আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মহল্লী (র.)
[৭৯১–৮৬৪ হি. / ১৩৮৯–১৪৫৯ খ্রি.]

তাফসীরে জালালাইন

৭

২৯ ও ৩০তম পারা

সম্পাদনায়

হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা

মূল ❖ আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মহল্লী (র.)

অনুবাদক ❖ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন

প্রকাশক ❖ আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম.
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল ❖ ১৫ রমযান, ১৪৩১ হিজরি
২৫ আগস্ট, ২০১০ ইংরেজি
১১ ভাদ্র, ১৪১৭ বাংলা

শব্দ বিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد -

হেরা থেকে বিচ্ছুরিত বিশ্বব্যাপী আলোকজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা আল-কুরআন। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। এর অনুপম বিধান সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বিশ্ব মানবতার এক চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য সংবিধান আল-কুরআন। যে মহাগ্রন্থের আবির্ভাবে রহিত হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ। যার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ এবং সার্বিক সফলতার নিদর্শন। মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক সকল দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ আলোচনার একমাত্র আধার হচ্ছে আল-কুরআন।

ইসলামি মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সফল ও সার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে বিশ্ববরেণ্য নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর মাধ্যমে। নবুয়তের তেইশ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় এ মহান ঐশীগ্রন্থ। ফলে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনিই সমধিক অবহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।

তাঁর পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ছিল কুরআন তাফসীরের অন্যতম অবলম্বন। তাঁদের পরবর্তী স্তরে তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রণীত ব্যাখ্যা ছিল গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে। এর পরে ক্রমান্বয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অদ্যাবধি এ শাশ্বত গ্রন্থের তাফসীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত 'তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়, যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায় সেখানে। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলব্ধি করছিলেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন সময়ের দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে ২৯ ও ৩০তম পারা [৭ম খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করেন। আমি এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ৭ম খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও তারকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে মাযহারী সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা-ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ও ওলামা হযরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

বিনয়াবনত

মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

লেখক ও সম্পাদক

ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
الجزء التاسع والعشرون : ২৯তম পারা [৯ — ২৫২]	
▮ সূরা আল মুলক	৯
সূরাটির নামকরণের কারণ	৯
সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল।	৯
সূরাটির ফজিলত।	৯
সূরাটির বিষয়বস্তু	৯
সূরা তাহরীমের সাথে সূরা মুলকের যোগসূত্র	১০
জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি তত্ত্ব	১২
হায়াত ও মউতের অবস্থান বিভিন্নতর	১২
মৃত্যু হওয়া সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের মতামত	১৩
কি বস্তু দ্বারা সাত আসমান তৈরি করা হয়েছে	১৫
তারকাগুলোকে مصابيح -এর সাথে তাশবীহ দান ও তারকারাজি দ্বারা আসমানকে সুশোভিত করার হেকমত	১৭
কুফরের তাৎপর্য	২১
আজাবের কয়েকটি বিশেষণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা	২০
এটা একটি উপদেশ ও সতর্কবাণী স্বরূপ	২৪
الاكل বলার পর النشور বলার কারণ	২৭
আল্লাহর অবস্থান	২৮
ঈমান থেকে কাফেরদের বিরত থাকার কারণ এবং তা খণ্ডনের পদ্ধতি	৩১
▮ সূরা আল ক্বালাম	৩৬
সূরাটির নাম করণের কারণ	৩৬
বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	৩৬
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩৬
কলম ও ما يسطرون -এর নামে শপথ করার কারণ	৩৯
কাফেরদের উক্তির খণ্ডন	৪০
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর خلق عظيم সম্পর্কে আলোচনা	৪০
বাগানের ঘটনা	৪৭
বিভ্রান্তির দশা অপসারিত	৫০
তওবার প্রতিদান	৫১
মধ্যম ব্যক্তি কি করে উত্তম হতে পারে	৫১
ধ্বংসের অজ্ঞাত শপথ	৫৯
আল্লাহর আনুগত্যের উপর বিনিময় চাওয়া জায়েজ হবে কি?	৬০
সাহেবে হূতের ঘটনা	৬২
হযরত ইউনুস (আ.) গুনাহ করেছেন কি না?	৬৩
▮ সূরা আল হাক্কাহ	৬৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	৬৫
নাজিল হওয়ার সময়কাল	৬৫
বিষয়বস্তু ও সারকথা	৬৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৬৬
অন্যান্য মিথ্যারোপকারীদের কথা উল্লেখ না করে ছামূদ ও আদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করার কারণ	৬৮
আদ জাতিকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহের সাথে উপমা দেওয়ার কারণ	৭০
مؤتفكات বলে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?	৭২
শিঙ্গায় ফুৎকদানকারী কে হবেন?	৭৪
আকাশের পার্শ্বদেশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের আকৃতির বর্ণনা	৭৫
গুনাহগারদেরকে শিকল দ্বারা বাধার কারণ	৮০
কসম নেওয়ার কারণ	৮৩
গণক বা কাহিন কাকে বলে?	৮৪
▮ সূরা আল-মা'আরিজ	৮৮
সূরাটির নামকরণের কারণ	৮৮
নাজিল হওয়ার সময়কাল	৮৮
শাস্তি প্রার্থনাকারী	৯০
শাস্তির দিনের পরিমাণ	৯১
একহাজার বছর এবং পঞ্চাশ হাজার বছর -এর সামঞ্জস্য বিধান	৯২
পাহাড়কে পশমের সাথে তুলনা করার কারণ	৯৪
জাহান্নামের ডাক	৯৫
জাহান্নামের ডাকার পদ্ধতি	৯৫
নামাজ সর্বদা কায়েম করা ও সংরক্ষণ করার তাৎপর্য	১০০
কাফেরগণ রাসূলের দরবারে দৌড়ে আসার কারণ	১০১
মানব সৃষ্টির তাৎপর্য এবং জান্নাতে প্রবেশের মাপকাঠি	১০১
▮ সূরা নূহ	১০৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	১০৫
অবতীর্ণের সময়কাল	১০৫
বিষয়বস্তু ও সারমর্ম	১০৫
সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা	১০৭
হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন? কওমে নূহ কারা	১০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত নূহ (আ.)-এর আনুগত্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ	১০৯
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার হেকমত	১১৩
হযরত হাসান বসরী (রা.)-এর ঘটনা	১১৪
নূর ও সিরাজ -এর মধ্যকার পার্থক্য	১১৫
কোন আকাশে চন্দ্র ও সূর্য অবস্থিত রয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ কি?	১১৬
মানব সৃষ্টিকে উদ্ভিদ সৃষ্টির সাথে তুলনা করার কারণ	১১৬
হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নাফরমানি কি ছিল?	১১৮
মানুষের মাঝে মূর্তি পূজার প্রচলন কিভাবে শুরু হয়?	১১৮
উদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসর এর তাফসীর	১১৯
▮ সূরা আল-জিন	১১২
সূরাটির নামকরণের কারণ	১২২
অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল	১২২
বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	১২২
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	১২৩
জিন এর পরিচয়	১২৫
রাসূল ﷺ কি জিনদের দেখেছিলেন না দেখেননি?	১২৫
ঈমানদার জিনদের জান্নাতের প্রবেশ সম্পর্কে মতপার্থক্য	১২৫
একজন জিন সাহাবীর ঘটনা	১২৮
শয়তানগণ কোন আকাশে বসত অথচ সকল আসমান রক্ষিবাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল	১৩২
যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা অমান্য করলেই কি চিরদিন জাহান্নামে জ্বলবে	১৩৯
▮ সূরা আল-মুয্যাম্মিল	১৪৩
সূরাটির নাম করণের কারণ	১৪৩
অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল	১৪৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	১৪৪
সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ	১৪৬
কিয়ামুল লাইল কি রাসূল ﷺ-এর উপর ফরজ ছিল?	১৪৭
কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারতীল ওয়াজিব না সুন্নত?	১৪৯
গান করে এবং লাহান করে কুরআন পড়া সম্বন্ধে ফিকহবিদদের মাযহাব	১৪৯
তাহাজ্জুদের নামাজের হুকুম দেওয়ার কারণ	১৫১
বিশেষত হযরত মূসা (আ.) এবং ফেরাউনের উল্লেখ করার কারণ	১৫৮
তাহাজ্জুদ -এর হুকুম প্রদানের হেকমত	১৬২
তাহাজ্জুদের فرضيت রহিত করার মধ্যে হেকমত	১৬৫
▮ সূরা আল-মুদ্দাছছির	১৬৬
সূরাটির নামকরণের কারণ	১৬৬
অবতীর্ণের সময়কাল	১৬৬
সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা	১৬৬
অত্র সূরার শানে নুযূল	১৬৮
দাঈদের পবিত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ দান	১৭১
রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ধৈর্যধারণ করতে বলার কারণ	১৭২
আবূ জাহল এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ -এর মাঝে কথোপকথন	১৭৪
জাহান্নামের কর্মচারী ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখের কারণ	১৮৩
সকাল বেলা, রাত্রি ও চন্দ্রের শপথ করার কারণ	১৮৮
شفاعة অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ	১৯০
সত্যকে শ্রবণ করা হতে পলায়ন করার কারণ	১৯২
▮ সূরা আল কিয়ামাহ	১৯৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	১৯৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	১৯৫
আয়াতকে শপথের সাথে নেওয়ার হেকমত	১৯৮
কিয়ামত ও পরকালে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণ	১৯৯
ওহীকে গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়া করার কারণ	২০৫
কিয়ামত দিবসে আল্লাহকে দেখার প্রমাণ	২০৬
নামাজের গুরুত্ব এবং তা ঈমানের দাবি হওয়া	২০৯
▮ সূরা আল-ইনসান/আদ্দাহর	২১৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	২১৩
সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা	২১৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২১৪
মানুষের কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা	২১৮
ইসলামের দৃষ্টিকে ধৈর্যের তাৎপর্য	২২৪
জান্নাতে সূর্য থাকবে না কিভাবে ছায়া পাওয়া যাবে?	২২৭
বালকসমূহের মণি-মুক্তার সাথে তুলনা করার কারণ	২২৯
শারাবান তাহ্রান -এর তাৎপর্য	২৩০
▮ সূরা আল-মুরসালাত	২৩৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	২৩৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২৩৫
সূরায় যেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে তা অস্পষ্ট রাখার কারণ	২৩৮
এটাতো হবে দুনিয়াতে আর পরকালে?	২৪৩
ভূ-পৃষ্ঠের উপর পাহাড়সমূহকে উঁচু উঁচু করে স্থাপনের কারণ ও হিকমত	২৪৪
জাহান্নামের ধোয়া তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়ার কারণ	২৪৬
ওজর পেশ করতে না দেওয়া ইনসাফের খেলাফ	২৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
الجزء الثلاثون : ৩০তম পারা	
[২৫৩ – ৬৩৬]	
▮ সূরা আন নাবা	২৫৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	২৫৩
সূরাটির মূল কথা ও আলোচ্য বিষয়	২৫৩
সূরা আল মুরসালাতের সাথে সূরা আন নাবার যোগসূত্র	২৫৫
কিয়ামতের ব্যাপারে কারা মতবিরোধ করত?	২৫৭
পাহাড় কখন সৃষ্টি করা হয়েছে	২৬১
ঘুমের জন্য سبات এবং দিনের জন্য معاش উল্লেখ করার কারণ	২৬৩
সূর্য সৃষ্টির রহস্য	২৭৪
শিঙ্গায় ফুঁকের সংখ্যা	২৬৮
কিয়ামত কখন এবং কোথায় সংঘটিত হবে	২৬৯
পূর্ণ আকাশ দরজাময় হয়ে যাওয়ার কারণ	২৭০
পুলসিরাতের স্বরূপ	২৭৫
জান্নাতবাসী জাহান্নাম অতিক্রম করার কারণ	২৭৫
শুধু হিসাবকে উল্লেখ করার কারণ	২৭৯
কিভাবে একই বস্তুকে প্রতিফল এবং পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত করা হলো	২৮৪
روح -এর অর্থ নিয়ে মতভেদ	২৮৭
▮ সূরা আন - নাযিআত	২৯৩
ফেরেশতাদেরকে ناشطات -এর সাথে তুলনা করার কারণ	২৯৪
আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত ফেরেশতাগণের শপথ কেন করেছেন?	২৯৬
হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা কি?	৩০৪
পথ প্রদর্শক ছাড়া আল্লাহকে চিনার উপায় আছে কি?	৩০৫
হযরত মূসা (আ.) কিভাবে পিছিয়ে গেলেন এবং কি চেষ্টা করলেন?	৩০৭
ফেরাউনের ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়	৩০৯
কিয়ামতের যৌক্তিকতা	৩১১
রাত্রকে আকাশের দিকে সম্বোধন করার কারণ	৩১২
পাহাড় স্থাপন ও পানি এবং গাছপালা সৃষ্টির অর্থ ও রহস্য	৩১৩
হাশরের ময়দানের অবস্থা	৩১৭
আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখার গুরুত্ব	৩১৯
তাদের সকাল-সন্ধ্যা উল্লেখের কারণ	৩২০
▮ সূরা আবাসা	৩২১
সূরাটির নামকরণের কারণ	৩২১
নাজিল হওয়ার সময়কাল	৩২১
ঐতিহাসিক পটভূমি ও সূরাটির বিষয়বস্তু	৩২১
পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র	৩২২
ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) কিসের ভয় করতেন?	৩২৭
কুরআন নিজেই সম্মানিত	৩৩০
মানুষের তিনটি ধাপ	৩৩৩
পানি বর্ষণের প্রতি লক্ষ্য করার কারণ	৩৩৭
এখানে আটটি বস্তুর উল্লেখের উদ্দেশ্য কি?	৩৩৯
নির্দিষ্ট কয়েকজনের কথা উল্লেখের কারণ	৩৪২
▮ সূরা আত্‌তাকভীর	৩৪৪
সূরাটির নামকরণের কারণ	৩৪৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩৪৪
عشار -এর অর্থ এবং এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৪৮
কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিতকরণের ঐতিহাসিক তথ্য	৩৫২
সন্তান হত্যার বিধান	৩৫২
হাশরে দোজখের উত্তপ্ততা এবং বেহেশতের নৈকট্য দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	৩৫৩
কুরআনকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বাণী বলার কারণ	৩৫৭
হযরত জিবরাঈল (আ.) শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ	৩৫৮
গায়েব বিষয়ে কার্পণ্য কেন করেননি?	৩৬১
▮ সূরা আল ইনফিতার	৩৬৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	৩৬৩
আকাশ বিদীর্ণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৬৫
মানুষ যখন তার কৃতকর্ম জানতে পারবে	৩৬৬
কে কেন এবং কিভাবে ধোকা দেয়	৩৬৮
মানুষের দেহে আল্লাহর আশ্চর্যজনক কুদরত	৩৬৯
কাফেরদের সাথে সংরক্ষক আছে কি না?	৩৭১
আমল লিপিবদ্ধ করার হিকমত	৩৭২
সূরা আল মুতাফফিফীন	৩৭৬
সূরাটির নামকরণ	৩৭৬
সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য	৩৭৬
কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা	৩৮০
কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহকে দেখতে পাবে কিনা?	৩৮৪
তাসনীম দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৮৮
পরকালে কাফেরদেরকে উপহাস করবে	৩৯০
▮ সূরা আল ইনশিকাক	৩৯২
সূরাটির নামকরণের কারণ	৩৯২
সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলকথা	৩৯২
আকাশ তার প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করার অর্থ কি?	৩৯৪
সহজ ও কঠোর হিসাবের পর্যালোচনা	৩৯৮
কাফেরদের আমলনামা কিভাবে দেওয়া হবে?	৩৯৯
তারা কেন অস্বীকার করত?	৪০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
▮ সূরা আল বুরূজ	৪০৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪০৫
সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য	৪০৫
আকাশকে ذات البروج বলা হয়েছে কেন?	৪০৮
প্রতিশ্রুতি দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য	৪০৮
আসহাবে উখদূদের ঘটনা	৪০৯
আসহাবে উখদূদ মুমিনগণকে কেন আজাব দিয়েছিল?	৪১৪
ফেরাউন ও ছামূদের উল্লেখ করার হেতু কি?	৪১৮
لوح কোথায় অবস্থিত?	৪২০
▮ সূরা আত্ তারিক	৪২১
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪২১
সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	৪২১
বর্তমান সূরার সাথে পূর্বের সূরার যোগসূত্র	৪২৩
নারী পুরুষ উভয়ের থেকে বীর্য গ্রহণ করার কারণ	৪২৬
কেন এবং কিভাবে ষড়যন্ত্র করেছেন?	৪৩০
সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী আল কুরআন	৪৩১
▮ সূরা আল আ'লা	৪৩২
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৩২
সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা	৪৩২
ভারসাম্য রক্ষা করার তাৎপর্য	৪৩৫
মহা অগ্নি দ্বারা উদ্দেশ্য	৪৪০
দুনিয়া থেকে পরকাল উত্তম হওয়ার কারণ	৪৪২
▮ সূরা আল গাশিয়াহ	৪৪৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৪৩
সূরার বিষয়বস্তু ও মূলকথা	৪৪৩
কিয়ামতকে غاشية বলা হয়েছে কেন?	৪৪৫
অগ্নিতে [জাহান্নামে] কিভাবে ঘাস জন্মিবে?	৪৪৬
বিশেষভাবে উষ্ট্রকে উল্লেখ করার কারণ	৪৫০
▮ সূরা আল ফাজর	৪৫৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৫৩
সূরার আলোচ্য বিষয়	৪৫৩
জোর-বেজোড়ের তাৎপর্য	৪৫৫
আদ জাতির ঘটনা	৪৫৭
ছামূদ জাতির ঘটনা	৪৫৮
ফেরাউন যেসব মহিলাকে পেরেক দ্বারা শাস্তি প্রদান করেছিল?	৪৬০
রিজিকের প্রশস্ততা ও সীমাবদ্ধতাকে পরীক্ষা বলার কারণ	৪৬৩
এতিমকে সম্মান না দেওয়ার অর্থ	৪৬৪
নফসের শ্রেণি বিভাগ	৪৬৮
▮ সূরা আল-বালাদ	৪৬৯
সূরাটির নাম করণের কারণ	৪৬৯
সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা	৪৬৯
দাসমুক্ত করা উত্তম না সদকা করা উত্তম	৪৭৭
▮ সূরা আশ্-শামস	৪৭৯
সূরাটির নাম করণের কারণ	৪৭৯
সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল কথা	৪৭৯
এখানে ছামূদ সম্প্রদায়ের উল্লেখের তাৎপর্য	৪৮৪
কে উষ্ট্রীকে হত্যা করেছে	৪৮৫
▮ সূরা আল-লাইল	৪৮৬
সূরাটির নাম করণের কারণ	৪৮৬
সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	৪৮৬
হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য	৪৯৪
▮ সূরা আদ্ব -দ্বুহা	৪৯৫
▮ সূরা আলাম নাশরাহ	৫০৪
▮ সূরা আত্ব-তীন	৫১০
▮ সূরা আল আলাক	৫১৬
▮ সূরা আল ক্বদর	৫২৭
▮ সূরা আল - বাইয়্যিনাহ	৫৩৩
▮ সূরা আয্-যিলযাল	৫৪১
▮ সূরা আল-আদিয়াত	৫৪৬
▮ সূরা আল-ক্বারিয়াহ	৫৫২
▮ সূরা আত-তাকাছুর	৫৫৬
▮ সূরা আল আসর	৫৬১
▮ সূরা আল হুমাযাহ	৫৬৫
▮ সূরা আল-ফীল	৫৭০
▮ সূরা আল-কুরাইশ	৫৭৭
▮ সূরা আল-মাউন	৫৮৩
▮ সূরা আল-কাউছার	৫৮৯
▮ সূরা আল-কাফিরূন	৫৯৪
▮ সূরা আন-নাসর	৫৯৯
▮ সূরা আল-লাহাব	৬০৪
▮ সূরা আল -ইখলাস	৬১০
▮ সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস	৬১৬
▮ সূরা আল-ফাতিহা	৬২৭

سُوْرَةُ الْمُلْكِ : সূরা আল-মুলক

সূরাটির নামকরণের কারণ : পবিত্র কুরআনের অত্র সূরার নামকরণ তার প্রথম আয়াতাংশ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ -এর মধ্যকার اَلْمُلْكُ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছে। এতে ৩০টি আয়াত, ৩৩৫টি বাক্য এবং ১৩১৩টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির অন্যান্য নাম : এ সূরাটিকে তাবারাকা, মুনজিয়াহ ও মানেয়া নামও দেওয়া হয়েছে। তাবারাকা নাম দেওয়ার কারণ হলো— এর পাঠকারী অশেষ কল্যাণ ও বরকত লাভ করে থাকে। আর মুনজিয়াহ নামের কারণ হলো— এর পাঠকারীকে কবর আজাব হতে পরিত্রাণ দেওয়া হয়। আর মানেয়া নাম দেওয়ার কারণ হলো— এর পাঠকারীকে এটা কবর আজাব হতে রক্ষা করে এবং বাধা দিয়ে থাকে। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু সূরাটির ভাষা, বর্ণনাভঙ্গির বক্তব্য ও বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা নবী করীম ﷺ -এর মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ জন্য তাকে মক্কী সূরা বলা হয়। কতক তাফসীরকার বলেন, এ সূরাটি তূরের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ইবনে শেহাব (রা.) বলেন, اِنَّهُ كَانَ يُسَمِّيْهَا الْمُجَادَلَةَ لِاَنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِى الْقَبْرِ 'এ সূরাকে সূরাতুল মুজাদালাহও বলা হয়। কেননা এ সূরা তেলাওয়াতকারীর পক্ষ থেকে ফেরেশেতাগণের সাথে ঝগড়া করবে এবং তেলাওয়াতকারীকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করবে।' যেমন হাদীস শরীফে এসেছে—

١. رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا هِىَ اِلَّا ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَاَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ وَهِىَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ .

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন মাজীদের একটি সূরা রয়েছে, যা ৩০ আয়াত বিশিষ্ট, যে তা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এ সূরা তার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে দোজখ হতে বের করাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবে। আর সে সূরাটি হলো— سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِىْ قَبْرِهِ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُوْلُ رِجْلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ لِاَنَّهُ يَقُوْمُ بِسُوْرَةِ الْمُلْكِ ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ لِسَانُهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ لِاَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِىْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ ثُمَّ قَالَ هِىَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَهِىَ فِى التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِىْ لَيْلَةٍ فَقَدْ اَكْثَرَ وَاَطْنَبَ .

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শায়িত করা হয় তখন সর্বপ্রথম তার পা যুগলের দিক থেকে আজাবের ফেরেশতা আসতে শুরু করে। তখন মৃতব্যক্তির পা দু'খানি ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, এ ব্যক্তির নিকটে আসার তোমাদের কোনো সুযোগ নেই। কেননা সে সূরা আল-মুলক সর্বদা পড়ত। অতঃপর তার মাথার দিক থেকেও পুনরায় আজাবের ফেরেশতা আসতে থাকে, তখন মৃতব্যক্তির মুখ বলবে এ ব্যক্তির নিকট তোমাদের আগমনের কোনো পন্থা নেই। কেননা, সে আমার (মুখমণ্ডলের) মাধ্যমে সূরা মুলক তেলাওয়াত করত। অতঃপর তিনি বললেন, এটা আল্লাহর আজাবকে ফিরিয়ে দেয়। তাওরাত কিতাবেও এটা সূরাতুল মুলক নামে পরিচিত ছিল। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তা তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি অত্যধিক নেক কার্য করল এবং তার নেক আমলনামাকে দীর্ঘ করল।

অপর একটি হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বলেন— هِىَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ) এটা (سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ) আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহতকারী, যে এটা তেলাওয়াত করবে তাকে তা কবরের শাস্তি থেকে নাজাত দান করবে। –[কুরতুবী]

وَاَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَبَارَكَ الْمُلْكِ فِىْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ . হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যেন প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তি শিখে নেয় এবং তেলাওয়াত করে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অচেতন ও গাফেল লোকদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের বিশেষত্ব হলো.

এগুলোতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে খুব সংক্ষেপে অথচ হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষের অন্তঃকরণে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসসমূহ সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। মানুষ তার প্রতি গভীর দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়।

সূরাটির ১ থেকে ৫নং আয়াত পর্যন্ত মহামহিম অসীম শক্তিধর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বর্ণনা দিয়ে সৃষ্টিকুলে তাঁর তুলনাহীন সৃষ্টি নৈপুণ্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা সৃষ্টিলোকের প্রতি আতিপাতি করে খোঁজাখুঁজি করলেও কোথাও কোনো খুঁত, অসমাঞ্জস্য ও ত্রুটি দেখবে না। জীবন-মৃত্যুকে এ জগতে তোমাদের পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে তাদের মধ্যে কারা সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান হয়, তা বাস্তবে প্রমাণ করে নিতে পারেন।

৬ থেকে ১১নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সাথে কুফরি করার ভয়াবহ ও মারাত্মক পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন এবং জাহান্নামের আজাবের বর্ণনা দিয়ে, যেন তার বাস্তব চিত্রটি লোকদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

১২ থেকে ১৪নং আয়াতে আল্লাহভীরু লোকদের শুভ পরিণাম ও সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ যে সর্বজ্ঞাতা, ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য সকল শ্রেণির কাজ ও কথা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা এবং আল্লাহর অন্তর্যামী হওয়ার কথাও তুলে ধরেছেন।

১৫ থেকে ২৩ নং আয়াতে আল্লাহভীরু মানুষের নিকট কম গুরুত্বপূর্ণ অথচ চিরন্তন ও শাশ্বত মহাসত্য তুলে ধরে স্বীয় অসীম ক্ষমতা, কুদরত ও সৃষ্টি-কৌশলের অবিসংবাদিত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– এ ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-পৃষ্ঠকে আমি নরম ও চলনোপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। আকাশকে শূন্যলোকে ঝুলন্ত রেখেছি। বায়ুমণ্ডলকে বিহঙ্গকূলের উড্ডয়নের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তোমাদেরকে যদি আল্লাহ তা'আলা ভূমির তলদেশে ধ্বসিয়ে দেন, কংকর বর্ষণ করেন, তবে তোমাদের রক্ষা করার কে আছে? অতএব তোমরা সে মহাশক্তিধরের সম্মুখে অবনত হও, তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাও, তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা ও অধিকারকে মেনে নাও। ইতঃপূর্বে যারা তাঁকে স্বীকার করেনি, তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাকে মেনে নেয়নি, তাদের আমি [আল্লাহ] কঠোর শাস্তি দিয়েছি। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো সেনাবাহিনীও নেই, যারা আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। তিনি যদি তোমাদের জীবিকা ও জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের জীবিকা দান করার কেউ আছে কি? এ বাস্তব সত্যগুলোর প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে তোমাদের ঈমান আনা উচিত। বস্তুত আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। এসব কথার উদ্দেশ্য হলো নির্ভেজালরূপে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নিরংকুশ সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও আস্থাশীল হওয়া।

২৪ থেকে ২৭নং আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; কিন্তু সে সময়টা কখন তা বলা নবীর দায়িত্ব নয়; বরং ঐ সময়টি আগমনের সংবাদটি দেওয়াই হলো নবীর কাজ। সে সময়টির আগমন মুহূর্তটি জানিয়ে দেওয়ার যে দাবি তোমরা উত্থাপন করেছে, তা সম্পর্কে নবী ﷺ অবগত নন। সে নির্ধাত মুহূর্তটি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত রয়েছেন। তা যখন তোমরা অবলোকন করবে, তখন তোমরা ভীতবিহ্বল, কম্পমান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

পরিশেষে ২৮-৩০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মক্কার মুশরিকদের সেসব অবাঞ্ছিত কথার জবাব দিয়েছেন, যা তারা নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলত। তারা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি নানারূপ কটূক্তি ও গালাগাল করত এবং ঈমানদারদের ধ্বংস কামনা করত। এর জওয়াবে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে– নবী করীম ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ ধ্বংস হোন বা তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণার আশিসধারা বর্ষিত হোক, তাতে তোমাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না। তোমাদের ব্যাপারটি তোমাদেরই চিন্তা করতে হবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হলে তোমাদের কেউই রক্ষা পাবে না। তোমরা ঈমানদারদেরকে ভ্রান্ত ভাবছ, কিন্তু আসলে কারা ভ্রান্ত, তা একদিন অবশ্যই উদ্ঘাটিত হবেই।

সূরাটির সর্বশেষে কাফিরদের কাছে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এ ধূসর মরু ও পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে তোমাদের অন্যতম জীবনোপকরণ হলো পানি, সে পানি যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে বল তো তোমাদের জন্য কে সে সঞ্জীবনী সুরা এনে দিতে পারে?

সূরা তাহরীমের সাথে সূরা মুলকের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে রিসালাতের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে তাওহীদের কথা দলিল সহকারে পেশ করা হয়েছে এবং তাওহীদের দায়িত্বের ব্যাপারে ত্রুটি করলে তার পরিণতির কথাও পেশ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরাতে নেককার ও বদকার নারীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে এ আলোচনাকে সাধারণ ও ব্যাপক করে তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে, এ সূরাটির সম্পর্ক রয়েছে সূরা আত্-তালাকের সাথে। সূরা আত্-তালাকে সপ্ত আকাশ ও জমিনের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে তার উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কথা দলিল-প্রমাণসহকারে পেশ করা হয়েছে। এ মতে সূরা তাহরীম সূরা আত্-তালাকের অংশ বিশেষের মতো অথবা সূরা আত্-তালাকের সম্পূরক। -[রূহুল মা'আনী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. تَبٰرَكَ تَنَزَّهَ عَنْ صِفَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ الَّذِيْ بِيَدِهِ فِيْ تَصَرُّفِهِ الْمُلْكُ السُّلْطَانُ وَالْقُدْرَةُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

২. الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ فِى الدُّنْيَا وَالْحَيٰوةَ فِى الْاٰخِرَةِ اَوْ هُمَا فِى الدُّنْيَا فَالنُّطْفَةُ تَعْرِضُ لَهَا الْحَيٰوةُ وَهِيَ مَا بِهِ الْاِحْسَاسُ وَالْمَوْتُ ضِدُّهَا اَوْ عَدَمُهَا قَوْلَانِ وَالْخَلْقُ عَلَى الثَّانِيْ بِمَعْنَى التَّقْدِيْرِ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِى الْحَيٰوةِ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط اَطْوَعُ لِلّٰهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِيْ اِنْتِقَامِهِ مِمَّنْ عَصَاهُ الْغَفُوْرُ لِمَنْ تَابَ اِلَيْهِ ـ

অনুবাদ :

১. তিনি মহিমান্বিত সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলি হতে পবিত্র যাঁর হস্তে করায়ত্তে সর্বময় কর্তৃত্ব রাজত্ব ও ক্ষমতা আর তিনি সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু পার্থিব জীবনে ও জীবন আখেরাতে, অথবা উভয়টিই ইহজগতে। যেমন, বীর্যের মধ্যে জীবন আসে, যা দ্বারা তাতে অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আর মৃত্যু তার বিপরীত কিংবা তা না থাকার নাম। এ সম্পর্কে দু'টি মতামত রয়েছে। আর خَلَقَ শব্দটি দ্বিতীয় মতের প্রেক্ষিতে تَقْدِيْر অর্থে পরিগণ্য। তোমাদেরকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে পার্থিব জীবনে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক হতে উত্তম? আল্লাহ তা'আলার প্রতি অধিক আনুগত্যশীল। তিনি পরাক্রমশালী তাঁর সাথে অবাধ্যাচরণকারী হতে প্রতিশোধ গ্রহণে। ক্ষমাশীল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির একাধিপত্য এবং অবিমিশ্র সাম্রাজ্য যাঁর, যিনি সব কিছু করতে পারেন, তাঁর ক্ষমতা অসীম এবং অপার মহিমার অধিকারী তিনি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন– আয়াতের অনুবাদ হলো, সে আল্লাহর সত্তা বড়ই বরকতসম্পন্ন ও পবিত্র, যাঁর কুদরতি কবজায় সারা বিশ্বের কর্তৃত্ব রয়েছে, যাঁর হুকুমত ও বাদশাহী দুনিয়ার অপ্রকৃত বাদশা ও হাকিমগণের রাজত্বের ন্যায় ধ্বংসশীল নয় এবং অসম্পূর্ণও নয়; বরং তিনিই সকল বাদশা ও সম্রাটদের সম্রাট। যিনি সকল বস্তুর উপর সর্বদা পূর্ণঅধিকার বিস্তার করে আছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَبَارَكَ : تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَةٌ হতে مُشْتَقٌّ হয়েছে, শব্দ গঠনের বিশেষ ধরনের কারণে এতে বিপুলতার অর্থ শামিল রয়েছে। অর্থাৎ উচ্চতরতা, বিরাটত্ব, বিপুলত্ব, প্রাচুর্য, স্থিতি এবং কল্যাণের ব্যাপকতা ও অশেষ ধারা এর অর্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ মা'আরেফ গ্রন্থকারের মতে, বৃদ্ধি হওয়া ও অতিরিক্ত হওয়া।

تَبَارَكَ শব্দটি যখন আল্লাহর শানে বলা হবে তখন অর্থ হবে সর্বোত্তম, সর্ববৃহৎ সম্মানী বা মর্যাদাশীল এবং পবিত্র। যথা, আল্লাহু আকবর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ)।

অথবা, এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা অসাধারণ, মহান ও বিরাট, স্বীয় সত্তার গুণাবলিতে ও কার্যাবলিতে তিনি অনন্য সাধারণ ও সকলের চাইতে অতুলনীয়ভাবে উচ্চতর। সীমাহীন কল্যাণের প্রস্রবণ তাঁর সত্তা হতে সদা প্রবহমান। সর্বদিকে তাঁর পূর্ণত্ব চিরন্তন ও শাশ্বত।

اَلْمُلْكُ শব্দের হাকিকত : بِيَدِهِ الْمُلْكُ শব্দের অর্থ হলো– রাজত্ব তাঁর হস্তে। اَلْمُلْكُ শব্দটি পবিত্র কালামের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অদ্রূপ يَدٌ শব্দকেও বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার শানে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা শরীর ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং এরূপ শব্দসমূহ اٰيَاتٌ مُتَشَابِهَةٌ-এর অর্ন্তভুক্ত। সুতরাং আয়াতে মুতাশাবেহাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই কেবল ওয়াজিব।

আল্লাহর হস্ত ও চেহারা ইত্যাদির রূপরেখা ও হাকিকত সম্বন্ধে কারো কোনো কিছুই জানা নেই। আর সে বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগা শরিয়তের বিধান মতেও জায়েজ নয়। অতএব اَلْمُلْكُ শব্দটিকে সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। اَلْمُلْكُ-এর এক অর্থ আসমান-জমিন ও দুনিয়া-আখেরাতের হুকুমত বা সমগ্র সৃষ্টিলোকের ও বিশ্ব নিখিলের উপর রাজকীয় সার্বভৌমত্ব এবং নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব তাঁর কুদরতী হস্তে নিবদ্ধ। –[মা'আরিফ]

জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টিতত্ত্ব : মানবকুলের জীবন ও মৃত্যুর অব্যাহত ধারাটি আল্লাহরই সৃষ্টিকৃত একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। মানবকুলের জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পিছনে আল্লাহর বিশেষ একটি উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল। মানব সৃষ্টির পিছনে যেমন আল্লাহর একটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তেমনি রয়েছে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির পিছনে একটি মহান উদ্দেশ্য। আর তাহলো কারা এ পার্থিব জগতে কর্মে সৎ ও সুন্দর হয় এবং কারা কর্মে দুষ্ট ও অসুন্দর প্রমাণিত হয়, তা পরীক্ষা করা। মানুষের জড় দেহটি হচ্ছে এ জাগতিক জীবনে আত্মার বিচরণ ও অবস্থানের একটি বাহন মাত্র। এ বাহন সৃষ্টির পূর্বে আত্মার ক্রিয়াশীলতার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং দেহটিকে আত্মার ক্রিয়াশীলতার বাহন সৃষ্টি করে তাকেই হায়াত বা জীবন নামকরণ করা হয়েছে। আর আত্মা যখন এ বাহন ছেড়ে চলে যায়, তখনকার অবস্থাটিকে নাম দেওয়া হয়েছে মৃত্যু। কারণ আত্মার ক্রিয়াশীলতার কোনো বাহন বা অস্তিত্ব নেই। সুতরাং তা-ই মৃত্যুবৎ অবস্থা।

আয়াতে মাউত শব্দটি হায়াত শব্দের পূর্বে উল্লেখ করে আত্মার প্রথমত বাহনহীন ও অস্তিত্বহীনতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাথে সাথে এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, জীবনদানকারী ও মৃত্যুদানকারী একমাত্র আল্লাহই। তিনি ব্যতীত আর কেউ এ অবস্থা ঘটাতে পারে না। আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে ভালো কাজ করার এবং খারাপ কাজ করার উপাদান বর্তমান তাও ইঙ্গিতে বুঝা যায়। সূরা আশ-শামসের ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে– "আমি তাদের মধ্যে ভালো ও খারাপের উপাদান রেখে দিয়েছি।" সুতরাং এ সৎ স্বভাব ও অসৎ স্বভাবের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের মধ্যে কারা ভালো ও উত্তম কাজ করে, তাও পরীক্ষা করা জীবন ও মৃত্যুদানের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া ভালো ও মন্দের মাপকাঠি নির্ধারণকর্তা যে পরীক্ষার্থী নিজে নয়, বরং আল্লাহ, এখানে তাও বুঝা যায়। অতএব কোনটি ভালো ও কোনটি খারাপ কাজ তা পরীক্ষার্থীগণের পূর্বাহ্নে জেনে নেওয়া আবশ্যক। উক্ত আয়াতে সর্বশেষে যে তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে, তা হলো পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া-নাহওয়া অনুপাতেই প্রতিফল নির্ধারণ হবে। ভালো কাজ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শুভ প্রতিফল এবং খারাপ কাজ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে খারাপ প্রতিফল ভোগ করবে, এটাই পরীক্ষার দাবি। কেননা প্রতিদান না দেওয়া হলে পরীক্ষা-ই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

হায়াত ও মউতের অবস্থান বিভিন্নতর : তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর মহাকুদরত ও হিকমতের দ্বারা সৃষ্টিজগতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকার সৃষ্টির হায়াতও বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। এর মধ্যে সবচাইতে পরিপূর্ণ জীবন মানবজাতিকেই প্রদান করেছেন। আর মানবজাতির হায়াতের মধ্যে এমন ক্ষমতাও প্রদান করেছেন যে, তারা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এ অভিজ্ঞতাই مُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ হওয়ার কারণ হয়েছে এবং এটাই আল্লাহ তা'আলার আমানতপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বিশেষ কারণ হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন– إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ - আর এ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির কারণেই তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ হায়াত এসেছে, সে হায়াতের বিপরীত হলো এমন মৃত্যু যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– (اَلْاٰيَةُ) اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ - উক্ত আয়াতে কাফেরকে মৃত এবং মু'মিনকে জীবিত বলা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, কাফের কি মৃতব্যক্তির সমান ছিল না? অতঃপর আমি তাকে জীবন দান করেছি, অর্থাৎ ঈমান নসিবের মাধ্যমে জীবিত করেছি। কাফের ব্যক্তি নিজ পরিচয় গ্রহণ করার অনুভূতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, যা মানুষের বিশেষ হায়াত হিসেবে পরিগণিত ছিল। এটা হলো প্রথম প্রকারের হায়াত।

২. কিছু সংখ্যক মাখলুকাতের মধ্যে এরূপ হায়াত বিদ্যমান নেই। কিন্তু (حِسٌّ وَحَرَكَتٌ) অনুভূতি রয়েছে। এ প্রকার হায়াতের বিপরীতমুখী মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ الخ - উক্ত আয়াতে হায়াত অর্থ حِسٌّ وَحَرَكَةٌ আর মৃত্যু বলে সে حِسٌّ وَحَرَكَتٌ বন্ধ হয়ে যাওয়া। এটা দ্বিতীয় প্রকারের হায়াত।

৩. আর কিছু সংখ্যক সৃষ্টির মধ্যে উক্ত (حِسّ وَحَرَكَتْ) অনুভূতিশক্তিও বিদ্যমান নেই, বরং (نُمُو) [বৃদ্ধি] ক্ষমতা রয়েছে। যেমন– সাধারণ উদ্ভিদজগৎ ও গাছপালা ইত্যাদির জীবন, এ জীবনের বিপরীত যে মৃত্যু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ – হায়াত -এর এটি তৃতীয় প্রকার। এ তিন প্রকারের হায়াত কেবল মানুষ, জানোয়ার ও উদ্ভিদজগতের মধ্যে সীমিত রয়েছে। অন্যান্য সৃষ্টিজগতের মধ্যে এরূপ হায়াত দেওয়া হয়নি। তাই আল্লাহ তা'আলা পাথর দ্বারা তৈরিকৃত মূর্তিসমূহ সম্পর্কে বলেছেন أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ এতৎসত্ত্বেও পাথরসমূহের মধ্যে এক প্রকার হায়াত রয়েছে যা বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ জাতীয় হায়াতের اثر রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ অর্থাৎ এমন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ সম্বন্ধে অবগত নও। –[মা'আরিফ, মাযহারী]

হায়াত মৃত্যুর অগ্রে, তথাপিও হায়াত -এর পূর্বে মৃত্যুকে উল্লেখ করার কারণ : এর কয়েকটি কারণ হতে পারে :

১. মূলগত দিক থেকে বিবেচনা করলে মৃত্যুই مُقَدَّمٌ এবং হায়াত مُؤَخَّرٌ হবে। কেননা যে সকল জীবজন্তু বা বস্তু ইত্যাদির যখন অস্তিত্ব হয়েছে, তখন এর পূর্বে তা মৃত্যুর কবলে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর তাতে হায়াত এসেছে। তাই মৃত্যুকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হায়াতকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অথবা, মৃত্যু ও হায়াতের সৃষ্টির কারণ মানুষকে পরীক্ষা করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا এ পরীক্ষা হায়াতের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক পরিমাণে রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুকে উপস্থিত মনে করবে, সে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে নেক আমল করতে আগ্রহী হবে। যদিও এ পরীক্ষা তারা অধিক পরিমাণে বাঁচার আশায়ও করা সম্ভব। তথাপিও মৃত্যুর চিন্তায় মূলত নিজ নেক আমলসমূহের মধ্যে খুবই উন্নতি লাভ হয় এবং সে আমল খুবই مُؤَثِّرٌ হয়ে থাকে।

হযরত আমের ইবনে ইয়াসির (রা.) বলেন– كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا وَكَفٰى بِالْيَقِيْنِ غِنًى অর্থাৎ 'উপদেশ গ্রহণের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট আর তুষ্ট হওয়ার জন্য একিনই যথেষ্ট।' সুতরাং নিজের আপনজন ও প্রিয়তমদের মৃত্যুর মোশাহাদাহ সর্ববৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। যে ব্যক্তি তাতে مُتَأَثِّرٌ হয় না সে ব্যক্তি অন্যের মাধ্যমে مُتَأَثِّرٌ হওয়া বড়োই মুশকিল। আর যাকে আল্লাহ ঈমান ও একিনের ন্যায় দৌলত দান করেছেন, তার সমকক্ষ কোনো বৃহৎ ধনী ব্যক্তি হতে পারে না।

হযরত আনাস ইবনে রবী' (রা.) বলেন, মৃত্যু মানুষকে দুনিয়া হতে বিমুখ এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানে খুবই কার্যকর। এ জন্য মৃত্যুকে হায়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা মানুষকে যেহেতু نُطْفَه হতে সৃষ্টি করা হয় এবং نُطْفَه মৃতবৎ আর نُطْفَه সন্তানের জন্মের উপায়, এ কারণে مَوْت -কে مُقَدَّمٌ ও হায়াতকে مُؤَخَّرٌ করা হয়েছে।

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا বাক্যে أَحْسَنُ عَمَلًا -এর অর্থ : أَحْسَنُ عَمَلًا বা উত্তম আমল কে করেছে, তা আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করে দেখবেন। উত্তম আমলের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ খালেস এবং সঠিক আমল। কেননা কোনো আমল আল্লাহর জন্য খালেস এবং রাসূলের সুন্নতের পন্থায় সঠিকভাবে সম্পাদিত না হলে আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হবে না। কেউ কেউ বলেন, أَحْسَنُ عَمَلًا -এর অর্থ হচ্ছে– আকলের সাথে আমল করা। কেননা যার জ্ঞান সঠিক থাকে সে ব্যক্তিই ভালোভাবে আমল করতে পারে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো "তোমাদের মাঝে দুনিয়া থেকে কে বেশি বিমুখ।" কেননা দুনিয়াকে ত্যাগ না করলে উত্তম কাজ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। –[কাবীর]

মৃত্যু হওয়া সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের মতামত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কালবী এবং মুকাতিলের মতে, মৃত্যু একটি দেহ বা শরীর বিশিষ্ট। অতএব মৃত্যুর অস্তিত্ব রয়েছে। এমনিভাবে حَيَاةٌ তথা জীবনেরও অস্তিত্ব রয়েছে। একটির উপস্থিতিতে অন্যটি অনুপস্থিত থাকে।

কারো মতে مَوْت [মৃত্যু] حَيَاةٌ [জীবন] না থাকাকে বলা হয়। হায়াতবিহীন রূহশূন্য অবস্থাকে مَوْت বা মৃত্যু বলা হয়ে থাকে। এর 'দেহবিশিষ্ট' হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, مَوْت একটি গুণ, যার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু حِسّ وَحَرَكَتْ -এর আওতায় আনা যায় না। যেমন, গরম ও ঠাণ্ডা। –[পার্শ্বটীকা জালালাইন]

অনুবাদ :

٣. الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةٍ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ لَهُنَّ وَلَا لِغَيْرِهِنَّ مِنْ تَفٰوُتٍ ط تَبَايُنٍ وَعَدَمُ تَنَاسُبٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ اَعِدْهُ اِلَى السَّمَاءِ هَلْ تَرٰى فِيْهَا مِنْ فُطُوْرٍ صُدُوْعٍ وَشُقُوْقٍ .

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশকে স্তরে স্তরে একটির উপর অপরটিকে, যা-পরস্পর মিলিত নয়। তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে দেখবে না আকাশমণ্ডলী ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টির মধ্যে কোনোরূপ ব্যতিক্রম বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি। পুনরায় তাকিয়ে দেখ পুনর্বার আকাশের প্রতি তুমি কি দেখতে পাও? তাতে কোনো রূপ ত্রুটি ফাটল ও ভাঙ্গন।

٤. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ يَنْقَلِبْ يَرْجِعُ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا ذَلِيْلًا لِعَدَمِ اِدْرَاكِ خَلَلٍ وَّهُوَ حَسِيْرٌ مُنْقَطِعٌ عَنْ رُؤْيَةِ خَلَلٍ .

৪. অতঃপর তুমি বারংবার দৃষ্টি ফেরাও পুনঃ পুনঃ ফিরে আসবে প্রত্যাবর্তন করবে তোমার প্রতি সে দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে বিফল হয়ে, কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি না পেয়ে ক্লান্ত অবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি না দেখার কারণে অবসাদগ্রস্ত হয়ে।

٥. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا الْقُرْبٰى اِلَى الْاَرْضِ بِمَصَابِيْحَ بِنُجُوْمٍ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا مَرَاجِمَ لِلشَّيٰطِيْنِ اِذَا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ بِاَنْ يَنْفَصِلَ شِهَابٌ عَنِ الْكَوْكَبِ كَالْقَبَسِ يُؤْخَذُ مِنَ النَّارِ فَيَقْتُلُ الْجِنِّىَّ اَوْ يَخْبِلُهُ لَا اِنَّ الْكَوْكَبَ يَزُوْلُ عَنْ مَكَانِهٖ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ النَّارِ الْمُوْقَدَةِ .

৫. আমি অবশ্যই সুশোভিত করেছি দুনিয়ার আকাশকে জমিন হতে নিকটবর্তী। প্রদীপমালা দ্বারা তারকাপুঞ্জ দ্বারা। এবং আমি তাদেরকে করেছি নিক্ষেপের উপকরণ নিক্ষেপ করার উপকরণ শয়তানের জন্য যখন সে চুপিসারে শুনার অপচেষ্টা করে। তখন নক্ষত্র হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় একখণ্ড ছুটে শয়তানকে ভস্ম করে দেয়, কিংবা তাকে অনুভূতিহীন করে দেয়। এটা নয় যে, নক্ষত্ররাজি স্বীয় অবস্থান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি প্রজ্বলিত অগ্নি।

তাহকীক ও তারকীব

كَرَّتَيْنِ শব্দের অর্থ এবং তারকীবে তার অবস্থান : এখানে كَرَّتَيْنِ শব্দটি مَصْدَرْ -এর স্থলে অবস্থিত। সুতরাং مَنْصُوْب হয়েছে। কারণ তার অর্থ হলো বারবার, একের পর এক দৃষ্টি ফেরাও। -[কুরতুবী]

বারবার দৃষ্টি ফেরাতে বলার কারণ হলো, একবার দেখলে কোনো বস্তুর দোষগুণ বিচার করা যায় না, আর বারবার দেখলে তার দোষগুণ দৃষ্টিগোচর হয়।

مِنْ تَفَاوُتٍ বাক্যে অবতীর্ণ কেরাতদ্বয় : জমহুর تَفَاوُتٍ শব্দটি فَ -এর পরে আলিফ দিয়ে পড়েছেন। ইবনে মাসউদ, হামযা এবং কিসায়ী এ শব্দটিকে تَفَوُّتٍ তথা وَاوْ বর্ণে تَشْدِيْد দিয়ে পড়েছেন। দুই قِرَاءَةْ -এর একই অর্থ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا : অর্থাৎ আল্লাহ তিনিই, যিনি সাতটি আসমানকে পরস্পর উপর-নিচ করে তৈরি করেছেন এবং একটি অপরটি হতে বহুদূরে রেখেছেন। যথা হাদীস শরীফে রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, একটি আসমানের পর অপরটি আসমান পর্যন্ত বহু দূর-দূরান্তের দূরত্ব বিরাজমান রয়েছে। অতঃপর আরেকটি আসমান এভাবে ৭টি আসমান বিদ্যমান রয়েছে। মাদারেক গ্রন্থকার বলেন- طِبَاقًا অর্থ- مُطَابَقَةً بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنْ طَابِقِ النَّعْلِ إِذَا خَصَفَهَا طَبَقًا عَلٰى طَبَقٍ اَوْ عَلٰى ذَاتِ طِبَاقٍ اَوْ عَلٰى طُوْبِقَتْ طِبَاقًا - দু'টি আসামানের মাঝে শূন্যস্থান বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর মি'রাজ গমনের ঘটনাটিও প্রমাণস্বরূপ পেশ করার যোগ্য, অর্থাৎ তিনি একটি আসমান হতে অপর আসমানের দিকে পরিভ্রমণ করেছেন।

অপরাপর হাদীসসমূহ দ্বারা এও জানা যায় যে, দু'টি আসমানের মধ্যকার শূন্যস্থানটুকু ৫০০ (পাঁচশত) বছরের রাস্তা। কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে, দু'টি আসমানের মধ্যকার প্রভেদ নেই; বরং সকল আসমানই সংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, طِبَاقًا অর্থ একটি স্তরের পর আরেকটি স্তরবিশিষ্ট ৭টি আসমান।

قَالَ الْبُقَاعِىُّ بِحَيْثُ يَكُوْنُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا مُطَابِقًا لِلْجُزْءِ مِنَ الْأُخْرٰى وَلَا يَكُوْنُ جُزْءٌ مِنْهَا خَارِجًا عَنْ ذٰلِكَ قَالَ وَهِىَ لَا تَكُوْنُ كَذٰلِكَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ كُرَةً وَالسَّمَاءُ الدُّنْيَا مُحِيْطَةٌ بِهَا اِحَاطَةَ قِشْرِ الْبَيْضَةِ مِنْ جَمِيْعِ الْجَوَانِبِ وَالثَّانِيَةُ مُحِيْطَةٌ بِالدُّنْيَا وَهٰكَذَا اِلٰى اَنْ يَكُوْنَ الْعَرْشُ مُحِيْطًا بِالْكُلِّ وَالْكُرْسِىُّ الَّذِىْ هُوَ اَقْرَبُ بِهَا بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِىْ فَلَاةٍ فَمَا ظَنُّكَ بِمَا تَحْتَهُ وَكُلُّ سَمَاءٍ فِى الَّتِىْ فَوْقَهَا بِهٰذِهِ النِّسْبَةِ . وَقَدْ قَرَّرَ اَهْلُ الْهَيْئَةِ اَنَّهَا كَذٰلِكَ وَلَيْسَ فِى الشَّرْعِ مَا يُخَالِفُهُ بَلْ ظَوَاهِرُهُ تُوَافِقُهُ . (جـ)

কি বস্তু দ্বারা সাত আসমান তৈরি হয়েছে : আল্লামা বাগাবী (র.) কা'বে আহবার (র.)-এর কথার উক্তির বরাতে বলেছেন যে, পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমান মেঘমালার ঢেউয়ের জমাট আস্তরণে নির্মিত। দ্বিতীয় আসমান হলো সাদা জমরদ পাথরের, তৃতীয় আসমান হলো লৌহনির্মিত, চতুর্থ আসমান পিতলের নির্মিত, পঞ্চম আসমান রৌপ্যনির্মিত, ষষ্ঠ আসমান স্বর্ণনির্মিত, আর সপ্তম আসমান লালবর্ণের ইয়াকূত পাথরে নির্মিত। -[নূরুল কোরআন]

সৃষ্টিলোকের সামঞ্জস্যশীলতা : এ বিশ্বলোক ও মহাবিশ্ব ব্যবস্থা একটি মহাপরিকল্পনা মাফিক বিরতি এবং একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানের অধীনে পরিচালিত। বিশ্বলোকের সব কিছু সঠিক ও সমাঞ্জস্যশীল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথাও কোনো অমিল ও অসামঞ্জস্য নেই। এটার প্রতিটি গ্রন্থি ও বাঁধন যেন যথাযথ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিশ্বলোক ও মহাবিশ্ব ব্যবস্থাটিকে আমরা একটি স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনশীল মেশিনের সাথে তুলনা করতে পারি। মেশিনটি যেমন নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সঠিক ও সুসামঞ্জস্যভাবে তৈরি করা হয়। কোথাও কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি, অমিল বা সামঞ্জস্যহীনতা থাকলে বা ফাটল থাকলে মেশিনটি অচল হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবেই সৃষ্টিলোকের কোথাও অমিল-অসঙ্গতি থাকলে, সৃষ্টিলোক সঠিকভাবে বাঁধাধরা নিয়মে আবহমানকাল ধরে চলতে পারত না। অবশ্যই কোনো এক সময় বিকল ও অচল হয়ে পড়ত। দিবা-রাত্রির আবর্তন, সূর্যের উদয় ও অস্তমিত হওয়া, চন্দ্র ও নক্ষত্রকুলের আলোক দান, যথাযথ নিয়মে বায়ুর প্রবাহ ও গতিশীলতা, স্থান ও অঞ্চল উপযোগী তাপমাত্রা উর্ধ্ব-নিম্ন হওয়া, বৃক্ষ-তরুলতা ও উদ্ভিদজগতের আগমন, নির্গমন, জন্ম ও বিলুপ্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালে সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, এ সৃষ্টিলোকের কোথাও কোনো ত্রুটি, খুঁত ও ফাটল নেই। সর্বত্রই সুসামঞ্জস্য ও সঙ্গতি বিরাজমান। উপরিউক্ত ৩নং আয়াতে "তোমরা মহাদয়াবানের সৃষ্টিলোকে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাবে না।" কথা দ্বারা বিশ্বলোকের মহাশক্তিমানের নিখুঁত সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কথাই বলা হয়েছে। تَفٰوُتٍ শব্দটির অর্থ হলো-অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, একটি অন্যটির সাথে মিল না হওয়া, খাপ না খাওয়া। সুতরাং মূলকথা হলো, সৃষ্টিলোককে তোমরা অবিন্যস্ত, অমিল, বেমানান ও বেখাপ্পা দেখতে পাবে না সবকিছু একটি ধারাবাহিক নিয়মে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা দ্বারা মহাশক্তিধর আল্লাহর সীমাহীন কুদরত, ক্ষমতা ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যতার স্বীকৃতি কামনা করে আল্লাহর একত্বতা ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতার সম্মুখে মস্তক অবনত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, পুনরায় লক্ষ্য করে দেখ, এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র ও ফাটল রয়েছে কি? নিখিল সৃষ্টির প্রত্যেক কিছুই একই আইন, একই নিয়ম-শৃঙ্খলা ও একই নিয়ন্ত্রণসূত্রে গ্রথিত রয়েছে। প্রত্যেকটি সৃষ্টি যেমনই চাই তেমনি হয়েছে।

আল্লামা কাযী বায়যাবী (র.) বলেন- فَارْجِعِ الْبَصَرَ الخ আয়াত অংশ পড়তে গিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ বারবার আল্লাহর সকল সৃষ্টি ও আসমানের দিকে লক্ষ্য করেছি এবং আয়াতে যে কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। সৃষ্টিকুলের সকল জীবজন্তু ও বস্তুজগতের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টি কার্যের যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিরাজ করছে।

মাদারেক গ্রন্থকার এ আয়াতের তাফসীর লিখেছেন এভাবে فَارْجِعِ الْبَصَرَ أَيْ رُدَّهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يَصِحَّ عِنْدَكَ مَا أُخْبِرْتَ بِهِ بِالْمُعَايَنَةِ فَلَا تَبْقَى مَعَكَ شُبْهَةٌ فِيهِ অর্থাৎ তুমি তোমার দৃষ্টিকে আসমানের দিকে নিক্ষেপ করো, তবে দেখতে পাবে যে আল্লাহর এ কথাটি বাস্তবে সম্পূর্ণ সত্য এবং তোমার কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনোরূপ তারতম্য নেই। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কথা আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ .... حَسِيْرٌ : অর্থাৎ উপরের দিকে আবারও বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, কোথাও কোনো খুঁত পরিলক্ষিত হয় কিনা? কারণ এক-আধবার দেখায় ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে, সুতরাং তন্ন তন্ন করে দেখ, তখন তোমার (দর্শকের) চোখ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে। শেষ পর্যন্তও তাঁর সৃষ্টিতে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখতে পাবে না। তুমি দেখতে পাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। যেমন ইচ্ছা তেমন তৈরি করতে তিনি সক্ষম। অথচ কোটি কোটি বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছে তবুও সৃষ্টি নিখুঁত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে বলেছেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ অর্থাৎ তারা কি লক্ষ্য করেনি আকাশের প্রতি যে, আমি তাদের মাথার উপর এটা কেমন কুদরত খাটিয়ে বানিয়েছি। কেমন সৌন্দর্যময় করেছি, অথচ তার কোথাও কোনো একটি সুড়ঙ্গও নেই। -[মা'আরেফ, তাহেরী]

كَرَّتَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আয়াতে كَرَّتَيْنِ শব্দের মূল অর্থ (দ্বিবচন শব্দ হিসেবে) দু'বার; কিন্তু এখানে দু'বারের অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং এটা দ্বারা تَكْثِيْر [বহুবার] উদ্দেশ্য করা হয়েছে। يَعْنِي لَا يَتَأَتَّيَانِ بِنَظْرَتَيْنِ এটা لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ -এর অনুরূপ শব্দ। তবে এ অর্থে মূল আয়াতের তারতম্যও হবে না; বরং وَلَا ثُلُثٌ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى كَرَّاتٌ সঠিক হবে। কেননা কায়দা রয়েছে- وَالتَّثْنِيَةُ قَدْ تُفِيْدُ التَّكْثِيْرَ অর্থাৎ দ্বিবচন শব্দ কখনও আধিক্যের অর্থ প্রদান করে থাকে। হযরত ইবনে আতিয়্যাহ (র.) বলেন, كَرَّتَيْنِ مَعْنَاهُ مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ كَرَّتَيْنِ শব্দটি مَرَّتَيْنِ অর্থে ব্যবহৃত। আর كَرَّتَيْنِ শব্দটি مَصْدَر হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। যদি দু'বার তাকানোর অর্থ হয় তবে কারো কারো মতে, প্রথম দৃষ্টি আসমানের সৌন্দর্য ও মসৃণতা দেখার জন্য, আর দ্বিতীয় দৃষ্টি তারকারাজি ইত্যাদির গতিপথ লক্ষ্য করার জন্য। -[জামাল]

قَوْلُهُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ : خَاسِئًا - শব্দটি ذَلِيْلًا অর্থে এবং حَسِيْرٌ শব্দটি مُنْقَطِعٌ عَنْ رُؤْيَةِ خَلَلٍ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। -[জালালাইন গ্রন্থকার]

اَلْبَصَرُ -কে বারবার উল্লেখ করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে بَصَرٌ শব্দটি তিনবার উল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ নিম্নরূপ-

১. প্রথমবার লক্ষ্য করার যে আদেশ রয়েছে, তা হলো সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে, কেননা তারা কোনো সৃষ্টির প্রকাশ্য রূপ দেখেই তার স্রষ্টার গুণের উপর আস্থা স্থাপন করে।

২. দ্বিতীয়বার ইরশাদ হয়েছে- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ এবারের আদেশ হলো সেসব লোকদের জন্য, যারা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য লক্ষ্য করে এ সত্য উপলব্ধি করে যে, এর চেয়ে উত্তম কিছু সম্ভব নয়।

৩. আর তৃতীয়বার ইরশাদ হয়েছে- يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ একথা বলা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে বিশেষ নৈকট্যধন্য। যারা আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে শুধু যে তার পরাক্রমশালী হওয়ার কথা বিশ্বাস করে তা-ই নয়; বরং নিজেদের ক্ষমতা এবং অজ্ঞানতা স্বীকার করে দরবারে এলাহীতে বিনয় প্রকাশ করেন। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا .... عَذَابَ السَّعِيْرِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত করে দিয়েছি। আর সে তারকারাজিকে শয়তানের জন্য বিতাড়নী হিসেবে বানিয়েছি। অর্থাৎ তাদের মারণাস্ত্র হিসেবে কিছুসংখ্যক তারকা সাজিয়ে রেখেছি। ফেরেশতারা তা দ্বারা শয়তানদেরকে তখনই আঘাত করেন, যখন শয়তানের দল আকাশের পথে অগ্রসর হতে চায় এবং আল্লাহর বিশেষ গোপনীয় বিষয়াদির সম্পর্কে জানতে চায়। এ দ্রুতগমনশীল উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ব্যবস্থা দ্বারাই কেবল শয়তানকে ক্ষতবিক্ষত করাই যথেষ্ট শাস্তি নয়, বরং রোজ কিয়ামতেও তাদের জন্য কঠোর শাস্তির সুব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত مَصَابِيْح দ্বারা তারকারাজি উদ্দেশ্য। مَصَابِيْح -এর মূল অর্থ ছিল চেরাগসমূহ। সুতরাং মাদারেক গ্রন্থকার বলেন, এটার অর্থ- চেরাগসমূহ। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটতম আকাশকে তারকা দ্বারা সুসজ্জিত করার জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, তারকা আসমানের সাথে সম্মিলিত হবে; বরং তারকাগুলো আসমানের বহু নিচে খোলা জায়গায় হওয়াই যথেষ্ট। -[মাদারিক]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ : শয়তানকে বিতাড়নের জন্য তারকারাজি অঙ্গার হিসেবে তৈরি করার অর্থ এই হতে পারে যে, তারকারাজি হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কোনো কিছু শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় এবং তারকা তখন নিজ স্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে শয়তানকে নিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড স্বীয় স্থান হতে সরে পড়ে, তাই আরবিতে এ অবস্থাকে اِنْقِضَاضُ الْكَوَاكِبِ বলা হয়। -[কুরতুবী]

এটাতে আরও একটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শয়তানের দল যখন আকাশের সংবাদ চুরি করার জন্য ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে গমন করতে থাকে, তখন তাদেরকে তারকারাজি থেকে বহু দূরে থাকতেই বিতাড়িত করে দেওয়া হয়। -[কুরতুবী]

মাদারেক গ্রন্থকার বলেন- رُجُوْم শব্দটি رَجْم শব্দের বহুবচন, এটা مَصْدَرٌ অর্থাৎ مَا يُرْجَمُ بِهٖ যা দ্বারা رَجْم করা হয়। শয়তানকে বিতাড়নের জন্য এটা এক প্রকার উল্কাপিণ্ড বা বিধ্বংসী যন্ত্রবিশেষ। এ উল্কাপিণ্ড দ্বারা তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। সুতরাং কোনো শয়তান শেষ পর্যন্ত আসমানের গুপ্ত সংবাদ শুনতে সক্ষম হয় না।

আধুনিক মতের অনুসারীগণ বলেন, বর্তমানযুগে এ উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে বহু তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। তবে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আজও এ বিষয়ে কেউ পৌঁছতে পারেনি। তথাপিও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণকারীগণ যে তথ্যে উপনীত হয়েছেন, তা হলো এ সব উল্কা কোনো গ্রহে বিস্ফোরণ সৃষ্টি হওয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাশূন্যে আবর্তিত হতে থাকে। পরে কোনো এক সময় পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ পরিমণ্ডলের মধ্যে এসে পড়ার ফলে তা পৃথিবীর উপর নিপতিত হয়। এটাই সর্বাধিক জনপ্রিয় মত হিসেবে বিবেচিত।

তারকাগুলোকে مَصَابِيْح -এর সাথে তাশবীহ দান ও তারকারাজি দ্বারা আসমানকে সুশোভিত করার হেকমত :

১. বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ তা'আলা এ কুরআন নাজিল করেছেন। সুতরাং যেরূপ উদাহরণের মাধ্যমে জগতবাসী তার বিষয়বস্তুসমূহ বুঝতে সহজ হয়, সেরূপ উদাহরণ দ্বারা কুরআন অবতীর্ণ করাই আল্লাহ উত্তম মনে করেছেন। এ কারণেই এখানে বুঝার সুবিধার্থে তারকাগুলোকে বাতির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

২. আর মানুষ দুনিয়াতে মসজিদসমূহকে যেভাবে বাতি দ্বারা সাজিয়ে সৌন্দর্যময় করে তোলে, সেভাবেই আল্লাহ তা'আলা আসমানকেও তারাকা দ্বারা সৌন্দর্যময় করেছেন। সেভাবেই আসমান দুনিয়ার ছাদ স্বরূপ, যেভাবে ঘরের চাল তার ছাদস্বরূপ।

৩. তারকাগুলো যদিও মূলে বাতি নয়, কিন্তু আমাদের নজরে সচরাচর সেগুলো বাতির অনুরূপ দেখা যায়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তারকাগুলোকে বাতির সাথে সাদৃশ্য দান করেছেন।

ক. মহান রাব্বুল আলামীন যতকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো সবই অপরূপ গুণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। এত বিরাট আসমান যদি খালি রেখে দেওয়া হতো তবে এটা তেমন সুন্দর দেখাত না। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর খচিত সৌন্দর্য যে কত সীমাহীন ও মানব রচিত সৌন্দর্যসমূহ হতে যে তাঁর খচিত সৌন্দর্য অতুলনীয় রূপরেখার অধিকারী, তা বুঝানোর জন্য এ মহা আসমানকে সৌন্দর্যময় করেছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন, যা মানুষের কল্পনার বাইরে, আর কিভাবে কি জিনিস দ্বারা এত সুন্দর নকশা করেছেন কিয়ামত পর্যন্তও মানুষ এটা যেন বুঝে কূল করতে সক্ষম না হয়। আর এ কুদরতের ফেরেশতার প্রতি লক্ষ্য করে মানুষ যেন আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

খ. অপর দিকে যদি আকাশে রাতের বেলায় এ তারকাগুলোর মাধ্যমে আকাশকে এমনিভাবে উজ্জ্বল ও সুশোভিত করা না হতো তবে মানুষের পক্ষে রাতের বেলা চলাফেরা করা কখনও সম্ভবপর হতো না, ঘন অন্ধকারে সারা জগৎ নিমজ্জিত হয়ে থাকত। জগৎবাসী অন্ধকার রাতে হাবুডুব খেতে থাকত।

গ. দিক-দর্শনের জন্যও তারকাগুলো বিশেষ কার্য করে থাকে। বহুকাল অতীত থেকেই সাগরে পরিভ্রমণকারীগণ এ তারকাগুলোর মাধ্যমে দিক নির্ণয় করে থাকে। যদি তারকা না থাকত মানুষ তখন সাগরে ডুবে মরত।

ঘ. শয়তানকে দগ্ধ করার জন্য যে তারকারাজি সৃষ্টি করা হয়েছে এ বিষয়টি তো আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং সে বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ফায়দা : কথিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন মসজিদে এশার নামাজ আদায় করতে যেতেন, তখন মসজিদে শুকনো খেজুর পাতায় নির্মিত একপ্রকার বাতি জ্বালাতেন। যখন হযরত তামীমুদ্দারী (রা.) মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন ক্যাণ্ডেল [মোমবাতি] ও যয়তুনের তেল ব্যবহার করতে শুরু করলেন, অর্থাৎ মসজিদের চতুর্দিকে তা জ্বালাতে শুরু করলেন। এটা দেখে রাসূলাল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, نَوَّرْتَ مَسْجِدَنَا نَوَّرَ اللّٰهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ তুমি যেহেতু মসজিদকে নূরান্বিত করেছ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও নূরান্বিত করুন, আর যদি আমার একটি মেয়ে থাকত তবে তাকে তোমার নিকট বিবাহ দান করতাম।

হযরত ওমর (রা) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর তারাবীহের নামাজ পড়া অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখে অধিক পরিমাণে বাতির ব্যবস্থা করেন। এটা দেখে হযরত আলী (রা.) হযরত ওমর (রা)-কে দোয়া করেন এবং বলেন-

نَوَّرْتَ مَسْجِدَنَا نَوَّرَ اللّٰهُ قَبْرَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ . (رُوْح)

এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা সম্ভাব্য পরিমাণে জায়েজ ও উত্তম।

আর এ আয়াতে খুব সূক্ষ্মভাবে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ বলেছেন, যেভাবে আকাশকে তারকাপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি, তোমরাও সেভাবে মসজিদকে সুশোভিত করো।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الخ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের একটি বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা দিয়েছেন। তা এই যে, সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে থাকেন। তবে সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে কিছুই বাড়িয়ে জানান না, আর যদি কোনো আয়াতে এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়, তবে তাও খুব গোলমালভাবেই বর্ণনা করা হয়। আর তা أَرْبَابِ نَظْر ও أَهْلِ عِلْم -এর জন্য বর্ণনা করে দেওয়া থাকে। কারণ সাধারণ লোকের حَقِيْقَتِ أَشْيَاء সম্বন্ধে অবগত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাই أَهْلِ عِلْم গণের উদ্দেশ্যেই অত্র আয়াতে زِيْنَتِ سَمَاء ও خِلْقَتِ نُجُوْم সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ :

٦. وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِيَ .

৬. আর যারা অবাধ্যাচরণ করে তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল তা।

٧. إِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا صَوْتًا مُنْكَرًا كَصَوْتِ الْحِمَارِ وَهِيَ تَفُوْرُ تَغْلِيْ .

৭. যখন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার শব্দ শুনতে পাবে গাধার স্বরের ন্যায় শ্রুতিকটু স্বর। আর তা উদ্বেলিত হতে থাকবে উপচাতে থাকবে।

٨. تَكَادُ تَمَيَّزُ وَقُرِئَ تَتَمَيَّزُ عَلَى الْاَصْلِ تَنْقَطِعُ مِنَ الْغَيْظِ ط غَضَبًا عَلَى الْكُفَّارِ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سُؤَالُ تَوْبِيْخٍ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ رَسُوْلٌ يُنْذِرُكُمْ عَذَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৮. ফেটে পড়ার উপক্রম হবে অপর এক কেরাতে শব্দটির মূলরূপ تَتَمَيَّزُ পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। স্বক্রোধে কাফেরদের উপর রোষভরে। যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্য হতে একদল। তাদেরকে রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে ধমকিমূলক জিজ্ঞাসা তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি কোনো রাসূল, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করবেন।

٩. قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ج اِنْ مَا اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِ الْمَلٰئِكَةِ لِلْكُفَّارِ حِيْنَ اَخْبَرُوْا بِالتَّكْذِيْبِ وَاَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ لِلنُّذُرِ

৯. তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সকর্তকারী এসেছিল। আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, "আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ শেষোক্ত বাক্যটি কাফেরদের উদ্দেশ্যে কথিত ফেরেশতাগণের বক্তব্য হতে পারে, যখন তারা তাদের মিথ্যারোপ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছে। কিংবা তা কাফেরদেরই বক্তব্য হতে পারে, যা তারা সতর্ককারীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল।

١٠. وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَيْ سَمَاعَ تَفَهُّمٍ اَوْ نَعْقِلُ اَيْ عَقْلَ تَفَكُّرٍ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

১০. আর তারা আরও বলবে, "আমরা যদি শুনতাম" অর্থাৎ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শুনা। অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করার মতো বিবেক, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।

١١. فَاعْتَرَفُوْا حَيْثُ لَا يَنْفَعُ الْاِعْتِرَافُ بِذَنْبِهِمْ ج وَهُوَ تَكْذِيْبُ النُّذُرِ فَسُحْقًا بِسُكُوْنِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا لِاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ فَبُعْدًا لَهُمْ عَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

১১. বস্তুত তারা স্বীকার করবে কিন্তু, তখন সে স্বীকারোক্তি তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাদের অপরাধ আর তা হলো সতর্ককারীগণের প্রতি অসত্যারোপ করা। সুতরাং ধিককার سُحُقًا শব্দটি حَا - বর্ণে সকুন ও পেশযোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। জাহান্নামবাসীদের জন্য। সুতরাং তারা আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ হতে দূর হোক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا (الْاٰيَة) : وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا জার ও মাজরুর মিলে মুতা'আল্লিক كَائِنٌ -এর সাথে كَائِنٌ তার জার ও মাজরুর মিলে فِيْ مَحَلِّ الرَّفْعِ খবরে মুকাদ্দাম। পরবর্তী عَذَابُ جَهَنَّمَ -এর মহল্লে ই'রাব মুবতাদা মুয়াখখার হিসাবে রফা'র স্থানে অবস্থিত।

قَوْلُهُ تَمَيَّزُ : জমহুর-এর নিকট এ শব্দটির কেরাত হলো تَمَيَّزُ একটি 'তা' দ্বারা। তালহা শব্দটিকে দু'টি 'তা' দিয়া تَتَمَيَّزُ পড়েছেন। যাহহাক শব্দটিকে تَمَايَزُ পড়েছেন। تَمَيَّزُ শব্দটির মহল্লে ই'রাব হলো হাল হওয়ার কারণে নসব।

قَوْلُهُ "عَذَابُ" : জমহুর عَذَابُ শব্দটিকে রফা' দিয়ে পড়েছেন। রফা' দিয়ে পড়লে এর মহল্লে ই'রাব রফা, মুবতাদা হিসেবে এবং খবর لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا। হাসান, যাহহাক এবং আ'রাজ عَذَابٌ শব্দটিকে নসব দিয়ে পড়েছেন। নসব দিয়ে পড়লে মহল হবে নসব, عَذَابَ السَّعِيْرِ -এর উপর আত্ফ হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ "شَهِيْقًا" "وَهِيَ تَفُوْرُ" وَ"سُحْقًا" : شَهِيْقًا শব্দটি سَمِعُوْا -এর মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। لَهَا হাল হিসেবে নসবের স্থানে অবস্থিত। وَهِيَ تَفُوْرُ বাক্যটি فِيْهَا -এর যমীর হতে হাল হয়েছে।

سُحْقًا এটা মাফউল বিহী হিসেবে মানসূব হয়েছে অর্থাৎ اَلْزَمَهُمُ اللّٰهُ سُحْقًا অথবা এটা মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসূব হয়েছে। উহ্য বাক্যটি হলো– سَحَقَهُمُ اللّٰهُ سُحْقًا –[জুমাল]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক : পূর্বে আকাশকে তারকা দ্বারা সুসজ্জিত করার কথা বলা হয়েছে এবং তারকা দ্বারা শয়তানকে বিতাড়নের কথা ও শয়তানের শাস্তি বিধানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে শয়তানের অনুসারী কাফিরদের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। –[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... وَهِيَ تَفُوْرُ : উক্ত আয়াত হতে কাফেরদের শাস্তি প্রসঙ্গে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহর হুকুম-আহকামকে লঙ্ঘন করেছে, তাদের জন্য জাহান্নামের অনলকুণ্ড নির্ধারিত রয়েছে। আর অনলকুণ্ড কতইনা নিকৃষ্টতম স্থান, জিন-ইনসান উভয় জাতির মধ্যে যারাই কুফরি করবে, তারাই এ শাস্তির সম্মুখীন হবে। আর তাদেরকে যখনই দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তারা জাহান্নামের ভয়ংকর গর্জন শুনতে পাবে।

شَهِيْق শব্দটির অর্থ হলো নিকৃষ্টতম আওয়াজ, যা গর্দভের আওয়াজের ন্যায়। অর্থাৎ জাহান্নাম হতে এ নিকৃষ্টতম শব্দ শুনতে পাবে। অথবা জাহান্নামের ধ্বনিই এরূপ হবে। অর্থাৎ এ সকল কাফেরদের পূর্বে যে সকল লোক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাদের চিৎকারের ভয়াবহ শব্দটিই জাহান্নাম হতে শুনা যাচ্ছে। তাদের আওয়াজে এ শোরগোল হতে থাকবে। যেমন– সূরা হূদ-এর ১০৬ আয়াতে আল্লাহ বলেন– فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا الخ - সূরা ফোরকানে আল্লাহ বলেছেন, كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِذَاۤ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا (الْاٰيَة) যখন সে কাফেরদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করতে নেওয়া হবে, তখন তারা ক্রোধ ও আক্রোশের শব্দসমূহ শুনতে পাবে। এতে প্রতীয়মান হলো যে জাহান্নামীদের নিজেদের যেমন চিৎকার হবে তেমন জাহান্নামের আগুনের শব্দও হতে থাকবে। তাই আল্লাহর দরবারে আমরা এ দোয়া করি–

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا عَنْ ذٰلِكَ الْعَذَابِ فَاِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ . وَاَيْضًا اِلٰهِىْ لَا تُعَذِّبْنِىْ فَاِنِّىْ مُقِرٌّ بِالَّذِىْ قَدْ كَانَ مِنِّىْ .

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার কাফিরদের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং সকল শ্রেণির তথা জিন-ইনসান কাফিরদের শাস্তি হবে জাহান্নাম।

কুফরের তাৎপর্য : কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– গোপন করা, ঢেকে রাখা, এ থেকেই অস্বীকার করার অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামের পরিভাষায় যারা সত্যকে গোপন রাখে, তারাই কাফের। আর এভাবে ঈমানের বিপরীত অর্থে ব্যবহার শুরু হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহতে ঈমান আনে না, তারাই আল্লাহর সাথে কুফরি করে। ঈমানের অর্থ হলো– মেনে নেওয়া, স্বীকার করা। আর কুফরির অর্থ হলো– অমান্য করা, অস্বীকার করা। কুরআন কারীমের দৃষ্টিতে কুফরির আচরণ নানারূপে হতে পারে।

এক : আল্লাহ তা'আলাকে আদৌ স্বীকার না করা। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। অথবা, আল্লাহকে নিজের ও বিশ্বের মালিক বলে মানতে অস্বীকার করা, কিংবা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মা'বুদ বলে মানতে অস্বীকার করা।

দুই : আল্লাহকে মেনে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করে তাঁর নির্দেশকে জ্ঞান ও আইনের উৎসরূপে না মানা।

তিন : আল্লাহর বিধান মেনে চলা উচিত, নীতিগততাবে এটা মেনেও বিধান ও আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণকে অস্বীকার করা।

চার : নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা। নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসের কারণে কোনো নবীকে সত্য বলে স্বীকার করা এবং কোনো নবীকে মিথ্যা বলে অমান্য করা।

পাঁচ : নবীগণ আল্লাহর নিকট হতে আকীদা-বিশ্বাস, আইন-কানুন, নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-আচরণের নিয়মকানুন যা কিছু পেয়েছেন, তা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকতাবে অস্বীকার করা।

ছয় : সব কিছুকেই নীতিগততাবে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর বিধানকে কার্যততাবে অস্বীকার করা এবং তার বিরোধিতা করা, তাকে জীবনের ভিত্তিরূপে আদৌ গ্রহণ না করা।

কুরআন মাজীদ এ ধরনের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে আল্লাহদ্রোহিতা নামে আখ্যায়িত করেছে। আর এটার প্রতিটি প্রকরণ ও পদ্ধতিকেই কুফর নামে অতিহিত করেছে। এ ছাড়া কুফর শব্দটি কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই অকৃতজ্ঞতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শোকর ও কৃতজ্ঞতার বিপরীত শব্দরূপেই কুফরের ব্যবহার দেখা যায়। শোকরের অর্থ হলো– কোনো নিয়ামতদানকারীর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁর বদান্যতা দ্বারা উপকৃত হয়ে তাঁর প্রশংসা করা। আর না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতার অর্থ হলো, নিয়ামত দানকারীর অনুগ্রহের স্বীকৃতি না দেওয়া, তার অনুগ্রহকে দাম্ভিকতার সাথে অস্বীকার করা, একে নিজের প্রচেষ্টার ফল বলে গর্ব-অহংকার করা। এটাকেই আমাদের পরিতাষায় নিমকহারামী, গাদ্দারী, না-শোকরী ইত্যাদি নামে অতিহিত করা হয়।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর সাথে মানুষের কুফরির তয়াবহ পরিণাম ও জাহান্নামের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। কাফেরদের প্রতি জাহান্নামের রোষানলের অবস্থাটি কিরূপ হবে, কাফেরগণ জাহান্নামের নিপতিত হওয়ার পর জাহান্নাম রক্ষীগণ তাদের নিকট কি জিজ্ঞাসা করবে এবং জবাবে তারা কি বলবে, আর সর্বশেষে তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি এবং জাহান্নামের যোগ্য হওয়ার কথা তাদের ভাষায়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্মুখে এমন হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেছেন, যেন তারা জাহান্নাম ও এসব কথোপকথন চোখের সম্মুখেই সবকিছু অবলোকন করছে।

আজাবের কয়েকটি বিশেষণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা :

এক : شَهِيْقًا শব্দটির অর্থ হলো– জাহান্নাম হতে উদ্ভূত বিকট শব্দ। মূলত এ শব্দটি গর্দতের শব্দ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যাংশের অর্থ দু'তাবে হতে পারে। জাহান্নাম হতে আওয়াজ উত্থিত হবে অথবা এটাই হবে জাহান্নামের ধ্বনি অথবা তাদের নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে যারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারা চিৎকার করতে থাকবে। সূরা হূদের ১০৬ নং আয়াতে উল্লেখ্য যে, জাহান্নামীগণ জাহান্নামে হাঁপাইতে ও রোষধ্বনি করতে থাকবে। সুতরাং এটা যে জাহান্নামীদের ধ্বনি হবে, তা সূরা হূদের এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। আর সূরা আল-ফুরকানের ১২নং আয়াতের বর্ণনা দ্বারা দ্বিতীয় অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় যে, জাহান্নামে গমনকারীগণ দূর হতে তার আক্রোশ ও রোষানলের শব্দ শুনতে পারবে। এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ বিকট শব্দ হবে জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নির। বস্তুত উল্লিখিত দু' সূরার বর্ণনা প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ আওয়াজ জাহান্নামের আক্রোশ ও প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ ও জাহান্নামীদের চিৎকার ও হাহাকার উভয় মিলে একটি বিকট আওয়াজ এবং হট্টগোল।

দুই : تَفُوْرُ শব্দটির অর্থ হলো– উথাল-পাথাল করতে থাকা। মুজাহিদ (র.) বলেন, হাঁড়িতে বা পাতিলে গরম পানিতে যেমন কোনো দানা ফুটালে টগবগ ও উথাল-পাথাল করতে থাকে, ঠিক তেমনই জাহান্নামের আগুন উথাল-পাথাল এবং টগবগ করতে থাকবে। এটাতে যা কিছুই দেওয়া হবে, যাকেই নিক্ষেপ করা হবে তাকেই ভাত ফুটাবার মতো করে টগবগ করে ফুটাবে। এর আজাব এত ভয়াবহ যে, সে সবসময় উথাল-পাথাল করতে থাকবে।

তিন : تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ক্রোধ আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। যেমন, কোনো মানুষ খুব বেশি ক্রোধান্বিত হলে তার চোখেমুখে সব রক্ত জমা হয় এবং মনে হয় যেন তা এখনই ফেটে পড়বে। ঠিক জাহান্নাম তার আক্রোশে ফুলতে থাকবে এবং ক্রোধের কারণে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। মূলত এ কথার দ্বারা জাহান্নামের ভয়াবহতা ও কাঠিন্য বুঝানো হয়েছে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى : تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ..... اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, দোজখ তখন উথাল-পাথাল করতে থাকবে। ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তাতে কোনো জনসমষ্টিকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার কর্মচারীগণ জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের নিকট কি কোনো সাবধানকারী আসেনি?

উক্ত আয়াতে اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ - বাক্যটি বাহ্যত দেখা যায় প্রশ্নবোধক। তবে এটা জানার ইচ্ছায় প্রশ্ন নয়; বরং একে سُؤَال تَوْبِيْخ [ধমকিমূলক প্রশ্ন] বলা হয়। এ প্রশ্নটি দোজখের দারওয়ানের মাধ্যমে সকল দোজখীদের দলকেই করা হবে। কেননা সকল দোজখী একই প্রকার হবে না। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর হবে। সুতরাং স্তরভেদে সকল দল পৃথক পৃথকভাবে জাহান্নামের দিকে থাকবে, আর এ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

জাহান্নামীদের সাথে কোনোরূপ দুরাচরণ করা হচ্ছে কিনা বা ব্যভিচার হচ্ছে কি সুবিচার হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়া হবে। দুনিয়াতে আল্লাহর নবী-রাসূলগণ তাদের নিকট সত্যই আগমন করেছিলেন। সত্য ও অসত্য পথ সম্পর্কে তারা অবগত হয়েছিল, সত্য পথের বিরোধিতার কারণে তারা সেদিন জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর সকল বাণী সত্য ছিল, তারা মিথ্যার উপর ছিল, এ কথাগুলো বুঝিয়ে স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্যই এ প্রশ্ন করা হবে। [মা'আরিফ, জালালাইন] সে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আয়াতে বর্ণনা রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : قَالُوْا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ الخ : বলা হয়েছে কাফের সম্প্রদায় স্বীকারোক্তি স্বরূপ বলবে যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী পয়গাম্বর আগমন করেছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে আমরাই তাঁদেরকে অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের উপর কোনো আসমানি গ্রন্থ ও কোনো আহকাম নাজিল করেননি। আর আপনারা বড়োই ভুল-ভ্রান্তির পথে নিমজ্জিত রয়েছেন।

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلَالٍ كَبِيْرٍ -এর প্রবক্তা : এর বক্তা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত-

১. জালালাইন গ্রন্থকার (র.) বলেন- এটা ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে উপলক্ষ করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তখনই কাফেরদেরকে বলবেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই মহাভ্রষ্টতায় লিপ্ত, যখনই কাফেরদের দল ফেরেশতাগণকে অসত্যে থাকার কথা বলে ছিল।

২. অথবা কাফেরগণ (مُنْذِرِيْنَ) নবী-রাসূলগণকে একথা বলেছিল।

قَوْلُهُ تَعَالَى ضَلَالٍ كَبِيْرٍ : এ বাক্যাংশটির অর্থ বা মর্ম সম্বন্ধে কারো কারো অভিমত এই যে,

১. যারা দুনিয়াতে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবর্তিত হতো তা ব্যাপক ছিল, তারা দুনিয়াতে চরম গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত ছিল।

২. আবার কারো কারো মতে, এর মর্ম হলো চরম ধ্বংস, তাদের প্রত্যেকটি কাজকর্মই ছিল চরম ধ্বংসকারী এবং তারা নিজেরা ধ্বংসের কাজে লিপ্ত ছিল। -[কাবীর]

ফায়দা : উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর دَلَائِل اَدِلَّة সমূহ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত কাউকেও দোজখে নিক্ষেপ করবেন না।

সুতরাং যাদের নিকট সত্যের বাণীসমূহ পৌছেনি, [যথা- পাগল, বেহুঁশ, নির্বোধ, অবুঝ সন্তানসন্ততি ইত্যাদি] তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন না।

সলফে সালেহীনের প্রকৃত মতামত এটাই। নতুবা আল্লাহ তা'আলার উপর জুলুমের অন্যায়-অপবাদ পড়বে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ . اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ . اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ অর্থাৎ আমি বান্দাগণের উপর অত্যাচার করি না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের উপর অণু পরিমাণও অত্যাচার করেন না। আল্লাহ তা'আলা কি সকল হাকিম ও বিচারক থেকে সর্ব বৃহৎ বিচারক নন? -[আশরাফী]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন– চরম লজ্জাকর অবস্থায় আফসোস করতে করতে তারা বলবে হায়! আমরা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় যদি নবী ও রাসূলগণের কথা শ্রবণ করতাম ও ভালোরূপে বিবেক-বিবেচনা খাটিয়ে তা অনুধাবন করতাম তাহলে আজ আমরা কখনও দাউ দাউকারী অগ্নিকুণ্ডের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না, বরং বেহেশতে খুব আনন্দ ও উৎফুল্লে বসবাস করতে থাকতাম।

অতঃপর তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তাদেরকে যে বিনা দোষে দণ্ডাদেশ দেওয়া হচ্ছে না এটা তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। কিন্তু তখন তাদের এ অনুতাপের দ্বারা কোনো লাভ হবে না; বরং তাদেরকে স্পষ্ট বলা হবে যে, তোমাদের জন্য অনুগ্রহের জগতে কোনো ঠাঁই নেই। দূর হও, নিপাত যাও জাহান্নামই তোমাদের আসল ঠাঁই।

কাফেরদের এ জবাব ও তার প্রতি উত্তরের দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা আকল ও বিবেক-বিবেচনা খরচ করবে না এবং সত্যের অনুসন্ধানী হবে না তারা চতুষ্পদ জন্তুর সমতুল্য। কেননা আকল আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। এই নিয়ামতের যারা শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে না তারাই নাশোকর এবং তারাই জানোয়ার।

উক্ত আয়াতটি ঐ সকল লোকদের জন্য تَرْدِيْد স্বরূপ যারা ইসলামের বিধানের যৌক্তিকতা অস্বীকার করে। তারা জানোয়ার ব্যতীত আর কিছুই নয়। –[মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)]

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ-এর মধ্যে اَلذَّنْبُ শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে اَلذَّنْبُ শব্দটিকে একবচন করার কারণ হচ্ছে, নবী ও রাসূলগণকে অমান্য করা ও তাদের বাণীসমূহকে অস্বীকার করা এবং এতদসম্পর্কীয় সকল গুনাহের মূল হলো একটি গুনাহ তা হলো 'ঈমান' আনয়ন না করা। এ কারণে ذَنْب শব্দটি وَاحِدْ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ-এর মধ্যে سَمْع-কে مُقَدَّمْ ও عَقْل-কে مُؤَخَّرْ করার কারণ :

ক. সাধারণত কোনো কথা বললে সর্বপ্রথম শ্রবণশক্তিই কাজ করে থাকে, অতঃপর বিবেচনাশক্তি কাজ করে থাকে, এ কারণে سَمْع-কে عَقْل-এর উপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে।

খ. তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকার বলেন, এর কারণ হলো যখন কাফিরা রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সর্বপ্রথম তাঁর কথা শুনবে। রাসূলগণ মানুষকে দীনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং প্রথমে মানুষগণ রাসূলদের কথা শুনে থাকেন। এর পর সেই দাওয়াত গ্রহণ বা বর্জন করার কথা সিদ্ধান্ত করে থাকেন। এ কারণেই প্রথমে শ্রবণের ও পরে বিবেচনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। –[কাবীর]

অনুবাদ :

১২. إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يَخَافُونَهُ بِالْغَيْبِ فِيْ غَيْبَتِهِمْ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فَيُطِيْعُوْنَهُ سِرًّا فَيَكُوْنُ عَلَانِيَةً أَوْلَى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ أَيِ الْجَنَّةُ .

১২. নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাঁকে ভয় করে দৃষ্টির অগোচরে তারা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে থাকাবস্থায় এবং গোপনভাবে তাঁরা আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং প্রকাশ্য আনুগত্য তো উত্তম রূপেই করবে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান অর্থাৎ বেহেশত।

১৩. وَأَسِرُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِ إِنَّهُ تَعَالَى عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِيْهَا فَكَيْفَ بِمَا نَطَقْتُمْ بِهِ وَسَبَبُ نُزُوْلِ ذٰلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ لَا يَسْمَعُكُمْ إِلٰهُ مُحَمَّدٍ .

১৩. আর তোমরা চাই গোপন কর হে লোক সকল! তোমাদের কথা, কিংবা তা প্রকাশ্যে বল নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ তা'আলা অন্তরে লুক্কায়িত বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত অন্তরের মধ্যে যা কিছু আছে। সুতরাং কিরূপে তিনি– তোমরা যা ব্যক্ত করেছ তা সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন। এ আয়াতটির শানে নুযূল এই যে, মুশরিকগণ একে অন্যকে বলত, তোমরা তোমাদের কথাবার্তা গোপনে বলো, যাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর উপাস্য তা শুনতে না পায়। তৎসম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

১৪. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ج مَا تُسِرُّوْنَ أَيَنْتَفِيْ عِلْمُهُ بِذٰلِكَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ فِيْ عِلْمِهِ الْخَبِيْرُ فِيْهِ لَا .

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না যা তোমরা গোপন কর। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে কি তিনি অনবহিত? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী তাঁর অবহিতি ক্ষেত্রে সম্যক অবগত তৎসম্পর্কে। না, তিনি স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অনবহিত নন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَسِرُّوْا.....الخ -এর শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– উপরিউক্ত ...-১৪নং আয়াতদ্বয় মুশরিকদের উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নবী করীম ﷺ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ...গাচরে অনেক কথাবার্তা ও আলোচনা করত; কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) সেই কথা ও আলোচনার সংবাদ নবী করীম ﷺ ...ক জানাতেন। পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদের নিকট হতে তাদের এ সব কথাবার্তা ও আলোচনার বিষয় শুনতে ...য়ে বিস্মিত হতেন। সুতরাং কাফেরগণ এক পরামর্শ বৈঠকে পরস্পর বলল, তোমরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের আলোচনা ... নীরবে ও গোপনে করবে। কেননা মুহাম্মদের প্রভু এটা শুনতে পেলে তাঁকে জানিয়ে দিবেন। কাফেরদের এ উক্তির জবাবেই ...লোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। পরিশেষে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা কি তোমাদের বিষয় কোনো সংবাদ রাখেন ... তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত। শুধু মানুষের বেলায়ই সংবাদ রাখেন না; বরং সৃষ্টিলোকের সব তত্ত্ব সম্পর্কেই ...নি অবহিত। –[খাযেন, কামালাইন, জালালাইন]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ الخ : মহান আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আলোচ্য আয়াতে ...কালে বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে না দেখেও তাঁকে মেনে ...য়েছে তাঁরা প্রতাপ এবং দাপটের ভয়ে কম্পিত হয়েছে, তাঁর অসন্তোষ এবং আজাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, লোকচক্ষের অন্তরালে ...ড়তে-নীরবে আল্লাহকে স্মরণ করে কাঁদে, অশ্রুজলে ভাসে, পরিণামে তারা আনন্দের হাসি হাসবে। আল্লাহর দরবারে বিরাট ...তদান পাবে এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির মার্জনা পাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করবে। –[তাহেরী]

আল্লাহকে না দেখেও ভয় করার দু'টি অনিবার্য ফল রয়েছে বলে উক্ত আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে। একটি হলো- মানবীয় দুর্বলতার দরুন মানুষ কর্তৃক যে অপরাধই সংঘটিত হয়ে থাকবে তা মাফ করে দেওয়া হবে। তবে অবশ্যই তার গভীরমূলে আল্লাহর ভয় লুক্কায়িত থাকতেই হবে এবং তাঁকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার কোনো ভাব থাকতে পারবে না।

অপরটি হলো, আল্লাহকে ভয় করে মানুষ যে নেক আমলই করবে, সেজন্য সে অতি বড় সুফল লাভ করবে।

আয়াতের মূলকথা : আল্লাহ সকল নাফরমানদেরকে প্রকাশ্যভাবে এবং সকল মানুষকে অপ্রকাশ্যভাবে বলেন- হে মানুষ তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ না বটে, কিন্তু তিনি তোমাদের সকলকেই দেখতে পাচ্ছেন। তোমাদের সকল গোপন ও প্রকাশ্য আচার-আচরণ সবই লক্ষ্য করছেন, তোমাদের গোপন কথা কিংবা প্রকাশ্য কথা, এমনকি মনের কথা পর্যন্ত তিনি জানেন। কেননা তিনি সকলের পক্ষেই অন্তর্যামী।

قَوْلُهُ حَاصِلُ الْإِسْتِدْلَالِ مِنَ الْاٰيَةِ : আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর خَالِقٌ مُخْتَارٌ সুতরাং তিনি মানুষের সকল কার্য এবং কথারও সৃষ্টিকর্তা। কোনো জিনিসের সম্বন্ধে অবগতি লাভ করতে না পারলে সে জিনিস সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়, তাই আল্লাহ সকল বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞ। -[মা'আরিফ]

উক্ত আয়াতে কেবল اَقْوَالُ اِنْسَانٌ-কে নির্দিষ্ট করার কারণ : উক্ত আয়াতে যদিও اَقْوَالٌ-কে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে তথাপি اَقْوَالٌ-এর সাথে اَفْعَالٌ ও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তবে মা'আরিফ গ্রন্থকারের মতে, اَقْوَالٌ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, اَقْوَالٌ সমূহ অধিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে, اَفْعَالٌ সমূহ তদপেক্ষা কম সংখ্যক সংঘটিত হয়ে থাকে। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ :

এটা একটি উপদেশ ও সতর্ক বাণী স্বরূপ : এ কথাটি সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এটাতে মু'মিনদের জন্য এই শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, দুনিয়াবী জীবন যাপনকালে তাকে এই তীব্র অনুভূতি হৃদয়মনে সদা জাগ্রত রাখতে হবে যে, শুধু তার প্রকাশ্য সকল বিষয় নয়, বরং তার মনের গভীরে নিহিত নিয়ত ও ভাবধারা চিন্তাধারা পর্যন্ত আল্লাহর নিকট স্পষ্ট।

আর কাফেরদের জন্য এতে একটি বিশেষ সতর্কবাণী হলো এই, সে আল্লাহকে ভয় না করে নিজ স্বভাবে যাই করুক না কেন তার কোনো একটি বিষয়েও আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচতে পারবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ : বলা হয়েছে যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ মানুষের নাড়িভুঁড়ি সবই তাঁর নখদর্পণে, তিনি সর্বজ্ঞানী ও অন্তর্যামী।

উক্ত আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের সার-সংক্ষেপ স্বরূপ। অর্থাৎ যখন আল্লাহই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক সব কিছুই সৃজন করেছেন, তখন তিনি মানুষের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কি হেতু হবে। আর যখন সকল সৃষ্টির হাকিকত সম্পর্কে অবগত রয়েছেন তখন পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে কি করে তাঁর জ্ঞান না থাকতে পারে। তাঁকে কোনো সংবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। [থানবী (র.)]

قَوْلُهُ هٰذِهِ الْاٰيَةُ دَالَّةٌ عَلٰى خَلْقِ اَفْعَالِ الْعِبَادِ : উক্ত আয়াতটি এ কথার প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের সকল কার্যকলাপের সৃষ্টিকর্তা ও সকল কথাবার্তা তাঁরই শক্তিতে মানুষ বলতে সক্ষম। সুতরাং তিনি যেমনি خَالِقُ الْاَقْوَالِ তেমনি خَالِقُ الْاَفْعَالِ -[মাদারিক]

وَاَيْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْاَصَمِّ وَجَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ مِنْ مَفْعُوْلٍ وَالْفَاعِلُ مُضْمَرٌ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاحْتَالَا بِهٰذَا النَّفْيِ خَلْقَ الْاَفْعَالِ. (مَدَارِكٌ)

উক্ত আয়াতটির অনুবাদ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন মতান্তর রয়েছে। যথা- কারো কারো মতে, এটার অনুবাদ হলো, তিনি কি তাঁর সৃষ্টিকে জানেন না? মূল ভাষা হলো مَنْ خَلَقَ এটা অর্থ যিনি সৃষ্টি করেছেন। অথবা কে সৃষ্টি করেছেন? অথবা তিনি যা সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে জানবেন না এটা কিভাবে হতে পারে? হ্যাঁ, তবে সৃষ্টি নিজকে নিজে জানতে পারে না, এটা হতে পারে।

قَوْلُهُ اللَّطِيْفُ : এর একটি অর্থ হলো অদৃশ্য অনানুভূত পন্থায় কর্ম সম্পাদনকারী। অপর অর্থ হলো- সূক্ষ্ম ও গোপনতম সত্যসমূহ জানেন এমন সত্তা।

অনুবাদ :

١٥. هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا سَهْلَةً لِلْمَشْيِ فِيْهَا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا جَوَانِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ط الْمَخْلُوْقِ لِاَجْلِكُمْ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ مِنَ الْقُبُوْرِ لِلْجَزَاءِ.

১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন তার উপর চলাচল সহজ করে দিয়েছেন। অনন্তর তোমরা তার দিক-দিগন্তে বিচরণ করো) তার পথে-প্রান্তরে। আর তাঁর প্রদত্ত জীবিকা হতে ভক্ষণ করো তোমাদের উদ্দেশ্যে সৃজিত। আর তাঁরই প্রতি পুনরুত্থান কবরসমূহ হতে প্রতিফল গ্রহণের জন্য।

١٦. ءَاَاَمِنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْاُخْرٰى وَتَرْكِهَا وَاِبْدَالِهَا اَلِفًا مَّنْ فِى السَّمَاۤءِ سُلْطَانُهٗ وَقُدْرَتُهٗ اَنْ يَّخْسِفَ بَدَلٌ مِنْ مَنْ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ تَتَحَرَّكُ بِكُمْ وَتَرْتَفِعُ فَوْقَكُمْ.

১৬. তোমরা কি নিশ্চিত হয়েছ? শব্দটি উভয় হামযাকে বহাল রেখে, দ্বিতীয়টিকে সহজ করে, উভয়ের মধ্যখানে আলিফ যোগ করে, আলিফকে বর্জন করে, হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে পঞ্চবিধ কেরাতে পঠিত হয়েছে। যে, যিনি আকাশে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতা তিনি ধসিয়ে দেবেন এটা পূর্বোক্ত مَنْ হতে بَدَلْ রূপে ব্যবহৃত। তোমাদেরসহ জমিনকে, আর তা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে তোমাদের নিয়ে প্রকম্পিত হবে এবং তোমাদের উপরে উত্থিত হবে।

١٧. اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاۤءِ اَنْ يُّرْسِلَ بَدَلٌ مِنْ مَنْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط رِيْحًا تَرْمِيْكُمْ بِالْحَصْبَاءِ فَسَتَعْلَمُوْنَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ كَيْفَ نَذِيْرِ اِنْذَارِىْ بِالْعَذَابِ اَىْ اَنَّهٗ حَقٌّ.

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়েছ যে, যিনি আকাশে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি প্রেরণ করবেন এটা مَنْ হতে بَدَلْ রূপে ব্যবহৃত। তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা সেই প্রবল বাতাস যা তোমাদের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে শাস্তি প্রত্যক্ষ করাকালে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী আমার সম্পর্কে আমার সতর্কবাণী অর্থাৎ তা যথার্থ ছিল।

١٨. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْاُمَمِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ اِنْكَارِىْ عَلَيْهِمْ بِالتَّكْذِيْبِ عِنْدَ اِهْلَاكِهِمْ اَىْ اَنَّهٗ حَقٌّ.

১৮. আর মিথ্যা আরোপ করেছিল এদের পূর্ববর্তীগণ উম্মতগণ। ফলে কিরূপ হয়েছিল শাস্তি মিথ্যা আরোপের প্রতিফলস্বরূপ প্রদত্ত আমার শাস্তি, যখন তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। অর্থাৎ তা যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

١٩. اَوَ لَمْ يَرَوْا يَنْظُرُوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ فِى الْهَوَاءِ صَافَّتٍ بَاسِطَاتٍ اَجْنِحَتِهِنَّ وَّيَقْبِضْنَ ۚ اَجْنِحَتَهُنَّ بَعْدَ الْبَسْطِ اَىْ وَقَابِضَاتٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ عَنِ الْوُقُوْعِ فِىْ حَالِ الْبَسْطِ وَالْقَبْضِ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ط بِقُدْرَتِهٖ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيْرٌ اَلْمَعْنٰى لَمْ يَسْتَدِلُّوْا بِثُبُوْتِ الطَّيْرِ فِى الْهَوَاءِ عَلٰى قُدْرَتِنَا اَنْ نَفْعَلَ بِهِمْ مَا تَقَدَّمَ وَغَيْرَهٗ مِنَ الْعَذَابِ ـ

১৯. তারা কি তাকায় না দেখে না বিহঙ্গকুলের প্রতি, তাদের উর্ধ্বে শূন্যলোকে যারা বিস্তারকারী তাদের পক্ষ বিস্তাকারী আর তাকে সঙ্কুচিত করে তাদের পক্ষকে বিস্তার করার পর অর্থাৎ এবং সঙ্কোচনকারী তাদেরকে স্থির রাখেন বিস্তার ও সঙ্কোচনকালে পতিত হওয়া হতে। একমাত্র দয়াময় আল্লাহ তাঁর কুদরত দ্বারা নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। এটার মর্মার্থ এই যে, কাফিরগণ শূন্যলোকে উড়ন্ত বিহঙ্গকুলকে দেখেও আমার কুদরত উপলব্ধি করতে পারে না যে, আমি পূর্বোল্লেখিত পন্থায় এবং অন্যবিধ উপায়ে শাস্তি দানে সক্ষম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ ءَاَمِنْتُمْ : এতে পাঁচটি কেরাত রয়েছে–

১. উভয় হামযাহকে বহাল রেখে। যথা– ءَاَمِنْتُمْ

২. দ্বিতীয় হামযাহকে সহজ করে। যথা– ءَامِنْتُمْ

৩. উভয় হামযার মাঝে اَلِفْ প্রবেশ করিয়ে যথা– ءَااَمِنْتُمْ

৪. দ্বিতীয় হামযাহকে বাদ দিয়ে যথা– اَمِنْتُمْ

৫. দ্বিতীয় হামযাহকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে। যথা– اٰمِنْتُمْ

قَوْلُهٗ يُمْسِكُهُنَّ : একে জমহুর বাবে اِفْعَالْ হতে পড়েছেন, তখন س টা كَسْرَه যুক্ত হবে। আর ইমাম যুহ্‌রী (র.) তাকে بَاب تَفْعِيْل হতে অর্থাৎ س-কে كَسْرَه সহ مُشَدَّدْ করে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَرْض ذَلُوْل-এর তাৎপর্য বর্ণনা : কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ভূতলকে শয্যা, আশ্রয়স্থল, অধীন ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। একটি শিশু দোলনায় যেভাবে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, মানুষও এ বিশালকায় পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে ঘুমায়, বিচরণ করে, নানারূপ ক্রিয়া-কলাপ করে। অথচ এটাতে তারা কোনোই ভয়ভীতি ও অনিশ্চয়তা অনুভব করে না। এ বিশালকায় ভূমণ্ডলটি শূন্যলোকে দোদুল্যমান একটি গ্রহবিশেষ, যা স্বীয় কক্ষপথে ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে ঘূর্ণায়মান এবং মেরুদণ্ডটির গতিবেগ ঘণ্টায় ছয় লক্ষ ছিষট্টি হাজার মাইল। আবার এর গর্ভে রয়েছে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা। মাঝে মাঝে রয়েছে আগ্নেয়গিরি, যার অগ্নোদগমনের গলিত লাভা স্রোত প্রবাহিত করে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করে; কিন্তু এত কিছু থাকা ও হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জন্য ভূ-লোককে তার সৃষ্টিকর্তা খুব শান্তশিষ্ট ও আরামের স্থানরূপে সৃষ্টি করেছেন। চলা-ফেরা, আহার-বিহার, নর্তন-কুর্দন, আনন্দস্ফূর্তি সাধারণভাবেই মানুষ করে যাচ্ছে। এ ভূমিকে মানুষের জন্য অধীন করে দেওয়ার পিছনে তাঁর বিচক্ষণ কর্মকুশলতাও ক্রিয়াশীল। এমন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ভূমিকে তৈরি করেছেন যাতে স্বাভাবিকভাবেই নিহিত রয়েছে মানুষের জীবনোপকরণ

ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তিনি এটাকে অথৈ সম্পদের ভাণ্ডাররূপে করেছেন। মানুষ এ অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে। যেখানে হাত দেয়, পায় তারা রাশি রাশি নিয়ামত। মাটির বুক চিরে ফলায় অফুরন্ত ফসল। তার বুকে উদ্ভিদ বীজ ছড়িয়ে গড়ে তোলে নিবিড় বন ও বাগ-বাগিচা। সাগরের অথৈ জলের মধ্য হতে লাভ করে নিজেদের জীবিকা। ভূ-গর্ভ হতে উত্তোলন করে রাশি রাশি নিয়ামত ও খনিজ সম্পদ। অথচ এই বিশালকায় ভূমি, অথৈ জলরাশির সাগর তাদেরকে কোনোই বাধা দেয় না, কিছুই বলে না। মানুষ নির্বিঘ্নে সাধারণতভাবে প্রয়োজনের তাকীদে সবকিছু করে যাচ্ছে। সুতরাং একথা মানতে হবে যে, ভূ-মণ্ডল ও ভূমিকে মানুষের জন্য সুগম ও তাদের অধীন করে দেওয়ার পিছনে এক মহান শক্তিধর সত্তারই বিচক্ষণ ও নিপুণ নির্মাণ-কৌশলই ক্রিয়াশীল। অতএব মানুষের উচিত সেই মহান সত্তা ও শক্তিধরের সমীপে নিজেদের অস্তিত্ব লুটিয়ে দেওয়া, নিজেদেরকে তাঁরই অনুগত দাসে পরিণত করা।

قَوْلُهُ تَعَالَى "فَامْشُوْا .... رِزْقِهٖ" : উপরিউক্ত আয়াতে জমিনের বক্ষের উপর চলাফেরা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। مَنَاكِبْ শব্দের তাফসীরে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কেউ এর অর্থ করেছেন 'বক্ষ', কেউ অর্থ করেছেন পাহাড়-পর্বত। অন্য এক অর্থে রাস্তা-ঘাট বলা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে তার পাহাড়ের চূড়ায় যেখানেই তোমার প্রয়োজন হয় চলে যাও। কেউ তোমাকে বাধা দেওয়ার নেই। দুনিয়াকে পদানত করার ক্ষেত্রে তোমাকে দেওয়া হয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এ দুনিয়ায় সর্বত্র বিচরণ করে তুমি আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত সংগ্রহ করো। তাঁর সৃষ্টি-রহস্য অবলোকন করে তাঁরই নিকট মাথা নত করো। তাঁর দেওয়া রিজিক ভক্ষণ করো। রিজিক এর অর্থ এখানে ব্যাপক। দুনিয়াতে যত উপাদান ও উপকরণ আছে সবই আল্লাহর দেওয়া রিজিক। যে অক্সিজেন আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করি তাও আমাদের জন্য রিজিক। এখানে রিজিক ভক্ষণ করার কথা বলা হলেও আমরা সব রিজিকই ভক্ষণ করি না, কিছু ব্যবহার করি, কিছু উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করি। যেহেতু কিছু ভক্ষণ করাটাই তা থেকে উপকৃত হওয়ার উত্তম পন্থা বা চূড়ান্তরূপ বলে আমরা গণ্য করি সেহেতু এখানে ভক্ষণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে রিজিক শব্দের অর্থ : রিজিক বলতে সাধারণত মানুষ তাকেই বুঝে থাকে, যা খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে। প্রকৃত অর্থে রিজিক শব্দটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী صَاحِبِ عَقَائِدْ রিজিক -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন– اَلرِّزْقُ اِسْمٌ لِمَا يَسُوْقُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلنَّاسِ اَوْ مِمَّا يَتَغَذّٰى بِهٖ - অর্থাৎ রিজিক ঐ সকল কিছুর নাম, যা আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করে দেন। অথবা যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। যাই হোক রিজিক বলতে খাদ্যদ্রব্য সন্তানসন্ততি বা আল্লাহর সৃষ্টি হতে যত কিছু মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সবই রিজিক -এর অন্তর্ভুক্ত। কেবল ভক্ষণ করার উপযোগী বস্তুকে রিজিক -এর অর্থে ব্যবহৃত করাই যথার্থ নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতানুসারে রিজিক -এর تَعْرِيْف হলো– اَلرِّزْقُ اِسْمٌ لِمَا يَسُوْقُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ ذٰلِكَ قَدْ يَكُوْنُ حَلَالًا وَقَدْ يَكُوْنُ حَرَامًا অথবা اَلرِّزْقُ اِسْمٌ بِمَا يَتَغَذّٰى بِهِ الْحَيَوَانُ مَاكُوْلًا اَوْ مَشْرُوْبًا রিজিক তার নাম, যা আল্লাহ তাকে (ব্যক্তিকে) দান করে থাকেন। আর তা কখনও হালাল বস্তু বা কখনও হারাম বস্তু হতে পারে। অথবা যা দ্বারা কোনো جَانْدَارْ জীবন ধারণ করে থাকে। كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

মু'তাযিলাগণের মতে اَلرِّزْقُ اِسْمٌ بِمَا يَأْكُلُهُ الْمَالِكُ وَ ذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ حَرَامًا অর্থাৎ রিজিক তাকে বলে যা ব্যক্তি নিজ মালিকানা স্বত্ব বিশেষে ভক্ষণ করে থাকে।

اَلْاَكْلُ বলার পর اَلنُّشُوْرُ বলার কারণ : এ পৃথিবীতে চলাফেরা করে এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া রিজিক ভোগ-ব্যবহার কালে আমাদের মাঝে স্বভাবতই পরকালের কথা স্মরণ নাও আসতে পারে। আমরা হিসাব-নিকাশের দিনের কথা ভুলে যেতে পারি। আল্লাহর নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে–এ কথা খেয়াল না-ও থাকতে পারে। এ কারণেই আয়াতের শেষে اَلنُّشُوْرُ বা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আমাদের পরীক্ষা করছেন। এ কথা যেন খেয়াল থাকে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহর অবস্থান : উপরিউক্ত ১৬-১৭নং আয়াত দ্বারা বাহ্যত প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলার অবস্থান হলো আকাশমণ্ডল, অথচ আল্লাহ স্থান-কাল-পাত্রের অতীত এক সত্তা, এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। বাহ্যিকরূপে আয়াত দ্বারা যে মর্ম উদ্ধার হয়, আসলে আয়াতের মর্ম তা নয়। আল্লাহ যে আকাশেই অবস্থান করেন না তা সত্য কথা। 'যিনি আকাশে রয়েছেন' এ কথাটি মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই নিজের তুলনায় বড়কে সর্বদা উর্ধ্বে মনে করে। বড়লোক বললে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধারণা এদিকে চলে যায় যে, বড়লোক তারাই, যারা পাঁচতলা, দশতলা বিশিষ্ট অট্টালিকায় বসবাস করে। এমনিভাবে নিরাকার ও ধরা-ছোঁয়ার অতীত মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার কথা বললেই তাদের ধারণা উর্ধ্বলোকের দিকে চলে যায়। এ জন্যই মানুষ যখন আল্লাহর দিকে একাগ্রচিত্ত হয়, তখন উর্ধ্বে তাকায়, উর্ধ্বে হাত তুলে প্রার্থনা করে। বিপদ-আপদে উর্ধ্বে মুখ তুলে ফরিয়াদ জানায়। ইত্যাকার সবকিছু সীমাহীন মহান সত্তার দিকে ধারণা গমন করারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এ দিকেই লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে যে, 'আকাশে যিনি রয়েছেন'। অন্যথায় আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান। কুরআন মাজীদে সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে– فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ 'তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে।' উপরিউক্ত আয়াতের মর্মটি সেই হাদীসের ন্যায়, যা হযরত খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা.) সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন– "তিনি সেই মহিলা, যার অভিযোগ সপ্ত আকাশে শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে।" এ হাদীসেও 'সপ্ত আকাশে শ্রুত ও গৃহীত হওয়া' দ্বারা তথায় আল্লাহর অবস্থানকে বুঝানো হয়নি; বরং আল্লাহ আকাশের ন্যায় সীমাহীন মহান সত্তা– সেকথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহর নিকট তাঁর নালিশ শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে। মানুষের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিকোণেই এরূপ বলা হয়। যেমন বলা হয়– উপর ওয়ালা যেন বিচার করেন। এটার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ উর্ধ্বলোকে অবস্থান করেন, ভূ-তলে করেন না; বরং এর দ্বারা সীমাহীন মহান সত্তার কথাই বুঝানো হয়।

قَوْلُهُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাফেরদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করার সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন। তোমরা কি নির্ভীক হয়ে গেছে যে, কারূনের ন্যায় তোমাদেরকে আসমানের অধিপতি (আল্লাহ) জমিনের নিচের দিকে দাবিয়ে নেবেন না? এবং জমিন তোমাদেরকে গিলে ফেলতে পারবে না? যদিও আল্লাহ তা'আলা জমিনকে সাধারণ অবস্থায় চলাফেলার উপযোগী করে তৈরি করেছেন। জমিনকে মানুষ খনন করা ব্যতীত জমিনের দিকে কোনো কিছু গাড়াইতে সক্ষম নয়। তবে আল্লাহ সে বিষয়ে বিনা খননেও সক্ষমতা রাখেন। তিনি ইচ্ছা করলে সাধারণভাবে ভূমিকম্প সৃষ্টি করে সব কিছুকেই জমিনের গর্ভে ঢুকিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন। সুতরাং কাফের যেন সেই কথা জেনে রাখে যে, যেমনিভাবে না চাইলেও তাঁর অশেষ ও অফুরন্ত নিয়ামত পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর রোষ ও আক্রোশ সর্বাধিক। তিনি নারাজ হলে আর কারো রক্ষা নেই। –[মা'আরিফ, আশরাফী, তাহের]

خَسْف শব্দের অর্থ : خَسْف জমিনের নিচের দিকে দেবে যাওয়া। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের প্রসিদ্ধ সম্পদশালী কারূনকে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ জমিনের নিচের দিকে দাবিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (الْآيَة) অর্থাৎ আমি কারূনকে তার ঘরবাড়িসহ জমিনের দিকে দাবিয়ে দিয়েছি, তখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো দলবল কেউই সাহায্যকারী ছিল না এবং সর্বশেষ তার সাহায্যকারী কেউ ছিল না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও এ বিষয়ে বলেছেন– لِكُلِّ أُمَّةٍ خَسْفٌ وَمَسْخٌ

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ বাক্যে نَذِيرِ -এর মর্মার্থ : فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ বাক্যে نَذِيرِ -এর মর্ম কি তা সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ এর মর্মার্থ বলেন যে, نَذِيرِ -এর অর্থ مُنْذِرٌ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -কে-ই বুঝানো হয়েছে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে এবং তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে জানতে পারবে। তখন তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। তাঁর সম্পর্কে এখনই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তাঁকে অনুসণ করো। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এখানে إِنْذَارٌ অর্থাৎ সতর্কীকরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা আমার সতর্ককীকরণের পরিণাম জানতে পারবে। আমি তোমাদেরকে আমার রাসূল ও কিতাব-এর মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তা শোননি। এর পরিণতি যখন টের পাবে তখন কিন্তু তোমাদের করার কিছুই থাকবে না।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ : আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে দুনিয়াতে শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের ঘটনাবলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন [এরা তো কি] ইতঃপূর্বে এদের অপেক্ষাও শত সহস্রগুণে বেশি শক্তিশালী ধনবল, জনবল এবং বাহুবলে বলীয়ান কত জাতি তাঁর অবাধ্যতার কারণে তাঁর গজব ও আক্রোশের ফলে নিপাত গেছে। তোমাদের শিক্ষা ও সতর্কতার পক্ষে তাদের শোচনীয় দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

এটা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, كُفْر আল্লাহর রোষের কারণ, কোনো বিশেষ স্বার্থের খাতিরে যদিও আল্লাহর শাস্তি নাজিল না হয়ে থাকে তবে তা পরকালে অবশ্যই নাজিল হবে। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে, فَكَيْفَ كَانَ نَذِيْرِ ও فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ বলেছেন এতে اِسْتِفْهَام تَعَجُّبْ হয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি তাদের ক্ষেত্রে যে কত ভয়াবহ ও কঠিনভাবে অবতীর্ণ হবে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। সুতরাং এতে আল্লাহর এ শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতি আবশ্যকতা বুঝানো হয়েছে। -[মা'আরিফ, তাহেরী, জালালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالَى اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰفّٰتٍ اَلْ : উক্ত আয়াত হতে আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁর قُدْرَت مُطْلَقَةٌ-কে বিভিন্ন প্রকারভেদে বর্ণনা করেছেন এবং প্রথমে খোলা আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীসমূহের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন- তাদের মাথার উপর আকাশমণ্ডলে অর্থাৎ হাওয়ার উপর যে পাখিসমূহ তাদের পাখা প্রসার করে উড়ে বেড়াচ্ছে, আবার কখনও বা পাখাগুলো গুটিয়ে উড়ছে। নিজেদের দেহভার সত্ত্বেও মাটিতে পড়ে যাচ্ছে না, শূন্যলোকেই স্বাচ্ছন্দ্যে অবাধে মনের সুখে বিরাজ করছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদেরকে টানতে পারছে না , একমাত্র আল্লাহর অশেষ কুদরতের মাধ্যমেই যে এটা সম্ভব হচ্ছে, এটাতে তিনি প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, তিনি সকল ব্যাপারেই শক্তিশালী, সবকিছুই দেখতে পান। এ অবস্থা কি তারা দেখতে পায়নি এবং এ দৃশ্যের উপর লক্ষ্য করে কি তারা ঈমান আনয়ন করতে পারে না।

এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নজিরবিহীন কুদরতের প্রমাণ। এর প্রতি একটুও যদি চিন্তা-ভাবনা করা হয় তবে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত গতি থাকে না। -[মা'আরিফ, জালালাইন]

এ থেকে আরও স্পষ্টতর কুদরতের উদাহরণ হলো আকাশে উড্ডীয়মান উড়োজাহাজসমূহ তা এত শত শত মন ওজন হওয়া সত্ত্বেও ভূমিতে পড়ে যায় না। লক্ষ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করে বেড়ায় জগতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত করে থাকে। এগুলোতে যদি আল্লাহ কুদরত না ঘটাতেন তবে এটা কখনও এভাবে উড়ে বেড়ানো সম্ভব হতো না। মানুষের মেধা শক্তিতে এই কুদরত কার্যকরী করে রেখেছেন।

অনুবাদ :

٢٠. أَمَّنْ مُبْتَدَأٌ هٰذَا خَبَرُهُ الَّذِيْ بَدَلٌ مِنْ هٰذَا هُوَ جُنْدٌ أَعْوَانٌ لَّكُمْ صِلَةُ الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ صِفَةُ جُنْدٍ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ط أَيْ غَيْرِهِ يَدْفَعُ عَنْكُمْ عَذَابَهُ أَيْ لَا نَاصِرَ لَكُمْ إِنِ مَا الْكٰفِرُوْنَ إِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ غَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِأَنَّ الْعَذَابَ لَا يَنْزِلُ بِهِمْ.

২০. কিংবা কে আছে مَنْ অব্যয়টি مُبْتَدَأٌ এমন هٰذَا এ পূর্বোক্ত مَنْ-এর خَبَر যে এটা هٰذَا হতে بَدَل সৈন্যবাহিনী সাহায্যকারী তোমাদের জন্য এটা الَّذِيْ ইসমে মাউসূলের জন্য صِلَه যারা তোমাদের সাহায্য করবে এটা جُنْد সৈন্যবাহিনী -এর সিফাত [দয়াময় আল্লাহ ভিন্ন] অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অপর কেউ, যে তোমাদের হতে তাঁর শাস্তি প্রতিরোধ করবে। অর্থাৎ বাস্তবে তোমাদের কোনোই সাহায্যকারী নেই। কাফেরগণ তো إِنْ অব্যয়টি مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভ্রান্তিতেই রয়েছে শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে যে, তাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হবে না।

٢١. أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ الرَّحْمٰنُ رِزْقَهُ ج أَيِ الْمَطَرَ عَنْكُمْ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَيْ فَمَنْ يَرْزُقُكُمْ أَيْ لَا رَازِقَ لَكُمْ غَيْرُهُ بَلْ لَّجُّوْا تَمَادَوْا فِيْ عُتُوٍّ تَكَبُّرٍ وَّنُفُوْرٍ تَبَاعُدٍ عَنِ الْحَقِّ.

২১. কিংবা এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবিকা দান করবে, যদি বন্ধ করেন দয়াময় তাঁর জীবিকা অর্থাৎ তোমাদের হতে বৃষ্টি। আর শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী বক্তব্য যৎপ্রতি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ তখন কে তোমাদেরকে জীবিকা দান করবে? সারকথা, তিনি ব্যতীত অপর কেউ তোমাদের জীবিকা দানকারী নেই। বরঞ্চ তারা অবিচল রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত করেছে অবাধ্যতা অহঙ্কার ও সত্য বিমুখতায় সত্য হতে দূরে রয়েছে।

٢٢. أَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا وَاقِعًا عَلٰى وَجْهِهِ أَهْدٰى أَمْ مَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا مُعْتَدِلًا عَلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَخَبَرُ مَنِ الثَّانِيَةِ مَحْذُوْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الْأُوْلٰى أَيْ أَهْدٰى وَالْمَثَلُ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ أَيْ أَيُّهُمَا عَلٰى هُدًى.

২২. তবে কি যে ব্যক্তি ঝুঁকে চলে পতিত হয়ে তার মুখের উপর সে-ই পথপ্রাপ্ত? নাকি যে স্থিরভাবে চলে সরলভাবে সঠিক পথের উপর দ্বিতীয়টির খবর উহ্য! যৎপ্রতি প্রথমটির খবর নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ أَهْدٰى পথপ্রাপ্ত আর এ উদাহরণ মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে কে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে?

٢٣. قُلْ هُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَكُمْ خَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط الْقُلُوْبَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ مَا مَزِيْدَةٌ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ مُخْبِرَةٌ بِقِلَّةِ شُكْرِهِمْ جِدًّا عَلٰى هٰذِهِ النِّعَمِ

২৩. বলুন, তিনিই তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ অন্তর তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর বাক্যটি মুস্তানিফা বাক্য। যা এ সকল নিয়ামতের উপর তাদের স্বল্প কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে সংবাদদানকারী।

٢٤. قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَأَكُمْ خَلَقَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ لِلْحِسَابِ.

২৪. বলুন, তিনিই, তোমাদেরকে বিস্তৃত করেছেন সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবিষ্ট করা হবে হিসেবে-নিকাশের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ الخ আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল : উক্ত দু'টি আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কাফের সম্প্রদায় দু'টি কথার উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করত না এবং তাঁর সাথে সর্বদা শত্রুতা পোষণ করত। সেই কথা দু'টি হলো। ১. তারা নিজেদেরকে ধন ও জনবলের অধিক শক্তিশালী মনে করত। ২. তাদের ধারণা ছিল, তাদের মূর্তিসমূহ তাদেরকে মহান আল্লাহর নিকটে পৌঁছিয়ে দেবে এবং নিজেদের জন্য সকল উন্নতি সাধন করবে এবং সকল ক্ষতিকারক বিষয় হতে বিরত রাখবে। এ ধারণাগুলোকে আল্লাহ তা'আলা খণ্ডন করে আয়াত দু'টি নাজিল করলেন। [এরূপই তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকার বলেছেন।] আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ওহে কাফিরগণ! তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তা'আলা রাহমানুর রাহীমের নির্ধারিত ফেরেশতাগণ ব্যতীত দুনিয়াতে তোমাদের আর কোনো সাহায্যকারী দল রয়েছে? যারা সর্বক্ষণ তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকবে। যারা তোমাদেরকে আগুনে জ্বলতে, পানিতে ডুবতে দেবে না। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি জেনে রাখুন, এরা শয়তানের ধোঁকাবাজিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর এমন দয়াময় আল্লাহকে ভুলে শয়তানের সমীপে মাথানত করছে। আল্লাহ আরও বলেন, হে মূর্তিপূজকগণ! আসমান হতে বৃষ্টিবর্ষণ ও জমিন থেকে উদ্ভিদের মাধ্যমে যদি আল্লাহ তোমাদের রিজিকের বন্দোবস্ত না করতেন তবে তোমরা কোথা হতে রিজিক পেতে, কে তা ব্যবস্থা করে দিত? আল্লাহ ব্যতীত কারোও পক্ষে এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এ কথা জেনে রেখো! কার দেওয়া রিজিক খেয়ে কার ইবাদতে মশগুল হয়েছ। মূলত তারা সর্বদা রাসূলের বিপক্ষে কাজ করে থাকে। সত্য হতে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

أَمْ-এর অর্থ ও তা দ্বারা উদ্দেশ্য : أَمْ টি এখানে مُتَّصِلَة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করেছ? আর তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্ষক নাকি তোমাদের সহচরগণ।

আবূ হাইয়ান বলেন, এটা أَمْ مُنْقَطِعَه আর এটা بَلْ অর্থে ব্যবহৃত, هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ অর্থে ব্যবহৃত নয়। যদি هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে দু'টি اِسْتِفْهَامْ একত্র হয়ে যাবে, যা كَلَامُ اللّٰهِ -এর সৌন্দর্য বিনষ্টকারী।

ঈমান থেকে কাফেরদের বিরত থাকার কারণ এবং তা খণ্ডনের পদ্ধতি : কাফেররা ঈমান কবুল করত না এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতের দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করত না। এর কারণ ছিল মূলত দু'টি। এক. তাদের শক্তি-সামর্থ্য থাকার কারণে। তাদের ধন-সম্পদ ও শক্তি সামর্থ্যের উপর তাদের বিশেষ আস্থা ও ভরসা ছিল। দুই. তারা বলত, আমাদের এই মূর্তিগুলো যাদের আমরা পূজা করি এরাই সমস্ত কল্যাণের আধার, এরাই আমাদেরকে সব ধরনের কল্যাণ দেয় এবং আমাদের বিপদ-আপদ দূর করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ধরনের দাবি ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করেন এবং এদের এ কথাকে এখানে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। তাদের প্রথম কথার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন "তোমাদের এমন কোনো সৈন্যবাহিনী রয়েছে যা আমার গজব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তোমাদের এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এর পূর্বেও তা অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কত বড় বড় বাদশাহ দুনিয়াতে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদেরকে কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা বা সাহায্য করতে পারে না।

তাদের দ্বিতীয় ধারণার ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ভালো-মন্দের চাবিকাঠি তো একমাত্র আমার হাতে। আমি যদি তোমাদের রিজিক বন্ধ করে দেই, তোমাদের জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ বন্ধ করে দেই- যেমন বৃষ্টি বা গাছপালা শস্য উৎপাদন তাহলে কে তোমাদেরকে রিজিক দেবে? তোমাদেরকে কেউ রিজিক দেওয়ার নেই। তোমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া। এরপরও তোমরা তোমাদের ভ্রান্তির মাঝে রয়েছ। সত্য প্রকাশ হওয়ার পরও তোমরা বাতিলের উপর আঁকড়ে রয়েছ। এটা তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হচ্ছে। তোমরা আসলে সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারী নও। -[কাবীর]

তাদের অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতার কারণ : কাফেররা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তা গ্রহণ করেনি। তারা সত্য হতে দূরে সরে থাকে। অহংকার ও দাম্ভিকতার ভাব দেখায়। তাদের অবাধ্যতার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক মোহ। এটা তাদের কর্মশক্তির বিকৃতির লক্ষণ। তারা নিজেদের কর্মশক্তিকে সঠিক খাতে পরিচালিত করছে না। তাদের সত্যবিমুখতার কারণ হলো তাদের অজ্ঞতা। এটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার বিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপন্থা সঠিক খাতে প্রবাহিত না করলে সত্য পথের দিশারী হতে পারবে না। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَفَمَنْ يَّمْشِيْ .... صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ" : اَفَمَنْ يَّمْشِيْ আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা দু'টি উদাহরণ পেশ করেছেন। এক. মু'মিনদের, দুই. কাফেরদের। মু'মিনদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো, যে মাথা উঁচু করে সোজাসুজি একটি সমতল সড়কের উপর দিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ তার গন্তব্যস্থল জানা রয়েছে। তার পথ মাত্র একটিই। সে শুধু ইসলামের পথেই- আল্লাহর পথেই চলবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণটি কাফেরদের জন্য দেওয়া হয়েছে। তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে উল্টা দিকে মুখ করে চলছে। তার পথে কোথায় কোনো অজগর বা ভয়ংকর জীবজন্তু বসে রয়েছে যা সে দেখতে পায় না। তার পথে কোনো গর্ত বা বিপদ-আপদ রয়েছে সেদিকেও তার কোনো দৃষ্টি নেই। এ ব্যক্তি কি কোনো দিন গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে? কখনও কি সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারে? তার পক্ষে নাজাত কখনও কি পাওয়া সম্ভবপর? না এটা কখনও সম্ভবপর হতে পারে না। -[কাবীর, যিলাল]

* আর মুকাতিল (র.) বলেছেন, এ দৃষ্টান্ত সকলের জন্য নয়, বরং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। কাফিরদের মধ্যে আবূ জাহলকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর ঈমানের প্রতীক ও আহ্বায়ক হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
* হযরত আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এর দ্বারা আবূ জাহল এবং হামযা ইবনে আব্দুল মোত্তালিব (রা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
* হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, অত্র আয়াতে যে কাফেরের কথা বলা হয়েছে সে হলো আবূ জাহল আর যে মু'মিনের কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)। -[কাবীর]

হেদায়েতপ্রাপ্ত ও গোমরাহকে আল্লাহ ভালো করে জানেন, তথাপিও আবার কেন প্রশ্নের সুরে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন? : এর উত্তর হচ্ছে- সবকিছুই আল্লাহ জানেন, মানুষও তা জানে। তথাপিও প্রশ্ন করে সত্যকে সত্যরূপে স্পষ্ট করে বর্ণনা করিয়ে দেওয়া এবং তার সৃষ্টি জগতের মানুষকে সজাগ ও সচেতন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এভাবে প্রশ্নসহ তাঁর বক্তব্য পেশ করে থাকেন।

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ .... وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ : আয়াত দু'টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর দেওয়া নিয়ামতসমূহের কথা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন, মহান রাব্বুল আলামীন এমন অগণিত ও অমূল্য নিয়ামতও দেওয়ার শক্তি রাখেন যা অস্বাভাবিক। তিনি বহিরাগত বহুবিধ নিয়ামত তো দিয়েই দিয়েছেন। অতঃপর প্রত্যেকটি আদম সন্তানকে তার দেহে খচিত করে এমন কতগুলো নিয়ামত দিয়েছেন সেগুলোর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তন্মধ্যে কতগুলো হলো اِدْرَاك حِسِّيٌّ অনুভূতিশক্তির মাধ্যমে আর কতগুলো হলো اِدْرَاك غَيْر حِسِّيٌّ অনুভূতিশক্তির মাধ্যমে নয়। যথা- কর্ণ ও নাসিকা প্রকাশ্য অনুভূতি শক্তির মাধ্যম হিসেবে খুবই স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আর অন্তর বা কলব اِدْرَاك عَقْلِيٌّ জ্ঞানের অনুভূতির অদৃশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে সৃজন করেছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন তবে তোমাদের মধ্যে খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই এগুলোর শোকর করে থাকে। আরও বলেন- يَا نَبِيَّ اللّٰهِ আপনি শুনিয়ে দিন, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করে রেখেছেন, যাতে তোমরা কুদরতের দৃশ্যসমূহ অবলোকন করতে পাও এবং তা হতে উপদেশাবলি অর্জন করতে পার এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাক। নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পর একদিন তাঁর দরবারে তোমাদের সবারই হাজিরা দিতে হবে।

اَلْقَلْبُ وَالْبَصَرُ وَالسَّمْعُ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : অন্যান্য অঙ্গগুলো হতে قَلْب - سَمْع . بَصَر -কে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করার কারণ উক্ত আয়াতে মানুষের অঙ্গগুলো হতে কেবল মাত্র তিনটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে এর কারণ হচ্ছে- উক্ত অঙ্গগুলোর মধ্যে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বিশেষ কার্যগুলো নির্ভরশীল রয়েছে অর্থাৎ اِدْرَاك . عِلْم দার্শনিকগণ اِدْرَاك شُعُوْر ও عِلْم -এর জন্য পাঁচটি মাধ্যম বর্ণনা করেছেন। সেই পাঁচটি মাধ্যমকে حَوَاسِ خَمْسَه বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ১. قُوَّة سَامِعَه শ্রবণশক্তি; ২. قُوَّة بَاصِرَه দৃষ্টিশক্তি; ৩. قُوَّة شَامَّه ঘ্রাণশক্তি; ৪. قُوَّة ذَائِقَه স্বাদ গ্রহণশক্তি; ৫. قُوَّة لَامِسَه স্পর্শশক্তি। ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য নাক, স্বাদ গ্রহণের জন্য জিহ্বা, স্পর্শ করার জন্য সকল শরীরে শক্তি ও শ্রবণ করার জন্য কর্ণ এবং দৃষ্টিপাত করার জন্য চক্ষু তৈরি করে দিয়েছেন। এখানে মাত্র এ পাঁচটি হতে দু'টির [কান ও চক্ষুর] কথা উল্লেখ করেন।

এর কারণ হচ্ছে- ঘ্রাণ নিয়ে স্বাদ গ্রহণ ও স্পর্শ করে মানুষ খুব কম সংখ্যক জিনিসের সম্পর্কে عِلْم অর্জন করতে পারে। সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা শ্রবণ ও দেখার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। তদুপরি سَمْع বা শ্রবণশক্তির কথাকে প্রথমে বলা হয়েছে। কারণ মানুষ তার সারা জীবনে যত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তন্মধ্যে শ্রবণকৃত বিষয় অন্যান্য বিষয় হতে অধিক। এ সকল কারণেই حَوَاسِ خَمْسَه হতে কেবল দু'টিকে উল্লেখ করেছেন। কারণ, অধিকাংশ অভিজ্ঞতা এ দুই শক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

তৃতীয় পর্বে قَلْب সম্পর্কে বলা হয়েছে। তা মানুষের মূল এবং জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করার মূল মাধ্যম। কর্ণ দ্বারা শ্রবণকৃত চক্ষু দ্বারা দর্শনকৃত বিষয়সমূহের অভিজ্ঞতা লাভ করা অন্তরের উপরই নির্ভরশীল।

পবিত্র কালামের বহু আয়াতেই قَلْب -কে مَرْكَز عِلْم বলা হয়েছে। অর্থাৎ عِلْم অর্জনের সেন্টার। যেমন আল্লাহ বলেন كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا الخ তবে দার্শনিকগণ স্মৃতিশক্তিকে জ্ঞানের ভাণ্ডার বলে থাকেন। -[মা'আরিফুল কুরআন, মাদারিকুত তানযীল]

اَ مُوَ وَجْهُ تَخْصِيْصِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْقَلْبِ عَلٰى بَوَاقِيْ اَعْضَاءِ الْاِنْسَانِ .

অনুবাদ :

২৫. وَيَقُوْلُوْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ وَعْدُ الْحَشْرِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ.

২৫. আর তারা বলে মু'মিনদের উদ্দেশ্যে কখন এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে? সমাবেশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি যদি তোমরা সত্যবাদী হও এ দাবিতে।

২৬. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ بِمَجِيْئِهٖ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ.

২৬. বলুন, এর ইলম তো এটার আগমন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট। আর আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র প্রকাশ্য সতর্কীকরণ।

২৭. فَلَمَّا رَاَوْهُ اَيِ الْعَذَابَ بَعْدَ الْحَشْرِ زُلْفَةً قَرِيْبًا سِيْٓـئَتْ اِسْوَدَّتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ اَيْ قَالَ الْخَزَنَةُ لَهُمْ هٰذَا اَيِ الْعَذَابُ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ بِاِنْذَارِهٖ تَدَّعُوْنَ اَنَّكُمْ لَا تُبْعَثُوْنَ وَهٰذِهٖ حِكَايَةُ حَالٍ تَاْتِيْ عُبِّرَ عَنْهَا بِطَرِيْقِ الْمُضِيِّ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهَا

২৭. অনন্তর যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে অর্থাৎ সমাবেশিত হওয়ার পর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে অত্যাসন্ন অতিশয় নিকটবর্তী মলিন হয়ে যাবে কালো হয়ে যাবে কাফেরদের মুখমণ্ডল। আর বলা হবে অর্থাৎ রক্ষীগণ তাদের উদ্দেশ্যে বলবে এটাই শাস্তি তো যাকে তোমরা সতর্কীকরণ কালে দাবি করতে যে, তোমরা পুনরুত্থিত হবে না। আর এটা ভবিষ্যতে আগমনকারী অবস্থার বর্ণনা; কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়া অবধারিত হিসেবে مَاضِىْ অতীতকালীন শব্দযোগে ব্যবহার করা হয়েছে।

২৮. قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِعَذَابِهٖ كَمَا تَقْصِدُوْنَ اَوْ رَحِمَنَا لَا فَلَمْ يُعَذِّبْنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ اَيْ لَا مُجِيْرَ لَهُمْ مِنْهُ.

২৮. বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? যদি আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করেন এবং যারা আমার সঙ্গে রয়েছে মু'মিনগণ মধ্য হতে তাঁর শাস্তির মাধ্যমে, যেমন তোমরা ইচ্ছা পোষণ কর। অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন সুতরাং আমাদের শাস্তি দান না করেন। তবে কাফেরদেরকে কে পীড়াদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? অর্থাৎ তা হতে কেউ তাদেরকে রক্ষাকারী নেই।

২৯. قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ج فَسَتَعْلَمُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ اَنَحْنُ اَمْ اَنْتُمْ اَمْ هُمْ.

২৯. বলুন, তিনিই দয়াময় আল্লাহ। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর ভরসা করেছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে শব্দটি ত. ও ي. যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, শাস্তি প্রত্যক্ষ করার প্রাক্কালে। কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে প্রকাশ্য, আমরা না তোমরা, না তারা?

٣٠. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا غَائِرًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ جَارٍ تَنَالُهُ الْأَيْدِي وَالدِّلَاءُ كَمَائِكُمْ أَيْ لَا يَأْتِي بِهِ إِلَّا اللّٰهُ فَكَيْفَ تُنْكِرُوْنَ أَنْ يَّبْعَثَكُمْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَّقُوْلَ الْقَارِئُ عَقِيْبَ مَعِيْنٍ اَللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ وَتُلِيَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَجَبِّرِيْنَ فَقَالَ تَأْتِيْ بِهِ الْفُؤُوْسُ وَالْمَعَاوِلُ فَذَهَبَ مَاءُ عَيْنِهِ وَعَمِيَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى اٰيَاتِهِ.

৩০. বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে অদৃশ্য হয়ে যায় ভূমিতে অদৃশ্য তবে কে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি আনয়ন করবে? প্রবাহিত। যাকে হস্ত ও বালতিসমূহ নাগালের কাছে পাবে। যেমন তোমাদের পানিসমূহ এরূপ নাগালের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তা আনয়ন করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা কিরূপে তোমাদের পুনরুত্থানকে অস্বীকার কর। পাঠকের জন্য মোস্তাহাব এই যে, مَعِيْنٍ শব্দটি পাঠের পর বলবে اَللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ আল্লাহ সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। যেমন হাদীস শরীফে এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। এই আয়াতটি কোনো এক অহংকারীর নিকট পঠিত হলে সে বলল, কুড়াল ও কোদাল তা আনয়ন করবে। তখন তার চোখের পানি শুকিয়ে যায় এবং সে অন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নিদর্শনাবলি সম্পর্কে দুঃসাহস হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।

তাহকীক ও তারকীব

تَدَّعُوْنَ ও سَتَعْلَمُوْنَ শব্দদ্বয়ে বর্ণিত কেরাত : تَدَّعُوْنَ শব্দটিকে جُمْهُوْر তাশদীদ দিয়ে تَدَّعُوْنَ পড়েছেন। কাতাদা, ইবনে আবী ইসহাক, ইয়াকূব এবং যাহ্হাক এ শব্দটাকে দাল সাকিন সহকারে تَدْعُوْنَ পড়েছেন।

سَتَعْلَمُوْنَ শব্দ জমহুর কর্তৃক 'তা' দ্বারা سَتَعْلَمُوْنَ পড়া হয়েছে। কিসায়ী এটাকে جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ ধরে 'ইয়া' দ্বারা سَيَعْلَمُوْنَ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মক্কার কাফেরগণ নবী করীম ﷺ এবং সাহাবীদের জন্য বদদোয়া করত এবং তাঁদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করত। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন [নূরুল কুলূব।] অথবা ইমাম যাহেদ (র.) বলেছেন, কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যু কামনা করত এবং তাঁর সাহাবীদের ধ্বংস চাইত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে ঐ সমস্ত নরাধমদের উত্তর দানের জন্য উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[হোসাইনী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : উক্ত আয়াতে কাফেরগণ নবী করীম ﷺ ও ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে যা বলেছিল তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে কাফেররা কিয়ামতের সম্ভাব্যতাকে অলীক ও বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত মনে করত। আর তাকে অস্বীকার ও অবিশ্বাসের একটা ছুঁতা হিসেবেই তার দিন-তারিখের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তাদের এ কথাটির তাৎপর্য হলো, হে নবী ও মু'মিনগণ! তোমরা আমাদের হাশর-নাশরের যে আশ্চর্যজনক খবরাদি শুনাচ্ছ, তা কবে কার্যত বাস্তবায়িত হবে? কখন পাঠাবার জন্য তাকে তুলে রাখা হয়েছে? তা আমাদের চোখের সামনে এনে হাজির করে দাওনা কেন? দেখিয়ে দিলেই তো আমরা মেনে নিতে পারি। মূলত এ ধরনের কথায় বিদ্রূপের সুর অনুরণিত। কেননা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বিবেক-বুদ্ধি সম্মত যুক্তি-প্রমাণের অকাট্যতা দেখিয়ে লোকেরা কিয়ামতে বিশ্বাসী হতে পারে

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে ঠিক এ উদ্দেশ্যেই এ সকল যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করা হয়েছে। তবুও এর সময়ও তারিখের প্রশ্ন করা হলে বলতে হবে এরূপ প্রশ্ন কেবল মূর্খ লোকেরাই তুলতে পারে। কেননা এ তারিখ যদি বলেও দেওয়া হয় তবুও তারা বলতে পারে ঠিক আছে সেই ঘোষণা অনুসারে সেই তারিখ যখন আসবে, তখন আমরা দেখে নেবো, মেনে নেবো। তা যে নিঃসন্দেহ তা এখন আমরা কিতাবে মেনে নেবো।

قَوْلُهُ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ : এটা কাফিরদের প্রশ্নের জবাবস্বরূপ। এর বিশদ ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বলেন, হে নবী! আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন, কিয়ামত কখন আসবে তা আল্লাহই ভালো জানেন, তা ঠিক কোন দিন আসবে এ সংবাদদাতা আমি নই। তিনি ছাড়া তা জানা কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। আর সেদিন কখন সংঘটিত হবে তা জানা জরুরিও নয়। অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الخ আর আমি একজন প্রকাশ্যভাবে কিয়ামতের দিনের ভয় প্রদর্শনকারী।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوهُ ..... بِهِ تَدَّعُوْنَ : আল্লাহ তাআলা আরও বলেন- হে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন যখন তারা দেখবে যে কিয়ামত একেবারেই নিকটবর্তী হয়ে আসছে তখন সে সময়ে ভয়ে কাফেরদের মুখসমূহ বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদের হুঁশ-জ্ঞান সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা খুবই বেপরোয়া হয়ে যে দিনটি আগমনের জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষা জাহির করেছ তা এখন হয়েছে। সুতরাং এখন এত বেহুঁশ কেন হলে? অর্থাৎ ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিতব্য অপরাধীকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার যেমন অবস্থা হয়, ঠিক সেদিন ঐ লোকদের তা অপেক্ষা আরও ভয়ানক অবস্থা হবে।

قَوْلُهُ سِيْئَتْ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : অত্র আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ঐ কাফেররা যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব দেখতে পাবে অথবা কিয়ামত নিকটবর্তী হবে তখন তারা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হবে যে, ভয়-ভীতির কারণে তাদের চেহারা বিবর্ণ এবং বিকৃত হয়ে যাবে তখন তাদের হৃদপিণ্ড দুরুদুরু কাঁপতে থাকবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, এ আজাবই তো তোমরা কামনা করছিলে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, চেহারা বিবর্ণ হওয়ার অবস্থা হলো এমন, যখন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তদ্রূপ এ কাফিরদের অবস্থাও তেমন হবে, যখন তারা আসমানি আজাব দেখবে অথবা কিয়ামত আসন্ন হবে। -[নূরুল কোরআন]

وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ .... বাক্যটির বক্তা কে? এবং تَدَّعُوْنَ-এর অর্থ কি? : وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ বাক্যটির قَائِلْ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। এক. এটা জাহান্নামের প্রহরীদের উক্তি। তারা কাফেরদেরকে এ কথা বলবেন। দুই. কেউ কেউ বলেন, এই উক্তিটি হচ্ছে কাফেরদের। তারা আজাব প্রত্যক্ষ করার পর একে অপরকে লক্ষ্য করে একথা বলবে। تَدَّعُوْنَ -এর অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। ফাররা এর মতে এ শব্দটি دُعَاءٌ শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে তোমরা প্রার্থনা ও কামনা করছিলে এবং খুব তাড়াতাড়ি আজাব চাইছিলে তা আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত। কেউ কেউ বলেন, تَدَّعُوْنَ শব্দটি মূলত دَعْوٰى শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে তোমরা দাবি করছিলে যে, তোমরা পুনরুত্থিত হবে না এবং কোনো আজাব আসবে না, দেখ আজ তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং তোমাদের নিকট সেই আজাব এসে উপস্থিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি এটা দাবি করছিলে? না বরং তোমরা এটা সংঘটিত হবে না, তাই দাবি করছিলে কিন্তু আজ তা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ .... (الْآيَة) : আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করেছ যে, তোমাদের কূপের পানি যদি তলিয়ে যায়, ঝরনাধারার যে প্রবাহ বিদ্যমান সেই পানি যদি ভূ-গর্ভে নিঃশেষ হয় এবং নাগালের বাইরে চলে যায়, তবে এমন কোনো শক্তিধর আছে যে, পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে পারে?

এসব বিষয় তোমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং তোমাদের মনের কাছেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, ইবাদত পাওয়ার যোগ্য দেবদেবীগণ, না এক লা-শরিক আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কেউ এই পানি ফিরিয়ে আনার শক্তি রাখে না। সুতরাং যারা আল্লাহকে একক সত্তা ও শরিকহীন মনে করে তারা ভ্রান্ত, না যারা তাঁর সাথে শরিক করে তারা ভ্রান্ত এ প্রশ্ন তোমাদের মনের কাছেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

سُوْرَةُ الْقَلَمِ : সূরা আল-ক্বালাম

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নাম নূন অথবা আল-ক্বালাম, কেননা এ শব্দ দু'টি অত্র সূরার প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে এ দু'টি শব্দের অনুসরণেই অত্র সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২ রুকু', ৫২টি আয়াত, ৩০০টি বাক্য ও ১২৪৬টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটি নাজিলের কারণ ও সময়কাল : এ সূরাটিও মক্কা শরীফে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়তী জীবনের প্রথম দিকে নাজিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম। মক্কা শরীফে নতুন দীন প্রচার শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.), হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যায়েদ (রা.) এবং হযরত উম্মে আয়মান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এদিকে নবী করীম ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে অজু ও নামাজের তালিম দেওয়া হলো। নবী করীম ﷺ এবং নব মুসলমানগণের এ নতুন কর্ম অবলোকন করে কাফেরগণ বিস্মিত হলো। মক্কার প্রতিটি ঘরে ঘরে, অলিগলিতে তাদের এ নবতর কাজ ও ইবাদতি অনুষ্ঠান এবং কুরআনের অলৌকিক বিস্ময়কর বাণীর কথা আলোচিত হতে লাগল। কাফের সরদারগণ তাদের শিরকি মতবাদের উপর একে একটি আঘাত মনে করল। কেননা কুরআনের প্রবল আকর্ষণে মানুষ বিমোহিত হয়ে শিরকি মতবাদ ছেড়ে এ নবতর দীনে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। ফলে কাফের সরদারগণ এর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে উঠল। নবী করীম ﷺ-কে নানাভাবে উপহাস, তিরস্কার ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে লাগল। এমনকি তাঁকে উন্মাদ-পাগল নামে আখ্যায়িত করতেও ছাড়ল না। সুতরাং এতে নবী করীম ﷺ-এর মনে আঘাত পাওয়া এবং মনঃক্ষুণ্ন হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এই সূরা অবতীর্ণ করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন; কিন্তু নাজিলের সময় কোনটি তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, মক্কী জীবনে কাফেরদের বিরোধিতার মাত্রা যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল, সম্ভবত তখনই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : উক্ত সূরাতে আল্লাহ তা'আলা মোট তিনটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও ওজর-আপত্তির জবাব, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও সদুপদেশ প্রদান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং অবিচলতার জন্য উপদেশ দান।

অত্র সূরার প্রথম পর্যায়ে রাসূলে কারীম ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান করে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের প্রতি আপনার ইসলামের দাওয়াত পেশ করার প্রেক্ষিতে তারা আপনাকে যে গালি দিচ্ছে, তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আপনি নৈতিকতার উচ্চমানে অধিষ্ঠিত, আপনি প্রভুর মহাসত্য প্রচারে রত। আপনি পাগল নন, বরং কে পাগল আর কে ভালো তা তো সকলেই অবগত রয়েছে।

আপনার বিরুদ্ধিতার যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে, এটার কোনো চাপই আপনি মেনে নিবেন না, কোনো না কোনো এক পর্যায়ে আপনি কেবল তাদের কথায় বাধ্য হয়ে যান, এটাই তাদের কামনা। এরা সভ্য হতে মানুষকে পথভ্রষ্টকারী। সীমালঙ্ঘনকারী বটে এবং চুগলখোর। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যকার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সকল মক্কাবাসীদের নিকট সে সুপরিচিত। তখনও তাদের সকলের নিকট নবী করীম ﷺ-এর সুমহান চরিত্র উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হয়েছিল। তথাপিও মুহাম্মদ ﷺ তাদের উক্ত সুপরিচিত ব্যক্তির নিকট আল্লাহর বাণী প্রচার করলে বলত, এটা প্রথম যুগের বা পূর্বযুগের মানুষদের কিস্সা-কাহিনী মাত্র। তবে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির কথার জবাব খুব শক্তভাবেই দিয়েছেন। ১৭-৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এ বাগানের অধিকারী মালিকগণ আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত পেয়েও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন হতে বঞ্চিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগানকে সম্পূর্ণ নিধন করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা তাঁর নিয়ামত হতে বঞ্চিত রয়ে গেল। এ বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে মক্কাবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, রাসূলে করীম ﷺ-এর আদর্শ ও চরিত্রে চরিত্রবান না হলে যে কোনো যুগে যে কোনো জাতিই এরূপ আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে তাঁর গজবের সম্মুখীন হবে। ৩৪-৪৭ আয়াতসমূহে কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে কাফেরদেরকে ক্রমান্বয়ে নসিহত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কোথাও কাফেরদেরকে আবার কোথাও নবী করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। সেসব সম্বোধন ও আলোচনার নির্যাস এই যে, যারা আল্লাহকে মান্য করবে আর যারা অমান্য করবে, এ উভয় পক্ষের পরকালীন পরিণতি এক হবে না, অথচ কাফেরদের বিষয়ে ধারণা হলো, শেষ পরিণতি তাদেরই পক্ষে হবে।

তাদের এহেন ধ্যান-ধারণার কোনো মূল্য নেই, এটা ভিত্তিহীন, এর পক্ষে তাদের কোনো প্রমাণাদি পেশ করা অসম্ভব। মূলত মু'মিনগণ জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর কাফেররা জাহান্নামী হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মতামত সত্যায়িত করার জন্য তাদের দলনেতাগণও শত চেষ্টা করে কোনো ফল বের করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তাঁর দস্তুর মতেই স্বীয় কাজ চালিয়ে যাবেন।

৪৮ হতে শেষ আয়াত পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ-কে বিশেষভাবে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা আগমন করা পর্যন্ত দীন প্রচারে যত কঠোরতা ও দুঃখ-কষ্টেরই সঙ্গী হতে হয়, তা যেন তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে অতিক্রম করে যান। হযরত ইউনুস (আ.)-এর মতো যেন ধৈর্যহারা না হন। কারণ এ ধৈর্যহারা হওয়ার দরুন তিনি বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমত তাঁকে রক্ষা করেছিল। অতএব কাফেরদের সকল লাঞ্ছনার মোকাবিলায় তিনি যেন হতাশ না হন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আল মুলকে বেশির ভাগ আলোচনা ছিল একত্ববাদ এবং তার অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আর এ সূরার অধিকাংশ আলোচনা রেসালাতের অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে করা হয়েছে। আর নবুয়তকে অবিশ্বাস করা কুফরি সুতরাং কুফরির প্রতিফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। -[বায়ানুল কুরআন, মা'আরিফ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. نٓ تف اَحَدُ حُرُوْفِ الْهِجَاءِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ وَالْقَلَمِ الَّذِيْ كُتِبَ بِهِ الْكَائِنَاتُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ اَيِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ .

১. নূন আরবি বর্ণমালার একটি বর্ণ। আল্লাহই এর উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। আর শপথ কলমের যার মাধ্যমে লাওহে মাহফূযে সমগ্র সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবং যা তারা লিপিবদ্ধ করে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। কল্যাণ ও পুণ্যের মধ্য হতে।

٢. مَآ اَنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ اَىْ اِنْتَفَى الْجُنُوْنُ عَنْكَ بِسَبَبِ اِنْعَامِ رَبِّكَ عَلَيْكَ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا وَهٰذَا رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ

২. আপনি নন হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ অর্থাৎ নবুয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার কল্যাণে আপনার মধ্যে উন্মাদতা নেই। আর এটা কাফেরদের বক্তব্য اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ "সে তো একজন উন্মাদ" -এর প্রত্যুত্তর।

٣. وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ مَقْطُوْعٍ .

৩. আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার অবিচ্ছিন্ন।

٤. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ دِيْنٍ عَظِيْمٍ .

৪. নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রে দীনে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

٥. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ .

৫. অচিরেই আপনি দেখবেন ও তারা দেখবে।

٦. بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ مَصْدَرٌ كَالْمَعْقُوْلِ اَيِ الْفُتُوْنُ بِمَعْنَى الْجُنُوْنِ اَىْ اَبِكَ اَمْ بِهِمْ .

৬. তোমাদের মধ্য হতে কে বিকারগ্রস্ত اَلْمَفْتُوْنُ শব্দটি مَعْقُوْل -এর ন্যায় মাসদার অর্থাৎ جُنُوْن অর্থে ব্যবহৃত فُتُوْن -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আপনার সাথে, না তাদের সাথে।

٧. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ لَهٗ وَاَعْلَمُ بِمَعْنٰى عَالِمٌ .

৭. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অধিক পরিজ্ঞাত, কে তার পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই সৎপথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত তাঁর প্রতি। اَعْلَمُ শব্দটি এখানে عَالِمٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ : এ বাক্যে وَاوْ কসমের জন্য مَا মাওসূলা, يَسْطُرُوْنَ সেলাহ, বাক্যটি قَلَمِ -এর উপর আতফ হয়েছে। مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ الخ বাক্যটি জওয়াবে কসম। وَاِنَّ لَكَ الخ বাক্যটি পূর্ববতী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। وَاِنَّكَ لَعَلٰى الخ বাক্যটি তার পূর্ব বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। এ তিনটি বাক্যই জওয়াবে কসম। بِاَيِّكُمُ খবর মুকাদ্দাম, اَلْمَفْتُوْنُ মুবতাদা মুআখখার। মুবতাদা এবং খবর মিলে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ এই জুমলাটি নসবের স্থলে আছে পূর্বের জুমলার সাথে مُتَعَلِّقْ হওয়ার কারণে।

উক্ত আয়াতে خُلُقٍ শব্দকে একবচন এবং عَظِيْمٍ শব্দকে তার صِفَتْ নেওয়ার কারণ : এর কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল চারিত্রিক গুণাবলির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সেগুলো মূলত বহুবিধ চারিত্রিক গুণাবলির সমষ্টি। এ কারণে خُلُقٍ শব্দটি لَفْظًا যদিও একক হয়ে থাকে তবে مَعْنًى তা বহুবচনের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে এবং عَظِيْمٍ -কে তার صِفَتْ নেওয়া হয়েছে। আর مَكَارِمِ اَخْلَاقْ -এর জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলি সবগুলোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ এবং اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল : ইবনে জুরাইজ (রা.) বলেন, মক্কার কাফেররা যখন নবী করীম ﷺ-কে পাগল বা উন্মাদ, অতঃপর শয়তান নামে আখ্যায়িত করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ উক্তির প্রতিবাদে উপরিউক্ত ২নং আয়াত অর্থাৎ "আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নন" অবতীর্ণ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর চেয়ে কেউই সুন্দর চরিত্রের ছিল না। এরূপ উত্তম চরিত্রের যেমন তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন না, তেমনি তাঁর পরিবারের কোনো লোকই ছিলেন না। যখনই তাঁর কোনো সাহাবী বা পরিবারের কোনো লোক তাঁকে ডাকতেন, তখনই তিনি বলতেন, আমি উপস্থিত। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উপরিউক্ত ৪নং আয়াত অবতীর্ণ করে সুমহান চরিত্র ও সুউচ্চ নৈতিকতার আসনে সমাসীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা কলম ও লেখকগণের লেখার শপথ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি আপনার প্রভুর নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন, আপনি পাগলামি করছেন না, যদিও ধর্মবিরোধীদের নিকৃষ্ট মুখে আপনাকে পাগল বলা হয়েছে, এতে আপনি কর্ণপাত করবেন না। আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার এই সালামের মহৎ কাজের প্রতিফল পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবন পেতেই থাকবেন। আর আপনি তো মহাউত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কাফেররাই কেবল নিকৃষ্টতম চরিত্রে নিমজ্জিত রয়েছে। সুতরাং আপনি অবিচলভাবে আপনার মহতী কার্যে অবিচলভাবে দায়িত্ব পালন করে যান।

قَوْلُهٗ نٓ -এর মধ্যে نٓ -এর তাৎপর্য : قَوْلُهٗ نٓ একে حَرْف مُقَطَّعْ বলা হয়, পবিত্র কালামুল্লাহ- এর বহু সূরার প্রথমে এরূপ বহু حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- سُوْرَه اَحْقَافْ -এর প্রথমে حٰمٓ সূরা ইয়াসীনের প্রথমে يٰسٓ ইত্যাদি। এটাকে তাফসীরকারগণ حُرُوْف مُعْجَمْ ও বলেছেন। এর সঠিক অর্থ ও তথ্যের পেছনে উঠে পড়ে লাগা বান্দাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন, তাই তাফসীরকারগণ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন- اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ আল্লাহ এটা দ্বারা কি অর্থ নিয়েছেন তা তিনিই ভালোরূপে জানেন- كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ -[মা'আরিফ]

তথাপিও বিভিন্ন তাফসীরকারগণ এটার বিভিন্ন تاويل করেছেন, হযরত ইবনে মুনযির, ইবনে জুরাইজ ও মুজাহিদ (র.) বলেন, اَلنُّوْنُ هُوَ الْحُوْتُ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْاَرْضُ - নূন ঐ মাছটির নাম যার উপর সারা ভূ-পৃষ্ঠ দণ্ডায়মান রয়েছে। আল্লামা তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নূন অর্থ মাছ।

আব্দুর রায্যাক, ইবনুল মুনযির এবং কাতাদাহ হাসান (রা.) হতে বর্ণনা করেন, اَلنُّوْنُ الدَّوَاةُ وَهٰكَذَا رَوٰى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَيْضًا -[কাবীর]

জালালাইন গ্রন্থকার বলেন, এটা একটি حَرْف هِجَائِيّ [হরফে হিজায়ী] একটি আরবি বর্ণমালা মাত্র। তিনি এ তাফসীর করার মূল কারণ হলো, যারা বলে যে আল্লাহর নামসমূহের অংশ বিশেষ তাদের কথাকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করা।

তাদের দাবি ছিল نٓ টি আল্লাহর নাম اَلرَّحْمٰنُ বা اَلنَّصِيْرُ অথবা اَلنَّاصِرُ শব্দের একটি অংশ। কারো কারো মতে এটা إِسْمُ السُّوْرَةِ। কারো কারো মতে এটা إِسْمُ الْقُرْاٰنِ ইত্যাদি। -[জামাল]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে প্রাচীনতম তাফসীকারগণ এ অভিমত পেশ করেছেন যে, এ نُوْن অক্ষরের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মু'মিনদের প্রতি একটি সাহায্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

কারো কারো মতে লাওহে মাহফূযে যে দোয়াতের কালি দ্বারা মানুষের তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হয় এখানে সে অক্ষরের উল্লেখ করে দোয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[খাযেন, ম'আলিম, হোসাইনী]

কারো কারো মতে, এটি সেই মাছ যেটি হযরত ইউনুস (আ.)-কে তার উদরে ধারণ করে রেখেছিল। -[নূরুল কোরআন]

প্রথম আয়াতের قَلَمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : উপরিউক্ত ১নং আয়াতে কলমের শপথ দ্বারা সেই কলমের কথা বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাময় সকল বস্তু ও বিষয় লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ অনেক তাফসীরকারকের অভিমত। তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম মুজাহিদ (র.)-এর মতে এখানে কলম দ্বারা সেই কলমকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা জিকির অর্থাৎ কুরআন মাজীদ লেখা হতো।

আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, তাকদীর লিপিবদ্ধকারী কলমটি ছিল, নূরের যার দৈর্ঘ্য ছিল আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা এখানে 'কলম' উল্লেখ করে যারা কলম ব্যবহার করেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এমতাবস্থায় মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য হতে পারে।

অথবা যে ওলামায়ে কেরাম কলম দ্বারা ইলমে দীন লিপিবদ্ধ করেন তাদেরকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

وَمَا يَسْطُرُوْنَ-এর মর্মার্থ : وَمَا يَسْطُرُوْنَ-এর মর্ম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হচ্ছে লিখিত বস্তু। এখন যদি কলম বলতে সমস্ত কলম বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে 'দুনিয়াতে যা কিছু লেখা হচ্ছে সেই সবের কসম।' কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে, যা কিছু কিরামান কাতেবীন মানুষের আমলনামায় লেখে তার শপথ। কেউ কেউ বলেন, এটার মর্ম হলো, লাওহে মাহফূযে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। يَسْطُرُوْنَ বলে বহুবচন বুঝানো হয়নি; বরং এটা দ্বারা تَعْظِيْم বুঝানো হয়েছে। অথবা দুনিয়ায় সংঘটিত সমস্ত কাজকর্ম যা কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে তা বুঝানো হয়েছে। -[কাবীর]

কলম ও مَا يَسْطُرُوْنَ-এর নামে শপথ করার কারণ : উক্ত আয়াতে قَلَمْ দ্বারা যদি قَلَم تَقْدِيْر উদ্দেশ্য করা হয় যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি, তবে তা প্রথম সৃষ্টি হিসেবে অন্যান্য সৃষ্টির উপর তার বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং তা দ্বারা শপথ করা (مُنَاسِبْ) উপযোগী হয়েছে।

আর যদি قَلَمْ দ্বারা সাধারণ কলম উদ্দেশ্য করা হয় যা দ্বারা قَلَم تَقْدِيْر এবং ফেরেশতা ও ইনসানের সকল কলম তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তখন বলতে হবে যে, কলমের শপথ এ কারণে করা হয়েছে যে, জগতের বিশাল বিশাল রাজ্যসমূহ বিজয় করার জন্য তলোয়ারের অপেক্ষাও অধিক কাজ করে থাকে "কলম" অর্থাৎ কলমের গুরুত্ব তলোয়ার অপেক্ষা অধিক, যা কারোও বোধগম্য হতে আর বাকি থাকবে না। এ প্রসঙ্গে আবূ হাতেম বুসতী দু'টি শ্লোক (شِعْر) বলেছেন-

إِذَا اَقْسَمَ الْاَبْطَالُ يَوْمًا بِسَيْفِهِمْ ✽ وَعَدُّوْهُ مِمَّا يُكْسِبُ الْمَجْدَ وَالْكَرَمْ

كَفٰى قَلَمَ الْكُتَّابِ عِزًّا وَّرِفْعَةً ✽ مَدَى الدَّهْرِ اِنَّ اللّٰهَ اَقْسَمَ بِالْقَلَمِ

অর্থাৎ যখন কোনো বাহাদুর কোনো দিন স্বীয় তলোয়ারের শপথ করে থাকে, তখন সে তার তলোয়ারকে এমন বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে তোলে যেগুলো মানুষকে মর্যাদাশীল ও সম্মানী করতে পারে।

সে মর্মে বলতে হয় যে, লেখকদের জন্য কলম সর্বদা তার সম্মান বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন কলমের দ্বারা। -[মা'আরিফ]

মূলকথা হলো, উক্ত আয়াতে عَامْ قَلَمٌ বা قَلَم تَقْدِيْر উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে। উভয় অর্থই বিশুদ্ধ হবে। অতঃপর ن يَسْطُرُوْنَ বলে যা قَلَم تَقْدِيْر অথবা قَلَم عَامْ দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয় তার শপথ করে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সেই সকল অপবাদকে খণ্ডন করে দিয়েছেন যেগুলো দ্বারা নবী করীম ﷺ -কে তারা লাঞ্ছনা দিয়েছিল। যেমন তারা বলেছিল- يَاَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ.

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসীদের নিকট একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ এবং আল-আমীন বা বিশ্বাসী লোক ছিলেন। সত্যের বাণী নিয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করলেন তখনই তাদের চোখে তিনি একজন পাগল, উন্মাদ ও প্রবঞ্চনাকারী হয়ে গেলেন, তখনই তারা তাঁর সত্যতা, বিচার-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কথা ভুলে গেল এবং নানা প্রকার কটূক্তির দ্বারা তাঁকে অপমানিত করতে শুরু করল। মিথ্যা অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনতে লাগল, তাদের এ সকল কটূক্তি ও মিথ্যার প্রতিবাদেই আল্লাহ তা'আলা কলমের ও তার লেখার শপথ করলেন এবং কখনও কখনও কুরআনের শপথ এবং অন্যান্য সৃষ্টির শপথ করে তাদের কটূক্তির খণ্ডন করলেন এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের উক্তি মতে আপনি পাগল বা মিথ্যুক ও জাদুকর নন। তাঁর মনে যে সংকোচবোধ হচ্ছিল, করুণাময় তা দূর করে দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন এবং তাদের কটূক্তির কঠোর প্রতিবাদ বা নিন্দা করেছেন।

কাফেরদের উক্তির খণ্ডন : মহানবী ﷺ মক্কার লোকদের নিকট তাঁর নবুয়তের দাবি উত্থাপন করার পূর্বে তিনি তাদের নিকট একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও উত্তম চরিত্রের লোকরূপে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর সততা, বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার উপর সকলেই ছিল সংশয়হীন-আস্থাবান; কিন্তু তিনি যখন তাদের কাছে কুরআনুল কারীম পেশ করলেন, তখন তারা তাঁকে উন্মাদ বা পাগল ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতে লাগল। তাঁদের এ সব কটূক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন লেখার কলমের শপথ করে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। যে কুরআনের কারণেই তাঁর উপর মিথ্যা অভিযোগ দিত; সেই কুরআনের শপথ করেই প্রতিবাদ জানানো হয়েছে যে, আপনি তাদের উক্তি মতে উন্মাদ বা পাগল নন। যদিও এ কথাটি রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে; কিন্তু এর লক্ষ্য হলো মক্কার লোকদের এ মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ জানানো। এরূপ নয় যে, নবী করীম ﷺ নিজে নিজে উন্মাদ হওয়ার আশঙ্কাবোধ করছিলেন এবং তাদের মুখেও উন্মাদ হওয়ার কথা শুনেছিলেন, তাই "আপনি আপনার প্রতিপালকের করুণায় উন্মাদ নন" বলে তাঁর মনের সংশয় ও দ্বিধা দূর করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ-এর মনে এরূপ দ্বিধা-সংশয় উদ্রেক হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। তাঁর নিকট যে আল্লাহর প্রত্যাদেশ আসে এবং তিনি তাঁর মনোনীত রাসূল এতে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। সুতরাং উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর خُلُقٍ عَظِيْمٍ সম্পর্কে আলোচনা : রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, خُلُقٍ عَظِيْمٍ -এর অর্থ دِيْنٍ عَظِيْمٍ বা দীন ইসলাম, অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে এ দীন ইসলাম অপেক্ষা আর কোনো ধর্ম এত বেশি প্রিয় নয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ তাঁর চরিত্রটাই হলো কুরআনুল কারীম। অর্থাৎ কুরআনে কারীম যে সকল উত্তম কাজ ও চরিত্রের শিক্ষা প্রদান করেছে সেসব বিষয়ে বাস্তব প্রয়োগ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কার্যাবলি এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণের মাধ্যমেই ফুটে উঠে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, خُلُقٍ عَظِيْمٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (اٰدَابُ قُرْاٰن) আদাবে কুরআন। অর্থাৎ ঐ সকল অভ্যাস যা কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে যাবতীয় উত্তম চরিত্রকে তাঁর মধ্যে জমা করে দিয়েছেন তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ আমি স্বচ্চরিত্রতা পূর্ণরূপে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত একাধারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি, তথাপিও কোনো কাজে তিনি আমাকে কখনও اُفٍّ করেননি।

রত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কাউকে তাঁর নিজ হাতে প্রহার করেননি। তবে ইসলামের জন্য জিহাদ াতে যেখানে যখন গেছেন তখন সেখানে কাফের ও মুশরিকদেরকে হত্যা না করে ছাড়েননি। অন্যথা কখনো তার কোনো ালাম বা চাকরানি অথবা স্বীয় স্ত্রীদেরকেও প্রহার করেননি। তবে শরয়ী কানুন মোতাবেক তাকে সাজা দেওয়াতেন। কারো াথাও ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকলেও তার কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। -[মুসলিম]

রত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কখনো এমন প্রশ্ন করা হয়নি যার উত্তর তিনি দেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

রত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো বাজারে যেয়ে হৈ চৈ করতেন না আর অসৎ কার্যের প্রতিউত্তর অসৎ ার্যের মাধ্যমেও দেননি। যদিও جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا -কে জায়েজ রাখা হয়েছে। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, ়ামতের দিন خُلُقٌ حَسَنٌ -এর ন্যায় আমলের পাল্লায় এত বেশি ওজনী আর কোনো কিছুই হবে না।

রত আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমানগণ, তাদের حُسْنِ خُلُقٍ -এর বদৌলতেই ঐ ক্তির মর্যাদায় মর্যাদশীল হবে, যে ব্যক্তি রাতে ইবাদত এবং দিনে রোজা পালন করে। -[আবূ দাউদ]

قَوْلُهُ تَعَالَى "فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ" : "অতঃপর অচিরেই আপনি প্রত্যক্ষ করবেন এবং তারাও প্রত্যক্ষ াবে যে, আপনাদের মাঝে কে উন্মাদ।" এখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর কাফেরদের অপবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে ং তাদের কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে। প্রথম অংশে "আপনি অচিরেই প্রত্যক্ষ করবেন এবং তারা প্রত্যক্ষ করবে" এ কথাটির ট অর্থ হতে পারে।

১. দুনিয়াতে কার পরিণতি কি হবে। আপনি দুনিয়াবাসীদের সকলের অন্তরে দুনিয়াবাসীর বিরাট মর্যাদা লাভ করবেন, আর তারা ঞ্ছিত-অপমানিত হবে। আপনি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবেন, তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন।

২. পরকালে দেখা যাবে কার কি অবস্থা হয়। সেখানে আপনি হবেন কামিয়াব আর কাফেররা হবে ব্যর্থ, ক্ষতিগ্রস্ত। আর مَفْتُونٌ -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে- বিপদগ্রস্ত হওয়া, উন্মাদ হওয়া, ধন-সম্পদহারা বা জ্ঞানহারা হওয়া, পাগল বা বিকারগ্রস্ত ওয়া। অর্থাৎ কে প্রকৃত জ্ঞানবান, সফলকাম; আর কে উন্মাদ ও ব্যর্থ তা অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে। সময়ই বলে দেবে যে, সূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সফলকাম এবং প্রকৃত জ্ঞানী আর কাফেররা ছিল ব্যর্থ এবং উন্মাদ-পাগল। -[কাবীর]

অনুবাদ :

٨. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ .

৮. সুতরাং আপনি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করবেন না।

٩. وَدُّوْا تَمَنَّوْا لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ تُدْهِنُ تَلِيْنُ لَهُمْ فَيُدْهِنُوْنَ يَلِيْنُوْنَ لَكَ وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى تُدْهِنُ وَاِنْ جُعِلَ جَوَابُ التَّمَنِّىْ الْمَفْهُوْمِ مِنْ وَدُّوْا قُدِّرَ قَبْلَهُ بَعْدَ الْفَاءِ هُمْ .

৯. তারা কামনা করে আশা করে যদি لَوْ অব্যয়টি মাসদারিয়্যাহ নমনীয় হন আপনি তাদের প্রতি বিনম্র হন, তবে তারা নমনীয় হবে আপনার প্রতি বিনম্র হবে يُدْهِنُوْنَ শব্দটি تُدْهِنُ -এর প্রতি عَطْف হয়েছে। আর যদি তাকে جَوَاب تَمَنِّىْ রূপে গণ্য করা হয় যা وَدُّوْا হতে উপলব্ধিত হয়; তবে يُدْهِنُوْنَ -এর পূর্বে فَاء -এর পরে একটি هُمْ উহ্য গণ্য করা হবে। অর্থাৎ فَهُمْ يُدْهِنُوْنَ

١٠. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ كَثِيْرِ الْحَلْفِ بِالْبَاطِلِ مَّهِيْنٍ حَقِيْرٍ .

১০. আর অনুসরণ করো না সেই ব্যক্তির যে অধিক শপথকারী অপ্রয়োজনে অধিক শপথকারী, যে লাঞ্ছিত তুচ্ছ ও নগণ্য।

١١. هَمَّازٍ عَيَّابٍ اَىْ مُغْتَابٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ سَاعٍ بِالْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلٰى وَجْهِ الْاِفْسَادِ بَيْنَهُمْ .

১১. যে পরচর্চাকারী নিন্দাকারী অর্থাৎ পশ্চাতে নিন্দাকারী। যে একের কথা অন্যের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কথা লাগিয়ে বেড়ায়।

١٢. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ بَخِيْلٍ بِالْمَالِ عَنِ الْحُقُوْقِ مُعْتَدٍ ظَالِمٍ اَثِيْمٍ اٰثِمٍ .

১২. যে কল্যাণে বাধাদানকারী হক আদায়ে সম্পদে কার্পণ্যকারী যে সীমালঙ্ঘনকারী অত্যাচারী, পাপিষ্ঠ পাপাচারী।

١٣. عُتُلٍّ غَلِيْظٍ جَافٍ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ دَعِىٍّ فِىْ قُرَيْشٍ وَهُوَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ اِدَّعَاهُ اَبُوْهُ بَعْدَ ثَمَانِىْ عَشَرَةَ سَنَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَا نَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى وَصَفَ اَحَدًا بِمَا وَصَفَهُ مِنَ الْعُيُوْبِ فَاَلْحَقَ بِهٖ عَارًا لَا يُفَارِقُهُ اَبَدًا وَتَعَلَّقَ بِزَنِيْمٍ الظَّرْفُ قَبْلَهُ .

১৩. রূঢ় স্বভাব কঠোর ও সঙ্গি-সাথীকে কষ্টদানকারী তদুপরি কুখ্যাত কুরাইশদের মধ্যে যে এ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। আর সে হলো অলীদ ইবনে মুগীরা, যার পিতা আঠার বছর পর তাকে সন্তানরূপে স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমার জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার যে পরিমাণ নিন্দাবাদ করেছেন, তদ্রূপ আর কারও করেছেন কিনা? সুতরাং এ দুর্নাম তার চিরসাথী হয়েছে। আর بَعْدَ ذٰلِكَ যরফ যা زَنِيْم এর সাথে মুতা'আল্লিক।

١٤. اِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ اَىْ لِاَنْ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ .

১৪. এ জন্য যে, সে সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। اَنْ শব্দটি لِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত, তার সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যে নির্দেশনার সাথে।

١٥. إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ قَالَ هِيَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اَىْ كَذَّبَ بِهَا لِإِنْعَامِنَا عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ وَ فِىْ قِرَاءَةٍ ءَأَنْ بِهَمْزَتَيْنِ مَفْتُوْحَتَيْنِ .

১৫. যখন তার নিকট আমার আয়াত পঠিত হয় কুরআন, সে বলে এটা পূর্ববর্তীগণের রূপকথা অর্থাৎ সে তৎপ্রতি মিথ্যা আরোপ করে। তার উপর আমার উল্লিখিত অনুগ্রহরাজির কারণে। আর أن শব্দটি ءأن দু'টি হামযায়ে মাফতূহাহ-এর মাধ্যমে এক কেরাতে পড়া হয়েছে।

١٦. سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ سَنَجْعَلُ عَلٰى أَنْفِهٖ عَلَامَةً يُعَيَّرُ بِهَا مَا عَاشَ فَخُطِمَ أَنْفُهٗ بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ .

১৬. অচিরেই আমি তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দিবো তার নাসিকায় এমন চিহ্ন করে দিবো, যাতে চিরদিন সে লজ্জিত থাকবে। বদর যুদ্ধের দিন তরবারি দ্বারা তার নাসিকায় দাগ দেওয়া হয়েছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ : فَيُدْهِنُوْنَ আতফ হয়েছে تُدْهِنُ -এর উপর। অর্থাৎ فَهُمْ يُدْهِنُوْنَ আর لَوْ -এর জওয়াব উহ্য। অনুরূপভাবে وَدُّوْا -এর মাফঊলও উহ্য। অর্থাৎ وَدُّوْا إِدْهَانَكَ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ এটাও হতে পারে যে, فَيُدْهِنُوْنَ উহ্য খবরের মুবতাদা হয়ে لَوْ -এর জওয়াব হবে। শর্ত এবং জাযা وَدُّوْا -এর মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهٗ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ : বাক্যটি মুতা'আল্লিক হয়েছে لَا تُطِعْ ফে'ল -এর সঙ্গে। কোনো কোনো কেরাতে أَنْ -কে إِنْ পড়া হয়েছে। إِنْ যদি شَرْطِيَّة হয় তবে এটার খবর হচ্ছে উহ্য। মূলে ছিল إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ يَكْفُرُ عَلَيْهِ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ বাক্যটি مُسْتَانِفَة যা نَهِىْ -এর কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের সাথে এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক : আল্লাহ তা'আলা পূর্বে কাফেরদের আচরণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তারা যে উন্মাদনার অভিযোগ আনয়ন করেছে এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যে কথাবার্তা বলেছে অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। তাঁর দীন ও নবীর চরিত্রকে সুমধুর করেছেন– তা উল্লেখ করেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে কাফেরদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তাদের ব্যাপারে নমনীয়তা গ্রহণ না করার জন্য নবীকে জানিয়ে দিচ্ছেন, যদিও তাঁর অনুসারীর সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় অতি নগণ্য। কেননা এটা মাক্কী জীবনের প্রথম দিকের সূরা। এখানে কাফেরদের ব্যাপারে, তাদের মূর্তিপূজার ব্যাপারে পরিষ্কার ও কাটছাঁট কথা বলার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে দেওয়া হয়েছে। –[কাবীর]

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ الخ-এর শানে নুযূল : আবূ হাতেম আল্লামা সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, উপরিউক্ত ৯নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কার প্রখ্যাত দুষ্ট আখনাস ইবনে শোরায়েককে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়। বিশিষ্ট তাফসীরকারক কালবী থেকেও ইবনে মুনযির অনুরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। মুজাহিদ (র.)-এর মতে উপরিউক্ত আয়াত আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের পরিচয়দানে অবতীর্ণ হয়।

অথবা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কাছে যখন উপরিউক্ত ১০-১১নং আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখনও আমরা বঞ্চিত লোকটিকে চিনতে পারিনি। পরিশেষে যখন তাকে জারজ নামে আখ্যায়িত করা হয় তখনই আমরা তাকে সঠিকভাবে চিনতে পারলাম। তখন বুঝতে পারলাম যে, সে ব্যভিচারপ্রসূত জারজ সন্তান। –[লোবাব]

অথবা, হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, এ আয়াতগুলো ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আঠার বছর পর তার পিতা মুগীরা তাকে নিজের সন্তান বলে স্বীকার করে। –[বায়যাবী, মা'আলিম]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ : "তারা চায় আপনি নমনীয় হোন, তবে তারাও নমনীয় হবে।" এটাই দর কষাকষি। যেমন সাধারণ মানুষ লেনদেন ও ব্যবসায়ে করে থাকে; কিন্তু আকীদা ও ব্যবসার মাঝে বিরাট ব্যবধান! আকীদার ধারক তার আকীদার ব্যাপারে সামান্য ছাড় দিতে কখনও প্রস্তুত নয়। তার আদর্শ তার নিকটে সবচেয়ে বড়। এ ব্যাপারে সে সব কিছুকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত; কিন্তু তার আকীদা-আদর্শকে সে কখনও ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। কাফেররা নবীর নিকট অনেক প্রস্তাব ও প্রলোভন নিয়ে এসেছিল। সুন্দরী নারী, অর্থসম্পদ, দেশের বাদশাহী, আরো কত লোভনীয় প্রস্তাব; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব কিছুকে আদর্শের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাঁর আদর্শের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, যদি আমার এক হাতে চন্দ্র ও অন্য হাতে সূর্য এনে দাও তবুও আমি আমার আদর্শ প্রচার থেকে বিরত হবো না। আমার আদর্শের ব্যাপারে কোনোই আপোষ নেই। নবীর নিকট থেকে তারা আদর্শের ব্যাপারে যে নমনীয়তা আশা করে তা কখনো সম্ভবপর নয়। দুনিয়াবী কাজে তিনি অত্যন্ত নরম; কিন্তু দীনের ব্যাপারে তিনি পাহাড়ের চেয়েও অনড়, ইস্পাতের চেয়েও কঠিন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى حَلَّافٍ : এটা حَلَّافٍ إِسْم فَاعِلْ مُبَالَغَه -এর শব্দ অর্থাৎ বেশি বেশি কসমকারী। মিথ্যাবাদীরাই অধিক শপথ করে থাকে। কথায় বলা হয়, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। তারা অধিকাংশ মিথ্যা কথা বলে থাকে। তাই তারা মিথ্যাকে আড়াল করার জন্য অধিক কসম করে। মানুষকে তার প্রতি আহ্বান করতে সে চেষ্টা করে। নবুয়তের যুগে এহেন প্রকৃতির লোক বহু সংখ্যক ছিল। সুতরাং বর্তমানেও এ ধরনের লোকদের হতে দূরে সরে থাকা একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ও وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ -এর মধ্যে نَهْي কি تَحْرِيْم -এর জন্য? : উক্ত আয়াতে যে কাফেরদের অনুসরণ করতে দু'বার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সম্পর্কে যেহেতু কোনো প্রকার قَرَائِنْ পাওয়া যায় না, সুতরাং তা تَحْرِيْم হারামের জন্যই সাব্যস্ত হবে। তবে এরা যেহেতু মিথ্যাচারী ও সত্য হতে মানুষকে স্পষ্ট বিরতকারী। সুতরাং যেহেতু আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য নিষেধ করা হচ্ছে এটা অমান্য করা অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করা হারাম হবে। لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ মা'আরিফ গ্রন্থকারও এটাকে হারামের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ : সে লোক গালাগালি করে, চুগলি করে বেড়াতে বেশি অভ্যস্ত অর্থাৎ মানুষকে কথায় কথায় দোষী সাব্যস্ত করতে চায়, সামনে মানুষকে খুবই ভালো বলে, পিছনে খুবই মন্দ বলে। এটাই هَمَّازٍ -এর অর্থ এটাকে গিবত বলা হয়। আর চুখলি করার অর্থ হলো– نَقْلُ الْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلٰى وَجْهِ الْإِفْسَادِ بَيْنَهُمْ মানুষের মাঝে এমন কিছু কথাবার্তা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে যাতে মানুষে মানুষে খুবই বিবাদ ঘটে। এরূপ লোককে نَمَّامٌ বলা হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ চুগলখোর বেহেশেতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর গিবত সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا সুতরাং কুরআন ও হাদীসের লক্ষ্যে উভয় কার্যই নিন্দনীয় ও হারাম। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে– الغيبة اشد من الزنا আরও হুযূর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো গিবত করল সে যেন তার মায়ের সাথে জেনা করল।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ : উক্ত আয়াতের দু'টি তাৎপর্য হতে পারে এবং এই অর্থদ্বয় خَيْر শব্দের অর্থের বিভিন্নতার কারণেই হতে পারে।

১. যদি خَيْر শব্দের অর্থ ধন-মাল নেওয়া হয়, তখন আয়াতের অর্থ হবে সে লোকটি ভয়ানক কৃপণ ও বখিল। কাউকে একটা কুটাকড়ি পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত নয়।
২. আর যদি ভালো ও কল্যাণ অর্থ নেওয়া হয়, তখন আয়াতের অর্থ হবে সে লোকটি সকল প্রকার ভালো, কল্যাণময় এবং সকল প্রকার নেককাজের প্রতিবন্ধক। ইসলামের ন্যায় এক ব্যাপক কল্যাণময় জীবনাদর্শ হতে সে লোকদেরকে বিরত রাখছে। অর্থাৎ তা গ্রহণ করতে বাধা দান করছে। এই বাধা দানে সে খুবই তৎপর। -[খাযেন, মাদারিক]

مُعْتَدٍ -এর মর্মার্থ : مُعْتَدٍ অর্থ– সীমা অতিক্রমকারী, সীমালঙ্ঘনকারী। হক এবং ন্যায়-নীতির সীমা অতিক্রমকারী। সে নবী করীম ﷺ -এর উপর সীমালঙ্ঘনকারী, মুসলমানদের এবং ইসলামের ধারক-বাহকদের ব্যাপারে সীমা অতিক্রমকারী। সে লোকদের দীনের পথে, হেদায়েতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সীমালঙ্ঘন করা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অভ্যাস। ইসলাম সব ধরনের সীমালঙ্ঘনকে নিষেধ করে। খানাপিনাতেও ইসলামের সীমারেখা মেনে চলা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, "তোমরা হালাল রিজিক খাও এবং এতে বাড়াবাড়ি করো না' কেননা ইনসাফ এবং ভারসাম্য রক্ষা করাটাই ইসলামের প্রকৃতি, ইসলামের মূল শিক্ষা। -[যিলাল]

عُتُلٍّ -এর অর্থ : عُتُلٍّ শব্দটি এমন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যে খুব দুর্ধর্ষ ও বেশি পানাহারকারী, আর এটার সাথে সাথে ঝগড়াটে, চরিত্রহীন ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। কতকের মতে অশ্লীল গালিগালাজকারী ব্যক্তির বেলায় এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার কতেক বলেছেন, কুফরিতে দৃঢ় প্রত্যয়কারী লোককে বুঝাবার জন্য এ শব্দের ব্যবহার হয়। -[খাযেন]

زَنِيْم শব্দের মর্মার্থ : زَنِيْم শব্দটি আরবি ভাষায় ব্যভিচারপ্রসূত জারজ সন্তানকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যে কোনো পরিবারের লোক না হওয়া সত্ত্বেও সে তারই অন্তর্ভুক্ত থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'যানীম' অর্থ জারজ সন্তান। –(রুহুল মা'আনী) সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, স্বীয় দুষ্কৃতির কারণে সর্বজন পরিচিত ও প্রখ্যাত লোককে বুঝাবার জন্যও এ শব্দের ব্যবহার হয়। এখানে যে কয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মনে হয় লোকটি মক্কার খুব প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত লোক ছিল। যদিও আল-কুরআন তার নাম উল্লেখ করেনি। ফলে তাফসীরকারকদের মধ্যে নাম নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। শানে নুযূলে সম্ভাব্য নামগুলোর আলোচনা রয়েছে। হযরত ইকরিমা (র.) زَنِيْم -এর ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত কবিতা বর্ণনা করেছেন– زَنِيْمٌ لَا يُعْرَفُ مَنْ اَبُوْهُ * بَغِى الْاُمِّ ذُوْ حَسَبٍ لَئِيْمٍ [জারজ ঐ ব্যক্তি যার পিতা অজ্ঞাত, মা ব্যভিচারিণী, এমন ব্যক্তি নিকৃষ্ট বংশের।]

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত নিকৃষ্ট অভ্যাসসমূহ : আলোচ্য আয়াতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার ১০টি নিকৃষ্ট অভ্যাসে আলোচনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

(١) حَلَّافٍ (٢) مَهِيْنٍ (٣) هَمَّازٍ (٤) مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ (٥) مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ (٦) مُعْتَدٍ (٧) اَثِيْمٍ (٨) عُتُلٍّ (٩) زَنِيْمٍ (١٠) اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

অর্থাৎ ১. মিথ্যাভাবে অধিক শপথ করা, ২. নির্লজ্জ হওয়া, ৩. অন্যের দোষ খুঁজে বের করা, ৪. চুগলখোরি করা, ৫. সৎকার্যসমূহ হতে আল্লাহর বান্দাদেরকে প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ করা, ৬. আল্লাহর নিয়মের অবাধ্য চলা, ৭. গুনাহের কার্য করা, ৮. নিকৃষ্ট অভ্যাসের অনুকরণকারী হওয়া, ৯. জেনার সন্তান হওয়া, ১০. আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে পুরাতন যুগের কেসসা-কাহিনী বলে গালি দেওয়া। দশম প্রকারের বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

মাদারেক গ্রন্থকার বলেন–হযরত ইয়াযীদ, ইয়াকূব ও সাহল (র.) বলেছেন, যেহেতু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ নবী করীম ﷺ-কে একটি মিথ্যা অপবাদ দিল অর্থাৎ مجنون বলে গালি দিল, এটার প্রতিফলে আল্লাহ তাকে দশটি গালি দিলেন, অর্থাৎ দশটি অপবাদ দিলেন। এটার কারণ এই যে, নবী করীম ﷺ-এর উপর যদি একবার দরূদ পাঠ করা হয়, তবে দরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে দশটি রহমত প্রেরণ করা হয় এবং দশটি পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কাজেই মহান আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়েছে যে, তার একটির প্রতিউত্তরে ১০টি বদ স্বভাবের উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا .... عَلَى الْخُرْطُوْمِ : আল্লাহ তা'আলা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ সম্বন্ধে বলেন– যখন আমার নাজিলকৃত আয়াতসমূহ তার নিকট পড়ে শুনানো হয়, তখন হঠকারিতার ছলে সে বলে, এটাতো কেবল পুরানা যুগের কেসসা-কাহিনী মাত্র। এ ধরনের নিকৃষ্টতম মন্তব্য করার কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে তাদের হতে সতর্ক করে দিয়েছেন।

প্রথমোক্ত আয়াতটির সম্পর্ক যদি পূর্ব হতে চলে আসা কথার সাথে ধরা হয় তখন আয়াতের অর্থ এরূপ হতে পারে যে, এ ব্যক্তির দাপট ও প্রভাব এ জন্য যে, সে বিপুল ধন-জনের অধিকারী, আদৌ এমন লোককে মেনে নেবেন না। [তাহলে ধর্মের কলঙ্ক হতে পারে।] অথবা, পরবর্তী বাক্যের (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ) সাথে ও সম্পর্কে করা যাতে পারে। তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে এই যে, বহু ধন-জনের মালিক হওয়ার দরুন লোকটি খুব অহংকারী হয়ে পড়েছে। এ কারণে কুরআনের আয়াত তাকে শুনানো হলে সে অহংকারে অন্ধ হয়ে বলে উঠে, এটাতো আগেকার যুগের লোকদের কথাবার্তা।

আর সে লোকটি যেহেতু নিজেকে খুব উঁচু দরের লোক বলে মনে করত এ কারণে তার নাকটিকে শুঁড় বলা হয়েছে। নতুবা শুঁড় যে কেবল হাতির থাকে তা কারো অজানা নয়। আর আল্লাহ বলেছেন, তাকে নাকের উপর দাগ লাগিয়ে দিবো। অর্থাৎ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে দেবো। অর্থাৎ তাকে ইহকাল ও পরকাল এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো যা হতে সে কখনো নিষ্কৃতি পাবে না। –[মা'আরিফ]

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ কখন কার জন্য বলা হয়েছে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. কিয়ামতের দিন তার নাকের উপর কুফরির কারণে অপদস্থমূলক এমন নিশান লাগিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সে খুব অসম্মানিত হবে।
২. অথবা, مُوْضِحُ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঐ ব্যক্তি ছিল ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ। সে কুরাইশ বংশের নেতৃবর্গের একজন লোক ছিল। এটার ذِلَّتْ দুনিয়াতেও হতে পারে অথবা আখেরাতে। যদি দুনিয়াতে হয় তবে বদরের যুদ্ধেই হয়েছে। কারণ সেদিন তার নাকের মধ্যে খুবই জখম হয়েছিল এবং আল্লাহর قَوْل সত্যায়িত হয়েছিল। আখেরাতের বিষয়ে কোনো কথা বলা হয়নি এবং বদরের দিনের সে জখমটি তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বহাল রইল। –[সাবী]

خُرْطُوْم অর্থ : এটার অর্থ– শুঁড়, হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার নাসিকাকে শুঁড় বলা হয়েছে। নতুবা, কোনো মানুষের শুঁড় হতে পারে না। যেমন সাধারণ পরিভাষায় কোনো ব্যক্তির চেহারাকে تهوبزى (ব্যাঙ্গার্থে মুখ) বলা হয়। অথচ কুকুরের ক্ষেত্রে تهوبزى শব্দ ব্যবহার করা হয়। আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (র.) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। –[খাযেন, বায়হাকী]

অনুবাদ :

১৭. إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ إِمْتَحَنَّا اَهْلَ مَكَّةَ بِالْقَحْطِ وَالْجُوْعِ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْبُسْتَانِ إِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا يَقْطَعُوْنَ ثَمَرَتَهَا مُصْبِحِيْنَ وَقْتَ الصَّبَاحِ كَيْلَا يَشْعُرَ لَهُمُ الْمَسَاكِيْنَ فَلَا يُعْطُوْنَهُمْ مِنْهَا مَا كَانَ اَبُوْهُمْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْهَا .

১৭. আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি মক্কাবাসীকে আমি দুর্ভিক্ষ ও অনাহার দ্বারা পরীক্ষা করেছি। যেভাবে আমি পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে বাগানের অধিপতিদেরকে। যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা আহরণ করবে বাগানের ফল কর্তন করবে প্রত্যুষে প্রভাতকালে, যাতে দরিদ্রগণ তা টের না পায়। সুতরাং তা হতে তাদেরকে দিতে হবে না যা তাদের পিতা দরিদ্রদেরকে তা হতে দিত।

১৮. وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ فِيْ يَمِيْنِهِمْ بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ اَيْ وَشَانُهُمْ ذٰلِكَ .

১৮. আর তারা ইচ্ছা প্রার্থনা করেনি তাদের শপথে ইনশাআল্লাহ যোগ করেনি। আর বাক্যটি মুসতানিফ বাক্য। অর্থাৎ আর তাদের অবস্থা এরূপ।

১৯. فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ نَارٌ اَحْرَقَتْهَا لَيْلًا وَهُمْ نَآئِمُوْنَ .

১৯. অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে অর্থাৎ রাত্রে সেই বাগানে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল। যখন তারা নিদ্রিত ছিল।

২০. فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ كَاللَّيْلِ الشَّدِيْدِ الظُّلْمَةِ اَيْ سَوْدَاءَ .

২০. ফলে তা তিমির রজনীতুল্য হয়ে পড়ল প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রির ন্যায় হলো, অর্থাৎ জ্বলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

২১. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ .

২১. প্রত্যুষে তারা একে অন্যকে ডেকে বলল।

২২. اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ غَلَّتِكُمْ تَفْسِيْرٌ لِلتَّنَادِيْ اَوْ اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ اَيْ بِاَنْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ مُرِيْدِيْنَ الْقَطْعَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ .

২২. তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের বাগানে চলে তোমাদের শস্যক্ষেত্রে, এটা تَنَادَوْا-এর ব্যাখ্যা অথবা اَنْ অব্যয়টি مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ بِاَنْ যদি তোমরা ফল আহরণকারী হও ফল কর্তনের ইচ্ছা কর। শর্তের জবাবের প্রতি পূর্ববর্তী বক্তব্য নির্দেশ করছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ : বাক্যে لَيَصْرِمُنَّهَا জওয়াবে কসম, مُصْبِحِيْنَ হাল হয়েছে لَيَصْرِمُنَّهَا হতে। وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ জুমলায়ে মুস্তানাফা, فَتَنَادَوْا শব্দটি اَقْسَمُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে, وَهُمْ نَائِمُوْنَ বাক্যটি মহল্লে নসবে আছে حَالٌ হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ اَنِ اغْدُوْا : -এর মধ্যস্থ اَنْ মাসদারিয়া, কেউ কেউ বলেন, মুফাসসিরা। اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ শর্ত, তার জওয়াব فَاغْدُوْا উহ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর সম্পর্ক : মক্কার যেসব কাফের দুষ্ট-দুরাচার লোক নিজেদের ধন-সম্পদের কারণে খুব অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে মহানবী ﷺ -এর দীনের দাওয়াতের বিরোধিতা করত এবং পদে পদে দীনের দাওয়াতি কাজে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করত; আর কুরআনকে সেকালের রূপকথা এবং মহানবী ﷺ -কে উন্মাদ বলে আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেসব আলোচনার পর এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মুখে ইয়েমেন এলাকার ধ্বংসকৃত বাগানটির দৃষ্টান্ত পেশ করে বলছেন– বাগানের মালিকগণকে বাগানের শস্য সম্পদ দ্বারা আমি যেভাবে পরীক্ষা করেছি, অনুরূপভাবেই আমি তোমাদেরকেও ধন-সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ও প্রাচুর্য দান করে পরীক্ষা করছি। তোমরা যদি এ প্রাচুর্যের দর্পে গর্বিত হয়ে আমার দীনকে অবহেলা কর, নবীর দাওয়াতি কাজে বাধা দাও এবং তাঁর নামে এ কটূক্তি কর, তবে বাগানের মালিকদের ন্যায় তোমাদের ধন-সম্পদকেও সমূলে ধ্বংস করে ছাড়ব। অতএব সাবধান! ঐ বাগানের ঘটনাটি হতে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। হাদীসে এসেছে– মক্কাবাসীদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়ার কারণে এরূপ দুর্ভিক্ষ এসেছিল, যেরূপ বাগানের মালিকদের উপর দুর্ভিক্ষ এসেছিল।

বাগানের ঘটনা : বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, ইয়েমেন প্রদেশের কোনো একটি বাগানের মালিক ছিল একজন আল্লাহভীরু লোক। সে বাগানের ফসলের নির্দিষ্ট একটি অংশ গরিব-মিসকিনগণকে দান করত; কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র তার মালিক হলো। তারা ভাবল যে, আমাদের লোকসংখ্যা অনেক। আমাদের পরিবার-পরিজনের তুলনায় বাগানের ফসল সম্পদ খুবই অপ্রতুল। সুতরাং গরিব-মিসকিনগণকে ফসলের নির্দিষ্ট একটি অংশ দান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়; কিন্তু কোনো এক ছেলে এই চিন্তাধারার বিপরীত ছিল। সে গরিব-মিসকিনের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। তবে তার কথায় অন্যান্যরা কান দিল না। তারা প্রতিজ্ঞা করল যে, আগামী দিন সকালবেলা আমরা ভিক্ষুক দল আসবার পূর্বেই গিয়ে ফসল কেটে আনবো; কিন্তু এ শপথ ও প্রতিজ্ঞায় আল্লাহর ইচ্ছাকে শামিল করল না। অর্থাৎ তারা এ কথা বলল না যে, আল্লাহ চাইলে [ইনশাআল্লাহ] আমরা আগামীকল্য সকাল সকাল গিয়ে ফসল কেটে আনবো। এ ইনশাআল্লাহ না বলা এবং গরিব-মিসকিনগণকে না দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের অপরাধে তাদের ঘুমে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগানের উপর গজব নাজিল করলেন। ফলে প্রচণ্ড মরুঝঞ্ঝা বায়ু বাগানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাগানের ফসলকে মথিত করে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ ও ধ্বংস করে ফেলল। বাগানটি দেখলে মনে হতো যে, মথিত হয়ে চর্বিত ফসলের ন্যায় হয়ে গেছে। অতঃপর অতি প্রত্যুষে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, তোমরা ফসল কাটতে চাইলে সকাল সকাল বাগানে চলো। ভিক্ষুকের দল ভিড় জমাবার পূর্বেই ফসল তুলে আনতে হবে। অতঃপর তারা বাগানে যেয়ে অবস্থা মনে করল যে তারা ভুল করেছে, এটা তাদের বাগান নয়। কারণ তাদের বাগানতো এই রকম ছিল না। এটাতো ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

قَوْلُهُ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ .... مُصْبِحِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে পূর্বযুগের একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করে মক্কাবাসীদেরকে একটু হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। সুতরাং আল্লাহ বলেন, আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেভাবে বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যখন তারা পরস্পর হলফ করে এ অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, এবারের সুযোগে তারা খুবই ভোরবেলায় যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে নেবে। যাতে ফকির-মিসকিনগণ সংবাদ না পায়। আর তাদের এ অঙ্গীকারে তারা কৃতকামী হবে বলে তাদের এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা ইনশাআল্লাহ বলতেও ভুলে গেল। অর্থাৎ বলার তৌফিক হয়নি।

بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ আয়াতে মক্কাবাসীদের পরীক্ষা করার অর্থ : মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষা করার অর্থ এও হতে পারে যে, আয়াতে বর্ণিত বাগানওয়ালা সম্প্রদায়কে যেরূপ নিয়ামত দ্বারা সুশোভিত করেছি। এর শুকরিয়া আদায় না করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেছে এবং তাদের উপর হতে নিয়ামত হরণ করে নেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে মক্কাবাসীদের উপর আল্লাহর মহান নিয়ামত "হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে তাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করা হয়েছে" এটার তুল্য নিয়ামত আর প্রয়োজন নেই। তদুপরি তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত বরকত দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তির জীবন যাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ সকল হতে আল্লাহর পরীক্ষা হলো, তারা এগুলো তাঁর নিয়ামত বলে স্বীকার করে কিনা এবং রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করে কিনা, অথবা কুফরির উপর অটল থাকে।

অথবা, তাদের বাগানওয়ালাদের ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত ছিল, যদি এটা দ্বারা নসিহত কবুল না করে তবে তাদের উপরও তেমিনভাবে আল্লাহর গজব নাজিল হতে পারে। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ)

بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا الخ -এর উক্ত ব্যাখ্যা ঐ সময় সঠিক প্রতীয়মান হবে যখন এ আয়াতগুলোকে মাক্কী আয়াত বলে সাব্যস্ত করা হয়। তবে বহু সংখ্যক তাফসীরকার এ আয়াতগুলোকে মাদানী আয়াত বলেছেন। তখন 'পরীক্ষা' দ্বারা মক্কার দুর্ভিক্ষের শাস্তি উদ্দেশ্য করেছেন। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বদদোয়ার কারণে তাদের উপর পতিত হয়েছিল। সে দুর্ভিক্ষের দিনে তারা ক্ষুধার জ্বালায় মরতে লাগল। মৃত জীবজন্তু ও বৃক্ষের ছালসমূহ পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছে, আর এ অবস্থা যা ঘটনাটি হিজরতের পরেই হয়েছে।

مَحَلِّ جَنَّةٍ সম্পর্কে দু'টি জরুরি কথা : উক্ত আয়াতে كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ বলে যে বাগানটির প্রতি ইশারা কর হয়েছে। সে বাগানটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আরও কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে ইয়েমেনেই ছিল। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত মতে, উক্ত বাগানটি . صَنْعَا নামক ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ শহর বা রাজধানী হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। কারো কারো মতে, উক্ত বাগানটি হাবশায় অবস্থিত ছিল। –[ইবনে কাছীর] বাগানের মালিগণ আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার কিছু দিন পরেই হয়েছিল। –[কুরতুবী, মা'আরিফ]

আর আয়াতের বর্ণনা মতে এ কথাই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তারা বাগানওয়ালা হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তবে আয়াতের বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, তাদের নিকট কেবল বাগানই ছিল না; বরং বাগানের সাথে ক্ষেতি-জিরাত করার জায়গাও ছিল এবং ক্ষেতি-জিরাতও করত। সুতরাং তখন বলতে হবে যে, হতে পারে বাগানের সাথে সাথে ক্ষেতও ছিল তবে ক্ষেতের কথা প্রকাশ লাভ করেনি। বাগানের কথাই প্রসিদ্ধ হওয়াতে তাদের নাম اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ হিসেবেই প্রসিদ্ধ হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ানের রেওয়ায়েতে উক্ত বাগানকে ضَرَوَانُ বলা হতো। আর মৃতব্যক্তির ওয়ারিশ হিসেবে তিন ছেলে ছিল। অন্যান্য রেওয়ায়েত মতে ৫ ছেলে ছিল। আর বাগানের উৎপন্ন ফসলাদি দ্বারা তাদের বছরের খরচ মেটাতে খুবই কষ্ট হতো, তাই তারা ফকিরদেরকে দান করতে অসম্মত হলো। হযরত থানবী (র.)-এর রেওয়ায়েতে কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ وَلَايَسْتَثْنُوْنَ : لَا يَسْتَثْنُوْنَ-এর অর্থ হলো, তারা . اِسْتِثْنَا করল না, অর্থাৎ ইনশাল্লাহ বলল না। কেউ কেউ বলেন, . اِسْتِثْنَا না করার অর্থ, তারা সম্পূর্ণরূপে ফসল নিয়ে নিত, ফকিরদের হিস্‌সা তাদের পিতার ন্যায় পৃথক করত না। –[মাযহারী]

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ প্রকাশ্যত شَرْط -এর স্থলে রয়েছে তথাপিও তাকে . اِسْتِثْنَا কেন বলা হয়েছে? : এটার উত্তর এই যে, যদিও وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ প্রকাশ্যত শর্ত এবং তাকে . اِسْتِثْنَا বলা হয়েছে, তবুও বাস্তবে এটা . اِسْتِثْنَا এবং শর্ত যাই বলা হোক উভয় অর্থে একই হবে। আর এটা لَاَخْرُجَنَّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ এবং وَلَا اَخْرُجُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ -এর অনুরূপ অর্থাৎ সুরতে দু'টি বাক্য হলেও উভয় বাক্যের অর্থ মূলত একই দাঁড়াবে। –[মাদারিক]

قَوْلُهُ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ .... كَالصَّرِيْمِ -এর ব্যাখ্যা : অতঃপর তার উপর আপনার প্রভুর পক্ষ হতে এক আগমনকারী (طَائِفٌ) আগমন করল, সে সময় তা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। অতঃপর সকালবেলায় বাগানটি শস্য কাটা ক্ষেতের মতো পড়ে রইল।

طَائِفٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতে طَائِفٌ বলতে যে কোনো এক প্রকার শাস্তি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। –[বায়যাবী]

আর কেউ কেউ বলেন, طَائِفٌ দ্বারা উক্ত আয়াতে অগ্নি (نَارٌ) -কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ এক প্রকার আগুন এসে জ্বালিয়ে তছনছ করে দিয়েছে।

কাবীর গ্রন্থকার বলেন, طَائِفٌ বলতে রাত্রিকালে আগমনকারী শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে। আর طَائِفٌ -এর অপর একটি অর্থ হলো প্রদক্ষিণকারী, রাত্রিবেলায় উক্ত অগ্নিটি তাদের বাগানের চতুর্দিকে বেষ্টন করে প্রদক্ষিণকারীর মতো প্রদক্ষিণ করে সমস্ত বাগানকে ছাই করে দিয়েছিল। এ অনুসারে এটাকে (عَذَابٌ -কে) طَائِفٌ বলা হয়েছে। –[মাদারিক, কাবীর]

قَوْلُهُ كَالصَّرِيْمِ : صَرْمٌ শব্দের অর্থ হলো– ফল, ফসল বা এমন ধরনের কোনো কিছু কর্তন করা। আর صَرِيْمٌ অর্থ مَصْرُوْمٌ বা مَقْطُوْعٌ আয়াতের مَطْلَبُ এই যে, আগুন সেই বাগান এমন করে ছেড়েছে, যেভাবে ফসল কাটার পর জমিন খালি পড়ে থাকে।

صَرِيْمٌ -এর এক অর্থ– রাত্র, তখন অর্থ হবে রাত যেভাবে কালো অন্ধকার হয়ে যায়, তদ্রূপ উক্ত ক্ষেতও পুড়ে কালো হয়ে গেছে। –[মা'আরিফ]

كَالصَّرِيْمِ -এর আরেক অর্থ হলো كَالصُّبْحِ [মাদারেক] অর্থাৎ জমিন বৃক্ষহীন হওয়ার পর সাদা হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : "فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ..... صَارِمِيْنَ" : এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের যে পরিকল্পনা ছিল এবং তা তারা বাস্তবায়ন কিভাবে করতে যাচ্ছিল সেই চিত্র তুলে ধরেছেন।

অনুবাদ :

٢٣. فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ يَتَسَارُّوْنَ.

২৩. অতঃপর তারা চলল, নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে।

٢٤. أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ تَفْسِيْرٌ لِمَا قَبْلَهُ أَوْ أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ بِأَنْ

২৪. যেন আজ তাতে তোমাদের নিকট কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে এটা পূর্ববর্তী বক্তব্যের ব্যাখ্যা। অথবা أَنْ অব্যয়টি مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ بِأَنْ যেন।

٢٥. وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ مَنْعٍ لِلْفُقَرَاءِ قٰدِرِيْنَ عَلَيْهِ فِيْ ظَنِّهِمْ.

২৫. অতঃপর তারা প্রভাতে যাত্রা করল, নিবৃত্ত করতে দরিদ্রদেরকে বাধাদান করতে সক্ষম হওয়ার ধারণা নিয়ে তাদের ধারণায় তারা এতে সক্ষম এ অবস্থায়।

٢٦. فَلَمَّا رَأَوْهَا سَوْدَاءَ مُحْتَرَقَةً قَالُوْا إِنَّا لَضَآلُّوْنَ عَنْهَا أَيْ لَيْسَتْ هٰذِهٖ ثُمَّ قَالُوْا لَمَّا عَلِمُوْهَا

২৬. অনন্তর যখন তারা তাকে দেখল পুড়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে এমতাবস্থায়। তারা বলল, আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি তা হতে। অর্থাৎ এটা সেই বাগান নয়। অতঃপর যখন তারা নিঃসন্দেহ হলো, তখন বলল।

٢٧. بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ثَمَرَتَهَا بِمَنْعِنَا الْفُقَرَاءَ مِنْهَا.

২৭. বরং আমরা তো বঞ্চিত তার ফল হতে, তা হতে দরিদ্রদেরকে আমাদের নিবৃত্ত করার কারণে।

٢٨. قَالَ أَوْسَطُهُمْ خَيْرُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا هَلَّا تُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ تَائِبِيْنَ.

২৮. তাদের মধ্য হতে মধ্যম ব্যক্তি বলল তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? তোমরা কেন لَوْلَا শব্দটি هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না আল্লাহ তা'আলার, তৎপ্রতি প্রত্যাবর্তনপূর্বক।

٢٩. قَالُوْا سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ بِمَنْعِ الْفُقَرَاءِ حَقَّهُمْ.

২৯. তখন তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা মহিম ঘোষণা করছি। আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম দরিদ্রদেরকে তাদের হক হতে বঞ্চিত করার দরুন।

٣٠. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ.

৩০. তখন তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে আরম্ভ করল।

٣١. قَالُوْا يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكُنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ.

৩১. তারা বলল, হায় يَا হরফে নেদা تَنْبِيْه-এর জন্য। আমাদের দুর্ভোগ ধ্বংস আমরা অবশ্যই অবাধ্যচারী সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

٣٢. عَسٰى رَبُّنَآ أَنْ يُّبْدِلَنَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ لِيَقْبَلَ تَوْبَتَنَا وَيَرُدَّ عَلَيْنَا خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِنَا رُوِيَ أَنَّهُمْ أُبْدِلُوْا خَيْرًا مِنْهَا.

৩২. সম্ভবত অচিরেই আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এটার পরিবর্তে দান করবেন يُبْدِلَنَا শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। এটা অপেক্ষা উত্তম উদ্যান। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হলাম। যাতে তিনি আমাদের তওবা কবুল করেন এবং আমাদের উদ্যান অপেক্ষা উত্তম বাগান আমাদেরকে প্রত্যর্পণ করবেন। বর্ণিত আছে যে, তাদেরকে অপেক্ষাকৃত উত্তম উদ্যান তৎপরিবর্তে প্রদত্ত হয়েছে।

٣٣. كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ الْعَذَابِ لِهٰؤُلَاءِ الْعَذَابُ لِمَنْ خَالَفَ اَمْرَنَا مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ عَذَابَهَا مَا خَالَفُوْا اَمْرَنَا .

৩৩. এরূপই অর্থাৎ এদের শাস্তিদানের ন্যায় শাস্তি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে মক্কাবাসী কাফেরগণের মধ্য হতে আর আখেরাতের শাস্তিই বড় যদি তারা জানতে পারত আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে তবে তারা আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করত না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَ هُمْ يَتَخَافَتُوْنَ : বাক্যটি فَانْطَلَقُوْا -এর ফায়েল হতে হাল হয়েছে। قَادِرِيْنَ মানসূব হয়েছে حَالْ হওয়ার কারণে। قَادِرِيْنَ শব্দ غَدَوْا -এর ফায়েল থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ : كَذٰلِكَ খবর মুকাদ্দাম, اَلْعَذَابُ মুবতাদা মুয়াখখার। খবরকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে حَصْر -এর ফায়েদা দেওয়ার জন্য। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ .... حَرْدٍ قَادِرِيْنَ : উক্ত আয়াতে يَتَخَافَتُوْنَ -এর অর্থ হলো يَتَسَارُّوْنَ বা يَتَشَاوَرُوْنَ বিনা শব্দে বা চুপে কথা বলে, আলোচনা করে। অর্থাৎ তারা এমনভাবে চলমান অবস্থায় কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল যাতে ফকির-মিসকিনগণ তাদের সম্বন্ধে টের না পায়। যে কথা গোপনে বলাবলি করছিল তা হলো তাদের ফসল ক্ষেত বা বাগানে যেন আজ কোনো মিসকিন ঢুকতে না পারে। এ বিষয়ে খুবই চৌকান্না থাকতে হবে।

আর حَرْدٍ শব্দের অর্থ হলো مَنْعٌ এবং غَيْض وَغَضَبْ দেখানো। সুতরাং وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ -এর অর্থ হচ্ছে লোকগুলো নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে এই বুঝে যাচ্ছিল যে, কোনো ফকির-মিসকিনকে কোনো অংশ না দেওয়া আমাদের ক্ষমতার অধীনের কাজ। আর কেউ যদি এসে যায় তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। -(মা'আরিফ) মাদারেক গ্রন্থকার বলেন, غَدَوْا قَادِرِيْنَ اِلٰى جَنَّتِهِمْ بِسُرْعَةٍ قَادِرِيْنَ عِنْدَ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ اَلْقَصْدُ وَالسُّرْعَةُ فِيْهِ অথবা جَدٌّ فِى الْمَنْعِ অর্থ حَرْد ... حَرَامِهَا مَنْفَعَتَهَا عَنِ الْمَسَاكِيْنِ اَوْ هُوَ عَلَمٌ لِلْجَنَّةِ اَىْ غَدَوْا عَلٰى تِلْكَ الْجَنَّةِ قَادِرِيْنَ عَلٰى حَرَامِهَا عِنْدَ اَنْفُسِهِمْ আর মিসকিনদেরকে বাগানে প্রবেশ করা হতে যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তাকে نَهْىٌ عَنِ الْمَسَاكِيْنِ বলা ... يَعْنِىْ لَا تُمَكِّنُوْا مِنَ الدُّخُوْلِ فِيْهِ।

বিভ্রান্তির দশা অপসারিত : তারা পূর্ব সিদ্ধান্তমাফিক খুব দাম্ভিকতা ও অহংকারী মনে সকালবেলা ফসল কাটার জন্য রওয়ানা হলো। আর পরস্পর চুপে চুপে বলাবলি করতে লাগল–সাবধান! আজ যেন কোনো প্রকারে তোমাদের কাছে ভিক্ষুকের দল ভিড় জমাতে না পারে। তারা আসার পূর্বেই ফসল তোলার কাজ শেষ করতে হবে। ভিক্ষুক ও গরিবদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার মনোভাব নিয়ে তারা বাগানে পৌঁছল। বাগানের বিনাশ ও ধ্বংসযজ্ঞ অবলোকন করে বলল– আমরা পথ ভুলে হয়তো অন্য কোনো বাগানে এসেছি। আমাদের বাগানতো এটা নয়। আমাদের বাগান কত সুন্দর, সুজলা-সুফলা শস্যভরা, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু বাগানের চতুর্দিকের সীমানা ও আলামত দেখে তারা চেতনা ফিরে পেল। তাদের নিজেদের গর্ব-অহংকার ও আল্লাহর সাথে নাফরমানি করার কথা মনে হলো। আর বলল, আমাদের উপর আল্লাহর লানত এসেছে, আমাদেরকে ফসল হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। তখন তাদের মধ্যে যে লোকটি স্বভাব-চরিত্রে উত্তম ছিল এবং ভিক্ষুকদের প্রতি সংবেদনশীল ছিল, সে বলল, আমি কি পূর্বে তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে নাফরমানি না করার জন্য বলেছিলাম না? এটা আল্লাহর সাথে নাফরমানিকরণ, ভিক্ষুকগণকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা এবং গর্ব-অহংকারের পরিণতি ছাড়া কিছুই নয়। এখনও সময় রয়েছে, গুনাহ হতে তওবা করো। আল্লাহর মহিমা ঘোষণা এখনও কেন করছ না? সর্বহারা হওয়ার পরই তাদের বিভ্রান্তির দশা কাটল। তারা মনে মনে তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার মহিমা প্রকাশ করছি। আপনিই মহাশক্তিধর। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমরা সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছি। ক্ষমা না করলে আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

قَوْلُهُ تَعَالَى رَأَوْهَا ..... نَحْنُ مَحْرُومُوْ : আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসকৃত বাগান দেখার পর যে অবস্থার সৃষ্টি য়েছিল এবং তারা যে কথোপকথন করেছিল তার কিছুটা চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন। "তারা যখন বাগান দেখল তখন তারা বল, আমরা পথ ভুল করেছি; না বরং আমরা বঞ্চিত।" এটার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তারা যখন ভস্মীভূত বাগান দেখল খন তারা মনে করল, আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে পড়েছি। এটা আমাদের বাগান নয়। পরে যখন তারা ভালোভাবে লক্ষ্য রে দেখল এবং বুঝতে পারল যে, এটাই তাদের বাগান। তখন তারা বলল, আমরাই বঞ্চিত, আমাদের খারাপ নিয়তের কারণে পণতার কারণে আমরা নিজেরাই বঞ্চিত হলাম। দুই. তারা বাগান দেখার পর বলল, আমরা পথভ্রষ্ট। আমরা গরিব-দুঃখীদের ঞ্চিত করার চিন্তায় বিভোর ছিলাম অথচ আমরা তাদের উপকার করতে সক্ষম ছিলাম। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। াজকে আমরাই বঞ্চিত।

قَوْلُهُ تَعَالَى "قَالَ أَوْسَطُهُمْ .... لَوْلَا تُسَبِّحُوْ : আল্লাহ তা'আলা এখানে বাগানের মালিকদের কথা বলতে য়ে তাদের মাঝে যে উত্তম ব্যক্তিটি ছিল তার কথা উল্লেখ করেছেন। সে লোকটি তার সাথীদেরকে যে নসিহত করেছেন তা লে ধরেছেন। أَوْسَطُهُمْ -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। أَوْسَطُهُمْ বলতে তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, তাদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে মধ্যবয়সী। –[রূহুল মা'আনী]

উত্তম ব্যক্তিটি তাঁর সাথীদের বললেন, আমি কি তোমাদের তাসবীহ করার কথা, আল্লাহর প্রশংসা করার কথা, তোমাদেরকে । নিয়ামত দান করেছেন তার কথা স্মরণ করে আল্লাহর প্রশংসা করার কথা বলিনি? তোমরা আমার কথা শুননি। এখন দেখ বস্থাটা কি হলো? এ কথার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, ঐ লোকটির ইচ্ছা অন্য রকম ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অন্যদের মতেরই নুসরণ করে। সে ছিল একাই এ মতের এবং হকের উপর, সে অনড় থাকতে পারেনি। ফলে সেও তাদের সাথে একইভাবে ঞ্চিত হলো। –[যিলাল]

ওবার প্রতিদান : অতঃপর তারা পরস্পর দোষারোপ করতে লাগল। পরিশেষে নিজেদের ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য নিজেদেরকেই াষী সাব্যস্ত করল এবং বলল, এটা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্যই হয়েছে। তারা আল্লাহর নিকট খাঁটি অন্তরে ওবা করে আশা করল যে, আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে, তিনি নিজগুণে ামাদের ক্ষমা করে এ বাগানের পরিবর্তে উত্তম বাগান আমাদেরকে দান করতে পারেন। আমরা আমাদের যাবতীয় সমস্যা তাঁর কেট অর্পণ করলাম এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করলাম। তাফসীরকারগণ লিখেছেন– তাদের এই তওবার ফলে এবং জেদের যাবতীয় সমস্যা আল্লাহর নিকট সোপর্দকরণ এবং সত্যদীনের ধারক হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা এটার তুলনায় নেক অনেক গুণ উত্তম ও সুজলা-সুফলা শস্যভরা উদ্যান দান করে অপূর্ব সম্পদশালী করেছিলেন।

শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান : আল্লাহ তা'আলা ঘটনাটি বর্ণনার শেষে উপসংহারে বলছেন, এ পার্থিব জগতে আল্লাহ এবং তাঁর াসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী লোকদের জীবনে এমনিতর শাস্তিই নেমে আসে। আর পরকালেও থাকবে তাদের জন্য বিরাট শাস্তি; ন্তু মানুষ সে শাস্তি সম্পর্কে কোনো কিছু অবগত নেই বলে তারা তাতে বিশ্বাসী হয় না। তাদের এই পার্থিব শাস্তি অবলোকন রে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অতীতের ইতিহাসই জ্ঞানীলোকদের জন্য পথের সন্ধান দেয়। বস্তুত হে মক্কার পাপিষ্ঠ দুষ্ট-দুরাচার াফেরকুল! তোমরা সময় থাকতে সতর্ক হও। ধনসম্পদ ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অহংকারে আল্লাহর দীনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ য়ো না, তোমাদের জীবনেও এমনিভাবে অপমান, লাঞ্ছনা ও শাস্তির অমানিশা নেমে আসতে পারে এবং পরকালেও হবে ঠিনতর শাস্তি। অতএব, তোমরা এ ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহর দীনের ছায়াতলে আশ্রয় নাও; রাসূলের নেতৃত্বে মবেত হও। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর প্রাচুর্যের ভাণ্ডার খুলে দেবেন। নতুবা তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে শাস্তি বধারিত। উপসংহারের ৩৩নং আয়াতের ভাষণের মর্ম এটাই।

ধ্যম ব্যক্তি কি করে উত্তম হতে পারে? : এটার উত্তর একেবারেই সহজভাবে দেওয়া যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বেহেশ্‌ত ম্পর্কে এ কথাটি বলেছিলেন–(جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَوْسَطُهَا) (أَوْكَمَا قَالَ ﷺ) (وَخَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا) ান্নাতুল ফিরদাউস উত্তম বেহেশ্‌ত আর উত্তম বেহেশ্‌ত মাঝারী ধরনের বেহেশ্‌ত (أَوْكَمَا قَالَ ﷺ) [আর সকল কার্যে মাঝারী াস্থা অবলম্বন করাই উত্তম।]

াই বুঝা গেল যে, মাঝারী বস্তুই উত্তম বস্তু, আর বিভিন্ন তাফসীরকারের বর্ণনায়ও প্রমাণিত হয় যে, তাদের মেঝো ব্যক্তি ার্মিকতার দিক দিয়ে উত্তম ছিল, তাই সকলের পূর্বেই সে তাদেরকে নসিহত বাণী শুনিয়ে দিল। সর্বোপরি কথা হলো আল্লাহ া'আলা যেহেতু তার নাম উল্লেখ করেছেন, সুতরাং أَوْسَطُ -কে উত্তম বলতে হবে। অতএব, أَعْلَى -কে- أَوْسَطُ ও أَخْيَرُ বলা ঠিক হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ : এটার অর্থ হলো هَلَّا تَسْتَثْنُوْنَ কেন তোমরা আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা কর া। কেননা, إِسْتِثْنَاءٌ অর্থ তাসবীহ, আর তাস্‌বীহ ও ثَنَاءٌ উভয় শব্দই এর অর্থকে শামিল করে থাকে।

لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ অথবা إِنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ تَفْوِيْضٌ إِلَيْهِ وَالتَّسْبِيْحُ تَنْزِيْهٌ لَهُ وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّنْزِيْهِ تَعْظِيْمٌ -এর অর্থ হবে لَوْلَا تَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ তোমরা আল্লাহকে কেন স্মরণ কর না? অথবা لَوْلَا تَتُوْبُوْنَ إِلَيْهِ তাঁর নিকট কেন তওবা করছ না? কেননা তোমাদের নিয়তের মধ্যে خَبَاثَتْ নিকৃষ্টপনা খেয়াল সংযোগ অর্থাৎ তাদের মধ্যে মেঝো ব্যক্তি বা উত্তম ব্যক্তি তাদের এ নিকৃষ্টপনা ও ঘৃণিত খেয়াল দেখে [আমরা ফকিরদেরকে কেন ফলদান করবো, আমাদের পিতার বোকামির কারণেই তিনি দিয়েছিলেন, বা আমাদের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা অবস্থায় আমরা কেন ফকিরদেকে ফল দান করবো] বলেছিল- لَوْلَا تَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ وَتُسَبِّحُوْنَ لَهُ وَتَتُوْبُوْنَ إِلَيْهِ مِنْ خُبْثِ نِيَّتِكُمْ তথাপিও তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল ছিল, আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেনি, নিকৃষ্টতম খেয়াল পোষণ করা হতে বিরত ছিল না, তাই আল্লাহ তাদের এই সাজা দিয়েছিলেন। অতঃপর তারা সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বলেছিল, سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ -[মাদারিকুত তানযীল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا ....عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ : উক্ত আয়াত দু'টির তাৎপর্য এই যে, প্রথম আয়াতটি তাদের নিজেদের দোষের স্বীকারোক্তি স্বরূপ, অর্থাৎ তাদের উত্তম ভাইয়ের প্রথম সময়ের উপদেশকে কেউই গ্রাহ্য করেনি, সব কিছু হারিয়ে শেষকালে তার কথায় আসতে বাধ্য হয়েছে এবং স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেছে এবং বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র রয়েছেন সকল প্রকার দোষত্রুটি হতে। আমরাই জালিম সাব্যস্ত হয়েছি। আমরা ফকিরদের হিসসাও খেয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম, ফকিরদেরকে না দেওয়ার আশা করা আমাদের জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। (মা'আরিফ) মাদারেক গ্রন্থকার এ আয়াতের তাফসীর এরূপ লিখেছেন যে-

تَكَلَّمُوْا بَعْدَ خَرَابِ الْبَصَرَةِ بِمَا كَانَ يَدْعُوْهُمْ إِلَى التَّكَلُّمِ بِهِ أَوَّلًا وَاَقَرُّوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ بِالظُّلْمِ فِيْ مَنْعِ الْمَعْرُوْفِ وَتَرْكِ الْإِسْتِثْنَاءِ. وَنَزَّهُوْا عَنْ أَنْ يَكُوْنَ ظَالِمًا .

অতঃপর فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ الخ আয়াতটি দ্বারা প্রত্যেকেই নিজেদের স্বচ্ছতা জাহির করছিল। অর্থাৎ একে অন্যের উপর দোষ চাপাতে শুরু করল যে, তুমিই প্রথমে ভুল ধারণা দিয়েছিলে, (অপরজনও অপরজনকে এরূপ বলছিল) ফলে এ আজাব এসেছে। অথচ তাদের কারো এটা একা দোষ ছিল না; বরং অধিকাংশ অথবা সকল ভাই এই মতামতে বহাল রইল ও শরিক ছিল, [মাদারেক, মা'আরিফ] গ্রন্থকার বলেন, এটার অর্থ হলো- يَتَلَاوَمُوْنَ أَيْ يَلُوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلٰى مَا صَدَرَ مِنْهُمْ سَابِقًا অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল, তাদের থেকে পূর্বে যে কাজটি প্রকাশ পেয়েছিল তার জন্য একে অন্যকে দোষী করল। -[সাবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَالُوْا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ....رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা বলল, হায় আফসোস! আমরা সবাই সীমালঙ্ঘনকারী, সবাই গুনাহগার। তাদের এই স্বীকারোক্তি তওবার স্বরূপ হয়েছে। এই অনুসারে আল্লাহর নিকট তাদের এ আশা হয়েছে যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ বাগান হতে উন্নততর বাগান দান করবেন। তাদের সীমালঙ্ঘন হলো কেবল ফকিরদের হক বিনষ্টের চেষ্টা ও তাদের কথায় إِسْتِثْنَاء বা ইনশাআল্লাহ শব্দ না বলা।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সত্যই এ বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনের পর তওবা করেছে। অতঃপর তাদেরকে উক্ত বাগান অপেক্ষা উন্নত বাগান দান করা হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, উক্ত বাগানের অধিকারী সম্প্রদায় খালেস তওবা করেছে এবং আল্লাহ তাদের সত্যতা যাচাই করে পেয়েছেন। অতঃপর এ বাগানের পরিবর্তে তাদেরকে اَلْحَيَوَانُ নামক বাগান দান করেছেন। তথায় আঙ্গুর ফল এতবেশি হতো যে খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে তা নেওয়া আবশ্যক হতো এবং একটি ছড়াতেই এক বোঝা হতো। ইমাম বগাবী (র.)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা যমখশারী (র.)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

-[মাদারিক, কাবীর ও মা'আরিফ]

উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য : এটার উদ্দেশ্য হলো-

ক. জগৎবাসীদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া যে, ফকির, এতিম, মিসকিন বা গরিব-দুঃখীদের হক বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য করা হলে সেই ক্ষেত্রে নিজেরাই বঞ্চিত হতে হয়। আল্লাহর হক নষ্ট করলে তার প্রতিফল নিজেরাই ভোগ করতে হবে। এ কিস্সাটি তার উপর জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ। সুতরাং দুনিয়াবাসী যেন এটা হতে এ শিক্ষা গ্রহণ করে নেয়।

খ. এটা একটি বিশেষ ঈমানী পরীক্ষা। এ পরীক্ষা দ্বারা ঈমানদারদের ঈমান পাকা হয়েছে এবং পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ .... وَالثَّمَرَاتِ এটা ثَمَرَاتٌ -এর মাধ্যমে পরীক্ষা ছিল।

গ. আল্লাহর নির্দেশ যথাযথ পালন না হলে তথায় গজব নাজিল হবে। আল্লাহ নাফরমানদেরকে কখনোও ছাড়বেন না। মক্কাবাসীদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা আল্লাহর নাফরমানি করলে তাদেরকে এভাবে নিধন করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ : মক্কাবাসীদের শাস্তি ও দুর্ভিক্ষের বর্ণনার পর বাগানের অধিকারীদের বাগানের পরিণতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহর সাধারণ নীতি সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে যে, যখন আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি এসে থাকে তখন তা এমনিভাবেই এসে থাকে। আর দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে আখেরাতের শাস্তির কাফফারা হয়ে যায় না; বরং আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক হবে।

অনুবাদ :

৩৪. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا إِنْ بُعِثْنَا نُعْطَى أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ـ

৩৪. পরবর্তী আয়াত মক্কাবাসীদের এ উক্তির জবাবে অবতীর্ণ হয় যে, তারা বলেছিল, আমরা যদি পুনরুত্থিত হই, তবে তোমরা– মুসলমানদের তুলনায় উত্তম অবস্থার অধিকারী হবো। নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত রয়েছে।

৩৫. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ أَيْ تَابِعِيْنَ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ

৩৫. আমি কি আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করবো? অর্থাৎ দান করার ক্ষেত্রে আনুগত্যকারীদেরকে অবাধ্যচারীদের অনুগামী করবো?

৩৬. مَا لَكُمْ تف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ هٰذَا الْحُكْمُ الْفَاسِدُ ـ

৩৬. তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করছ? এরূপ সিদ্ধান্ত বাতিলরূপে গণ্য।

৩৭. أَمْ بَلْ لَكُمْ كِتَابٌ مُنَزَّلٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ تَقْرَؤُوْنَ ـ

৩৭. নাকি أَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে। তোমাদের নিকট কিতাব আছে অবতারিত যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর পাঠ কর।

৩৮. إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ تَخْتَارُوْنَ ـ

৩৮. যে, তোমাদের জন্য তথায় রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর তোমরা বেছে নাও।

৩৯. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عُهُوْدٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ وَاثِقَةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا مُتَعَلِّقٌ مَعْنًى بِعَلَيْنَا وَفِيْ هٰذَا الْكَلَامِ مَعْنَى الْقَسَمِ أَيْ أَقْسَمْنَا لَكُمْ وَجَوَابُهُ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ بِهِ لِأَنْفُسِكُمْ ـ

৩৯. নাকি তোমাদের সাথে অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি আছে আমার পক্ষ হতে, যা বলবৎ থাকবে কার্যকর থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত অর্থ বিবেচনায় إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ বাক্যাংশটি عَلَيْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ -এ বাক্যের মধ্যে শপথের অর্থ বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদের সাথে শপথ করেছি', আর শপথের জবাব হলো যে, তোমরা নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তা-ই তোমরা প্রাপ্ত হবে তোমাদের বেলায় যেই সিদ্ধান্ত করবে।

৪০. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ الْحُكْمِ الَّذِيْ يَحْكُمُوْنَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ أَفْضَلَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ زَعِيْمٌ كَفِيْلٌ لَهُمْ ـ

৪০. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্য হতে কে এটার সাথে তাদের নিজের বেলায় তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার সাথে– এই মর্মে যে, তাদেরকে আখেরাতে মু'মিনদের অপেক্ষা উত্তম মর্যাদা দান করা হবে। দায়িত্বশীল তাদের জন্য জিম্মাদার।

٤١. اَمْ لَهُمْ اَىْ عِنْدَهُمْ شُرَكَاءُ ج مُوَافِقُوْنَ لَهُمْ فِىْ هٰذَا الْقَوْلِ يَكْفُلُوْنَ لَهُمْ بِهِ فَاِنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ الْكَافِلِيْنَ لَهُمْ بِهِ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ـ

৪১. নাকি তাদের জন্য অংশীগণ রয়েছে। অর্থাৎ তাদের নিকট এমন কোনো অংশী আছে, যে তাদের সাথে এ দাবিতে একমত এবং এ ব্যাপারে তাদের জন্য জিম্মাদার হবে। যদি এমন হয় তবে তাদের অংশীদেরকে উপস্থিত করুক যারা এ ব্যাপারে তাদের জন্য জিম্মাদার হবে। যদি তারা সত্যবাদী হয়।

٤٢. اُذْكُرْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْاَمْرِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ يُقَالُ كَشَفَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ اِذَا اشْتَدَّ الْاَمْرُ فِيْهَا وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ اِمْتِحَانًا لِاِيْمَانِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَصِيْرُ ظُهُوْرُهُمْ طَبَقًا وَاحِدًا ـ

৪২. স্মরণ করুন যে দিন চরম সঙ্কট দেখা দেবে এটা দ্বারা কিয়ামতের দিনকার হিসাব-নিকাশের কঠোরতা উদ্দেশ্য, যেমন যুদ্ধ ঘোরতরভাবে শুরু হলে বলা হয় كَشَفَ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ এবং তাদেরকে সিজদা করার নিমিত্ত আহ্বান করা হবে তাদের ঈমান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা সক্ষম হবে না তাদের পিঠ একটি কাষ্ঠ হয়ে যাবে।

٤٣. خَاشِعَةً حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُدْعَوْنَ اَىْ ذَلِيْلَةً اَبْصَارُهُمْ لَا يَرْفَعُوْنَهَا تَرْهَقُهُمْ تَغْشَاهُمْ ذِلَّةٌ ط وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ فِى الدُّنْيَا اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ فَلَا يَاْتُوْنَ بِهِ بِاَنْ لَّا يُصَلُّوْا ـ

৪৩. অবনত অবস্থায় এটা يُدْعَوْنَ -এর ضَمِيْر হতে حَالٌ অর্থাৎ লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদের দৃষ্টিসমূহ তারা তাকে উর্ধ্বমুখি করতে পারবে না। তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে ঢেকে রাখবে হীনতা আর তারা আহূত হয়েছিল পার্থিব জীবনে সিজদা দানের প্রতি এবং তারা তখন সুস্থ ছিল তথাপি তারা তা আদায় করেনি। তথা তারা নামাজ আদায় করত না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ : إِنَّ এর ইসমে اَلْمُتَّقِيْنَ আর إِنَّ খবরে عِنْدَ رَبِّهِمْ যরফ হতে পারে, অথবা جَنّٰتِ হতে হাল হতে পারে।

قَوْلُهُ اَفَنَجْعَلُ : -এর হামযাটি اِنْكَار বা অস্বীকৃতির জন্য এসেছে। উহ্য বাক্যের উপর ف টি আতফ হয়েছে, বাক্যটি এরূপ ছিল– اَنَحِيْفُ فِى الْحُكْمِ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ

قَوْلُهُ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ : বাক্যে فِيْهِ জার এবং মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হয়েছে تَدْرُسُوْنَ -এর, فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ জুমলাটি كِتَابٌ -এর সিফাত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ : বাক্যটি سَلْ -এর দ্বিতীয় মাফউল হয়েছে এবং এ জুমলাটি মহল্লে নসবে আছে। يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ الخ -এর মধ্যস্থ يَوْمَ শব্দটি فَلْيَاْتُوْا অথবা اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। يُدْعَوْنَ শব্দটি يُكْشَفُ -এর উপর আতফ হয়েছে। فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ শব্দটি يَوْمَ يُكْشَفُ -এর জবাব। خَاشِعَةً শব্দটি يُدْعَوْنَ -এর যমীর হতে হাল হয়েছে। اَبْصَارُهُمْ - خَاشِعَةً -এর ফায়েল হিসেবে মারফূ' হয়েছে। وَهُمْ سَالِمُوْنَ বাক্যটি يُدْعَوْنَ হতে হাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ রয়েছে যে, মক্কার কাফের সরদারগণ বলত, এ পার্থিব জগতে আমরা যেসব ধন-সম্পদ ও নিয়ামতের অধিকারী হয়েছি, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, আমরা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়পাত্র এবং পরকালেও আমরা অনুরূপভাবে সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়ে সানন্দে জান্নাতে কালাতিপাত করবো। পক্ষান্তরে তোমরা যে চরম দুঃখ-দুর্দশা ও দৈন্যতার মধ্যে নিপতিত রয়েছ, তাতে বুঝা যায় যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয়ভাজন নও। পরকালেও তোমরা এমনিভাবে চরম দুঃখ-দুর্দশা, শাস্তি-অপমান ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হবে। তাদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার জবাবেই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন; কিন্তু তাফসীরে খাযেন, হোসাইনী, কামালাইন প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন উপরিউক্ত ৩৪নং আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন কাফিরগণের মুখেই উপরিউক্ত কথাগুলো ধ্বনিত হয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদে ৩৫-৩৯নং আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ .... كَيْفَ تَحْكُمُونَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই মুত্তাকী ও পরহেজগারদের জন্য তাদের পরওয়ারদেগারের নিকট বিভিন্ন রকমের নিয়ামতসম্পন্ন বেহেশ্‌তসমূহ তৈরি রয়েছে। মুশরিকগণ তার আরামদায়ক হাওয়া পর্যন্ত পাবে না। কারণ তাদের মধ্যে তাকওয়া নেই।

আর মক্কার কাফের ও মুশরিকরা কি করে এ কথা বলতে সাহস পেল যে, আমি তাদেরকে মুসলমানদের সমান করবো। এটাতো কখনও হতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ বে-ইনসাফী। এমন বে-ইনসাফী আমার থেকে প্রকাশ পাওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। কেয়াসের ব্যতিক্রম এমন হুকুম তারা কিভাবে দিতে পারে। তবে সম্ভবত এটা তাদের আত্মপ্রসন্নতা বা আত্মগরিমার কারণেই হতে পারে। যদি কাফেরদের নাজাতের ব্যবস্থা হয় তবে আল্লাহর সকল ওয়াদা মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন– أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ অর্থাৎ এমন সময় হবে, যে সময় গুনাহগারদের জন্য কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। اِنْصَافِىْ ও اِنْصَافْ-এর সকল সত্য ফয়সালা করা হবে। সেদিন কাফেরদের এই সকল আকাশকুসুম চিন্তা কোনো কাজে আসবে না। অথচ বলা হয়েছে– إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

প্রত্যেকটি জান্নাতেই তো নিয়ামত থাকবে তথাপিও جَنّٰتِ النَّعِيْمِ-কে কেন خَاصْ করা হলো? : এই প্রশ্নের عَقْلِىْ উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, ১. যদিও সকল বেহেশত আল্লাহর নিয়ামতসম্পন্ন তথাপিও جَنّٰتِ النَّعِيْمِ সম্ভবত উত্তম নিয়ামতসম্পন্ন, তাই এটার কথা বলা হয়েছে। ২. অথবা, جَنّٰتِ النَّعِيْمِ বলে تَخْصِيْص উদ্দেশ্য নয়; বরং বর্ণনা تَبْيِيْنْ উদ্দেশ্য নতুবা প্রত্যেক বেহেশতেই নিয়ামত অবর্ণনীয় হিসেবে থাকবে। আর مُتَّقِىْ দ্বারা যদি مُتَّقِىْ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْمُبَاحَاتِ উদ্দেশ্য হয় তখন হয়তো উত্তম جَنّٰتْ বুঝানোর জন্য এটার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। [আল্লাহই সঠিক সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।]

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ الخ-এর মধ্যে কোন প্রকারের প্রশ্ন করা হয়েছে? : মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, এ অংশে اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ নেওয়া হয়েছে, কারণ أَفَنَجْعَلُ الخ এ উক্তিটি তার এ কথার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, لَوْ كَانَ مَا يَقُوْلُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَنَحْنُ نُعْطٰى فِى الْاٰخِرَةِ خَيْرًا مِمَّا يُعْطٰى هُوَ وَمَنْ مَعَهُ كَمَا فِى الدُّنْيَا অতঃপর বলা হয়েছে যে, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ـ اَنَحِيْفُ فِى الْحُكْمِ অর্থাৎ আমি কি কখনো বক্র হুকুম দান করবো যা পড়া না পড়া একই সমান হবে এটা কখনও নয়।

قَوْلُهُ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে কাফেরদের দল! তোমাদের নিকট আসমান হতে এমন কোনো কিতাব খাসভাবে এসেছে কি? যাতে তোমরা ঐ সব কথা পেয়েছ যা বলছ, আর সে আসমানি কিতাবে তোমাদের ইচ্ছামতো ভালো দিক বলে যাবে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

মাদারিক গ্রন্থকার এ আয়াত দু'টির তাফসীর এরূপ লিখেছেন تَدْرُسُوْنَ اَنَّ لَكُمْ مَا تَخَيَّرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের যা যেরূপ পছন্দ হয় তোমরা সেরূপ বা সে পছন্দনীয় অংশই তেলাওয়াত করে থাক। যা তোমাদের পছন্দ হয় না তা তোমরা তেলাওয়াত কর না। আর تَدْرُسُوْنَ -কে مَدْرُوْس অর্থাৎ مَقْرُوْء অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা تَدْرُسُوْنَ -কে حِكَايَةً لِلْمَدْرُوْسِ হিসেবে তাফসীর করা যেতে পারে। যেমন– আল্লাহ বলেন, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ আর تَخَيَّرَ الشَّيْءَ وَاخْتَارَهُ يَعْنِيْ اَخَذَ خَيْرَهُ –[মাদারিক]

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ حَاصِلُهُ هَلْ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ كِتَابٌ تَقْرَؤُوْنَ فِيْهِ اَنَّ مَا تَشْتَهُوْنَهُ وَتَخْتَارُوْنَهُ لَكُمْ . (كَمَالَيْن)

قَوْلُهُ تَعَالٰى "مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ" : আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফেরদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে যেসব মন্তব্য করত সে ব্যাপারে তাদের কথাকে ধিক্কার দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করছেন যে, তোমরা কিসের ভিত্তিতে এ সব মন্তব্য করছ? কিসের ভিত্তিতে তোমরা ফয়াসালা করছ, কিভাবে তোমরা আদর্শের বিচার ও যাচাই-বাছাই করছ যে, তোমাদের দৃষ্টিতে একজন আল্লাহর অনুগত বান্দা আর একজন অপরাধী এক রকম হতে পারে? এটা কখনও হতে পারে না। আয়াতে উল্লিখিত ইসতিফহামটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ –[যিলাল]

اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ বাক্যটির মুতা'আল্লিক এবং তার অর্থ : اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ কার সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে, সে সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটা بَالِغَةٌ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। এটার অর্থ হলো তোমাদের কি এমন কসম রয়েছে যার শক্তি এবং কামালিয়াত কিয়ামত পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। অন্য অভিমতটি হলো اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ মুতা'আল্লিক হয়েছে উহ্য ثَابِتَةٌ -এর সাথে। এটার অর্থ হলো তোমাদের নিকট এমন কসম কি রয়েছে যা তাকীদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে যা খুবই সঠিক এবং উত্তম, এ রকম তোমাদের কোনো অঙ্গীকার কি রয়েছে? –[কাবীর]

"جَنَّةُ النَّعِيْمِ" -এর অর্থ : উল্লিখিত ৩৪নং আয়াতে "জান্নাতুন নাঈম" দ্বারা আল্লাহর অর্থে নিয়ামতে ভরপুর একটি বিশেষ জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, যা পরকালে মুত্তাকীগণ লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন লোকদের পরকালে সুখী করার জন্য আটটি জান্নাত সৃষ্টি করে রেখেছেন, যার নাম হলো– ১. জান্নাতুল ফিরদাউস, ২. জান্নাতুল আদন, ৩. জান্নাতুল মাওয়া, ৪. জান্নাতুল খুলদ, ৫. দারুস সালাম, ৬. দারুল মাকাম, ৭. ইল্লিয়ীন এবং ৮. জান্নাতুন নাঈম। এ জান্নাতগুলোতে আল্লাহ পরকালে শ্রেণিভেদে মু'মিন বান্দাগণকে স্থান দেবেন।

قَوْلُهُ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ ...... اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সে কফেরদেরকে প্রশ্ন করুন যে, তাদের যে দাবি তারা প্রকাশ করছে যে, পরকালের সুখ-শান্তি মুসলমানদের অপেক্ষা তাদের জন্য অধিকতর হবে। সে সুখ-শান্তি সেদিন তোমাদেরকে দান করার দায়িত্ব কে নিয়েছে? আর যদি তাদের এ দাবিকে সত্যায়িতকারী কোনো দেবতা থাকে তবে তারা তাদেরকে যেন উপস্থিত করে। এতে যেন কাল বিলম্ব না হয়।

বাস্তবিকপক্ষে তাদের এ সকল দাবি-দাওয়া সম্পর্কে কোনো অসমানি গ্রন্থে কোনো কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। অন্যথা কোনো ওহীর মাধ্যমেও তাদের এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়নি বা বর্ণনা করাও হয়নি। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের এ বিষয়ে কেউ দায়িত্ব নিতে পারবে না। সুতরাং এগুলো মিথ্যা দাবি। –[মা'আরিফ]

زَعِيْم -এর অর্থ : زَعِيْم শব্দের অর্থ হলো– আরবি ভাষায় যে কোনো পক্ষীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা মুখপাত্র। সুতরাং এটার অর্থ হবে তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিকে যে তোমাদের জন্য আল্লাহর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দাবি করতে প্রস্তুত হবে যে, সে আল্লাহর নিকট হতে কোনো চুক্তি বা ওয়াদা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাফরমানদের মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জস্বরূপ। আল্লাহর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাতিল পক্ষ কখনো টিকতে পারবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : জালালাইন ও মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, كَشْفِ سَاقٍ বলে شِدَّةُ اَمْرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের হিসাব-কিতাবের ব্যাপার খুবই কঠিন হবে। আর আরব দেশে যদি কোনো কাজে কঠোরতা অবলম্বন করা হয় তখন বলা হয় كَشَفَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ অর্থাৎ খুবই ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং এ

একটি প্রবাদ বাক্য স্বরূপ। অনুরূপভাবে আরো বলা হয় يَدُهُ مَغْلُوْلَةٌ তার হাত বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন ইহুদি সম্প্রদায় বলেছিল كَقَوْلِهِ تَعَالٰى يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَلَا আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহর কোনো হাত নেই। يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى الْحَقِيْقَةِ

হযরত ইকরামা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (র.) প্রমুখের মতে كَشْفُ سَاقٍ -এর অর্থ হলো কিয়ামতের কঠিন দিনে মহাবিপদের মুখোমুখি হওয়া।

হযরত ইবনে জারীর (র.) বলেছেন كَشْفُ سَاقٍ হলো কিয়ামতের সেই কঠিন বিপদ যা প্রত্যেকের উপর আপতিত হবে।

অধিকাংশের মতে এর দ্বারা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নূরের তাজাল্লী প্রকাশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। سَاقٍ শব্দের অর্থ হলো পায়ের গোড়ালির উপরিভাগ। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন 'সাক' বা তাঁর কদম মোবারকের গোছা প্রকাশ করবেন তথা বিশেষ নূরের তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হবে। –[নূরুল কোরআন]

وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ -এর ব্যাখ্যা : দারে কুতনী, তাবারানী ইসহাক ইবনে মারদুবিয়াহ -এর মুসনাদে এবং হাকেম যে হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্র করবেন এবং তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। তখন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, হে লোক সকল! তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমাদের প্রভু যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের সুন্দর অবয়ব দান করেছেন এবং তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন, তিনি চান যে, তোমরা দুনিয়াতে যে যার ইবাদত করতে এখন সে সবেরই ইবাদত আবার করতে শুরু করবে। এটা কি তোমাদের জন্য ইনসাফ নয়? তারা বলবে হ্যাঁ, এটা ইনসাফ। অতঃপর প্রত্যেকেই যে যার ইবাদত করত তা তার সামনে আসবে। যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করত তাদের সামনে ঈসা'র শয়তান আসবে। এ ধরনের যারা পাথর, বৃক্ষ, কাঠ প্রভৃতি যারই ইবাদত করত তাদের সামনে তা এসে হাজির হবে এবং তারা তা নিয়ে চলবে। আর ইসলামের অনুসারীরা দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বলবেন, তোমাদের কি হয়েছে? কেন তোমরা যাচ্ছ না? যেমন অন্য মানুষেরা চলে গেছে? তখন তারা বলবে, আমাদের একজন প্রভু আছেন। তাঁকে আমরা এখনও দেখিনি। তিনি বলবেন যে, তোমরা তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে? তারা বলবে হ্যাঁ, আমরা তাঁকে দেখলে চিনতে পারবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পায়ের নিম্নদেশ খুলে দেবেন। তখন মুসলমানেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়বে, আর কাফের ও মুনাফিকরা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের পিঠ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কঠিন ও শক্ত হয়ে যাবে। তারা পিঠ বাঁকা করে সিজদা করতে পারবে না। –[রূহুল মা'আনী]

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ -এর মর্ম এবং سَاقٍ -এর অর্থ কি? : يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ বাক্যে উল্লিখিত يَوْم -এর মর্ম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। জমহুরের নিকট এটার মর্ম হলো يَوْم বা দিন বলতে কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। সেদিন লোকদেরকে সিজদার জন্য বলা হবে এবং এ হুকুম হবে তাদেরকে নামাজি ও বে-নামাজি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে। এটার মাধ্যমেই প্রমাণ করা হবে, কে দুনিয়ায় নামাজ পড়ত আর কে পড়ত না। দ্বিতীয় অভিমতটি হলো, এটার মর্ম হচ্ছে, দুনিয়ার দিন। কেননা পরকালে কোনো تَكْلِيْفٌ নেই। দুনিয়াতেই নামাজ-রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসের আলোকে দেখলে জমহুরের অভিমতটিই সহীহ বলে প্রতীয়মান হয়।

سَاقٍ -এর অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ ভয়াবহতা। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ প্রকৃত অবস্থা, যেদিন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা হবে। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ জাহান্নামের 'সাক' বা আরশের 'সাক' বা পায়ের নিম্নদেশ খোলা হবে। –[কাবীর]

অনুবাদ :

٤٤. فَذَرْنِي دَعْنِي وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ط الْقُرْاٰنِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَأْخُذُهُمْ قَلِيْلًا قَلِيْلًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ.

৪৪. সুতরাং আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে অবকাশ দাও আর যারা এ বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কুরআনকে, অচিরেই আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরবো তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করবো, এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না।

٤٥. وَاُمْلِيْ لَهُمْ ط اُمْهِلُهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ شَدِيْدٌ لَا يُطَاقُ.

৪৫. আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি তাদেরকে অবকাশ দান করি। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ সুকঠিন, যা সহ্যের অতীত।

٤٦. اَمْ بَلْ تَسْأَلُهُمْ عَلٰى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مِّمَّا يُعْطُوْنَكَهُ مُّثْقَلُوْنَ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ لِذٰلِكَ.

৪৬. নাকি اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে, আপনি তাদের নিকট চাচ্ছেন রিসালাত প্রচারের বিনিময়ে পারিশ্রমিক, ফলে তারা সেই দণ্ডকে যা তারা আপনাকে প্রদান করবে দুর্বহ বোঝা মনে করে যে জন্য তারা ঈমান আয়নন করে না।

٤٧. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ اَيِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ الَّذِيْ فِيْهِ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ مِنْهُ مَا يَقُوْلُوْنَ.

৪৭. নাকি তাদের নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান আছে অর্থাৎ লাওহে মাহফূয, যাতে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে। যে, তারা তা লিখে রাখে তন্মধ্যে হতে, যা তারা বলে বেড়াচ্ছে।

তাহকীক ও তারকীব

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ বাক্যটি مُسْتَأْنِفَةٌ হয়েছে। তাদের জন্য وَمَنْ মাফঊলে মাআহু হয়েছে فَذَرْنِي -এর। যে শাস্তি হবে فَذَرْنِي وَمَنْ يُّكَذِّبُ الخ আয়াত হতে তার كَيْفِيَةٌ বর্ণনা করার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَذَرْنِي وَمَنْ يُّكَذِّبُ .... اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ : উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কিয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ে আপনার সাথে কটু আচরণকারীদের আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না; বরং তাদের ব্যাপার আমার হস্তে অর্পণ করে দিন। আমি তাদেরকে দেখে নিবো। তাদের শাস্তিদানে যদিও কালবিলম্ব হয় তবেও তারা রেহাই পাবে না। আমি কলা-কৌশলের মধ্য দিয়ে তাদেরকে এমন সুন্দরভাবে কবজা করে নেবো, তারা একটুও টের পাবে না। শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বো।

আর তাদের রশি ছেড়ে দিচ্ছি, কুকর্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিফল ভোগাবো না, এতে তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমার তদবির খুবই শক্ত।

আল্লাহর বাণী ذَرْنِي দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলার এ বাক্যটি একটি প্রচলিত বাক্য হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকুন। কথাটির মূল অর্থ হলো এই যে, কাফেরগণ বারবার হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দরবারে এ কথাটি তুলে ধরত যে, যদি সত্যই আমরা প্রভুর দরবারে দোষী হয়ে থাকি এবং তিনি আমাদেরকে শাস্তি প্রদানে ক্ষমতাশীল, তবে তিনি কেন বিলম্ব করেন? এ সমস্ত কথাবার্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তঃকরণেও এ ভাব সৃষ্টি হয় যে, যদি তার কথা কখনো সত্য প্রতিফলিত হয়ে যেত তবে অবশিষ্ট লোকগণ সংশোধন হয়ে যেত। এ মর্মে কখনও হযরত ইউনুস (আ.)-এর ন্যায় তিনি দোয়াও করেছিলেন। তবে তাঁর সে দোয়া সাথে সাথেই কার্যকর হয়নি।

আর তাদেরকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও না করা আল্লাহর বিশেষ কোনো মঙ্গলের খাতিরে হতে পারে। সুতরাং সে মঙ্গলের লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সবর করতে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহর কাজ আল্লাহ সুবিধামতো করবেন। অথবা নবী করীম ﷺ -এর উম্মতকে সরাসরি এভাবে ধ্বংস করে বিধর্মীদের চোখের পর্দা নষ্ট করবে না। তাই নবী করীম ﷺ -কে একটু ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে।

إِسْتِدْرَاجٌ -এর মূলতত্ত্ব : কাবীর ও মাদারিক গ্রন্থকার এর তাফসীর করেছেন–

سَنُدْنِيْهِمْ مِنَ الْعَذَابِ دَرَجَةً دَرَجَةً يُقَالُ إِسْتَدْرَجَهُ إِلٰى كَذَا إِذَا اسْتَنْزَلَهُ دَرَجَةً فَدَرَجَةً حَتّٰى يُوَسِّطَهُ فِيْهِ وَاسْتِدْرَاجُ اللّٰهِ تَعَالٰى عِبَادَهُ الْعُصَاةَ أَنْ يَرْزُقَهُمُ الصِّحَّةَ وَالنِّعْمَةَ فَيَجْعَلُوْنَ رِزْقَ اللّٰهِ ذَرِيْعَةَ الْمَعَاصِىْ . هٰكَذَا قَالَ الزَّمَخْشَرِىُّ أَيْضًا .

অর্থাৎ অচিরেই আমি তাদেরকে আস্তে আস্তে আজাবের নিকটে নিয়ে যাবো। যেমন বলা হয় إِسْتَدْرَجَهُ إِلٰى كَذَا যখন তাকে কিঞ্চিৎ অবতরণ করা হয় এবং সর্বশেষ একেবারেই ঘনিয়ে আনা হয়। আর আল্লাহ তাঁর গুনাহগার বান্দাগণকে إِسْتِدْرَاجٌ করার অর্থ হলো, তাদের তাঁর নিয়ামতের ভেতর ডুবিয়ে রাখবেন এবং সুস্থতার উচ্চশিখরে পৌঁছিয়ে দেবেন। সর্বশেষ তাদের উপর দেয় নিয়ামতসমূহকে গুনাহের কারণ বানিয়ে দেন।

আল্লামা যমখশারী (র.)ও এমনি মতামত পেশ করেন। জালালাইন গ্রন্থকার বলেন– এর অর্থ হলো, وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ نَأْخُذُهُمْ قَلِيْلًا قَلِيْلًا যখন আল্লাহর গুনাহগার বান্দা গুনাহকে নতুন নতুনভাবে আরম্ভ করে। আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত নতুনভাবে প্রদান করতে থাকেন এবং সে দেয় নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করাকে সে ভুলে যায়।

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يَنْعَمُ عَلٰى عَبْدِهٖ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَاعْلَمْ أَنَّهٗ إِسْتِدْرَاجٌ يَسْتَدْرِجُ بِهِ الْعَبْدَ . (كَبِيْر)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা দেখবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাগণের উপর নিয়ামত দান করছেন, অথচ সেই বান্দা গুনাহের উপর বহাল রয়েছে, তখন জানবে যে, এটাই إِسْتِدْرَاجُ اللّٰهِ এটার দ্বারাই বান্দাকে পাকড়াও করা হবে।

–[কাবীর]

ধ্বংসের অজ্ঞাত পথ : আল্লাহ তা'আলা পূর্বভাষণের পাশাপাশি উপরিউক্ত ভাষণসমূহ যদিও নবী করীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছেন, কিন্তু এটার মূল লক্ষ্য মক্কার ভ্রান্ত কাফের দল এবং দুনিয়ার ইসলাম বিরোধী ভ্রান্ত মানুষসমূহ। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে নবী! তাদের সাথে বুঝাপড়া করার দায়িত্ব আপনার নয়। আমার কাছে তাদেরকে ছেড়ে দিন, আমিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবো। তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে এমনভাবে নিয়ে যাবো যে, তারা বুঝতেও পারবে না, তারা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় তাদের শেষ মঞ্জিল। অজ্ঞাতসারে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ হলো– সত্যের দুশমন ও জালিম লোকদেরকে দুনিয়ায় বহুবিধ নিয়ামত ধন-ঐশ্বর্য এবং বিত্ত-সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি দান করা হয়। বৈষয়িক জীবনে সাফল্য দান করে তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, তারা যা কিছু করছে ভালোই করছে। তাদের সব কাজ-কর্মই সঠিক ও নির্ভুল। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের পাপাচারী ভূমিকা এবং সত্যের বিরোধিতার গতিবেগ বহুগুণে বেড়ে যায়। এ দুনিয়ায় যা কিছু নিয়ামত দান করা হয় তা সবই তাদের ধ্বংস ও বিনাশের কার্যকারণে পরিণত হয়। উপরিউক্ত ৪৪নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, আর পরবর্তী আয়াতে বলেছেন, আমি তাদেরকে নিয়ামত ও প্রাচুর্যের মধ্যে রেখে অবকাশ দিয়ে চলেছি। এ নিয়ামত ও অবকাশদান তাদেরকে ধ্বংস করার আমার একটি সুদৃঢ় ও সুচতুর কৌশল বিশেষ। বস্তুত আমার কৌশল এতই সূক্ষ্ম যে, মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

كَيْدِىْ শব্দের তাৎপর্য : এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো ষড়যন্ত্র করা। নির্দোষ ও শত্রুতার জন্য গোপনে কারো বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র করা মহাপাপ; কিন্তু কোনো লোকের কর্মদোষে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, তার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র ব্যতীত কোনো গত্যন্তর থাকে না, তখন ষড়যন্ত্র করা দোষ নয়। উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের নিজ কর্মদোষে সৃষ্ট পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করেই তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর গোপন ষড়যন্ত্র ও কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَمْ تَسْئَلُهُمْ ... مُثْقَلُوْنَ (الاية)" : এখানে আল্লাহ তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলছে যে, "আপনি কি তাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছেন যে, এরা এ অর্থ-দণ্ডের বোঝার তলে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে" বাহ্যত প্রশ্নটি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট করা হয়েছে; কিন্তু আসলে এ প্রশ্ন করা হয়েছে সেই লোকদের প্রতি যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরোধিতা করার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, আমাদের রাসূল কি তোমাদের নিকট কোনো কিছু চাচ্ছেন? তিনি যে প্রকৃতই একজন নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। তিনি তোমাদের সম্মুখে দীনের দাওয়াত পেশ করছেন কেবলমাত্র এ কারণে যে, এতেই তোমাদের সঠিক কল্যাণ নিহিত বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এ ছাড়া এর পিছনে আর কোনো কারণ নেই, তা তোমরা জান। এটার পরও তোমরা যদি তা মেনে নিতে প্রস্তুত না হও তবে মেনে নিও না। সেজন্য তোমাদের এতটা রাগান্বিত হয়ে উঠার কারণ থাকতে পারে? তোমরা তাঁর সাথে এ কোন্ ধরনের আচরণ করছ?

আল্লাহর আনুগত্যের উপর বিনিময় চাওয়া জায়েজ হবে কি? : এ প্রসঙ্গটি খুবই দীর্ঘালোচনার বিষয় বটে। তবে এখানে খুবই দীর্ঘালোচনার স্থান নয় বিধায় খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বলা আবশ্যক মনে হয়।

মূলত اُجْرَةٌ عَلَى الطَّاعَةِ তথা আল্লাহর অনুগত্যের উপর বিনিময় গ্রহণ করা হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম হতে مُتَقَدِّمِيْنَ [মুতাকাদ্দেমীন]-এর সময় পর্যন্ত জায়েজ ছিল না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন–

قَوْلِهِ ﷺ اتَّخِذُوْا مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلٰى اَذَانِهِ اَجْرًا .

তোমরা এমন একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করো যে তার আজানের কোনো বিনিময় গ্রহণ করবে না। এ হাদীসটিকে দলিলরূপে গ্রহণ করে مُتَقَدِّمِيْنَ ধর্মীয় কার্যাবলির উপর কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ করাকে হারাম বলেছেন।

মুতাআখখিরীনগণ এ মাসআলার উপর খুবই তীক্ষ্ণ নজর পেশ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদি এমনিভাবে কেবল تَعْلِيْمِ دِيْن -কে ছেড়ে রাখা হয় তবে ছাত্র-শিক্ষক কাউকে এটার উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যাবে না। ফলে দীনে এলাহী অচিরেই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবে। তাই দীন রক্ষার্থেও ছাত্র-শিক্ষক গণের ধর্মের প্রতি আগ্রহ জন্মানো ও ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেখানে ধর্ম বিলীন হওয়ার ভয় থাকবে সেখানে আল্লাহর অনুগত্যের উপর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ হবে। যথা– কুরআন শিক্ষা দেওয়া, ইমামতি করা, দীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। আর যেখানে ধর্ম বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না সেখানে তবে আল্লাহর অনুগত্যের উপর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ" (الاية) : উল্লিখিত আয়াতটির দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমত তাদের নিকট কি লাওহে মাহফূয আছে? সুতরাং তারা তার মধ্যে নিজেদের কুফরি এবং শিরকের জন্য নিজেদের খাতায় নেকী লিখে নিচ্ছে আর এ কারণেই তারা শিরক ও কুফরির উপর অটল এবং অনড় রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থটি হলো যে, গায়েবী জিনিসসমূহ তাদের মন-মগজে এসে উপস্থিত হয়েছে, এটার ফলে তারা আল্লাহর উপর কলম ধরছে– লিখছে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের উপর স্বীয় ইচ্ছা হুকুম এবং ফরমান চালাচ্ছে। আয়াতে উল্লিখিত জিজ্ঞাসাবোধক অব্যয়টি তথা اِسْتِفْهَامْ টি اِنْكَارْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। –[কাবীর]

অনুবাদ :

٤٨. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فِيْهِمْ بِمَا يَشَاءُ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ، فِي الضَّجَرِ وَالْعُجْلَةِ وَهُوَ يُوْنُسُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِذْ نَادٰى دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ مَكْظُوْمٌ مَمْلُوْءٌ غَمًّا فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ .

৪৮. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় তাদের ব্যাপারে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। আর আপনি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হবেন না অধৈর্য ও তড়িঘড়ি করায়। আর তিনি হলেন হযরত ইউনুস (আ.)। যখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তখন বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর ছিলেন মৎস্য উদরে চিন্তায় অস্থির।

٤٩. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ أَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ بِالْعَرَاءِ بِالْأَرْضِ الْفَضَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ لٰكِنَّهُ رُحِمَ فَنُبِذَ غَيْرَ مَذْمُوْمٍ .

৪৯. যদি না তাঁর নিকট পৌছত তাঁকে সহায়তা করত অনুগ্রহ রহমত তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে, তবে তিনি নিক্ষিপ্ত হতেন মৎস্য উদর হতে উন্মুক্ত প্রান্তরে খোলা জায়গায় লাঞ্ছিত হয়ে কিন্তু তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে। তাই লাঞ্ছনাহীনভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

٥٠. فَاجْتَبٰهُ رَبُّهُ بِالنُّبُوَّةِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ الْأَنْبِيَاءِ .

৫০. অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে নির্বাচিত করলেন নবুয়ত মাধ্যমে এবং তাঁকে সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত করলেন নবীগণের।

٥١. وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا بِأَبْصَارِهِمْ أَيْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ نَظْرًا شَدِيْدًا يَكَادُ أَنْ يَّصْرَعَكَ وَيُسْقِطَكَ عَنْ مَكَانِكَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ وَيَقُوْلُوْنَ حَسَدًا إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ بِسَبَبِ الْقُرْاٰنِ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ .

৫১. আর কাফেরগণ যেন আপনাকে আছড়ে ফেলে দিবে يُزْلِقُوْنَ শব্দটি ى-এর মধ্যে পেশ ও যবর যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ তারা আপনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, যেন তারা আপনাকে আছড়ে ফেলবে এবং আপনাকে স্বীয় মর্যাদা হতে ছুঁড়ে ফেলবে। যখন তারা উপদেশ শ্রবণ করে কুরআন। এবং তারা বলে বিদ্বেষবশে। এতো পাগল এ কুরআনের কারণে, যা তিনি আনয়ন করেছেন।

٥٢. وَمَا هُوَ أَيِ الْقُرْاٰنُ إِلَّا ذِكْرٌ مَوْعِظَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ لَا يَحْدُثُ بِسَبَبِهِ جُنُوْنٌ .

৫২. আর তা তো কুরআন উপদেশ নসিহত জগদ্বাসীর জন্য মানব ও জিনের জন্য। তার কারণে উন্মাদনা সৃষ্টি হয় না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَهُوَ مَكْظُوْمٌ : বাক্যটি মহল্লে নসবে আছে হাল হওয়ার কারণে। বাক্যটি نَادٰى-এর ফায়েল হতে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ (الاية) : تَدَارَكَ ফে'ল, نِعْمَةٌ মাউসূফ, مِنْ رَبِّهِ সিফাত। সম্পূর্ণ বাক্যটি تَدَارَكَ-এর ফায়েল, ة যমীর মাফউল। لَنُبِذَ শব্দটি لَوْلَا-এর জওয়াব।

قَوْلُهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ : বাক্যটি مُسْتَأْنِفَةٌ অথবা মহল্লে নসবে আছে يَقُوْلُوْنَ-এর ফায়েল হতে হাল হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الخ -এর শানে নুযূল : উক্ত আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে সাবী গ্রন্থকার বলেন, যখন উহুদের ময়দানে রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুনাফিকদের উত্তেজিত ভাব দেখে পলায়ন করেছিলেন, তখন পলাতক ব্যক্তিবর্গের প্রতি হুযূর ﷺ বদদোয়া করতে মনস্থ করলেন, এমতাবস্থায় তাঁকে বদদোয়া হতে বিরত থাকার নিমিত্তে আয়াত নাজিল হলো।

কারো কারো মতে, মক্কাবাসীদের অত্যাচার-ব্যভিচারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে খুব ব্যথা জেগেছিল এবং মক্কার কাফেররা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। কারো কারো মতে, এ অত্যাচারী লোকগণ ছিল বনু ছাকীফ গোত্রীয় লোক। অত্যাচারীগণ রাসূল ﷺ-কে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পা মুবারক রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বদদোয়া করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ الخ

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি তাদের তীব্র শত্রুতার কারণে তাঁর কথা শ্রবণ করার সময় তাঁর প্রতি এরূপ চক্ষু ফিরিয়ে দেখত যেন তাকে মাটিতে ফেলে দেবে, অথবা ক্রোধের দ্বারা যেন তাঁকে খেয়ে ফেলবে। তাদের মন-মগজ ও সর্ব শরীরের শত্রুতা চক্ষু দ্বারা প্রকাশ করত। তখন কাফেরদের উক্ত অবস্থা বর্ণনায় وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْاٰيَةَ অবতীর্ণ হয়।

অথবা, তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- বনী আসাদ গোত্রে কয়েকজন কুদৃষ্টি নিক্ষেপক লোক ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁর উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। তখন اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ ... لِلْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয় অবগত করা এবং কুদৃষ্টির কোনো প্রভাব তাঁর উপর পড়বে না বলে জানিয়ে দেওয়া এবং তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করা উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুদৃষ্টির সর্বপ্রকার প্রভাব হতে মুক্ত রেখেছেন। সিহাহ সিত্তায় হযরত আবূ হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, اَلْعَيْنُ حَقٌّ কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য। অর্থাৎ কুদৃষ্টি নিক্ষেপক ব্যক্তি কোনো বস্তুর প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই এ বস্তুর ক্ষতি হবে। এটা হতে বাঁচার জন্য তাবিজ-কবজ ইত্যাদি দ্বারা তদবির করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। হযরত হাসান হতে বর্ণিত হয়েছে, বদ-নজর দূর করার জন্য এ আয়াতদ্বয় পাঠ করে ফুঁক দিলে বদ-নজরের প্রভাব দূরীভূত হয়। -[রূহুল মা'আনী, খাযেন]

সাহেবে হূতের ঘটনা : আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ভাষণের জের টেনে মহানবী ﷺ-কে কাফেরদের তিরস্কার-জ্বালাতন, দীনের বিরোধিতাকরণ এবং তাঁকে উন্মাদ ও পাগল আখ্যাদান ইত্যাদি ব্যাপারে অতিষ্ঠ ও অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আর বহু বছর পূর্বেকার একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, আপনি সেই মাছওয়ালার ন্যায় ধৈর্যহারা হবেন না; যে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করেই দেশ ছেড়ে পলায়ন করেছিল। এ মাছওয়ালা হলেন আল্লাহর একজন মনোনীত নবী। তাঁর জীবন চরিত্র অতি সংক্ষেপে প্রথম তিনটি আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। এ মহামতি নবী হলেন হযরত ইউনুস (আ.)। তাঁকে 'মাছওয়ালা' কেন সম্বোধন করা হয়েছে তার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য এখানে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী উল্লেখ করছি।

হযরত ইউনুস (আ.) কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, তার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পিতার নাম ছিল মাত্তা, তা অনেক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন তাঁর বয়স ২৮ বছর হয়, তখন তিনি নবুয়ত লাভ করেন। ইতিহাস গ্রন্থ দ্বারা জানা যায় যে, তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ের নবী ছিলেন। তাঁকে অসুরীয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। অসুরীয়দের বিরাট এক গোত্রভিত্তিক সাম্রাজ্য ছিল, যার কেন্দ্রীয় শহর ছিল প্রাচীন নিনাওয় শহর। এ শহরটি বর্তমান ইরাকে অবস্থিত। এ নগরীর ব্যাপক ধ্বংসাবশেষ বর্তমানেও দাজলা নদীর পূর্বতীরে বর্তমান মুসেল শহরের বিপরীত দিকে বিদ্যমান রয়েছে। এ অঞ্চলে 'ইউনুস নবী' নামে একটি স্থান এখনও রয়েছে। এ জাতির লোকের সেকালে যে কত উন্নত ছিল, তা রাজধানী নিনাওয়া প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী এলাকা জুড়ে থাকার দ্বারা অনুমান করা যায়। এ নিনাওয়া শহরেই অসুরীয়দের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে নবী করে পাঠান। কুরআনের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়- ঐ সময় ঐ শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষ হতেও বেশি ছিল। তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে দীন ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন; কিন্তু তাঁর দাওয়াতে কেউ কর্ণপাত করল না। তখন তিনি তাদের প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে আল্লাহর গজব নাজিল হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে শহর ছেড়ে দূরে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

এদিকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে নগরীর লোকজন আল্লাহর গজব নাজিল হওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সন্ধানে বের হলো। তারা ভাবল হযরত ইউনুস (আ.) সত্যই আল্লাহর নবী। তাঁর কথা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-কে না পেয়ে নগরীর রাজাসহ সকল লোক নিজেদের পশুপালসহ ময়দানে গিয়ে জমায়েত হয়ে কান্নে

ওবা করল এবং হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর দীনকে কবুল করে নিল। ফলে আল্লাহ তাদের উপর হতে আজাবের ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা নিরাপদে রয়ে গেল; কিন্তু এ সব হযরত ইউনুস (আ.) কিছুই জানলেন না। তিনি ত্রিশ দিন অপেক্ষা করার পর আজাব না আসতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। শহরবাসীদের নিকট তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন। তিনি লজ্জায় কিভাবে মুখ দেখাবেন। তাই তিনি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করে ঐ অঞ্চল ছেড়ে পশ্চিম দিকে রওয়ানা হলেন, পথে ফোরাত নদী পার হওয়ার জন্য খেয়াতরীতে অনেক লোকসহ উঠলেন। খেয়া নদীর মাঝখানে যাওয়ার পর নদীতে তুফান সৃষ্টি হলো। খেয়া ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ সময় লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, নিশ্চয় হয়তো আমাদের মধ্যে মনিব হতে ভেগে আসা কোনো গোলাম থাকবে; তার কারণেই খেয়াতরীর এ অবস্থা। হযরত ইউনুস (আ.) ভাবলেন আমিই তো আমার প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না করে চলে আসছি। পরিশেষে তিনি নিজে পলায়নকারী গোলাম বলে পরিচয় দিলেন। তখন এরূপ লোক কে? তা অবগত হওয়ার জন্য তিনবার লটারী করা হলো। তিনবারই হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম উঠল। অতঃপর তাঁর এবং লোকদের ইচ্ছায় তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করা হলো, নদীর তুফান থেমে গেল। খেয়াতরী নিরাপদ হলো। এদিকে আল্লাহর নির্দেশে বিরাট এক মৎস্য হযরত ইউনুস (আ.)-কে গিলে ফেলল। মৎস্যের পেটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে তিনি আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা জানালেন لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ – আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। আল্লাহর নির্দেশে মৎস্য তাঁকে নদীর তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বমি করে ফেলে দিল। তখন তাঁর অবস্থা ছিল অতিশয় দুর্বল ও নাজুক। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা উক্ত স্থানে একটি ছায়াবৃক্ষ জাগিয়ে দিলেন। হযরত ইউনুস (আ.) এ বৃক্ষতলে থেকে প্রখর রৌদ্রতাপ হতে নিরাপদ রইলেন। কিছুটা সুস্থতা বোধ করার পর তথায় একটি ঝুপড়ি নির্মাণ করে বৃক্ষ তরুলতার ফল আহার করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। অতঃপর আবার আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ব মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়ে নিনাওয়াবাসীদের হেদায়েতের দায়িত্ব দিয়ে তথায় পাঠালেন। বাকি জীবন নিনাওয়া অধিবাসীদের হেদায়েত ও নসিহতে কাটিয়ে দিয়ে ঐ নিনাওয়া শহরেই ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তিনি সমাধিস্থ হন। –[কাসাসুল কোরআন, নাদওয়া]

হযরত ইউনুস (আ.) গুনাহ করেছেন কিনা? : বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, হযরত ইউনুস (আ.) হেদায়েতের দায়িত্ব লাভ করে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করে সে দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার দ্বারা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এ জন্য তিনি গুনাহগারও হয়েছেন; কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরাম ও আহলে সুন্নতের অভিমত অনুযায়ী নবীগণ নবুয়তি দায়িত্ব লাভ করার পর হতে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ থাকেন। আল্লাহ তাঁদেরকে গুনাহ হতে নিরাপদ রাখেন। তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে চলে আসার ঘটনাকে এভাবে ব্যাখ্যা দেন যে, মূলত তিনি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেননি; বরং মুখ-লজ্জার ভয়ে দূরে সরে পড়েছিলেন। এ জন্য আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে তা তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। সুতরাং কোনো কাজ অনিচ্ছায় হয়ে পড়লে তাকে অপরাধ বা গুনাহ বলা যায় না। তাফসীরে খাযেন এবং কাবীর-এর লেখক এ প্রশ্নের উত্তরে তিনটি সমাধান পেশ করেছেন। এক. উপরোল্লেখিত ৪৯নং আয়াতের لَوْلَا শব্দই প্রমাণ করে যে, তাঁর দ্বারা এমন কোনো দূষণীয় কাজ হয়নি, যা গুনাহকে অপরিহার্য করে। দুই. হয়তো এটা দ্বারা আফযাল ও মুস্তাহাব পর্যায়ের কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে– ফরজ ওয়াজিব শ্রেণির কোনো কর্তব্য নয়। তিন. এ ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর নবুয়ত লাভ করার পূর্বে। কেননা পরবর্তী ৫০নং আয়াত প্রমাণ দেয় যে, এ ঘটনার পরই তাঁকে নবীরূপে নির্বাচিত করে তাঁর নিকট ওহী পাঠানো হয়েছিল। বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী فَاجْتَبٰهُ শব্দের فَ অক্ষরটি পূর্ববর্তী অবস্থার জের বুঝাবার জন্যই ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ .... فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ : অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলার ইহসান তার প্রতি না হতো তিনি যে ময়দানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন মাছের গর্ভ হতে, তখন তথায় তিনি খুবই সংকটময় অবস্থায় এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতেন تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ দ্বারা এখানে তওবা কবুলকে বুঝানো হয়েছে। এটার তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার লিখেছেন أَدْرَكَهُ رَحْمَةٌ [তাকে রহমত পেয়েছে]

সূরা صَافَّاتٌ-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ যদি তিনি তওবা ও ইস্তিগফার না করতেন, তবে অবশ্যই মাছের পেটে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকতেন। আর যদি তিনি তওবা করতেন এবং আল্লাহ তাঁর তওবা ও ইস্তিগফার কবুল ও মঞ্জুর না করতেন, তবে দুনিয়াতে এটার বরকত অবশ্যই হতো এবং মাছের গর্ভ থেকেও নাজাত পেতেন, আর যেভাবে তওবা কবুল -এর পর ময়দানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, সেভাবেই নিক্ষিপ্ত হতেন, তবে তখন তাঁর অবস্থা مَذْمُوْمٌ খুবই নিকৃষ্ট হতো, অর্থাৎ তাঁর উপর عِتَابٌ বা ভর্ৎসনা আসত, তওবা কবুল -এর কারণে حَالَتْ مَذْمُوْمٌ হয়নি। কেননা তওবা কবুল -এর পর مَلَامَتٌ ও مَذَمَّتٌ আসে না, এটা আল্লাহর নীতিমালা।

অতঃপর তাঁর প্রভু তাঁকে আরও অধিক পছন্দশীল বানিয়ে নিয়েছেন নবুয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে এবং তাঁকে নেককারদের মধ্যে অধিক মর্যাদাশীল করে দিলেন।

قَوْلُهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ : এ শব্দটির তাফসীর বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্নরূপ করেছেন। জালালাইন গ্রন্থকার বলেন, مِنَ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ নবীগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এটা হতে বুঝা যায় উক্ত ঘটনা তাঁর নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল। কারো কারো মতে, তিনি ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেও নবী ছিলেন। তখন اِجْتَبَاهُ অর্থ হবে اِنْ رَدَّ عَلَيْهِ الْوَحْىَ بَعْدَ اَنْ كَانَ قَدْ اِنْقَطَعَ عَنْهُ অর্থাৎ ঘটনার সময় ওহী আগমন বন্ধ হয়ে গেছে, পুনরায় আবার ওহীর আগমন ঘটেছে। -[জুমাল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاِنْ يَّكَادُ .... اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ" : সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা কিতাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতকে রাগ ও ক্ষোভের সাথে দেখত তারা কিভাবে রাসূলের দিকে বিষচক্ষে দেখত, তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখত। কুরআন তাদের চিত্রটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে। তারা এমনভাবে চাইত যে, তারা যেন আপনাকে আছড়ে ফেলবে, আপনাকে সমূলে উৎপাটন করবে তাদের দৃষ্টির বানে। যখন তারা কুরআন শুনত, আর তারা বলত "সে নিশ্চয় পাগল" তাদের এই দৃষ্টি যেন রাসূলের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাদের চাহনীর মাধ্যমে যেন তারা রাসূলকে গিলে খেতে চায়। এটার মাধ্যমেই জানা যায়, তারা রাসূলের দাওয়াতের ব্যাপারে কতটা উন্মত্ত ছিল, কতটা ক্ষিপ্ত ও ক্রোধান্বিত ছিল। তারা রাসূলকে বিষচক্ষে দেখত। রাসূলুল্লাহ তাদের চোখের বিষে পরিণত হয়েছিলেন। তারা চাইত যে, দৃষ্টি বানে তাকে ভস্ম করে ফেলতে। আর তারা রাসূলকে কুরআনের বাণী শুনাতে দেখে পাগল বলত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে চরম ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পাগল বলে গালি দিত। -[যিলাল]

আয়াতের ব্যাখ্যা : বলা হয়েছে যে, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি উপরে ইঙ্গিতকৃত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার হেদায়েতের পাবন্দ হোন। আর কাফেরদের থেকে সদা হুঁশিয়ার থাকা চাই, কেননা তারা আপনার প্রাণের শত্রু। যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন মনে হয় যেন তারা তাদের কুদৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আপনার স্থান হতে দূরে নিক্ষেপ করে ফেলবে। আর তারা এমন বদকার যে, কুরআন শুনে আপনাকে পাগল ও উন্মাদ বলে বেড়ায়। আর বলে এ কুরআন নামক বিষয়টি সাধারণ কেস্‌সা-কাহিনীসমূহের একটি গ্রন্থ মাত্র। অথচ এ কালাম সারা বিশ্ববাসীদের জন্য কেবল জিকির ও নসিহত বৈ আর কিছুই নয় আর এটা তাদের فَلَاحٌ وَصَلَاحٌ করার মূল ব্যবস্থাপনা। এমন বাণীর বাহককে কি করে دِيْوَانٌ ও مَجْنُوْنٌ বলা যেতে পারে আফসোস শত আফসোস।

ইমাম বাগাবী (র.) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ উপরিউক্ত আয়াতসমূহের সম্পর্কে বলেন, মানুষের বদনজর বা কুদৃষ্টি মানুষ ও অন্যান্য সব কিছুর উপর কার্যকর করা যেভাবে সকলেরই নিকট জানাশুনার বিষয় সেভাবে এটার সম্পর্কে হাদীস শরীফেও বর্ণনা রয়েছে। হুযূর ﷺ বলেন, وَاِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ وَالرَّجُلَ الْقَبْرَ الْعَيْنُ حَقٌّ অর্থাৎ কুদৃষ্টি উটকে হালাক করে দেয় এবং মানুষকে ধ্বংস করে এমনকি কবর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। আর কুদৃষ্টি সত্য।

আরব দেশেও এ বিষয়টি সকলেরই জানাশুনা ছিল। মক্কা নগরে এক ব্যক্তি বদ-নজর দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। উট অথবা মানুষ বা অন্যান্য জানোয়ার ইত্যাদির মধ্যে যদি তার বদ-নজর লাগত তবে তা তৎক্ষণাৎ মরে যেত। যথা বলত لَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مِثْلَهٗ [আজ আমি এটার তুল্য কোনো কিছু দেখিনি।] মক্কাবাসী কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিঃশেষ করার জন্য সর্বপ্রকার হীন চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলো। একদা সে মক্কার বনী আসাদ গোত্রের লোকটির মাধ্যমে বদ-নজর লাগিয়ে তাঁকে শেষ করার উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল এবং শত চেষ্টা-চালিয়েও কিছু করতে পারেনি। (মা'আরিফ, মাদারিক) কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ৯৯ বিমারের দোয়াটি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়ে নিলেন। ফলে তার স্বীয় মনোষ্কামনায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল।

বি. দ্র. হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তির উপর বদ-নজর লেগে যায় তবে অত্র সূরার শেষ আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করে উক্ত ব্যক্তির প্রতি ফুঁক দিলে বদ-নজরের দোষ বিনষ্ট হয়ে যাবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের উক্তি খণ্ডন করে বলছেন যে, তিনি পাগল নন। তিনি যে কুরআন পাঠ করে শুনান তা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ। মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে চরম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন তখনই আল্লাহ ঘোষণা করেন কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ, কুরআন বিশ্ববাসীর কাছে পৌছবে। এতে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, কুরআন একদিন বিজয় লাভ করবে, বিশ্ববাসীর কাছে কুরআন উপস্থিত হবে। এতে বুঝা যায় যে, ইসলাম তার যাত্রালগ্ন থেকেই সারা দুনিয়ায় তার দাওয়াত ছড়াতে চায়- এটাই আল্লাহ চান। ইসলাম মক্কা থেকেই বিশ্ববাসীর নিকট তার দাওয়াত পেশ করেছে, বিশ্ববাসীর নিকট উপদেশ পেশ করেছে। -[যিলাল]

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ : সূরা আল-হাক্কাহ্

এ সূরাটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে দু'টি রুকূ এবং ৫২ টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায় ২৫৬ টি বাক্য ও ১৪৮০ অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির নাম اَلْحَاقَّةُ রাখা হয়েছে সূরাটির প্রথম শব্দের দিকে লক্ষ্য করে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন اَلْحَاقَّةُ কিয়ামতের একটি নাম যার অর্থ অবশ্যম্ভাবী বা আবশ্যকীয় ঘটনা। আর এ নামকরণের কারণ হলো, কিয়ামতের দিনই সকল প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়ন হবে। কিয়ামত ধ্রুব সত্য এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। অথবা, এ নামকরণের কারণ এও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিনই সকল বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য জানা যাবে। সেদিনই সকল আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ' এবং ৫২টি আয়াত, ২৫৬টি বাক্য ও ১৪৮০টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

নাজিল হওয়ার সময়কাল : আল-কুরআনের এ সূরাটি ওহী অবতীর্ণের প্রাথমিক পর্বে নাজিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত। তবে কখন অবতীর্ণ হয়, তা সঠিক করে কিছু বলা যায় না; কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক পূর্বেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। বর্ণটি হলো এই– হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হলাম। আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি হেরেমের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং নামাজে দাঁড়িয়ে গেছেন। আমি গিয়ে শুনতে পেলাম যে, তিনি সূরা আল-হাক্কাহ্ পাঠ করছেন। আমি কুরআনের বাচন-ভঙ্গি ও বাক্য-বিন্যাসের মধুরতা ছন্দের ঝংকার শ্রুত হয়ে অভিভূত হলাম এবং মনে মনে বললাম– ইনি নিশ্চয় একজন উন্নত শ্রেণির কবি হবেন, নতুবা এমনি মোহনীয় ছন্দের বাক্য আর কে-ই বা রচনা করতে পারে। কুরাইশগণ তো এটাই বলে থাকেন। তখনই মহানবীর কণ্ঠে শুনতে পেলাম 'এটা এক মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের বাণী, কোনো কবির বাক্য নয়।' আমি মনে মনে বললাম, কবি না হবেন তো গণকঠাকুরের কথা অবশ্যই হবে। আর তখনই তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো 'এটা কোনো গণকঠাকুরের কথা নয়।' তোমরা চিন্তা-ভাবনা খুব কমই কর। এটা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। এটা শুনার ফলে তো ইসলাম আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। –[মুসনাদে আহমদ]

হযরত ওমর (রা.)-এর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই অবতারিত। কেননা এ ঘটনার পরও বহুদিন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার প্রথম রুকূ'তে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কীয় আলোচনা এবং দ্বিতীয় রুকূ'তে কুরআন আল্লাহর অবিসংবাদিত মহাসত্য কালাম এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সূরার ১-১২নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ঘটিতব্য বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিয়ামতের অস্বীকারকারী প্রাচীন আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের সম্প্রদায়সমূহকে এ অবিশ্বাসের কারণে ধ্বংস করার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১৩-১৭নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে, তার বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। অতঃপর ১৮-৩৭নং আয়াত পর্যন্ত মূল বিষয়টি বলে দেওয়া হয়েছে। তা হলো, পার্থিব জীবনের পর পরকালীন অনন্ত জীবন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর সকল মানুষ হিসাব-নিকাশ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সমবেত হবে। এই পার্থিব জগতে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি; কিয়ামত, হাশর-নশর ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্মশীল জীবন যাপন করেনি, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তথায় জ্বালাময়ী শাস্তি ও অসম্মানজনক খাদ্য আহার প্রদান করা হবে। তখন কারো কোনো আমল গোপন করা হবে না। সকলের গোপন কথাই তুলে ধরা হবে এবং মু'মিনগণকে ডান হস্তে ও কাফেরগণকে বাম হস্তে আমলনামা দেওয়া হবে। মু'মিনগণ চিরন্তন-শাশ্বত, সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দমুখর জীবন যাপন করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে কেউ রেহাই দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত চিরন্তর জাহান্নামই হবে তাদের স্থান।

৩৮-৫২নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিষয় আলোচনা রেখেছেন। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। এটা কোনো কবির রচিত কবিতার চরণ নয় এবং কোনো গণকঠাকুরের বল কাহিনীও নয়; বরং বিশ্ব-পালকের নিকট হতে অবতারিত কিতাব। রাসূল ﷺ যদি নিজ পক্ষ হতে কিছু রচনা করে তা আমার নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, তবে কঠোর হস্তে তা দমন করা হতো। তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। এ কুরআন হচ্ছে আল্লাহভীরু লোকদের জন্য উপদেশ ভাণ্ডার বিশেষ। তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে, যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরকে ভালোভাবেই জানি। এ কুরআনই হবে কাফেরদের জন্য পরকালে অনুশোচনার কার্যকারণ। এ কুরআন এক মহাসত্য আল্লাহর কালাম। সুতরাং হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায় গুণগানে মশগুল থাকুন। কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় নবী করীম ﷺ-এর রেসালাতের সত্যতার প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। অহংকার এবং নাফরমানির শোচনীয় পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। আর এ সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইতঃপূর্বে যেসব জাতি আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তাও বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য সূরায়। –[নূরুল কোরআন]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বিভিন্ন ফজিলত তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন–

১. যদি কারো কেবল গর্ভ বিনষ্ট হয়ে যায় কোনো প্রকারেই রোধ করা যায় না। তখন কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র সূরা লিখে গর্ভধারণকারিণীর সাথে তাবিজ বানিয়ে ব্যবহার করলে ইনশাল্লাহ তার গর্ভ নষ্ট হবে না, সুস্থ-নিরাপদ থাকবে। –[আ'মালে কুরআনী]

২. মায়ের গর্ভ থেকে কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যদি অত্র সূরা তেলাওয়াত করে ফুঁক দেওয়া পানি শিশুকে খাইয়ে দেওয়া যায়, অথবা এক ফোঁটা কেবল মুখে দেওয়া যায়, তখন ঐ বাচ্চার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে [আ'মলে কুরআনী] এবং সকল প্রকার বিপদাপদ ও অসুস্থতা হতে রেহাই পাবে। এটার সংখ্যা ৮১৭০৯।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلْحَاقَّةُ اَلْقِيٰمَةُ الَّتِىْ يُحَقُّ فِيْهَا مَا اُنْكِرَ مِنَ الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ اَوِالْمُظْهِرَةُ لِذٰلِكَ.

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কিয়ামত, যাতে সে সমুদয় বিষয়ই বাস্তবে প্রমাণিত হবে, যেগুলো অস্বীকার করা হয়েছিল। অর্থাৎ পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফলন দান কিংবা কিয়ামত এ সকল বিষয়কে প্রকাশ করে দেবে।

٢. مَا الْحَاقَّةُ تَعْظِيْمٌ لِشَانِهَا وَهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ خَبَرُ الْحَاقَّةِ.

২. কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? এটা দ্বারা কিয়ামতের বিশালত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। مَا অব্যয়টি مُبْتَدَأٌ আর দ্বিতীয় اَلْحَاقَّةُ তার خَبَرٌ আর এ বাক্যটি প্রথম الحاقة -এর خَبَرٌ।

٣. وَمَآ اَدْرٰكَ اَىْ اَعْلَمَكَ مَا الْحَاقَّةُ زِيَادَةُ تَعْظِيْمٍ لِشَانِهَا فَمَا الْاُوْلٰى مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُهُ وَمَا الثَّانِيَةُ وَخَبَرُهَا فِىْ مَحَلِّ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ لِاَدْرٰى.

৩. আর আপনাকে কিসে জানাবে অর্থাৎ অবহিত করবে যে, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি? তার বিশালত্ব বর্ণনায় অতিরিক্ত। সুতরাং প্রথমোক্ত مَا অব্যয়টি مُبْتَدَأٌ ও তৎপরবর্তী বক্তব্য তথা اَلْحَاقَّةُ তার خَبَرٌ আর দ্বিতীয় مَا অব্যয়টিও তার خَبَرٌ মিলে বাক্য হয়ে اَدْرٰى ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ ثَانِىْ -এর স্থলে অবস্থিত।

٤. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ الْقِيَامَةِ لِاَنَّهَا تَقْرَعُ الْقُلُوْبَ بِاَهْوَالِهَا.

৪. ছামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়কে কিয়ামত, এটাকে قَارِعَةٌ এ জন্য বলা হয়েছে, যেহেতু তার বিভৎসতা মনুষ্য অন্তরে করাঘাত করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْحَاقَّةُ : মুবতাদা مَا الْحَاقَّةُ খবর। وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ বাক্যে وَاوْ হরফে আতফ, مَا মুবতাদা, اَدْرٰى এটার খবর ك যমীর প্রথম মাফঊল, مَا الْحَاقَّةُ দ্বিতীয় মাফঊল اَدْرٰى ক্রিয়ার। سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ জুমলায়ে মুস্তানিফা তাদের ধ্বংসের كَيْفِيَّةٌ বর্ণনা করার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ .... وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ : اَلْحَاقَّةُ অর্থ : আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন, اَلْحَاقَّةُ -এর আসল হলো اَلْحَاقَّةُ اَىُّ شَيْءٍ هِيَ অর্থাৎ اَلْحَاقَّةُ কেমন মহাগুরুত্বপূর্ণ ও কতইনা ভয়াবহ ব্যাপার। অধিক ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য ظَاهِرِىْ অবস্থাকে بَاطِنِىْ অক্ষর সংযুক্ত করে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে اَلْحَاقَّةُ শব্দটি দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ কিয়ামতের এক নাম হলো-
لْحَاقَّةُ وَاَيْضًا فِى الْكَبِيْرِ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ الْحَاقَّةَ هِيَ الْقِيَامَةُ .

আর اَلْحَاقَّةُ -এর শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে-

১. اَلْحَقُّ অর্থ হলো اَلثَّابِتُ ও اَلْكَائِنُ অর্থাৎ اَلْكَائِنُ وَالثَّابِتُ -এর লক্ষ্যে اَلْحَاقَّةُ বলতে ঐ সময়কে বুঝানো হয়েছে যা সংঘটিত হওয়া ও আগমন করা সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সন্দেহ নেই।

২. অর্থাৎ اَلْحَاقَّةُ এমন বিষয় যাতে সকল বিষয় উপস্থাপিত হবে। অর্থাৎ সব কিছুর হাকিকত সম্পর্কে জানা যাবে। আর কিয়ামত স্বয়ং حَقٌّ ও সত্য এবং তা স্থাপিত হওয়া নিগূঢ় সত্য ও নিশ্চিত বিষয়। আর কিয়ামত ঈমানদারদের জন্য বেহেশত হবে এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নাম সাব্যস্ত করবে।

আর اَلْحَاقَّةُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ হতে ব্যবহৃত يُثْبِتُ অর্থ يُحِقُّ তখন كَقَوْلِهِ تَعَالٰى لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ হিসেবে حَاصِلٌ اَبَاتٌ হবে- 'যে কিয়ামতকে তদানীন্তন কাফেরগণ কিয়ামত ও পরকালকে এবং পরকালে একদিন বিধাতার দরবারে হিসাব নিয়ে হাজির হতে হবে' এ কথা অমান্য করেছিল তা মিথ্যা। বরং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া চিরন্তন সত্য কথা, আর তা কত যে ভয়াবহ ও মহাবিপদের দিন হবে তা বলার অবকাশ রাখে না। 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় যদিও তাকে অবিশ্বাস করেছিল তথাপিও তা বাস্তব সত্য হিসেবে প্রকাশ পাবে।

اَلْقَارِعَةُ অর্থ : এটা قَرْعٌ হতে উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ ফারসি ভাষায় অর্থ دَرْ كُوْفْتَنْ (صِرَاحْ) আর করাঘাতকারী বিষয়কে قَارِعَةٌ বলা হয় কিয়ামতের দিবস বুঝাবার জন্য। এ শব্দ এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, তা সকল মানুষকে অধৈর্য ও অস্বস্তি করে তুলবে এবং আসমান-জমিনকে ভেঙ্গে চিরে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবে।

আর قَارِعَةٌ অর্থ মহাবিপদ ও বিধ্বংসকারী দুর্যোগ, অথবা মহাপ্রলয় অর্থাৎ তার ভয়-ভীতি মানুষের অন্তরে ঘণ্টার মতো ভীতির শব্দ বেজে উঠে এবং অন্তরকে কিয়ামতের ভয়ে প্রকম্পিত করে তোলে।

আর যদি قَارِعَةٌ অর্থ "শাস্তি" নেওয়া হয় তখন অর্থ হবে, যারা তাদের নবীগণের মুখে শাস্তির কথা শুনে তা অমান্য করেছে, যেমন- قَوْمُ عَادٍ ও قَوْمُ ثَمُوْدَ সর্বশেষ যখন তাদের উপর মহাশাস্তি নাজিল হয়েছে তখন তাদের হৃদয় থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

আল-হাক্কাহ্ সম্পর্কে দু'টি জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য : আল-হাক্কাহ্ সম্পর্কে পরপর দু'টি জিজ্ঞাসা রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং শ্রোতামণ্ডলীকে বিস্মিত করে দেওয়াই এরূপ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য, যেন তারা কথার গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করে এবং পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে পরবর্তী কথা শুনতে আগ্রহী ও উৎকর্ণ হয়ে উঠে।

অন্যান্য মিথ্যারোপকারীদের কথা উল্লেখ না করে ছামূদ ও 'আদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করার কারণ : এর কারণ এই যে, যুগে যুগে বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামগণের উম্মতগণ যেভাবে তাদের নবীগণের কথা অমান্য করেছে সেভাবে তারা তার সাজাও প্রাপ্ত হয়েছে। তবে قَوْمُ عَادٍ ও قَوْمُ ثَمُوْدَ তাদের নবীগণকে জঘন্যতমভাবে অবমাননা করে জঘন্যতম সাজাও প্রাপ্ত হয়েছে এরা জঘন্যতম জাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করানো এবং তাদেরকে দুর্নীতির সাজার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ উদ্দেশ্য করেছেন। সাধারণ দুর্নীতিবাজদের কথা স্মরণ করিয়ে মক্কার কাফেরগণকে উচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতো না। অবস্থা বিশেষ ব্যবস্থা না করলে হয় না। তাই 'আদ ও ছামূদ জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٥. فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ بِالصَّيْحَةِ الْمُجَاوِزَةِ لِلْحَدِّ فِي الشِّدَّةِ .

৫. আর ছামুদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক বিকট চিৎকার দ্বারা এমন এক চিৎকার যা সীমাহীন বিকট ছিল।

٦. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ شَدِيْدَةِ الصَّوْتِ عَاتِيَةٍ قَوِيَّةٍ شَدِيْدَةٍ عَلٰى عَادٍ مَعَ قُوَّتِهِمْ وَشِدَّتِهِمْ .

৬. আর 'আদ সম্প্রদায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা প্রচণ্ড শব্দবিশিষ্ট عَاتِيَةٌ শব্দের অর্থ– সুকঠিন। 'আদ সম্প্রদায় শক্তিশালী ও কঠোর হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর উক্ত ঝঞ্ঝা-বায়ু সুকঠিন ছিল।

٧. سَخَّرَهَا أَرْسَلَهَا بِالْقَهْرِ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا مِنْ صُبْحِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لِثَمَانٍ بَقِيْنَ مِنْ شَوَّالٍ وَكَانَتْ فِيْ عَجُزِ الشِّتَاءِ حُسُوْمًا قف مُتَتَابِعَاتٍ شُبِّهَتْ بِتَتَابُعِ فِعْلِ الْحَاسِمِ فِيْ إِعَادَةِ الْكَيِّ عَلَى الدَّاءِ كَرَّةً بَعْدَ أُخْرٰى حَتّٰى يَنْحَسِمَ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى مَطْرُوْحِيْنَ هَالِكِيْنَ .

৭. যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন অভিশাপরূপে তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। তাদের উপর সাত রাত ও আট দিন যার প্রথম দিন ছিল বুধবার সকালবেলা, শাওয়াল মাসের আট দিন অবশিষ্ট থাকতে অর্থাৎ চব্বিশ তারিখে, শীত মওসুমের শেষাংশে। বিরামহীনভাবে ধারাবাহিকভাবে, যদ্রূপ দাগদানকারী একের পর এক দাগ বসাতে থাকে, যাবৎ তা দাগবিশিষ্ট না হয়। তদ্রূপ তাদের উপর অবিরাম শাস্তি চলতে থাকে। তখন তুমি সেই সম্প্রদায়কে তথায় লুটিয়ে পড়ে আছে দেখবে ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকাবস্থায় যেন তারা কাণ্ডসমূহ মূলসমূহ সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুরের ভূমিতে পতিত শূন্য।

٨. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ أُصُوْلُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ج سَاقِطَةٍ فَارِغَةٍ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ صِفَةُ نَفْسٍ مُقَدَّرَةٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ بَاقٍ لَا .

৮. অতঃপর তুমি কি তাদের মধ্যে হতে কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাও? بَاقِيَةٌ শব্দটি উহ্য نَفْس-এর সিফাত এবং তন্মধ্যস্থিত تَاءٌ বর্ণটি مُبَالَغَةٌ-এর জন্য। অর্থাৎ بَاقٍ অবশিষ্ট। না, কেউ অবশিষ্ট নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ : এটা তৎপূর্ববর্তী মুবতাদা -এর খবর হয়ে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ : এটা عَادٌ থেকে خَبَرٌ হিসেবে جُمْلَةٌ হয়ে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর صَرْصَرٍ টি رِيْحٍ-এর প্রথম صِفَتٌ হয়েছে এবং عَاتِيَةٌ টি দ্বিতীয় صِفَتٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ : উভয়ই عَطْف وَمَعْطُوْف হয়ে ظَرْفُ زَمَانٍ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হয়েছে।

قَوْلُهُ حُسُوْمًا : টি سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ হতে صِفَتٌ বা نَعْتٌ হয়েছে। অথবা, سَخَّرَهَا-এর مَفْعُوْل ضَمِيْرُهَا হতে حَالٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ وَالْحُسُوْمُ هٰهُنَا اِسْتِعَارَةٌ بِتَشْبِيْهِ تَتَابُعِ الرِّيْحِ الْمُسْتَاصِلَةِ بِتَتَابُعِ الْكَيِّ لِلْقَاطِعِ لِلدَّاءِ أَيْ الْمَرَضِ অর্থাৎ حُسُوْمًا-কে এখানে অনবরত বয়ে যাওয়া ঝঞ্ঝা-বায়ুর জন্য اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া হয়েছে। যেভাবে দাগদানকারী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উপর রোগের ক্রিয়া দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত দাগ দিতে থাকে, সেভাবে ঝঞ্ঝা-বায়ুকে আল্লাহর দুশমনগণ দুনিয়া হতে মূলোৎপাটন হওয়া পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ صَرْعٰى : এটা صَرِيْعٌ -এর বহুবচন। تَرٰى হতে حَالٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। كَأَنَّهُمْ -এর هُمْ ضَمِيْر টির ইশারা হলো قَوْمُ عَادٍ এবং هُمْ টি مُشَبَّهٌ আর أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ টি مُشَبَّهٌ بِهٖ হয়েছে। আর بَاقِيَةٌ টি উহ্য نَفْسٌ -এর صِفَتْ হয়ে مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ : ثَمُوْدُ সম্প্রদায়ের পরিচিতি সংক্ষিপ্ত আকারে এই- (فَتْحُ الْبَيَانِ) ثَمُوْدُ بْنُ عَادِ بْنِ إِرَمَ অথবা ثَمُوْدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ إِرَمَ (মা'আলিম, বায়যাবী) এরা মদীনা ও শাম -এর মধ্যবর্তী (وَادِيْ قُرٰى) নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত ছিল। হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে ধর্মের প্রতি খুবই আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তারা তার কথা অমান্য করে ইচ্ছাধীন চলেছিল। তাই আল্লাহ তাদেরকে طَاغِيَةٌ দ্বারা বরবাদ করে দিয়েছিলেন. এদেরকে قَوْمُ صَالِحٍ ও বলা হয়ে থাকে।

طَاغِيَةٌ শব্দের মর্ম ও অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, هِيَ الرَّجْفَةُ এমন এক বিকট আওয়াজ যা দুনিয়ার সকল প্রকার বৃহৎ আওয়াজ হতে অধিক তীক্ষ্ণ আওয়াজ সম্পন্ন বজ্রধ্বনি। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ চিৎকারের শব্দ। -[মাদারিক, মা'আরিফ]

কেউ কেউ বলেন, طَاغِيَةٌ শব্দ طُغْيَانٌ হতে مُشْتَقٌّ অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল বিকট আওয়াজের সীমালঙ্ঘনকারী, যা মানুষের শ্রবণশক্তির সীমাতীত। অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আজাব এমন কঠিন আওয়াজ সহকারে এসেছে যাতে দুনিয়ার সকল বজ্র শব্দ একত্রে আওয়াজ করলে যে শব্দ হতো তা হতেও বিকট শব্দ হয়েছে। এতে তাদের কলিজা ফেটে গেছে এবং তারা মরে গেছে।

قَوْلُهُ عَاتِيَةٍ : তাফসীরকারগণ عَاتِيَةٌ শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্য করেছেন। কাবীর গ্রন্থকারের মতে এটার অর্থ عَتَتْ عَلٰى خُزَّانِهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَأَصْلُ الْعُتُوِّ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ তার অর্থ হলো সীমালঙ্ঘন করা। সুতরাং যখন কোনো কিছু স্বীয় স্থান ত্যাগ করত বে-হিসাব অবস্থায় বের হয়ে যাওয়া শুরু করে তখন তাকে عَاتِيَةٌ বলা হয়।

জালাইন গ্রন্থকার এটার তাফসীর করেছেন قَوِيَّةٌ شَدِيْدَةٌ عَلٰى عَادٍ আদ সম্প্রদায়ের উপর তা খুবই মারাত্মক শক্তিশালী আকার ধারণ করেছিল। কেউ কেউ বলেন- عَتَتْ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ

عَاتِيَةٌ অর্থ হলো وَزْنِيْ বা كَيْلِيْ পরিমাপ ব্যতীত তা সীমালঙ্ঘন করেছে। এর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হতে গ্রহণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কখনো বায়ুকে পরিমাপ ব্যতীত ছেড়ে দেন না। আর পানির ফোঁটাকেও পরিমাপ ব্যতীত ছেড়ে দেন না।

তবে 'আদ' ও নূহ সম্প্রদায়ের দিন পরিমাপ ব্যতীত ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.)-এর বংশকে ধ্বংস করার দিন পরিমাপ সীমা খুবই লঙ্ঘন করে গেছে। যাতে নূহজাতির বাঁচবার কোনো পথ বাকি ছিল না। আর আদজাতির ধ্বংসের দিন বায়ু তার পরিমাপ সীমা এমনভাবে ত্যাগ করেছে যাতে তাদের বাঁচবার কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং عَاتِيَةٌ অর্থ- ওজন ও পরিমাপ ছাড়া সীমালঙ্ঘন করা এ অর্থও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। -[সাবী]

قَوْلُهُ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ ...... خَاوِيَةٌ : অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 'আদ' সম্প্রদায়ের উপর এক তীব্র ঝঞ্ঝাবর্তের আঘাতকে একাধারে সাত রাত ও আট দিন যাবৎ স্থায়ী করে দিলেন। আপনি যদি তথায় থাকতেন তবে দেখতে পেতেন যে, 'আদজাতি ইতস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। যেমন, পুরাতন খেজুর গাছসমূহ গোড়াসহ পড়ে রয়েছে।

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ আয়াতে বলা হয়েছে সাত রাত ও আট দিন তাদের উপর তীব্র ঝঞ্ঝা অনবরত স্থায়ী ছিল। তার সময় সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। জালালাইন ও মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, শাওয়ালের ২২ তারিখ বুধবার সকালবেলায় শীতকালের শেষের দিকে।

قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : তাদের উপর শাস্তি আরম্ভ হওয়ার তারিখ ছিল শুক্রবার সকালবেলা। আর তাদের শাস্তির অষ্টম দিবসে সন্ধ্যাকালে তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর সে ঝঞ্ঝাই তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করেছিল। -[কাবীর]

কাবীর গ্রন্থের বরাত দিয়ে (ওহাব) বলেন, আরব দেশে শীতের মৌসুমের শেষাংশকে أَيَّامُ الْعَجُوْزِ বলা হতো।

আদজাতি-কে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহের সাথে উপমা দেওয়ার কারণ : এটার কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষ পুরাতন ও বড় হলে তার কাণ্ড বা জড়ও খুবই বিরাটকায় দেখায়। অর্থাৎ খুবই বড় কায়া বিশিষ্ট দেখায়। কথিত আছে যে, قَوْمُ عَادٍ সম্প্রদায় সে যুগে খুবই লম্বাচৌড়া অর্থাৎ আকৃতি-প্রকৃতিতে খুবই বড় ছিল। উজাড় খেজুরের বৃক্ষ যেমন দেখাত তাদের মৃত লাশকেও তেমনি দেখিয়ে ছিল। এ জন্য তাদেরকে খেজুর বৃক্ষের ঝাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আকৃতির বিরাটত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য।

অনুবাদ :

٩. وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ اَتْبَاعُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُوْنِ الْبَاءِ اَىْ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْاُمَمِ الْكَافِرَةِ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ اَىْ اَهْلُهَا وَهِىَ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ بِالْخَاطِئَةِ بِالْفِعْلَاتِ ذَاتِ الْخَطَأِ .

৯. আর লিপ্ত হয়েছে ফেরাউন ও তার সঙ্গীগণ তার অনুসারীগণ, অপর এক কেরাতে শব্দটি قَافْ বর্ণে যবর ও بَاءْ বর্ণে সাকিন যোগে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাফের জাতিসমূহ। এবং উপড়ে ফেলানো বস্তিসমূহ অর্থাৎ তার অধিবাসীগণ। আর তা হলো লূত সম্প্রদায়ের বস্তি। পাপাচারিতায় এমন কাজ যা পাপযুক্ত।

١٠. فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ اَىْ لُوْطًا وَغَيْرَهُ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً زَائِدَةً فِى الشِّدَّةِ عَلٰى غَيْرِهَا .

১০. তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করে অর্থাৎ লূত (আ.) ও অন্যান্য নবী (আ.) গণ। ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দান করলেন, সুকঠিন শাস্তি অন্যদের তুলনায় অধিকতর কঠোর।

١١. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَآءُ عَلَا فَوْقَ كُلِّ شَىْءٍ مِنَ الْجِبَالِ وَغَيْرِهَا زَمَنَ الطُّوْفَانِ حَمَلْنٰكُمْ يَعْنِىْ اٰبَآءَكُمْ اِذْ اَنْتُمْ فِىْ اَصْلَابِهِمْ فِى الْجَارِيَةِ السَّفِيْنَةِ الَّتِىْ عَمِلَهَا نُوْحٌ صَلَوٰتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ وَنَجَا هُوَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فِيْهَا وَغَرِقَ الْبَاقُوْنَ .

১১. নিশ্চয় আমি যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তুফানের সময় পানি পাহাড় ইত্যাদির উপরে উত্থিত হয়েছিল তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছি অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষগণকে, যখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠে অবস্থান করছিলে। নৌযানে যা হযরত নূহ (আ.) তৈরি করেছিলেন এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ মুক্তি লাভ করেছিলেন। আর অন্যরা ডুবে ধ্বংস হয়েছিল।

١٢. لِنَجْعَلَهَا اَىْ هٰذِهِ الْفِعْلَةَ وَهِىَ اِنْجَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِهْلَاكُ الْكَافِرِيْنَ لَكُمْ تَذْكِرَةً عِظَةً وَتَعِيَهَا لِتَحْفَظَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ حَافِظَةٌ لِمَا تَسْمَعُ .

১২. আমি এটাকে করার জন্য এ কাজকে, অর্থাৎ মু'মিনগণকে মুক্তিদান ও কাফেরদেরকে ধ্বংসকরণ তোমাদের জন্য শিক্ষা উপদেশ আর এটা সংরক্ষণ করে সংরক্ষণ করার জন্য সংরক্ষণকারী কর্ণ হেফাজতকারী, শ্রুত বস্তুকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ الخ : বাক্যে مَنْ হলো মাওসূলা, قَبْلَهُ তার সিলাহ, উভয় মিলিত হয়ে فِرْعَوْنُ-এর উপর আত্‌ফ হয়েছে। فِرْعَوْنُ শব্দটি جَاءَ-এর ফায়েল। وَالْمُؤْتَفِكَاتُ আত্‌ফ হয়েছে جَاءَ-এর উপর। بِالْخَاطِئَةِ মাফউল جَاءَ-এর।

قَوْلُهُ رَسُوْلَ رَبِّهِمْ : বাক্যটি عَصَوْا-এর মাফউল, اَخْذَةً মাফউল মুতলাক-মাওসূফ, رَابِيَةً সিফাত।

قَوْلُهُ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ الخ : বাক্যে اِنَّ-এর نَا ইসমে। حَمَلْنٰكُمْ বাক্যটি খবর, فِى الْجَارِيَةِ হাল হয়েছে মাফউল كُمْ হতে। لَمَّا طَغَى الْمَاءُ যরফ حَمَلْنَا-এর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে قَوْمِ عَادٍ ও قَوْمِ ثَمُوْدَ-এর ধ্বংসের চিত্র কথা অংকন করা হয়েছে। উক্ত আয়াত হতে فِرْعَوْنُ ও তার সমসাময়িক কাফেরদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং বলা হয়েছে তদানীন্তন اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলে বড় খোদার দাবিদার ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তী বড় বড় কাফের সম্প্রদায় যেমন হযরত লূত (আ.)-এর বংশগণ জঘন্য হতে জঘন্যতম অপরাধ করেছিল। কিন্তু তাদের কাউকেও আল্লাহ ছাড়েননি; বরং খুব কঠোর সাজা দান করেছেন। আর তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে (যথা) হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধরকে তাদের নাফরমানির কারণে এক অবিস্মরণীয় শাস্তি

দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) সহ তাঁর অনুসারীদেরকে নৌকার মাধ্যমে নাজাত দেওয়া হয়েছে এবং গোস্তাখদেরকে প্লাবন দ্বারা চির নস্যাৎ করা হয়েছে। এ ঘটনাটি পরবর্তী আগমনকারী সকল উম্মতদের জন্য একটি মহাস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে কুরআনের পাতায় খচিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ ... فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً : পূর্ববর্তী বহু জাতিকে তাদের কৃতকর্মের ফল শোচনীয়ভাবে ভোগানোর কথা শুনানো হয়েছে। এতদসত্ত্বেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না। যে একটুখানি ঐশ্বর্য ও সম্পদশালী হয়ে উঠে সে তখনই মাথানাড়া দিয়ে উঠে। ফেরাউন এবং তৎপূর্ববর্তী কাফের জাতিগণ বহু নাফরমানি করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাওমে লূত (আ.)-কে পেশ করা যেতে পারে তারা পুরুষেরা পুরুষদের সাথে সমকামিতা (لَوَاطَتْ) করত। এটা জেনা অপেক্ষা আরও জঘন্যতর অপরাধ। এ অপরাধে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জমিনসহ উল্টিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। আর ফেরাউনকে তার জাতিসহ হযরত মূসা (আ.)-এর বিরোধিতার কারণে নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেছিলেন। সুতরাং এভাবে যারাই যে যুগে যত অপরাধ করেছিল তাদেরকে ক্রমান্বয়ে কঠিন হতে কঠিনতর শাস্তি দিয়ে ইহকাল হতে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অপরাধ যত বড় করেছে শাস্তিও তত মারাত্মকভাবে দেওয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে এ কথাটা এই ভাষায় বলা হয়েছে যে– فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَّبِيْلًا

مُؤْتَفِكَاتٌ বলে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? اَلْمُؤْتَفِكَاتُ বলতে মাদারেক ও জালালাইন গ্রন্থকারে মতে কাওমে লূত (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে– وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْمُؤْتَفِكَاتِ الْأُمَمِ الَّذِيْنَ ائْتَفَكُوْا بِذُنُوْبِهِمْ فَهَلَكُوْا

মুতাফিকাতদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণ : এটার কারণ হচ্ছে– শাব্দিক অর্থের দিক বিবেচনায় مُؤْتَفِكَاتٌ শব্দটি বা اِئْتِفَاكٌ শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। اِئْتِفَاكٌ অর্থ اِنْفِعَالٌ সুতরাং اِئْتَفَكَتْ অর্থ اِنْقَلَبَتْ বা اِنْفَعَلَتْ অর্থাৎ উল্টে গিয়েছিল। সুতরাং যেহেতু লূত জাতিকে জমিনসহ উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই তাদের قَوْمٌ مُؤْتَفِكَاتٌ বা উল্টানো জাতি বলা হয়ে থাকে। –[কাবীর]

ذَاتُ بِالْفَعْلَاتِ-এর অর্থ করা হয়েছে ذَاتُ الْخَطَأِ অর্থাৎ ذَاتُ الْفَعْلَاتِ তাফসীর খতীব গ্রন্থকার بِالْفَعْلَاتِ-এর তাফসীরে বলেন– بِالْخَاطِئَةِ (গুনাহের প্রতি ধাবিতকারী কার্য বা গুনাহসম্পন্ন কার্য) যাতে গুনাহের প্রতি পদার্পণ করতে বাধ্য করে। যথা– লেওয়াতাত اَلْخَطَأُ ضِرَاطٌ . صَفَقٌ ও শিরক ইত্যাদি যাবতীয় ফিস্‌ক-ফুযূরীর কার্য।

গ্রন্থকারের মতে اَلْخَاطِئَةُ শব্দটি একটি مَوْصُوْفٌ مَحْذُوْفٌ-এর صِفَتٌ হয়েছে। তা হতে পারে فِعْلٌ خَاطِئٌ অথবা, خِصَالٌ خَاطِئٌ।

قَوْلُهُ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ .... أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ : হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, যখন হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে তাঁর জাতি তাঁর হেদায়েত অমান্য করল, তখন হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি মুষ্টিমেয় ঈমানদারদেরকে ব্যতীত অন্যান্য সকল নাফরমানদেরকে তুফানের পানি দিয়ে খতম করে দিয়েছি। আর হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সহচরদেরকে নৌকায় উঠিয়ে রক্ষা করেছি। যাতে এটা পরবর্তী জাতির জন্য স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে।

উক্ত আয়াতে সম্বোধন সচরাচরভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর মূল বংশধরগণকে করা হয়নি; বরং সম্বোধিতদের পূর্বপুরুষগণকে করা হয়েছে। তাফসীরকার সেই কথাটা حَمَلْنَاكُمْ يَعْنِيْ أٰبَائَكُمْ বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তখন অর্থ হতো হে নূহ (আ.)-এর উপর বিশ্বাসীগণ, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঔরশে যখন তোমরা ছিলে তখন তাদেরকে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার মাধ্যমে ঔরশজাত ও সন্তানরূপে তোমাদের রক্ষা করেছি। وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ বলে সকল উম্মতকে হুঁশিয়ারি করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ঘটনাকে স্মরণ রেখে যেন ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেক জাতি নিজেদেরকে এহেন দূষণীয় কার্য হতে রক্ষা করতে থাকে। যত জাতিই কিয়ামতকে অস্বীকার করবে তত জাতিই এভাবে তার ফল ভুগতে হবে।

طُغْيَانُ الْمَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কালের নাফরমানদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে তুফান চালিয়েছিলেন তখন তুফানের সাথে পানি উপচে সারা জগৎ প্রলয় হয়ে গিয়েছিল, সেই প্লাবনের প্রতি طُغْيَانٌ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। فِى الْجَارِيَةِ বলে হযরত নূহ (আ.)-এর তৈরিকৃত নৌকার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ : এটার অর্থ মাদারিক গ্রন্থকারের মতে أُذُنٌ حَافِظَةٌ لِمَا تَسْمَعُ হযরত কাদাতাহ (র.) বলেন, এটার অর্থ أُذُنٌ عَقَلَتْ عَنِ اللّٰهِ وَانْتَفَعَتْ بِمَا سَمِعَتْ যা কর্ণের মাধ্যমে শ্রবণ করে তা বুঝে এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে তার প্রতি আমল করে থাকে। –(মাদারিক) প্রকৃতগতভাবে এখানে রক্ষণাবেক্ষণকারী কান বলে (প্রকাশ্য অর্থে) কান বুঝায়নি; বরং সে সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা শুনে স্মরণ রাখতে পারে ও স্মরণে রাখে এবং তা হতে শিক্ষা উপদেশাবলি গ্রহণ করে। আর পরকালে অস্বীকৃতি ও আল্লাহর হুকুম অমান্যতার ভয়াবহ পরিণতির কথা তারা ভুলে যায় না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ .... أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ : আল্লাহ তা'আলা 'আদ, ছামূদ, ফেরাউন, লূত, নূহ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন। তাদের অবাধ্যতার পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এসব সম্প্রদায়সমূহকে নসিহত ও শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ ও বাস্তব নজির বানিয়েছেন, যাতে মানুষ তাদের–কিয়ামত, পরকাল ও নবীদেরকে অবিশ্বাস করার পরিণতির কথা ভেবে তাতে বিশ্বাসী হয় এবং নবী করীম ﷺ-এর উথাপিত জীবনাদর্শ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলে। هَا যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْوَاقِعَةُ কেউ কেউ বলেছেন هَا যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْجَارِيَةُ এ মতটিকে তাফসীরে কাবীরে ضَعِيْفٌ বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٣. فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَهِىَ الثَّانِيَةُ .

১৩. যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার সৃষ্টি জগতের মধ্যে ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে। এটা দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য।

١٤. وَحُمِلَتِ رُفِعَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دُقَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً .

১৪. এবং বহন করা হবে উৎক্ষিপ্ত হবে পৃথিবী পর্বতমালাসহ, আর উভয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে একই ধাক্কায়।

١٥. فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ قَامَتِ الْقِيَامَةُ .

১৫. সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় কিয়ামত সংঘটিত হবে।

١٦. وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ضَعِيْفَةٌ .

১৬. আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে দুর্বল।

١٧. وَالْمَلَكُ يَعْنِى الْمَلَائِكَةَ عَلٰى اَرْجَائِهَا ط جَوَانِبِ السَّمَاءِ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ اَىِ الْمَلَائِكَةِ الْمَذْكُوْرِيْنَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اَوْ مِنْ صُفُوْفِهِمْ .

১৭. আর ফেরেশতা অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তার প্রান্ত দেশে থাকবে আকাশের প্রান্তদেশে আর তোমার প্রতিপালকের আরশ বহন করবে তাদের উপর অর্থাৎ উল্লিখিত ফেরেশতাগণের উপরে সেদিন আটজন ফেরেশতা আটজন ফেরেশতা কিংবা ফেরেশতাগণের আটটি সারি।

١٨. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لِلْحِسَابِ لَا تَخْفٰى بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ مِنَ السَّرَائِرِ .

১৮. সেদিন উপস্থাপন করা হবে হিসেবের জন্য তোমাদের কোনো গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না গোপন রহস্যাদি হতে।

١٩. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ خِطَابًا لِجَمَاعَتِهٖ لِمَا سُرَّبِهٖ هَآؤُمُ خُذُوْا اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ تَنَازَعَ فِيْهِ هَاؤُمُ وَاقْرَءُوْا .

১৯. তখন যাকে দেওয়া হবে তার কর্মলিপি তার দক্ষিণ হস্তে, সে বলবে তার সঙ্গী-সাথীদের খুশির খবর শুনিয়ে নাও গ্রহণ করো আমার কর্মলিপি পাঠ করো كِتَابِيَهْ শব্দটি اِقْرَءُوْا ও هَاؤُمُ এই فِعْل দু'টি আমল করার জন্য تَنَازُعْ করেছে।

٢٠. اِنِّىْ ظَنَنْتُ تَيَقَّنْتُ اَنِّىْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ .

২০. আমি ধারণা করেছি বিশ্বাস করেছি যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হবো।

٢١. فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ مَّرْضِيَّةٍ .

২১. সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন উত্তম।

٢٢. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ .

২২. সুমহান বেহেশতে।

٢٣. قُطُوْفُهَا ثِمَارُهَا دَانِيَةٌ قَرِيْبَةٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ .

২৩. যার ফল-ফলাদি তার ফল অবনমিত হবে নিকটবর্তী হবে, ফলে দণ্ডায়মান ব্যক্তি, বসা ব্যক্তি ও শায়িত ব্যক্তির নাগালের মধ্যে থাকবে।

٢٤. فَيُقَالُ لَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا حَالٌ اَىْ مُتَهَنِّئِيْنَ بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ الْمَاضِيَةِ فِى الدُّنْيَا .

২৪. তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে খাও এবং পান করো তৃপ্তির সাথে এটা حَالٌ রূপে ব্যবহৃত অর্থাৎ তৃপ্তি লাভকারী অবস্থায় তারই বিনিময় স্বরূপ যা তোমরা অতীত দিনে সম্পাদন করেছ অতীতকালে পৃথিবীতে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ : نُفِخَ -এর নায়েবে ফায়েল হয়েছে। وَاحِدَةٌ তাকিদের জন্য। وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ الخ আতফ হয়েছে نَفْخ -এর উপর।

قَوْلُهُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : يَوْمَئِذٍ যরফ বাক্যে وَقَعَتْ -এর। وَانْشَقَّتْ আতফ হয়েছে وَقَعَتْ -এর উপর। পরবর্তী يَوْمَئِذٍ শব্দটি وَاهِيَةٌ -এর যরফ। فَيَوْمَئِذٍ এবং এটার পরবর্তী বাক্যটি اِذَا نُفِخَ -এর জওয়াব হয়েছে। لَا يَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ বাক্যটি মানসূব হয়েছে تُعْرَضُوْنَ -এর যমীর হতে হাল হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ : এখানে كِتَابِيَهْ টি হয়তো هَاؤُمُ -এর مَفْعُوْل হবে। এটা কূফীদের মতে। আর বসরীদের মতে اِقْرَءُوْا -এর مَفْعُوْل হবে। তারা নিকটবর্তী فِعْل -এর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আর কূফীগণ প্রথমটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। (يَعْنِي الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ)

قَوْلُهُ اِنِّيْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ : এটা ظَنَنْتُ -এর مَفْعُوْل হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ : এটা তৎপূর্ববর্তী مُبْتَدَأ -এর خَبَر হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ الخ : এরা عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ -এর বয়ান অথবা بَدَل হতে পারে।

قَوْلُهُ هَنِيْئًا : এটা উহ্য মাসদার অর্থাৎ اَكْلًا وَشُرْبًا -এর صِفَتْ হতে পারে। অথবা كُلُوْا وَاشْرَبُوْا এর ضَمِيْر হতে حَالٌ হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ الخ : মক্কার কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, হে কাফের গোষ্ঠী! এমন বড় বড় শক্তিশালী অতীত জাতিসমূহ তাদের রাসূলদের নাফরমানি করে কি অবস্থায় পৌছেছে তা তোমাদের জানার আর বাকি নেই। সেই তুলনায় তোমরা কোনো দিক হতেই কিছুই নও; বরং জ্ঞানীর পরিচয় হবে এখন এই, স্বপ্নের অচেতনতা হতে জাগ্রত হয়ে উঠ। আর ঐ সময়কে স্মরণ করো, যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে। আর জমিন ও পাহাড়সমূহ নিজ নিজ স্থান হতে উঠিয়ে দেওয়া হবে। তখন কি করতে পারবে? কিয়ামত তো তখনই শুরু হয়ে যাবে।

نُفِخَ : نَفْخُ الصُّوْرِ **অর্থ কি?** نَفْخُ الصُّوْرِ **কার দ্বারা হবে? আর আয়াতে বর্ণিত** نَفْخَةً وَاحِدَةً **অর্থ** কি নেওয়া হয়েছে? نَفْخُ الصُّوْرِ অর্থ– শিঙ্গায় ফুঁক দান করা। ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে একটি مَرْفُوْعٌ حَدِيْثٌ বর্ণনা করেছেন যে, صُوْر বলতে সিংয়ের আকৃতিবিশিষ্ট একটি বস্তু, যাতে কিয়ামতের দিন ফুঁক দেওয়া হবে। হাদীসটি হলো এই–

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصُّوْرُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

শিঙ্গায় ফুঁকদানকারী কে হবেন? : শিঙ্গায় ফুৎকারী হবেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। আর কেউ কেউ বলেন, তাঁর সাথে হযরত জিবরাঈল (আ.)ও থাকবেন। কেননা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা রয়েছে শিঙ্গায় আকৃতিকে শিংয়ের ন্যায় হওয়া এবং ফুঁকদানকারীদের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদীসখানা নকল করেছেন।

আর এ শিঙ্গার ফুঁককে نَفْخَةُ الصَّعْقِ অথবা نَفْخَةُ الْفَزَعِ ও বলা হয়েছে। এটা হলো نَفْخَةُ اُوْلٰى বা প্রথম ফুৎকার। এটার সাথে সকল জীবিত মাখলুক মরে যাবে, তবে হযরত ইসরাফীল, আযরাঈল, জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ.)-কে পৃথক রাখা হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ বলে شُهَدَاءُ كِرَامٌ -কে اِسْتِثْنَاءٌ করা হয়েছে। لِقَوْلِهِ هُمْ الشُّهَدَاءُ اِذْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ শহীদগণ প্রথম শিঙ্গার ফুৎকারের সাথে বিলীন হবেন না। কেননা তারা তাদের প্রভুর দরবারে রিজিক ভক্ষণ করতে থাকবেন।

জালালাইন গ্রন্থকার اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ -এর তাফসীরে সূরা জুমু'আর অংশে বলেন–

اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ يَعْنِىْ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَالْوِلْدَانِ .

কয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে? : জালালাইন গ্রন্থকারের মতে এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকার। এখানে উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের সময় মোট কতটি ফুৎকার দেওয়া হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে তিনটি ফুৎকার হবে। কেউ কেউ বলেন যে, দু'টি মাত্র ফুৎকার হবে। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাসমূহ পর্যালোচনা করলে তিনটি ফুৎকার হওয়ার কথা বুঝা যায়। যথা– ১. نَفْخَةُ الْفَزَعِ ২. نَفْخَةُ الصَّعْقِ ৩. نَفْخَةُ الْبَعْثِ । কেউ কেউ نَفْخَةُ الْفَزَعِ এবং نَفْخَةُ الصَّعْقِ -কে একটি মাত্র نَفْخَةٌ হিসেবে ধরেছেন। তাঁদের মতে এটা একটি মাত্র ফুৎকার যার প্রথম দিকটি نَفْخَةُ الْفَزَعِ বা ভীতসন্ত্রস্তকারী আর শেষ দিকটি نَفْخَةُ الصَّعْقِ বা সব কিছুকে মৃত্যুদানকারী বা ধ্বংসকারী। আর শেষটি نَفْخَةُ الْبَعْثِ বা সবাইকে হাশর মাঠে একত্রকারী ফুৎকার। এ দুইটি মতকে সামনে রাখলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং জালালাইনের লেখকের মাঝে কোনো মতপার্থক্য থাকে না; আর বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) نَفْخَةُ الْفَزَعِ এবং نَفْخَةُ الصَّعْقِ -কে একটি মাত্র نَفْخَةٌ ধরেছেন। আর জালালাইন গ্রন্থকার نَفْخَةُ الْفَزَعِ ও نَفْخَةُ الصَّعْقِ -কে আলাদা আলাদা نَفْخَةٌ গণ্য করেছেন। –[মা'আরিফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ .... ثَمَانِيَةٌ : আল্লাহ বলেন, আসমান ফেটে যাবে এবং সেদিন তা একেবারেই জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাবে। আর যে সকল ফেরেশতা আসমানে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে তারা আকাশ ফেটে যাওয়ার মুহূর্তে আসমানের পার্শ্বদেশে চলে যাবে। এতে বুঝা যায় আকাশ মধ্যখান থেকে ফেটে যাওয়া আরম্ভ হবে। তাই ফেরেশতাগণও কিনারার দিকে ফিরে আসবে। অতঃপর فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ দ্বারা বুঝা যায় ফেরেশতাগণও তখন মরে যাবে। (অনুরূপ কাবীর গ্রন্থে রয়েছে।) আর এ সকল ঘটনা نَفْخَةُ اُوْلٰى -এর পর হতে থাকবে এবং মহান আল্লাহর আরশকে সেদিন আটজন ফেরেশতা উঠিয়ে নিয়ে যাবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আরশকে চারজন ফেরেশতা উঠিয়ে নিয়ে আছে। মোটকথা, কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশ্‌তা আরশকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং তখন হিসাব শুরু হবে।

ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় যাওয়ার কারণ : ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে যাওয়ার কারণ হলো, তারা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহর হুকুম তখন কি হয় এবং তাদের উপর কি নির্দেশ এসে থাকে তা পালনের জন্য আকাশের প্রান্তে আসবে এবং নির্দেশকৃত হুকুম পালন করার জন্য প্রয়োজন হলে জমিনেও অবতরণ করবে, যাতে বিলম্ব না হয়। –[সাবী]

ফেরেশ্‌তা সকল প্রথম ফুৎকারের সাথে মৃত্যুবরণ করবে لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَصَعِقَ الخ সুতরাং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তে যাবে এ কথা কিভাবে বলা শুদ্ধ হবে? এটার উত্তর এভাবে দেওয়া যাবে, যে সকল ফেরেশতা আকাশের প্রান্তে অবস্থান করবে তারা মৃত্যুবরণ করবে না فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ -এর আয়াতে এদেরকেও مُسْتَثْنٰى -এর অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে।

আকাশের পার্শ্বদেশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের আকৃতির বর্ণনা : হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন–

يَحْمِلُ ثَمَانِيَةُ مَلَكٍ عَلٰى صُوْرَةِ الْاَوْعَالِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ رُؤُوْسُهُمْ عِنْدَ الْعَرْشِ وَاَقْدَامُهُمْ فِى الْاَرْضِ السُّفْلٰى وَلَهُمْ كَقُرُوْنِ الْوَعْلَةِ مَا بَيْنَ اَصْلِ قُرُوْنِ اَحَدِهِمْ اِلٰى مُنْتَهَاهُ خَمْسُمِاَةِ عَامٍ . وَ رُوِىَ اَنَّ مَا بَيْنَ اَظْلَافِهِمْ اَىْ رُكَبِهِمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَ رُوِىَ اَنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمْ وَجْهُ رَجُلٍ وَ وَجْهُ اَسَدٍ وَ وَجْهُ ثَوْرٍ وَ وَجْهُ نَسْرٍ وَلِابْنِ جَرِيْرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ مَرْفُوْعًا يَحْمِلُهُ الْيَوْمَ اَرْبَعَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيَةٌ . (كَبِيْر)

قَوْلُهُ ثَمَانِيَةٌ : আল্লাহর আরশকে আট ফেরেশতা উঠাবে। এ কথাটিকে জালালাইন গ্রন্থকার দুই দিকে ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন মাত্র আটজন ফেরেশতা অথবা আট সারি ফেরেশতা। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ثَمَانِيَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَلَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى ফেরেশতার আটটি সারি, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, মাত্র আটজন ফেরেশতা। হযরত হাসান (রা.) বলেন, তারা কি আটজন মাত্র, অথবা, আটটি সারি, অথবা আট হাজার হবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। وَفِى الْكَبِيْرِ اِنَّ حَامِلِيْنَ الْعَرْشَ هُمْ ثَمَانِيَةُ اَشْخَاصٍ . (خَطِيْب) অর্থাৎ কাবীর গ্রন্থে তাদের সংখ্যা আট বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা মোট আট প্রকারের হবে। –[মাদারিক]

হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে দেখা যায়, কিয়ামতের পূর্বে আরশ বহনকারী ফেরেশতা চারজন নির্ধারিত রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে আরও চারজন সহচর দেওয়া হবে এবং মোট আটজন হবে। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য সকলকে উপস্থাপন করবেন। সেদিন কোনো কিছু গোপন থাকবে না। সবকিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিন সবই হবে খোলা, প্রকাশিত। সেদিন মানুষের দেহ খোলা, অন্তর খোলা, আমল সকলের সামনে প্রকাশিত, তাদের অবস্থানও খোলা। সেদিন কোনো পর্দাই থাকবে না। মানুষ তার সব ধরনের চেষ্টা-তদবির থেকে নিরুপায়। সমস্ত সৃষ্টিলোকের সামনে তার আমল উপস্থিত। একান্ত গোপনীয় জিনিসও সবার সামনে খোলা ও প্রকাশিত। সেদিন সকলের সামনে তার সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ায় সে হবে অপদস্থ, অপমানিত। আল্লাহর কাছে সেতো সব সময়ই আড়ালহীন। কিয়ামতের দিন সে সমস্ত সৃষ্টিকূলের নিকট হবে আড়ালহীন, খোলা; মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে বিচারের জন্য। –[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ .... اِقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ (الاية) : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরার পর এখানে লোকদের বিচারের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে নেককার লোকদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। নেককার লোকদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। সে তখন সকলকে বলবে আসো, আসো আমার কিতাব পড়ো। ডান হাতে আমলনামা দেওয়াটা স্বতই স্পষ্ট করে প্রকাশ করবে যে, তার হিসাব সম্পন্ন হয়েছে, তার কোনো কিছু বাকি নেই। আল্লাহর দরবারে সে অপরাধীরূপে নয়, একজন নেককার, চরিত্রবান, সদাচারী ব্যক্তি হিসেবেই উপস্থিত হয়েছে। নেককারগণ আমলনামা দক্ষিণ হস্তে লাভ করে খুব আনন্দিত ও পুলকিত হয়ে অন্যকে অর্থাৎ নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে বলবে– এই যে, আমি ডান হাতে আমলনামা পেয়েছি, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। দুনিয়ায় মানুষ পরীক্ষায় পাশ করে সনদ অথবা প্রাইজ লাভ করে পুলকিত মনে যেমন তা আত্মীয়-স্বজন ও অপরকে দেখায়, পরকালেও নেককারগণ অনুরূপভাবে খুশিতে মত্ত হয়ে নিজেদের আমলনামা অন্যদের পাঠ করতে দেবে। ইবনে আবী হাতেম আবী ওসমান থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, মু'মিন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা গোপনে ডান হাতে তার আলমানাম দেবেন। তখন সে তার গুনাহসমূহ পাঠ করতে থাকবে। যখন সে তার পাপসমূহ পাঠ করতে থাকবে তখন চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর যখন সে তার নেক আমলসমূহ পাঠ করবে তখন তার মুখমণ্ডলের চেহারা আবার পূর্বের ন্যায় ফিরে আসবে। অতৎপর সে তার পুরা আমলনামার দিকে দৃষ্টি দেবে তখন দেখতে পাবে যে, তার গুনাহগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় সে খুশি হয়ে সকলের নিকট বলবে– আসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ। –[যিলাল]

আয়াতে كِتَابِيَهْ দ্বারা কোন কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? : كِتَابِيَهْ দ্বারা এখানে কি কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার ইঙ্গিত অবশ্য خُلَاصَةٌ অংশে দেওয়া হয়েছে। তবে তা হলো দুনিয়াবী জীবনের কৃতকার্য, যা কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাগণ সারা জীবন লিখেছিলেন, এটাই প্রত্যেকের নেকী ও বদীর সকল চূড়ান্ত হিসাব। তার উপরই নির্ভর করবে ব্যক্তির বেহেশত অথবা দোজখ। এক কথায় বুঝতে হবে, তা হলো দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের ফলাফল বহি।

قَوْلُهُ هَاؤُمُ : এটা اِسْمُ فِعْلٍ - خُذُوْا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাকে দু' অবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ তা কখনও فِعْلٌ صَرِيْحٌ হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে, আবার কখনো اِسْمُ فِعْلٍ হিসেবে। তবে উভয় অবস্থায় خُذُوْا অর্থে ব্যবহার হয়। আর যখন اِسْمُ فِعْلٍ হিসেবে ব্যবহার হবে, তখন দুই অবস্থায় পড়া যাবে– ১. اَلْمَدُّ ২. اَلْقَصْرُ যেমন– (بَاءٌ بِالْمَدِّ) - هَا دِرْهَمًا يَا زَيْدُ (হে যায়েদ এই দেরহাম নাও।) (بَاءٌ بِالْقَصْرِ) - هَا دِرْهَمًا يَا زَيْدُ [হে যায়েদ এই দেরহাম নাও।]

আর এরা وَاحِدٌ . تَثْنِيَةٌ . جَمْعٌ . مُذَكَّرٌ . مُؤَنَّثٌ এ একইরূপ থাকে। এদের সাথে كَافُ خِطَابٍ সংযুক্ত হয়ে থাকে। তখন তার রূপ হবে এই– هَاكَ . هَاكِ . هَاكُمَا . هَاكُنَّ ইত্যাদি।

আর যখন এরা فِعْلٌ صَرِيْحٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং ضَمِيْرٌ بَارِزٌ مَرْفُوْعٌ -এর সাথে মিলিত হয়ে থাকে, তখন তিনটি অবস্থায় পড়া হয়ে থাকে।

১. তা عَاطِىْ يُعَاطِىْ -এর অনুরূপ পড়া হবে–

هَاءِ يَا زَيْدُ . فَيُقَالُ هَاتِيْنِ يَاهِنْدَاتُ . هَاتُوْنَ يَا زَيْدُوْنَ . يَا هِنْدَاتُ . اَوْ . هَاتِيَانِ يَا زَيْدَانِ . هَاتِىْ يَا هِنْدُ .

২. অথবা, هَبْ -এর অনুরূপ পড়া হবে- هَانَ . هَاؤُا . هَاء . هَاهِيْ যেমন- هَبَا . هَبُوْا . هَبْنَ . هَبْ . هَبِيْ

৩. অথবা, خَفْ -এর অনুরূপ পড়া হবে। আর خَفْ টি خَوْف -এর أَمْر হবে। তখন বলা হবে- هَانَ . هَاءُوا . هَاءَا . هَاي . هَاءَ অনুরূপভাবে خَفْنَ . خَافُوْا . خَافَا . خَفْ তার مَدْلُوْل সম্পর্কে কিছু মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে এটা خُذُوْا অর্থে ব্যবহৃত। কারো কারো মতে تَعَالَوْا অর্থে ব্যবহৃত। তখন إِلَى দ্বারা مُتَعَدِّيْ হবে। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ اَلْقَصْدُ ইচ্ছা করা।

قَوْلُهُ ظَنَنْتُ : এটা تَيَقَّنْتُ অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ظَنَّ টি يَقِيْن অর্থে ব্যবহৃত। আর পবিত্র কালামে এ শব্দ এরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে। وَ ذٰلِكَ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى এ কথা (يَقِيْنِ حِسَابْ) দ্বারা এই বুঝানো হয়েছে যে, সে ব্যক্তি يَوْمَ الْحِسَابِ-এর ভয়ে সর্বদা আল্লাহর দরবারে নত থাকত এবং এ ভয়ভীতির কারণেই সেই ব্যক্তি নাজাত পেয়েছে এবং সর্বদা পরকালীন আমলের প্রতি সচেতন থাকত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভয়ভীতির প্রতিফলে তাকে ক্ষমা করে তার বাণীর সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। -[সাবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "إِنِّيْ ظَنَنْتُ إِنِّيْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ" : এ আয়াতটির দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এক. নেককার ব্যক্তি ডান হাতে আমলনামা পেয়ে সকলকে উল্লসিত মনে পড়তে বলবে এবং সে যে দুনিয়ায় পরকালের ব্যাপার সম্পর্কে কিছুমাত্র গাফিল হয়ে থাকেনি; বরং একদিন তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে ও নিজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এ কথা মনে মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেই সে জীবন-যাপন করছিল তাও সকলকে অবহিত করবে।

দুই. সে বলবে, আমি ধারণা করেছিলাম আমার বিচার করা হবে এবং আল্লাহ আমার গুনাহের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন, কিন্তু আল্লাহ আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমার গুনাহ-খাতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেননি, তিনি আমাকে উত্তম প্রতিফল দান করেছেন। আসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ো। -[কাবীর, যিলাল]

إِنِّيْ ظَنَنْتُ -এর মধ্যে عِلْم -এর স্থানে ظَنّ -কে ব্যবহারের কারণ : উক্ত আয়াতে عَلِمْتُ শব্দ বলা উত্তম বলে মনে হয়, অথচ ظَنَنْتُ ব্যবহার করা হয়েছে। এটার কারণে মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, সাধারণত আরবি ভাষায় ظَنّ غَالِبْ -এর অবস্থাকে عِلْم বলা চলে। অর্থাৎ ظَنّ غَالِبْ টি عِلْم-এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। اَحْكَامُ شَرْعِيَّهْ -এর ক্ষেত্রে এমন ব্যবহারবিধি রয়েছে। আর এ কারণও হতে পারে যে, لِاَنَّ مَا يُدْرَكُ بِالْاِجْتِهَادِ قَلَّمَا يَخْلُوْ عَنِ الْوَسْوَاسِ وَالْخَوَاطِرِ وَهِيَ تُفْضِ اِلَى الظُّنُوْنِ فَجَازَ اِطْلَاقُ لَفْظِ الظَّنِّ عَلَيْهَا لَمَّا لَا يَخْلُوْ عَنْهُ চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে যা অনুভব করা হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ .... فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যার আমলনামা তার ডান হস্তে দেওয়া হবে সে ব্যক্তি এমন খুশিতে জীবন যাপন করবে, যা দেখে তার আশেপাশের ব্যক্তিগণ অথবা, সাথীগণ খুবই খুশি হবে। অর্থাৎ তার আশপাশের কেউ তার এ অবস্থার জীবনের উপর রাগ করবে না বা হাসাদও করবে না। কেননা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- وَفِى الْحَدِيْثِ اَنَّهُمْ يَعِيْشُوْنَ وَلَا يَمُوْتُوْنَ اَبَدًا وَيَصِحُّوْنَ وَلَا يَمْرَضُوْنَ اَبَدًا وَيَنْعَمُوْنَ فَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا اَبَدًا অর্থাৎ তারা চিরজীবী হবে, কখনো মরবে না, সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। সর্বদা নিয়ামতে ডুবে থাকবে, কখনো বিপদ আসবে না। -[মাদারিক, সাবী] আর সেই নিয়ামতের স্থান হবে বেহেশ্‌ত, যা সুউচ্চ মর্যাদা অথবা সুউচ্চ ইমারতের ন্যায় হবে। যেমন দুনিয়াতে বড় লোকগণ নির্মাণ করে থাকে। আর বেহেশ্‌তের বাগানসমূহের ফল-ফলাদি প্রত্যেক বেহেশতীর হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে। শায়িত ব্যক্তি শোয়া হতে, বসা ব্যক্তি বসা হতে, দাঁড়ানো ব্যক্তি দাঁড়ানো হতে ফলের জন্য নড়তে হবে না। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা অতীত জীবনে এগুলো বেহেশতের জন্য প্রেরণ করেছ, তাই এখন এটা পানাহার করতে থাকো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ শব্দগুলো صَائِمِيْن রোজাদারের জন্য বলা হবে, যেহেতু তারা রোজা রেখেছে। কারো কারো মতে اَسْلَفْتُمْ -এর অর্থ হলো اَسْلَفْتُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ অতীতে যেই নেককাজ করেছিলে তার বিনিময়ে এই নিয়ামত। -[কাবীর, মাদারিক]

অনুবাদ :

٢٥. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ .

২৫. আর যাকে দেওয়া হবে তার কর্মলিপি বাম হস্তে, সে তখন বলবে হায়! يا হরফে নেদাটি تنبيه -এর জন্য। যদি আমাকে দেওয়া না হতো আমার কর্মলিপি।

٢٦. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ .

২৬. আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব-নিকাশ ।

٢٧. يَا لَيْتَهَا أَيِ الْمَوْتَةُ فِي الدُّنْيَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ الْقَاطِعَةَ لِحَيَاتِيْ بِأَنْ لَا أُبْعَثَ .

২৭. হায়! তাই যদি হতো অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যুবরণ আমার চূড়ান্ত পরিণাম আমার জীবনকালকে বিচ্ছিন্নকারী হতো এবং আমি পুনরুত্থিত না হতাম।

٢٨. مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ .

২৮. আমার কোনোই কাজে আসল না আমার সম্পদ।

٢٩. هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ قُوَّتِيْ وَحُجَّتِيْ وَهَاءُ كِتَابِيَهْ وَحِسَابِيَهْ وَمَالِيَهْ وَسُلْطَانِيَهْ لِلسَّكْتِ تَثْبُتُ وَقْفًا وَ وَصْلًا اِتِّبَاعًا لِمُصْحَفِ الْاِمَامِ وَالنَّقْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَذَفَهَا وَصْلًا .

২৯. আমার নিকট হতে ধ্বংস হয়েছে আমার ক্ষমতা আমার ক্ষমতা ও দলিল-প্রমাণ। سُلْطَانِيَهْ ـ مَالِيَهْ ـ حِسَابِيَهْ ـ كِتَابِيَهْ এ শব্দগুলোর মধ্যকার ها বর্ণটি سَكْتَهْ 'সাকতাহ'-এর জন্য, যা বিরাম ও অবিরাম উভয় অবস্থায় বহাল থাকে, মাসহাফে ওসমানীর মধ্যে এরূপই উদ্ধৃত হয়েছে। আর কোনো কোনো ক্বারী সাহেবের মতে وَصْل তথা অবিরাম পড়ে যাওয়ার সময় তা বিলুপ্ত হবে।

٣٠. خُذُوْهُ خِطَابٌ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ فَغُلُّوْهُ اَجْمِعُوْا يَدَيْهِ اِلٰى عُنُقِهِ فِي الْغُلِّ .

৩০. তাকে ধরো দোজখের রক্ষী ফেরেশতাগণের প্রতি সম্বোধন। অতঃপর তার গলদেশে বন্ধনী পরিধান করিয়ে দাও হাতগুলোকে গলায় বেঁধে দাও।

٣١. ثُمَّ الْجَحِيْمَ النَّارَ الْمُحْرِقَةَ صَلُّوْهُ اَدْخِلُوْهُ .

৩১. অতঃপর জাহান্নামে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তাকে নিক্ষেপ করো তাকে প্রবিষ্ট করো।

٣٢. ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْمَلَكِ فَاسْلُكُوْهُ اَيْ اَدْخِلُوْهُ فِيْهَا بَعْدَ اِدْخَالِهِ النَّارَ وَلَمْ تَمْنَعِ الْفَاءُ مِنْ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِالظَّرْفِ الْمُقَدَّمِ .

৩২. পুনরায় এমনি এক শৃঙ্খলে তাকে শৃঙ্খলিত করো, যার দৈর্ঘ্য সত্তর গজ ফেরেশতাগণের গজে। তৎপর তাকে প্রবিষ্ট করো অর্থাৎ তাকে তাতে প্রবিষ্ট করো, দোজখে প্রবিষ্ট করার পর। فَاءْ অব্যয়টি ظَرْف مُقَدَّمْ -এর মধ্যে فِعْل -এর আমল করার অন্তরায় নয়।

٣٣. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ .

৩৩. সে মহান আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাসী ছিল না।

٣٤. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ .

৩৪. আর সে অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না।

অনুবাদ :

৩৫. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ قَرِيْبٌ يَنْتَفِعُ بِهٖ -

৩৫. অতএব এ দিন যেথায় তার কোনো সুহৃদ থাকবে না এমন কোনো আত্মীয়, যার দ্বারা সে উপকৃত হবে।

৩৬. وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ صَدِيْدِ اَهْلِ النَّارِ اَوْ شَجَرٍ فِيْهَا -

৩৬. আর না কোনো খাদ্য ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত দোজখীগণের স্রাব অথবা তন্মধ্যকার একটি বৃক্ষ।

৩৭. لَا يَأْكُلُهٗ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ الْكَافِرُوْنَ -

৩৭. যা অপরাধী ব্যতীত অপর কেউ খাবে না কাফেরগণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ : বাক্যটি مُسْتَأْنِفَةٌ পূর্বের تَعْلِيْل বর্ণনা করার জন্য বাক্যটি উল্লিখিত হয়েছে। لَا يَأْكُلُهٗ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ বাক্যটি غِسْلِيْن-এর সিফাত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ ..... كَانَتِ الْقَاضِيَةَ" : এ আয়াতদ্বয়ে কাফেরদের কিয়ামতে কি অবস্থা হবে তার বর্ণনা রয়েছে। হাশরের মাঠে তাদের কিভাবে আমলনামা দেওয়া হবে এবং তা পেয়ে তাদের মানসিক অবস্থা কি হবে তা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে "যার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে।" সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে- "আর যার আমলনামা পেছন দিকে হতে দেওয়া হবে।" সম্ভবত তার বাস্তব অবস্থাটা এরূপ দাঁড়াবে যে অপরাধী ব্যক্তি আগে হতেই নিজে অপরাধী হওয়া সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং তার আমলনামায় কি কি জিনিস লিপিবদ্ধ রয়েছে তা তার ভালোভাবেই জানা থাকবে বিধায় সে অত্যন্ত মনমরা ভাব ও উৎসাহহীনতা সহকারে নিজের বাম হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে তা গ্রহণ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পিছনের দিকে নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে। যেন কেউ দেখতে না পায়। অতঃপর বলবে 'হায় আমার আমলনামা, আমাকে যদি না-ই দেওয়া হতো। আর আমার হিসাব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম।' অর্থাৎ এ আমলনামা দ্বারা হাশরের ময়দানে প্রকাশ্যভাবে সকলের সামনে আমাকে যদি লাঞ্ছিত, অপমানিত করা না হতো এবং শাস্তি যা দেওয়ার তা যদি গোপনে গোপনে দিয়ে দেওয়া হতো তাহলেই ভালো হতো। সে আরও আফসোস করে বলবে "হায় আমার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো।" অর্থাৎ দুনিয়ায় মরার পর আমি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। দ্বিতীয় কোনো জীবন-ই যদি না হতো। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, মানসিক শাস্তি শারীরিক শাস্তি হতেও পীড়াদায়ক।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ" : উল্লিখিত আয়াতে سُلْطَانِيَهْ শব্দের অর্থ দু'টি। এক অর্থ হলো- দলিল, প্রমাণ ও যুক্তি। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আয়াতের মর্ম হবে, আমি পার্থিব জীবনে অবস্থানকালে পুনরুত্থান, কিয়ামত, হাশর-নশর, বিচার ও আমলনামা লাভকরণের অবিশ্বাসের অনুকূলে যেসব দলিল ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করতাম আমা হতে তা সবই অপসৃত হলো। সেই যুক্তি-প্রমাণ এখন অসার প্রমাণিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, ক্ষমতা, আধিপত্য ও প্রতিপত্তি। এই অর্থ গ্রহণ করা হলে আয়াতের মর্ম হবে, পার্থিব জীবনে অবস্থানকালে আমার যে ক্ষমতা-আধিপত্য ও প্রভুত্ব বজায় ছিল, তা সবই আমা হতে অপসারিত হয়েছে। আমি এখন অসহায় ও নিরুপায় হয়েছি। আমার কোনো ক্ষমতা ও আধিপত্য নেই।

মাদারিক গ্রন্থকার এটার তাফসীরে লিখেছেন-

هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَةٌ اَىْ مُلْكِىْ وَتَسَلُّطِىْ عَلَى النَّاسِ وَبَقِيْتُ فَقِيْرًا وَ ذَلِيْلًا -

অর্থাৎ মানুষের উপর আমার প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব অকেজো হয়ে গেছে। কেবল এখন আমিই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় পড়ে রইলাম।

মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, سُلْطَانٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- غَلَبَهٌ وَتَسَلُّطٌ প্রাধান্য লাভ করা এবং লেলিয়ে পড়া। তাই حُكُومَتٌ-কে سَلْطَنَتٌ বলা হয় এবং حَاكِمٌ-কে سُلْطَانٌ ও বলা হয়। আয়াতের তাৎপর্য তখন এই বলেন- দুনিয়াতে অন্যান্য মানুষের উপর যে বড়ত্ব ও প্রধানত্ব ছিল, সকলেই আমাকে বড় জেনে ছিল, তা আজ কোনো কাজে আসেনি। আর حُجَّتٌ অর্থে ব্যবহৃত হলে তাঁর মতে আয়াতের তাফসীর হবে- হায় আফসোস! আজ আমার হাতে এমন কোনো সনদ নেই, যা দ্বারা আমি আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা পেতে পারি। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالَى اَلْقَاضِيَةَ ،مَالِيَهْ ، سُلْطَانِيَهْ : শব্দসমূহে বর্ণিত هَاءْ-এর তাৎপর্য : উক্ত শব্দগুলোর মধ্যে যে هَاءْ শেষাংশে রয়েছে এটাকে هَاءْ سَاكِنَهْ বলা হয়। ওয়াকফের সময় বাক্য বা শব্দের শেষাংশে এরূপ উপযুক্ত হয়ে سَاكِنْ هَاءْ হয়ে থাকে।

আল-মুফাসসাল গ্রন্থে বলা হয়েছে- كُلُّ مُتَحَرِّكٍ لَيْسَتْ حَرَكَتُهُ إِعْرَابِيَّةً يَجُوْزُ عَلَيْهِ الْوَقْفُ بِالْهَاءِ যথা ثَمَّهْ এবং ওয়াকফ ও ওয়াছল উভয় অবস্থায় তা বহাল থাকে। অধিকাংশ কারীগণের অভিমত এটাই। তবে مُصْحَفْ إِمَامْ বা مُصْحَفْ عُثْمَانِيْ-এর অনুসরণে সেই هَاءْ-এর حَرَكَتْ-কে تَرْك করাই বিধেয়।

مُصْحَفْ إِمَامْ নামে অভিহিত করার কারণ : উক্ত مُصْحَفْ إِمَامْ-কে مُصْحَفْ إِمَامْ নামে ভূষিত করার কারণ হলো, তা أَصْلُ الْمَصَاحِفِ আর সকলেই তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আর مُصْحَفْ إِمَامْ-ই نَقْلِ مُتَوَاتِرْ হিসেবে مَنْقُوْل হয়েছে। কেবল তাকে অধিক অনুসরণ করার দরুনই مُصْحَفْ إِمَامْ বলা হয় না। এরূপই আল্লামা যমখশরী (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবার কারো কারো মতে وَصْل মিলিয়ে পড়ার সময় উক্ত هَاءْ-কে حَذْف বা বিলুপ্ত করে পড়া জায়েজ।

তবে যাই হোক উক্ত هَاءْ-কে ثَابِتْ বা حَذْف রাখা উভয়ই দুরস্ত রয়েছে। কারণ সকল কেরাতই নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ .... بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ : যাদের আমলনামা বাম হস্তে আসবে সেই দুর্ভাগাদের সেদিনের অনুতাপ কোনো কাজেই আসবে না। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে দিবেন এবং বলবেন, তোমরা সে নাফরমানকে পাকড়াও করে ৭০ গজ লম্বা শিকল পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। পৃথিবীতে তার অহংকারের অন্ত ছিল না। এমনকি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করত না।

গুনাহগারদেরকে শিকল দ্বারা বাঁধার কারণ : গুনাহগারদের জন্য আল্লাহর শাস্তির নির্দেশই যথেষ্ট তথাপিও তাদেরকে শিকল দ্বারা আটকানোর প্রয়োজন কি?

এটার উত্তরে বলা যায়, যদিও শিকল দ্বারা আটকানোর প্রয়োজন করে না তবুও গুনাহ যেহেতু জঘন্যতম, তাই তার শাস্তিও জঘন্যতম হওয়া আবশ্যক। সুতরাং শাস্তির কঠিনতা বৃদ্ধি করার জন্য শিকল দ্বারা বেঁধে শাস্তি দেওয়া হবে। যাতে এদিকওদিক নড়াচড়া করার সুযোগ না হয়, আর খুব ভালোভাবে শাস্তি অনুভব করতে পারে। অথবা, এটার কারণ এই হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ الخ

قَوْلُهُ تَعَالٰى سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا : উক্ত আয়াতে ذِرَاعًا বলতে আরবি-ফারসি ভাষায় একগজ = ১ হাতকে বুঝায়, তবে এটা কার গজ, এটা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এটা দ্বারা (ذِرَاعُ الْمَلَكِ) ফেরেশতাদের গজ বা পরিমাণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
২. হাসান বসরী (র.) বলেন, এটা দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট গজ বা পরিমাপ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং ذِرَاعٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এটা আল্লাহই ভালো জানেন।
৩. ইবনে মুনযির নায়েফ বাকালী হতে বর্ণনা করে বলেন-

اَلذِّرَاعُ سَبْعُوْنَ بَاعًا وَالْبَاعُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ هُوَ بِالْكُوْفَةِ .

৪. ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সত্তর গজ বলে সে পরিমাণ লম্বা আকারের শিকল বুঝানো হয়েছে। এতে আসমান-জমিনের দূরত্বের পরিমাণ লম্বা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শিকলটি আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত দূরত্ব সম্পন্ন দীর্ঘ। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاسْلُكُوْ : মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, এটার প্রকৃত অর্থ হলো– তাকে জিঞ্জিরে আটক করো। অর্থাৎ জিঞ্জির কে তার শরীরের এক দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অপর দিক দিয়ে বের করে দাও। যেমনিভাবে তাসবীহ ও মনিমুক্তার হার গাঁথা য়ে থাকে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ الخ : দোজখীগণ আল্লাহর আজাব ও গজবের সম্মুখীন হওয়ার একটি বিশেষ কারণ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় কারণ ও তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বলা হয়েছে, সে নাফরমান ব্যক্তি তো নিজে কোনো অনাথকে অন্নদান করা দূরের কথা, অন্যকেও অন্নদানে উৎসাহিত করে না। এটাতে বুঝা যায় সে ব্যক্তি পুনরুত্থানকেও বিশ্বাস করত না। কেননা মানুষ মিসকিনদের সাহায্য দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে এবং পরকালের ছওয়াব পাওয়ার আশা করে থাকে। যখন পরকালের ছওয়াবের আশা করে না বা তাকে বিশ্বাস করে না তখন এতিম-মিসকিনদের অন্নদান করার কোনো অর্থই হয় না।

এ আয়াত দ্বারা এ কথার اِسْتِدْلَالْ করা যায় যে, মিসকিনদেরকে অন্নদান না করা মারাত্মক অপরাধ।

আয়াত وَلَا يَحُضُّ الخ টি এ কথা প্রমাণ করে যে, মিসকিনদের অন্নদান না করা অপেক্ষা অন্নদানের জন্য উৎসাহিত করা উত্তম, সুতরাং এটার ব্যাখ্যা কি?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– যারা অনাথদেরকে অন্নদানে উৎসাহ দান করে না তাদের অপরাধ যদি এত মারাত্মক হয় তবে অন্নদান না করাতো আরো মহাঅপরাধ সাব্যস্ত হবে। এ কথাটি বুঝানোর উদ্দেশ্যে আয়াতে এরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে একটি বর্ণনা এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে সর্বদা [খাওয়ার জন্য পাকানো তরকারিতে] অধিক শুরুয়া দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন, যাতে মিসকিনদেরকে তা দ্বারা বিদায় করতে সহজ হয়। আর তিনি বলতেন–

خَلَعْنَا نِصْفَ السِّلْسِلَةِ بِالْاِيْمَانِ فَلْنَخْلَعْ نِصْفَهَا بِهٰذَا .(مَدَارِكْ)

আর আয়াতটি এ কথাও প্রমাণ করে যে, কাফেরগণ মানুষকে দয়া বর্ষণ করে না, আর মু'মিনগণ দয়া বর্ষণ করে থাকে। কারণ তিনি মানুষকে দু' শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন– ১. ঈমানদার, ২. কাফের, অর্থাৎ اَهْلُ يَمِيْنٍ ও اَهْلُ شِمَالٍ প্রথম পক্ষের বেলায় বলেছেন, اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ আর দ্বিতীয় পক্ষের বেলায় বলা হয়েছে– اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ –[মাদারিক]

غِسْلِيْنٌ-এর মর্মার্থ : غِسْلِيْنٌ শব্দটি غَسْلٌ শব্দ হতে উদ্ভূত। এটার অর্থ হলো– ব্যবহৃত পানি। বিধৌত পানি সর্বদাই ময়লাযুক্ত হয়। আল-কুরআনে এ শব্দটি ক্ষত-নিঃসৃত পানি বা পচা রক্ত বা পুঁজ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কতক তাফসীরকারের মতে এটা দ্বারা যাক্কুম বা কাঁটাযুক্ত বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে, তবে এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যদি এক বালতি 'গিসলীন' এ দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হতো তবে এ পৃথিবী দুর্গন্ধে ভরে যেত। –[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٣٨. فَلَا لَا زَائِدَةٌ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ .

৩৮. অনন্তর ﻻ অব্যয়টি অতিরিক্ত আমি শপথ করছি তার যা তোমরা দেখছ সৃষ্টির মধ্য হতে।

٣٩. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ مِنْهَا أَيْ بِكُلِّ مَخْلُوقٍ .

৩৯. আর যা তোমরা দেখতে পাও না তা হতে অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির।

٤٠. إِنَّهُ أَيِ الْقُرْآنَ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ أَيْ قَالَهُ رِسَالَةً عَنِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى .

৪০. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআন সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফেরেশতা এটাকে বহন করে এনেছেন।

٤١. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ء قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ .

৪১. এটা কোনো কবির কবিতা নয়, তোমরা সামান্য বিশ্বাস কর।

٤٢. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ء قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الْفِعْلَيْنِ وَمَا زَائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ وَالْمَعْنٰى أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِأَشْيَاءَ يَسِيرَةٍ وَتَذَكَّرُوهَا مِمَّا أَتٰى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْخَيْرِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ شَيْئًا .

৪২. আর না কোনো গণকের কথা, তোমরা সামান্যই অনুধাবন কর শব্দটি يَاءْ ও تَاءْ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, উভয় ক্রিয়ার মধ্যে। আর مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত ও গুরুত্বারোপের জন্য অর্থাৎ এ সকল লোক এ সমস্ত কথাতো স্বীকার করে এবং স্মরণ রাখে যা অতিশয় নগণ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত শিক্ষার মোকাবিলায়। অর্থাৎ কল্যাণ, প্রতিদান ও পুণ্যাত্মতা। সুতরাং কিছুই তাদের কোনো কাজে আসবে না।

٤٣. بَلْ هُوَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

৪৩. বরং এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত গ্রন্থ।

٤٤. وَلَوْ تَقَوَّلَ أَيِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ بِأَنْ قَالَ عَنَّا مَا لَمْ نَقُلْهُ .

৪৪. যদি সে স্বয়ং রচনা করত অর্থাৎ নবী করীম ﷺ আমার নামে কোনো কল্পকথা যেমন, আমার পক্ষে এমন কথা বলত, যা আমি বলিনি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ : বাক্যে لَا অতিরিক্ত বা নাফিয়া لَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ কসম, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ জবাবে কসম। وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ বাক্যটি তাকিদের জন্য, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ আতফ হয়েছে بِقَوْلِ شَاعِرٍ বাক্যের উপর। تَنْزِيلٌ খবর هُوَ উহ্য মুবতাদার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَا أُقْسِمُ الخ -এর শানে নুযূল : মক্কার কাফের সরদারেরা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করত। তারা রাসূলের দাওয়াত বাইরের লোকজন যেন গ্রহণ না করে এ উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ-কে বিভিন্ন অপবাদ দিতে চেষ্টা করত। মুকাতিল বলেন যে, ওয়ালীদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যাদুকর বলেছিল এবং আবূ জাহল বলেছিল, মুহাম্মদ ﷺ একজন কবি; আর উতবা বলেছিল, মুহাম্মদ

একজন গণকঠাকুর। তোমরা কেউ তার কথাবার্তা শুনো না, তাঁর কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ো না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা খণ্ডন করে এ আয়াতগুলো নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَلَآ اُقْسِمُ ... وَمَالَا تُبْصِرُوْنَ" : আয়াতে উল্লিখিত لَا অব্যয়টি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এটা অতিরিক্ত। আর কেউ কেউ বলেন, এটা نَفِىْ لِلْقَسَمِ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। زَائِدَةٌ لَا হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- তোমরা যা কিছু দেখছ এবং যা কিছু তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে সব কিছুরই কসম করছি। আর نَفِىْ لِلْقَسَمِ لَا হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তোমরা যা কিছু দেখছ এবং যা কিছু তোমাদের জন্য অদৃশ্য সব কিছুরই কসম করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তোমরা যা দেখছ ও দেখছ না, যেমন- সত্য কথা তেমনি রাসূলের কথাগুলোও সত্য এবং হক। সেজন্য কসম করার কোনো প্রয়োজন হয় না। -[কুরতুবী]

"তোমরা যা দেখছ এবং যা দেখছ না" বলে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ ব্যাপক। কেউ বলেন, যা দেখতে পাওয়া যায় না তা হলো পরকাল, জিন, ফেরেশতা। আর যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা এ দুনিয়ার সৃষ্টিকুল। অপর কেউ বলেন, তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, যে ব্যক্তি কুরআন পেশ করছেন তিনি অতিশয় ভদ্র এবং আমানতদার। এতে তার কোনো স্বার্থ নেই।

কসম নেওয়ার কারণ : মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, এখানে শপথ বাক্য ব্যবহার করার কারণ হলো কোনো কোনো সৃষ্টি স্বীয় بِالْفِعْلِ يَا بِالْقُوَّةِ স্বীয় দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা রাখে, আবার কোনো সৃষ্টি দেখার ক্ষমতা রাখে না, অর্থাৎ কুরআন মাজীদ অবতরণকারীকে দেখা যায় না, আর যাদের উপর অবতীর্ণ করা হয় তাদেরকে দেখা যায়, এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য। -[মা'আরিফ]

আর لَا اُقْسِمُ টি কারো কারো মতে زِيَادَةٌ নেওয়া হয়েছে। তখন মূল ইবারত হবে- اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ
আবার কেউ কেউ তাকে نَفِىٌ لِلْقَسَمِ ও বলেন, তখন হাসেলে ইবারত হবে। অর্থাৎ-
لَاضَرُوْرَةَ الْقَسَمِ بِالْاَشْيَاءِ الَّتِىْ تَرَوْنَ وَالَّتِىْ لَا تَرَوْنَهَا كُلُّهَا .

قَوْلُهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ : رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এটাতেও মতবিরোধ রয়েছে। মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ অথবা হযরত জিবরীল (আ.) উদ্দেশ্য। يَعْنِىْ يَقُوْلُهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ عَلٰى وَجْهِ الرِّسَالَةِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাত হিসেবে এটা সম্বন্ধে তাবলীগ করছেন বা বলাবলি করছেন।

এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবস্বরূপ হয়েছে। তা হলো اِنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللّٰهِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَكَيْفَ يُقَالُ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ؟ অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী, সুতরাং এটাকে قَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ কি করে বলা শুদ্ধ হয়েছে? এটার উত্তর দেওয়া হয়েছে- وَالْجَوَابُ اِنَّهُ يَقُوْلُهُ عَلٰى سَبِيْلِ التَّبْلِيْغِ لَا اَنَّهُ وَصْفٌ لَهُ كَمَا اَنَّهُ كَذٰلِكَ اللّٰهُ تَعَالٰى (جُمَلٌ) অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কালামকে তাবলীগ-স্বরূপ বর্ণনা করছেন। (এটা স্বীয় বাক্য নয়) এ বাণীর উচ্চারণ তাঁর কোনো وَصْفٌ নয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন তার এ নির্দেশ।

اَلرَّسُوْلُ الْكَرِيْمُ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত ৪০নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'এ কুরআন' এক মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের কথা। এটা দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে। আর সূরা তাকবীরে ১৯নং আয়াতে এরূপ একই কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে। কুরআন রাসূলের বা জিবরাঈলের নিজস্ব কথা নয় বরং আল্লাহ তা'আলারই কথা, এটার প্রমাণ স্বয়ং রাসূল শব্দটি। কেননা রাসূল তো বার্তাবাহক ও প্রতিনিধিকেই বলা হয়। এটা ছাড়া ৪৩নং আয়াতে পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, "এটা বিশ্বের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।" তবে 'সম্মানিত বার্তাবাহকের কথা' এদিক দিয়ে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর নিকট হতে, রাসূল জিবরাঈলের মুখ হতে এবং শ্রোতামণ্ডলী রাসূলের মুখের ধ্বনি হতে শুনত। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, এটা মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের মুখে উচ্চারিত আল্লাহর কথা। আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের শপথ করে বলছেন যে, এ কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের নিজস্ব কোনো কথা নয়। তাঁর রচিত কোনো কবিতার চরণ নয়। কোনো গণকঠাকুরদের উক্তি নয়। রাসূল নিজ পক্ষ হতে কিছু রচনা করে বললে আমি

তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম। এমনভাবে শাস্তি দিতাম যে, তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না। এ কথাগুলো বলার কারণ হলো যে, আল-কুরআনের অবিসংবাদিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাক্য-বিন্যাস ও ছন্দের ঝংকার অবলোকন করে মক্কার অনেক লোকই মহানবী ﷺ-কে কাব্যকার নামে অভিহিত করেছিল। আল-কুরআনের পরকালীন গায়েবী সংবাদ ও তত্ত্ব শ্রবণ করে লোকেরা ভাবত যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন উন্নত মানের গণক। জ্যোতিষ্ক জ্ঞানের সহায়তায় এ সব অলৌকিক ও মহাশূন্য সম্পর্কীয় তত্ত্ব প্রকাশ করছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সব ধারণা ও কথার প্রতিবাদেই বলেছেন যে, আল-কুরআন কোনো কবির কাব্যচরণ বা কোনো গণকের অদৃশ্য সংবাদ কাহিনী নয়। সূরা ইয়াসীনেও বলা হয়েছে যে, "আমি তোমাকে কবিতা শিক্ষা দেই নি এবং এটা শিক্ষা করাও তোমার পক্ষে সমীচীন নয়।" বস্তুত আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের অবিসংবাদিত এবং তা আল্লাহর কালাম হওয়ার প্রমাণের জন্যই উপরিউক্ত কথাগুলো বলেছেন।

قَوْلُهُ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا ... مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : কুরাইশদের মেধাশক্তি সাধারণত কবিতা বা কবিত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, سَلَامَتْ وَطَلَاقَتْ اَوْ فَصَاحَتْ بَلَاغَتْ-এর ক্ষেত্রে তারা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল, তাদের এমনও ধারণা ছিল যে, কবিগণ অসাধারণ শক্তির অধিকারী তাই কুরআনের মধ্যে বালাগতের পরিপূর্ণতা দেখে মুহাম্মদ ﷺ-কে তারা কবি বলে বেড়াত। তাই আল্লাহ বলেন, এটা কোনো কবির কবিতা নয়। অর্থাৎ আমার রাসূল কোনো কবি নন। তবে এটা তোমাদের খুব কমই বিশ্বাস আসবে। কেননা তোমরা কবিত্বের পথে মাতাল রয়েছ। তোমাদের সৃষ্টিতে কবিত্বের জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর মক্কাবাসীগণ কুরআনের বালাগাত ও ফাসাহাত দেখে যেমনি তাঁকে কবি বলত, তেমনি যেহেতু কুরআনুল কারীমে অতীত যুগের অবিস্মরণীয় ঘটনাবলি প্রকাশ করত এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বহু ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত করে দেখতে পেল এবং তা সত্য প্রমাণিত হতে লাগল। তাই তারা তাঁকে كَاهِنٌ বা গণক বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করল।

আল্লাহ বলেন, এটা কোনো كَاهِنٌ-এর বক্তব্য নয়। আর তোমরা তো একটু ভেবে দেখ না যে, গণকের কথা ও কুরআনের বক্তব্যে কি অসাধারণ পার্থক্য রয়েছে। গণকরা অপবিত্র এবং গণকদের কথা শতকরা ৯৯% মিথ্যা এবং কুরআনের বাণী পবিত্র এবং তার ১০০% সত্য হচ্ছে! তথাপিও কুরআনকে কিভাবে قَوْلُ كَاهِنٍ বলছে! তাই বুঝে নাও যে, এটা رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর পক্ষ থেকে রচিত সত্য বাণী বৈ অন্য কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে তোমরা যে সকল দাবি করছ তা সম্পূর্ণই মিথ্যা।

গণক বা কাহিন কাকে বলে? : কাহিন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি جِنَّاتْ অথবা শয়তান জাতি সংশ্রবে এবং তারকারাজির দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে আন্দাজ করে কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রচনা করে থাকে। এটাতে অধিকাংশ কথাই মিথ্যা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ" : "তোমরা খুব কমই ঈমান গ্রহণ কর" কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম হলো, "তোমরা ঈমান আন না"। দ্বিতীয় অর্থ হলো, কুরআনের বক্তব্য শুনে তোমাদের হৃদয় স্বতই এ কথা বলে উঠে যে, এটা মানুষের কালাম হতে পারে না; কিন্তু তোমরা তো নিজেদের জিদের উপর অবিচল হয়ে থাকছো এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করছ না।

অনুবাদ :

٤٥. لَاَخَذْنَا لَنِلْنَا منه عقابا بالْيَمِيْنِ بالقوة والقدرة .

৪৫. তবে আমি তাকে ধৃত করতাম শাস্তিদান উদ্দেশ্যে পাকড়াও করতাম দক্ষিণ হস্তের মাধ্যমে শক্তি ও ক্ষমতার সাথে।

٤٦. ثم لقطعنا مِنْهُ الْوَتِيْنَ نِيَاطَ الْقَلْبِ وَهُوَ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ بِهِ إِذَا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ .

৪৬. অতঃপর কর্তন করে দিতাম তার জীবন-ধমনী আত্মার শিরা, তা হলো তার সাথে সংশ্লিষ্ট শিরা, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

٤٧. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ هُوَ اِسْمُ مَا وَمِنْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ النَّفْيِ وَمِنْكُمْ حَالٌ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ مَانِعِيْنَ خَبَرُمَا وَجُمِعَ لِاَنَّ اَحَدًا فِيْ سِيَاقِ النَّفْيِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ وَضَمِيْرُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْ لَا مَانِعَ لَنَا عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْعِقَابِ .

৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ নেই اَحَدٍ ইসমে 'মা' আর مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা نَفِيْ-এর تَاكِيْد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আর مِنْكُمْ শব্দটি اَحَدٌ হতে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হতে রক্ষাকারী প্রতিরোধকারী। এটা مَا-এর خَبَرْ আর এটাকে এ জন্য বহুবচন নেওয়া হয়েছে, যেহেতু اَحَدٌ শব্দটি نَفِيْ-এর সিয়াকে অবস্থিত হিসেবে বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত। আর عَنْهُ মধ্যকার যমীর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আজাব হতে মুক্তির কোনো উপায় হতো না।

٤٨. وَاِنَّهُ اَيْ الْقُرْاٰنَ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ .

৪৮. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআন মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ।

٤٩. وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ مُكَذِّبِيْنَ بِالْقُرْاٰنِ وَمُصَدِّقِيْنَ .

৪৯. আর আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছে হে মানুষ! মিথ্যারোপকারী কুরআনের প্রতি এবং সত্যারোপকারী।

٥٠. وَاِنَّهُ اَيْ الْقُرْاٰنَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ اِذَا رَاَوْا ثَوَابَ الْمُصَدِّقِيْنَ وَعِقَابَ الْمُكَذِّبِيْنَ بِهِ

৫০. আর নিশ্চয় এটা কুরআন কাফেরদের জন্য অনুশোচনার কারণ যখন তারা সত্যারোপকারীদের ছওয়াব এবং মিথ্যারোপকারীদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

٥١. وَاِنَّهُ اَيْ الْقُرْاٰنَ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ اَيْ لِلْيَقِيْنِ حَقَّ الْيَقِيْنِ .

৫১. আর নিশ্চয় এটা কুরআন নিশ্চিত সত্য অর্থাৎ বিশ্বাস করার জন্য যথার্থ বিশ্বাসযোগ্য।

٥٢. فَسَبِّحْ نَزِّهْ بِاسْمِ زَائِدَة رَبِّكَ الْعَظِيْمِ .

৫২. অতএব পবিত্রতা ঘোষণা করো মহিমা কীর্তন করো নামের সাথে এটা অতিরিক্ত তোমার সুমহান প্রতিপালকের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যদি মুহাম্মদ ﷺ পবিত্র কুরআনের সাথে নিজের পক্ষ হতে ২/৪টি কথা মিলায়ে দেয় অর্থাৎ এটা যদি হয়ে থাকেও (তবে তার পরিণাম কি হবে তা বলেননি)। অত্র আয়াতে তার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ .... عَنْهُ حَاجِزِيْنَ : এ বাক্যটির মর্মার্থ হলো, মহান আল্লাহ বলেন– যদি আমার নবী ﷺ স্বীয় অন্তর হতে কোনো কথা বানিয়ে তাকে আমার প্রতি সম্পর্ক করে দেন, তবে এ মারাত্মক অপরাধের কারণে সর্বপ্রথম আমিই তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম। তা এভাবে যে, প্রথমে আমি স্বীয় ক্ষমতা বলে তাঁকে পাকড়াও করতাম অতঃপর তাঁর রগ কেটে দিতাম, তখন তোমাদের কেউ তাকে সেই আজাব হতে রক্ষা করতে পারত না। এ কথাটি এভাবেও বুঝিয়ে নেওয়া যায় যে, বাদশাহ কর্তৃক সনদ-প্রমাণ এবং নিয়োগপত্রসহ দায়িত্ব সম্পাদনে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার মর্যাদার অপব্যবহার করে, তখন তার যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা বাদশাহের উপর অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র তথাপিও কিভাবে আল্লাহ বলেন– لَاَخَذْنَا بِالْيَمِيْنِ [আমি তাকে ডান হাতে পাকড়াও করবো]? : এ বাক্যের মর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্ন তাফসীর করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ يَعْنِيْ لَاَخَذْنَا بِيَمِيْنِهٖ অর্থাৎ অবশ্যই তাকে তার ডান দিক হতে পাকড়াও করতাম যাতে তার সর্বশক্তি প্রথমেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

অথবা, يَمِيْن-কে خَاصّ করার কারণ হচ্ছে– যখন হত্যাকারীগণ কারো পিষ্ঠদেশ হতে হত্যা করতে চায় তখন তার (হত্যাকৃত ব্যক্তির) বাম হস্ত ধরে ফেলে, আর যখন তার গর্দানায় হত্যা করার ইচ্ছা হয় তখন তার ডান হস্ত ধরে ফেলে থাকে, যাতে হত্যাকৃত ব্যক্তি তলোয়ার দেখতে পায় এবং হত্যাকাণ্ডে অধিক কষ্ট অনুভব করে থাকে। –[মাদারিক]

কেউ কেউ বলেন– এটার অর্থ হলো তাকে শক্তির সাথে ধরা হবে। –[জালালাইন]

কারো মতে, এটার অর্থ হলো খুবই কড়াক্রান্তি হিসাব করে তার হিসাব নেওয়া হবে।

কেউ বলেন, এটার মর্ম হলো আমি তাকে ধৈর্যের সাথে হত্যা করবো। যেভাবে রাজা-বাদশাহগণকে কেউ মিথ্যাবাদী বললে তখন খুবই রাগান্বিত হয়ে হঠাৎ তাকে আক্রান্ত করে বসে। এভাবে হত্যা করাকে قَتْل صَبْر বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কঠোর হস্তে দমন করার জন্য يَمِيْن-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। –[মাদারিক]

অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা ডান বাম ইত্যাদির মুখাপেক্ষী নন। বান্দাগণের সহজ বোধের জন্য এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلْوَتِيْنَ : اَلْوَتِيْن সম্পর্কে জালালাইন গ্রন্থকার ও মাদারিক গ্রন্থকার বলেন– اَلْوَتِيْنُ نِيَاطُ الْقَلْبِ وَهُوَ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ بِالْقَلْبِ اِذَا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهٗ. অর্থাৎ اَلْوَتِيْن অন্তঃকরণের রগকে বলা হয়, যার সম্পর্কে অন্তর হতে বিনষ্ট হয়ে গেলে প্রাণী মৃত্যুবরণ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরূপই বর্ণনা করেছেন, আর মুজাহিদ (র.) বলেন– هُوَ الْحَبْلُ الَّذِيْ فِى الظَّهْرِ –[কাবীর]

قَوْلُهُ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ : হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর 'মাথা' হতে 'পা' পর্যন্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেবল সত্য বাণীর নিশানস্বরূপ। যে পয়গাম আমার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয় তা বিন্দু-বিসর্গসহ তিনি তোমাদের নিকট পেশ করে থাকেন। তাই এ কালামের প্রত্যেকটি অক্ষর সম্পূর্ণরূপে সত্য। আল্লাহভীরুদের জন্য এটাতে সম্পূর্ণ নসিহত ও উপদেশ বাণী দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে।

مُتَّقِيْن-দের জন্য কুরআনকে تَذْكِرَة বলে নির্দিষ্ট করার কারণ : এটার কারণ এই যে, যারা এটা হতে উপকৃত হতে চেষ্টা করবে, তারাই উপকৃত হতে সক্ষম হবে। মুত্তাকীনগণ যেহেতু তাকে উপদেশ বা নসিহত হিসেবে কবুল করে থাকে বা তাদের মধ্যে সে مَادَّة রয়েছে তারাই তা থেকে উপকৃত হতে সক্ষম হবে। আর কাফেরদের মধ্যে যেহেতু উপদেশ গ্রহণের مَادَّة নেই, তারা গ্রহণ করতে পারবে না। তাই تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে এ কথাটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলেন, ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ যারা উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের জন্যই এটা উপদেশ দান করবে। অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে নসিহত বাণী সম্বলিত হওয়াই তার صِفَاتْ كَمَالِيَةْ اِضَافِيَةْ হওয়ার কারণ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِيْنَ : এ আয়াতে কুরআন অমান্যকারীদেরকে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে। নিজেরা নিজেদেরকে সত্যবাদী বললেই চলবে না; বরং সবই আল্লাহর জানা রয়েছে– কে সত্যের পথে রয়েছে, আর কে মিথ্যার পথে রয়েছে। কেননা– اِنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ : যারা আল্লাহকে ভয় করে পবিত্র কুরআন ইহকাল ও পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর রহমত হিসেবে কাজ করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে অমান্য করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হয় না। এমন একদিন আসবে যেদিন এই মূর্তিমান রহমত তাদের বিপক্ষে আক্ষেপ-অনুতাপের কারণে পরিণত হবে। তারা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে হায়! যদি দুনিয়াতে এ কুরআনকে মেনে নিতাম– এর বাণীর উপর আমল করতাম, তবে এমনভাবে আজ চরম সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হতো না। আর এ কথা তখনই বলতে থাকবে যখন কুরআনের অনুসরণকারীগণকে ছওয়াব ও অন্যায়কারীদেরকে শাস্তি দেওয়া শুরু হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ : আর প্রকৃতপক্ষে এটাই বিশ্বাসযোগ্য। অর্থাৎ যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে এ কুরআনকেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ কুরআনের প্রত্যেকটি বিষয়ই দ্বিধা-সন্দেহের ঊর্ধ্বে। এটাতেই অবিচল বিশ্বাস যোগাতে হবে।

১. عِلْمُ يَقِيْنٍ যে কোনো বস্তুর একিনের স্তর তিনটি। হাকিকত সম্বন্ধে বর্ণনা দ্বারা অবহিত হওয়া যথা– اَلْعَسَلُ حُلْوٌ মধু মিষ্টি। এটা শুনে তাকে বিশ্বাস করা এবং সাধারণভাবে মিষ্টির সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা যায়।

২. حَقُّ الْيَقِيْنِ কোনো একটি বস্তুর হাকিকত সম্বন্ধে শুনে চাক্ষুষ প্রমাণ গ্রহণ করা। যথা– شَرِبْتُ الْعَسَلَ بِلَذَّةٍ আমি তৃপ্তিসহকারে মধু পান করলাম।

৩. عَيْنُ الْيَقِيْنِ যথা– رَأَيْتُ يَشْرَبُ النَّاسُ الْعَسَلَ بِلَذَّةٍ আমি মানুষকে তৃপ্তিসহকারে মধু পান করতে দেখেছি। অর্থাৎ শ্রুতিগত জ্ঞানের পরিধির মাধ্যমে বিশ্বাস করাকে عِلْمُ الْيَقِيْنِ আর স্বচক্ষে দৃষ্টির মাধ্যমে অনুভব করলে حَقُّ الْيَقِيْنِ এবং বাস্তবে উপলব্ধি করে নিলেই عَيْنُ الْيَقِيْنِ হবে। এটাই তাসাউফ পন্থিদের অভিমত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ" : এ বাক্যাংশটির অর্থ হলো, কুরআন আল্লাহর সুনিশ্চিত বাস্তব সত্য কালাম। যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাতিলের কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই। আদ্যোপান্ত জ্বলন্ত সত্যের প্রতীক। ইয়াকীনের সাধারণ অর্থ হলো দৃঢ় বিশ্বাস। তাসাউফের পরিভাষায় একিনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। পুঁতিগত বিদ্যা বা শ্রুত জ্ঞানের মাধ্যমে যে বিশ্বাস লাভ হয়, তাকে 'ইলমুল ইয়াকীন' বলা হয়। এ ধরনের বিশ্বাস বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর চাক্ষুষ দর্শনের জ্ঞানের মাধ্যমে যে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় 'আইনুল ইয়াকীন'। এরূপ বিশ্বাস লাভ হলে তা বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর বাস্তব ব্যবহারিক উপলব্ধি জ্ঞানের দ্বারা যে বিশ্বাস লাভ হয় তাকে বলা হয় 'হাক্কুল ইয়াকীন।' এ বিশ্বাস 'আইনুল ইয়াকীনের তুলনায় অনেক সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। বিশ্বাসের এ তিনটি পর্যায়কে আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারি। যেমন– ভূগোলশাস্ত্রের জ্ঞানের মাধ্যমে বা কারো নিকট শুনে অবগত হলাম যে, বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ফলে বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে আমাদের মনে একটি প্রবল বিশ্বাস জন্মিল, কিন্তু অন্য কোনো লোক যদি বলে যে, বঙ্গোপসাগর বলতে কিছুই নেই বা কোনো ভূগোল দ্বারা যদি পাল্টা প্রমাণ করা যায় যে, বঙ্গোপসাগর বলতে কিছুই নেই। তবে আমাদের মনের অর্জিত বিশ্বাসটি হয় দোদুল্যমান বা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির পথে। একে 'ইলমুল ইয়াকীন' বলা যেতে পারে। আর যদি বাংলার দক্ষিণপ্রান্তে গিয়ে নিজেই বঙ্গোপসাগরকে অবলোকন করে আসে, তবে বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে কোনো যুক্তি জ্ঞানই আমার চাক্ষুষ জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারবে না। আর যদি আমি বঙ্গোপসাগরের অথৈ পানিতে নেমে গোসল করি, সন্তরণ করি, সেখান হতে পাথরকুচি ও সাগরের পানি নিয়ে আসি, তবে এ ব্যবহারিক জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস পূর্বটির তুলনায় আরো দৃঢ় ও মজবুত হয়। আমি বিরুদ্ধবাদীগণকে পাথরকুচি ও পানি পান করিয়ে নিজের মতে মতাবলম্বী করতে পারবো। এটাকেই বলা হয় 'হাক্কুল ইয়াকীন'। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে এ ধরনের বিশ্বাসজনিত গ্রন্থরূপে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ কুরআন যারা শ্রবণ করেন কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে যারা গবেষণা করে ও কুরআনের বিধানসমূহ যারা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করে তাদের অন্তরের মণিকোঠায় এ ধরনেরই অবিসংবাদিত বিশ্বাস লাভ করে।

তারা বাস্তবরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, এ কুরআন মহাসত্য ও আল্লাহর বাণী। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কুরআনের বাণীর ন্যায় একটি বাক্য রচনা করার ক্ষমতা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের হয়নি। অথচ অতিবাহিত চৌদ্দশত বছরের মধ্যে কত জ্ঞানীগুণী ও যুগস্রষ্টা, সাহিত্যিক ও কাব্যকারের উদ্ভব হলো, কেউ তো কুরআনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হলো না। তাই আল্লাহ বলেছেন, হে অবিশ্বাসীগণ! তোমরা গ্রাহ্য কর আর নাই কর, আল-কুরআন একটি মহাসত্য, দৃঢ় প্রত্যয়শীল বাস্তব সত্য, আল্লাহর কালাম। যারা একে স্বীকার করে না, তারাই হতভাগ্য, তারাই আল্লাহর নিয়ামত হতে বঞ্চিত।

قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার কালাম। এটা আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশাবলিতে ভরপুর। কুরআন বিরোধীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত। তাই উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে تَسْبِيْح পাঠ করার জন্য বলছেন। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেই ওহী নাজিলের জন্য মনোনীত করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটা রুকুতে রাখ' এ জন্য রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া এবং তা তিন বার পড়া উম্মতের সম্মিলিত মতে সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। –[মা'আরিফুল কোরআন]

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এখানে تَسْبِيْح টি নামাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তথা হে রাসূল! আপনি আল্লাহকে স্মরণ করুন, নামাজ আদায় করতে থাকুন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের আদেশ মোতাবেক নামাজ আদায় করুন। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ : সূরা আল-মা'আরিজ

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার তৃতীয় আয়াতে উল্লিখিত ذِي الْمَعَارِجِ হতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে; একে الْوَاقِعُও বলা হয়। এতে ২টি রুকু', ৪৪টি আয়াত, ২১৬টি বাক্য এবং ৮৬১টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটিও মক্কায় অবস্থানকালে অবতারিত প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু সূরাটি কখন নাজিল হয়; তা সঠিকরূপে বলা যায় না। সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা اَلْحَاقَّةُ যে অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সূরাটিও প্রায় অনুরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি اَلْحَاقَّةُ -এর পর মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়। -[নূরুল কোরআন]

মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু : মক্কার কাফেরগণ কিয়ামত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে মহানবী ﷺ এবং তাঁর অনুসারীগণকে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক করত। আর বলত- হে মোহাম্মদ! তোমার কথা যদি সত্য হয় এবং তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাক, তবে সে কিয়ামত সংঘটিত করিয়ে দেখাও দেখি। তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ আমরা তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ তা'আলা গোটা সূরাটিই কাফেরদের এই চ্যালেঞ্জের জবাবে অবতীর্ণ করেছেন।

প্রথম থেকে ১৪ নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, জনৈক লোক কিয়ামতের শাস্তি চাচ্ছে। এ শাস্তি কাফেরদের জন্য বিলম্ব হলেও অবশ্যই হবে। কেননা আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতির বিপরীত কিছু করেন না। সুতরাং আপনি তাদের অসদাচরণে ধৈর্যহারা হবেন না। তারা তাকে খুব দূরের বিষয় ভাবে; কিন্তু আমি অতি সন্নিকটে দেখছি। যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে সেদিন আকাশমণ্ডলী বিগলিত ধাতুর ন্যায় হবে। পাহাড়গুলো রঙ্গিন পশমের ন্যায় উড়বে। সেদিন পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও কেউ কারো নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে না। বন্ধু-বান্ধব সংবাদ নিবে না। লোকেরা শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন, জাতি-গোষ্ঠীকে মুক্তিপণ রাখতে চাইবে; কিন্তু কিছুতেই তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না।

১৫ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত লেলিহান অগ্নিশিখার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সে আগুন দ্বারা দেহের চর্ম জ্বলে খসে পড়বে। এ পৃথিবীতে যারা ঈমান আনেনি এবং দীন হতে দূরে সরে রয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকবে।

১৯ থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে- জাহান্নাম হতে কোন ধরনের লোক মুক্তি পাবে তাদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে- যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে, ভিক্ষুক ও অভাবীদের জন্য নিজেদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করে, অপাত্র হতে নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে চলে এবং যারা প্রতিশ্রুতি ও আমানত রক্ষা করে, আর সঠিক সাক্ষ্য দানে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে, তারাই লাভ করবে অথৈ নিয়ামতের ভাণ্ডার জান্নাত। সেখানে তারা সম্মানজনক জীবন যাপন করবে।

৩৬ থেকে ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের হলো কি? তারা আপনার কাছে দলে দলে এসে ভিড় জমায় কেন? তারা কি অথৈ নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের আশা করে নাকি? কখনো তারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না। জান্নাত লাভের একটি গুণগত মান রয়েছে। সে মানে তাদের পৌঁছতে হবে- অন্যথা নয়। তারা যদি ঈমান না আনে তবে আমি তাদের পরিবর্তে নতুন জাতি সৃষ্টিতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এ কথা আমি বহু উদয়াচল ও অস্তাচলের একক প্রতিপালকের শপথ করে বলছি। আমি তাতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাবান।

পরিশেষে বলেছেন যে, হে নবী! আপনি তাদেরকে আমোদ-ফূর্তি ও কৌতুকের মধ্যে থাকতে দিন। তাদের প্রতি আপনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। কিয়ামতের দিন তারা কবর হতে উত্থিত হয়ে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে দ্রুতবেগে দৌড়াতে থাকবে। সেদিন লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। তাদের নয়নযুগল থাকবে সর্বদা অবনমিত। নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য অনুতাপ করতে থাকবে, কপালে হাত মেরে বলবে- হায়! কি করলাম; কিন্তু তখন সে অনুশোচনায় কোনোই কাজ হবে না।

সূরা আল-হাক্কাহ্-এর সাথে সূরা আল-মা'আরিজ-এর যোগসূত্র : সূরা আল-হাক্কাহ্তে কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিয়ামতের অবিশ্বাসীর পরিণাম আলোচা করা হয়েছে। সেখানকার আলোচনাকে সূরা আল-মা'আরিজ -এ পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এ সূরাটি সূরা আল-হাক্কাহ্ -এর বক্তব্যের পূর্ণতা দানকারী হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

سورة المعارج مكية : সূরা আল-মা'আরিজ মক্কায় অবতীর্ণ

৪৪ আয়াত বিশিষ্ট : اربع واربعون اية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. سَالَ سَائِلٌ دعَا دَاعٍ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ .

অনুবাদ :

১. এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল আবেদনকারী আবেদন করল অবধারিত শাস্তি সংঘটিত হতে।

٢. لِلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ هُوَ النَّضْرُ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ الاية .

২. কাফেরদের জন্য এর প্রতিরোধকারী কেউই নেই অর্থাৎ নযর ইবনে হারিছ, সে এ দোয়া করেছিল যে, اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ فَامْطِرْ عَلَيْنَا

٣. مِنَ اللّٰهِ مُتَّصِلٌ بِوَاقِعٍ ذِى الْمَعَارِجِ مَصَاعِدِ الْمَلٰئِكَةِ وَهِىَ السَّمٰوٰتُ .

৩. আল্লাহর পক্ষ হতে এটা পূর্বোক্ত وَاقِعٌ -এর সাথে সম্পৃক্ত। যিনি সোপানসমূহের অধিকারী ফেরেশতাগণের আরোহণের বাহন, আর তা হলো আকাশমণ্ডলী।

٤. تَعْرُجُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ جِبْرِيْلُ اِلَيْهِ اِلٰى مَهْبَطِ اَمْرِهٖ مِنَ السَّمَاءِ فِىْ يَوْمٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ يَقَعُ الْعَذَابُ بِهِمْ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْكَافِرِ لِمَا يَلْقٰى فِيْهِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ اَخَفَّ مِنْ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ يُصَلِّيْهَا فِى الدُّنْيَا كَمَا جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ .

৪. ঊর্ধ্বারোহণ করে শব্দটি يَاءٌ ও تَاءٌ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। ফেরেশতাকুল ও আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর প্রতি আকাশের যে অংশে তাঁর আদেশ অবতারিত হয়। এমন একদিনে তার সম্পর্ক উহ্য বক্তব্যের সাথে অর্থাৎ يَقَعُ الْعَذَابُ بِهِمْ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এ পরিমাণ কাফেরদের নিকট অনুভূত হবে, যেহেতু তারা কঠোরতম শাস্তিতে লিপ্ত থাকবে। অবশ্য মু'মিনের নিকট তা দুনিয়ায় এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করার তুল্য সময় অনুমিত হবে। যেমন হাদীস শরীফে অনুরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

٥. فَاصْبِرْ هٰذَا قَبْلَ اَنْ يُّؤْمَرَ بِالْقِتَالِ صَبْرًا جَمِيْلًا اَىْ لَا فَزَعَ فِيْهِ .

৫. সুতরাং ধৈর্যধারণ করুন এটা যুদ্ধসংক্রান্ত আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার বিধান। পরম ধৈর্য যাতে কোনোরূপ অস্থিরতা থাকবে না।

٦. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ اَىِ الْعَذَابَ بَعِيْدًا غَيْرَ وَاقِعٍ .

৬. তারা এটাকে মনে করে অর্থাৎ শাস্তিকে সুদূর অবাস্তব।

٧. وَنَرَاهُ قَرِيْبًا وَاقِعًا لَا مُحَالَةَ .

৭. কিন্তু আমি তাকে অত্যাসন্ন দেখছি যা অবশ্যম্ভাবীরূপে বাস্তবায়িত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْقِرَاءَةُ فِيْ سَالَ سَائِلٌ : سَأَلَ শব্দের দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। জমহূরের নিকট سَأَلَ হামযা দিয়ে পঠিত হয়েছে। নাফে' এবং ইবনে আমের এ শব্দটিকে سَالَ হামযা ব্যতিরেকেই পড়েছেন। سَالَ হামযা ব্যতিরেকে পড়ার কারণ দু'টি হতে পারে– ১. سَالَ মূলে سَأَلَ ছিল। তাখফীফের কারণে আলিফ পরিবর্তিত হয়েছে। ২. এ শব্দটি سَيَلَانٌ শব্দ থেকে উৎপত্তি, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কেরাত এর প্রমাণ। তিনি পড়েছেন سَالَ سَيْلٌ।

قَوْلُهُ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ : বাক্যে سَأَلَ ফে'ল سَائِلٌ ফায়েল, بِعَذَابٍ وَاقِعٍ দ্বিতীয় মাফউল, প্রথম মাফউল উহ্য, অর্থাৎ اَللّٰهَ অথবা নবী করীম ﷺ।

قَوْلُهُ لِلْكٰفِرِيْنَ : জার মাজরূর মিলিত হয়ে মুতা'আল্লিক হয়েছে وَاقِعٌ-এর সাথে, উহ্য শিবহে ফে'ল ثَابِتٌ এর সাথেও মুতা'আল্লিক হতে পারে। তখন لِلْكَافِرِيْنَ শব্দ عَذَابٌ-এর দ্বিতীয় সিফাত হবে। প্রথম সিফাত হলো وَاقِعٌ।

قَوْلُهُ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ : বাক্য عَذَابٌ-এর দ্বিতীয় সিফাত। অথবা عَذَابٌ হতে হাল হয়েছে, অথবা জুমলায়ে মুস্তানাফা। مِنَ اللّٰهِ মুতা'আল্লিক হয়েছে وَاقِعٌ-এর সাথে। অর্থাৎ وَاقِعٌ فِيْ جِهَةِ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى অথবা মুতা'আল্লিক হয়েছে دَافِعٌ-এর সাথে। অর্থাৎ– لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ مِنْ جِهَةِ تَعَالٰى

قَوْلُهُ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ الخ : জুমলায়ে মুস্তানাফা, فِيْ يَوْمٍ মুতা'আল্লিক হয়েছে تَعْرُجُ-এর সাথে, অথবা وَاقِعٌ-এর সাথে অথবা سَأَلَ-এর সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : ইবনে আবূ হাতেম ও নাসায়ী হতে বর্ণিত, ইমাম ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন নযর ইবনে হারিছ ইবনে কালাদাহ কাফের কা'বা ঘরের দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ তাঁর কথায় ও কাজে সত্য হয়ে থাকলে আপনি আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন, অথবা আমাদের উপর কঠিন জ্বালাময়ী শাস্তি আপতিত করুন। তার এ কথার জবাবেই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নযর বদর যুদ্ধে নিহত হয়।

ইবনে মুনযির হতে বর্ণিত, হযরত হাসান (রা.) বলেন, যখন سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মুসলিম অমুসলিম সকলের মধ্যে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তারা জিজ্ঞাসা করল এ শাস্তি কাদের জন্য হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা لِلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব, খাযিন]

অথবা, নাসায়ী ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ শাস্তি প্রার্থনাকারী ছিল নযর ইবনে হারিছ ইবনে কালাদাহ কাফের। এ পাষণ্ড সূরা আল-হাক্কাহ্ শুনে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করল– যদি তা সত্যই হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য কাফেররাও বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, সে শাস্তি কেন আসে না? তাদের ধারণা মতে কিয়ামতের আগমন একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এ জন্য অস্বীকৃতির সুরে প্রশ্ন করত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র সূরা অবতীর্ণ করেন। –[হাক্কানী]

শাস্তি প্রার্থনাকারী : শাস্তি প্রার্থনাকারীর ব্যাপারে ছয়টি মত উল্লেখ হয়েছে।

১. শাস্তি প্রার্থনাকারী ছিল নযর ইবনে হারিছ। সে বলেছিল, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ তাঁর কথায় ও কাজে সত্য হয়ে থাকলে আপনি আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন, অথবা আমাদের উপর কঠিন জ্বালাময়ী শাস্তি আপতিত করুন।
২. আবূ জাহল; সে নবীকে অস্বীকার করেছিল এবং বিদ্রূপ করে শাস্তি প্রার্থনা করেছিল।
৩. প্রশ্নকারী ছিল হারিছ ইবনে নু'মান আল-ফাহরী।
৪. আজাব প্রার্থনারী ছিল মক্কার কাফেরদের একটি দল। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এসব কথা বলেছিল এবং নবী করীম ﷺ-কে আজাব নিয়ে আসার জন্য আবেদন করেছিল।
৫. আজাব প্রার্থনারী ছিলেন হযরত নূহ (আ.)।
৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের উপর আল্লাহর আজাব কামনা করেছিলেন।

এ মতগুলোর মধ্যে প্রথম মতটিই গ্রহণীয় বলে তাফসীরকারগণ মন্তব্য করেছেন। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى "سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ" : কোনো কোনো তাফসীরকার سَأَلَ -কে سُؤَالٌ বা জিজ্ঞাসা করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে এর অর্থ হলো, জিজ্ঞাসাকারী জিজ্ঞাসা করেছে যে, আমাদেরকে যে আজাবের সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা কার উপর বা কখন সংঘটিত হবে। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, سَأَلَ প্রার্থনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নাসায়ী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। বর্ণনাটি এই– নযর ইবনে হারিছ ইবনে কালাদাহ বলেছে, হে আল্লাহ! এটা যদি বাস্তবিকই তোমার পক্ষ হতে সত্য ও যথার্থ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আকাশ হতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করো অথবা আমাদের প্রতি কঠিন পীড়াদায়ক আজাব নাজিল করো। –[কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاقِعٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ : অর্থাৎ যে আজাব প্রার্থনা করেছিল তা অবশ্যই সংঘটিত হবে, দুনিয়াতে হোক। চাই আখেরাতে হোক। যদি দুনিয়াতে হয় তবে বদরের যুদ্ধে হয়েছে। আর যদি আখেরাতে হয়, তবে তা হবে عَذَابُ النَّارِ الْخِزْىُ আর তা কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত হবে। কারণ, তারা তা নিজেদের উপর ডেকে এনেছে। আর তা তাদের মূর্খতা ও বোকামির প্রতিফল মাত্র, আর তারা যে রাসূলের সাথে ঠাট্টা করেছিল সে কারণেই এ শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ : অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে কাফেরদের উপর যে আজাব আগমন করবে তা প্রতিহত করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। আর তিনি হলেন ذِى الْمَعَارِجِ সিঁড়িওয়ালা اَىْ مَصَاعِدُ السَّمَاءِ مَعَارِجُ - لِلْمَلٰئِكَةِ শব্দটি مِعْرَاجٌ -এর বহুবচন- عُرُوْجٌ শব্দ হতে উৎপত্তি ঘটেছে- مَعْرَجٌ وَمِعْرَاجٌ এমন সিঁড়িকে বলা হয় যাতে নিচ হতে উপরে চড়ার জন্য অনেকগুলো ধাপ থাকে।

অতএব, ذِى الْمَعَارِجِ বলে আল্লাহ তা'আলার এ صِفَتْ বুঝানো হয়েছে যে, তিনি دَرَجَاتٌ عَالِيَةٌ -এর অধিকারী (এরূপই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) মত ব্যক্ত করেছেন।) আর এ دَرَجَاتٌ عَالِيَةٌ দ্বারা সাত আসমান ও আসমানের স্তরসমূহকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, ذِى السَّمٰوَاتِ يَعْنِىْ مَالِكَ السَّمٰوَاتِ জালালাইন গ্রন্থকার বলেন, এরূপ – مَصَاعِدُ الْمَلٰئِكَةِ وَهِىَ السَّمٰوَاتُ

সাবী গ্রন্থকার বলেন– ذِى الْمَعَارِجِ অর্থ مَعَارِجُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْجَنَّةِ অর্থাৎ মু'মিনগণকে সিঁড়ির মাধ্যমে বেহেশতে চড়াবেন যিনি। আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে তাৎপর্য হবে, তিনি অতীব উচ্চ, উন্নত, মহান ও অসীম মর্যাদার অধিকারী সত্তা। তাঁর সমীপে হাজির হতে হলে ফেরেশতাগণকে ক্রমাগত উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণ করতে হয়। তবে নবী করীম ﷺ ব্যতীত অন্য কোনো মানুষকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

قَوْلُهُ تَعَالَى تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ : অর্থাৎ একের পর একটি সিঁড়ি যেভাবে স্থাপিত হয় আকাশমণ্ডলও তেমনিভাবে স্তরে স্তরে রয়েছে। ফেরেশতা ও রুহুল আমিন সেই আসমানগুলোতে চড়তে থাকবে।

رُوْحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য এবং رُوْحٌ -কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ : رُوْحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.)। হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আয়াতেও رُوْحُ الْاَمِيْنِ বলে সম্বোধন করেছেন। হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.) একজন বিশেষ স্বর্গীয় দূত এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা। তাঁর কিছু বিশেষত্ব থাকার কারণে তাঁর নাম رُوْحُ الْاَمِيْنِ বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত জিব্রাঈল (আ.) -এর বিশেষত্ব এই যে, তিনি ছিলেন একজন স্বর্গীয় দূত, অর্থাৎ ঐশী বাণীসমূহকে আল্লাহর পক্ষ হতে নবীগণের নিকট আদান প্রদান করতেন। সে বাণীর মধ্যে وَحْىٌ جَلِىٌّ এবং وَحْىٌ خَفِىٌّ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস শরীফ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অথবা, তাকে ঐ সকল ফেরেশতাগণের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যারা বিশেষ বিশেষ কাজে দায়িত্বশীল হয়েছে। –[মাদারিক]

শাস্তির দিনের পরিমাণ : উল্লিখিত ৪ নং আয়াতে ফেরেশতা ও হযরত জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহর নিকট পৌছতে যে পথ অতিক্রম করতে হয় তা মানুষের অতিক্রম করতে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় লাগে; কিন্তু ফেরেশতাগণ তা নিমিষের মধ্যে অতিক্রম করে থাকেন, তাই আয়াতের মর্ম। কতেক তাফসীরকারক লিখেন, উপরিউক্ত আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছর দ্বারা কিয়ামতের দিন কাফেরদের পক্ষে শাস্তির দিনগুলোকে পার্থিব দিনগুলোর পরিমাণ অনুযায়ী বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের পর হবে অনন্ত জীবন। তার কোনো শেষ নেই; কিন্তু মু'মিনদের পক্ষে এ সময়টি হবে খুবই ক্ষীণ। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি– মু'মিনগণ এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করতে যে সময় ব্যয় করেন, কিয়ামতের এক একটি দিন তাদের পক্ষে এর চেয়েও খুব হালকা হবে।

মোদ্দাকথা, এ আয়াতটি মুতাশাবিহ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক তত্ত্ব জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। শাস্তির সময় বা দিনের যে পরিমাণ বলা হয়েছে, তা মানুষকে বুঝানোর জন্য একটি রূপক কথা মাত্র। কেননা সূরা আল-হজের ৪৭ নং আয়াতে এবং সূরা আস-সাজদার ৫ নং আয়াতে পরিমাণ বলা হয়েছে, পার্থিব জগতের এক হাজার বৎসরের সমতুল্য। মোটকথা সৃষ্টির সূচনা ও আদি সম্পর্কে আমাদের যখন কোনো জ্ঞান নেই এবং আল্লাহর পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা কিছুই যখন জানি না, তখন এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়। যারা আল্লাহর পরিকল্পনাকে শেষ করে তার পরিণতি কাল তাদের সম্মুখে উপস্থিত করার দাবি করে এবং তা না করলে পরিণতির ব্যাপারটা উদ্ভট হওয়ার প্রমাণ পেশ করে; তারা নিজেদের নির্বোধ হওয়ারই পরিচয় দেয়। -[খাযেন]

'এক হাজার বছর' এবং 'পঞ্চাশ হাজার বছর'-এর সামঞ্জস্য বিধান : সূরা আস্-সাজদায় কিয়ামতের দিনের পরিমাণ এক হাজার বছর বলা হয়েছে এবং সূরা মা'আরিজে তা পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হয়েছে। এ দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পঞ্চাশটি অধ্যায় বা مَوْطِنٌ হবে। প্রত্যেকটি অধ্যায় এক হাজার বছরের পরিমাণ হবে। সূরা আস্-সাজদায় একটি অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে এবং সূরা মা'আরিজে পঞ্চাশটি অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে। আর এত অধিক সময়ও একজন মু'মিনের নিকট এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়ার চেয়েও কম বলে মনে হবে। মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে একটি বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করছেন যে, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! সেদিনটি একজন মু'মিনের নিকট এত কম সময় বলে মনে হবে যে, এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়তে যে সময় লাগে তার চেয়েও কম বলে মনে হবে। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا : এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সান্ত্বনা প্রদানকারী বাণী স্বরূপ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন আবূ জাহল এবং নযর ইবনে হারিছ আর কুরাইশগণ দলবদ্ধভাবে আল্লাহর নিকট আজাব প্রার্থনা করল এবং তারা সত্য ও মুহাম্মদ ﷺ এবং তার বাণী মিথ্যা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে এবং তারা আল্লাহর আজাবকে খুবই দূরে বুঝে রয়েছে এহেন অশ্লীল ভাষা রাসূলের সম্মুখে বর্ণনা করেছে। তাতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর অন্তর ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক কথা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধৈর্যধারণের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং তাদের হঠকারিতা হতে দুঃখিত না হওয়ার জন্য সান্ত্বনা দান করেছেন।

صَبْر جَمِيْل-এর অর্থ : এর তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেছেন اَلصَّبْرُ الَّذِيْ لَا جَزَعَ فِيْهِ অর্থাৎ এমন ধৈর্য যাতে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় না। ধীর ও স্থিরতা রক্ষা করে বিপদকে নীরবে সহ্য করা। সহ্যহীন অবস্থাকেও সহ্য করে নেওয়া। বিপদে ভেঙ্গে না পড়া, বিপদের মুহূর্তেও নিজের কার্যে অবিচল থাকা।

صَبْر-কে جَمِيْل-এর সাথে সংযুক্ত করার কারণ : এর কারণ হচ্ছে- আয়াতের মধ্যে সম্বোধিত হলেন হুযূর ﷺ। তাঁর প্রত্যেক কার্যেই حُسْن وَجَمَالٌ থাকা একান্ত আবশ্যক। তা না হলে شَانِ نُبُوَّتٌ-এর বিপরীত কাজ হবে। যেমন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে- فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ এভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের সকল কার্যেই حُسْن وَجَمَالٌ দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে। তাই বলা হয়েছে- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَنَرَاهُ قَرِيْبًا : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কিয়ামত এবং কিয়ামতের আজাবকে বহু দূরে মনে করে অর্থাৎ তা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে, তবে তাকে যত দূরেই মনে করুক না কেন তা ততদূরে নয়, বরং এটা তাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আর আমি তো কিয়ামতকে অতি নিকটে দেখতে পাচ্ছি। এখানে بَعِيْد দ্বারা بُعْد اِمْكَانِىْ এবং قَرِيْب-কে قُرْب اِمْكَانِىْ-কে বুঝানো হয়েছে। সময় অথবা দূরত্বের অনুসারে بَعِيْد ও قَرِيْب বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ যতই তা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে তা ততই অবশ্যম্ভাবী। -[মা'আরিফ, মাদারিক]

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ এখনও প্রকাশ পায়নি, তথাপিও কিভাবে আল্লাহ বলেছেন যে, আমি তাকে খুবই নিকটে দেখতে পাই।

এর উত্তরে বলা হবে যদিও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করেনি, তবে আংশিকভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ হলো- ইলম লোপ পাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, জেনা ও শরাব পান বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং এগুলো তো বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে হুযূর ﷺ বলেন, مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়। প্রত্যেক মানুষই কালক্রমে মৃত্যুবরণ করবে বা করছে তাই ব্যক্তিদের লক্ষ্যেই 'কিয়ামত নিকট' এ কথা যথার্থ হয়েছে।

আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, 'কাফেররা কিয়ামতের আজাবকে দূরে দেখে' এর তাৎপর্য হলো তারা কিয়ামত অসম্ভব মনে করে. তারা মনে করে এমন ঘটনা তখনো ঘটবে না। তাদের ধারণা আসমান-জমিন চন্দ্র-সূর্য সব ঠিকই থাকবে। -[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

٨. يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ يَقَعُ كَالْمُهْلِ كَذَائِبِ الْفِضَّةِ ـ

৮. সেদিন আকাশ হবে তার সম্পর্ক উহ্য ক্রিয়া অর্থাৎ يقع -এর সাথে। গলিত ধাতুর মতো বিগলিত রৌপ্যের ন্যায়।

٩. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ كَالصُّوْفِ فِى الْخِفَّةِ وَالطَّيَرَانِ بِالرِّيْحِ ـ

৯. আর পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের ন্যায় পাতলা ও হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার বিবেচনায়।

١٠. وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا قَرِيْبٌ قَرِيْبَهُ لِاشْتِغَالِ كُلٍّ بِحَالِهِ ـ

১০. এবং সুহৃদ সুহৃদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে না আত্মীয় আত্মীয়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে না। সকলেই নিজের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত থাকার কারণে।

١١. يُبَصَّرُوْنَهُمْ ط يُبْصِرُ الْاَحِمَّاءُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَتَعَارَفُوْنَ وَلَا يَتَكَلَّمُوْنَ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ يَتَمَنَّى الْكَافِرُ لَوْ بِمَعْنَى اَنْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا بِبَنِيْهِ ـ

১১. তাদেরকে পরস্পরে দৃষ্টি গোচর করানো হবে সুহৃদগণ পরস্পর একে অপরকে দেখতে পাবে, চিনতে পারবে; কিন্তু কথাবার্তা বলবে না, বাক্যটি মুসতানাফা বাক্য। অপরাধী কামনা করবে কাফেরগণ আশা পোষণ করবে পণ দিতে لَوْ অব্যয়টি اَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে শাস্তি হতে সেদিন يَوْمَئِذٍ শব্দটি مِيْم বর্ণে যের ও যবর যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তার সন্তানসন্ততি দ্বারা।

١٢. وَصَاحِبَتِهِ زَوْجَتِهِ وَاَخِيْهِ ـ

১২. আর তার সঙ্গিনী দ্বারা স্ত্রী এবং তার ভাইয়ের দ্বারা।

١٣. وَفَصِيْلَتِهِ عَشِيْرَتِهِ لِفَصْلِهِ مِنْهَا الَّتِىْ تُئْوِيْهِ تَضُمُّهُ ـ

১৩. এবং তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির দ্বারা তার বংশধরদের, বংশধরদেরকে فَصِيْلَةٌ এ জন্য বলা হয়, যেহেতু সন্তানসন্ততি, পিতামাতার বিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ তারা তাকে আশ্রয় দিত তার জিম্মাদার হতো।

١٤. وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ذٰلِكَ الْاِفْتِدَاءُ عَطْفٌ عَلٰى يَفْتَدِىْ ـ

১৪. এবং পৃথিবীর সকলের দ্বারা। অতঃপর তা তাকে মুক্তি দান করে সে মুক্তিপণ, এটা পূর্বোক্ত يَفْتَدِىْ -এর উপর আতফ।

١٥. كَلَّا ط رَدْعٌ لِمَا يَوَدُّهُ اِنَّهَا اَىِ النَّارُ لَظٰى اِسْمٌ لِجَهَنَّمَ لِاَنَّهَا تَتَلَظّٰى اَىْ تَتَلَهَّبُ عَلَى الْكُفَّارِ ـ

১৫. না, কখনো নয় তার কামনার প্রতি শাসানো উদ্দেশ্য। তা তো অগ্নি লেলিহান অগ্নি জাহান্নামের নাম। কেননা তা কাফেরদের প্রতি লেলিহান হবে।

١٦. نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى جَمْعُ شَوَاةٍ وَهِىَ جِلْدَةُ الرَّأْسِ ـ

১৬. যা মস্তক হতে চামড়া খসিয়ে দিবে شَوٰى শব্দটি شَوَاةٌ -এর বহুবচন, আর তা হলো মস্তকের চামড়া।

١٧. تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى عَنِ الْاِيْمَانِ بِاَنْ تَقُوْلَ اِلَىَّ اِلَىَّ ـ

১৭. জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ঈমান হতে। এরূপ বলতে থাকবে যে, আমার মধ্যে আস, আমার মধ্যে আস।

١٨. وَجَمَعَ الْمَالَ فَاَوْعٰى اَمْسَكَهُ فِىْ وِعَائِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهُ ـ

১৮. আর সে পুঞ্জীভূত করেছিল সম্পদ এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল তার ভাণ্ডের মধ্যে হেফাজত করেছিল এবং তা হতে আল্লাহর হক আদায় করেনি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَوْمَ : এ শব্দটি পূর্বোল্লেখিত قَرِيْبًا হতে মাফউল, অথবা এটা পূর্ববর্তী فِىْ يَوْمٍ হতে বদলও হতে পারে। يُبَصَّرُوْنَهُمْ বাক্যটি মুসতা'নাফাহ অথবা حَمِيْمًا -এর সিফাত।

كَلَّا হরফে রদা', اِنَّهَا -এর যমীর هَا نَارٌ -এর দিকে ধাবিত, অথবা এটা যমীরে মুবহাম, যার তাফসীর করা হয়েছে। لَظٰى খবর, অথবা বদল, অথবা কিসসা, نَزَّاعَةً এটা اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর, অথবা উহ্য মুবতাদার খবর, অথবা لَظٰى যমীরে মানসূব হতে বদল হয়েছে। اِنَّ খবরে نَزَّاعَةً, আবার কেউ نَزَّاعَةً হাল হিসাবে নসব দিয়েও পড়েছেন।

قَوْلُهُ كَالْعِهْنِ : এটা مُشَبَّهٌ بِهٖ আর اَلْجِبَالُ টি مُشَبَّهٌ

قَوْلُهُ كَالْمُهْلِ : এটাও مُشَبَّهٌ بِهٖ এবং اَلسَّمَاءُ টি مُشَبَّهٌ

قَوْلُهُ يُبَصَّرُوْنَهُمْ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَقِلٌ হবে এবং جُمْلَةٌ تَعْلِيْلِيَّةٌ হতে পারে।

قَوْلُهُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ الخ : এটা বাক্য হয়ে পূর্ববর্তী يَوَدُّ الْمُجْرِمُ হতে مَفْعُوْلٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ يُنْجِيْهِ : এটা لَوْ يَفْتَدِىْ -এর উপর عَطْفٌ হয়েছে।

يَسْأَلُ শব্দে কেরাতসমূহ এবং বিভিন্ন কেরাতের অর্থসমূহ : يَسْأَلُ শব্দে দু'টি কেরাত। জমহুর এটাকে فَتْحَ দিয়ে يَسْأَلُ পড়েছেন। এর অর্থ কোনো বন্ধু বা আপনজন নিজ আপনজনের কথা জিজ্ঞাসা করবে না। ইবনে কাছীর তাকে ضَمَّة দিয়ে يُسْأَلُ মাজহুলের সীগাহ পড়েছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, কোনো আপনজনকে কোনো আপনজনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তার বন্ধুর বা আপনজনের অবস্থা জানার জন্য। যেমন কোনো লোকের খবর তাদের আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব থেকে নেওয়া হয়ে থাকে যে, সে কোথায় কেমন আছে ইত্যাদি। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ" : مُهْلٌ -এর আভিধানিক অর্থ– গলিত খনিজ পদার্থ, যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি। তৈলের গাদ, কফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত আয়াতে বিগলিত ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত হাসান (রা.) বিগলিত রৌপ্যের-ন্যায় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

يَوْمَ শব্দটি মানসূব হওয়ার চারটি কারণ হতে পারে– ১. মানসূব হয়েছে قَرِيْبًا -এর দ্বারা অর্থাৎ يَوْمَ শব্দটি قَرِيْبًا -এর মাফউল হয়েছে। ২. يَوْمَ শব্দটি পূর্বে উল্লিখিত وَاقِعٌ -এর مَفْعُوْلٌ অথবা ظَرْفٌ হয়েছে। ৩. يَوْمَ শব্দটি একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাক্যটি ছিল এভাবে يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ كَانَ كَذَا وَكَذَا. ৪. يَوْمَ শব্দটি পূর্বের يَوْمٍ হতে بَدْلٌ হয়েছে। –[কাবীর]

পাহাড়কে পশমের সাথে তুলনা করার কারণ : পাহাড়কে পশমের সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে– পাহাড়সমূহ লাল, কালো, সাদা অর্থাৎ রংবেরঙের আকার হয়ে থাকে, আর পশম বা উলও তদ্রূপ বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। বিভিন্ন রঙের উল যখন উড়িয়ে দিলে রংবেরঙের আকার ধারণ করবে, পাহাড়সমূহও সেদিন পশমের মতো উড়তে থাকবে। রঙের সাদৃশ্যে উভয়ই সমান রূপের দেখা যাবে। এ কারণে পাহাড়সমূহকে রুইয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। –[কাবীর]

মাদারিক গ্রন্থকার এর তাফসীর ও وَجْهُ تَشْبِيْهٍ এই বর্ণনা করেছেন যে, كَالْعِهْنِ يَعْنِىْ كَالصُّوْفِ الْمَصْبُوْغِ اَلْوَانًا لِاَنَّ الْجِبَالَ جُدَدٌ بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ فَاِذَا بُسَّتْ وَطُيِّرَتْ فِى الْجَوِّ اِشْتَبَهَتِ الْعِهْنَ الْمَنْفُوْشَ . هٰكَذَا قَالَ فِىْ سُوْرَةِ الْقَارِعَةِ . وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ . আর প্রত্যেকেই কার কি অবস্থা ঘটছে তা দেখতে পাবে এবং চোখের উপর ভাসতে থাকবে, তবে কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না, কেবল প্রত্যেকেই يَا نَفْسِىْ يَا نَفْسِىْ করতে থাকবে। কেউ কারো ভালোমন্দের কথা চিন্তাও করবে না।

আর কেউ কারো সহানুভূতিও করবে না। কারো কি হচ্ছে তা দেখেও জানতে চাইবে না। নিজের চরম সংকট নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

সূরা আস-সাফ্‌ফাতের আয়াতে বলা হয়েছে একে অপরকে মুখামুখি প্রশ্ন করবে, আর অত্র সূরার আয়াতে বলা হয়েছে যে কোনো বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না, তাই প্রকাশ্য আয়াতসমূহের দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কিভাবে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যাবে।

তার উত্তরে মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, সূরা আসা-সাফ্‌ফাতের আয়াতে যে পরস্পর প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পরস্পর বিবাদ স্বরূপ এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদ স্বরূপ প্রশ্নবাণ করার কথা বলা হয়েছে। কোনো কিছু জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করার কথা নয়। এ সুরতে যে প্রশ্ন করবে না বলা হয়েছে এতে জানার অথবা সহানুভূতি করার লক্ষ্যে বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মধ্যে পরস্পর অর্থের দ্বন্দ্ব থাকল না; বরং উভয়ের উদ্দেশ্য সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

مُجْرِمْ-এর অর্থ এবং আয়াতে তার মর্মার্থ : مُجْرِمْ শব্দটি جُرْم শব্দ হতে নির্গত। তার অর্থ হলো– অপরাধী, পাপী, অন্যায়কারী। আয়াতে مُجْرِمْ বলতে কাফির বা যে কোনো পাপী বুঝানো হয়েছে, যে কিয়ামতের দিন অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং জাহান্নামের উপযোগী হবে সে কাফের। যার জন্য জাহান্নাম অবধারিত সে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তার যা কিছু আছে দুনিয়ার সব কিছু দিয়ে হলেও যদি জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়া যেত তাহলেও ভালো ছিল। সে যেকোনো মূল্যে হোক আজাব হতে বাঁচতে চাইবে; কিন্তু হায়! কিভাবে সে পরিত্রাণ পাবে। –[কাবীর, যিলাল]

জাহান্নামের ডাক : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, তারা যদি পৃথিবীর যাবতীয় ধন-সম্পদ ও মুক্তিপণরূপে দিতে চায়, তবুও তাতে কোনো কাজ হবে না। তাদের শাস্তির জন্য হবে জাহান্নামের অগ্নিশিখা। এ শাস্তির দু'টি কারণ আল্লাহ তা'আলা এখানে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো ঈমান না আনা। 'اَدْبَرَ' শব্দ দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছেন। আর দ্বিতীয়টি হলো দুনিয়াদার হওয়া। وَتَوَلّٰى দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। মানুষ দুনিয়াদার ও বৈষয়িকতাবাদ গ্রহণ করলে স্বভাবতই কৃপণ হয়, সম্পদ পুঞ্জীভূত করে। তাই আল্লাহ বলেছেন, তারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখত; তার জাকাত আদায় করত না। অতঃপর তাদের শাস্তি হলো জাহান্নাম। জাহান্নাম তাদেরকে এভাবে ডাকবে, হে মুশরিক! হে মুনাফিক! এদিকে আসো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জাহান্নাম কাফের ও মুশরিকগণের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকবে। জবাব না পেয়ে প্রকাণ্ড একটি চিৎকার দিবে। অতঃপর পাখি দানা গলাধঃকরণের ন্যায় তাদেরকে জাহান্নাম গলাধঃকরণ করবে। –[খাযেন, ইবনে কাছীর]

জাহান্নামের ডাকার পদ্ধতি : জাহান্নামের ডাকার পদ্ধতির ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। **এক.** জাহান্নাম কাফেরদেরকে লেসানে হাল তথা অবস্থার ভাষা দ্বারা ডাকবে। **দুই.** আল্লাহ তা'আলা সেদিন জাহান্নামের মাঝে বাক ক্ষমতা সৃষ্টি করবেন এবং সে ডাকবে, 'হে কাফের, হে মুনাফিক' এবং তাদেরকে পাখি যেমন দানা গিলে খায় সেরূপ গিলে খাবে। **তিন.** জাহান্নামের রক্ষীরা সেদিন কাফেরদেরকে ডাকবে। এখানে مُضَافٌ –কে লুপ্ত করে জাহান্নামের সাথে ডাকাকে যুক্ত করা হয়েছে। **চার.** ডাকা-এর অর্থ হলো ধ্বংস করা অর্থাৎ যারা ঈমান থেকে বিমুখ এবং ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবে তাদেরকে জাহান্নাম ধ্বংস করবে। আরবি ভাষায় دَعَا শব্দটি هَلَكَ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– আরবদের কথা دَعَاكَ اللّٰهُ অর্থাৎ اَهْلَكَكَ –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى : এ শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যথা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, বেরোখ হয়ে যাবে। লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে অন্যের হক নষ্ট করে সম্পদ যোগাড় করবে। সম্পদ অর্জন করে অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করে রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের হক বিনষ্ট করবে।

অথবা, আকীদা ও চরিত্র ধ্বংস করার অর্থের প্রতি اَدْبَرَ وَ تَوَلّٰى দ্বারা ইশারা করা হয়েছে। মূলকথা হলো এমন গুণাবলি সে নাফরমানগণের মধ্যে পাওয়া যাবে যার কারণে তারা দোজখে প্রবেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

আর جُمَعَ فَاَوْعٰى বলে কাফেরদের مُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ হওয়া বুঝানো হয়নি এবং مُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ হওয়াও আবশ্যক হয় না। কারণ কাফেরদের ঈমান বহাল নেই। সুতরাং তাদের উপর কেবল কুফরির আজাব পতিত হবে এবং গুনাহগার ঈমানদারদের উপর গুনাহের শাস্তি পতিত করা হবে। [আল্লাহই ভালো জানেন।]

অনুবাদ :

١٩. إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ وَتَفْسِيْرُهُ.

১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে হতোদ্যম রূপে حَالٌ مُقَدَّرَةٌ যার ব্যাখ্যা হলো [পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে]।

٢٠. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَقْتَ مَسِّ الشَّرِّ

২০. যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করতে থাকে বিপদ স্পর্শ করার সময়।

٢١. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا وَقْتَ مَسِّ الْخَيْرِ أَيِ الْمَالِ لِحَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهُ

২১. আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে হয় অত্যন্ত কৃপণ কল্যাণ স্পর্শ করার সময়, অর্থাৎ সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর তা হতে আল্লাহর হক আদায়ে কার্পণ্য করে।

٢٢. إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ أَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

২২. তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত অর্থাৎ মু'মিনগণ

٢٣. الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ مُوَاظِبُوْنَ.

২৩. যারা তাদের সালাত আদায়ে সর্বদা নিষ্ঠাবান সদা পালনকারী।

٢٤. وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ هُوَ الزَّكٰوةُ.

২৪. আর যাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক তা হলো যাকাত

٢٥. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ الْمُتَعَفِّفِ عَنِ السُّؤَالِ فَيُحْرَمُ.

২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতগণের জন্য যে প্রার্থী না হওয়ার কারণে বঞ্চিত থাকে।

٢٦. وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ.

২৬. আর যারা সত্যারোপ করে কর্মফল দিবসের প্রতি কর্মফল লাভের দিন অর্থাৎ কিয়ামত।

٢٧. وَالَّذِيْنَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ خَائِفُوْنَ.

২৭. আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভয় [পোষণকারী] ভীতসন্ত্রস্ত।

٢٨. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ نُزُوْلُهُ.

২৮. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। তা অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هَلُوْعًا : হালে মুকাদ্দারা خُلِقَ হতে। অনুরূপভাবে جَزُوْعًا ও مَنُوْعًا উভয়ই হাল। প্রথম إِذَا টি جَزُوْعًا-এর যরফ, আর দ্বিতীয় إِذَا টি مَنُوْعًا-এর যরফ। إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ মুসতাছনা, الْإِنْسَانَ মুসতাছনা মিনহু।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ : বাক্যে أُولٰئِكَ মুবতাদা, فِيْ جَنّٰتٍ খবর, এটা مُكْرَمُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হতে পারে। مُكْرَمُوْنَ দ্বিতীয় খবর أُولٰئِكَ-এর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে দোজখের আলোচনা করা হয়েছে। অত্র আয়াতসমূহে ঈমানদারদের কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا : هَلُوْعًا শব্দের অর্থ হলো– সংকীর্ণমনা, ছোট অন্তর, অতিশয় কৃপণ, অস্থির প্রকৃতির, অত্যধিক লোভী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে هَلُوْعًا শব্দটির ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াত দু'টিতে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ هَلُوْعًا-এর অর্থ হলো বিপদ-আপদে হা-হুতাশ করা, অধৈর্য হওয়া এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণতা করা, ধন-সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা। উল্লিখিত আয়াতে الْإِنْسَانُ বলতে কি বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমত إِنْسَانٌ দ্বারা এখানে কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এসব কু-স্বভাব হতে মু'মিনদেরকে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত إِنْسَانٌ দ্বারা সাধারণভাবে সকল মানুষকেই বুঝানো হয়েছে; কিন্তু মু'মিনদেরকে পরে বাদ দেওয়া হয়েছে।
–[রূহুল মা'আনী, খাযেন]

মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব এবং আয়াতে মুসল্লিদেরকে ব্যতিক্রম করার কারণ : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ, লোভ-লালসা, কৃপণতা, অস্থিরতা ও ক্রোধ ইত্যাদি গুণাবলি ও স্বভাবগত দুর্বলতার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদের এ স্বভাবসমূহ ব্যবহারিক প্রভেদে ভালো ও মন্দ পরিচয় লাভ করে থাকে। যেমন অপচয় না করলে তখন বলা হয় মিতব্যয়িতা। কিন্তু সম্পদ ব্যয় হওয়ার আশঙ্কায় আল্লাহর হুকুমের বিপরীত যাকাত ও দান-সাদকা হতে বিরত থাকলে তখন এ স্বভাবটিকে বলা হয় কৃপণতা। বস্তুত মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতাকে নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্য রক্ষা করে তারাই চলতে পারে, যারা ঈমানদার ও আল্লাহভীরু হয়। এ স্বভাবসমূহকে নির্মূল করা অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সঠিক পাত্রে ব্যবহার করাই হলো মূলকথা। ঈমানদার ও আল্লাহভীরু লোকগণ এরূপ পারে বলেই তাদেরকে উপরিউক্ত আয়াতসমূহে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। ঈমানদার না হলে এ স্বভাবগুলো মানুষের মধ্যে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিকপাত্রে ব্যবহারের ক্ষমতাই তাদের থাকে না। নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সঠিক পাত্রে ব্যবহারের শক্তিটি মানুষের মধ্যে ঈমানই জন্ম দেয়। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى جَزُوْعًا وَمَنُوْعًا : এ স্থানে جَزُوْعًا বলতে অস্থির, অধৈর্য, উৎকণ্ঠিত, দুঃখিত ও ঘাবড়ানো ইত্যাদি। এখানে جَزُوْعًا বলে ঐ সকল লোকদেরকে উদ্দেশ্য হয়েছে, যারা শরিয়তে ইসলামের নীতিমালার বাহিরে কার্যকলাপ করতে সংকোচ করেন না।

আর مَنُوْعًا বা কৃপণ বলতে ঐ সকল লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সচরাচর فَرَائِضْ وَ وَاجِبَاتْ আদায় করতে সংকোচ করে। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَعَالٰى اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ .... الخ : উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকৃতির মানুষকে مُسْتَثْنٰى করেছেন।

. প্রথম পর্যায়ে সেই সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর হকসমূহ আদায় করে থাকে, অর্থাৎ فَرَائِضْ خَمْسَةْ -কে রীতিমতো আদায় করে থাকে। আর আল্লাহর জন্য সকল ইবাদত অনবরতভাবে আদায় করে।

مُصَلِّيْنَ দ্বারা اِسْتِثْنَاءْ করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদারদের ঈমানের প্রথম ও প্রধান চিহ্ন। ঈমানদার বলার যোগ্য তারাই যারা নামাজ সমাপন করে। আর صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ বলে সে সকল নামাজিদেরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যারা নামাজের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকায় না।

ইমাম বাগাবী (র.) স্বীয় সনদে "আব্দুল খায়ের" হতে রেওয়ায়েত করে বলেন, আমরা হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন- مُدَاوِمٌ عَلَى الصَّلٰوةِ 'নামাজের উপর অনবরত প্রতিষ্ঠিত' সে ব্যক্তি নয় যে সর্বদা নামাজ পড়ে; বরং সে বক্তিই নামাজের উপর مُدَاوِمْ যে নামাজের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নামাজের প্রতি খেয়াল রাখে, এদিক-সেদিক লক্ষ্য না করে। যেমন এ অর্থে সূরা মু'মিনূন-এ বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ .... مُحَافَظَةْ عَلَى الصَّلٰوةِ .

.. দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাগণের হকসমূহ আদায় করে থাকে। তাদের সম্পদে এতিম-মিসকিনদের যে অংশ রয়েছে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রার্থী ও অপ্রার্থীদেরকে দিয়ে থাকেন। এদের মধ্যে তারাও শামিল থাকবে যারা ওয়াদা ভঙ্গ হতে বিরত থাকে, আমানতের খেয়ানত করে না, সত্য সাক্ষীদান করে, এতে কারো পক্ষপাতিত্ব করবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ : আয়াতে উল্লিখিত حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ বা নির্ধারিত হক বলতে কি বুঝায়, সে সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো তা দ্বারা ইসলাম নির্ধারিত জাকাতের অংশ বুঝানো হয়েছে। কেননা সাধারণ দান-খয়রতের কোনো নির্ধারিত পরিমাণ নেই। এ মতটিই হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান এবং ইবনে সিরীন (র.)-এর। দ্বিতীয় মতটি হলো, তা দ্বারা জাকাত নয়; বরং নফল দান-খয়রাত বুঝায়। কেননা এ আয়াতটি মাক্কী সূরার, আর জাকাত ফরজ হয়েছে মদীনাতে। প্রথম মতের অনুসারীরা বলেন যে, তা দ্বারা জাকাত বুঝায় কেননা প্রাথমিকভাবে মক্কায় জাকাতের কথা বলা হয়েছে এবং মদীনায় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তা ছাড়া حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ কথাটি নামাজের সাথে উল্লেখ করায় জাকাত বলেই বুঝা যায় এবং এটা সেসব লোকদের গুণাবলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যারা مَذْمُوْمٌ নন। আর জাকাত আদায় না করলে সে ব্যক্তি مَذْمُوْمٌ হবে। এ কারণে তা দ্বারা জাকাত বলাটাই যুক্তিযুক্ত। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

سَائِلْ এবং مَحْرُوْمٌ **শব্দদ্বয়ের অর্থ :** سَائِلٌ অর্থ- প্রার্থী, প্রার্থনাকারী, ভিক্ষুক এবং مَحْرُوْمٌ অর্থ বঞ্চিত, অধিকার থেকে বঞ্চিত। এখানে سَائِلْ বা প্রার্থী বলতে পেশাদার ভিক্ষুক বুঝানো হয়নি, সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী লোক বুঝিয়েছে। আর مَحْرُوْمٌ বা বঞ্চিত বলতে বেকার, রুজি-রোজগারহীন বা উপার্জনের চেষ্টা করেও প্রয়োজন পরিমাণ আর্জনে অক্ষম থাকা লোক, অথবা দুর্ঘটনার কবলে নিপতিত বা আকস্মিক বিপদগ্রস্ত হওয়ার দরুন অভাবী হয়ে পড়া লোক, কিংবা উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তি বুঝিয়েছে। এ ধরনের লোক সম্পর্কে যখন নিশ্চিতরূপে জানা যাবে যে, সে বাস্তবিকই বঞ্চিত, অভাবগ্রস্ত, তখন মু'মিন ব্যক্তি তার প্রার্থনা করার অপেক্ষা না করেই নিজেই অগ্রসর হয়ে আগে-ভাগেই তার সাহায্য করবে, এটাই স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ..... مُشْفِقُوْنَ : উক্ত আয়াতে সে সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর মহাশক্তির কথা বিশ্বাস করে কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে এবং তার শাস্তি হতে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে বিশ্বাস বা আকীদা সত্য এবং আমলসমূহও নেক, তারাই পরিপূর্ণ আকল সম্পন্ন লোক। আল্লাহর সাথে যেমন তাদের সম্পর্ক গভীর তেমনি তাঁর বান্দাদের সঙ্গেও অদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ ..... غَيْرُ مَأْمُوْنٍ : আর তারা এমন লোক যারা কোনো বিপদে ভীত হয়ে যায়। আর আরাম পেয়েও খুব উত্তেজিত হয়ে যায় না। তারা সকল ভালো-মন্দ দুঃখ সব কিছুই নিরর্থক মনে করে। প্রভুর পক্ষ হতে আগত আজাবকে খুবই কঠিন মনে করে থাকে। আর তাদের প্রভুর আজাব হতে রক্ষা পাওয়া খুবই মুশকিল।

অনুবাদ :

২৯. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ .

২৯. এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে ।

৩০. اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ مِنَ الْاِمَاءِ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ .

৩০. হ্যাঁ, তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত ক্রীতদাসীগণ । নিশ্চয় তারা এ জন্য নিন্দিত হবে না।

৩১. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ الْمُتَجَاوِزُوْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ .

৩১. অনন্তর যারা এতদ্ভিন্ন অন্য কাউকেও কামনা করে, তবে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী । হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামের প্রতি সীমালঙ্ঘনকারী ।

৩২. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْاِفْرَادِ مَا اُئْتُمِنُوْا عَلَيْهِ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَعَهْدِهِمْ الْمَاخُوْذِ عَلَيْهِمْ فِيْ ذٰلِكَ رَاعُوْنَ حَافِظُوْنَ .

৩২. আর যারা তাদের আমানতসমূহের অপর এক কেরাতে শব্দটি একবচন রূপে পঠিত হয়েছে। তার প্রতি দীন বা দুনিয়া সংক্রান্ত যে সকল বিষয় আমানত রাখা হয়েছে এবং তাঁদের অঙ্গীকার যা এ ব্যাপারে তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে। রক্ষাকারী হেফাজতকারী ।

৩৩. وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْجَمْعِ قَائِمُوْنَ يُقِيْمُوْنَهَا وَلَا يَكْتُمُوْنَهَا .

৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অপর এক কেরাতে শব্দটি বহুবচন রূপে পঠিত হয়েছে। অটল তার উপর অবিচল থাকে এবং তা গোপন করে না।

৩৪. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ بِاَدَائِهَا فِيْ اَوْقَاتِهَا .

৩৪. এবং যারা তাদের সালাত সম্পর্কে হেফাজতকারী তাকে সময় মতো আদায় করার ব্যাপারে।

৩৫. اُولٰئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ .

৩৫. তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।

৩৬. فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ نَحْوَكَ مُهْطِعِيْنَ حَالٌ اَيْ مُدِيْمِي النَّظَرِ .

৩৬. কাফেরদের কি হয়েছে যে, আপনার প্রতি আপনার দিকে ছুটে আসছে তা حَالٌ রূপে ব্যবহৃত অর্থাৎ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

৩৭. عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ مِنْكَ عِزِيْنَ حَالٌ اَيْضًا اَيْ جَمَاعَاتٍ حَلَقًا حَلَقًا يَقُوْلُوْنَ اِسْتِهْزَاءً بِالْمُؤْمِنِيْنَ لَئِنْ دَخَلَ هٰؤُلَاءِ الْجَنَّةَ لَنَدْخُلَنَّهَا قَبْلَهُمْ قَالَ تَعَالٰى .

৩৭. ডান দিক ও বা দিক হতে আপনার দলে দলে এটাও حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তারা দলে দলে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলে, যদি এরা জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে আমরাও তাতে প্রবেশ করবো । আল্লাহ তা'আলা তদুত্তরে বলেন।

৩৮. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ .

৩৮. তাদের প্রত্যেকেই কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে?

৩৯. كَلَّا ط رَدْعٌ لَهُمْ عَنْ طَمْعِهِمْ فِى الْجَنَّةِ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِمَّا يَعْلَمُوْنَ مِنْ نُطْفٍ فَلَا يُطْمَعُ بِذٰلِكَ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّمَا يُطْمَعُ فِيْهَا بِالتَّقْوٰى ـ

৩৯. না, কখনো নয় এটা তাদের জান্নাত লাভের প্রত্যাশার ব্যাপারে শাসানো উদ্দেশ্য। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি অন্যদের ন্যায় এমন বস্তু হতে যা তারা জ্ঞাত আছে বীর্য হতে, আর তার কল্যাণে জান্নাতের প্রত্যাশা করা যায় না, হ্যাঁ, কেবল তাকওয়ার মাধ্যমেই তা প্রত্যাশা করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَمَنِ ابْتَغٰى الخ : বাক্যটি شَرْط এবং فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ জুমলা হয়ে جَزَاءٌ হয়েছে। অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْه এবং পরবর্তী বাক্যগুলো مَعْطُوْف হয়েছে এবং এ বাক্যগুলোও شَرْط এবং اُولٰۤئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ বাক্যটি جَزَاءٌ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَمٰنٰتِهِمْ : আয়াতে দু'টি কেরাত রয়েছে। অধিকাংশ কারীদের মতে, এটা بِصِيْغَةِ جَمْع হয়ে থাকে। অর্থাৎ اَلِفْ-এর পরে نُوْن - اَمٰنٰتِهِمْ -কে اَلِفْ সহকারে পড়া হবে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) بِصِيْغَةِ وَاحِدْ অর্থাৎ اَمٰنَتِهِمْ - اَمٰنٰتِهِمْ ব্যতীত পড়েছেন।

عَنِ الْيَمِيْنِ এবং عَنِ الشِّمَالِ মুতা'আল্লিক হয়েছে عِزِيْنَ অথবা مُهْطِعِيْنَ-এর সাথে। عِزِيْنَ হাল।

قَوْلُهُ اَنْ يُّدْخَلَ الخ : বাক্যটি يَطْمَعُ-এর মাফউল হয়েছে। اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ জওয়াবে কসম। وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ কসমের দ্বিতীয় জবাব অথবা قَادِرٌ হতে হাল।

قَوْلُهُ يَوْمَ يَخْرُجُ : -এর মধ্যস্থ يَوْمَ শব্দটি পূর্ববর্তী يَوْمَ হতে বদল হয়েছে। سِرَاعًا শব্দটি يَخْرُجُوْنَ-এর ফায়েল হতে حَالٌ। আনুরূপভাবে كَاَنَّهُمْ نُصُبٌ - حَالٌ হয়েছে يَخْرُجُوْنَ-এর ফায়েল হতে। خَاشِعَةً - حَالٌ হয়েছে يُوْفِضُوْنَ-এর যমীরে ফায়েল হতে। اَبْصَارُهُمْ মারফূ' হয়েছে خَاشِعَةً-এর ফায়েল হিসাবে। تَرْهَقُهُمْ الخ জুমলায়ে মুস্তানাফা বা حَالٌ হয়েছে يُوْفِضُوْنَ-এর ফায়েল হতে, অথবা يَخْرُجُوْنَ-এর ফায়েল হতে। ذٰلِكَ মুবতাদা اَلْيَوْمَ الخ খবর। অথবা সম্পূর্ণ বাক্যটি মুবতাদা, খবর উহ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حِفَاظَتْ فَرْج-এর তাৎপর্য : প্রত্যেক বনী আদমকে আল্লাহ তা'আলা পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ অবশ্যই দান করেছেন, এটাই হলো তার যৌনাঙ্গ। আর এ যৌনাঙ্গের হেফাজতের একমাত্র ব্যবস্থাপনা হলো বৈবাহিক জীবন বা বিবাহ বন্ধন এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলন কার্য। এতে যৌনক্ষুধা মিটে যায় এবং জেনার কার্যে ধাবিত হওয়া হতে বিরত থাকা যায়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلنِّكَاحُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ বিবাহ চক্ষুকে নিচু করে দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতেরও বিশেষ বিহিত ব্যবস্থা।

সুতরাং যারা বিয়ে বন্ধন ব্যতীত যৌন স্পৃহা মিটাবে তারা যেন فُرُوْج-এর حِفَاظَتْ-কে করল না, তারাই فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ الخ আয়াতের ধমকির সম্মুখীন হবে। উক্ত আয়াত হতে হযরত ফুকাহায়ে কেরাম এ মাসআলা নির্গত করেন যে, নিকাহে মুত'আ, সমকামিতা, চতুষ্পদজন্তুর সাথে সঙ্গম, হস্ত মৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে যৌন কামনা নিবারণ করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ এ সবগুলোই শরয়ী বিধান মতে সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এ সবগুলোই حُدُوْدُ اللّٰهِ-কে লঙ্ঘন করার অন্তর্ভুক্ত।

-[মাদারিক, মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ : আর যারা তাদের আমানতগুলো সঠিকভাবে রক্ষা করে। চাই দুনিয়ার আমানত হোক অথবা আখেরাতের আমানত হোক।

আমানতের তাৎপর্য হলো তা আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়। আমানত দুই শ্রেণির হতে পারে–

১. دُنْيَوِيٌّ যদি হয় তবে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের حُقُوْق বিষয়ক হতে পারে। যেমন কারো রক্ষিত সম্পদ টাকা পয়সা ইত্যাদি কারো নিকট আমানত রাখলে তার সময়মতো সে বস্তুটিই ফিরিয়ে দেওয়া হলো আমানত।

২. আর যদি اُخْرَوِيٌّ হয় তবে ইসলামের বিধিবিধান অথবা নিয়মনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করতে হবে, তবে তো আমানত রক্ষা করা হবে।

হযরত জুনায়েদ (র.) বলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর রক্ষণাবেক্ষণই হলো আমানত। আল্লাহর একত্ববাদের উপর আত্মার অঙ্গীকার বহাল রাখা আর সযত্নে ও সংশোধনের সাথে কোনো বস্তুর উপর স্থিরতা অবলম্বন করার নাম رِعَايَتْ -আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমানতকে খেয়ানত করা, কথা বলতে মিথ্যা কথা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ঝগড়ায় ফিসক ও ফুজূরী করা ইত্যাদি মুনাফিকের চিহ্ন। –[রূহুল মা'আনী]

আমানত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ যার আমানত নেই, তার ঈমান নেই, যার অঙ্গীকার সঠিক থাকে না তার ধর্ম ঠিক থাকে না। সুতরাং আয়াতের লক্ষ্যে হাদীসের মাধ্যমে আমানত রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট তাকিদ ও হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে عَهْد অর্থ– وَالْاِيْمَانُ - وَالنُّذُوْرُ - وَعُهُوْدُ خَلْقٍ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা কারো কারো মতে, عَهْدٌ مَا اَتٰى بِهِ الرَّسُوْلُ ﷺ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করেছেন, তা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিপালন করার বলা হয়েছে। –[মাদারিক]

নামাজ সর্বদা কায়েম করা ও সংরক্ষণ করার তাৎপর্য : জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণ লাভ ও জান্নাত লাভের প্রথম পূর্বশর্ত মানুষের নামাজি হওয়া। এখানে কথা শুরু করা হয়েছে [২২নং আয়াতে] 'নামাজ কায়েম করুন' দ্বারা এবং কথা শেষ করা হয়েছে 'নামাজ রীতিমতো সংরক্ষণ' দ্বারা। এতে নামাজের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তাই প্রকাশ পায়। আর ঈমানের পরই নামাজ আদায়করণ মু'মিনের প্রাথমিক কর্তব্য এখানে তাই বুঝায়। নামাজ সংরক্ষণ দ্বারা দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা, স্থানের পবিত্রতা, দেহ আবৃতকরণ এবং আরকানসমূহ যথারীতি আদায় করা, নামাজে ডানে বামে নজর না করা একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে থাকা, দুনিয়ার শত কাজ ও ঝামেলা ফেলে আজান পড়ার সাথে সাথে জামাতে শরিক হওয়া, আরামকে হারাম করে শীত ও বর্ষায় জামাতে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি কার্যাবলিসহ নামাজ আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। সেরূপ নামাজ নয় যেমন মোরগ দানা ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে আহার করে। এরূপ নামাজ দ্বারা ব্যক্তির জীবনে যেমন কোনো পরিবর্তন আসে না, তেমনি সমাজ জীবনেও কোনো প্রভাব রাখে না। উপরিউক্ত ৩৪ নং আয়াতে নামাজ সংরক্ষণের তাৎপর্য এটাই। –[কাবীর]

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ আয়াতে شَهَادَةٌ **শব্দটিকে বহুবচনে উল্লেখের কারণ :** উপরিউক্ত আয়াতে شَهَادَةٌ শব্দ বহুবচনে উল্লেখ করার পিছনে কারণ হলো, শাহাদত বা সাক্ষ্যদান অনেক প্রকার হতে পারে, সেদিকে ইঙ্গিত করা এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্যদান করা যে অপরিহার্য কর্তব্য, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এতে ঈমান, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যও শামিল রয়েছে। রমজানের চাঁদ দেখা, শরিয়তের হুদূদ ও মানুষের মাঝে বিভিন্ন সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত। এসব সাক্ষ্য প্রকাশ করা যেমন কর্তব্য তেমনি তা গোপন করা হারাম। এসব সাক্ষ্য সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এটা যে মু'মিন জীবনের একটি মহান ও মহৎ গুণাবলির অন্তর্গত তা এ আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায়। –[মা'আরিফুল কোরআন, কাবীর]

সাক্ষ্যদান বা شَهَادَةٌ যদিও আমানতের মাঝে শামিল রয়েছে তবুও তাকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার ফলে شَهَادَةٌ -এর বিশেষ গুরুত্ব এবং ফজিলত প্রকাশ পায়। কেননা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। হকদার তার প্রাপ্য হক ফিরিয়ে পায়। সমাজ থেকে অন্যায় ও জুলুম দূর হয়। –[কাবীর]

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কার কাফির লোকগণ গ্রুপ গ্রুপ হয়ে নবী করীম ﷺ-এর চতুর্দিকে এসে বসত, আর দীন ইসলাম সম্পর্কে নানা কটূক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করত। গরিব মুসলমান ও নবী করীম ﷺ-এর প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলত, এসব ছোট লোকগণ বুঝি অথৈ নিয়ামতের ভাণ্ডার জান্নাতের আশায় পাগলপারা। তারা যদি জান্নাতী হয়, তবে আমরা তাদের অনেক আগেই জান্নাতী হবো। আল্লাহ তা'আলা এসব কাফিরদের উক্তির জবাবে উপরিউক্ত আয়াত (الاية) فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অবতীর্ণ করেন। –[খাযেন, মা'আলিম, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... الخ : কাফেরদের হাসিঠাট্টা সম্পর্কে উক্ত আয়াতে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাফেরগণ কুরআনের পবিত্র বর্ণনা শুনে আপনার ডানে বামে ভীত ও আতঙ্কিত চিত্তে বাঁকা ঘাড়ে ছুটে আসছে কেন? আর ভিড় জমাচ্ছে কেন? তারা যেমনিভাবে মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করেছে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে তা কিভাবে হতে পারে। আবার তারা কেমন করে বেহেশতের আশাও করে থাকে। তবে তা তাদের জন্য মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্ন মাত্র। এ দুঃস্বপ্ন কখনো বাস্তবে রূপায়িত হবে না। আর আমি তাদেরকে কি নিকৃষ্ট বস্তু হতে সৃষ্টি করেছি তা তো তাদের অজানা নয়।

কাফেরগণ রাসূলের দরবারে দৌড়ে আসার কারণ : তার কারণ হলো তাদের চরম ও পরম শত্রু হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। অতএব তারা তাদের চিরশত্রু হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও দীন ইসলাম, আর মুসলমানগণকে চিরতরে দুনিয়া হতে উৎখাত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর নিকটে দৌড়ে আসত। যে কোনোভাবেই তাঁকে লজ্জিত ও অপদস্থ করে অথবা যে কোনোভাবেই তাঁকে নিধন করার মানসে তাঁর কাছে আসত।

قَوْلُهُ تَعَالَى كَلَّا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ الخ : كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ বাক্যটি যদি তৎপূর্ববর্তী আয়াতের اَيَطْمَعُ الخ সারমর্ম মনে করা হয়, তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে, اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ প্রত্যেক ব্যক্তি এ বেহেশতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে যদি এই হয় যে, বস্তুগত মূল যে উপাদান হতে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তা-ই বেহেশতে যাবে। তবে সকল মানুষ মাত্রই বেহেশতে যাওয়া আবশ্যক হবে। তাতে আলিম, ফাজিল, জাহিল, জালিম, মু'মিন, মুশরিক কেউই বাদ পড়বে না। তবে সাধারণ উপাদানভিত্তিক মানুষ বেহেশতে যাবে না; বরং তাদের গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই মানুষ বেহেশতে যাবে।

নতুবা كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ বাক্যটি তৎপরবর্তী বাক্যগুলো فَلَآ اُقْسِمُ الخ -এর ভূমিকাও হতে পারে। তখন كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ الخ আয়াতের তাৎপর্য হবে, এ লোকেরা নিজেদেরকে আমার আজাব হতে সুরক্ষিত বলে মনে করে, যে লোক তাদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে, 'তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-উপহাস করে। অথচ আমার ইচ্ছামতো যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়ার আজাবে নিক্ষেপ করতে পারি। আবার যখন ইচ্ছা পুনরুজ্জীবিত করতে পারবো। এ লোকেরা ভালোভাবেই জানে যে, এক ফোঁটা শুক্রকীট হতে তাদের সৃষ্টির সূচনা করে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়েছি। যদি তারা চিন্তা-বিবেচনা করত, তবে তারা কস্মিনকালেও নিজেদেরকে আমার কর্তৃত্বের আওতা হতে মুক্ত মনে করার মতো চরম একটা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে পারত না।

মানব সৃষ্টির তাৎপর্য এবং জান্নাতে প্রবেশের মাপকাঠি : উল্লিখিত كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো, তারা কখনো জান্নাতী হবে না। আমি তাদেরকে কি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি তা তারা অবগত।' এ আয়াতটির মর্ম কয়েকটি হতে পারে। প্রথমত তাকে যদি পূর্ব আয়াতের বক্তব্যের সাথে সংযুক্ত ভাবা হয়, তবে মর্ম হবে– আমি সমস্ত মানুষকে একই জাগতিক উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এ দিক থেকে তারা এক ও অভিন্ন; কিন্তু জান্নাত লাভ হওয়া না হওয়ার মাপকাঠি এ জাগতিক উপাদান নয়; বরং জান্নাত লাভের জন্য একটি গুণগত মাপকাঠি রয়েছে। আর তা হলো ঈমান ও নেক আমল। সুতরাং তোমরা যতই ভাবনা কেন যে, আমরা একই বস্তুর উপাদানে সৃষ্টি এবং তারা জান্নাতী হলে আমরা তাদের পূর্বেই জান্নাতী হবো, তা তোমাদের অহমিকা ও বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতী হতে পারবে না। দ্বিতীয় মর্ম হলো, আমি তোমাদেরকে কি কারণে সৃষ্টি করেছি তা তোমরা অবগত। অর্থাৎ আমার আদেশ-নিষেধ পুরস্কার ও শাস্তি কার্যকর করার জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অতএব যারা আমার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী চলবে তারাই জান্নাতী হবে এবং যারা চলবে না তারা হবে জাহান্নামী। তৃতীয় মর্ম হলো, আমি তোমাদেরকে কিরূপ সৃষ্টি করেছি তা তোমরা অবশ্যই জ্ঞাত। তোমাদেরকে পশুর ন্যায় সৃষ্টি করিনি। তোমাদেরকে জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক ইত্যাদি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তোমরা কিরূপে জান্নাতী হতে পার তা তোমরাই চিন্তা করে দেখ। –[খাযিন]

অনুবাদ :

٤٠. فَلَا لَا زَائِدَةٌ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّا لَقَادِرُوْنَ.

৪০. অনন্তর এখানে لَا অতিরিক্ত আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির সূর্য, চন্দ্র ও সকল নক্ষত্রপুঞ্জ এতে শামিল। নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।

٤١. عَلَىٰ أَنْ نُّبَدِّلَ نَأْتِيَ بَدَلَهُمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ بِعَاجِزِيْنَ عَنْ ذٰلِكَ.

৪১. যে, আমি স্থলবর্তী করবো তাদের পরিবর্তে সৃষ্টি করবো, তাদের অপেক্ষা উত্তম সৃষ্টি এবং আমি তাতে অপরাগ নই তা করতে অক্ষম নই।

٤٢. فَذَرْهُمْ أُتْرُكْهُمْ يَخُوْضُوْا فِيْ بَاطِلِهِمْ وَيَلْعَبُوْا فِيْ دُنْيَاهُمْ حَتّٰى يُلَاقُوْا يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ فِيْهِ الْعَذَابَ.

৪২. অতএব তাদেরকে থাকতে দিন ত্যাগ করুন বাক-বিতণ্ডায় তাদের বাতিল বিশ্বাসে এবং ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত তাদের পার্থিব অবস্থায় যাবৎ তারা সম্মুখীন হয় মিলিত হয় সে দিবসের, যা সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। তাতে সংঘটিত শাস্তির বিষয়ে।

٤٣. يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الْقُبُوْرِ سِرَاعًا إِلَى الْمَحْشَرِ كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَرْفَيْنِ شَيْءٍ مَنْصُوْبٍ كَعَلَمٍ أَوْ رَايَةٍ يُّوْفِضُوْنَ يُسْرِعُوْنَ.

৪৩. সেদিন তারা কবর হতে বের হবে সমাধি হতে দ্রুত বেগে হাশর মাঠের প্রতি যেন তারা কোনো লক্ষ্য বস্তুর প্রতি অপর এক কেরাতে শব্দটি উভয় অক্ষরে পেশ যোগে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সে বস্তু যা গেড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পতাকা ও ঝাণ্ডা ইত্যাদি ধাবিত হয়েছে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে।

٤٤. خَاشِعَةً ذَلِيْلَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ تَغْشَاهُمْ ذِلَّةٌ ط ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ذٰلِكَ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَاهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

৪৪. অবনমিত ক্ষেত্রে দীন-হীনভাবে তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে ঢেকে রাখবে হীনতা, এটাই সেদিন, যার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছিল। ذٰلِكَ মুবতাদা ও তৎপরবর্তী বাক্যাংশ তার খবর। আর এর অর্থ হলো কিয়ামত দিবস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ .... بِمَسْبُوْقِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা مَشَارِقُ وَمَغَارِبُ-এর শপথ করে বলেছেন যে, তিনি তার পৃথিবীর নাফরমানদেরকে চির নস্যাৎ করে তদস্থলে উত্তম ও ভিন্ন জাতিকে বসিয়ে দিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাশীল, তাতে তিনি কারো নিকট ঠেকবেন না। অর্থাৎ কোনো শক্তিই তাকে কিছুই করার নেই।

مَشَارِقُ وَمَغَارِبُ শব্দদ্বয়কে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ : এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে–

১. প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যহ সূর্য একই স্থান দিয়ে উদয় ও অস্ত যায় না; বরং প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিয়ে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। তদ্রূপভাবে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উদয়স্থল ও অস্তস্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা مَشَارِقُ وَمَغَارِبُ -কে বহুবচনের শব্দ দ্বারা ব্যবহার করেছেন।

২. অথবা, এটাও বলা যায় যে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য নিজগতিতে চলমান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذٰلِكَ الخ -সুতরাং সূর্য যেহেতু প্রতিদিন উদয় ও অস্ত হয়েছে, তাই রাত্রিকালে তা (সূর্য) আমাদের বিপরীত দিকে অবস্থান করে। তাতে পৃথিবীর এক অংশে যখন রাত তখন অপর অংশে দিন থাকে। এ হিসাবে সূর্যের উদয় ও অস্তস্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা مَشَارِقُ ও مَغَارِبُ -কে বহুবচন ব্যবহার করেছেন।

অত্র আয়াতে مَشَارِقُ وَمَغَارِبُ শব্দদ্বয় বহুবচনে এসেছে এবং অন্য আয়াতে مَشْرِقَيْنِ وَمَغْرِبَيْنِ শব্দদ্বয় দ্বিবচনে এসেছে অপর এক আয়াতে رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ শব্দদ্বয় একবচনে এসেছে। সুতরাং এদের মধ্যে সামঞ্জস্য কিভাবে হবে? : এর উত্তরে বলা যায় যে, যে আয়াতে مَشَارِقُ ও مَغَارِبُ -কে বহুবচনে নেওয়া হয়েছে, সেখানে বছরের বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনে উদয়াচল ও অস্তাচলের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর যে স্থানে مَشْرِقَيْنِ -কে দ্বিবচনে নেওয়া হয়েছে সে আয়াতে مَشْرِقُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ এবং مَغْرِبُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ -এর লক্ষ্যে وَمَغْرِبَيْنِ -দ্বিবচন নেওয়া হয়েছে। আর যে আয়াতে مَشْرِقٌ وَمَغْرِبٌ -কে একবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে সাধারণভাবে উদয় ও অস্তের দিক হিসাবে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের অনুসারে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

(هٰذَا هُوَ التَّوْفِيْقُ مَا بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِالْحَقَائِقِ)

نُبَدِّلَ خَيْرًا বলে আল্লাহ তা'আলা কোন দিকের উত্তমতা বুঝিয়েছেন? : সাবী গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাতে বলতে চান যে, পরিবর্তিত জাতির অবস্থা পরিবর্তন করে দিবো সৃষ্টিগত দিক হতে। অতএব, তারা শারীরিক মানসিক ও অন্যান্য গুণাবলিতে অতি উন্নততর হবে। অর্থাৎ তারা খুবই ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট হবে, ধন-দৌলতেও খুব ভরপুর হবে। দৈহিক শক্তিতেও শক্তিশালী, বড় শরীর বিশিষ্ট হবে, প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে খুবই প্রসারতা লাভ করবে এবং তারা আপনার বাক্য ও দাওয়াতের কথা শ্রবণে আপনাকে ইজ্জতদানে এবং আমার ও আপনার সন্তুষ্টিমূলক কার্যে খুব বেশি অগ্রসর হতে থাকবে।

অতঃপর তাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত সাহাবায়ে কেরামগণকে সৃষ্টি করেছেন। তদ্রূপ তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণকেও সৃষ্টি করেছেন। আর তাদেরকে جَبَّارِيْنَ আর قَهَّارِيْنَ দের ধনমাল ও রাজত্ব প্রদান করেছেন এবং পৃথিবীতে তারা যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করতে থাকেন। –[সাবী] সর্বশেষ ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব তাদেরই হস্তে থাকবে।

কারো কারো মতে, সে জাতির মধ্যেই تَبْدِيْل حَقِيْقِيْ হয়েছে। আর কারো কারো মতে, তাদের পরবর্তী জাতিগণের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আর তারাও কুফরি ও নাফরমানির মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا الخ : সুতরাং হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! এখন আপনি তাদের সাথে অধিক পরিমাণে কিছু বলবেন না, আর তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর থাকতে দিন। তাদেরকে তাদের দুনিয়াদারীর কার্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হতে দিন। শেষ পর্যন্ত যেন কিয়ামতের দিন আগমন করে। অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কবরসমূহ হতে জীবিত হয়ে তাড়াতাড়ি বের হতে থাকবে। যেভাবে তারা দুনিয়াতে খুবই উত্তেজনার সাথে মন্দিরের দিকে গিয়েছিল। তখন লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকবে এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তারা কম্পিত হতে থাকবে। এটাই সেদিন যেদিন সম্পর্কে অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছিল এবং ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল।

خَوْضٌ এবং لَعِبٌ -এর অর্থ : خَوْضٌ শব্দের অর্থ– বানাওয়াট করা, কথা বানিয়ে বলা। আর لَعِبٌ অর্থ– খেলা করা, এখানে لَعِبٌ শব্দটি তামাশাচ্ছল বা হাসিঠাট্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং خَوْضٌ وَلَعِبٌ অর্থ হবে, তারা নিজ নিজ খেয়াল-খুশিমতে নিজেদের জীবন যাপন করতে দেওয়া। শরিয়তের বিধিবিধান অথবা নবীর নির্দেশের কোনো তোয়াক্কা না করা। বাতিল পন্থায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে জীবন ধ্বংস করা।

আল্লাহ হেদায়েতদানকারী তথাপিও আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন, তাদেরকে তামাশাচ্ছলে চলতে দিন? : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককেই হেদায়েত দান করবেন এবং হেদায়েতের জন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং কুরআন মাজীদেও বলা হয়েছে, তা মুত্তাকীনদের হেদায়েতের জন্য। অর্থাৎ যারা হেদায়েত কবুল করে তাদের জন্য হেদায়েতের বাণী। আর বান্দাগণকে ইহকাল ও পরকালের ভালোমন্দ বিবেচনা করে ভালো পথে চলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ইচ্ছা করলে মন্দপথেও চলতে পারবে, তবে মন্দ পথে চলাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। তবে বান্দাকে যেহেতু চলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে যে পথে চলতে চাইবে আল্লাহ সে পথেই চালাবেন। আবার মন্দ পথে চলার ক্ষতিগ্রস্ততা সম্বন্ধেও জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব, ইচ্ছাধীন চলার জন্য সুযোগ দেওয়ার কথা বলে মূলত তাদেরকে ধমক দিয়েছেন। অসৎ পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে তাদেরকে বলা হবে- وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার জীবনে যে দোজখকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছ, সে মিথ্যার প্রতিফলে আজ দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

আর উক্ত আয়াতে ذَرْ শব্দটির দ্বারা যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ প্রকার أَمْرٌ -কে- تَوْهِيْن বা تَهْدِيْد -এর জন্য ব্যবহার করা যাবে।

اَلنُّصُبُ দ্বারা উদ্দেশ্য : نُصُبٌ শব্দের উদ্দেশ্য হলো কোনো উড্ডয়মান পতাকা যা অনুসরণ করে ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে থাকে, এরূপ অবস্থা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর আবূ আমর বলেন- هِيَ شَبَكَةُ الصَّائِدِ অর্থাৎ نُصُبٌ হলো শিকারির খোঁচা মারা বা আঘাত করা।

نُصُبٌ শব্দের মর্মার্থ এবং তাতে পঠিত কেরাতসমূহ : نُصُبٌ -এর অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ মূর্তি। সুতরাং তাঁদের মতে এ বাক্যটির মর্ম হলো, হাশরের দিন কবর হতে উত্থিত হয়ে তারা নির্দিষ্ট একটি স্থানের দিকে এমনভাবে দৌড়াবে যেমন বর্তমানে তারা দেবদেবীর বেদীমূলের দিকে দৌড়ে থাকে। কতেক তাফসীরকার বলেছেন, তার অর্থ হলো- দৌড়ের প্রতিযোগীদের জন্য নির্ধারিত সে নিশানাটি যে পর্যন্ত সর্বাগ্রে পৌঁছার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগীগণ প্রাণপণ চেষ্টা চালায়।

نُصُبٌ শব্দটি তিনটি কেরাতে পড়া হয়েছে। এক. "ن" এবং "ص" অক্ষরদ্বয়ে পেশ দ্বারা তখন অর্থ হবে প্রতিমা বা দেবদেবীগণ যার পূজা করা হতো। দুই. "ن" অক্ষরে পেশ এবং "ص" -এ জযম দ্বারা ضُعْفٌ -এর ওজনে। তিন. "ن"-এ যবর এবং "ص"-এ জযম দ্বারা তখন অর্থ হবে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

سُوْرَةُ نُوْحٍ : সূরা নূহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম হলো 'নূহ'। অত্র সূরার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে বিধায় এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ২৮টি আয়াত, ২২৪টি বাক্য এবং ৯২৯টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতারিত প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত। অত্র সূরা অবতীর্ণের সঠিক সময়কালটি কখন তা বলা যায় না; কিন্তু বিষয়বস্তু হতে অনুমান হয় যে, মক্কায় কাফেরদের ইসলাম ও মহানবীর প্রতি বিরোধিতা যখন তীব্র আকার ধারণ করেছিল, তখনই প্রাচীন ইতিহাস হতে তাদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

বিষয়বস্তু ও সারমর্ম : এ সূরাতে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু তা সাধারণ কাহিনী রূপে নয়। মক্কার কুরাইশ কাফেরদরকে সতর্ককরণে যেটুকু বিষয়বস্তু আলোচনার প্রয়োজন ছিল, ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হয়েছে। এ কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সময় তখনকার জনগণ ও সমাজপতিগণ যে আচার-আচরণ ও ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তোমরাও ঠিক অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছ। অতএব তাদের যে পরিণতি ঘটেছে, তোমাদেরও অনুরূপ নির্মম পরিণতির সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয়। প্রথম থেকে ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আজাব আপতিত না হওয়া পর্যন্ত দীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশ মাফিক স্বীয় পরিচয় তুলে ধরে তাদের কাছে আল্লাহর দাসত্ব, নবীর আনুগত্য এবং আল্লাহ ভীরুতা অবলম্বন, এ তিন দফা দাওয়াত পেশ করলেন। আর তিনি বললেন, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট একটি সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন; কিন্তু তাঁর নির্ধারিত সময়কালটির আগমন হলে তোমাদেরকে আর কোনো অবকাশ দেওয়া হবে না। হযরত নূহ (আ.) দিবারাত্রি গোপনে প্রকাশ্যে কৌশল অবলম্বন করে স্বীয় সম্প্রদায়কে দীনের পথে আনার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাদের বোধোদয় হলো না। তারা হযরত নূহ (আ.) -এর কথা শুনলেই কানে আঙুল দিত এবং মুখমণ্ডল ঢেকে সরে পড়ত। তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে লাগল। সমাজপতিগণ অহংকার ও দাম্ভিকতাসহ এ আন্দোলন ও দাওয়াতের বিরোধিতায় অবিচল রইল। হযরত নূহ (আ.) বললেন, তোমরা এ তিন দফা দাওয়াত মনে-প্রাণে গ্রহণ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি মহাক্ষমাশীল এবং তোমাদের জন্য আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেশকে সুজলা-সুফলা করে তুলবেন। তোমাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

১৫ থেকে ২০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বলোক সৃষ্টি, মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি, আকাশকে সপ্তস্তরে বিন্যস্তকরণ, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির উপকারিতা, উদ্ভিদের ন্যায় মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে ক্রমোন্নতি দান, সে মাটিতেই বিলীন হওয়া এবং ঐ মাটি হতেই পুনরায় উত্থিত হওয়া। পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করে মানুষের চলাচলের উপযোগী করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত, মহত্ত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং একচ্ছত্র আধিপত্যকে হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে তৎকালীন লোকদের কাছে তুলে ধরেছেন।

২১ থেকে ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত নূহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের ব্যাপারে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থায় উপনীত হয়ে বললেন– 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জনগণ আমার অবাধ্য। তারা সমাজপতি ও গোত্রীয় সরদারদের কথা মেনে চলছে। অথচ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তাদের ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতাই ডেকে আনছে। সমাজ পতিগণ আমার ও দীনি আন্দোলনের বিরোধিতায় সোচ্চারকণ্ঠ এবং কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা জনগণকে উদ্দা, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রতিমার পূজা পরিত্যাগ না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করে আসছে। তারা বহু মানুষকে এ পথে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা শিরক-এর অপরাধে তাদেরকে মহা প্লাবনের পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন। এটাই ছিল তাদের পার্থিব শাস্তি। আর পরকালে তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে।

২৬ থেকে ২৮ নং পর্যন্ত আয়াতে হযরত নূহ (আ.) চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের বেঈমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য যে বদদোয়া করেছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.) প্রার্থনা করলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের বেঈমানগণকে গজবে নিপতিত করে সমূলে ধ্বংস করুন। একটিকেও অব্যহতি দিবেন না। কোনোটিকে অব্যহতি দিলে তারা আপনার ঈমানদার বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করবে এবং দুষ্কৃতকারী ও কাফের-বেঈমান জন্ম দিয়ে দুনিয়াকে শিরকী ও পাপাচারে ভরে ফেলবে। আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে ও আমার সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে, আর সকল যুগের মুসলিম নর-নারীগণকে আপনার করুণায় ক্ষমা করে দিন, আপনি মহাক্ষমাশীল ও করুণাময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ أَنْ أَنْذِرْ أَيْ بِإِنْذَارِ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا عَذَابٌ أَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

১. নিশ্চয় আমি নূহকে প্রেরণ করলাম, তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি যে, তুমি ভয় প্রদর্শন করো অর্থাৎ ভয় প্রদর্শন করার নির্দেশসহ তোমার সম্প্রদায়কে তাদের নিকট আগমনের পূর্বে যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে পীড়াদায়ক শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে পীড়াদানকারী।

٢. قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْإِنْذَارِ .

২. সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

٣. أَنِ أَيْ بِأَنْ أَقُوْلَ لَكُمْ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ .

৩. যে, অর্থাৎ এ বিষয়ে যে, আমি তোমাদেরকে বলছি আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমাকে অনুসরণ করো।

٤. يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُغْفَرُ بِهٖ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَبْعِيْضِيَّةٌ لِإِخْرَاجِ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَيُؤَخِّرْكُمْ بِلَا عَذَابٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى ط أَجَلِ الْمَوْتِ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ بِعَذَابِكُمْ إِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ، لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ لَاٰمَنْتُمْ .

৪. তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন এখানে مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারণ ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা তৎপূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। অথবা, مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْضِيَّةٌ 'কতিপয়' অর্থব্যঞ্জক, যাতে তা হতে বান্দার হকের পৃথকীকরণ হয়, যেহেতু তা ক্ষমা হয় না। আর তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দান করবেন শাস্তি দান ব্যতিরেকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত মৃত্যুকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময় তোমাদের শাস্তিদানে, যদি তোমরা ঈমান আনয়ন না কর। যখন আসবে তখন বিলম্ব করা হবে না। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে। তা, তবে তোমরা ঈমান আনয়ন করতে।

٥. قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا دَائِمًا مُتَّصِلًا .

৫. সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক? আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি ডাকছি সর্বদা ক্রমাগত।

٦. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىٓ اِلَّا فِرَارًا عَنِ الْاِيْمَانِ.

৬. কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন-প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে ঈমান আনয়ন হতে।

٧. وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ لِئَلَّا يَسْمَعُوْا كَلَامِىْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ غَطَّوْا رُؤُوْسَهُمْ بِهَا لِئَلَّا يَنْظُرُوْنِىْ وَاَصَرُّوْا عَلٰى كُفْرِهِمْ وَاسْتَكْبَرُوْا تَكَبَّرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ اِسْتِكْبَارًا.

৭. আর যখনই তাদেরকে আহ্বান করি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তখনই তারা কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করে যাতে তারা আমার বক্তব্য না শুনে। আর তারা নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে তা দ্বারা নিজেদের মস্তক আবৃত করে রাখে, যেন তারা আমাকে না দেখে। আর তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করে তাদের কুফরি আচরণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ঈমান আনয়ন প্রশ্নে জঘন্য রূপে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরা আল-মা'আরিজে এসেছে যে, اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ অর্থাৎ 'অবশ্যই আমি তোমাদের স্থলে উত্তম জাতি আনয়নে সক্ষম।'

এরপরই সূরা নূহে হযরত নূহ (আ.) -এর জাতির কথা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে তাদেরকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা হয়েছে। পৃথবীতে তাদের কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট থাকেনি। এভাবে পূর্ববর্তী সূরার ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে। −[নূরুল কোরআন]

সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা : হযরত নূহ (আ.) হলেন হযরত ইদরীস (আ.)-এর বংশধর নবী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল গাফফার। তবে তিনি স্বীয় নেক আমলের স্বল্পতা এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সর্বদা কান্নাকাটি করতে থাকতেন, তাই তার নাম হয়ে গেল نُوْحٌ। তাঁর যুগের মানুষের মধ্যে কুফরি ও শিরক সীমাহীনভাবে বেড়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তখন হযরত নূহ (আ.)-কে পয়গাম্বর বানিয়ে মানুষদের হেদায়েতের জন্য পাঠালেন। প্রথমে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে আনতে শুরু করলেন। এভাবে বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ চলে যেতে লাগল, কিন্তু মানুষ কিছুতেই তাঁর কথার প্রতি লক্ষ্য করছিল না; বরং তাদের কুফরির পর্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। সারা জীবনে তিনি মাত্র ৮০ জন মানুষকে হিদায়েত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদা তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে এবং তাদের অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে, তারা হেদায়েত কবুল করবে না। আর তাদের বংশধরগণও ঈমান গ্রহণ করবে না। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে বৃক্ষ রোপণের নির্দেশ মেতাবেক বৃক্ষ রোপণ করলেন। ৪০ বছর পর সে বৃক্ষের দ্বারা তাঁকে নৌকা বানানোর নির্দেশ প্রদান করা হলো। ৬০০ গজ লম্বা এবং ৩০০ গজ চওড়া নৌকা বানানো হলো এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সকল প্রকার জীব জন্তুর এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেওয়ার নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, যাতে نَسْل বিনষ্ট না হয়। যখন নৌকা তৈরি করছিলেন, তখনো কাফেরগণ তার সম্মুখে এসে নৌকা বানাতে দেখে বলত হে নূহ! তুমি কি নবুয়ত হারিয়ে মিস্ত্রি হয়ে গেছ? কি পয়গাম্বরীর কাজ সমাপ্ত করেছ? আবার কখনো বলত, বড় মিয়া, নৌকা তো তৈরি করছ তবে পানি কোথা হতে আনয়ন করবেন? যা হোক হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর হুকুমে ঈমানদারদেরকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের এক এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে গেলেন। তাদের নাফরমানির কারণে অনবরত ৪০ দিন পর্যন্ত তুফান ও তুফান বৃষ্টি বর্ষণ হলো এবং সকল নদী-নালা ভরে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত ৪০ গজ পানির নিচে তলিয়ে গেল। فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ হযরত নূহ (আ.) নৌকায় সওয়ার হওয়ার পূর্বে তাঁর ছেলে কেনানকে নৌকায় আরোহণ করতে আহ্বান করলেন। তার ছেলে তখন উত্তর দিল−আমি পাহাড়ের আশ্রয়ে থাকবো, যাতে পানির প্লাবন হতে রক্ষা পেয়ে যাবো। শেষ পর্যন্ত সেও ডুবে মরল। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ الخ -এর

প্রেক্ষিতে উত্তর দিলেন اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ - এরপর হযরত নূহ (আ.) পুনঃ আল্লাহর নিকট উক্ত দোয়া হতে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

যখন তাঁর নৌকা কা'বা শরীফের বরাবর উপস্থিত হলো এবং جُوْدِىْ পাহাড়ের তলায় এসে পৌছল, তখন ছয়মাস সময় তুফানের পর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তুফান বন্ধ হয়ে গেল। পুনরায় তাঁর ঔরস থেকেই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হতে লাগল, তুফানের পরবর্তী বংশধর তাঁর তিন ছেলের ঔরস মাত্র।

১. সাম (سَامٌ) আরব ও পারস্য অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ।

২. হাম (حَامٌ) সুদান, হিন্দু, সিন্ধু, কিবতী ইত্যাদির পূর্বপুরুষ।

৩. ইয়াফাস (يَافِسْ) তুরকী, চীন, ইয়াজুজ মাজুজ ইত্যাদিদের পূর্বপুরুষ।

এ জন্যই হযরত নূহ (আ.)-কে اٰدَمُ ثَانِىْ বলা হয়। অথবা, نَجِىُّ اللّٰهِ شَيْخُ الْاَنْبِيَاءِ ও বলা হয়। দিবারাত্র তিনি তিনশত রাকাত নামাজ আদায় করতেন, তাঁর বয়স ছিল ১ হাজার চারশত বছর, অথবা নয়শত পঞ্চাশ বছর ছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর লাশ মুবারক بَيْتُ الْمَقْدِسْ শরীফে দাফন করা হয়েছে।

নূহ শব্দটির অর্থ : নূহ শব্দটি অনারবীয় শব্দ। কিরমানী বলেন, এটা সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। তার অর্থ হচ্ছে– নিশ্চুপ, অবিচল, স্থির। এ শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষর সাকিন হওয়ার কারণে মুনসারেফ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, نُوْحٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– অতিশয় কাকুতিমিনতি করা, ক্রন্দন করা। তিনি অতিশয় কাকুতিমিনতি ও ক্রন্দন করতেন বলে তাঁকে নূহ নামে ডাকা হয়। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন? 'কাওমে নূহ' কারা? : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম।' হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন এবং হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় কারা?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا এ কথায় বুঝা যায় হযরত নূহ (আ.) রাসূল বা প্রেরিত। তিনি রাসূল ছিলেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এটা সর্বসম্মত অভিমত। –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

হযরত নূহ (আ.) -এর কওম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর কওম হচ্ছে, জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীগণ। তদানীন্তন কালে যারা আরব উপদ্বীপে বাস করত তারাই ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর কওম হয়েছে যারা জাযীরাতুল আরব এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতেন তারা। কেউ কেউ বলেন, যাঁরা কূফা এবং কূফার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের অধিবাসী ছিলেন তারাই হযরত নূহ (আ.)-এর কওম। –[রূহুল মা'আনী]

اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ ..... عَذَابٌ اَلِيْمٌ আয়াতে عَذَابٌ اَلِيْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উপরিউক্ত আয়াতে عَذَابٌ اَلِيْمٌ-এর অর্থ সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে। এক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে عَذَابٌ اَلِيْمٌ -এখানে পরকালের দোজখের আগুন বুঝানো হয়েছে। দুই. কালবী (র.)-এর মতে عَذَابٌ اَلِيْمٌ দ্বারা হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের প্রতি যে প্রলয় বা তুফান পাঠানো হয়েছিল, তা বুঝানো হয়েছে। তিন. তৃতীয় মতটি হলো, عَذَابٌ اَلِيْمٌ দ্বারা মূলত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনবে না। এ অভিমত অনুযায়ী عَذَابٌ اَلِيْمٌ -এর অর্থ عَامٌ বা ব্যাপক। হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমকে দাওয়াত দিতেন এবং পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন, কিন্তু তাঁর কওম এ দাওয়াত গ্রহণ করত না; বরং তাকে অত্যাচার করে বেহুঁশ করে দিত। তখন তিনি বললেন "হে আমার প্রভু! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করো। তারা আমাকে প্রকৃতপক্ষে জানে না, চিনে না।" –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ" : 'ইবাদত' বলতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ সর্বাবস্থায় মেনে চলা বুঝায়। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার অর্থ হলো তাঁর সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কাজ, তা অন্তরের কাজই হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজই হোক আদায় করা, মেনে চলা। 'তাকওয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বেঁচে

থাকা, বিরত থাকা, ভয় করা। তাকওয়া বলতে সাধারণত আমরা আল্লাহভীতি এবং পরহেজগারিতা বুঝি। আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা মেনে নিতে এবং তাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -[কাবীর]

হযরত নূহ (আ.)-এর আনুগত্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা এবং তাঁর প্রতি ভয়ভীতির নির্দেশের মাঝে যদিও হযরত নূহ (আ.)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ শামিল আছে এবং আল্লাহর ইবাদত করতে গেলে, তাঁর বিধি-নিষেধকে ভয়ভীতির সাথে পালন করতে গেলে তাঁর নবীকেও মানতে হয়, তবুও বিশেষভাবে হযরত নূহ (আ.) -এর আনুগত্যের কথা উল্লেখ করে তার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। আর তা যে বান্দাদের উপর বিশেষ কর্তব্য তা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "এবং তিনি তোমাদের অবকাশ দান করবেন নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।" সুতরাং প্রশ্ন হলো কিভাবে তিনি অবকাশ দানের কথা বললেন অথচ তিনিই (অন্যত্র) জানিয়েছেন নির্ধারিত সময়ের পর কোনো অবকাশ দেওয়া হয় না- এটা কি পরস্পর বিরোধী কথা নয়? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়-

আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন লাওহে মাহফূযে। তিনি সেখানে বান্দার আজল বা সময় দুই ধরনের নির্ধারণ করেছেন। قَطْعِىْ এবং مُعَلَّقْ। قَطْعِىْ যেমন, অমুক ব্যক্তি এক শত বছর বাঁচবে। مُعَلَّقْ যেমন, অমুক ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর বাঁচবে তবে আল্লাহর আনুগত্য বা অমুক কাজ করলে সত্তর বছর বাঁচবে। আল্লাহ তা'আলা জানেন, সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করবে কিনা? এবং সে মোট কতদিন বাঁচবে, তা লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে এবং তাই আযলে কাতয়ী। ফেরেশতার নিকট আল্লাহ তা'আলা বান্দার যে সময়সীমা জানিয়ে দেন তা আযলে মু'আল্লাক উল্লেখ থাকে এবং তাতেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটানো হয়। এ কথাটাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তা মিটিয়ে দেন এবং যা চান ঠিক রাখেন এবং তাঁর নিকটই মূল কিতাব রয়েছে।' মূল কিতাব বলতে লাওহে মাহফূয বুঝানো হয়েছে। তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ফেরেশতার নিকট যে আযল লিপিবদ্ধ আছে তাতেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে। তা হতেই বুঝা যা যে, এ দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। -[রূহুল মা'আনী, মা'আরিফুল কুরআন, কাবীর]

وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ -এর অর্থ এবং কাপড়াবৃত করার কারণ : وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ -এর অর্থ- তারা যখন হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত শুনত তখন নিজেদের মস্তক বা মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত। তাঁর দাওয়াতকে গ্রহণ করত না। তাঁর সাথে দেখা করতে চাইত না। তাদের নিজেদের মস্তক বা মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢাকার কয়েকটি কারণ হতে পারে। **এক.** এ জন্য যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-এর কথা শুনা তো দূরের কথা, তাঁর মুখ দেখতেও প্রস্তুত ছিল না। **দুই.** তারা এরূপ করত এ জন্য যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্মুখ দিয়ে মুখ ঢেকে এমনভাবে চলে যেত যেন তাদেরকে চিনতে পেরে হযরত নূহ (আ.) তাদের সাথে কথা বলারও সুযোগ না পান। -[কাবীর]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : উক্ত আয়াতের প্রথম অংশ يُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সময় দেওয়া যাবে এবং শেষাংশ اِذَا جَاۤءَ لَا يُؤَخَّرُ দ্বারা বুঝা যায় যে তাদেরকে সময় দেওয়া হবে না। সুতরাং আয়াতটির এক অংশ অপর অংশের জন্য প্রকাশ্য বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

এ দ্বন্দ্বের تَطْبِيْقْ এরূপে দেওয়া যায় যে, এখানে يُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى দ্বারা অর্থ হলো, تَاْخِيْرُهُمْ بِلَا عَذَابٍ عَلٰى تَقْدِيْرِ الْاِيْمَانِ اِلٰى اَجَلِ الْمَوْتِ তাদেরকে মৃত্যুর মূল নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঈমান থাকা অবস্থায় শাস্তি দিবেন না। আর اِذَا جَاۤءَ لَا يُؤَخَّرُ অর্থ হবে- عَدَمُ تَاْخِيْرِ اَجَلِ الْعَذَابِ عَلٰى تَقْدِيْرِ عَدَمِ الْاِيْمَانِ ঈমান না থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দান করতে বিলম্ব করবেন না। এরূপ অর্থে আয়াতের প্রথম ও শেষাংশের মধ্যে কোনো تَعَارُضْ থাকে না। তবে এ তাফসীর অনুসারে

প্রমাণিত হয় যে, أَجَلٌ মোট দু'টি أَجَلُ الْمُسَمَّى وَهُوَ الْأَجَلُ مُبْرَمٌ - بَعِيْدٌ غَيْرُ مُبْرَمٍ - قَرِيْبٌ يَعْنِى الْأَجَلُ أَجَلَانِ অর্থাৎ মৃত্যু সময় মোট দু'টি। একটি হলো أَجَلٌ قَرِيْبٌ নিকটতম সময় যা অন্য কোনো অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট, আর অপরটি হলো أَجَلٌ بَعِيْدٌ যা দূরবর্তী সময় এবং তা কোনো শর্তের সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই أَجَلٌ مُسَمًّى দ্বারা উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-এর তাৎপর্য হলো, যদি তোমরা জানতে যে তোমাদের উপর কি আজাব অবতীর্ণ হবে তোমাদের হায়াত শেষ হওয়ার মুহূর্তে তবে অবশ্যই তোমরা ঈমান আনতে।

قَوْلُهُ تَعَالَى قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِىْ ...... وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا : বছরের পর বছর হেদায়েতের পর হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলেন, হে প্রভু! আমার জাতিকে আপনার পথে আহ্বান করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনি। তথাপিও কেউই আমার হেদায়েতের প্রতি একটুও দৃষ্টিপাত করেনি। তারা নসিহতকে পালন করা তো দূরের কথা; বরং আমার আহ্বানকে উপেক্ষা করে তারা কেবল স্ব-স্ব সুযোগমতো অন্যপথে ভেগে যেতে লাগল। আমি যতবেশি তাদেরকে আপনার পথে ডাকতে চাই, তারাও ততবেশি করে দূরে সরে যায়। প্রকাশ্যে ও গোপনে দিবা-রাত্রে সর্বোতভাবে তোমার পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। কিছুতেই তারা আমার কথায় কর্ণপাত করেনি।

প্রত্যেক কাজে আল্লাহই হলেন مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ তথাপিও নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় ইসলাম হতে পলায়ন করার কারণ তাঁর দাওয়াতকে কেন বলা হয়েছে? : হযরত নূহ (আ.) তাঁর দাওয়াতের কারণে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের পলায়ন করার কারণ তাঁর দাওয়াতকে করা হয়েছে এ জন্য যে, প্রকাশ্যত যেহেতু তাঁর আহ্বানেই তারা পলায়ন করেছে, যদিও মূলত তাঁর আহ্বান তাদের পলায়ন করার কারণ নয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর কোনো দোষ নয়। অতএব, قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىْ إِلَّا فِرَارًا আয়াতটি قَوْلُهُ وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا الخ আয়াতের মর্ম সাদৃশ্য হয়েছে। অর্থাৎ যতই তাদেরকে (বক্র অন্তর সম্পন্ন লোকদের) কুরআনের হেদায়েতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, ততই তারা বেশি করে বক্রতার প্রতি ধাবিত হতে যায়। তাই কুরআনকে তাদের গোমরাহীর কারণ বলা যাবে না; বরং বলতে হবে যে, যারা যে কাজ আদৌ পছন্দ করে না সে কাজের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করলে তা তাদের অন্তরে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু করে এ কারণেই তারা পলায়ন করে। আর প্রাণপণে ঘৃণিত বিষয় হতে স্বভাবগতভাবে মানুষ দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করে। অতএব, دَعْوَتُ نُوْحٍ (ع) তাদের পলায়ন করার প্রকাশ্য কারণ। এ জন্যই فِرَارٌ-এর কারণ তার দাওয়াতকে করা হয়েছে। আর سَبَبٌ حَقِيْقِىْ বা سَبَبٌ بَاطِنِىْ তাদের কুফরিকেই সাব্যস্ত করা হবে।

অনুবাদ :

٨. ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا اَیْ بِاِعْلَاءِ صَوْتِیْ .

৮. অতঃপর আমি তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেছি অর্থাৎ আমার আওয়াজকে সমুচ্চ করে।

٩. ثُمَّ اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ صَوْتِیْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ الْكَلَامَ اِسْرَارًا .

৯. তৎপর আমি সোচ্চার প্রচার করেছি আমার স্বর আর গোপন করেছি তাদের প্রতি বক্তব্যকে একান্ত গোপনভাবে।

١٠. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ مِنَ الشِّرْكِ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا .

১০. অনন্তর আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অংশীবাদিতা হতে নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

١١. يُرْسِلِ السَّمَاۤءَ الْمَطَرَ وَكَانُوْا قَدْ مُنِعُوْهُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا كَثِيْرَ الدُّرُوْرِ .

১১. তিনি আকাশকে বর্ষণশীল করবেন বৃষ্টিপাত করবেন, তাদেরকে বৃষ্টি হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। তোমাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে অধিক পরিমাণে।

١٢. وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا جَارِيَةً .

১২. আর তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন সম্পদ ও সন্তান দ্বারা। আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ স্থাপন করবেন বাগানসমূহ আর তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন ঝরনাধারা প্রবহমান।

١٣. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا اَیْ تَاْمُلُوْنَ وَقَارَ اللّٰهِ اِيَّاكُمْ بِاَنْ تُؤْمِنُوْا .

১৩. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যাশা কর না? অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা কর না এবং ঈমান আনয়ন কর না।

١٤. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا جَمْعُ طَوْرٍ وَهُوَ الْحَالُ فَطَوْرًا نُطْفَةً وَطَوْرًا عَلَقَةً اِلٰى تَمَامِ خَلْقِ الْاِنْسَانِ وَالنَّظْرُ فِیْ خَلْقِهٖ يُوْجِبُ الْاِيْمَانَ بِخَالِقِهٖ .

১৪. অথচ তিনিই তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন اَطْوَارٌ শব্দটি طَوْرٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ- অবস্থা। যেমন- এক অবস্থা ছিল نُطْفَةٌ বীর্য, অতঃপর عَلَقَةٌ গোশত পিণ্ড হতে সৃষ্টির পূর্ণতা পর্যন্ত আরেক অবস্থা ছিল। আর সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনয়নের সহায়ক হয়ে থাকে।

١٥. اَلَمْ تَرَوْا تَنْظُرُوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ .

১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি? দেখনি যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশমণ্ডলীকে স্তরে স্তরে একটিকে অপরটির উপর।

١٦. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ اَیْ فِیْ مَجْمُوْعِهِنَّ الصَّادِقِ بِالسَّمَاۤءِ الدُّنْيَا نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا مِصْبَاحًا مُضِيْئًا وَهُوَ اَقْوٰى مِنْ نُوْرِ الْقَمَرِ .

১৬. এবং তথায় স্থাপন করেছেন চন্দ্রকে অর্থাৎ সেগুলোর সমষ্টির মধ্যে, যার বহিঃপ্রকাশ দুনিয়ার আকাশে হয়ে থাকে। আর সৃষ্টি করেছেন সূর্যকে প্রদীপ রূপে প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা। আর তা চন্দ্রের জ্যোতি অপেক্ষা অধিক আলোকোজ্জ্বল।

١٧. وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ خَلَقَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا اِذْ خَلَقَ اَبَاكُمْ اٰدَمَ مِنْهَا .

১৭. আর আল্লাহই তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন সৃষ্টি করেছেন। মাটি হতে উদ্ভূত করার মতো যেহেতু তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে তা হতেই সৃষ্টি করেছেন।

١٨. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا مَقْبُورِينَ وَيُخْرِجُكُمْ لِلْبَعْثِ إِخْرَاجًا .	১৮. অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তথায় প্রত্যাবর্তন করবেন। সমাধিস্থরূপে আর তোমাদেরকে বের করবেন পুনরুত্থানকল্পে বের করার ন্যায়।
١٩. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا مَبْسُوطَةً .	১৯. আর আল্লাহই স্থাপন করেছেন তোমাদের জন্য জমিনকে শয্যারূপে সম্প্রসারিত অবস্থায়।
٢٠. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا طُرُقًا فِجَاجًا وَاسِعَةً .	২০. যাতে তোমরা চলতে পর রাস্তায় পথে যা সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جِهَارًا : মাসদার হিসাবে মানসূব হয়েছে। হালের মাসদারও হতে পারে। অথবা উহ্য মাসদারের সিফাত। অর্থাৎ دُعَاءً جِهَارًا

قَوْلُهُ إِسْرَارًا : মাফউলে মুতলাক أَسْرَرْتُ হতে يَجْعَلْ . يُمْدِدْ . يُرْسِلْ শব্দগুলো মহল্লে জযম হয়েছে আমরের জবাব হিসাবে।

قَوْلُهُ مِدْرَارًا : শব্দ اَلسَّمَاءُ হতে হাল হিসাবে মানসূব হয়েছে। অথবা উহ্য মাসদারের না'ত। অর্থাৎ لِلّٰهِ اِرْسَالًا مِدْرَارًا -এর লামটি বয়ানের জন্য। এটা وَقَارًا -এর সিলাহও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ : বাক্যটি كُمْ -এর যমীর হতে حَالٌ হয়েছে। أَطْوَارًا হাল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, خَلَقَ -এর দ্বিতীয় মাফউল। আবূ লাইস বলেন, এটা একটি حَالٌ -এরপর অপর আর একটি حال।

আল্লাহ তা'আলা سُبُلًا فِجَاجًا বলেছেন وَاسِعَةً শব্দ বলেননি কেন? অথচ উভয় শব্দ একই অর্থবোধক : এর কারণ এই যে, فِجَاجًا শব্দটি صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ এবং তা سُبُلًا -এর نَعْتٌ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যদি তা طُرُقٌ وَاسِعَةٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তা سُبُلًا -এর عَطْفُ بَيَانٍ হবে বা بَدَلٌ হবে। سُبُلًا وَاسِعَةً বললে উভয় শব্দ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে যায়। অথচ নাহুবিদগণের নিয়মানুসারে جَمْعُ مُؤَنَّثٍ -এর صِفَتٌ দ্বারা مُفْرَدٌ مُؤَنَّثٌ নেওয়া বিধেয়।

قَوْلُهُ طِبَاقًا : এটা سَبْعَ سَمٰوٰتٍ হতে حَالٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ كَيْفَ الخ : বাক্যটি أَلَمْ تَرَوْا হতে مَفْعُوْلٌ হিসাবে مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হবে। আর وَجَعَلَ الْقَمَرَ الخ ও وَجَعَلَ اَلشَّمْسَ الخ বাক্য দু'টি عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ হয়েছে।

قَوْلُهُ نُورًا وَسِرَاجًا : এরা পরস্পর اَلْقَمَرَ ও اَلشَّمْسَ হতে حَالٌ হিসেবে مَنْصُوبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ نَبَاتًا : শব্দটি أَنْبَتَكُمْ হতে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হয়েছে, অতঃপর جُمْلَةٌ টি اَللّٰهُ শব্দ হতে خَبَرٌ হবে।

قَوْلُهُ بِسَاطًا : اَلْأَرْضَ টি হতে حَالٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا : বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য عِلَّةٌ হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ ...... لَهُمْ إِسْرَارًا : এ আয়াতগুলোতে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এক. প্রথমে তিনি গোপনে এবং চুপিসারে দাওয়াত দিয়েছেন। লোকদেরকে গোপনে দীনের কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। দুই. চুপিসারে দাওয়াতে কোনো ফল না পেয়ে তিনি প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু করেন। লোকদের প্রতি প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত পেশ করেন। জনসম্মুখে ইসলামের কথাবার্তা আলোচনা করেন। তাদেরকে

ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। তিন. প্রকাশ্য দাওয়াতেও আশানুরূপ ফল না পেয়ে তিনি গোপন ও প্রকাশ্য দাওয়াতের সমন্বয় সাধন করেন। তাদেরকে যেমন গোপনে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন, তেমনি প্রকাশ্য জনসম্মুখে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ আয়াতগুলো হতে আরও বুঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল প্রকারের পন্থাকেই ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। ثُمَّ শব্দটি প্রয়োগের ফলে বুঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) -এর দাওয়াতের পর্যায়গুলোর মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে দাওয়াত পেশ করার হেকমত : এর হেকমত এই যে, প্রকাশ্যভাবে দিবালোকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া অপ্রকাশ্য অবস্থা হতে খুবই কঠিন কাজ, এ কারণে প্রথমে গুপ্তভাবে পরে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেন। আবার কখনো প্রকাশ্য আবার কখনো অপ্রকাশ্যভাবে দাওয়াতের অপেক্ষা একত্রে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে দাওয়াত দান করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। এ কারণে সর্বশেষ কঠিনতম পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন।

اَلْجَهْرُ ও اَلْإِعْلَانُ-এর মধ্যে পার্থক্য : তাফসীরকারগণ শব্দদ্বয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য করেছেন–

جِهَارٌ : অর্থ খোলা মজলিসে কাউকেও সম্বোধন করে কিছু বলা, যা সকলেই শুনতে পায়।

إِعْلَانٌ : এটা إِذْعَانٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে إِعْلَانٌ -কে إِسْرَارٌ -এর মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ছোট ছোট শব্দ করে বলা, যা কোনোরূপে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়– উচ্চৈঃস্বরে নয়। আর ফুকাহায়ে কেরাম إِعْلَانٌ -কে إِذْعَانٌ -এর مُرَادِفٌ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, আর جَهْرٌ -কে خَفِيٌّ -এর মোকাবিলায় ব্যবহার করেছেন। যেমন– صَلٰوةٌ جَهْرِيَّةٌ এবং صَلٰوةٌ خَفِيَّةٌ বা قِرَاءَةٌ بِالْجَهْرِ অর্থাৎ শব্দ করে কেরাত পড়া, আর قِرَاءَةٌ بِالْخَفِيِّ অর্থাৎ চুপে চুপে কেরাত পড়া।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا ...... وَيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا" : আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান ও তাঁর আইন যে মানুষের পক্ষে শুধু পারলৌকিক কল্যাণ বয়ে আনে, জাগতিক জীবনে তার কোনো সুফল পাওয়া যায় না– এমন নয়; বরং আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান ইহ-পারলৌকিক উভয় জগতের রক্ষাকবচ, উভয় জগতে শান্তির নিয়ামক, উভয় জগতেই মানবের জীবনে বয়ে আনে অনাবিল শান্তির স্রোতস্বিনী। সুখ-সমৃদ্ধি দ্বারা লাভ করে তারা সমৃদ্ধশালী জীবন। পক্ষান্তরে আল্লাদ্রোহীতামূলক আচরণ, নৈতিকতা বিধ্বংসী কার্যকলাপ শুধু পরকালীন জীবনেরই অশান্তি ও অকল্যাণের কার্যকারণ নয়, এ পার্থিব জীবনেও তা দ্বারা অশান্তি-অকল্যাণ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলার এ পার্থিব জীবনে মানুষকে সুখের উপকরণ, বিলাস জীবনের সামগ্রী ধন-সম্পদ দানে দু'টি নীতি ক্রিয়াশীল থাকে। এক প্রকার ধন-সম্পদ দ্বারা মানুষ প্রতারিত হয়, খোদদ্রোহীতার আচরণে পড়ে যায়, নৈতিকতার বিপর্যয় ঘটে এবং বাহ্যিকরূপে সম্পদশালী পরিলক্ষিত হলেও ভিতরে জ্বলতে থাকে অশান্তির অনল শিখা, এ ধন-সম্পদই যেন তার জন্য বিরাট একটি আজাবে পরিণত হয়। জীবনে কোথাও এতটুকু শান্তির লেশ খুঁজে পায় না। দ্বিতীয় এক প্রকারের মানুষ ধন-সম্পদের দ্বারা হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোর সন্ধান পায়। তাদের জীবনে আল্লাহর আনুগত্যের প্রবৃদ্ধি ঘটে, নৈতিকতার উন্নয়ন হয়। জীবনে বয়ে আনে অনাবিল শান্তির অমিয় সুধা। এ ধন-সম্পদই যেন তার জন্য ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সমৃদ্ধির উপকরণে ও কার্যকরণে পরিণত হয়, অথচ উভয় প্রকার ধন-সম্পদ আল্লাহই দিয়ে থাকেন। প্রথম প্রকারের সম্পদকে আল-কুরআন مَتَاعُ الْغُرُوْرِ [প্রতারণাময় সম্পদ] নামে অভিহিত করেছেন, আর দ্বিতীয় প্রকার সম্পদকে অভিহিত করা হয়েছে مَتَاعٌ حَسَنًا [সুন্দর সম্পদ] নামে।

যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলগণ দীনের দাওয়াত, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান অনুযায়ী জীবন গঠনের আহ্বানের পাশাপাশি তাদেরকে ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহর পয়গাম ও জীবন-বিধানের সাথে যে ব্যক্তি, জাতি ও সমাজের ভাগ্য জড়িত হয়েছে, সে ব্যক্তি, জাতি ও সমাজ জাগতিক জীবনে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ও শান্তিময় জীবনের সামগ্রী লাভ করে ধন্য হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর গায়েবের ভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। আর পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য এর তুলনায় শতগুণে বেশি সুখ-সমৃদ্ধির উপায়-উপকরণ ও জান্নাতী শান্তির অনাবিল ধারা। কুরআন মাজীদে সূরা ত্বা-হা ১২৪ নং আয়াত, সূরা মায়িদা ৫৬ নং আয়াত, সূরা আ'রাফ ৯৩ নং আয়াত, সূরা হূদ ৪২ নং আয়াত সহ অনেক আয়াতই রয়েছে, যা হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর জীবন বিধান ইহকাল-পরকাল উভয় জীবনের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির ধারক-বাহক। আর তার পরিপন্থি জীবন উভয় জগতেই অশান্তি, অকল্যাণ, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্বিসহ জ্বালা বয়ে আনার কার্যকারণ।

১০ থেকে ১৩ নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে উভয় জগৎ শান্তিময়, কল্যাণময় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় হওয়ারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের জন্য আসমান হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত করে তার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠকে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অধিক মাত্রায় ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দান করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। আর পরকালে সুখময়

জান্নাত ও তার তলদেশ হতে ঝরনাধারা প্রবাহিত হওয়ার কথা বলে চিরসুখী করার সুখবর জানিয়েছেন। মহানবী ﷺ-এর দাওয়াতী কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, তিনিও উভয় জগতে কল্যাণময়, মঙ্গলময় ও সুখ-সমৃদ্ধশালী হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন। সূরা হূদের ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে আস, তবে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবন-সামগ্রী দান করবেন। আর অনুদান ও অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য প্রতিটি লোককে তিনি অনুগ্রহ (সুখ-সম্পদ) দান করবেন; কিন্তু তোমরা [এ জীবন-বিধান ও আল্লাহ হতে] যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, তবে আমি তোমাদের জন্য এক ভীষণ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান।'

মহানবী ﷺ কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা যদি একটি বাণীতে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরা আরব-অনারব গোটা বিশ্ব জগতের প্রশাসক, চালক ও নেতা হয়ে যাবে। একবার হযরত ওমর (রা.) দেশময় দুর্ভিক্ষের সময় বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন এবং শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত হলেন, বৃষ্টির প্রার্থনা করেননি। লোকেরা বলল, আমীরুল মু'মিনীন বৃষ্টির জন্য তো দোয়াই করলেন না? তিনি উত্তরে বললেন– আমি আকাশমণ্ডলের সেসব দুয়ারে ধাক্কা দিয়েছি যেখান হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, অতঃপর তিনি সূরা নূহের উল্লিখিত আয়াত তিনটি পাঠ করলেন। সারকথা হলো, আল্লাহর বিধানের ছত্র-ছায়ায় জীবন যাপন করা এবং আল্লাহর নিকট সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করে চলাই হচ্ছে ইহকাল-পরকালের অফুরন্ত নিয়ামত, সুখ-সমৃদ্ধি উত্তম জীবন সামগ্রী এবং অনাবিল শান্তি ও কল্যাণ লাভের নিশ্চয়তা এবং তার পরিপন্থি সমুদয় পথই অকল্যাণ-অশান্তি, দুঃখ ও অমঙ্গলের কার্যকারণ।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ঘটনা : বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি বড় অভাবগ্রস্ত। তিনি তাকে বললেন, মহান আল্লাহর নিকট তওবা করো। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমার কোনো পুত্র সন্তান নেই। তিনি বললেন, তওবা করো। অপর এক ব্যক্তি বলল, আমার শষ্যক্ষেত্র শুকিয়ে গেছে। তিনি বললেন, তওবা ইস্তিগফার করো। আরেক ব্যক্তি বলল, আমার কূপের পানি শুকিয়ে গেছে। তিনি বললেন, তওবা ইস্তিগফার করো। উপস্থিত লোকদের সকলেই তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, প্রত্যেককেই আপনি কেন তওবা ইস্তিগফারের কথা বললেন। তখন হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, দেখ আমি নিজের থেকে কিছুই বলিনি। আল্লাহ কুরআনে হাকীমে যা ইরশাদ করেছেন তা-ই আমি বলেছি। তখন তিনি এ আয়াতসমূহ তেলওয়াত করলেন। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا : وَقَارْ বলতে সম্মান-মর্যাদা বুঝায়। এর তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার ছোট ছোট রাজা-বাদশাহ, ধনী ও সরদার শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে তোমরা তো মনে কর যে, তাদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর কোনো কাজ করা বিপজ্জনক; কিন্তু মহান আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা এই নয় যে, তিনিও কোনো মান-মার্যাদা সম্পন্ন সত্তা হতে পারেন। তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, তাঁর প্রভুত্ব, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, তাঁর সার্বভৌমত্বে তোমরা অন্যদের অংশীদার মেনে নাও, তাঁর প্রদত্ত হুকুম-আহকাম তোমরা অমান্য করো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন এমন ভয় ও আশঙ্কাবোধও তোমাদের মনে জাগে না। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا : আলোচ্য আয়াতের تَرْجُوْنَ শব্দটি رَجَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে رَجَاءٌ শব্দটির অর্থ হলো– বিশ্বাস করা। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের কথা কেন বিশ্বাস কর না। মুফাসসিরগণ বলেন, বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করার জন্যই رَجَاءٌ শব্দটির এ অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের কথা নেই।

হযরত কালবী (র.) বলেছেন, এ ক্ষেত্রে رَجَاءٌ শব্দটির ভয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাঁকে ভয় কর না।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কে অবগত নও? তোমরা তাঁর অনন্ত-অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর শোকর গুজার হও না।

ইবনে কাইসান (র.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা তোমাদের ইবাদতের ব্যাপারে এ আশা করো না যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, আর এ জন্য তিনি আমাদেরকে ছওয়াব দান করেন।

অথবা, এর অর্থ হলো– তোমাদের ইবাদত-বন্দেগিতে কি তোমাদের এ আশা নেই যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ইবাদত বন্দেগির শুভ পরিণতি দান করবেন। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا" : উল্লিখিত وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার যে কথা বলেছেন, তার মর্ম হলো এই– আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি কর্মটি বিভিন্ন পর্যায়ে সুসম্পন্ন করেছেন। প্রথমত মানুষ পিতা ও মাতার দেহাভ্যন্তরে শুক্রকীটরূপে থাকে। স্বীয় কুদরতে মাতৃগর্ভে তার মিলন ঘটান। অতঃপর রক্তপিণ্ড মাংসপিণ্ডে রূপ দিয়ে একটি মানবাকৃতি দান করেন এবং তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন। সেখানে আলো, বাতাস, খাদ্য, অক্সিজেন পৌছিয়ে ক্রমান্বয়ে নয়-দশটি মাস পর্যন্ত প্রতিপালন করতে থাকেন। অতঃপর কোনো একদিন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ করিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। শিশু, কিশোর, যৌবন ইত্যাদি পর্যায়গুলো অতিক্রম করে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে অতিক্রম করানো হয়। এ পর্যায়সমূহের দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন– আমি তোমাদেরকে পর্যাক্রমে সৃষ্টি করেছি, সে সৃষ্টিতে তোমাদের কোনো হাত ছিল না। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অন্ধ, বধির, পঙ্গু করে সৃষ্টি করতে পারতাম। তোমাদের স্থলে অন্যকেও সৃষ্টি করতে পারতাম। এ সৃষ্টিকালে তোমরা আমার কত নিয়ামত ভোগ করেছ; কিন্তু আমার এ নিয়ামতের শোকর আদায়ের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা-প্রকাশ, আমার দয়া ও মেহেরবানির বিনিময় বিদ্রোহমূলক আচরণ তোমাদের দ্বারা কিরূপে শোভা পায়? এ বেয়াদবি ও বিদ্রোহের শাস্তি তোমাদের পেতে হবে না, এ কথা তোমরা কিরূপে মনে করলে? –[রূহুল মা'আনী]

এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ব্যাপারে এক অকাট্য দলিল। তিনি যে পর্যায়ক্রমে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তা কি অন্য কারো পক্ষে সম্ভব? –[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا : এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) -এর সে কথা বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছেন। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তা'আলা স্তর বিশিষ্ট করে সাত আসমান কিভাবে তৈরি করেছেন।

মা'আরিফ গ্রন্থকারের মতে, এখানে تَرَوْا শব্দটি عِلْم -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর জালালাইন গ্রন্থকারের মতে, نَظَر অর্থাৎ স্বচক্ষে দেখানো অর্থে নেওয়া হয়েছে, যাকে رُؤْيَتْ بَصَرِىْ বলা হয়।

আবার কখনো 'রায় দান অর্থে' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে, مَا رَأَيْتَ আপনার অভিপ্রায় কি? مَا تَرٰى তোমার মতামত কি?

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا : **-এর অর্থ : طَبَقَةٌ** বলতে সম্মিলিতভাবে একটির সাথে একটি, এ অর্থ নয়; বরং একটি অপরটির উপর বা নিচে। কারণ হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে একটি আসমান অপর আসমান হতে ৫০০ বছরের পথ উপরে অবস্থিত, ইবনে আবী হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি বর্ণনায় এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন বড় বড় ইমারতসমূহের বহু কয়টি তলা থাকে এবং একটি অপরটি হতে ৩/৪ গজ দূরে অবস্থিত হয়। তবে আসমানসমূহকে সৃষ্টির কুদরত হলো, যদিও স্তর বিশিষ্ট হয় তথাপিও তাতে কোনো খুঁটি লাগানো হয়নি।

كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا : আর তিনি চাঁদকে আকাশসমূহে নূর এবং সূর্যকে জ্বলন্ত প্রদীপ করে রেখেছেন। তাফসীরকারগণ চাঁদ সম্পর্কে বলেছেন جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ অর্থাৎ চাঁদকে আকাশসমূহে স্থাপিত করেছেন, এতে বুঝা যায় সকল আকাশেই চাঁদ খচিত রয়েছে। মূলত আমরা দেখতে পাই একটি আকাশে চাঁদ উদিত হয়। সুতরাং বলতে হবে আকাশসমূহ হতে একটির মধ্যে চাঁদকে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ سَمَاءُ دُنْيَا প্রথম আকাশে রয়েছে। কারণ আকাশসমূহের মধ্যে স্তর হিসাবে সামঞ্জস্য রয়েছে, তাই كُلْ বলে جُزْء উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আসমানসমূহের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে চন্দ্র এবং সূর্যের সম্মুখের দিক (وَجْه) আলো দান করছে। আর পিছনের দিক (ظَهْر) পৃথিবীর দিকে আলো দান করছে এ কারণে نُوْرُ الْقَمَرِ সকল আসমানকে আলো দান করছে। কারণ نُوْرُ الْقَمَرِ এমন স্বচ্ছ যা সাধারণত বাধাপ্রাপ্ত হয় না। অতএব, جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ বলা শুদ্ধ হয়েছে। তদ্রূপভাবে যদি কেউ বলে যে, زَيْدٌ فِى الْمَدِيْنَةِ এ কথা দ্বারা زَيْد শহরের সর্বস্থানে হওয়া আবশ্যক হয় না; বরং যে কোনো একটি স্থানে থাকলেই বাক্য শুদ্ধ হবে। তাই চন্দ্র আকাশের যে কোনো স্থানেই থাকুক جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ বলা শুদ্ধ হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে। –[মাদারিক]

সূর্যের বেলায়ও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে, কেননা جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ -এর উপর شَمْس -কে আতফ করা হয়েছে।

নূর ও সিরাজ-এর মধ্যকার পার্থক্য : نُوْر নূর বলা হয় জ্যোতিকে যা খুবই স্নিগ্ধ হয়, ঠাণ্ডা হয় এবং যা আলোকিত করতে পারে। আর তা লাবণ্যময় হয়ে থাকে। যথা বৈদ্যুতিক ডিমলাইটের আলো, চন্দ্রের আলো, ইবাদতকারীগণের চেহারায় ভাসমান আল্লাহ প্রদত্ত আলো ইত্যাদি। আর نُوْر -এর মধ্যে দাহন শক্তি থাকে না [illegible] দেয় না। আর চন্দ্রের আলো কোনো কিছুকে জ্বালিয়ে দেয় না, এ কারণে তাকে نُوْر বলা হয়েছে।

سِرَاجٌ বলা হয় এমন আলোকে যা অন্ধকারকে তো দূরীভূত করেই; বরং তাতে উত্তাপ থাকে এবং দাহন বা জ্বালানো শক্তি থাকে, তা খুবই প্রখর হয়–ঠাণ্ডা হয় না। নূর বা জ্যোতি অপেক্ষা তাতে আলো অত্যধিক হয়ে থাকে, সরিষা পর্যন্ত যাতে একটি একটি করে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। তার আলো দ্বারা সিক্ত (ভিজা) বস্তু শুকিয়ে যায়। চন্দ্রের আলোতে কোনো কিছু শুকায় না। চেরাগের ন্যায় সূর্যেরও জ্বালানো শক্তি আছে, তাই সূর্যকে سِرَاجٌ বলা হয়েছে।

কোন আকাশে চন্দ্র ও সূর্য অবস্থিত রয়েছে এবং এ বিষয়ে মতভেদ কি? : তাফসীরকারকগণের মতে মহান আল্লাহর বাণী- جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا আয়াতের মূল ইবারত এই যে- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ فِيْهِنَّ سِرَاجًا অর্থাৎ شَمْس -এর পরে فِيْهِنَّ একটি শব্দ مَحْذُوْف রয়েছে। তাহলে আয়াতের তাৎপর্য হবে لَمَّا جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ فَجَعَلَ الشَّمْسَ اَيْضًا فِيْهِنَّ যেভাবে চন্দ্রকে আকাশে খচিত করা হয়েছে, সেভাবে সূর্যকেও আকাশে খচিত করা হয়েছে। অতএব, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

মতভেদ : চন্দ্র যে প্রথম আকাশে খচিত রয়েছে এ বিষয়ে তাফসীরকারদের মতে কোনো মতভেদ নেই। সূর্য সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কারো কারো মতে সূর্য পঞ্চম আকাশে রয়েছে, কারো কারো মতে চতুর্থ আকাশে, কেউ বলেন শীতকালে চতুর্থ আকাশে এবং গ্রীষ্মকালে সপ্ত আকাশে থাকে। মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, ইজমা এ মতে যে, চতুর্থ আকাশেই সূর্য অবস্থান করেছে। -[সাবী]

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতে চন্দ্র প্রথম আকাশ হতেও বহু নিচে অবস্থান করছে যা فَضَاء বা খালিস্তান নামে অভিহিত। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা সূরায়ে فُرْقَانٌ -এর قَمَرًا الخ ..... تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ আয়াতে ব্যাখ্যা রয়েছে।

মানব সৃষ্টিকে উদ্ভিদ সৃষ্টির সাথে তুলনা করার কারণ : উদ্ভিদের সৃষ্টি এবং প্রবৃদ্ধিকে সাধারণত اِنْبَاتٌ বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে দুনিয়াকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাতে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। এ গাছপালা আবার মাটিতে মিশে যায়। তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তাকে আবার মাটির মাঝেই কবর দেওয়া হবে। আবার মাটির মধ্য হতে উঠানো হবে। যেমন গাছপালা সৃষ্টি করা হয়। এসবের দিকে লক্ষ্য করেই মানব সৃষ্টিকে গাছপালা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং গাছপালা প্রবৃদ্ধির জন্য যে اِنْبَاتٌ শব্দ ব্যবহার করা হয় সে শব্দটিই মানবসৃষ্টির ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে।-[যিলাল, কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا : মানবসৃষ্টি এবং তাদের এ পৃথিবীতে আবাদ করার পর তাদেরকে জমিনে প্রত্যাবর্তন করা এ দুয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান রয়েছে। এ কারণেই ثُمَّ (অতঃপর) দ্বারা আতফ করা হয়েছে। জমিন থেকে উঠানো এবং জমিনে প্রত্যাবর্তনের মাঝে যদিও সময়ের ব্যবধান রয়েছে কিন্তু জমিনের প্রত্যাবর্তন এবং তা হতে পুনরায় উঠানোর কাজকে এ পর্যায়ের অর্থাৎ সকলই পরকালীন কাজ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এ জন্য يُخْرِجُكُمْ -এ وَاوْ দ্বারা আতফ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টির পর তারা এ পৃথিবীকে আবাদ করবে অতঃপর বেশ কিছুকাল পর তাদেরকে জমিনে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করানো হবে এবং পুনরায় তাদেরকে জমিন হতে উঠানো হবে। -[রূহুল মা'আনী]

بِسَاطًا -এর অর্থ : بِسَاطًا শব্দের অর্থ– গালিচা, বিছানা, সম্প্রসারিত সমতলভূমি। আল্লাহ তা'আলা জমিনকে শয্যারূপে সৃষ্টি করেছেন। তাকে গালিচারূপে আচ্ছাদিত করেছেন। ফলে 'পৃথিবী গোলাকার' এ কথার সাথে তার কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা এত বড় গোলাকৃতির মাঝে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে সমতলই লক্ষ্য করি। পৃথিবী যে গোলাকৃতির তা সত্যকথা। তবে গোলাকৃতি হওয়াতে বা যদি তা নাও হয় শরিয়তের এতে কিছু যায় আসে না এবং তা জানা না জানার তেমন কোনো প্রয়োজন পড়ে না। -[রূহুল মা'আনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর]

جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا আয়াতের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, জমিন গোলাকার নয়, তার উত্তর কি হবে? : এর উত্তরে বলা হবে اَلْاَرْضَ بِسَاطًا দ্বারা যদিও জমিন গোলাকার বুঝায় না তথাপিও গোলাকার নয় এ কথাও তো বুঝায় না। কারণ যদি কোনো একটি বিশেষ বড় গোলাকৃতি বস্তুর উপর একটি ক্ষুদ্র প্রাণী বিচরণ করতে থাকে এবং গোলাকৃতি বস্তুটির পরিধি কয়েক মাইল পরিমাণ হয় তখন বস্তুটি গোলাকৃতি বলে অনুভব করা ক্ষুদ্র প্রাণীটির পক্ষে সম্ভব নয়। মনে হবে যে কেবল সমতলভূমি। এর একমাত্র কারণ হলো গোলাকৃতি বস্তুটির প্রশস্ততা, অতএব পৃথিবীটাও প্রশস্ততার দিক দিয়ে এত বড় যার উপর পায়ে চলে বা গাড়ি ঘোড়ায় চড়েও তার গোলাকৃতি অনুভব করা সম্ভব নয়। তবে যুগ যুগ ধরে বিচরণ করার পর তা প্রমাণিত হবে। সর্বোচ্চ কথা হলো, পৃথিবী গোল হতে হবে এ কথাও তো শরিয়তের বিধান মতে আবশ্যক নয়। -[কামালাইন]

অনুবাদ :

٢١. قَالَ نُوحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا اَىِ السَّفَلَةَ وَالْفُقَرَاءُ مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَهُمُ الرُّؤَسَاءُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ بِذٰلِكَ وَ وُلْدٌ بِضَمِّ الْوَاوِ وَسُكُوْنِ اللَّامِ وَبِفَتْحِهِمَا وَالْاَوَّلُ قِيْلَ جَمْعُ وَلَدٍ بِفَتْحِهِمَا كَخَشَبٍ وَخُشْبٍ وَقِيْلَ بِمَعْنَاهُ كَبُخْلٍ وَبَخَلٍ اِلَّا خَسَارًا طغيانا وكفرا .

২১. নূহ বলেছিল, হে প্রতিপালক! তারা আমার অবাধ্যাচারণ করেছে, আর তারা তাদেরই অনুসরণ করেছে অর্থাৎ নিকৃষ্ট ও দরিদ্র শ্রেণির লোক যাদের সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করেনি নেতৃস্থানীয়গণ যাদের উপর আল্লাহ সম্পদ ও সন্তান দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। وُلْدٌ শব্দটি وَاو পেশ ও لَام সাকিন যোগে এবং উভয় বর্ণে যবর যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। কারো মতে প্রথম কেরাত অনুযায়ী শব্দটি وَلَدٌ-এর বহুবচন, যেমন خَشَبٌ-এর বহুবচন خُشْبٌ হয়ে থাকে। আর কারো মতে, শব্দটি অর্থগতভাবে বহুবচন। যেমন– بُخْلٌ-এর অর্থগত বহুবচন بَخَلٌ ক্ষতিগ্রস্ততা ব্যতীত কিছুই সীমালঙ্ঘন ও কুফরি আচরণ।

٢٢. وَمَكَرُوْا اَىِ الرُّؤَسَاءُ مَكْرًا كُبَّارًا عَظِيْمًا جِدًّا بِاَنْ كَذَّبُوْا نُوْحًا وَاٰذَوْهُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ .

২২. আর তারা ষড়যন্ত্র করেছে অর্থাৎ নেতৃস্থানীয়গণ। ভয়ানক ষড়যন্ত্র জঘন্য রূপ ষড়যন্ত্র, এভাবে যে, তারা হযরত নূহ (আ.) -কে মিথ্যারোপ করেছে এবং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে।

٢٣. وَقَالُوْا لِلسَّفَلَةِ لَاتَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمِّهَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا هِىَ اَسْمَاءُ اَصْنَامِهِمْ .

২৩. আর তারা বলেছে নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্য দেবদেবীগুলোকে এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ শব্দটি ওয়াও বর্ণে যবর ও পেশযোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে সুয়ায়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে এগুলো তাদের দেবমূর্তিদের নাম।

٢٤. وَقَدْ اَضَلُّوْا بِهَا كَثِيْرًا ج مِنَ النَّاسِ بِاَنْ اَمَرُوْهُمْ بِعِبَادَتِهَا وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا عَطْفٌ عَلٰى قَدْ اَضَلُّوْا دعَا عَلَيْهِمْ لَمَّا اُوْحِىَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ .

২৪. আর তারা বিভ্রান্ত করেছে তা দ্বারা অনেককে মানুষদের মধ্য হতে, তারা তাদেরকে এগুলোর উপাসনা করতে আদেশ করেছে। সুতরাং এ জালিমদেরকে বিভ্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। এটা قَدْ اَضَلُّوْا-এর উপর عَطْف যখন হযরত নূহ (আ.) -এর নিকট এই মর্মে ওহী আসে যে, اِنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ 'তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য হতে যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তারা ব্যতীত আর কেউই ঈমান আনয়ন করবে না', তখন তিনি তাদের জন্য এ বদদোয়া করেন।

٢٥. مِمَّا مَا صِلَةٌ خَطَايَاهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ خَطِيْئٰتِهِمْ بِالْهَمْزَةِ اُغْرِقُوْا بِالطُّوْفَانِ فَاُدْخِلُوْا نَارًا عُوْقِبُوْا بِهَا عَقِبَ الْاِغْرَاقِ تَحْتَ الْمَاءِ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اَىْ غَيْرِ اللّٰهِ اَنْصَارًا يَمْنَعُوْنَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ .

২৫. তাদের এ সকল مَا অব্যয়টি صِلَةٌ-এর জন্য গুনাহের কারণে অপর এক কেরাতে শব্দটি হামযা যোগে خَطِيْئٰتِهِمْ পঠিত হয়েছে। তারা নিমজ্জিত হয়েছে তুফানে। অতঃপর তারা দোজখে প্রবিষ্ট হয়েছে পানির নীচে দোজখের আগুনে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, নিমজ্জিত হওয়ার পর। তখন তারা পায়নি তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত তাঁর অপর কোনো সাহায্যকারী যে তাদের হতে শাস্তিকে বিরত রাখবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ : জুমলায়ে اِنَّهُمْ হয়ে قَالَ -এর মাফউল। মাওসূলটি اِتَّبَعُوْا -এর মাফউল, যমীর তার ফায়েল। مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗ ফায়েল, يَزِدْ -এর, যমীর মাফউল, اِلَّا خَسَارًا ইস্তিছনায়ে মুফাররাগ।

قَوْلُهُ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ : বাক্যটি رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ -এর উপর আতফ হয়েছে, আবূ হাব্বান বলেন- وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ বাক্যটি قَدْ اَضَلُّوْا -এর উপর আতফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَالَ نُوْحٌ رَبِّ الخ : অবশেষে হযরত নূহ (আ.) কাওমকে হিদায়েত করতে করতে শেষ পর্যন্ত নৈরাশ হয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলেন, হে আল্লাহ! এরা তো আমার কথা মোটেই শুনে না, বরং এরা সমাজের এমন সব লোকদের কথাবার্তা মেনে চলছে যারা অত্যন্ত দরিদ্র ও লজ্জাহীন আর কিছু সংখ্যক হলো অসামাজিক বড় ধনবান তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এ লোকদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে।

হযরত নূহ (আ.) -এর সম্প্রদায়ের নাফরমানি কি ছিল? : হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির নাফরমানি সম্পর্কে ইতঃপূর্বেও আলাচনা করা হয়েছে, তা হলো, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর আনুগত্য করাকে অস্বীকার করা, নাফরমানির কার্যে আল্লাহকে ভয় করা, হযরত নূহ (আ.)-এর অনুসরণ করা, এ তিনটি হুকুম পালন করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তারা এগুলো অত্যন্ত বেয়াদবির সাথে অমান্য করেছিল। হযরত নূহ (আ.) -এর নির্দেশ মোতাবেক যদি তারা চলত তখন বেহেশতে স্থানলাভ করত, আর সম্প্রদায়ের সর্দারদের আনুগত্য করে তারা শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছে। সর্বশেষ তিনি তাদেরকে তওবার ডাক দিয়েছেন, তাও তারা অমান্য করে বসেছে এবং তওবার ফলে তাদেরকে যে সকল নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাও তারা গ্রহণ করেনি।

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ .... اِلَّا ضَلَالًا : উল্লিখিত আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আল্লাদ্রোহীতা, হযরত নূহ (আ.)-কে অমান্য করা, তৎকালীন সমাজ নেতা ও সরদারদের আনুগত্য করা এবং হযরত নূহ (আ.)-এর দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমাজ নেতাদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজের প্রভাবশালী নেতা ও সমাজপতিগণ সর্বদা জনগণকে হযরত নূহ (আ.)-এর আন্দোলন ও দীনি দাওয়াত এবং তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ ও শিক্ষা হতে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য জোর প্রয়াস চালাত। তারা বলত, নূহ তো তোমাদের ন্যায়ই একজন মানুষ। তার প্রতি আল্লাহর ওহী নাজিল হয়েছে তা কিরূপে মানা যায় [সূরা আ'রাফ ৬৩ আয়াত]। সমাজের গরিব, হীন ও নিম্ন শ্রেণির লোকগণই হযরত নূহের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করেছে। তাঁর কথাগুলোর গুরুত্ব থাকলে সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকগণ অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনত। [সূরা হূদ-২৭ আয়াত] কাউকেও আল্লাহ তা'আলার পাঠানোর প্রয়োজন থাকলে ফেরেশতাকেই পাঠাতে পারতেন। [সূরা মু'মিন- ২৪ আয়াত] এমনিভাবে নানা প্রবঞ্চনা ও কথা দ্বারা সমাজের নেতাগণ সাধারণ লোকদেরকে হযরত নূহ (আ.) হতে ফিরিয়ে রাখত। তারা নিজেদের উপাস্য দেবদেবীগণকে পরিত্যাগ না করার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি নির্দেশ দিত। নেতা ও সমাজপতিগণের এহেন ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা মক্কার সমাজ-নেতা, গোত্র-নেতা ও সাধারণ মানুষকে এ কথাই বলতে চান যে, তারা নবীর শিক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁকে নবীরূপে স্বীকৃতি না দেওয়ার দরুন, মহাপ্লাবনের পানিতে ডুবে চিরতরে ধ্বংস হয়েছিল। তোমরাও সাবধান হও। তোমরা মহানবীর শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ না করলে এবং সমাজের সাধারণ লোকদেরকে মহানবীর বিরোধিতায় প্ররোচিতকরণ হতে বিরত না থাকলে তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি আপতিত হওয়া বিচিত্র নয়।

তাদের চক্রান্ত কি? : তাদের চক্রান্ত কি ছিল সে সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের চক্রান্ত ছিল হযরত নূহ (আ.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে সমাজের গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া। কেউ কেউ বলেন, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে অন্যদের প্রভাবিত করা। শেষ পর্যন্ত সাধারণ লোকেরা বলেছিল যে, তারা যদি সঠিক পথে না থাকত তাহলে তাদের এত সম্পদ ও নিয়ামত দেওয়া হতো না। কেউ কেউ বলেন, তাদের চক্রান্ত ছিল, তারা সাধারণ লোকদেরকে বলত-তোমরা তোমাদের দেবতাদের পূজা ত্যাগ করো না। -[কুরতুবী]

মানুষের মাঝে মূর্তিপূজার প্রচলন কিভাবে শুরু হয়? : দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম শিরক ও মূর্তিপূজার প্রচলন হয় হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দ্বারা। হযরত আদম ও নূহ (আ.) -এর মধ্যবর্তী সময় অনেক মুত্তাকী নামযাদা ও শীর্ষস্থানীয় লোক জনগণের কাছে সুপরিচিত ছিল এবং তাদের প্রতি জনগণ অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখত ও তাদের অনুসরণ করে চলত। যুগের আবর্তনের সাথে সাথে শয়তানের প্রবঞ্চনার ফলে জন্মগত ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্যে তাদের নামে মানতকরণ, তাদের নামে পশু জবাইকরণ, বলি দেওয়া, তাদের কবরকে সিজদা করা এবং তাদেরকে আল্লাহর সমক্ষমতাসম্পন্ন বান্দা ভাবতে লাগল।

এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে মানুষের মনোজগতে তারা প্রভু ও মা'বূদরূপে স্থান পেল। মানুষ তাদের ইবাদতে মাশগুল হয়ে পড়ল। পরবর্তীকালে শয়তান মানুষের মনে এ বলে প্রবঞ্চনা দিল যে, যার ইবাদত করা হয়, তার একটি প্রতিমূর্তি বানিয়ে সম্মুখে রেখে ইবাদত করা হলে ইবাদতে প্রভুর স্বাদ উপলব্ধি হয় এবং ইবাদতেও মন গভীরভাবে বসে যায়। শয়তানের এ কুমন্ত্রণায় মানুষ ঐ সব নামকরা মুত্তাকী ও আল্লাহওয়ালা লোকদের প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার পূজা ও ইবাদত শুরু করে দিল। সেসব প্রতিমূর্তিসমূহেরই নাম আল-কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে উদ্দ, সুওয়া', ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হলো হযরত নূহ (আ.) সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজার ইতিহাস। তাদের হতেই দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা ও শিরকের প্রচলন শুরু হয়। হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় পানিতে ডুবে ধ্বংস হওয়ার কারণে প্রতিমূর্তিগুলো মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। পরবর্তীকাল শয়তান সে প্রতিমূর্তিসমূহ খুঁজে বের করে হযরত নূহ (আ.) -এর পৌত্র ও বংশধরগণকে পূজা করার জন্য এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতি ও মতাদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানায়। ফলে তারা আবার মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয় এবং এ মূর্তিপূজার ধারাটিই পরম্পরা সূত্রে বিভিন্ন আরবি গোত্র এবং ভারতীয়, সুদানীয় ও মিসরীয় লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও প্রথম দিক দিয়ে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকগণের মধ্যে এসব মূর্তির এবং অন্যান্য নামের অনেক মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল।

উদ্দ, সুওয়া', ইয়াগুছ, ইয়াউক, ও নসর -এর তাফসীর : উপরোক্ত নামগুলো কাফেরদের মূর্তিসমূহের নাম :

وَدّ : এটা ছিল কুজায়া গোত্রের শাখা, অর্থাৎ বনী কালব উপগোত্রের উপাস্য দেবতা। دُوْمَةُ الْجَنْدَلْ নামক স্থানে তার একটি পদপীঠ নির্মাণ করে রেখেছিল। আরবের প্রাচীনকালীন শিলালিপিতে তার নাম 'আদম আবাস" (আব্দ বাপু) লিখিত আছে। ঐতিহাসিক كَلْبِى বলেন, এটা একটি পুরুষাকৃতি বিশিষ্ট বিরাটাবয়ব সম্পন্ন মূর্তি ছিল। কুরাইশগণ একে উপাসনা করত। তাদের নিকট তা 'উদ্দ' নামে পরিচিত ছিল।

سُوَاعٌ : এটা ছিল هُـذَيْـل গোত্রের দেবী। তা নারী আকৃতিসম্পন্ন মূর্তি ছিল। يَـنْـبُـوْع -এর নিকট রুহাত নামক স্থানে এটার মন্দির ছিল।

يَغُوْثُ : এটা ছিল هُزَيْل গোত্রের 'আন উম' শাখা ও 'মাযহেজ' গোত্রের কোনো কোনো শাখার লোকদের স্বীকৃত উপাস্য। মাযাহেজগণ ইয়েমেন ও হিজাজের মধ্যবর্তী 'জুরাস' নামক স্থানে তার বাঘাকৃতি সম্পন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কুরইশ বংশের কারো কারো عَبْد يَغُوْث নাম ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

يَعُوْقُ : এটা ইয়েমেনের হামদান অঞ্চলের 'হামদান' গোত্রের গাইয়ান শাখার উপাস্য ছিল। তার মূর্তি ছিল অশ্বাকৃতি বিশিষ্ট।

نَسْر : এটা حِمْيَرْ অঞ্চলের অধিবাসী حِمْيَرْ গোত্রের 'আলেযুল কুলা' নামক শাখার লোকদের উপাস্য ছিল نَسْر। 'বালখা' নামক স্থানে তার প্রতিমূর্তি শকুনের আকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাবার প্রাচীন শিলালিপিতে তার নাম লিখিত ছিল নসওয়ার, তার পূজারীদেরকে বলা হয় নসওয়ার ওয়ালা। -[মাদারিক]

অপর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে। উপরিউক্ত পাঁচটি নাম হযরত আদম (আ.) -এর পাঁচ পুত্রের নাম ছিল, তন্মধ্যে وَدّ ছিল বড় জনের নাম।

হযরত নূহ (আ.) জাতির হেদায়েতের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। তাই জাতির উপর বদদোয়া করা কিভাবে শোভা পেল? : হযরত নূহ (আ.) যখন ওহীর মাধ্যমে স্বজাতির হেদায়েত কবুল না করার উপর নিশ্চিত অবগতি লাভ করলেন যে, لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ আপনার সম্প্রদায় হতে যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, এরা ব্যতীত আর কেউ ঈমান গ্রহণ করবে না, অতএব আপনি তাদের কৃতকার্যের উপর চিন্তিত হবেন না। এতে তিনি তাদের হতে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তারা নাফরমান বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। আর নাফরমানদের এবং কাফেরদের জন্য বদদোয়া জায়েজ হয়েছে যেভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কাফেরদের জন্য বদদোয়া করেছেন, اَللّٰهُمَّ زَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ আবূ জাহল ও অন্যান্য কাফেরদের প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরূপে বদদোয়া করা হয়েছে اَبُوْجَهْلٍ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا : اِغْرَاقٌ বলতে পানিতে ডুবিয়ে মারা বুঝায়। নূহ সম্প্রদায়কে মহাপ্লাবন দিয়ে ডুবিয়ে মারার কথা এখানে বলা হয়েছে। আর তাদরেকে ডুবানো হয়েছিল তাদের অপরাধ তথা গুনাহের কারণে। তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারাই শেষ নয়। এরপর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এর অর্থ হলো তাদেরকে কবরে আজাব দেওয়া, কেননা দোজখের আগুন আসবে কিয়ামতের পরে। তাই তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে বলে কবরের আজাবের কথাই বুঝানো হয়েছে। -[কুরতুবী, কাবীর]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং তাদেরকে মধ্যালোকে কবরের আজাবে গ্রেফতার করা হয়। -[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

২৬. وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اَىْ نَازِلَ دَارٍ وَالْمَعْنٰى اَحَدًا ـ

২৬. আর নূহ বলেছিল, হে প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না অর্থাৎ কোনো গৃহে অবতরণকারী, এর অর্থ হলো কাউকেও।

২৭. اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْآ اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا مَنْ يَّفْجُرُ وَيَكْفُرُ قَالَ ذٰلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْاِيْحَاءِ اِلَيْهِ ـ

২৭. যদি তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দান কর, তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে, আর তারা পাপাচারী ও কুফরি আচরণকারী ব্যতীত কোনো সন্তান জন্ম দিবে না, যারা পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং কুফরি আচরণ করবে। এ বদদোয়াও তিনি পূর্বোক্ত ওহী আসার পর করেছেন।

২৮. رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَكَانَا مُؤْمِنِيْنَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مَنْزِلِىْ اَوْ مَسْجِدِىْ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا هَلَاكًا فَاُهْلِكُوْا ـ

২৮. হে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করো তারা উভয়ে মু'মিন ছিল। আর ক্ষমা করো তাদেরকে যারা আমার গৃহে প্রবেশ করেছে আমার আবাসগৃহ বা মসজিদে মু'মিনরূপে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীদেরকে ক্ষমা করো কিয়ামত পর্যন্ত। আর জালিমদেরকে ধ্বংস ব্যবতীত কিছুই বৃদ্ধি করো না ধ্বংসপ্রাপ্তি। সুতরাং তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا : বাক্যটি قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ -এর উপর আতফ হয়েছে। مُؤْمِنًا শব্দটি لِمَنْ دَخَلَ হতে হাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ (আ.) -এর তাঁর সম্প্রদায়ের উপর বদোয়ার কারণ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে বেঈমান কাফিরের জন্য হযরত নূহ (আ.)-এর বদদোয়া এবং ঈমানদার মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর বদদোয়ার কারণ এটা নয় যে, তিনি খুবই ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন; বরং তিনি সুদীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত দীনের প্রচার চালিয়ে তার হক আদায় করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর জাতির লোকজনের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়েছেন। আর এ চরম নৈরাশ্যের মধ্যেই তাঁর কণ্ঠে এ দোয়া স্বতই উচ্চারিত হয়ে যায়। এর মূলে অস্থিরতা বা ধৈর্যহীনতার কোনো স্থান নেই। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا : এ অংশে হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বিতীয় বদদোয়াটির কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর দোয়ার ভাষা ছিল আল্লাহ যেন কোনো একটি কাফেরকেও বাঁচিয়ে না রাখেন, কারণ তাদেরকে রাখলে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানগণও তাদের মতো কাফের হবে।

হযরত নূহ (আ.) কিভাবে বলেছিলেন যে, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও কাফের ও ফাজির হবে অথচ আল্লাহই জানেন কে হেদায়েত প্রাপ্ত আর কে পথভ্রষ্ট হবে : হযরত নূহ (আ.)-এর বিষয়টি জানার বিভিন্ন কারণ রয়েছে । প্রথম কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ এটাই অকাট্য দলিল এবং হযরত নূহ (আ.)-এর এ কথা বলার জন্য যথেষ্ট । আল্লাহ যেখানে لَنْ يُّؤْمِنَ বলেছেন সেখানে আর কোনো সন্দেহ থাকে না । দ্বিতীয় কারণ হলো, পরীক্ষণ নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) যে হায়াত পেয়েছিলেন, তা মূলত অত্যন্ত বেশি হায়াত । হযরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা ৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) বছর হায়াত দান করে তাঁর জাতিকে হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন । সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছরের মধ্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তাদের হেদায়েতের জন্য চালিয়েছেন, কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি । এ দীর্ঘকালের মধ্যে তাদের স্বভাব ও চরিত্র জানতে আর কিছু বাকি ছিল না ।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ .... اِلَّا تَبَارًا : এ আয়াতটির প্রথমাংশ হযরত নূহ (আ.)-এর মাতা-পিতা ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান নরনারীর জন্য দোয়া এবং শেষাংশ কাফেরদের প্রতি বদদোয়া স্বরূপ । হযরত নূহ (আ.) বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে মাফ করে দিন, আর আমার সাথে যারা রয়েছে তাদের সকলকেই ক্ষমা প্রদর্শন করুন । আর জালিম কাফেরদেরকে নিঃশেষ করে দিন ।

قَوْلُهٗ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ : হযরত নূহ (আ.) তাঁর মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার প্রসঙ্গে যদি প্রশ্ন করা হয় যে তারা মুসলমান ছিল কিনা? নতুবা কাফেরদের জন্য দোয়া করা কিভাবে শুদ্ধ হবে? এ প্রসঙ্গে বলা হবে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর মাতাপিতা উভয়েই মুসলমান ছিলেন, জালালাইন গ্রন্থকার এ কথাটি স্পষ্ট করে বলেছেন وَكَانَا مُسْلِمَيْنِ তারা দু'জন মুসলমান ছিলেন, সুতরাং মুসলমান হিসাবে اَلدِّيْنُ -এর জন্য দোয়া ওয়াজিব, তিনি ওয়াজিব আদায় করেছেন–

لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا আয়াতে بَيْتِىَ শব্দের অর্থ : হযরত নূহ (আ.) যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তা ছিল নিজের জন্য, পিতামাতার জন্য এবং যারা তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিল তাদের জন্য । এখানে بَيْتِىَ বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে । ইমাম যাহহাক বলেন, بَيْتِىَ বা আমার ঘর বলতে 'আমার মসজিদ' বুঝানো হয়েছে । কেউ কেউ বলেন, ঘর বলতে এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর কিস্তি বুঝানো হয়েছে । কেউ কেউ বলেন, ঘর বলতে এখানে দীন বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ তাদেরকেও ক্ষমা করো যারা আন্তরিকতার সাথে আমার দীনকে কবুল করেছে । –[কাবীর]

سُوْرَةُ الْجِنِّ : সূরা আল-জিন্ন

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'আল-জিন্ন' শব্দটি এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এ সূরাতে জিনদের কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ন করে স্বজাতির লোকদের নিকট প্রচার করার কথা বিবৃত হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ২৮টি আয়াত, ২৮৫টি বাক্য এবং ৮৭০ টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীসহ হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবীসহ উকায নামক বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। এমতাবস্থায় জিনদের একটি বাহিনী সে অঞ্চল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে তারা থেমে গেল এবং গভীর মনোনিবেশের সাথে কুরআনের বাণী শ্রবণ করল। এ প্রেক্ষিতে সূরা আল-জিন্নটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

অধিক সংখ্যক তাফসীরকার এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেছেন যে, আসলে তা প্রখ্যাত তায়েফ যাত্রাকালীন একটি ঘটনা; হিজরতের তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের দশম বর্ষে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ তায়েফ সফরকালে জিনদের যে কুরআন শ্রবণের ঘটনা ঘটেছে তা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। সূরা আহকাফে তার ব্যাখ্যা রয়েছে। আর জিনগণ কুরআন শুনে ঈমান আনয়নের পূর্ব থেকেই তারা হযরত মূসা (আ.) ও আসমানি কিতাবাদির উপর ঈমান রাখত। অত্র সূরার ২ থেকে ৭ পর্যন্ত আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, এ সময় কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা বহু সংখ্যক ছিল, আর তারা মুশরিক ছিল। ইতিহাসের বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তায়েফ সফরকালে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) কেবল হুযূরের সঙ্গী ছিলেন।

আর উকায নামক বাজারে সফরকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে অনেকজন সাহাবী সঙ্গী ছিলেন। অনেকগুলো হাদীসের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, অত্র সফরে সঙ্গী জিনেরা রাসূলে কারীম ﷺ থেকে কুরআন শুনেছিল। আর এ সফরটি ছিল তায়েফের সফরের পর মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনকালে অর্থাৎ উকায বাজারের দিকে যাওয়ার কালে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ পড়ার সময় কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের ঘটনা।

এসব কারণে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরা আহকাফ ও সূরা আল-জিন্নে একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি; বরং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ছিল।

আর জিনগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছাকৃত কুরআন শ্রবণ করাননি; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে সাথে করে উকায বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। আর এ মুহূর্তে শয়তান যখন আকাশের مَلَأَ أَعْلٰى তে আল্লাহ কি আলোচনা করেছেন তা শ্রবণ করতে যেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ شِهَابٌ ثَاقِبٌ দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা হয় তখনই তারা পরস্পর একত্রিত হয়ে যুক্তি করল যে, আকাশের সংবাদ নেওয়ার কাজে আমরা যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি দুনিয়াতে এমন কিছু ঘটেছে যা আমাদের আসমানি সংবাদ নেওয়ার কাজে বাধা দানকারী হয়েছে, সুতরাং مَشْرِقْ থেকে مَغْرِبْ এবং شِمَالْ থেকে جُنُوْبْ পর্যন্ত গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। অতএব, তাদের আলোচনা মোতাবেক হেজাজ -এর তেহামাহ নামক স্থানে যে দল পৌঁছল তারা 'নাখলা' নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ফজরের নামাজ পড়তে দেখল। সে স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজরের নামাজের কেরাত শ্রবণ করে তারা পরস্পর শপথ করে বলাবলি করতে লাগল যে, এটাই আমাদের আসমানি সংবাদ নেওয়ার কাজে বাধাদানকারী বিষয়। তখন তারা তাদের অন্যান্যদের নিকট গিয়ে কুরআন শ্রবণের ঘটনা বর্ণনা করল। ভাষাটি ছিল إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا –[মা'আরিফ]

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরায় জিনদের আসমানি সংবাদ সংগ্রহের পথ বন্ধ হওয়ার কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মহানবীর কণ্ঠে কুরআন শ্রবণ করে বিমোহিত হওয়া এবং ঈমান আনা অতঃপর স্বজাতির মধ্যে প্রচার করার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম থেকে ১৫ পর্যন্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জিন কুরআনের বাণী শুনে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করেছে, যা নবী করীম ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে। জিনগণ স্বজাতির নিকট গিয়ে বলেছে, আমরা এমন এক বিস্ময়কর বাণী শুনেছি যা মানব ও জিন সম্প্রদায়ের জন্য সত্য পথের দিশা দেয়। আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরিক করবো না। তিনি মহান, তাঁর স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই কিন্তু আমাদের মধ্যে নির্বোধগণ আল্লাহর

শানে অবাস্তব উক্তি করে থাকে। আমরা জানতাম, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা উক্তি করতে পারে না। কতিপয় মানুষ জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের অহমিকা বাড়িয়ে দেয়। মানুষ এ মিথ্যা ধারণায় নিপতিত রয়েছে। আমরা যখন আসমানের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে যাই, তখনই আমরা বাধাপ্রাপ্ত হই এবং কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আসমানকে পরিপূর্ণ পাই। আমরা আসমানে কোনো এক গোপন স্থানে আরশের ফয়সালাকৃত সংবাদসমূহ জানার জন্য এর পূর্বে ওঁৎ পেতে বসে থাকতাম; কিন্তু এখন কেউ অনুরূপ বসলে সে জ্বলন্ত শেলের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের এ সংবাদ সংগ্রহের দ্বার বন্ধকরণ দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চান, না পথের দিশা দিতে চান তা আমরা কিছুই বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে অনেক নেককার ও পাপিষ্ঠ রয়েছে। আমরা আল্লাহকে কোনোক্রমেই পরাভূত করতে পারবো না। তাঁর আবেষ্টনীর মধ্যেই আমাদের আহ্বান। আমরা সত্যের বাণী শুনে ঈমান এনেছি। যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তাদের পুরস্কার লাঘব হওয়া এবং শাস্তি বৃদ্ধির কোনো আশঙ্কা নেই। আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছে মুসলমান এবং কিছু অমুসলমান। যারা হেদায়েত গ্রহণ করে তারা চিন্তা-ভাবনা করার পরই তা গ্রহণ করে। আর যারা জালেম ও সীমালজ্ঞনকারী তারা কিছুই চিন্তা-ভাবনা করে না। তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

১৬ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষকে শিরক পরিহার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা শিরক বর্জন করবে তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পারবে। আর যারা তা করবে না তারা চরম ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১৯ থেকে ২৩ নং আয়াত পর্যন্ত মক্কার কাফেরগণকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আল্লাহর নবী যখন ইবাদতে দণ্ডায়মান হয় তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ো। অথচ তিনি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করেন, তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার সাব্যস্ত করেন না। নবী তোমাদের অনিষ্ট বা কল্যাণ কিছুই করতে পারেন না। ভালোমন্দ করার কোনো কিছু তাঁর হাতে নেই। তা করার অধিপতি একমাত্র আল্লাহ। রাসূলের দায়িত্ব হলো মানুষের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌছে দেওয়া। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকার করে না, তারা চিরন্তনভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

২৪ থেকে ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত শাস্তি আগমনের সময় জানতে চাচ্ছ। তা অতি নিকটে না দীর্ঘ দিন পর হবে, নবী তা কিছুই জানেন না। তোমরা নবী এবং তাঁর দলবলকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ভাবছ। তোমরা স্মরণ রেখো! সে শাস্তি যখন প্রত্যক্ষ করবে, তখনই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, কারা দুর্বল এবং কারা সংখ্যায় স্বল্প। আল্লাহ গায়েবী বিষয় সম্পর্কে তাঁর মনোনীত নবী ব্যতীত কাউকেও অবহিত করেন না। একমাত্র নবুয়তের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই তাঁকে এ বিষয় অবিহত করা হয়। নবীর দায়িত্ব হলো আল্লাহর পয়গাম পৌছে দেওয়া। এ পয়গাম পৌছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ ফেরেশতাগণকে প্রহরী ও সংরক্ষকরূপে নিয়োজিত করেন। সব কিছুই তাঁর আবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা নূহে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। আর এ সূরায় জিনদের ঈমান আনয়নের কথা রয়েছে যে, তারা কুরআনে হাকীম শ্রবণ করে তার প্রতি ঈমান এনেছে, আর মানুষ বিশেষত মক্কার কাফেররা কুরআনে কারীমের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। আল্লামা সুয়ূতি (র.) লিখেছেন, আমি অনেক দিন যাবৎ দু' সূরার সম্পর্কের বিষয়টি চিন্তা করেছি। অবশেষে আমার নিকট যা প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো সূরা নূহে রয়েছে–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا .

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপ্রিয়। যদি তোমরা তাঁর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তবে তিনি আসমান থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। –[আয়াত : ১১]

আর সূরা আল-জিন্নে রয়েছে– وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا . অর্থাৎ যদি এ কাফেররা সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতাম। –[আয়াত : ১৬] –[নূরুল কোরআন]
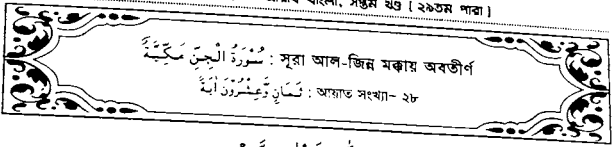
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ أُوْحِيَ اِلَيَّ أَخْبَرْتُ بِالْوَحْيِ مِنَ اللّٰهِ اَنَّهُ الضَّمِيْرُ لِلشَّانِ اسْتَمَعَ لِقِرَاءَتِيْ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ جِنُّ نَصِيْبِيْنَ وَذٰلِكَ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِبَطْنِ نَخْلَةَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَهُمُ الَّذِيْنَ ذُكِرُوْا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اَلْاٰيَةَ فَقَالُوْا لِقَوْمِهِمْ لَمَّا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ فِيْ فَصَاحَتِهِ وَغَزَارَةِ مَعَانِيْهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ .

১. বলুন হে মুহাম্মদ! মানুষকে উদ্দেশ্য করে আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দেওয়াও হয়েছে যে, এটা ضَمِيْر شَانِيَة শ্রবণ করেছে আমার কেরাত জিনদের মধ্য হতে একদল নসীবাইন নামক স্থানের জিনগণ উদ্দেশ্য। তা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী বাতনে নাখলা নামক স্থানে সংঘটিত ফজর নামাজের ঘটনা। আয়াত وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ (اَلْاٰيَة)-এর মধ্যেও এ সকল জিনের প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর তারা বলেছে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করার পর আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি যার ভাষাগত লালিত্য, অলংকারিত ও অর্থের ব্যাপকতা ইত্যাদি মানুষকে বিস্মিত করে।

২. يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ اَلْاِيْمَانِ وَالصَّوَابِ فَاٰمَنَّا بِهِ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بَعْدَ الْيَوْمِ بِرَبِّنَآ اَحَدًا .

২. যা সঠিক পথ নির্দেশ করে ঈমান ও ছওয়াবের প্রতি সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি এবং আমরা অংশীদার স্থির করবো না আজকের দিনের পর হতে আমাদের প্রতিপালকের সাথে অন্য কাউকেও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّهُ اسْتَمَعَ : বাক্যটি أُوْحِيَ -এর নায়েবে ফায়েল, اَنَّهُ -এর যমীর শান বা মর্যাদাজ্ঞাপক। عَجَبًا – কুরআন -এর সিফাত, মাসদার মুবালাগার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يَهْدِيْ – বাক্যটি قُرْاٰنًا -এর দ্বিতীয় সিফাত। অথবা তা হতে হাল, كَذِبًا – মাসদার হিসাবে মানসূব হয়েছে অথবা মাউসূলের সিফাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে জিনদের ঘটনা সম্পর্কে যে ওহী করেন তা তাঁর সাহাবীদের নিকট প্রকাশ করার নির্দেশ প্রদান করার ফায়েদা : আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন তিনি তাঁর সাহাবীদের নিকট জিনদের সম্পর্কে যে ওহী নাজিল করা হয়েছে তা প্রকাশ করে দেন। এ নির্দেশ প্রদানে যে ফায়েদা রয়েছে তা হলো :

১. সাহাবীরা যেন জানতে পারেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যেমন মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছেন– তেমনি তিনি জিনদের নিকটও প্রেরিত হয়েছেন।

২. মানুষ যেন জানতে পারে যে, তাদের মতো জিনেরাও মুকাল্লাফ, তারাও আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করতে আদিষ্ট।

৩. মানুষ যেন জানতে পারে যে, জিনেরা তাদের কথা শুনতে পায় এবং তাদের ভাষা বুঝতে পারে।

৪. কুরাইশদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, জিনেরা কুরআন শুনে তার মু'জিযা বুঝতে পেরেছে এবং ঈমান গ্রহণ করেছে। আর তোমরা তা বুঝতে পেরেও এখন পিছুটান কেন?

৫. এ কথা ও জানিয়ে দেওয়া যে, ঈমানদার জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে আহ্বান জানায়। –[কাবীর]

জিন-এর **পরিচয় :** আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মাঝে জিনও একটি। জিন দেহবিশিষ্ট এক প্রকার জীব। তাদের দেহের উপদানে অগ্নির প্রাধান্য বিদ্যমান, আর মানুষের দেহের উপাদানে বিদ্যমান মাটির প্রাধান্য। মানুষের মতো তাদেরও বিবেক, বুদ্ধি, অনুভূতি বিদ্যমান। মানুষের মতো নারী ও পুরুষে তারা বিভক্ত এবং তাদের বংশ বৃদ্ধিও হয়। তারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। মানুষের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে তাদের অবস্থান। জিন শব্দের অর্থ– লুক্কায়িত, গোপন থাকা। আর জিন আমাদের চোখের অন্তরালে থাকে বলে তাদের জিন বলা হয়। জিনদের মাঝে দুষ্ট প্রকৃতির যারা তাদের শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জিনদের অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কুফরি।

জিন সম্পর্কে মতভেদ : কারো কারো মতে জিনজাতি ইবলিসের সন্তানসন্ততি, যেভাবে মানুষ সকল হযরত আদম (আ.) -এর সন্তান إِنَّ الْجِنَّ وَلَدُ الْجَانِّ - وَالشَّيَاطِيْنَ وَلَدُ اِبْلِيْسَ يَمُوْتُوْنَ কারো মতে وَلٰكِنَّ الْمُتَمَرِّدَ مِنَ الْجِنِّ يُسَمّٰى شَيْطَانًا مَعَ اِبْلِيْسَ عِنْدَ النَّفْخَةِ . – তবে প্রথম অভিমতটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

আর যে জিনটি ঈমান আনয়ন করবে তখন তার পিতা হতে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে হযরত আদম (আ.)-এর সাথে ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুফরি করে থাকে তার সম্পর্ক হযরত আদম (আ.) হতে ছিন্ন হয়ে ইবলিসের সাথে কুফরির সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। –[সাবী]

তবে কেউ কেউ বলেন, ঈমানদার জিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে দোজখের আগুনেও নিক্ষিপ্ত হবে না; বরং বেহেশত ও দোজখের মাঝে থাকবে। তবে এ অভিমতটি خِلَافُ عَقْلٍ বলে ধারণা হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ .

বহুসংখ্যক মানব ও দানবকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করেছেন। সকলকে তো জাহান্নামী তৈরি করেছেন বলেননি। আর অন্যান্য আয়াতে যা বলা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, জিন ও ইনসান উভয় জাতির হিসাব-নিকাশ হবে। যদি বেহেশত ও দোজখের শাস্তি ও শান্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকত তবে হিসাব-নিকাশেরও আবশ্যকতা কি ছিল, অতএব জিনজাতির ঈমানদারগণ বেহেশতে প্রবেশ করাটাই হবে ইনসাফ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি জিনদের দেখেছিলেন না দেখেননি? : হযরত মুহাম্মদ ﷺ জিনদের দেখেছিলেন কিনা এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, তিনি তাদের দেখেননি। সূরা জিনের উপরিউক্ত আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় যে, তিনি তাদের দেখেননি। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখেছেন। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখেছেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিনদের একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতের ব্যাপারে এবং এ সূরার আয়াতের ব্যাপারে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রথম আগমনের কথা জানতে পারেননি এবং তাদেরকে দেখতে পাননি। তাদের আগমনের কথা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন এবং দীনের কথা শুনেছেন, যা বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। –[কাবীর, যিলাল]

ঈমানদার জিনদের জান্নাতে প্রবেশ সম্পর্কে মতপার্থক্য : জিনদের মাঝে যারা আল্লাহর অবাধ্য তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে যারা ঈমানদার তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কিনা সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করা হবে। দ্বিতীয় অভিমত হলো, তারা জান্নাতবাসী হবে। কেননা

বেহেশতি হুরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তাদেরকে কোনো মানুষ ও জিন স্পর্শ করেনি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতে জিনরাও প্রবেশ করবে। তা ছাড়া পাপী জিনদের যখন জাহান্নামে দেওয়া হবে তখন ঈমানদার জিনদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে এটাই আশা করা সঙ্গত এবং ইনসাফের দৃষ্টিতে এরূপ হওয়াই সমীচীন।

نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ – বলে জিনদের কোন দলের প্রতি ইশারা করা হয়েছে? : তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ -এর তাফসীর করেছেন جِنُّ نَصِيْبِيْنَ অর্থাৎ তারা নসীবাইন -এর অধিবাসী ছিল, আর তা ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম, [মায়ারেফ গ্রন্থকারের মতে তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৯ জন] আর ইয়েমেনের সে জিনগণ মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি স্থানে অর্থাৎ 'নাখলা' নামক জায়গায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ফজরের নামাজের সময় তেলাওয়াতকৃত কেরাত শ্রবণ করেছিল।

কুরআন মাজীদের ২৬ নং পারার সূরায়ে আহকাফেও এদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ .

قُرْاٰنًا عَجَبًا -এর মর্মার্থ : কালামে মাজীদে মূল শব্দটি হলো قُرْاٰنًا عَجَبًا-কুরআন অর্থ- পঠিতব্য বিষয়। আর عَجَبًا অর্থ- অতিশয় বিস্ময়কর। عَجَبٌ শব্দটি আধিক্যবোধক শব্দ। অর্থাৎ এটা দ্বারা গুণগত দিকটির আধিক্য, প্রাবল্য ও আতিশয্যতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়। সুতরাং এর মর্ম হবে পঠিতব্য বিষয়টি অতিশয় মনোমুগ্ধকর ও বিস্ময়কর। তা দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, জিনগণ তাকে তখন কুরআন ভেবে কুরআন বলেনি। কেননা সেটাই ছিল এ মহাকালামের সাথে তাদের প্রথম পরিচয়। এর পূর্বে এ মহান কালামের সাথে তাদের আদৌ কোনো পরিচিতি ছিল না; তারা একে আভিধানিক অর্থেই বুঝিয়েছে। আর এ বাক্যাংশ দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, জিন জাতি মানবজাতির ভাষা বুঝে থাকে। কেননা তারা কুরআনের অবিসংবাদিত আরবি ভাষা, তার বৈয়াকরণিক অলংকার মাধুর্যতা, ছন্দের ঝংকার ও ভাবের দ্যোতনাকে উপলব্ধি করেই বুঝেছিল যে, তা কোনো মানব রচিত কালাম নয়। এ কালাম অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই তাদের জন্য আসমানি সংবাদ সরবরাহ করার পথ বন্ধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ ...... بِرَبِّنَآ اَحَدًا : পবিত্র কালাম সম্পর্কে জিনগণ বলেছিল, তা এমন কালাম, যা নেককাজের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। অতএব, আমরা তার সত্যতা বুঝে তার উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আর আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে, আজ হতে কখনো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সাথে কাউকে শরিক করবো না।

উক্ত আয়াতটি কতগুলো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. জিনজাতিদের মধ্যেও মুসলমান অমুসলমান রয়েছে। অন্যথায় তারা ঈমান আনয়ন করার কোনো অর্থই থাকতে পারে না।

২. পবিত্র কুরআন মানুষকে সত্যই সঠিক পন্থার প্রতি আহ্বান করে, জিনজাতির ইসলাম গ্রহণের এ ঘটনাটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কারণ কারো প্ররোচনায় তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। কুরআনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

৩. মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যে নবী প্রেরণ করা হয়ে থাকে তাদের দ্বারাই জিনজাতি হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

৪. জিনজাতি আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা ও লালনপালনকারী রূপে বিশ্বাসী।

رُشْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : জালালাইন গ্রন্থকারের মতে رُشْدٌ দ্বারা এখানে طَرِيْقُ الصَّوَابِ এবং طَرِيْقُ الْاِيْمَانِ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মাদারেক গ্রন্থকার رُشْدٌ -এর তাফসীর করেছেন- يَدْعُوْا اِلَى الصَّوَابِ اَوْ اِلَى التَّوْحِيْدِ وَالْاِيْمَانِ অর্থাৎ কুরআনে এমন বাণী রয়েছে, যা সত্য পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, ঈমান ও আল্লাহর একত্ববাদের দিকে মানুষকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। শান্তির পথ সম্বন্ধে উপদেশ দান করে।

সূরা اَسْرٰى -এর আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا . - অপরাপর আয়াতেও বলা হয়েছে [অনুরূপভাবে]-

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ .

অনুবাদ :

٣. وَاَنَّهُ الضَّمِيْرُ لِلشَّانِ فِيْهِ وَفِيْ الْمَوْضَعَيْنِ بَعْدَهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا تَنَزَّهَ جَلَالُهُ وَ عَظْمَتُهُ عَمَّا نُسِبَ اِلَيْهِ مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً زَوْجَةً وَلَا وَلَدًا .

৩. আর নিশ্চয় এখানে এবং তার পরবর্তী দু'স্থানে ضَمِيْر গুলো ضَمِيْر شَانِيَة আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সুউচ্চ হয়েছে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সকল প্রকার অসঙ্গত কথাবার্তা হতে পূত-পবিত্র। তিনি গ্রহণ করেননি কোনো সঙ্গিনী স্ত্রী আর না কোনো সন্তান।

٤. وَاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا جَاهِلُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا غُلُوًّا فِى الْكِذْبِ بِوَصْفِهِ بِالصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ .

৪. আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধগণ বলত মূর্খগণ আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তা তাঁর প্রতি স্ত্রী-পুত্রের সম্পর্ক করে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত হতো।

٥. وَاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اَنَّهُ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِوَصْفِهِ بِذٰلِكَ حَتّٰى بَيَّنَا كِذْبُهُمْ بِذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى .

৫. অথচ আমরা ধারণা করতাম যে, اَنْ অব্যয়টি মুখাফফাফা, মূলত বক্তব্যটি ছিল اَنَّهُ মানুষ ও জিনজাতি আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা বলবে না এ ধরনের মিথ্যার সাথে তাঁকে বিশেষিত করবে না, যার অসত্যতা আমাদের বর্ণনা করতে হয়েছে।

٦. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ يَسْتَعِيْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ حِيْنَ يَنْزِلُوْنَ فِىْ سَفَرِهِمْ بِمَخُوْفٍ فَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ اَعُوْذُ بِسَيِّدِ هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ شَرِّ سُفَهَائِهِ فَزَادُوْهُمْ بِعَوْذِهِمْ بِهِمْ رَهَقًا طُغْيَانًا فَقَالُوْا سُدْنَا الْجِنَّ وَالْاِنْسَ .

৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর মানুষের মধ্য হতে কতিপয় লোক শরণাপন্ন হতো আশ্রয়প্রার্থী হতো জিনদের মধ্য হতে কতিপয়ের যখন তারা তাদের সফরকালীন সময় কোনো ভীতিপ্রদ স্থানে অবতরণ করত, তখন তারা প্রত্যেকে বলে উঠত اَعُوْذُ بِسَيِّدِ هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ شَرِّ سُفَهَائِهِ 'আমি এ স্থানের দলপতির আশ্রয় প্রার্থনা করছি এখানকার নিকৃষ্টদের অনিষ্ট হতে' তখন তারা তাদেরকে বৃদ্ধি করে দেয় তাদের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করে আত্মম্ভরিতা অহমিকা, ফলে তারা সদর্পে বলে বেড়াত, আমরা মানুষ ও জিনজাতির উপর নেতৃত্ব করেছি।

٧. وَاَنَّهُمْ اَىِ الْجِنُّ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ يَا اِنْسُ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اَنَّهُ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا بَعْدَ مَوْتِهِ .

৭. আর তারা জিনগণ ধারণা করেছে যেমন তোমরা ধারণা কর হে মানুষ সকল। যে, اَنْ অব্যয়টি মুখাফফাফা অর্থাৎ اَنَّهُ আল্লাহ কখনো কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না তার মৃত্যুর পর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رَهَقًا : শব্দটি زَادُوْا -এর মাফউল। وَجَدْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল। مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا বাক্যটি شَدِيْدًا সিফাত হয়েছে حَرَسًا -এর। فِى الْاَرْضِ হাল। فَلَا يَخَافُ الخ বাক্য জওয়াবে শর্ত فَمَنْ -এর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا : এখানে আল্লাহ তা'আলাকে পূর্বসূরি হওয়া হতে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে আমাদের প্রভুর শান এবং মহিমা সবার উর্ধ্বে এবং সবার উপরে, তিনি কখনো জায়া- পুত্র ধারণ করেন না। কারণ তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। জায়া-পুত্র, সন্তান-সন্ততি হওয়া থেকে তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, এগুলো উচ্চমর্যাদার পরিপন্থি।

উক্ত আয়াতে جَدُّ অর্থ হলো– তার মর্যাদা উচ্চতম, এখানে جَدُّ -এর ضَمِيْر টিকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার পরিবর্তে رَبّ -কে তার স্থলে নিয়ে তার উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। কেননা যিনি সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক তিনি সর্ব বিষয়েই মাখলুকাত হতে উচ্চমর্যাদার অধিকারী। –[মা'আরেফ, তাহের]

উক্ত আয়াত হতে দু'টি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে :

১. একটি এই যে, এ জিনেরা হয় খ্রিস্টানপন্থি জিন ছিল, অথবা এমন কোনো মতবাদে বিশ্বাসী ছিল, যাতে আল্লাহর স্ত্রী-পুত্র আছে বলে মনে করা হতো।

২. দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ তখন নামাজে সম্ভবত এমন একটা অংশ পাঠ করেছিলেন, যা শুনে তারা নিজেদের ধর্মমতকে ভুল বলে বুঝতে পেরেছিল, তখন তারা জানতে পারল যে, আল্লাহ উচ্চ ও মহান পবিত্র সত্তা, তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে মনে করা মারাত্মক ধরনের মূর্খতা ও চরম বেয়াদবি।

سَفِيْهٌ দ্বারা উদ্দেশ্য এবং তার অর্থ : سَفِيْهٌ অর্থ নির্বোধ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি বুঝায়। মূলশব্দ হলো سَفِيْهُنَا এটা এক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে, একটি দল বা গোষ্ঠী কিংবা একটি বাহিনীর ক্ষেত্রেও তা ব্যবহৃত হতে পারে। একজন অজ্ঞ-মূর্খ-বোকা লোক বুঝানোর উদ্দেশ্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকলে তখন তার অর্থ হবে ইবলীস শয়তান। আর একটি দল-গোষ্ঠী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে অর্থ হবে, একদল নির্বোধ জিন, যারা এ ধরনের বিবেকহীন কথাবার্তা বলত।

اَلنَّاصِبُ "كَذِبًا" :

كَذِبًا শব্দটির নসবদানকারী অব্যয় : كَذِبًا শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ হলো–

১. كَذِبًا শব্দটি একটি উহ্য মাসদারের সিফাত হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। মূলে ছিল–

اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ قَوْلًا كَذِبًا .

২. অথবা, كَذِبًا মানসূব হয়েছে মাফউলে মুতলাক হওয়ার কারণে।

একজন জিন সাহাবীর ঘটনা : আল্লামা ইবনে জাওযী 'সাফওয়াতুস সফওয়ান' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি কোনো এক সময় আদ সম্প্রদায়ের আবাসভূমিতে ভ্রমণে বের হলাম। পথ চলতে চলতে একটি শহর দেখতে পেলাম। এ শহরটিতে পাহাড় খোদাই করেই সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। সে শহরটি জনশূন্য কোথাও মানুষের আবাদ পরিলক্ষিত হয়নি। জিনগণ তথায় নিজেদের আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছে। আমি সে সুরম্য দালান-কোঠার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ একটি কামরায় অতিশয় বৃদ্ধ একটি লোক দেখতে পেলাম। সে কা'বার দিকে ফিরে নামাজরত রয়েছে। তার দেহের পোশাকটি অতি চমৎকার মনে হলো, যেন পোশাকটি নতুন, সবেমাত্র তৈরি করা হয়েছে। আমি তাকে সালাম করলাম, সেও সালামের জবাব দিল। অতঃপর সে আমাকে বলল, হে সাহল! দেহ কখনো পোশাককে পুরাতন করে না; বরং পাপাচারের দুর্গন্ধ এবং হারাম খাদ্যের ফলেই পোশাক পুরাতন হয়। এ পোশাকটি সাতশত বছর যাবৎ আমার দেহে শোভা পাচ্ছে। এ পোশাক পরিধান করেই আমি হযরত ঈসা (আ.) ও মহানবী মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাদের উভয়ের প্রতিই ঈমান এনে মুসলমান হয়েছি। এ কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি সে জিন, যাদের সম্পর্কে আল-কুরআনের ... قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ – আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[লোবাব, মা'আরেফুল কোরআন]

فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا বাক্যে رَهَقًا -এর অর্থ এবং زَادَ ফে'লের ফায়েল : رَهَقًا শব্দের অর্থ হলো গুনাহ, অহংকার, অহমিকা, দাম্ভিকতা, অবাধ্যতা। উক্ত আয়াতে তার মর্মার্থ হলো– তারা এসব করে তাদের গুনাহ-খাতা, পাপ ও অপরাধ আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। কেউ কেউ বলেন, এসব করে তাদের অহমিকা, দাম্ভিকতা, অহংকার আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। তারা যখন আমাদের নিকট এভাবে আশ্রয় চেয়েছে তখন আমার মতো আর কে আছে? زَادَ -এর ফায়েল সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। হযরত আতা (রা.) বলেন, زَادَ -এর ফায়েল হলো জিন। অন্য একটি অভিমত হলো, زَادَ -এর ফায়েল হলো– اِنْسَانٌ।

শানে নুযূল ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা : ইবনে মুনযির, আবূ হাতেম ও আবূ শায়খ প্রমুখ হতে বর্ণিত, ফরযম ইবনে আবূ সায়েব আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে কোনো এক বিশেষ প্রয়োজনে মদীনায় গিয়েছিলাম। এ সময়টি ছিল মহানবী ﷺ-এর নবীরূপে পরিচিতির প্রথম যুগ। পথে রাত্রি আমাদেরকে এক বকরি পালকের নিকট আশ্রয় দিল। রাতের কালো আঁধার যখন চতুর্দিক হতে নেমে আসল তখন একটি শৃগাল আক্রমণ করে একটি বকরি পাল হতে নিয়ে গেল। মেষপালক সাথে সাথে লাফিয়ে পড়ে বলল, হে উপত্যকার পরিচালক! আমি তোমার আশ্রয়াধীন প্রতিবেশী। আমার বকরি শৃগাল নিয়ে যাচ্ছে। তখন অদৃশ্য হতে কে যেন ডেকে বলতে লাগল, হে সরহান! সৈন্য পাঠিয়ে দাও। অতঃপর বকরিটি শৃগালের নিকট হতে ছিনিয়ে আনা হলো। বকরিটি স্বীয় পালে প্রবেশ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের নিকট মক্কায় উপরিউক্ত وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ ..... আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব, খাযেন, কাছীর]

দ্বিতীয় ঘটনা : ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত, বনী তামীম গোত্রের আবূ রেজায়া আল-আতুরদী (র.) বলেন, মহানবী ﷺ যখন নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেন, তখন আমি আমার পারিবারিক তত্ত্বাবধানে ছিলাম এবং আমিই এ কাজের জন্য যথেষ্ট ছিলাম। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর তাওহীদী আন্দোলন শুরু হলে আমরা পালিয়ে 'ফলাত' নামক স্থানে এসে আশ্রয় নিলাম এবং তথায় রাতের আঁধার নেমে আসলে আমাদের সঙ্গী বৃদ্ধজন বলল, আমরা এ উপত্যকার জিন সম্প্রদায়ের মহাপরিচালক ও সর্দারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা বললাম, বন, অরণ্য ও উপত্যকায় রাত যাপন করলে কি এরূপই বলতে হয়? আমাদের বলা হলো, তাহলে সে ব্যক্তির পথ, যে এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল। যে লোক তা পাঠ করে তার প্রাণ ও ধনসম্পদ নিরাপদ হয়। সুতরাং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং ইসলামে প্রবিষ্ট হলাম। হযরত আবূ রেজায়া বলেন, وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ ... আয়াত আমাদের ও আমাদের সঙ্গীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে কিনা তা আমরা জানি না। –[লোবাব, খাযেন, ইবনে কাছীর]

তৃতীয় ঘটনা : আল-খারায়েতী 'হাওয়াতিফুল জান' গ্রন্থে সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এ উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, বনী তামীম গোত্রের রাফে' ইবনে ওমায়ের তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে একথা বর্ণনা করেছেন। রাফে' বলেন, আমি কোনো এক রাতে আলেজ সম্প্রদায়ের বালুকাময় উপত্যকা দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। আমার চোখে নিদ্রা এসে পড়ল। সুতরাং আমি সওয়ারি হতে অবতরণ করে সওয়ারিটি বেঁধে ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশ্য নিদ্রার পূর্বে একথা বলেছিলাম যে, আমি এ উপত্যকার জিন অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুতরাং নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, এক লোকের হাতে একটি ধনুক; সে তা দ্বারা আমার উটকে জবাই করতে চায়। তা দেখে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিদ্রা হতে জাগলাম। আমি ডানে বামে লক্ষ্য করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম এটা আমার বায়ু রোগ। অতঃপর আমি নিদ্রা গেলাম। এবারও পূর্বানুরূপ স্বপ্ন দেখতে পেয়ে জাগলাম। দেখলাম আমার উটটি খুব বিব্রত ও অস্থির হয়ে পড়েছে। আর আমার স্বপ্নে দেখা লোকটির ন্যায় এক যুবককে দেখতে পেলাম, যার হাতে রয়েছে তীর ধনুক। এক বৃদ্ধ তাকে হাত দ্বারা উটটিকে জবাই করা হতে বিরত রাখছে। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। এ সময় তথায় তৃতীয় একটি বন্য গাভী দেখা গেল। তখন বৃদ্ধ লোকটি যুবকটিকে বলল, মানুষের উষ্ট্রের পরিবর্তে এটাকে মুক্তিপণরূপে নিয়ে যাও। যুবকটি বন্য গাভীটিকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। অতঃপর আমি বৃদ্ধ লোকটির দিকে তাকালাম। তখন বৃদ্ধ লোকটি আমাকে বলল, ওহে! যখন তুমি কোনো উপত্যকায় অবতরণ কর এবং সেখানে নিজেকে নিরাপদ মনে না কর, তখন তুমি এ কথা বলবে, আমি মুহাম্মদের প্রতিপালকের

নিকট এ উপত্যকার অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কখনো তুমি জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থী হবে না। এরূপ প্রার্থনা বাতিল হয়েছে। তখন আমি বললাম, মুহাম্মদ কে? তখন সে বলল, তিনি হলেন আরবের নবী। তাঁর নিকট পূর্ব-পশ্চিম বলতে কিছু নেই। তিনি সোমবার দিন নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি বললাম, তাঁর বাড়ি কোথায়? সে বলল, তিনি ইয়াসরিবে বাস করেন। আমি তৎক্ষণাৎ সওয়ারিতে আরোহণ করলাম। তখন প্রভাত ঘনিয়ে আসছিল। আমি সওয়ারিকে খুব দ্রুত পরিচালনা করে মদীনার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হলাম। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমার বলার পূর্বে পূর্বকার সংঘটিত ঘটনাটি আমার কাছে বলতে লাগলেন এবং আমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। সা'দ ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেন, আমরা মনে করি যে, আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ ...... رَهَقًا আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। –[লোবাব]

হযরত সাঈদ ইবনে জোবাইর (রা.) এ ঘটনাটি ব্যক্ত করে বলেন, আমার মতে এ ঘটনা প্রসঙ্গেই কুরআনের উক্ত আয়াত وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا নাজিল হয়েছে। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا: আর এটাও অস্বীকার করার মতো নয় যে, হে জিনজাতি! তোমরা যেভাবে ধারণা করেছিলে সেভাবে মানবজাতিও ধারণা পোষণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা একবার মৃত্যু দান করার পর পুনরায় কাউকেও জীবিত করতে সক্ষম হবেন না। এতে বুঝা যায় যে, জিনজাতিও بَعْث -কে অস্বীকার করত, অতঃপর ঈমান গ্রহণের পর তা বিশ্বাস করেছে। সুতরাং মানবজাতি কেন ঈমান গ্রহণ করে না এবং পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করে না। –[আশরাফ আলী থানবী (র.)]

كَمَا ظَنَنتُمْ দ্বারা মাদারিক গ্রন্থকারের মতে أَهْلَ مَكَّةَ-কে خِطَاب করা হয়েছে। আর أَنَّهُمْ-এর ضَمِير هُمْ টি দ্বারা জিনজাতিকে خِطَابْ করেছেন।

কাবীর গ্রন্থকার বলেন, এর দু'টি تَوْجِيه বা ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. ظَنَنتُمْ দ্বারা مُخَاطَبْ হলো قُرَيْش এবং

২. আয়াতটি যদি পূর্ববর্তী كَلَامْ-এর সাথে সম্পর্কিত করা হয় তখন إِنَّهُمْ-এর ضَمِيرْ এর مَرْجِعْ মানবজাতি হবে। আর ظَنَنتُمْ -এর خِطَابْ জিনজাতিকে উদ্দেশ্য করা হবে। –[কাবীর]

আবার কেউ কেউ উক্ত لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا-এর দু'টি তাফসীর করেন, তা হলো–

১. আল্লাহ তা'আলা কাউকেও রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।

২. আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না এবং প্রথমোক্ত তাফসীরকে এ কারণেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, অনেক ঈমানদার জিনেরাও নিজেদের জাতির জনতাকে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকেও নবীরূপে পাঠাবেন না বলে তোমাদের যে ধারণা ছিল তা ভুল ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল পাঠিয়েছেন বলেই ঊর্ধ্বজগতের দ্বারসমূহ আমাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ :

৮. قَالَ الْجِنُّ وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ رُمْنَا اِسْتِرَاقَ السَّمْعِ مِنْهَا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ شَدِيْدًا وَشُهُبًا نُجُوْمًا مُحْرِقَةً وَذٰلِكَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ .

৮. জিনেরা বলে, আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহের মনস্থ করেছি আমরা তথায় গোপনে কান পেতে শুনার সঙ্কল্প করেছি। তখন আমরা তাকে পরিপূর্ণ পেয়েছি ফেরেশতাগণের মধ্য হতে কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা তাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তৈরি তারকাপুঞ্জ। আর এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবির্ভূত হওয়ার পর।

৯. وَاَنَّا كُنَّا اَىْ قَبْلَ مَبْعَثِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط اَىْ نَسْتَمِعُ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا اَىْ اُرْصِدَ لَهٗ لِيُرْمٰى بِهٖ .

৯. আর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম অর্থাৎ আমরা গোপনে কান পেতে শুনতাম। আর বর্তমানে যে কান পেতে শুনার ইচ্ছা করে, সে তার প্রতি নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে তৈরি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ তার প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

১০. وَاَنَّا لَا نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بَعْدَ اِسْتِرَاقِ السَّمْعِ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا خَيْرًا .

১০. আর আমরা জানি না যে, অমঙ্গলই কি ইচ্ছা করা হয়েছে গোপনে কান পেতে শুনার পর জগদ্বাসীর জন্য, না, তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি মঙ্গলের ইচ্ছা করেছেন কল্যাণ।

১১. وَاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ بَعْدَ اِسْتِمَاعِ الْقُرْاٰنِ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ط اَىْ قَوْمٌ غَيْرُ صَالِحِيْنَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا فِرَقًا مُخْتَلِفِيْنَ مُسْلِمِيْنَ وَكَافِرِيْنَ .

১১. আর আমাদের মধ্যে কতেক সৎকর্মপরায়ণ কুরআন শ্রবণ করার পর এবং কতেক তার বিপরীত অর্থাৎ অসৎ কর্মপরায়ণ আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কেউ মুসলমান আর কেউ কাফের।

১২. وَاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اَنَّهٗ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا اَىْ لَا نَفُوْتُهٗ كَائِنِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَوْ هَارِبِيْنَ مِنْهَا اِلَى السَّمَاءِ .

১২. আর আমরা ধারণা করেছি যে, ان অব্যয়টি মুখাফ্‌ফাফা অর্থাৎ انه আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবো না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না। অর্থাৎ আল্লাহ হতে অব্যাহতি লাভ করে দুনিয়াতে কিংবা পলায়ন করে আকাশে আমরা তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবো না।

১৩. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى الْقُرْاٰنَ اٰمَنَّا بِهٖ ط فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بِتَقْدِيْرِ هُوَ بَعْدَ الْفَاءِ بَخْسًا نَقْصًا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَلَا رَهَقًا ظُلْمًا بِالزِّيَادَةِ فِىْ سَيِّئَاتِهٖ .

১৩. আর আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শ্রবণ করলাম কুরআন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অনন্তর যে তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, তবে সে ভয় করবে না এখানে ما -এর পরে هو সর্বনাম উহ্য রয়েছে কোনোরূপ ক্ষতি তার পুণ্যের স্বল্পতার আশঙ্কা এবং কোনো অন্যায়ের তার পাপ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অত্যাচারিত হওয়া।

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّا لَا نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ ..... وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا : জিনজাতি বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা জগৎবাসীদের সাথে কি ভালো উদ্দেশ্য করেছেন না মন্দ উদ্দেশ্য করেছে, তা আমরা জানি না। এ কথা বলার একটি কারণ এও হতে পারে যে, তারা গায়েবী খবর গণকদের নিকট পৌঁছিয়ে যে দুষ্কৃতি কাজ করত তাদের সে সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এতে তারা [বলা বাহুল্য] সম্ভবত এ কথাও বুঝাতে চেয়েছে যে, তারা আসমান হতে গুপ্তভাবে খবর এনে মানুষদের উপকার করতে পারবে না। আসলে তারা যে কতটুকু উপকার করেছে তা কারো অজানা নয়। যারা নিজেই জাহান্নামী হয়েছে তারা অন্যের উপকার সাধনের চিন্তা করার কথা শুনলেও হাসি পাবে। মা'আরিফ গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, রাসূলদের আগমন ঘটবে কিনা তা তো জানা নেই। কেননা রাসূলদের অনুসরণ দ্বারা হেদায়েত পাওয়া যায়। আর তাঁদের বিরোধিতার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি নসীব হয়। আর তাঁদের আগমন হওয়ার পর মানুষ কি তাঁদের অনুসরণ করবে– না বিরোধিতা করবে, এ সম্পর্কেও তো জানা নেই। এ কারণেই তারা বলেছিল যে, ভবিষ্যতে আল্লাহ মানবজাতিকে ধ্বংস করবেন, না হেদায়েত করবেন।

আর এ তাফসীর এ জন্য করা হয়েছে যে, জিন্নাতগণের স্বীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে অভিমত রয়েছে যে, ঈমানদারের সংখ্যা খুবই কম হবে, আর বাকিসকল শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আর نَفِىْ عِلْم বুঝানোর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রসার হয়ে গেছে, তা হলো, জিনগণ عِلْم غَيْب সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলে কারো কারো ধারণা রয়েছে। এ আয়াতের তাৎপর্য হতে তা মিথ্যা প্রতিফলিত হয়েছে। যদি জিনগণ عِلْم غَيْب সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতো তাহলে لَا نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ الخ এটা বলত না।

اَشَرٌّ اُرِيْدَ-এর قَائِلْ কে? : কারো কারো মতে এ বাক্যটির قَائِلْ হলো مَلْعُوْنْ اِبْلِيْس আর কেউ কেউ বলেন, জিন্নাতগণের মধ্যে যে কোনো একজন বলেছেন। আর এ বাক্যটি হুযূর ﷺ -এর قُرْاٰنْ تِلَاوَتْ শ্রবণ করার পূর্বেকার সময়ে বলেছিল।

قَوْلُهُ اَلشَّرُّ وَالرُّشْدُ : رَشَدًا দ্বারা এখানে ঈমান আনয়নের প্রতি এবং شَرٌ দ্বারা কুফরি করার প্রতি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর জিনদেরকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ মারার কারণ কারো কারো মতে একমাত্র সাজা দান করার উদ্দেশ্যেই হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَاَنَّا مِنَّا ...... طَرَائِقَ قِدَدًا : উল্লিখিত আয়াতে জিনদের কথা বলা হয়েছে। তারা বলে যে, তদের মাঝে কিছু সংখ্যক সদাচারী ও নেক লোক রয়েছে, আর কিছু লোক তাদের তুলনায় হীন বদকার রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন পন্থায় বিভক্ত হয়ে আছে এ আয়াত এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, তাদের মাঝে নেক ও বদকার লোক রয়েছে। সুদ্দী (র.) বলেন, তাদের মাঝে কাদরিয়া, মুরজিয়া, খাওয়ারেজও রয়েছে। আমাদের মতো তাদের মাঝেও বিভিন্ন দল ও উপদল রয়েছে।

অনুবাদ :

١٤. وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ط الْجَائِرُوْنَ بِكُفْرِهِمْ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا قَصَدُوْا هِدَايَةً ـ

১৪. আর আমাদের মধ্যে কতেক আত্মসমর্পণকারী মুসলিম এবং আমাদের মধ্যে কতেক সীমালঙ্ঘনকারী - তাদের কুফরির কারণে অত্যাচারী। অনন্তর যে আত্মসমর্পণ করে, সে সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়। হেদায়েতের সংকল্প করে।

١٥. وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وُقُوْدًا وَ اَنَّا وَاَنَّهُمْ وَاَنَّهٗ فِىْ اِثْنَىْ عَشَرَ مَوْضِعًا هِىَ وَاَنَّهٗ تَعَالٰى اِلٰى قَوْلِهٖ وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ اِسْتِيْنَافًا وَبِفَتْحِهَا بِمَا يُوَجَّهُ بِهٖ قَالَ تَعَالٰى فِىْ كُفَّارِ مَكَّةَ ـ

১৫. বস্তুত সীমালঙ্ঘনকারীগণ তো জাহান্নামেরই কাঠ-খড়ি ইন্ধন। اَنَّهٗ تَعَالٰى এ সকল শব্দ اَنَّهٗ - اَنَّهُمْ - اَنَّا হতে وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ পর্যন্ত বারো স্থানে হামযার মধ্যে যের যোগে مُسْتَانِفَةٌ রূপে এবং হামযার মধ্যে যবর যোগে ব্যাখ্যা দানকারী রূপে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসী কাফিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন।

١٦. وَاَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ وَاَنَّهُمْ وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى اَنَّهُ اسْتَمَعَ لَوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ اَىْ طَرِيْقَةِ الْاِسْلَامِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَاءً غَدَقًا كَثِيْرًا مِّنَ السَّمَاءِ وَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا رُفِعَ الْمَطَرُ عَنْهُمْ سَبْعَ سِنِيْنَ ـ

১৬. আর এটা যে, اَنْ অব্যয়টি ছাকীলা হতে মুখাফ্ফাফা। তার ইসম উহ্য অর্থাৎ وَاَنَّهُمْ আর এটা পূর্বোক্ত عَطْفٌ -اِنَّهُ اسْتَمَعَ এর প্রতি যদি তারা সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত অর্থাৎ ইসলামের পথে তবে আমি তাদেরকে প্রচুর বারিবর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম প্রচুর বৃষ্টিপাত করত দীর্ঘ সাত বছর অনাবৃষ্টির পর।

١٧. لِنَفْتِنَهُمْ لِنَخْتَبِرَهُمْ فِيْهِ ط فَنَعْلَمَ كَيْفَ شُكْرُهُمْ عِلْمَ ظُهُوْرٍ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ الْقُرْاٰنِ نَسْلُكْهُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ نُدْخِلْهُ عَذَابًا صَعَدًا شَاقًّا ـ

১৭. যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম তাদেরকে যাঁচাই করতাম। তা দ্বারা খোলাখুলিভাবে জানতে পারতাম যে, তাদের কৃতজ্ঞতা কিরূপ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ কুরআন হতে বিমুখ হয়, আমি তাকে প্রবিষ্ট করবো শব্দটি ن ও ى যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। দুঃসহ শাস্তির মধ্যে কষ্টকর।

١٨. وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ مَوَاضِعَ الصَّلٰوةِ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا فِيْهَا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا بِاَنْ تُشْرِكُوْا كَمَا كَانَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى اِذَا دَخَلُوْا كَنَائِسَهُمْ وَبِيَعَهُمْ اَشْرَكُوْا ـ

১৮. আর মসজিদসমূহ সালাতের স্থানসমূহ আল্লাহরই জন্য, সুতরাং তোমরা আহ্বান করো না তাথায় আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও অংশী স্থির করত যেমন ইহুদি-খ্রিস্টানগণ নিজেদের মঠ ও গীর্জাসমূহে প্রবেশ করে শিরক করত।

١٩. وَأَنَّهُ بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ اِسْتِيْنَافًا وَالضَّمِيْرُ لِلشَّانِ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْهُ يَعْبُدُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ كَادُوْا اَيِ الْجِنُّ الْمُسْتَمِعُوْنَ لِقِرَاءَتِهِ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا بِكَسْرِ اللَّامِ وَضَمِّهَا جَمْعُ لِبْدَةٍ كَاللِّبَدِ فِيْ رُكُوْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا اِزْدِحَامًا حِرْصًا عَلٰى سِمَاعِ الْقُرْاٰنِ.

১৯. আর এই যে اَنَّ অব্যয়টি হামযার মধ্যে যের ও যবর যোগে جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ আর যমীরটি ضَمِيْر شَانِيَهٌ যখন আল্লাহর বান্দা দণ্ডায়মান হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে আহ্বান করতে বাতনে নাখল্ নামক স্থানে ইবাদত করতে দাঁড়িয়েছে তখন লোকেরা অর্থাৎ জিনেরা তাঁর কেরাত শ্রবণ করার জন্য তার নিকট ভিড় জমিয়েছে لِبَدًا শব্দটি ل -এর মধ্যে যের যোগে ও পেশ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। এটা لِبْدَةٌ -এর বহুবচন, কুরআন শ্রবণ করার আগ্রহে একে অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হতে থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاَنْ لَوِ اسْتَقَامُوْا : বাক্যটি আতফ করা হয়েছে اَنَّهُ اسْتَمَعَ الخ বাক্যের উপর। اَنْ ছাকীলা হতে মুখাফফাফা। اَنْ-এর ইসেম যমীরে শান উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اَنَّهُ শর্ত ও জাযা মিলিত হয়ে খবরে اَنْ - يَسْلُكْهُ শর্তের জাওয়াব হিসাবে জযম বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ مَنْ يُعْرِضْ يَسْلُكْهُ - صَعَدًا শব্দটি عَذَابًا -এর সিফাত, সিফাত ও মাওসূফ মিলিত হয়ে يَسْلُكْ -এর মাফউল।

قَوْلُهُ وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ : বাক্যটি اَنَّهُ اسْتَمَعَ বাক্যের উপর আতফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ .... لِجَهَنَّمَ حَطَبًا : এটাও জিনজাতির বক্তব্য, [আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করে বলেন] তারা বলে, আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর ভয় এবং কুরআনের অনুপ্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর কিছু সংখ্যক লোক পূর্বনীতি অনুযায়ী আল্লাহর নাফরমানি করে নিজেদের উপর অত্যাচারী হয়ে গেছে। সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনমিত করে দিয়েছে। তারাই নিজেদের পরকালের নাজাতের ফয়সালা করে নিয়েছে, আর কাফেরদের সেদিন দোজখের আগুনে প্রজ্বলিত করা হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ الخ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে اَلْقَاسِطُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা হক থেকে দূরে সরে যায়।

* হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ হলো জালেম।

* ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্যায়কারীগণ।

* ইমাম তাবারী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত রয়েছে।

* ইমাম রাযী (র.) قَاسِطُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন এর অর্থ اَلْكَافِرُوْنَ তথা যারা কাফের, যারা সত্য পথ হতে দূরে গেছে আর যারা জালেম। -[নূরুল কোরআন]

জিনেরা আগুনের তৈরি সুতরাং তারা কিভাবে জাহান্নামের ইন্ধন হবে? : উল্লিখিত ১৫ নং আয়াতের মর্ম দ্বারা স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, জিনজাতি আগুনের তৈরি। সুতরাং তাদেরকে আগুনে ফেলে শাস্তি দানের মধ্যে কি অর্থ থাকতে পারে। এ জিজ্ঞাসার জওয়াব হলো, মানুষ মাটি দ্বারা তৈরি; কিন্তু যখন মানুষের উপর একটি শক্ত মাটির ঢিল ছোড়া হয়, তখনই সে আঘাত অনুভব করে। এর কারণ হলো যে, মানুষ মাটির উপাদান দ্বারা রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা ইত্যাদির সমন্বয় একটি দেহ-অবয়বে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সুতরাং সে দেহের উপরই মাটি দ্বারা আঘাত হানার ফলে সে ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করেছে। বস্তুত মানুষ যে বস্তু দ্বারা সৃষ্টি সে বস্তুর আঘাতেই যে কষ্ট পাওয়া একটি বৈজ্ঞানিক সত্য বিষয়। অনুরূপ জিনজাতিও আগুন দ্বারা সৃষ্টি হয়ে যখন একটি দেহ অবয়ব লাভ করে একটি চেতনাসম্পন্ন অস্তিত্বময় প্রাণী হবে তখন সে আগুনই তার জন্য কষ্টদায়ক ও উৎপীড়ক হওয়া সম্ভবপর। উপরন্তু সাধারণ আগুনের তুলনায় জাহান্নামের আগুনের তেজক্রিয়া হবে সত্তরগুণ বেশি। অতএব, তা দ্বারাও বুঝা যায় যে, জিনদেরকে জাহান্নামে ফেলে কষ্ট প্রদান একটি অর্থবহ শাস্তি। –[কাবীর]

اِسْتَقَامُوْا-এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল : اِسْتَقَامُوْا -এর যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থল সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। এক. জিনদের দিকে, যাদের সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সীমালঙ্ঘনকারীরা যদি ঈমান গ্রহণ করত, তাহলে আমি তাদের জন্য অমুক অমুক কাজ করতাম। দুই. اِسْتَقَامُوْا -এর যমীর মানুষের দিকে প্রত্যাবর্তিত। এ মতের অনুসারীরা নিজেদের পক্ষে দু'টি দলিল পেশ করেন।

ক. পানির প্রাচুর্য ও পানি পান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা চলে মানুষকে–জিনকে নয়।

খ. মক্কার কাফেরদের নিকট বেশ কয়েকটি বছর পানি বর্ষণ বন্ধ থাকার পর এ আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। এতটুকু বলা যেতে পারে যে, পূর্বে মানুষের উল্লেখ নেই; কিন্তু যেহেতু এ ব্যাপারটি সকলের জানা। তখন তা উল্লেখ করার তেমন প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا ..... مَاءً غَدَقًا : উল্লিখিত আয়াতটি হতে মহানবী ﷺ -এর মুখে আল্লাহ তা'আলার ভাষণ শুরু হয়েছে। মুকাতিল (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর বদদোয়ায় আল্লাহ তা'আলা সাত বছর যাবৎ মক্কার কাফেরদের জন্য বৃষ্টির পানি বন্ধ করে যখন দেশময় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন [লোবাব]। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মক্কার জনগণ যদি আমার দীনের উপর দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং তা হতে বিমুখ হয়ে বিরোধিতা না করত, তবে আমি তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আকাশ হতে বৃষ্টির পানি বর্ষণ করতাম। ফলে দেশময় সবুজের মহা সমারোহ দেখা দিত, ফুলে ফলে সুশোভিত হতো দেশের খামারগুলো এবং জীবকুল ও মানবকুলের জন্য শস্যভাণ্ডার গড়ে উঠত এবং তা দ্বারা তাদের যাবতীয় অভাব পূরণ হয়ে যেত। পানিই হচ্ছে জীবকুল ও মানবকুলের বেঁচে থাকার মূল উপাদান, পানির দ্বারাই জীবকুল ও মানবকুলের খাদ্য ভাণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং তার উপর নির্ভরশীল হয় কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা। তার অভাবে সবকিছুই বিকল ও অচল হয়ে যায়। এ হিসাবেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি তাদেরকে স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের পানি পান করাতাম এবং এটাই তাঁর কথার আসল মর্ম।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ .... اللّٰهِ اَحَدًا" : এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। হযরত কাতাদা (রা.) বলেছেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদের ইবাদতখানায় প্রবেশ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করত। তাই তাদেরকে এ কাজ হতে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, তোমরা আল্লাহকে সিজদা করার স্থানে প্রবেশ করে তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না। দ্বিতীয় অভিমত হলো, উক্ত আয়াতে مَسَاجِدُ দ্বারা হাত, পা, কপাল, নাসিকা ও হাঁটু এ সাত অঙ্গকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে সাত অঙ্গ দ্বারা সিজদা করে থাক। সুতরাং এ সাত অঙ্গকে গায়রুল্লাহর সিজদা করার কাজে ব্যবহার করো না এবং আল্লাহর সাথে শরিক করে তাদেরকেও ডেকো না। তৃতীয় অভিমত হলো, মাসাজিদ দ্বারা এখানে সমগ্র দুনিয়াকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম হাসান বসরীসহ অনেক ওলামায়ে কেরাম এর প্রবক্তা। সুতরাং এ অভিমত অনুসারে আয়াতের মর্ম হবে, গোটা দুনিয়াটাই আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করার স্থান। সুতরাং তাঁর এ সিজদা করার স্থানে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরিক করে ডেকো না। এ অভিমতের প্রমাণে যে হাদীসটি পেশ করা হয় তা

হচ্ছে-মহানবী ﷺ বলেছেন, আমার জন্য গোটা দুনিয়াটাকে ইবাদতের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে। বস্তুত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয় যে, গোটা দুনিয়াটাই আল্লাহর মসজিদ স্বরূপ। অতএব, হে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর এই মসজিদকে তোমরা শিরকের দুর্গন্ধ হতে পবিত্র রাখো– এটাই আয়াতের মূল মর্ম।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহর ওহীসমূহের মধ্য হতে একটি এই যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি বলে দিন, মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্যই নির্মিত হয়েছে, সুতরাং মানবজাতির অথবা জিনজাতির মধ্যে কেউ যেন তথায় আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকেও স্মরণ না করে। যেমন ইহুদি ও নাসারাগণ করে থাকে।

উক্ত আয়াতে مَسَاجِدُ বলে কোন প্রকারের মসজিদের কথা বলা হয়েছে, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

১. মাদারিক গ্রন্থে বলা হয়েছে নামাজের জন্য (اَلْبُيُوْتُ الْمُبْنِيَّةُ لِلصَّلٰوةِ) তৈরিকৃত ঘরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব, পাঞ্জেগানা ও জুমা মসজিদ এবং সর্ব প্রকারের নামাজের ঘর আয়াতের হুকুমের শামিল হবে।

২. কারো কারো মতে مَوَاضِعُ الصَّلٰوةِ তথা নামাজের স্থান উদ্দেশ্য।

৩. অথবা مَسَاجِدُ বলে মক্কার হারাম শরীফ ও বাইতুল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।

৪. আর مَسَاجِدُ اللّٰهِ বলে সমগ্র বিশ্বকেও উদ্দেশ্য করা যেতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ الخ : আর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর خَاصّ বান্দা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন আল্লাহর ইবাদত করার জন্য দণ্ডায়মান হয়ে যান; তখন এ কাফেরের দল এই বান্দার উপর ভিড় জমাতে শুরু করে। অর্থাৎ আশ্চর্যান্বিত ও শত্রুতা পোষণ করে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার দিকে তাকাতে থাকে, মনে হয় যেন তারা তাকে হামলা করবে।

قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ বলে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর حَجُوْنْ নামক স্থানের ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে এবং সে সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)ও সঙ্গে ছিলেন। আর জিনের সংখ্যা সে সময় বারো হাজার ছিল, অন্য মতে ৭০ হাজার ছিল, এরা সকলেই হুযূর ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন, اِنْشِقَاقُ الْقَمَرِ -এর সময় তারা بَيْعَتْ গ্রহণ থেকে অবসর হন।

এতে বুঝা যায় যে, হুযূর ﷺ -এর নিকট জিনগণ একবার نَخْل এবং আবার حَجُوْن স্থানে বায়'আত بَيْعَتْ নিয়েছিল। আর نَخْل -এর স্থানে ৭/৯ জন জিন বায়'আত হলো, আর حَجُوْنْ -এর স্থানে ১২,০০০ অথবা ৭০,০০০ সত্তর হাজার জিন বায়'আত হয়েছে।

২০. قَالَ مُجِيْبًا لِلْكُفَّارِ فِىْ قَوْلِهِمْ اِرْجِعْ عَمَّا اَنْتَ فِيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ اِلٰهًا وَّلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ـ

২১. قُلْ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا غَيًّا وَّلَا رَشَدًا خَيْرًا ـ

২২. قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهٖ اِنْ عَصَيْتُهٗ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ مُلْتَحَدًا مُلْتَجَأً ـ

২৩. اِلَّا بَلٰغًا اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَفْعُوْلِ اَمْلِكُ اَىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ اِلَّا الْبَلَاغَ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ اَىْ عَنْهُ وَرِسٰلٰتِهٖ ط عَطْفٌ عَلٰى بَلَاغًا وَمَا بَيْنَ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ وَالْاِسْتِثْنَاءُ اِعْتِرَاضٌ لِتَاكِيْدِ نَفْىِ الْاِسْتِطَاعَةِ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فِى التَّوْحِيْدِ فَلَمْ يُؤْمِنْ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ مَنْ فِىْ لَهٗ رِعَايَةً لِمَعْنَاهَا وَهِىَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ وَالْمَعْنٰى يَدْخُلُوْنَهَا مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَآ اَبَدًا ـ

অনুবাদ :

২০. বললেন কাফেরদের এ উক্তির প্রত্যুত্তরে যে, আপনি স্বীয় ব্রত পরিত্যাগ করুন। অপর এক কেরাতে শব্দটি قُلْ পঠিত হয়েছে। আমি তো আমার প্রতিপালককেই আহ্বান করি উপাস্যরূপে এবং আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করি না।

২১. বলুন, আমি তোমাদের অনিষ্টের মালিক নই ক্ষতি আর না ইষ্টের কল্যাণের।

২২. বলুন, আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ হতে তাঁর শাস্তি হতে, যদি আমি তাঁর অবাধ্যাচরণ করি কেউই, আর আমি তিনি ভিন্ন অর্থাৎ তাঁর অপর কোনো আশ্রয়ও পাব না আশ্রয়স্থল।

২৩. কেবলমাত্র পৌছানো এটা পূর্বোক্ত اَمْلِكُ ক্রিয়ার مَفْعُوْل হতে اِسْتِثْنَاءٌ অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য কিছুরই মালিক নই কেবলমাত্র তোমাদের প্রতি পৌছানো আমার দায়িত্ব আল্লাহর নিকট হতে অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে এবং তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করা এটা بَلَاغًا -এর প্রতি عَطْف আর مُسْتَثْنٰى ও مِنْهُ -এর মধ্যবর্তী বাক্যটি اِسْتِثْنَاءٌ جُمْلَهْ مُعْتَرِضَةٌ যা সামর্থ্য অস্বীকারের প্রতি তাকিদ বিশেষ। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে তাওহীদ প্রসঙ্গে অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করে না। তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, তারা প্রবিষ্ট হবে এটা لَهٗ -এর যমীর হতে حَالٌ যার مَرْجِعْ পূর্বোক্ত مَنْ অর্থের বিবেচনায়। আর তা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ يَدْخُلُوْنَهَا مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ সেথায় স্থায়ীভাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِلَّا بَلٰغًا : শব্দটি اَمْلِكُ মাফউল হতে ইস্তিছনা অর্থাৎ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ اِلَّا بَلَاغَ اِلَيْكُمْ আর وَرِسَالَاتِهٖ শব্দটি بَلَاغًا -এর উপর আতফ হয়েছে। মুসতাছনা এবং মুসতাছনা মিনহু -এর মধ্যে সামর্থ্যে অস্বীকৃতি জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবধান করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ : হাল হয়েছে مَنْ -এর যমীর হতে اَبَدًا তাকিদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলেন, হে নবী! আপনি এই দুরাত্মাদের বলুন যে, আমি তোমাদের কি করেছি: আমি তো তোমাদের মন্দ কিছুই করিনি, অকল্যাণ করিনি, কোনো অন্যায় বা যুক্তি বিরুদ্ধ কথাও বলিনি। তবুও কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপে আছ! আমি তো শুধু এ ঘোষণাই করছি যে, আমি একমাত্র আমার লা শরীক আল্লাহকেই ডাকি। এতে এমন শত্রুতার কি রয়েছে; তবুও তোমরা সকলে একজোট হয়ে যদি আমার বিরোধিতা কর এবং শত্রুতা পোষণ কর তবে তোমরা আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আমি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা করে আছি।

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا .... مُلْتَحَدًا : অর্থাৎ আল্লাহর সাম্রাজ্যে আমার কোনো কর্তৃত্ব আছে, অথবা লোকদের ভাগ্য রচনায় আমার কোনো ক্ষমতা আছে বলে আমি কখনো দাবি করি না। আমি একজন রাসূল মাত্র, রাসূলদের এমন কিছু বলার বা করার ক্ষমতা নেই। এসব আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ ক্ষমতা তাঁরই হস্তে নিহিত, বরং জেনে নিবে خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى আর আমার নিজের লাভ-লোকসান সম্পর্কেও আমার কিছু করার নেই। অন্যের লাভ-লোকসান সম্পর্কে বলা তো বহুদূরের কথা, আমি নিজেও যদি তাঁর নাফরমানি করি তবে তিনি আমাকেও ছাড়বেন না। আর তিনি ব্যতীত কারো দরবারে রক্ষা পাওয়ারও কোনো উপায় নেই।

অথবা, এ আয়াতটি কাফেরদের উক্তি اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ -এর জবাব স্বরূপ হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকারক ।ضَرًّا শব্দের অর্থ করেছেন غَيًّا অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা তখন مُسَبَّبْ বলে سَبَبْ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। কেননা ضَرَرْ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো পথভ্রষ্টতা, তখন তা مَجَازْ مُرْسَلْ হবে।

আর رَشَدًا -কে خَيْرًا বলে তাফসীর করেছেন এবং তা দ্বারা هِدَايَةٌ ও উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। কারণ হেদায়েত خَيْر -এর পথেই রয়েছে। হুযূর ﷺ বলেন, مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ আল্লাহ যার জন্য ভালো কামনা করেন তাকেই ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। আর ধর্মীয় জ্ঞান তখনই অর্জন সম্ভব হবে যখন هِدَايَةٌ প্রাপ্ত হবে।

وَهٰذَا اَيْضًا دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ بَلِ اللّٰهُ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ .

قَوْلُهُ تَعَالَى اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ ...... فِيْهَآ اَبَدًا : আর আপনি বলুন; বরং আল্লাহর পয়গামগুলো তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বা দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আর আমি তোমাদেরকে এটাও শুনিয়ে দেই যে, যে কেউই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথা না মানবে, তবে তার জন্য দোজখের অগ্নি তৈরি রয়েছে। এমন লোকগুলো চিরজীবন দোজখে জ্বলতে থাকবে।

رِسَالَاتٌ শব্দটিকে جَمْع ব্যবহার করার কারণ : رِسَالَاتٌ শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করেন, মূলত রিসালত একটি বিষয় সম্পর্কে দান করা হয়নি; বরং বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান সম্বলিত একটি গ্রন্থকে رِسَالَاتٌ বলা হয়েছে। সুতরাং رِسَالَتٌ -এর اَجْزَاء ، مُتَفَرِّقَةٌ -এর লক্ষ্যে সম্ভবত رِسَالَاتٌ -কে বহুবচন করা হয়েছে। আর যদি সব আহকামগুলোর সমষ্টিকে এক উদ্দেশ্য বলা হয়, তখন رِسَالَتٌ একবচন ব্যবহার করা শুদ্ধ হবে। অতএব, رِسَالَاتٌ বহুবচন বা একবচন ব্যবহার করা একই কথা।

উক্ত আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কোনো গুনাহগার ব্যক্তি চির জাহান্নামী হবে। সুতরাং এর তাৎপর্য কি? : এর তাৎপর্য এই যে, আয়াতে مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ দ্বারা مُؤْمِنْ عَاصِىْ উদ্দেশ্য নয়; বরং عاصى كافر উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নতুবা مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ হাদীসটির তাৎপর্য বহাল থাকবে না।

আর ظاهرى وباطنى ভাবে যারা কাফের তারা চির জাহান্নামী হবে। কারণ এ সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ . وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَغَيْرُهُ .

আর مُؤْمِنْ عَاصِىْ সম্পর্কে সারকথা হলো, তারা নাফরমানির পরিমাণ অনুপাতে দোজখে প্রবেশ করে শাস্তি ভোগ করবে, অতঃপর বেহেশতে প্রবেশ করবে।

যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করলেই কি চিরদিন জাহান্নামে জ্বলবে? : প্রত্যেকটি গুনাহ ও প্রত্যেকটি নাফরমানির শাস্তিই চিরন্তন জাহান্নাম নয় এবং যে কোনো গুনাহ করলেই জাহান্নামে চিরদিন জ্বলতে হবে না; বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট হতে তাওহীদের যে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি তা মানবে না এবং শিরক হতে বিরত থাকবে না, তার জন্যই রয়েছে চিরকালীন জাহান্নাম। –[কাবীর]

অনুবাদ :

٢٤. حَتّٰى إِذَآ رَأَوْا حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ فِيْهَا مَعْنَى الْغَايَةِ لِمُقَدَّرٍ قَبْلَهَا اَىْ لَايَزَالُوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ اِلٰى اَنْ يَّرَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ فَسَيَعْلَمُوْنَ عِنْدَ حُلُوْلِهِ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ اَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَاَقَلُّ عَدَدًا اَعْوَانًا اَهُمْ اَمِ الْمُؤْمِنُوْنَ عَلَى الْقَوْلِ الْاَوَّلِ اَوْ اَنَا اَمْ هُمْ عَلَى الثَّانِىْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ فَنَزَلَ.

২৪. যাবৎ তারা দেখবে এখানে حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ যাতে غَايَتْ-এর অর্থ অন্তর্নিহিত আছে যা তৎপূর্বে উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لَا يَزَالُوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ اِلٰى اَنْ يَّرَوْا তারা তাদের কুফরি আচরণে দেখা পর্যন্ত অবিচল থাকবে। যা তাদের সাথে প্রতিশ্রুত হয়েছে শাস্তির মধ্য হতে তখন অচিরেই তারা উপলব্ধি করতে পারবে উক্ত শাস্তি তাদের প্রতি আপতিত হওয়ার সময় বদর যুদ্ধের দিন অথবা কিয়ামতের দিন। যে, কে সাহায্যকারী হিসাবে দুর্বল এবং সংখ্যা হিসাবে নগণ্য সাহায্যকারী তারা না, মু'মিনগণ? প্রথম অভিমতের প্রেক্ষিতে। আর দ্বিতীয় অভিমতের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে, আমি– না তারা? এতদ শ্রবণের পর তাদের কেউ কেউ বলল, এই প্রতিশ্রুতি কখন আগত হবে? তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٢٥. قُلْ اِنْ اَىْ مَا اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا غَايَةً وَاَجَلًا لَا يَعْلَمُهٗ اِلَّا هُوَ.

২৫. বলুন, আমি জানি না اِنْ অব্যয়টি مَا অর্থে ব্যবহৃত তোমাদের উদ্দেশ্যে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি নিকটবর্তী শাস্তি বিষয়ে না, আমার প্রতিপালক তজ্জন্য মেয়াদ স্থির করবেন? চূড়ান্ত সীমা ও নির্ধারিত সময়, যা তিনি ছাড়া অপর কেউ জানে না।

٢٦. عٰلِمُ الْغَيْبِ مَا غَابَ بِهٖ عَنِ الْعِبَادِ فَلَا يُظْهِرُ يُطْلِعُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ.

২৬. তিনি অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত যা তাঁর বান্দা হতে অদৃশ্য। সুতরাং প্রকাশ লাভ করে না অবহিত হয় না তাঁর অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান, কারো নিকট মানুষের মধ্য হতে।

٢٧. اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ مَعَ اِطِّلَاعِهٖ عَلٰى مَا شَاءَ مِنْهُ مُعْجِزَةً لَّهٗ يَسْلُكُ يَجْعَلُ وَيُسَيِّرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ اَىِ الرَّسُوْلِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا مَلَائِكَةً يَحْفَظُوْنَهٗ حَتّٰى يُبَلِّغَهٗ فِىْ جُمْلَةِ الْوَحْىِ.

২৭. হ্যাঁ, তার মনোনীত রাসূলগণের মধ্য হতে যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তবে সে তাঁর মু'জিযা হিসাবে আল্লাহর ইচ্ছায় যা অবগত হয়েছে। প্রেরণ করে পরিচালিত করে তার সম্মুখে অর্থাৎ রাসূলের এবং পশ্চাতে প্রহরীবৃন্দ হেফাজতকারী ফেরেশতাকুল যারা পূর্ণ ওহী পৌছা পর্যন্ত তাকে হেফাজত করতে থাকে।

২৮. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ أَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ أَيْ أَنَّهُ قَدْ أَبْلَغُوْا أَيْ الرُّسُلُ رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ رُوْعِيَ بِجَمْعِ الضَّمِيْرِ مَعْنَى مَنْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ عَطْفٌ عَلٰى مُقَدَّرٍ أَيْ فَعَلِمَ ذٰلِكَ وَأَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تَمْيِيْزٌ وَهُوَ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمَفْعُوْلِ وَالْأَصْلُ أَحْصٰى عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ.

২৮. যাতে তিনি জানতে পারেন আল্লাহ তা'আলা, তা দ্বারা عِلْمَ ظُهُوْرٍ প্রকাশ্যভাবে জানা উদ্দেশ্য। যে, أَنْ অব্যয়টি মুছাক্কালাহ হতে মুখাফ্ফাফাহ অর্থাৎ أَنَّهُ তারা পৌছেছে অর্থাৎ রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের রিসালতের দায়িত্ব এখানে বহুবচনের যমীর আনয়ন পূর্বক مَنْ অব্যয়ের অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে। আর তিনি পরিবেষ্টিত করেছেন যা কিছু তাদের নিকট রয়েছে তা উহ্য বক্তব্যের প্রতি عَطْف অর্থাৎ فَعَلِمَ ذٰلِكَ এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। এটা تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত। আর তা مَفْعُوْل হতে পরিবর্তিত হয়েছে, মূলত বক্তব্যটি এরূপ ছিল أَحْصٰى عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ -

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَنْ أَضْعَفُ : -এর مَنْ মুবতাদা, أَضْعَفُ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে বাক্যটি أَدْرِيْ -এর দ্বিতীয় মাফউল হয়েছে। أَقَرِيْبٌ খবর মুকাদ্দাম, مَا تُوْعَدُوْنَ মুবতাদা মুআখখার।

قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ : বদল হয়েছে رَبِّيْ হতে অথবা উহ্য মুবতাদার খবর এবং তা جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنِ ارْتَضٰى : -এর مَنْ জিনস হতে ইসতিছনা। কেউ কেউ বলেন, مَنْ মুবতাদা এবং ارْتَضٰى তার খবর। رَصَدًا মাফউল يَسْلُكُ -এর। عَدَدًا মাসদার অথবা তামঈয।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "حَتّٰى إِذَا رَأَوْا ...... أَقَلُّ عَدَدًا" : উল্লিখিত আয়াতের মর্ম হলো, সেকালে কুরাইশের যেসব লোক মহানবী ﷺ-এর মুখে দীনের দাওয়াত ও আল্লাহর ইবাদতকরণের কথা শুনামাত্রই আক্রোশে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং নিজেদেরকে সংখ্যায় অনেক ও শক্তিশালী ভাবত, তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে– তোমরা নিজেদেরকে খুব শক্তিশালী ও সর্দার মনে করছ এবং আমাকে ও আমার অনুসারীগণকে মুষ্টিমেয় ভেবে আমাদের প্রতি নির্মম অত্যাচার-অবিচার করছ। তোমরা স্মরণ রেখো যে, হার-জিতের আসল স্থান এ জগৎ নয়। খেলার মাঠ আরেকটি রয়েছে, সেখানকার হার-জিতই হলো তাৎপর্যপূর্ণ আসল হার-জিত; কিন্তু তোমাদেরকে যে মহাবিপদের দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং যে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা যেদিন তোমরা অবলোকন করবে, সেদিনই হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারবে, কোন পক্ষের সাহায্যকারী দুর্বল এবং কোন পক্ষ সংখ্যায় স্বল্প। সেদিনই হবে আসল ফয়সালা এবং সেদিনই প্রদর্শিত হবে শক্তির বাহাদুরি।

حَتّٰى প্রান্তসীমা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, এখানে তা ব্যবহারের কারণ : حَتّٰى শব্দ দ্বারা বাক্য শুরু করে মূলত কাফেরদের যে অহংকার ও দাম্ভিকতা ছিল তার একটা সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এ দাম্ভিকতা তো মাত্র অল্প কিছু দিনের জন্য। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে, কে ছিল প্রকৃতপক্ষে সামর্থ্যবান-শক্তিধর এবং কে সামর্থ্যহীন ও দুর্বল। এ দুনিয়ার হার-জিত প্রকৃত হার-জিত নয়; বরং প্রকৃত হার-জিত পরকালে। অথবা এখানেও জানতে পারবে হার-জিতের কথা, যেমনটি ঘটেছিল বদরে।

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنْ أَدْرِي ..... رَبِّيْ أَمَدًا : বর্ণনাভঙ্গি হতেই উপলব্ধি করা যায় যে, এ কথাটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব স্বরূপ বলা হয়েছে। পূর্বের আয়াতের কথা শুনে বিরুদ্ধবাদীরা সম্ভবত ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে প্রশ্ন করে থাকবে যে, আপনি যেদিনের কথা বলে আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন, সেদিন কবে নাগাদ এসে উপস্থিত হবে? তারই জবাবে রাসূলে কারীম ﷺ-কে এ কথাটি বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আপনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিন যে, সে দিন-ক্ষণটি যে আসবেই তাতে তো একবিন্দু সন্দেহ নেই। সেদিনটি খুব শীঘ্র আসবে– না অনেক দীর্ঘ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর উপস্থিত হবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না, কেউই বলতে পারে না।

مَا يُوعَدُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য : এর দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে, দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি হবে। যেমন, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের শাস্তি হয়েছে।

২. প্রতিশ্রুত বিষয়টি হলো কিয়ামতের দিবস।

৩. এর দ্বারা মৃত্যুর মুহূর্তও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন; কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সে পর্যন্ত হয় না; যে পর্যন্ত না তাকে তার পরকালের আবাসস্থল দেখানো হয়। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَّا مَنِ ارْتَضَى ...... خَلْفِهِ رَصَدًا : পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, عِلْم غَيْب সম্পর্কে কাউকেও আল্লাহ অবহিত করেন না। উক্ত আয়াতে اِسْتِثْنَاءٌ-এর মাধ্যমে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, عِلْم غَيْب-এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়নি; বরং রিসালাত-এর জন্য প্রয়োজনীয় যতটুকু عِلْمِ غَيْب আবশ্যক, ততটুকু পরিমাণ আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। আর তা অত্যন্ত রক্ষণশীলতার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ ওহী নাজিলের মুহূর্তে রাসূলের চতুর্দিকে ফেরেশতা দ্বারা প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, যাতে কোনো শয়তান তাতে প্রবিষ্ট হতে না পারে। আর এতে عِلْمُ أَحْكَامِ إِسْلَامْ বা عِلْمُ شَرِيْعَتْ এবং প্রয়োজনীয় গুপ্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

সুতরাং তা হতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত اِسْتِثْنَاءٌ দ্বারা যতটুকু عِلْم غَيْب নবী এবং রাসূলগণের জন্য পৃথক করা হয়েছে তা সীমিত কিছু পরিমাণ عِلْمِ غَيْب স্বরূপ, যা رِسَالَتْ-এর দায়িত্ব পালনার্থে অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য।

অতএব, ব্যবহার-বিধি অনুসারে তাকে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ বলা হবে। অর্থাৎ عِلْمِ غَيْب غَيْرُ اللّٰهِ হতে এর যে নফী করা হয়েছে এ مُسْتَثْنٰى-এর মধ্যে তার সম্পূর্ণ اِثْبَاتْ নয়; বরং নির্দিষ্ট কতটুকু عُلُوْم غَيْب-কে বিশেষভাবে পৃথক করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে যাকে اَنْبَاءُ الْغَيْبِ বলা হয়েছে।

غَيْب ও عِلْمُ الْغَيْبِ-এর মধ্যে পার্থক্য : কিছু সংখ্যক বিবেকহীন লোক اَنْبَاءُ الْغَيْبِ আর غَيْب-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝে না, যার ফলে তারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে বিশেষত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে عِلْمُ الْغَيْبِ-এর জন্য حَاوِیْ মনে করেন। অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ عِلْمُ الْغَيْبِ জানেন বলে মনে করেন। আর বলে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে অণু-পরমাণুর প্রতি পর্যন্ত عِلْمُ الْغَيْبِ রাখেন, মুহাম্মদ ﷺ ও তেমনি জানেন। যা স্পষ্টভাবে শিরক ব্যতীত আর কিছুই নয়। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ মনে করি, যদি কেউ তার নিজস্ব গুপ্ত বিষয়াদি সম্পর্কে স্বীয় কোনো নিকটতম বন্ধুর নিকট আলোচনা রাখে, যা অন্য কেউই জানে না, তবে তাকে দুনিয়াতে কেউই عَالِمُ الْغَيْبِ বলবে না।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا : মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুর সংখ্যার হিসাব রাখেন এর ব্যাখ্যা হলো পাহাড়ের সংখ্যা এবং ওজন, সমুদ্রের পরিমাপ, বৃষ্টির ফোঁটার সংখ্যা, বৃক্ষগুলোর পাতার সংখ্যা, এক কথায় পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই। তিনি বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তভাবে জানেন, রাতের অন্ধকারে অথবা দিনের আলোতে যা কিছু হয়। সবই তিনি জানেন। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلُ : সূরা আল-মুয্যাম্মিল

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির নাম সূরা اَلْمُزَّمِّلُ [আল-মুয্যাম্মিল]। অত্র সূরার প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ اَلْمُزَّمِّلُ হতে অত্র সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর একটি নামও مُزَّمِّلُ। একদা হযরত মুহাম্মদ ﷺ রাত্রিকালে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, এমতাবস্থায় গায়েবের পক্ষ হতে يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা হতেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلُ তবে সূরার বিষয়বস্তুর সাথে শিরোনামের তেমন কোনো সামঞ্জস্য দেখা যায় না; কিন্তু এটা দ্বারা নামকরণ স্বার্থক না হওয়ারও কোনো কারণ নেই। অত্র সূরায় ২টি রুকূ', ২০টি আয়াত, ২৮৫টি শব্দ এবং ৮৩৮টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরাতে মাত্র দু'টি রুকূ' রয়েছে তবে দু'টি রুকূ'ই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। বিষয়বস্তু ও হাদীস শরীফের দলিলসমূহও এ কথা সত্যায়িত করে। প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ হতে বুঝা যায় যে, প্রথম রুকূ'টি নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ তখন নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ হতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যেমন, সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে আপনি রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠুন ও আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হোন, তবে তো নবুয়তের যথাযথ দায়িত্ব পালনে আপনার মধ্যে শক্তি অর্জিত হবে।

আর এতে তাহাজ্জুদ নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াতে অর্ধেক রাত্রি বা তার চাইতে একটু কম সময় অতিবাহিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বিরুদ্ধে বাদীদের সর্ব প্রকার অত্যাচারমূলক আচরণের মোকাবিলায় পরম ধৈর্য গ্রহণের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকে আজাবের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এগুলো হতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন তাঁর শত্রুগণ প্রবলভাবে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল। আর এগুলো নবুয়তের প্রথম অবস্থায়ই হয়েছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াত সম্পর্কে যদিও বহুসংখ্যক মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন যে, ঐগুলো মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তথাপিও কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে ঐ গুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর আয়াতসমূহ দ্বারাও যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। আর হুযূর ﷺ মাদানী জীবনেই যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় রুকূ'টি মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু তিনটি। প্রথম রুকূ'তে রাত্রের একটি অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ বাধ্যতামূলককরণ ও কাফেরদের কটূক্তি ও গালাগালকে উপেক্ষা করে চলার উপদেশ, দ্বিতীয় রুকূ'তে তাহাজ্জুদের নামাজ ঐচ্ছিক বিধানরূপে ঘোষণা করা।

১ হতে ৭ আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে কাফেরদের কথাবার্তায় চিন্তাযুক্ত ও ব্যথিত হওয়ার কারণে তাঁর চিন্তা দূরকরণ এবং তাঁর মনোবল বৃদ্ধিকরণের বিধান দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথমেই তাঁকে চাদর আবৃত করে শয়নকারীরূপে আখ্যায়িত করে তাঁর মনের চিন্তা-বেদনা ও কষ্টক্লেশ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতঃপর নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি ফর্মুলা পেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি রাত্রির একটি অংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থেকে কাটিয়ে দিন। এতে আপনার মনের অবিচলতা, অস্থিরচিন্তা এবং যে কোনো কঠিন বিপদের মুহূর্তেও অবিচল হয়ে সুদৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকার ক্ষমতা লাভ করবেন এবং নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পালন করতেও সমর্থ হবেন। দিবাভাগের কর্মব্যস্ততার দরুন এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ দিনের বেলা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিঝুম-নিথর-নিস্তব্ধ যামিনীতে আরাম ও বিলাসিতাকে পরিহার করে সাধনায় মশগুল থাকাই আপনার পথ।

অতঃপর ৮ হতে ১৩ আয়াতে একনিষ্ঠ মনে ঐকান্তিক অনুরাগ নিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার এবং পার্থিব যাবতীয় সমস্যা আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করার কথা বলা হয়েছে। আর কাফেরদের সর্বপ্রকার অবজ্ঞা, কটূক্তি ও গালাগালের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে সৌজন্যমূলক পন্থা গ্রহণ এবং তাদের কথার প্রতিবাদ না করার জন্য বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, যেসব সম্পদশালী লোক আপনার বিরোধিতায় সোচ্চার কণ্ঠ তাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করুন, আপনি প্রতিবাদে যাবেন না। আমি তাদেরকে ইহ-পরকালে কঠিন হস্তে শায়েস্তা করবো।

অতঃপর ১৪ হতে ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে লোকেরা! তোমাদের কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি, যেরূপ ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে নবীর বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণের আমি তার পরিণতি কি করেছি, ইতিহাসের পাতাগুলো তার সাক্ষী। মহাপ্রলয়ের পর তোমাদের সকলের যখন আমার কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হতে হবে, তখন তোমরা কিরূপে আমার শাস্তি হতে বাঁচবে। তোমাদের উচিত আমার পথ গ্রহণ করা। আমি উপদেশ দিচ্ছি। যার ইচ্ছা হয় সে নবীর বিরোধিতা পরিহার করে আমার পথ গ্রহণ করুক।

২০নং আয়াতে তাহাজ্জুদের বাধ্যতামূলক বিধানকে ঐচ্ছিককরণের কারণসমূহ বর্ণনা করে তাকে ঐচ্ছিক ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, তাহাজ্জুদ নামাজ যত হালকা করা সম্ভব হয় তাই কর; কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও যাকাত আদায় এবং বিনা স্বার্থে দরিদ্র ও অভাবীগণকে ঋণদান করবে। তোমরা পরকালের কল্যাণার্থে যা কিছু ভালো ও কল্যাণজনক কাজ করবে তাই আমার নিকট বিরাট পুরস্কার আকারে লাভ করবে। তোমরা সর্বদা মাগফিরাত কামনায় থাকো, আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও করুণানিধান। তিনি কারো ক্ষমা প্রার্থনাকে বিফল করবেন না।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত এ সূরা পাঠ করবে মহান আল্লাহ তাকে সুখে-শান্তিতে রাখবেন এবং দোজখের আজাব হতে তাকে রক্ষা করবেন।

* সর্বদা এ সূরা পাঠ করলে স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ-এর জিয়ারত লাভ করবে।

* এ সূরা পাঠ করে হাকীমের নিকট উপস্থিত হলে হাকীম সহৃদয় ব্যবহার করবে।

* নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ সূরা বিপদের সময় পাঠ করলে বিপদ দূর হবে।

* প্রত্যহ সাতবার পাঠ করলে রিজিক বৃদ্ধি পায়। -[নূরুল কোরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা (আল-জিন্ন)-এর মধ্যে কাফেরদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও কর্মফলের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অত্র সূরায় তাদের ঈমান না আনয়ন করার কারণে হুযূরে আকরাম ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। আর তিনি যেন তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ত্বকে দৃঢ়তার সাথে বজায় রাখেন সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[তাফসীরে আশরাফী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ النَّبِيُّ وَاَصْلُهُ الْمُتَزَمِّلُ اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الزَّاءِ اَيِ الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ حِيْنَ مَجِيْءِ الْوَحْيِ لَهُ خَوْفًا مِنْهُ لِهَيْبَتِهِ.

১. হে বস্ত্রাবৃত! নবী, مُزَّمِّلٌ শব্দটি মূলত مُتَزَمِّلٌ ছিল, تَاءٌ-কে زَاءٌ-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে অর্থাৎ ওহী আগমনকালে ভয়ের কারণে বস্ত্রাবৃতকারী।

٢. قُمِ اللَّيْلَ صَلِّ اِلَّا قَلِيْلًا.

২. রাত্রি জাগরণ করো সালাত আদায় করো কিয়দংশ ব্যতীত।

٣. نِصْفَهُ بَدَلٌ مِنْ قَلِيْلًا وَقِلَّتُهُ بِالنَّظْرِ اِلَى الْكُلِّ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ مِنَ النِّصْفِ قَلِيْلًا اِلَى الثُّلُثِ.

৩. অর্ধরাত্রি এটা قَلِيْلًا হতে بَدَل আর অর্ধরাত্রিকে সম্পূর্ণ রাত্রির মোকাবিলায় স্বল্প বলা হয়েছে। কিংবা তা হতে কম কর অর্ধরাত্রি হতে স্বল্প পরিমাণ রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

٤. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ اِلَى الثُّلُثَيْنِ وَاَوْ لِلتَّخْيِيْرِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَثَبَّتْ فِيْ تِلَاوَتِهِ تَرْتِيْلًا.

৪. কিংবা তদুপর অতিরিক্ত কর দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত اَوْ অব্যয়টি ঐচ্ছিকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কুরআনকে সুস্পষ্ট রূপে আবৃত্তি করো ধীরস্থিরভাবে পাঠ করো।

٥. اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا قُرْاٰنًا ثَقِيْلًا مَهِيْبًا اَوْ شَدِيْدًا لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّكَالِيْفِ.

৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি এমন বাণী কুরআন যা কঠিন ও কষ্টসাধ্য ভীতিপ্রদ অথবা তন্মধ্যকার বিধি-নিষেধের কারণে সুকঠিন।

٦. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ الْقِيَامُ بَعْدَ النَّوْمِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً مُوَافَقَةَ السَّمْعِ لِلْقَلْبِ عَلٰى تَفَهُّمِ الْقُرْاٰنِ وَاَقْوَمُ قِيْلًا اَبْيَنُ قَوْلًا.

৬. নিশ্চয় রাত্রিকালের উত্থান নিদ্রাযাপনের পর উত্থান সামঞ্জস্যতায় অধিক শক্তিশালী কুরআন বুঝার ব্যাপারে শ্রবণ করা, অন্তরের সামঞ্জস্যতা বর্তমান থাকে। এবং বাক্যস্ফুরণে অধিক সুদৃঢ় বাক্য উচ্চারণে সুস্পষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نِصْفَهُ : نِصْفَهُ শব্দটি তারকীবে اَللَّيْلَ হতে بَدَل হয়েছে। সুতরাং ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হলো لَيْل অতএব আয়াতের অর্থ হলো, অর্ধরাত জাগ্রত থাক, ... আর কেউ কেউ نِصْفَهُ শব্দটি قَلِيْلًا হতে بَدَل বলেছেন। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, রাত্র জাগরণ কর তবে অর্ধরাত্র ব্যতীত। -[ফাতহুল কাদীর]

তারকীবে نِصْفَهُ শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ : نِصْفَهُ শব্দটি اَللَّيْلُ হতে بَدَلْ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে, আর لا এর مَرْجِعْ হলো اَلنِّصْفُ সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, اَلنِّصْفُ قَلِيْلًا হলো مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হতে عَلَيْهِ-এর ضَمِيْر এবং অর্ধরাত্রি জাগ্রত থাকো, অথবা অর্ধ হতে কিছু কমিয়ে এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধ হতে কিছু বাড়িয়ে দুই-তৃতীয়াংশ জাগ্রত থেকে ইবাদত করো। কেউ কেউ نِصْفَهُ শব্দটিকে قَلِيْلًا হতে بَدَلْ হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তখন আয়াতের অর্থ হলো– রাত্রি জাগ্রত থাকো কিন্তু অর্ধাংশ বাদ দিয়ে অথবা অর্ধ হতে কিছু কম বাদ দিয়ে অথবা অর্ধেক হতে বেশি বাদ দিয়ে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ : জমহুর ইদগাম করে اَلْمُزَّمِّلُ পড়েছেন। আর উবাই মূলত যে রকম ছিল সে রকম রেখে اَلْمُتَزَمِّلُ পড়েছেন। আর ইকরামা زَاءٌ-কে تَخْفِيْف করে এবং مِيْم-এ তাশদীদ ও ফাত্হ দিয়ে ইসমে মাফঊল হিসেবে اَلْمُزَمَّلُ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

اَشَدُّ وَطْأً-এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর وَاوٌ-এ فَتْح এবং طَاءٌ তে سَاكِنْ যুক্ত করে وَطْأً পড়েছেন। আবী হাতিম এ কেরাত পছন্দ করেছেন। আবুল আলীয়া, ইবনে আবী ইসহাক, মুজাহিদ, আবূ আমর, ইবনে আমের, হোমাদ ইবনে মুহাইছেন, মুগীরা, আবূ হাইওয়া وَاوٌ তে كَسْرَة যুক্ত করে এবং طَاءٌ তে فَتْح ও مَدّ যুক্ত করে وِطَاءً পড়েছেন। আবূ ওবাইদ এ কেরাত পছন্দ করেছেন। প্রথম কেরাত অনুযায়ী অর্থ হলো, রাত্রি জাগরণ করে নামাজ পড়া দিনের নামাজের তুলনায় মুসল্লির পক্ষে অধিক কষ্টকর। আর দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ :

১. বায্যার এবং তাবারানী হযরত জাবের হতে এক অতি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এক সময় কুরাইশগণ 'দারুন নাদওয়াহ' তে একত্রিত হয়ে বলল, এ লোকটির এমন একটা নাম দাও যা শুনে যেন লোকেরা তাঁর কাছে আর না ভিড়ে। কেউ প্রস্তাব দিল কাহেন বা জাদুকর বললে কেমন হয়? বলা হলো, না কারণ সে জাদুকর নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা শুনতে পেয়ে নিজের কাপড় মুড়ি দিয়ে থাকলেন এবং তাতে আবৃত হয়ে রইলেন। এ সময় হযরত জিবরাঈল এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ এবং يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ।

২. ইবনে হাতিম ইব্রাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেছেন, يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ সূরাটি যখন নাজিল হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর জড়ানো অবস্থায় ছিলেন। –[আসবাবুন নুযূল, ইবনে কাসীর]

৩. বর্ণিত আছে যে, হেরা গুহায় যখন নবী করীম ﷺ -এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রথমবার ওহী নিয়ে আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভয় পেয়ে ছিলেন এবং কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে ছিলেন, বাড়ি ফিরে হযরত খাদীজা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমাকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও এবং কাপড়ে আবৃত করে দাও। আমার ভয় লাগছে। যখন তিনি এ অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁর কাছে হযরত জিবরাঈল এসে يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ অতঃপর يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ সূরা দু'টি নাজিল করেন। –[রূহুল কোরআন, সাফওয়া]

এ গুণে সম্বোধন করার কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'হে কাপড়ে আবৃত শয্যাগ্রহণকারী' বলে সম্বোধন করার কারণ হলো, মহানবী ﷺ-এর প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহশীলতা প্রকাশ করা। আরবরা কোনো ব্যক্তিকে স্নেহ করে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সম্বোধন করতে হলে সে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এবং অবস্থার সাথে জড়িত করে সম্বোধন করেন। যেমন হযরত আলী (রা.) একদিন হযরত ফাতিমা (রা.)-এর সাথে রাগ করে মাটিতে শুয়ে পড়লে তাঁর শরীরে মাটি লাগে, এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিল। قُمْ يَا اَبَا تُرَابٍ [উঠ হে মাটিওয়ালা!] এটা এ কথা বুঝবার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতি স্নেহবৎসল, তিরস্কারকারী নন।

দ্বিতীয় অন্য একটি কারণ হলো, রাতের বেলায় সমস্ত চাদর আবৃত শয্যা গ্রহণকারী লোকদেরকে সতর্ক করা যে, তারা যেন কিয়ামুল লাইল এবং আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে উঠার জন্য সতর্ক হয়ে যায়। কারণ কোনো فِعْل হতে কোনো اِسْم -কে مُشْتَقّ করা হলে তখন যাকে এটা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তার সাথে সাথে যেসব লোকের মধ্যে এ ওয়াসফ পাওয়া যাবে সকলেই এটার অন্তর্ভুক্ত হবে। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلً : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে কাপড়ে আবৃত শয়নকারী! রাত্রিকালে নামাজে দণ্ডায়মান হয়ে থাকো, কিছু অংশ ব্যতীত।' আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আপনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে উঠে পড়ুন এবং রাত্রের নামাজ আদায় করুন আর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও জিকির-আযকারে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এভাবে আপনি নিজেকে অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ এক কাজের জন্য প্রস্তুত করে নিন। সে কাজটি হলো, মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে নতুন দীন সম্বন্ধে অবহিত করা। -[সাফওয়া]

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, إِلَّا قَلِيْلًا 'কিছু অংশ ব্যতীত' কথাটির অর্থ হলো- এক-তৃতীয়াংশ ব্যতীত। কারণ আল্লাহ তা'আলা সূরার শেষের দিকে বলেছেন, إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ এ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, সর্বাধিক দুই-তৃতীয়াংশ কেয়াম করা আবশ্যক। আর এটা হতে বুঝা যায় যে, দুই-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে এক-তৃতীয়াংশ অবশ্যই ঘুমানো যাবে। সুতরাং إِلَّا قَلِيْلًا কথাটির তাৎপর্য হলো, এক-তৃতীয়াংশ ব্যতীত। আর সম্পূর্ণ আয়াত কয়টির অর্থ হলো- নামাজের জন্য রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন (এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে) দুই-তৃতীয়াংশ, অথবা অর্ধ রাত্রি জাগরিত থাকুন, অথবা অর্ধরাত্রি হতে কিছু কম, অথবা বেশি। এ হিসাব অনুযায়ী উপরের সংখ্যা হলো দুই-তৃতীয়াংশ আর নিম্ন সংখ্যা হলো এক-তৃতীয়াংশ। -[কাবীর]

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? : يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ দ্বারা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। প্রথম মতটি হলো হযরত ইকরামার- يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ হে নবুয়তে আবৃত, রেসালাতের বাহক। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, হে সেই লোক যিনি দায়িত্ব বহন করেছেন। তিনি زَاءْ -কে تَخْفِيْف করে مِيْم এ- فَتْح দিয়ে এবং تَشْدِيْد যুক্ত করে এবং مَفْعُوْل -কে حَذْف করে পড়তেন।

দ্বিতীয় মতটি হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, হে কুরআনে আবৃত।

তৃতীয় মত হলো কাদাহ ও অন্যান্যদের- হে স্বীয় বস্ত্রাবৃত! তিনি চাদরে আবৃত ছিলেন বলে তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

কিয়ামুল লাইল কি রাসূল ﷺ -এর উপর ফরজ ছিল? :

১. একদল আলিমের অভিমত হলো- কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ মহানবী ﷺ -এর উপরই কেবল ফরজ ছিল। তাঁরা قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا -কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯নং আয়াতে وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ "এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে এটা তোমার জন্য নফল হিসেবেই।" তাহাজ্জুদ মহানবী ﷺ -এর জন্য নফল বলা হয়েছে। আর এ আয়াতটি قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا -এর পরে নাজিল হয়েছে। এটা হতে বুঝা যায় যে, قُمِ اللَّيْلَ -এ যা ফরজ করা হয়েছিল তাকে এক্ষণে বনী ইসরাঈলের আয়াত দ্বারা মানসূখ করে নফল করা হয়েছে। এখানে নফল অর্থ করা এবং না করা উভয়ই জায়েজ এমন নয়। কারণ নফলের অর্থ যদি এখানে এটাই হয় তাহলে রাসূলের জন্য খাস হতে পারে না। আর যদি বলি রাসূলের জন্যও নফল, তাহলে বলতে হয় গোটা উম্মতের জন্য ফরজ। অন্যথায় বিশেষত 'তোমার জন্য' এটার কি অর্থ? সুতরাং এখানে নফল মানে ইস্তেলাহী নফল নয়। -[রাওয়ায়েউল বায়ান, সাবূনী]

২. আরেকদল আলিম বলেছেন, তাহাজ্জুদ কখনো মহানবী ﷺ -এর উপর ফরজ ছিল না। তাঁরা وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ আয়াত দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, তাহাজ্জুদ এ আয়াত মহানবী ﷺ-এর জন্য নফল বলা হয়েছে ফরজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটার জবাবে বলেছেন, نَافِلَةً لَّكَ অর্থ তোমার জন্য বিশেষত ওয়াজিব, অথবা তোমার জন্য ওয়াজিব অতিরিক্ত। (কারণ এ অর্থ না করে নফল অর্থ করা হলে, উম্মতের উপর ওয়াজিব বলতে হবে।) এরা আরো বলেন, তাহাজ্জুদ যদি নবী করীম ﷺ-এর উপর ফরজ হয়ে থাকে, তাহলে তা উম্মতের উপরও ফরজ হবে। কারণ উম্মতকে وَاتَّبِعُوْهُ দ্বারা নবীর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। এ যুক্তি খাটে না, কারণ نَافِلَةً لَّكَ হতে নবী ﷺ-এর জন্য নফল তা বিশেষভাবে বুঝা যাচ্ছে।

৩. আরেক দল আলিমের মতে তাহাজ্জুদের নামাজ মহানবী ﷺ এবং গোটা উম্মতের উপর ফরজ ছিল। তারা এ সূরার শেষের দিকের আয়াত- "إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الخ -কে দলিল হিসেবে গ্রহণ

করেছেন। তাঁরা বলেন, এ আয়াত হতে জানা যায় যে, সাহাবীগণও নবীর মতোই কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এটা তাঁরা রাত্রির কখনো দুই-তৃতীয়াংশ আবার কখনো অর্ধাংশ, কখনো এক-তৃতীয়াংশ জেগে থেকে করতেন। এটা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হলে তাদেরকে যতটুকু সহজ ততটুকু আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁরা তাদের এ মতের সমর্থনে বলেন, এ প্রেক্ষিতে কয়েকটি হাদীসও রয়েছে।

ক. ইবনে আবী হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, সূরা মুয্যাম্মিল এর প্রথমাংশ যখন নাজিল হয় তখন সাহাবীগণ রমজানে যেমন কিয়ামুল লাইল করা হয় তেমনি কিয়ামুল লাইল করতেন। অতঃপর সূরার শেষাংশ নাজিল হয়, এ প্রথমাংশ এবং শেষাংশের নাজিলের ব্যবধান ছিল প্রায় এক বছর।

খ. ইবনে জারীর হযরত আবূ আব্দুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ নাজিল হলো তখন প্রায় এক বছর পর্যন্ত সাহাবীগণ কিয়ামুল লাইল করলেন। এটার ফলে তাঁদের পা ফুলে গেল এবং রানে ব্যথা হতে লাগল। অতঃপর فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ আয়াতটি নাজিল হলে তাঁরা নিষ্কৃতি পেলেন।

গ. ইমাম আহমদ (র.) মুসনাদ গ্রন্থে সাঈদ ইবনে হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাত্রি জাগরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, তুমি কি সূরা আল-মুয্যাম্মিল পড়নি? বললাম, হ্যাঁ পড়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রথমাংশ দ্বারা রাত্রি জাগরণ ফরজ করে দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বছর পর্যন্ত রাত্রি জাগরণ করতে থাকলেন, যার ফলে তাঁদের পা ফুলে গিয়েছিল, সূরার শেষাংশ আল্লাহ তা'আলা আসমানে বারোটি মাস রেখে দিলেন। অতঃপর সূরার শেষাংশ নাজিল করে তাখফীফ বা সহজ করে দিলেন। এরপর হতেই রাত্রি জাগরণ ফরজ হওয়ার পর নফল হয়ে গেল।

গ্রহণযোগ্য অভিমত : এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত হলো, এ শেষোক্ত তৃতীয় মত। যে মতে বলা হয়েছে, তাহাজ্জুদ নবী এবং সাহাবীগণের উপর ফরজ ছিল, অতঃপর মানসূখ করা হয়েছে। এ মত গ্রহণ করার মাধ্যমেই আয়াতগুলোর মধ্যে সমন্বয় স্বাধীন সম্ভব। তা ছাড়া এ তৃতীয় মতের স্বপক্ষে রয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস।

অধিকাংশ আলিমগণের মতে তাহাজ্জুদের নামাজ উম্মতের ক্ষেত্রেই কেবল মানসূখ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওয়াজিব ছিল। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় সফরে হাযরে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন, কখনও কোনো কারণে আদায় করা সম্ভব না হলে দিনের বেলা বারো রাকাত আদায় করতেন।

-[আহকামুল কোরআন, কাবীর, রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا : আল-মা'আরিফ গ্রন্থকার এর তাফসীর এভাবে লিখেছেন- تَرْتِيْل-এর শাব্দিক অর্থ হলো- শব্দসমূহকে সহজভাবে ও ধীরস্থিরভাবে মুখ হতে বের করা। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে কুরআন তেলাওয়াতের সময় তাড়াহুড়া করবে না; বরং تَرْتِيْل ও تَسْهِيْل (সহজভাবে) উচ্চারণ আদায় করবে তার সাথে সাথে তার অর্থ ও মর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবে। -[কুরতুবী]

আর رَتِّلْ ও قُمِ اللَّيْلَ এরা পরস্পর عَطْف وَمَعْطُوْف হয়েছে, সুতরাং অর্জিত অর্থ হবে- রাত্রে দণ্ডায়মান হোন এবং নামাজে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। তাহাজ্জুদ নামাজ যদিও قِيَام قِرَاءَت رُكُوْع وَسُجُوْد ইত্যাদির মধ্যে শামিল রয়েছে, তথাপিও এখানে তাহাজ্জুদ দ্বারা শেষ রাত্রির কুরআন তেলাওয়াত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ জন্যই সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণনা রয়েছে যে, হুযূর ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজে অনেক লম্বা কেরাত করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এ অভ্যাস ছিল।

অতএব, বুঝা গেল যে, তাহাজ্জুদের সময় কেবল কুরআন তেলাওয়াত করাই উদ্দেশ্য নয়, বরং تَرْتِيْل -এর সাথে তেলাওয়াত উদ্দেশ্য, যাতে প্রত্যেক كَلِمَة ও حَرْف সহীহভাবে স্পষ্ট অবস্থায় আদায় হয়ে যায়। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এমনিভাবে تَرْتِيْل-এর সাথে পড়তেন।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) হতে কেউ কেউ নবী করীম ﷺ -এর তাহাজ্জুদ আদায়ের সময় কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর প্রদান করলেন যে, হুযূর ﷺ এমনভাবে তেলাওয়াত করতেন যাতে এক একটি حَرْف স্পষ্টভাবে বর্ণনা হয়ে যেত।

আর تَرْتِيْل -এর মধ্যে تَحْسِيْن صَوْت সম্ভাব্য খোশ আওয়াজ করে কুরআন পড়াও শামিল রয়েছে।

আর মূলত تَرْتِيْل বলা হয় حُرُوْف وَ اَلْفَاظ গুলো আদায় করার সময় খুব স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধভাবে আদায় করা, যাতে তেলাওয়াতকারী তার মর্মবাণীর উপর গভীর মনোনিবেশ করে এবং তার মর্ম দ্বারা তার আত্মা প্রভাবান্বিত হয়।

জালালাইন গ্রন্থকার এটার তাফসীর করেছেন- تَثَبَّتَ فِيْ تِلَاوَتِهِ অর্থাৎ ধীরগতিতে আগ্রহের সাথে তাড়াহুড়া না করে পড়বে, যাতে শ্রোতাবৃন্দ আয়াতসমূহ এবং শব্দসমূহ বুঝতে ও ইচ্ছা করলে শুনতে সক্ষম হয়।

আর হোযাইফা (রা.) হতেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- حَسِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ অর্থাৎ 'তোমরা আরববাসীদের এলহানে কুরআন তেলাওয়াত করো।' আর আহলে কিতাব এবং ফাসিকদের এলহানেও পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারতীল ওয়াজিব না সুন্নত? : হযরত মুহাম্মদ ﷺ হাদীস শরীফে যা বলেছেন সে প্রসঙ্গে বলতে হবে যে, তাজবীদের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা ওয়াজিব।

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ اٰثِمٌ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তাজবীদসহ কুরআন পড়বে না সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।' আর অনেক ক্ষেত্রে তাজবীদের ব্যতিক্রমের দরুন নামাজ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাজবীদ ব্যতীত কুরআন তেলাওয়াতের ফলে তেলাওয়াতকারীর উপর কুরআন লানত করে থাকে।

অতএব, বলতে হবে যে, تَرْتِيْل ও تَجْوِيْد ইত্যাদির সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা ওয়াজিব।

গান করে এবং লাহান করে কুরআন পড়া সম্বন্ধে ফিক্হবিদগণের মাযহাব :

এক. হাম্বলী এবং মালেকী মাযহাব মতে লাহান করে কুরআন পড়া মাকরূহ। হযরত আনাস ইবনে মালিক, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইবনে জোবাইর, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, হাসান বসরী, ইব্রাহীম নাখয়ী এবং ইবনে সীরীন (র.)-এরও এ অভিমত। তাঁদের দলিল হলো-

১. হযরত হোযাইফা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আরবদের লাহান এবং শব্দ উচ্চারণে কুরআন পড়ো। সাবধান, আহলে কিতাব এবং ফাসিকদের লাহানে কখনও পড়ো না। কারণ আমার পর এমন কিছু লোক আসবে যারা কুরআনকে কান্না এবং গানের মতো করে টেনে টেনে পড়বে। তাদের পড়া তাদের গণ্ড অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর হবে ফিতনায় পতিত। আর যারা তাদেরকে পছন্দ করবে তাদেরও একই অবস্থা। -[তিরমিযী]
   এখানে যারা লাহান করে গানের মতো করে কুরআন পড়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

২. অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
   يَتَّخِذُوْنَ الْقُرْاٰنَ مَزَامِيْرَ، يُقَدِّمُوْنَ اَحَدَهُمْ لَيْسَ بِاَقْرَءِهِمْ وَلَا اَفْضَلِهِمْ لِيُغَنِّيَهُمْ غِنَاءً.
   -[সালামুল কোরআন-ছায়েছ]

৩. কুরআনকে লাহান বা গান করে পড়লে তাতে এমন বর্ণ হামযা, বা মদ বেড়ে যেতে পারে যা মূলত কুরআনে নেই, এটা জায়েজ নয়। তা ছাড়া গানের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে খুশি করা; ভাব ও মর্মার্থ অনুভব করা নয়।

দুই. হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহযাব মতে তালহীন করে বা গান করে পড়া বৈধ। এটা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, আব্দুর রহমান, ইবনে আল-আসওয়াদ এবং ইবনে যায়েদেরও এ অভিমত। মুফাসসিরদের মধ্যে আবূ জা'ফর তাবারী এবং আবূ বকর ইবনুল আরাবীরও এ অভিমত।

তাঁদের দলিল :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ "কুরআনকে তোমাদের উচ্চারণ দ্বারা সৌন্দর্য দান করো।"
   -[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

২. রাসূলের উক্তি لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ "যে লোক কুরআনকে গান করে পড়েন, সে লোক আমাদের দলভুক্ত নয়।"

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফিল বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের সময় একবার বাহনের উপর বসে সূরা فَتْحٌ "ফাতাহ" টেনে পড়েছিলেন। -[বুখারী]

৪. এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর কেরাত শুনতে পেয়েছিলেন, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, لَقَدْ اُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ "তোমাকে হযরত দাউদ (আ.)-এর বংশের সুর দান করা হয়েছে।" এটা শুনে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেছিলেন, "আপনি শুনেছেন একথা জানতে পারলে আমি আপনার জন্য আরো সুন্দর করে পড়তাম।"

৫. অপর এক হাদীসে আছে- مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ اَذَنَهُ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ

৬. তারা আরো বলেন, এভাবে কুরআন পড়লে অন্তরে বেশি প্রভাব ফেলে এবং মনে তার ক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

মোটকথা হলো, উভয় দলের দলিল এবং মতামতের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, উচ্চারণে ত্রুটি ঘটিয়ে শব্দের বিকৃতি করে কেবল গানের মতো ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দানের জন্য পড়া কারো কাছেই জায়েজ নয়। তবে তাজবীদ সহকারে, সুন্দর উচ্চারণের মাধ্যমে মাদ, ওয়াক্ফ ইত্যাদি ঠিক রেখে পড়াকে কেউ হারাম বলেন না। সুতরাং তাদের মধ্যে মূলত কোনো মতদ্বন্দ্ব নেই।
—[আহকামুল কোরআন আলী ছায়েছ এবং রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ "قَوْلًا ثَقِيلًا" : প্রাচীন তাফসীরকারকদের হতে এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটার অর্থ কঠিন বাণী। হাসান বলেছেন এটার অর্থ হচ্ছে, লোকগণ যদিও এ সূরায় উল্লিখিত বিধান সম্পর্কে খুব আগ্রহী; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করা খুব কঠিন। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, ওহী দ্বারা নাজিলকৃত ফরজ ও দণ্ডবিধানগুলো খুবই কঠিন ও গুরুভার। হযরত মুকাতিল বলেন, তার আজ্ঞাসূচক, নিষেধাজ্ঞাসূচক ও দণ্ডবিধানগুলো কার্যকর করা খুব কঠিন। আবুল আলীয়া বলেন, ওহী দ্বারা নাজিলকৃত প্রতিশ্রুতি, শাস্তির ভয় এবং হালাল-হারামের বিধান খুব গুরুভার। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন, এটা মুনাফিকদের জন্য খুবই গুরুভার হোসাইন ইবনে ফজল বলেন, মুখে যদিও উচ্চারণে তা সহজ, কিন্তু মীযানে এটা খুবই গুরুভার হবে।

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং প্রাচীন তাফসীরকারদের কথার সার হলো– মহানবী ﷺ-কে রাত্রিকালে নামাজ পড়ার নির্দেশের কারণ হলো– আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এমন এক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবতীর্ণ করছেন যা বহন করার যোগ্যতা তার নেই। নিশীথের এ নামাজ দ্বারা তাঁর মধ্যে সে যোগ্যতার জন্ম দিবে। তার বিধানসমূহ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা তার শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা নিজেকে একটি জীবন্ত প্রতীকে পরিণত করা এবং দুনিয়ার সম্মুখে স্বীয় চিন্তাধারা, নৈতিকতা, কথা ও কাজ দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত করা মহানবীর কর্তব্য। এটার কারণে মহানবী ﷺ-কে দুর্বিসহ ও কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। সে মুহূর্তে তাঁকে তা ধারণ করে দুনিয়ার সম্মুখে নির্ভয়ে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকতে হবে। এটা একটি মহাসাধনার কাজ। এ সাধনাই হলো নিথর-নিস্তব্ধ নিমিত্তের নামাজ।

এটাকে দুর্বহ কালাম বলার আর একটি কারণ হতে পারে যে, তার নাজিল হওয়া এবং নিজের মধ্যে ধারণ করা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। রাত্রিকালীন নামাজ দ্বারা নবী করীম ﷺ-এর কলব ও অন্তরের ধারণশক্তি বর্ধিত হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রচণ্ড শীতের সময়ও আমি নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ওহী নাজিল হতে দেখেছি। তখন তাঁর দেহ ও ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। নবী করীম ﷺ উষ্ট্রের উপর থাকাকালে ওহী নাজিল হলে উষ্ট্রটি মাটির সাথে বুক লাগিয়ে বসে যেত। ওহী নাজিল হওয়া শেষ না হলে উঠতে পারত না। এ সব হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে ওহী ছিল একটি বিরাট গুরুভার বিষয়। —[খায়েন, মা'আলিম]

আল্লামা সাবূনী (র.) বলেন, উপরিউক্ত তাৎপর্যে কিয়ামুল লাইল এবং তেলাওয়াতে কুরআনের মধ্যে এক সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক নতুন দীনের দাওয়াতদানের দায়িত্ব দিয়েছেন। আর এ দায়িত্ব পালন এক অতি কঠিন কাজ। এ দীনের বিধি-বিধান মেনে চলা এবং অন্যকে এ বিধান মানানো আরও কঠিন। সন্দেহ নেই এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন মুজাহাদা এবং ধৈর্যের, কারণ এতে তাদের চিরাচরিত আক্বীদা-বিশ্বাস এবং পুরাতন আচার-আচরণ ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং হে মুহাম্মদ ﷺ তোমাকে অনেক কষ্ট পরিশ্রম করতে হবে এবং এ দাওয়াতের পথে ও এ দীনের অনুসারী বানাতে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। কাপড় জড়ানো, বস্ত্রাবৃত অবস্থায় থাকলে, আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এ কঠিন দায়িত্ব পালন তোমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে? সুতরাং বিছানা ছেড়ে কাপড়-চোপড় পরিত্যাগ করে উঠে পড়ুন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় আল্লাহর মুনাজাতে, নামাজে, কুরআন তেলাওয়াতে মাশগুল হয়ে থাকুন। যাতে আপনার মধ্যে কঠিন দায়িত্ব পালনের নতুন দীনের দাওয়াত দানের গুণাবলি সৃষ্টি হতে পারে। —[সাফওয়া]

قَوْلُهُ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَّأَقْوَمُ قِيلًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠা আত্মসংযমের জন্য খুব বেশি কার্যকর এবং কুরআন যথাযর্থভাবে পড়ার জন্য যথার্থ।"

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামুল লাইলের ফায়েদা এবং হিকমত বিবৃত করেছেন। বলা হয়েছে যে, রাত্রি জাগরণ করে নামাজ পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং ইবাদতে মশগুল থাকার মধ্যে দু'টি হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে।

এক : রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠা এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানব স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। মানুষের প্রকৃতি এ সময় বিশ্রাম লাভেচ্ছুক হয়ে থাকে। ফলে এরূপ অবস্থায় এ কাজটি করা একটি কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যাপার সন্দেহ নেই। এ কৃচ্ছ্রসাধনা মানুষের নাফসকে দমন করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি প্রবল প্রভাবশালী ব্যাপার। এ পন্থায় যে লোক নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ

সংস্থাপিত করে নেয় এবং স্বীয় দেহ ও মনের উপর প্রবল প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় ও নিজের শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়, সে সর্বাধিক দৃঢ়তাসহকারে সত্য শাশ্বত দীনের দাওয়াতকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করতে পারে।

গ্রন্থকার এটার আরেকটি হিকমতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সে হিকমত হলো, দিল ও মুখের মধ্যে বা দিল ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির তা একটি অতি বড় উপায় ও মাধ্যম। কারণ রাত্রিকালে যে লোক শয্যা ত্যাগ করে একাকিত্বে আল্লাহর ইবাদত করে সে তা অবশ্যই ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে করে থাকে।

দ্বিতীয় ফায়দাটি হলো, এ সময় কুরআনকে অধিক প্রশান্তি, নিশ্চিত ও মনোনিবেশ সহকারে পড়া যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) أَقْوَمُ قِيْلًا-এর তাৎপর্য বলেছেন, أَجْدَرُ أَنْ يَّفْقَهُ فِى الْقُرْاٰنِ "কুরআন অধিক চিন্তা-গবেষণা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করা যেতে পারে।" -[আবূ দাউদ]

আর এটা দীন দাওয়াতি কার্যে তোমার জন্য অধিক উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং সহায় হতে পারে। -[আহকামুল কুরআন সায়েদ]

نَاشِئَةَ اللَّيْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য : এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি মতভেদ পাওয়া যায়। যথা-

১. হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে রাতের কিছু অংশ বিশ্রাম করে নামাজের জন্য উঠাই হলো نَاشِئَةَ اللَّيْلِ।
২. ইবনে কাইসান (র.) বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য শেষ রাতে উঠাকেই نَاشِئَةَ اللَّيْلِ বলা হয়।
৩. হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, আবিসিনীয় ভাষায় نَشَأَ অর্থ قَامَ অর্থাৎ দাঁড়িয়েছে। অতএব, রাতের যে কোনো অংশে যদি কেউ নামাজের জন্য দাঁড়ায় তাকেই نَاشِئَةٌ বলা হয়। ইবনে যায়েদও এ মত পোষণ করতেন।
৪. হযরত ইকরামা (রা.) বলেছেন, রাতের প্রথম অংশে তাহাজ্জুদের নামাজে দাড়ানোকে نَاشِئَةَ اللَّيْلِ বলা হয়।
৫. আল্লামা বাগাবী হযরত যাইনুল আবেদীন (র.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম হুসাইন (রা.) মাগরিব ও এশার মধ্যে নফল নামাজ আদায় করতেন এটিই হলো نَاشِئَةَ اللَّيْلِ।
৬. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এশার নামাজের পর প্রত্যেক নামাজকেই نَاشِئَةٌ বলা হয়।
৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইবনে জোবায়ের (রা.)-কে نَاشِئَةٌ শব্দটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়েই বলেছেন, সমস্ত রাত ইবাদত করাই হলো نَاشِئَةٌ। -[নূরুল কোরআন]

هِىَ أَشَدُّ وَطْأً-এর ব্যাখ্যা : وَطْأً শব্দটি যদি بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُوْنِ الطَّاءِ অর্থাৎ ضَرَبَ-এর ওজনে হয় তখন এটার অর্থ হবে- অর্থাৎ শাসানো, পিশানো। তখন আয়াতের مَطْلَبْ হবে- রাত্রির নামাজ আত্মাকে তার খাহেশ অনুসারে নাজায়েজ পন্থায় পরিচালিত হওয়া হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ বড়োই কার্যকর ক্ষমতা রাখে।

আর যদি وِطَاءً অর্থাৎ كِتَابٌ-এর ওজনে যদি নেওয়া হয়, তখন এটা مُوَافَقَتْ بِمَعْنٰى مُوَاطَاةٌ মাসদারের অর্থে হবে।

وَاَقْوَمُ قِيْلًا-এর তাৎপর্য : اَقْوَمُ শব্দের অর্থ হলো- অতি উত্তম পর্যায়ে সঠিক ও অতি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কুরআন তেলাওয়াত অতি শুদ্ধ ও অন্তরে স্থাপিত হওয়ার ক্ষেত্রে উপযোগী হয়। কেননা বিভিন্ন প্রকার আওয়াজ ও শব্দ সেই সময় হট্টগোল করে না, বরং নীরব থাকে।

সারকথা হলো, উক্ত আয়াত দ্বারা قِيَامُ اللَّيْلِ-এর حِكْمَتْ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। রাত্রিকালে শেষ রাত্রে কুরআন তেলাওয়াত করা দ্বারা আত্মার কি শান্তি এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে এটার কি ফলাফল তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

তাহাজ্জুদ নামাজের হুকুম দেওয়ার কারণ : আর উক্ত আয়াতগুলো হতে সূক্ষ্মভাবে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামাজের হুকুম আল্লাহ তা'আলা এ জন্য দান করেছেন যে, তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করে মানুষ কষ্ট করে ইবাদত করার জন্য ভালোভাবে যেন অভ্যস্ত হয়। আর রাত্রিবেলায় গভীর নিদ্রা ও আরামকে নষ্ট করে আল্লাহর পথে আত্মার সাথে একটি অতি বড় জেহাদ করা হচ্ছে। এটা দ্বারা ভারি বোঝাসম্পন্ন -এর ভার বহন করার ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয় এবং তা পালন করা যাতে সহজতর হয়। তাই কবি বলেন- اَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوٰى * وَمَا كَرَّمَ الْمَرْءَ اِلَّا التُّقٰى

অনুবাদ :

٧. اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا تَصَرُّفًا فِىْ اِشْتِغَالِكَ لَا تَفْرُغُ فِيْهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ .

৭. নিশ্চয় দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে সুদীর্ঘ কর্ম-ব্যস্ততা তোমার কাজ-কর্মের ব্যস্ততা, যদ্দরুন তুমি তাতে তিলাওয়াতে কুরআনের অবকাশপ্রাপ্ত হও না।

٨. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اَىْ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ اِبْتِدَاءِ قِرَاءَتِكَ وَتَبَتَّلْ اِنْقَطِعْ اِلَيْهِ فِى الْعِبَادَةِ تَبْتِيْلًا مَصْدَرُ بَتَّلَ جِئَ بِهِ رِعَايَةً لِلْفَوَاصِلِ وَهُوَ مَلْزُوْمُ التَّبَتُّلِ .

৮. আর তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো অর্থাৎ তেলাওয়াতের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করো। আর মগ্ন হও অন্যদের হতে বিচ্ছিন্ন হও তাঁর প্রতি ইবাদত প্রাক্কালে একনিষ্ঠভাবে تَبْتِيْلًا শব্দটি بَتَّلَ-এর مَصْدَرٌ আয়াতের فَوَاصِلْ-এর সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে এ ওজনে আনয়ন করা হয়েছে। আর এটা تَبَتُّلْ-এর مَلْزُوْم হিসেবে ব্যবহৃত।

٩. هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا مَوْكُوْلًا لَهُ اُمُوْرَكَ .

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, অতএব তাঁকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো তোমার যাবতীয় বিষয়কে তাঁরই প্রতি সোপর্দ করো।

١٠. وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ اَذَاهُمْ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا لَا جَزَعَ فِيْهِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِقِتَالِهِمْ .

১০. আর লোকেরা যা বলে, তাতে ধৈর্যধারণ করো অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফিরগণ, তোমাদের উত্যক্ত করে আর তাদেরকে সৌজন্য সহকারে এড়িয়ে চলো যাতে কোনোরূপ অভিযোগ অনুযোগের অভিব্যক্তি থাকবে না। আর এ বিধানটি জিহাদ সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেকার বিধান।

١١. وَذَرْنِىْ اُتْرُكْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ عَطْفٌ عَلَى الْمَفْعُوْلِ اَوْ مَفْعُوْلٌ مَعَهُ وَالْمَعْنٰى اَنَا كَافِيْكَهُمْ وَهُمْ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ اُولِى النَّعْمَةِ التَّنَعُّمِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا مِنَ الزَّمَنِ فَقُتِلُوْا بَعْدَ يَسِيْرٍ مِنْهُ بِبَدْرٍ

১১. আর আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে অবকাশ দাও এবং অসত্যারোপকারীদেরকে এটা পূর্বোক্ত مَفْعُوْلٌ-এর আতফ অথবা مَفْعُوْلٌ مَعَهُ এটার অর্থ এই যে, আমিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট। আর 'তারা' বলতে কোরায়শ দলপতিদের বুঝানো হয়েছে। যারা অনুগ্রহরাজির অধিকারী বিলাস সামগ্রীর অধিকারী। আর তাদেরকে সামান্য অবকাশ দান করো স্বল্প সময়ের জন্য। যেমন, এর কিছুকাল পরই বদর যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছিল।

١٢. اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا قُيُوْدًا ثِقَالًا جَمْعُ نِكْلٍ بِكَسْرِ النُّوْنِ وَجَحِيْمًا نَارًا مُحْرِقَةً .

১২. আমার নিকট রয়েছে শৃঙ্খলসমূহ শক্ত বন্ধনীসমূহ, শব্দটি নূন-এ যের যোগে نِكْلٌ শব্দের বহুবচন। আর প্রজ্বলিত অগ্নি জ্বলন্ত আগুন।

١٣. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ يُغَصُّ بِهِ فِى الْحَلْقِ وَهُوَ الزَّقُّوْمُ اَوِ الضَّرِيْعُ اَوِ الْغِسْلِيْنُ اَوْ شَوْكٌ مِنْ نَارٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يَنْزِلُ وَعَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا زِيَادَةً عَلٰى مَا ذُكِرَ لِمَنْ كَذَّبَ النَّبِىَّ ﷺ .

১৩. আর গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য যা গলদেশে আটকে পড়ে, এটা দ্বারা زَقُّوْم বা ضَرِيْع কিংবা غِسْلِيْن অথবা অগ্নিকণ্টক উদ্দেশ্য। যা গলায় বিদ্ধ হয়ে থাকে, বের হয় না এবং গিলে ফেলাও যায় না। এবং পীড়াদায়ক শাস্তি কষ্টদায়ক, উল্লিখিত শাস্তির অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে। আর এটা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি অসত্যারোপণের বিনিময়।

١٤. يَوْمَ تَرْجُفُ تَزَلْزَلُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا رَمْلًا مُجْتَمِعًا مَهِيْلًا سَائِلًا بَعْدَ اِجْتِمَاعِهِ وَهُوَ مِنْ هَالَ يَهِيْلُ وَاَصْلُهُ مَهْيُوْلٌ اُسْتُثْقِلَتِ الضَّمَّةُ عَلَى الْيَاءِ فَنُقِلَتْ اِلَى الْهَاءِ وَحُذِفَتِ الْوَاوُ ثَانِى السَّاكِنَيْنِ لِزِيَادَتِهَا وَقُلِبَتِ الضَّمَّةُ كَسْرَةً لِمُجَانَسَةِ الْيَاءِ.

১৪. সেদিন প্রকম্পিত হবে কেঁপে উঠবে। পৃথিবী ও পর্বতমালা এবং পবর্তমালা বালুকারাশিতে পরিণত হবে একত্রীভূত বালি যা হবে প্রবহমান একত্রিত হওয়ার পর বহমান। مَهِيْلًا শব্দটি هَالَ - يَهِيْلُ হতে নিষ্পন্ন, মূলত তা ছিল مَهْيُوْلٌ - ى -এর মধ্যে পেশকে কঠিন জ্ঞান করে তাকে পূর্ববর্তী هَا -এর মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে দু'টি সাকিন একত্রিত হওয়ায় وَاوْ অতিরিক্ত বর্ণ হিসেবে তাকে বিলুপ্ত করা হয়। অতঃপর هَا মধ্যকার পেশটিকে ى-এর সাথে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে যের যোগে পরিবর্তন করা হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقِ : হামযা, কিসায়ী, আবূ বকর, ইবনে আমের رَبِّ এ- جَرٌّ দিয়েছেন رَبِّكَ-এর صِفَتٌ বা بَدَلٌ অথবা عَطْفُ بَيَانٍ হিসেবে। আর বাকি ক্বারীগণ رَبُّ -কে مُبْتَدَأٌ হিসেবে رَفْعٌ দিয়ে পড়েছেন। তাঁদের মতে এ مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আর কেউ কেউ এটাকে مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ -এর خَبَرٌ বলে দাবি করেছেন। সে مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ টি হলো هُوَ আর যায়েদ ইবনে আলী এটাকে نَصَبٌ দিয়েছেন مَدْحٌ হিসেবে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ سَبْحًا طَوِيْلًا : জমহুর سَبْحًا অর্থাৎ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ হিসেবে পড়েছেন অর্থ ব্যস্ততা। আর ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার, আবূ ওয়ায়েল, ইবনে আবী আবলা خَاءٌ مُعْجَمَةٌ এ- سَبْخًا দিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ আরাম-আয়েশ করার অবকাশ তার জন্য রয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর উভয় শব্দকে مُفْرَدٌ হিসেবে اَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পড়েছেন। ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস বহুবচন হিসেবে اَلْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

قَوْلُهُ قَلِيْلًا : قَلِيْلًا শব্দটি مَصْدَرٌ مَحْذُوْفٌ -এর صِفَتٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অথবা زَمَانٌ مَحْذُوْفٌ -এর صِفَتٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। প্রথম অবস্থায় তার تَقْدِيْرٌ হবে تَمْهِيْلًا قَلِيْلًا আর দ্বিতীয় অবস্থায় تَقْدِيْرٌ হবে زَمَانًا قَلِيْلًا।

يَوْمَ تَرْجُفُ -এর يَوْمَ শব্দটি مَنْصُوْبٌ হওয়ার কারণ : يَوْمٌ - ظَرْفٌ টি ذَرْنِيْ দ্বারা مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অথবা, عَذَابٌ -এর صِفَتٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তখন এক مَحْذُوْفٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হবে আর তা হলো عَذَابًا وَاقِعًا يَوْمَ تَرْجُفُ অথবা اِلَيْنَا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

تَرْجُفُ -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : تَرْجُفُ শব্দটি জমহুর تَاءٌ তে فَتْحٌ এবং جِيْمٌ -এ পেশ দিয়ে فِعْلٌ مَعْرُوْفٌ পড়েছেন। আর যায়েদ ইবনে আলী একে مَجْهُوْلٌ করে تُرْجَفُ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রাত্রিবেলায় জাগরণ করে ইবাদতে, নামাজে মাশগুল থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, অতঃপর আলোচ্য আয়াতে দিন বাদ দিয়ে রাত্রিবেলাকে কেন ইবাদতের জন্য মনোনীত করেছেন। তার কারণ বিবৃত করেছেন, এরপর কিয়ামুল-লাইলের সময় কোন আমল উত্তম সেদিকে আলোকপাত করেছেন। –[কাবীর]

قَوْلُهُ اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا : سَبْح-এর শাব্দিক অর্থ- প্রবহমান হওয়া বা ঘুরাফিরা করা, আর পানিতে সাঁতার কাটাকেও سَبْح বলা হয়। আর পানিতে কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ব্যতীত সাঁতার কাটাই সহজ কার্য; তাই এটাকে سَبَاحَتْ ও বলা হয়। উক্ত আয়াতে বর্ণিত سَبْح-এর অর্থ দিনের বেলায় দুনিয়ার কাজকর্ম অথবা ধর্মীয় তাবলীগ এবং শিক্ষাদীক্ষা اَصْلَاحُ خَلْقٌ অথবা স্বীয় জিবীকা নির্বাহের জন্য যাবতীয় উপকরণে ব্যস্ত থাকা সবই দাখিল রয়েছে ।

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতটুকুর দু'টি তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন–

১. দিনের বেলায় আপনার নিজস্ব নানা ব্যস্ততা রয়েছে, ফলে আল্লাহর খেদমতে সময় ব্যয় করা সম্ভব নাও হতে পারে, এ কারণেই রাত্রিতে আপনাকে নামাজ ও ইবাদত আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
২. রাত্রিকালে ঘুম এবং আরাম করতে গিয়ে যদি কখনো নামাজ পড়া বা ইবাদত করা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে দিনের বেলায় রয়েছে আপনার জন্য যথেষ্ট সময়। এ সময় আপনি তা আদায় করতে পারেন। –[কাবীর]

হযরাতে ফুকাহায়ে কেরামগণ বলেন, উক্ত আয়াত হতে এ কথা সাব্যস্ত হয় ওলামা মাশায়েখগণ تَعْلِيْم وَتَرْبِيَتْ وَاِصْلَاحُ خَلْقٌ -এর কার্যে নিবেদিত থাকেন, তাঁদের জন্যও উচিত দিনের বেলায় তাঁরা সে কার্যগুলো সমাধান করে ফেলবেন, আর রাত্রির সময়টাকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা কর্তব্য বা উচিত। ওলামায়ে সলফ এরূপই করতেন। কখনো বা যদি রাত্রিবেলায়ও সে কার্যগুলো করার আবশ্যকতা দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা।

قَوْلُهُ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "তোমার রবের নামের জিকির করতে থাকো। আর সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই হয়ে থাকো।" আলোচ্য আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে দু'টি কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– ১. আল্লাহর নামের জিকির, ২. একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহতে মগ্ন হওয়া।

গ্রন্থকার "আল্লাহর নামের জিকির করো" এটার অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এটার অর্থ হলো, তেলাওয়াতের পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া। কিছু কিছু তাফসীরবিদ লিখেছেন, দিনের বেলার ব্যতিব্যস্ততার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে– 'তোমার রবের নামে জিকির করতে থাকো।' এরূপ বলায় এ তাৎপর্য স্বতই প্রকাশিত হয় যে, দুনিয়ায় সর্বপ্রকারের কাজ করতে থাকা অবস্থায়ও তোমার রবের স্মরণ হতে তুমি গাফিল হয়ে থেকে না। যেভাবেই হোক তাঁর জিকির অবশ্যই করতে থাকবে।

আর কেউ বলেছেন, এটার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার 'আসমায়ে হুসনা' দ্বারা তাঁকে ডাকা। শেখ আলী আল্ছায়েছ বলেছেন, এটার অর্থ ব্যাপক; সর্বদা তাসবীহ, তাহমীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কুরআন এসব জিকির হতে বিরত না রাখে, তোমার সব কাজের উদ্দেশ্য যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে থাকে। –[আহকামুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দ্বিতীয় যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলাতে মগ্ন থাকা। মূলশব্দ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا এখানে تَبَتَّلْ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– বিচ্ছিন্ন হওয়া, সম্পর্ক ছিন্ন করা। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ মনে ও গভীর ঐকান্তিকতার সাথে মনোনিবেশ করার কথা বলা হয়েছে। এটা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়নি; বরং মনের যাবতীয় দুঃখ-বেদনা, চিন্তা ও অলীক কল্পনা যা কিছু মানসিক ক্ষেত্রে উদয় হয়ে থাকে, তাকে মন হতে ধুয়ে মুছে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে– আপনার প্রতিপালকের ইবাদত ও আরাধনায় এমনভাবে মাশগুল হোন, যেন মনে অন্য কোনো পার্থিব চিন্তা ও কল্পনার স্থান না থাকে। মনকে সর্বপ্রকার চিন্তামুক্ত করে পূর্ণরূপে তাঁর দিকে একনিষ্ঠ হোন, তাঁর ধ্যানের সাগরে ডুবে প্রেমের অমিয় সুধা পান করুন।

আর ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভে রত হওয়া অর্থাৎ মনের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে রাখা, আর অন্য সব কিছু থেকে মনকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ : وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ-এর তাফসীর লিখেছে قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ আপনার তেলাওয়াতের পূর্বে আপনি বিসমিল্লাহ তেলাওয়াত করে নিবেন।

আল্লামা যমখশরী বলেন, আপনি আমার স্মরণে দিন-রাত মশগুল থাকুন এবং ذِكْرٌ দ্বারা তাসবীহ, তাকবীর, তেলাওয়াতে কুরআন সব কিছুই শামিল করে। –[মাদারিক]

আর এখানে اُذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ الخ দ্বারা আল্লাহর স্মরণে এমনভাবে সার্বক্ষণিক লিপ্ত থাকা বুঝানো হয়েছে, যাতে কখনও গাফেল না হওয়া অথবা কসূরী না করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা وَاذْكُرْ رَبَّكَ না বলে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলার কারণ : ذِكْرٌ -কে اِسْم-এর সাথে مُقَيَّدْ করে বলার দ্বারা সম্ভবত ইশারা এই যে, اِسْمِ رَبِّ অর্থাৎ اَللّٰهُ اَللّٰهُ জিকিরের تَكْرَارْ-এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা।

জাস্সাস (র.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, কারো কারো মতে আয়াতের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার أَسْمَاءُ حُسْنَى সমূহ দ্বারা তাঁকে ডাকতে থাকো।

অথবা, কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে রাত-দিন তাঁর জিকিরে লিপ্ত থাকো। যে কোনো প্রকার ব্যস্ততা যেন তোমাকে আল্লাহর জিকির হতে গাফেল না করে। আর তোমার সকল কার্যই যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا : উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, যিনি পবিত্র ও মহান সত্তা مَشْرِقْ وَمَغْرِبْ তথা সারা জগতের সমস্ত প্রয়োজনসমূহ পূরণকারী, তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার ক্ষেত্রে একমাত্র উপযুক্ত তিনি রয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রতি ভরসা করো, আর তাঁর উপর যে ভরসা রাখবে সে কখনো বঞ্চিত হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ ভাগ্যে লিখিত পূর্ণ রিজক গ্রহণ করবে না। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তাই তোমরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য লেগে যাও।

এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, تَرْكِ دُنْيَا তাকে বলা হয় না যে, তোমরা আল্লাহর হালালকে তোমাদের জন্য হারাম করে নিবে। অথবা তোমাদের জন্য যে সম্পদ আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন তাকে অনর্থক উড়িয়ে দিবে; বরং تَرْكِ دُنْيَا বলা হয় তাকেই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। তাতে তোমাদের হাতের সম্পদ হতে অধিকতর ভরসা রাখবে।

قَوْلُهُ وَكِيلًا : যার উপর নিজের কাজের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাকেই বলা হয় উকিল। আমরা আমাদের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য উকিল নিয়োগ করি। সে আমাদের পক্ষ হতে যা কিছু করা প্রয়োজন তা করবে বলে তার প্রতি আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে। আমাদের এ বিশ্বাসও থাকে যে, সে আমাকে মোকদ্দমায় জয়ী করে দিবে। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে উকিল নিয়োগ করার অর্থ হলো– আপনার যাবতীয় ব্যাপারগুলো আল্লাহর নিকট সোপর্দ করুন, তাঁকেই আপনার কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করুন। তিনিই আপনার যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিবেন। কেননা তাঁর তুলনায় বড় শক্তিমান কেউ নেই। তিনি দিবারাত্রি অর্থাৎ দুনিয়ার বুকে যাবতীয় ব্যাপারে ঘটক ও নিয়ন্ত্রণক। তিনি আপনার উকিল হলে আপনার কোনোই চিন্তা থাকতে পারে না। দীনকে প্রতিষ্ঠা করা, কাফেরগণকে দমন করা, তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎকরণে তিনিই ক্ষমতাবান। এটার প্রতিবিধানের দায়-দায়িত্ব তাঁর কাছে ছেড়ে দিন।

قَوْلُهُ وَاصْبِرْ عَلٰى .... هَجْرًا جَمِيلًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর লোকের যেসব কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে সেজন্য তুমি ধৈর্যধারণ করো, আর সৌজন্য রক্ষাসহকারে তাদের হতে সম্পর্কহীন হয়ে যাও।" অর্থাৎ আপনি যখন আমাকে উকিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন এ কাফেররা আপনার সম্পর্কে যাই বলুক তাতে কর্ণপাত না করে তাদের ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দিন, কারণ আমি যখন আপনার উকিল হয়েছি আপনার এ সমস্যার সমাধান আপনার নিজের চেয়ে উত্তমভাবে করার দায়িত্ব আমার। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا : এ আয়াতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করে সামাজিক জীবনে একঘরে হয়ে থাকার কথা বলা হয়নি– বলা হয়নি আত্মীয়তার ও বংশীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে; বরং তাদের কটূক্তির প্রতিবাদ না করা, তাদের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে যা কিছু বলছে ও করছে, সেসব আজেবাজে বিষয়কে আপনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে চলুন। তার কোনো জবাব ও প্রতিকারে যাবেন না। এ উপেক্ষা ও পরিত্যাগের নীতির সাথে কোনোরূপ অস্বস্তি ও ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। একজন সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও নীতিবান লোকের পক্ষে এহেন অবাঞ্ছিত লোকদের কথায় কর্ণপাত না করাই শ্রেয়। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ হতে এ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, নবী করীম ﷺ-এর আচার-ব্যবহার খারাপ ছিল বা তিনি তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, বরং এ নির্দেশ দ্বারা কাফেরগণকে এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্যে যে, তোমাদের অশোভনীয় উক্তির প্রতিবাদ না করা মুহাম্মদ ﷺ -এর দুর্বলতার জন্য নয়, বরং প্রতিবাদ না করাই হলো আল্লাহর নির্দেশ। এ জন্যই তিনি প্রতিবাদ হতে বিরত থাকতেন।

মুফাস্সিরগণ বলেছেন, 'আল-হাজরুল জামীল' -এর অর্থ হলো কষ্ট না দিয়ে তিরস্কার না করে সম্পর্কচ্ছেদ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জিহাদ ফরজ হওয়ার পূর্বে। অতঃপর জিহাদ ফরজ হলে এ হুকুম মানসূখ হয়ে যায়। এটার হিকমত এই যে, মু'মিনগণ মক্কায় সংখ্যায় কম ছিল, তারা সেখানে দুর্বল ছিল, এ কারণেই তাদেরকে ধৈর্য অবলম্বন করতে কষ্ট সহ্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদ আদায় করে ইবাদতে মশগুল থেকে দুশমনের মোকাবিলাকরণের আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের তারবিয়াত গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, পরে যখন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন দুশমনদের মোকাবিলায় ইস্পাতনির্মিত প্রাচীরের মতো দাঁড়াবার নির্দেশ দেওয়া হলো; কিন্তু এ শক্তি সঞ্চয় করার পূর্বে কেবল মৌখিক দাওয়াত ও ধৈর্য অবলম্বন করা অপরিহার্য। –[সাফওয়া, কাবীর]

অপর এক দল মুফাসসির বলেছেন, এ আয়াত মানসূখ হয়নি; বরং এটার তাৎপর্য এই যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হিকমত অবলম্বন করত সম্পর্ক ছিন্ন করা বা উপদেশ করে চলা। ইমাম রাযী (র.) এ দ্বিতীয় মতকেই অধিক সহীহ বলে মত পোষণ করেছেন। –[কাবীর]

هَجْرًا جَمِيْلًا-এর কয়েদ লাগানোর কারণ : কাফের ও মুশরিকগণ হতে যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে যে সকল গালি-গালাজ ইত্যাদি করত তাদের থেকে এটার প্রতিশোধ নিতে বলা হয়নি, বরং তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করার মুহূর্তে সাধারণত মানবিক অভ্যাস হলো কিছু ভালোমন্দও বলে ফেলে, তাই হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, আপনি উত্তম চরিত্রবান ও মহাসম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে আপনার জন্য শোভনীয় হবে যেন তাদেরকে ভালোমন্দ কিছুই না বলেন, যাতে আপনার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ هَجْر جَمِيْل আপনার জন্য একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا : হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান করার জন্য কাফিরদের উপর আখিরাতের আজাব সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন– কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারে আপনি অধৈর্য হওয়া ঠিক হবে না; বরং আপনি ছেড়ে রাখুন তাদেরকে এবং আমাকে তাদের পাকড়াও করার জন্য একটু সুযোগ দিন। কেননা তারা আপনার কথায় কান না দিয়ে আল্লাহর দীন-ধর্ম, হক ও সত্যকে না মেনে তাদের ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশে মেতে রয়েছে। একটু পরেই আমি তাদের সাথে বুঝাপড়া করছি।

قَوْلُهُ تَعَالَى مَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা সে কাফেরদেরকে مَهْل قَلِيْل দেওয়ার কথা বলেছেন, مَهْل كَثِيْر বলেননি, এটার ব্যাখ্যায় হাকিম (র.) তার اَلْمُسْتَدْرَكْ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) হতে সহীহ সনদ বর্ণনা করে বলেন, বেশি সময়ের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাদের সময় ঘনিয়ে আসছিল। এ অবস্থা হওয়ার কিছু দিন পরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বদরের ময়দানে নিঃসহায় অবস্থায় মুসলমানদের হাতে হত্যা করিয়েছেন। –[কাবীর]

এতে বুঝা যায়– যারা আখেরাতকে অসত্য বলে মনে করে তারাই দুনিয়ার সকল نَازْ وَنِعْمَتْ পেয়ে তাতে মত্ত হয়ে যায়। তবে কখনো বা ঈমানদারগণকেও এ সকল নিয়ামত দেওয়া হয় কিন্তু তারা সে নিয়ামত পেয়ে তাতে এমনিভাবে মাতাল হয় না, যেমনি কাফেরগণ হয়ে থাকে। –[মা'আরিফ]

اَلْمُكَذِّبِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمُكَذِّبِيْنَ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ বিষয়ে অধিকাংশ তাফসীরকারদের অভিমত হলো, কুরাইশদের নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমনি মাদারিক ও জালালাইন গ্রন্থকারদ্বয় ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আল-ক্বালামের আয়াতে রয়েছে– فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ الخ সে সমস্ত মক্কার কুরাইশ বংশীয় লোকদেরকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى اُولِى النَّعْمَةِ : اُولِى النَّعْمَةِ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে– এ কথাটি হতে স্পষ্ট মনে হয় মক্কার যে সমস্ত লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অগ্রাহ্য ও অমান্য করত, তারা নানারূপে ধোঁকা দিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ উজ্জীবিত করত, আর জনগণকে রাসূলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিল তাদের প্রতিই আয়াতাংশ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا .... وَّعَذَابًا اَلِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমাদের নিকট (এদের জন্য) দুর্বহ বেড়ি আছে, আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, গলায় আটকিয়ে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আজাবও।" অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত অস্বীকার করেছে, রাসূল সম্পর্কে নানাকথা প্রচার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কাছে চার রকমের আজাব। ১. তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে, ২. দাউ দাউ করা আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, ৩. গলায় আটকানো-খাদ্য খেতে দেওয়া হবে এবং ৪. এটার অতিরিক্ত আরও কষ্টকর আজাব দেওয়া হবে।

اَنْكَالًا-এর অর্থ : اَنْكَال শব্দটি বহুবচন, একবচনে نِكْل অর্থ– শিকল, বেড়ি। ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, اَنْكَال হলো অগ্নি দ্বারা তৈরি শিকলসমূহ।

বড় দুর্বহ বেড়ি পরিয়ে দেওয়ার কারণ : জাহান্নামে বড় ও দুর্বহ বেড়ি পাপী ও অপরাধী লোকদের পায়ে বেঁধে দেওয়া হবে; কিন্তু এটা এ জন্য নয় যে, এরূপ বেড়ি না পরালে তারা পালিয়ে যেতে পারে বলে ভয় করা হবে; বরং এ বেড়ি পরানোর আসল উদ্দেশ্য হলো, এটার দরুন তারা উঠতে ও চলাফেরা করতে পারবে না, এটা শাস্তির বেড়ি, এ শাস্তির উপর শাস্তি, শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এটা পরানো হবে। পালিয়ে যাওয়া হতে বিরত রাখা এটার উদ্দেশ্য নয়। কেননা জাহান্নাম হতে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই।

قَوْلُهُ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ الخ : যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে, সেদিন থেকেই শুরু হবে কাফের মুশরিক ও বে-দীনদের কঠোর শাস্তি। এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া থেকে জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোজখীরা দোজখে পৌঁছা পর্যন্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, كَثِيْبًا مَّهِيْلًا-এর অর্থ হলো এমন বস্তুর স্তূপ যে তার কোনো অংশ যদি তুমি উঠিয়ে নাও তবে সাথে সাথে সে স্থলে অন্য একটি অংশ এসে যাবে, তাফসীরকার কালবী (র.)ও এ মতই পোষণ করেছেন।

–[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

١٥. اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ رَسُوْلًا هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْكُمْ مِنَ الْعِصْيَانِ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا وَهُوَ مُوْسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

১৫. নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের প্রতি, হে মক্কাবাসীগণ, এমন একজন রাসূল তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ যিনি সাক্ষ্য প্রদানকারী তোমাদের উপর, কিয়ামতের দিবসে তোমাদের পক্ষ থেকে যে সকল নাফরমানিমূলক কার্য প্রকাশ পায় সে বিষয়ে যেরূপ আমি প্রেরণ করেছি, ফিরআউনের নিকট একজন রাসূল। তিনি ছিলেন হযরত মূসা (আ.)।

١٦. فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا شَدِيْدًا.

১৬. অতঃপর যখন অবমাননা করেছিল ফিরআউন উক্ত রাসূলকে তখন আমি (ফলে) তাকে পাকড়াও করেছিলাম খুব কঠোরভাবে সুকঠিনভাবে।

١٧. فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ فِى الدُّنْيَا يَوْمًا مَفْعُوْلُ تَتَّقُوْنَ اَىْ عَذَابَهُ اَىْ بِاَىِّ حِصْنٍ تَتَحَصَّنُوْنَ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا جَمْعُ اَشْيَبَ لِشِدَّةِ هَوْلِهٖ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَالْاَصْلُ فِىْ شِيْنِ شِيْبًا الضَّمُّ وَكُسِرَتْ لِمُجَانَسَةِ الْيَاءِ وَيُقَالُ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ يَوْمٌ يُشَيِّبُ نَوَاصِىَ الْاَطْفَالِ وَهُوَ مَجَازٌ وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ فِى الْاٰيَةِ الْحَقِيْقَةَ.

১৭. অতএব, কেমন করে তোমরা আত্মরক্ষা করবে যদি কুফরি কর, দুনিয়াতে, সেই দিবসে يَوْمًا টি تَتَّقُوْنَ -এর مَفْعُوْلُ অর্থাৎ তাঁর শাস্তি হতে, অর্থাৎ কোন কিল্লায় তোমরা আশ্রয় গ্রহণ করবে সেদিনের আজাব হতে? যেদিন বানিয়ে দিবে বালকদেরকে বৃদ্ধ। شَيْب টি اَشْيَبُ-এর বহুবচন, দিনের ভয়াবহতার দরুন আর তা হলো কিয়ামতের দিন। আর شِيْبًا -এর شِيْن -এ ضَمَّةٌ হওয়া বিধেয় ছিল, يَاءٌ -এর সম্পর্কের দরুন তাতে كَسْرَةٌ দেওয়া হয়েছে। আর কোনো কঠিন দিন সম্পর্কে বলা হয়। তা বালকদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে ছাড়বে, এটা مَجَازٌ হিসেবে। আর আয়াতের حَقِيْقِىْ অর্থও উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে।

١٨. اَلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ ذَاتُ انْفِطَارٍ اَىْ اِنْشِقَاقٍ بِهٖ ط بِذٰلِكَ الْيَوْمِ لِشِدَّتِهٖ كَانَ وَعْدُهٗ تَعَالٰى بِمَجِيْءِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَفْعُوْلًا اَىْ هُوَ كَائِنٌ لَامُحَالَةَ.

১৮. আসমান ফেটে যাবে যেদিন ফাটলযুক্ত টুকরা টুকরা হওয়ার অবস্থা সেদিনটির ভয়াবহতার কারণে নিঃসন্দেহে তাঁর ওয়াদা সেদিনের আগমন সম্পর্কে আল্লাহর অঙ্গীকার, প্রতিপালিত হবে। অর্থাৎ তা কার্যে পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

١٩. اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الْمُخَوِّفَةَ تَذْكِرَةٌ ج عِظَةٌ لِلْخَلْقِ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا طَرِيْقًا بِالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ.

১৯. নিঃসন্দেহে এটা ভয় প্রদর্শনকারী আয়াতসমূহ উপদেশবাণী স্বরূপ। মাখলুকাতের জন্য নসিহত। অতএব, যার ইচ্ছা হয়! সে অবলম্বন করুক তার প্রভুর পন্থা। ঈমান ও আনুগত্যের পথ গ্রহণ করুক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى "يَوْمًا" : يَوْمًا শব্দটি তারকীবে تَتَّقُوْنَ-এর مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে। ইবনুল আনবারী বলেছেন, কেউ কেউ يَوْمًا-কে كَفَرْتُمْ-এর مَفْعُوْل بِهٖ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে বলে দাবি করেছেন। আল্লামা শাওকানী এটাকে জঘন্য বলে মনে করেছেন, কারণ তখন অর্থ হবে "কিভাবে তোমরা আল্লাহর আজাব হতে বাঁচবে যদি সেদিন কুফরি কর যেদিন তরুণরা ভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে।" আর এটা অসম্ভব। কারণ কিয়ামত দিবসে কেউ কুফরি করতে সাহস করবে না।

اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرَةٌ না বলে مُنْفَطِرٌ বলার কারণ : আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী اَلسَّمَاءُ শব্দটি مُؤَنَّثٌ সুতরাং তার خَبَرٌ ও مُؤَنَّثٌ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়েছে مُذَكَّرٌ এর কারণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা রয়েছে– ১. এখানে اَلسَّمَاءُ-কে شَيْئٌ-এর স্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কারণ তখন দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়ার পর আসমান আর আসমান থাকবে না شَيْئٌ-এ পরিণত হবে। ২. আবূ আমর ইবনে আলা বলেন, اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرَةٌ বলা হয়নি এ কারণে যে, তার مَجَازٌ হলো سَقْفٌ ৩. ফাররা বলেছেন, اَلسَّمَاءُ শব্দটি اِسْمُ جِنْسٍ সুতরাং مُذَكَّرٌ এবং مُؤَنَّثٌ উভয়ই হতে পারে। ৪. আবূ আলী আল-কারেসী বলেছেন, এটা اِمْرَأَةٌ مُرْضِعٌ -এর মতো। অর্থাৎ এখানে ذَاتٌ একটি مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। সুতরাং تَقْدِيْرٌ হলো اَلسَّمَاءُ ذَاتُ مُنْفَطِرٍ। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে কাফিরদের নাফরমানী এবং নাফরমানির সাজা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। অত্র আয়াতসমূহে মক্কাবাসী তথা জগৎবাসীদেরকে তাদের নাফরমানি হতে ফিরানোর জন্য ফিরআউনের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে শতর্ক করা হচ্ছে।

ফেরাউন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর উদাহরণ দানের কারণ : আল্লাহ তা'আলা এ উদাহরণ দ্বারা মক্কার কাফেরগণকে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা যদি সত্য পথের আশ্রয় গ্রহণ না কর এবং আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাক তবে তোমাদের এ পার্থিব জীবনে চরম দুর্দশায় নিপতিত হতে হবে এবং পরকালে থাকবে তোমাদের জন্য চরম শাস্তি। তোমাদের আমার শাস্তি হতে পালাবার কোনোই উপায় থাকবে না। –[আবূ দাউদ]

বিশেষত হযরত মূসা (আ.) এবং ফেরাউনের উল্লেখ করার কারণ : আল্লামা খাযেন বলেছেন, অন্যান্য নবী-রাসূল এবং উম্মতের উদাহরণ বাদ দিয়ে বিশেষ হযরত মূসা (আ.) এবং ফেরাউনকে ইতিহাসের পাতা হতে টেনে আনার কারণ হলো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে মক্কাবাসীগণ কষ্ট দিয়েছে এবং এ কারণে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা করেছিল যে, তিনি তাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছিলেন। ঠিক তেমনি হযরত মূসা (আ.)-কেও ফেরাউন অবজ্ঞা করেছিল এ কারণে যে, তিনি তার বাড়িতে লালিতপালিত হয়েছিলেন। –[খাযেন]

আল্লাহ তা'আলা এখানে ফিরআউনকে শাস্তিদান করা এবং তার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-ঐশ্বর্য যে তাকে আল্লাহর আজাব হতে বাঁচাতে পারেনি এ কথা বলার পর আবার মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে পরকালের কথা এবং পরকালের শাস্তির আলোচনা করে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, ফিরআউন যেমন আল্লাহর আজাব হতে বাঁচতে পারেনি ঠিক তেমনি তোমরাও বাঁচতে পারবে না, যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত এবং তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার কর। এ প্রসঙ্গ আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَالَ تَعَالٰى : فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ـ

"সুতরাং তোমরা যদি সেদিনকে অস্বীকার কর তবে তোমরা কিভাবে শাস্তি হতে বাঁচবে, যেদিনের ভয়াবহতা তরুণকে বৃদ্ধে পরিণত করবে।" –[সাফওয়া]

অর্থাৎ তোমাদের মনে এ ভয় জাগ্রত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, তোমরা যদি আমার পাঠানো রাসূলকে অমান্য ও অগ্রাহ্য কর, তাহলে ফিরআউন অনুরূপ অপরাধের ফলে যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদেরকেও এ দুনিয়ায় অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে; কিন্তু মনে কর দুনিয়ায় তোমাদের উপর আজাব আসল না, তাহলে তোমরা বেঁচে গেলে ভাবছ নাকি? না, তা মনে করতে

পার না। কেননা দুনিয়ায় এ আজাব না আসলেও কিয়ামতের দিন এ আজাব ভোগ করতে তোমরা অবশ্যই বাধ্য হবে। তাহলে কিয়ামতের সে আজাব হতে তোমরা বেঁচে যাবে এমন কথা কি করে মনে করতে পার?

قَوْلُهُ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا : এটার তাৎপর্য বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। জালালাইন গ্রন্থকারের মতে এটার مَعْنَى حَقِيْقِىْ ও উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ সত্যই বালক বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে, বালক বালক অবস্থায় হাশর ময়দানে উঠবে না, তবে এ কথা দ্বারা পূর্ণবৃদ্ধ বয়স হওয়া আবশ্যক নয়; বরং বৃদ্ধ বয়সের ধাপে পৌঁছার অর্থও হতে পারে।

কারণ, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো বৃদ্ধ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ বালকের ন্যায় হয়ে বেহেশ্‌তে যাবে।

অথবা, এটা দ্বারা কিয়ামতের দিনের ভয়বাবহতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বালকগণও সেদিনের ভয়বাহ দুরবস্থা ও কঠিনতা সহ্য করতে করতে শেষ পর্যন্ত শক্তিহারা হয়ে বৃদ্ধদের অবস্থায় পৌঁছে যাবে।

আল্লামা তাবারানী (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম ﷺ একদিন উক্ত আয়াত يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا তেলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন, এটা কিয়ামতের দিন হবে, যখন হযরত আদম (আ.) বলবেন, কত থেকে কত সংখ্যাকে দোজখে নিতে হবে? তখন আল্লাহ বলবেন, প্রতি এক হাজার হতে ৯৯৯ জনকে দোজখে নিবেন। এ কথা শুনে প্রত্যেক বালক কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধদের মতো হয়ে যাবে। -[তাবারী, ইবনে কাছীর, সাফওয়া]

আল্লামা যামাখশারী বলেছেন, এটার তাৎপর্য হলো কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্যের বর্ণনা দান। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এমন দীর্ঘ হবে যে, দীর্ঘতার ফলে তরুণরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّمَاءَ ..... وَعْدُهُ مَفْعُوْلًا : "এবং যার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।" অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এতই ভয়াবহ ও কঠোর হবে যে, এ বিরাট আসমানও ভয়াবহতার দরুন দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। এ দিনের আগমন সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা খেলাফ করেন না। মুকাতিল বলেছেন, দীন ইসলাম বিজয়ী হওয়া সম্বন্ধীয় আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا : অর্থাৎ উপরোল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে উপদেশ বাণী স্বরূপ অর্থাৎ আল্লাহর আজাবের ভয়াবহতা বর্ণনার আয়াতগুলোর সাথে বাণী স্বরূপ। অতএব, যে চায় সে যেন ওয়াজ হিসেবে এটা গ্রহণ করে নেয়। আর তাকওয়া ও আল্লাহর ভয়-ভীতি অন্তরে স্থান দিয়ে যেন আল্লাহর পথে উপনীত হয়। এটাই হবে মানবিক দায়িত্ব। এটা দ্বারা ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি আগ্রহী করা হয়েছে।

এটার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি নাজাত কামনা করে সে যেন আল্লাহর পথ অনুসরণ করে।

قَوْلُهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا : দ্বারা প্রকাশ্যত বুঝা যায় যে, ঈমান গ্রহণ করা না করা বান্দার এখতিয়ারে দেওয়া হয়েছে এবং ঈমানের আবশ্যকতাও প্রকাশ পায় না।

এটার উত্তরে বলবো, এখানে যদিও প্রকাশ্যভাবে ঈমানের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বুঝা যায় না। এ ধারণা করা ঠিক হবে না। বরং আয়াতটিতে ঈমানের প্রতি কঠোরভাবে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতটি বুঝতে হলে সাধারণ ব্যবহারী একটি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই হয় যেমন কেউ কারো প্রতি রাগ হলে বলে যদি তুমি ভালো মনে কর তবে আমার সঙ্গেই এ পথে চল। নতুবা তোমার কোনো ক্ষতি হলে আমি জানি না। তদ্রূপ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ও তেমনি অর্থাৎ যারা বাঁচতে চাও তারা যেন সত্যের পথের পথিক হয়, অন্যথায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার সম্পর্কে আর আল্লাহ কিছু জানেন না। অপ্রকাশ্যভাবে যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ হতে দূরে রয়েছে তাদেরকে ধমক দেওয়া হচ্ছে এ নির্দেশের ব্যতিক্রমকারীদের পরকাল বেশি শুভ হবে না।

٢٠. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى اَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلٰى ثُلُثَيْ وَبِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلٰى اَدْنٰى وَقِيَامُهُ كَذٰلِكَ نَحْوَ مَا اُمِرَ بِهِ اَوَّلَ السُّوْرَةِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ط عَطْفٌ عَلٰى ضَمِيْرِ تَقُوْمُ وَجَازَ مِنْ غَيْرِ تَاكِيْدٍ لِلْفَصْلِ وَقِيَامُ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ كَذٰلِكَ لِلتَّاَسِّيْ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَايَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى مِنَ اللَّيْلِ وَكَمْ بَقِيَ مِنْهُ فَكَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ كُلَّهُ اِحْتِيَاطًا فَقَامُوْا حَتّٰى اِنْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ سَنَةً اَوْ اَكْثَرَ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ يُحْصِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط عَلِمَ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَيْ اَنَّهُ لَنْ تُحْصُوْهُ اَيِ اللَّيْلَ لِتَقُوْمُوْا فِيْمَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيْهِ اِلَّا بِقِيَامِ جَمِيْعِهِ وَ ذٰلِكَ يَشُقُّ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ رَجَعَ بِكُمْ اِلَى التَّخْفِيْفِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط فِى الصَّلَاةِ بِاَنْ تُصَلُّوْا مَا تَيَسَّرَ ـ

অনুবাদ :

২০. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো সামান্য কম প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, আর কখনো অর্ধ রাত্রি এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি نِصْفَهُ ও ثُلُثَهُ শব্দ দু'টি ثُلُثَيْ-এর প্রতি আতফ হিসেবে পঠিত হলে যের যোগে এবং اَدْنٰى -এর প্রতি আতফ হিসেবে পঠিত হলে পেশ যোগে পঠিত হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রি জগারণও সূরার প্রারম্ভে কৃত আদেশ অনুযায়ী ছিল। আর তোমার সঙ্গীগণ মধ্য হতো একদল এটা تَقُوْمُ ক্রিয়ার ও مَعْطُوْف عَلَيْهِ-ضَمِيْر-এর প্রতি আতফ আর ضَمِيْر -এর মধ্যে ব্যবধান থাকার কারণে مَعْطُوْف مُتَّصِل-এর تَاكِيْد আনয়ন ছাড়াও এরূপ করা জায়েজ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতেও একদল অনুরূপ রাত্রি জাগরণ করত; কিন্তু কোনো কোনো সাহাবী এটা অনুমান করতে পারত না যে, রাত্রির কি পরিমাণ সময় নামাজ পড়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ রাত্রি অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে তারা সতর্কতার স্বার্থে সারা রাত্রি জাগরণ করত। যদ্দরুন তাদের পায়ে পানি জমা হয়ে ফুলে যেত। এক বৎসর বা ততোধিক সময় পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। অতঃপর রাত্রি জাগরণের বিধানটিকে সহজ করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আল্লাহ নির্ধারিত করেন পরিমাণ নির্ণয় করেন রাত্রি ও দিনের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, اَنْ অব্যয়টি ثَقِيْلَةٌ হতে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ মূলত শব্দটি اَنَّهُ ছিল। তোমরা তার পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে না অর্থাৎ রাত্রির, যাতে তোমরা ওয়াজিব পরিমাণ সময় জাগরণ করতে পার, কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরণ করা ব্যতীত তোমরা এটা করতে পার না। অথচ এটা তোমাদের জন্য কষ্টকর। সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি মনসংযোগ করেছেন তোমাদের প্রতি সহজীকরণে মনোনিবেশ করেছেন। কাজেই তোমাদের জন্য যতটুকু সহজসাধ্য, কুরআনের ততটুকু আবৃত্তি করো। নামাজের মধ্যে। এভাবে যে, তোমরা সহজসাধ্য পরিমাণ আবৃত্তি করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ : জমহুর نِصْفَهُ -কে- ثُلُثَيِ اللَّيْلِ -কে- نِصْفَهُ আর ثُلُثَهُ -কে- نِصْفَهُ -এর উপর عَطْف করে جَرٌّ দিয়ে نِصْفِهٖ وَثُلُثِهٖ পড়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই-তৃতীয়াংশের কম এবং অর্ধেকের কম ও এক-তৃতীয়াংশের কম রাত্রি জাগরণ করে ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকেন। আবূ ওবাইদ, আবূ হাতিম এ কেরাতকেই পছন্দ করেছেন। ইবনে কাছীর এবং কূফীগণ نِصْفَهُ -কে- أَدْنٰى-এর উপর عَطْف করে আর ثُلُثَهُ -কে- نِصْفَهُ-এর উপর عَطْف করে نَصَبْ দিয়ে نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ পড়েছেন। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই-তৃতীয়াংশের কম এবং অর্ধ রাত্রি ও এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : ইসলামের প্রথম অবস্থায় মুসলমানদের উপর রাত্রির ইবাদত করা অর্থাৎ রাত্রির বেলায় নামাজ আদায় করা ফরজ ছিল, সে যুগে বর্তমান যুগের ন্যায় যেহেতু ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না এ কারণেই রাত্রের বেলায় সময়ের তারতম্য করা মুশকিল হয়ে যেত। অনেকেই রাত্রির আরাম-আয়েশ ইত্যাদি ত্যাগ করতে বাধ্য হলো, সারা রাত্র আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। কিছুকাল পর এমন কঠিন ইবাদতের কারণে শারীরিক বিভিন্ন রোগ দেখা দিল, পা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল, পা ফুলে গেল, এভাবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর রহমত তাদের উপর ঘনিয়ে আসল এবং إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنٰى مِنْ الخ আয়াত নাজিল হলো। আর হুকুম হলো যে, এখন আর নামাজে তাহাজ্জুদ ফরজ নয় যার ইচ্ছা সে পড়ুক, আর যার ইচ্ছা না হয় না পড়ুক।

قَوْلُهُ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ .... مَعَكَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "তোমার রব জানেন যে, তুমি কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় আর কখনো অর্ধেক রাত্র এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক। আর তোমার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যেও কিছু লোক এ কাজ করে।" অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ তোমার রব জানেন যে, তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশের কম, কখনও অর্ধেক আবার কখনো এক-তৃতীয়াংশ সময় দাঁড়িয়ে থাক। এ আয়াত হতে স্বতই জানা গেল যে, রাসূলের সাহাবীগণ তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। এটা কি ফরজ হিসেবে আদায় করতেন না নফল হিসেবে আদায় করতেন তা আয়াতের এ অংশে জানা না গেলেও পরের অংশের বর্ণনা-ভঙ্গি হতে মনে হয় যে, এটা তাঁদের উপরও ওয়াজিব বা ফরজ ছিল। পরের অংশে এক জায়গায় বলা হয়েছে- আল্লাহ জানেন যে, এ কিয়ামুল লাইল তোমাদের কোনো কোনো লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না রোগের কারণে বা সফরের কারণে বা জিহাদের কারণে, তাই আল্লাহ তা'আলা এটাকে তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। নফল হলে সহজ করার প্রয়োজন কি ছিল? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা হতে এটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, কিয়ামুল লাইল রাসূলের সাহাবীদের উপর ওয়াজিব ছিল, অতঃপর নফল করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য নবী করীম ﷺ -এর উপর এখনও ফরজ রয়ে গেছে। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ : বিভিন্ন তাফসীরকার কর্তৃক এ অংশের দু'টি তাফসীর করা হয়েছে-

১. তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের পরিমাণ যথাযথভাবে গুনে রাখতে পারবে না। এ হেতু তিনি তোমাদের কল্লে অনুগ্রহ করেছেন।

২. আল্লামা তাবারী ও ইবনে জারীর (রা.) এ অংশের তাফসীর এই বলেন- তোমাদের প্রভু জানেন যে, তোমাদের পক্ষে পুরা রাত্রি ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, এ কারণে তাখফীফ করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

মূলকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামগণের অশেষ কষ্ট দেখে কিয়ামুল লাইল-এর ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ فَرْضِيَّتْ-এর পর্যায়কে হালকা করে نَفْلِيَّتْ-এর পর্যায়ে রূপায়িত করে দিয়েছেন। আর জালালাইন গ্রন্থকার فَخَفَّفَ عَنْهُمْ একটি শব্দ উল্লেখ করেছেন, এটা দ্বারা তাহাজ্জুদের فَرْضِيَّتْ-এর হুকুমকে শিথিলতা করার প্রতি ইঙ্গিত বুঝানো হয়েছে।

তাহাজ্জুদ-এর হুকুম প্রদানের হেকমত : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামগণের উপর তাহাজ্জুদ বা রাত্রির ইবাদত করার উদ্দেশ্য হলো, দিবা-রাত্রির কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার মাধ্যমে তারা যেন আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আর তিনি قِيَامُ اللَّيْلِ-এর মেহনত সহ্য করে কুরআনের ভার বহন করতে যেন সক্ষম হয়ে উঠেন, যা قِيَامُ اللَّيْلِ-এর তুলনায় বহুগুণ কষ্ট সহ্যের ব্যাপার হবে।

মূলকথা হলো, عِلْمَ اَزَلِىْ অনুসারে মুহাম্মদ ﷺ-কে রিসালাতের জন্য উপযোগী করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাওয়ার পর قِيَامُ اللَّيْلِ-এর হুকুম مَنْسُوْخ করে দেওয়া হয়েছে এবং এটার فَرْضِيَّتْ তখন نَفْلِيَّتْ-এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ : আয়াতাংশের শাব্দিক অনুবাদ হলো 'যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার ততটাই পড়তে থাক।' এটার তাৎপর্য এই যে, যতটুকু তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয় কেবল ততটুকুই আদায় কর। এখানে কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা নামাজ বুঝানো হয়েছে। এ কারণে যে, নামাজের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকে কুরআন তেলাওয়াত।

আয়াতটি নামাজে কেরাত ফরজ হওয়ার দলিল : এ আয়াতটি হতে আরো একটি কথা জানতে পারা যায়, তা হলো, সালাতে যেভাবে রুকূ'-সিজদা ফরজ, কুরআনের আয়াত পাঠ করাও অনুরূপ ফরজ। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেভাবে অন্যান্য স্থানে রুকূ ও সিজদার কথা-বলে সালাত বুঝেয়েছেন আলোচ্য আয়াতেও অনুরূপভাবে কুরআন পাঠের কথা বলা হয়েছে। আর তা বলে সালাতে কুরআন পাঠ করাই বুঝিয়েছেন।

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ আয়াতটির আর এক অর্থ হলো "নামাজে কুরআনের যে অংশ বা যে সূরা তোমাদের জন্য সহজতর হয় তা পড়ো।" অর্থাৎ নামাজের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট নেই বরং কুআনের যে কোনো জায়গা হতে এতটুকু পড়লেই হবে যতটুকুকে কেরাত বলা চলে।

ইমামগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতান্তর নেই যে, নামাজে কেরাত পড়া ফরজ, অতঃপর তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে যে, এ ফরজ কি পবিত্র কুরআনের যে কোনো জায়গা হতে পড়লেই আদায় হয়ে যাবে? না ফরজিয়াত আদায় করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সূরা পড়তে হবে?

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী (র.)-এর মতে, যে কোনো জায়গা হতে পড়লে ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। কোনো সূরা এটার জন্য নির্দিষ্ট করে পড়তে হবে না, কারণ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ আয়াতটিতে মুতলাক বা শর্তহীনভাবে কেরাত পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটার সাথে সূরা আল-ফাতিহা পড়াকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেওয়া যায় না। কারণ এটা করা হলে পবিত্র কুরআনের উপর হাদীস দ্বারা অতিরিক্তকরণ লাযিম হবে, যা না-জায়েজ।

অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে। এটা না পড়লে নামাজের ফরযিয়াতই আদায় হবে না। এরা আরো বলেছেন– আয়াতটি মুতলাক বা শর্তহীন হলেও সহীহ হাদীস দ্বারা এটাকে মুকাইয়াদ বা শর্ত সাপেক্ষ করতে হবে। এটার জবাবে হানাফীদের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, কুরআন এবং হাদীসকে যথাস্থানে রাখতে হলে কুরআন দ্বারা যা প্রমাণিত তাকে ফরজ আর হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত তাকে ওয়াজিব বলতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হানাফী ইমামগণ কুরআনের যে কোনো স্থান হতে কেরাত পড়াকে ফরজ আর সূরা আল-ফাতিহাকে নির্দিষ্ট করে পড়া ওয়াজিব বলেছেন। –[আহকামুল কুরআন, আল্জায়েছ]

٢٠. عَلِمَ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَىْ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى لا وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يُسَافِرُوْنَ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ يَطْلُبُوْنَ مِنْ رِزْقِهِ بِالتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ز وَكُلٌّ مِنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثِ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ مَا ذُكِرَ فِىْ قِيَامِ اللَّيْلِ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ بِقِيَامِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ بِاَنْ تُنْفِقُوْا مَا سِوَى الْمَفْرُوْضِ مِنَ الْمَالِ فِىْ سَبِيْلِ الْخَيْرِ قَرْضًا حَسَنًا عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا مِمَّا خَلَّفْتُمْ وَهُوَ فَصْلٌ وَمَا بَعْدَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرِفَةً يُشْبِهُهَا لِاِمْتِنَاعِهِ مِنَ التَّعْرِيْفِ وَاَعْظَمَ اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

অনুবাদ :

২০. তিনি অবগত আছেন যে, اَنْ টি এখানে مُثَقَّلَهْ হতে مُخَفَّفَهْ অর্থাৎ اَنَّهُ অচিরেই হবেন তোমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ অসুস্থ আর বাকি কেউ কেউ ছড়িয়ে পড়বেন দেশ বিদেশে ভ্রমণ করবেন, অন্বেষণে আল্লাহর ফজল ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া রিজিক অর্জনে, আর কেউ কেউ যুদ্ধ জিহাদে লিপ্ত হবেন আল্লাহর পথে, উপরিউক্ত তিন দলের লোকগণের উপরই উল্লিখিত রাত্রি জাগরণ অত্যন্ত কষ্টকর হবে। এ জন্য সহজতার ভিত্তিতে রাত্রি জাগরণের হুকুম প্রদান করেছেন। অতঃপর তাকে পাঞ্জেগানা নামাজের হুকুম দ্বারা মানসূখ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আপনারা পড়ুন সহজসাধ্য পরিমাণ তা হতে যেমন স্বল্প পূর্বে আলোচনা হয়েছে। আর প্রতিষ্ঠা করুন নামাজ যা নির্ধারিত করা হয়েছে। আর প্রদান করুন জাকাত এবং কর্জ প্রদান করুন আল্লাহকে, অর্থাৎ زَكٰوة مَفْرُوْضَهْ ব্যতীত তোমাদের সম্পদ হতে কিছু কিছু সৎপথে ব্যয় কর উত্তমরূপে। সন্তুষ্টচিত্তে, আর যে নেককার্য প্রেরণ করবেন পূর্বাহ্নে, নিজেদের জন্য, পাবেন তাকে আল্লাহর সমীপে পৌঁছে তাকে সর্বোৎকৃষ্টতমভাবে তা হতে যে সমস্ত সম্পদ তোমরা ছেড়ে গেছে (هُوَ) টি ضَمِيْر فَصْل আর তার পরবর্তী বাক্যাংশ যদিও مَعْرِفَهْ হয়নি مَعْرِفَهْ হতে নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন তা مَعْرِفَهْ-এর অনুরূপ হয়েছে। আর শ্রেষ্ঠতম বিনিময়রূপে লাভ করবেন। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আল্লাহর দরবারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড়োই ক্ষমাশীল এবং বড়োই দয়ালু। ঈমানদারগণের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَيْرًا : خَيْرًا শব্দটি تجدوه-এর مَفْعُوْل ثَانِىْ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। তখন هُوَ . ضَمِيْر হলো ضَمِيْر فَصْل জমহুর خَيْرًا-কে مَنْصُوْب করে পড়েছেন, আবূ সাম্মাক, ইবনে সুমাইফ هُوَ-কে مُبْتَدَأ হিসেবে এবং خَيْر-কে خَبَر হিসেবে رَفْع দিয়ে পড়েছেন, তখন هُوَ خَيْرٌ বাক্যটি مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে تَجِدُوْهُ-এর مَفْعُوْل ثَانِىْ হিসেবে।

–[ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কোরআন, ছায়েছ]

قَوْلُهُ "أَعْظَمَ أَجْرًا" : জমহুর أَعْظَمَ-কে خَيْرًا-এর উপর عَطْف করে مَنْصُوْب পড়েছেন। আবূ সাম্মাক ইবনে সুমাইক رَفْع দিয়ে أَعْظَمُ পড়েছেন। তারা যেমনি خَيْرٌ-কে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। আর أَجْرًا-কে تَمْيِيْز হিসেবে مَنْصُوْب পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ .... مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক রোগী হতে পারে, আর কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করে, কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। কাজেই কুরআনের যা খুব সহজেই পড়া যায় তাই পড়ে নাও।"

এটার তাফসীরে আল্লামা মুহাম্মদ আলী আচ্ছায়েছ বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ মানসূখ হওয়ার কারণ হিকমত, পূর্বে عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ-তে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে তা সবিস্তারে বলা হয়েছে। তাহাজ্জুদের নামাজের ফরযিয়াত রহিত হওয়ার কারণ হলো কষ্ট দূরীকরণ। আল্লাহ তা'আলা এখানে এমন তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন যে তিনটিই সহজকরণ কামনা করে, কারণ এ তিনটি কারণের কোনো একটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কিয়ামুল লাইল অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। এক. রুগ্নতা, দুই. সফর, তিন. জিহাদে থাকা। রোগ নিয়ে কিয়ামুল-লাইল করা অতি কষ্টসাধ্য। আর সফর এবং জিহাদের সময় মানুষ দিনের বেলা তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে কারণে তার পক্ষে আবার রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের জন্য দীর্ঘক্ষণ ইবাদতে মাশগুল হয়ে থাকা অতি কষ্টকর। তা ছাড়া এভাবে রাত্রিজাগরণ করে ইবাদতে মশগুল থাকলে তাদের পক্ষে যথাযথভাবে দিনের বেলায় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। যা হবে মুসলিম সমাজের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং কষ্ট লাঘবের জন্য তাহাজ্জুদের নামাজের ফরযিয়াতকে রহিত করা হলো, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ কথাটি আবার বলার উদ্দেশ্য হলো সহজকরণের প্রতি তাকিদ দান। -[কাবীর, সাফওয়া, আহকামুল কোরআন]

فَاقْرَءُوْا الخ-এর تَكْرَارٌ নেওয়ার কারণ : উক্ত সূরায় فَاقْرَءُوْا الخ আয়াতকে বারবার বলার কারণ তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকারের মতে تَاكِيْد-এর উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের فَرْضِيَّتْ যদিও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তথাপিও তা পড়ার জন্য বারবার তাগিদ করা হয়েছে। কারণ তাহাজ্জুদ গুজারদের প্রসঙ্গে কুরআনের বহু স্থানে প্রশংসা করা হয়েছে। কখনও তাদেরকে أَهْلُ تَقْوٰى বলা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ .... وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاقْرَءُوْا الخ আয়াতে যে أَمْرٌ রয়েছে তাতে যদি فَاقْرَءُوْا অর্থ صَلُّوْا (নামাজ পড়) নেওয়া হয়, তখন أَمْر টি وُجُوْب-এর জন্য মানতে হবে। তখন হুযূর ﷺ-এর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে কারণ তাঁর জন্য তাহাজ্জুদ ওয়াজিব-এর পর্যায়ে ছিল। আর যদি فَاقْرَءُوْا অর্থ (তেলাওয়াতে কুরআন) নেওয়া হয়, তখন أَمْر টি نَدْبٌ ইত্যাদির জন্য হবে। কারণ সে সময় তেলাওয়াতে কুরআন ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : "সালাত কায়েম করো আর জাকাত দাও।" অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ভালো করে আদায় করো এবং ফরজ জাকাত প্রাপকদের হাতে পৌঁছো দাও। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কুরআনে সালাতের আলোচনার সাথে সাথে প্রায় জাকাতের আলোচনা করা হয়, কারণ নামাজ হলো আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ভিত। আর জাকাত হলো দাতা এবং গ্রহীতা মুসলিম ভাইদের মধ্যে ভিত। সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদত, আর জাকাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মালী ইবাদত। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا : وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম কর্জ দিতে থাকো।" এটার তাৎপর্য হলো, গরিব, ফকির, মিসকিনদেরকে যাকাত ছাড়া অন্যান্য নফল সদকা দিয়ে ফকির-মিসকিনদেরকে দানকরণকে আল্লাহ তা'আলাকে কর্জদান বলা হয়েছে, এ কথা বুঝাবার জন্য যে, এ দানের ছওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে, এতে কোনো রকমের হেরফের হবে না। যেমন কোনো বিশ্বস্ত ভালো লোককে কর্জ দিলে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে- তেমনি ফকির-মিসকিনদেরকে দান করলেও তার ছওয়াব আল্লাহর কাছে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর দ্বারা জাকাত ব্যতীত অন্যান্য-খয়রাত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ব্যয় করা।

অথবা, এর অর্থ হলো– তোমরা ভালোভাবে জাকাত আদায় করো।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, قَرْضًا শব্দের পর حَسَنًا শব্দ সংযোজন করে দান-খয়রাতের ছওয়াবের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

কোনো কোনো মুফাসসির এটার তাফসীরে বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম কর্জ দিতে থাকো।" এ কথাটির অর্থ হলো, তোমাদের উপর ফরজকৃত জাকাত উত্তমভাবে আদায় করো। অর্থাৎ তোমাদের উত্তম হালাল মাল হতে ফকির-মিসকিনদেরকে সহীহ খালেস নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিতে থাকো। এ অর্থ গ্রহণ করলে বলতে হবে "এবং জাকাত দাও" এ কথাটির পর "আল্লাহ তা'আলাকে কর্জে হাসানা দিতে থাক" এটা বলে আবার ফরজ জাকাত আদায় করার কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, যাকাত আদায়করণের প্রতি উৎসাহ দান। কারণ এ দান যেন আল্লাহকেই কর্জ দান, যা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা একশত ভাগ সত্য। –[আহকামুল কোরআন, ছাফ্বেয়েছ]

قَوْلُهُ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ (الاية) : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামি দৃষ্টিতে যা কিছু কল্যাণকর ও উপকারী যারা তা করবে তা পরকালে বিরাট পুরস্কাররূপে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানে خَيْرٌ শব্দ দ্বারা কোনো কোনো লোক ধন-সম্পদ দানের কথা প্রকাশ করলেও মূলত তা দ্বারা শরিয়তের দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার ভালো ও উত্তম কাজ বুঝানো হয়েছে, তা যে প্রকার কাজই হোক না কেন। সুতরাং আয়াতের মর্ম হলো– তোমরা পরকালের কল্যাণ ও উপকারার্থে যা কিছু অগ্রিম পাঠিয়েছ তা এ দুনিয়ায় রেখে যাওয়া সম্পদের তুলনায় অধিকতর কল্যাণকর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন– তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে রয়েছে যার নিকট নিজের ধন-সম্পদের তুলনায় উত্তরাধিকাররের ধন-মাল অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নিজের ধন-সম্পদের তুলনায় উত্তরাধিকারীদের ধন-সম্পদ প্রিয়বস্তু। নবী করীম ﷺ বললেন, খুব চিন্তা-ভাবনা করে বলো। লোকগণ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সত্য কথাই বলছি। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদ হলো তা যা তোমার পারকালের জন্য পাঠিয়েছে। আর উত্তরাধিকারের জন্য যা রেখে দিয়েছ তা হলো তাদের সম্পদ।

–[বুখারী, নাসায়ী, তিরমিযী]

এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, উপরিউক্ত আয়াতে পরকালের উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় ও বলা হয় তারই বিনিময় আল্লাহ তা'আলা বিরাট পুরস্কাররূপে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। –[আহকামুল কোরআন, ছাফ্বেয়েছ]

তাহাজ্জুদের فَرْضِيَّتْ রহিত করার মধ্যে হেকমত : এটার হিকমত হলো– যেহেতু তখনকার মুসলমানগণকে দিবারাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হতো, আবার কেউ কেউ সফররত থাকত। আবার তাহাজ্জুদ গুজারের দরুন কেউ কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল, এমতাবস্থা তাহাজ্জুদ আদায় করা ও রাত্র জারগণ খুবই কষ্টকর। সুতরাং এ কষ্ট দূরীভূত করার জন্য তাহাজ্জুদ বাতিল করা হলো।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতগণকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন– তোমাদের জন্য ইসলামে কোনো কঠিন্যতা নেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ .... رَّحِيْمٌ : মূলত মানুষ শত চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হয় না। কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। এ জন্য ইবাদতের পর তওবা-ইস্তিগফার করা অবশ্যই কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত এতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি মানুষ যেন তার নেক আমলের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর না করে, বরং নেক আমলের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা মানুষ যত বড় নেক আমলই করুক এবং যত নিখুঁত এবং সুন্দরভাবেই করুক না কেন কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারের শান মোতাবেক হয় না। তাই বান্দার কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং নিজের ত্রুটি স্বীকার করা।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেন, অত্র আয়াতে غَفُوْرٌ শব্দের ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহ মাফ করবেন। আর غَفُوْرٌ -এর পর رَحِيْمٌ শব্দটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে সামান্য আমলেরও অনেক বেশি ছওয়াব দান করবেন। –[কাবীর, ইবনে কাছীর, মাযহারী]

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ : সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির প্রথম আয়াতের শব্দ (اَلْمُدَّثِّرُ) হতে সূরাটির নাম দেওয়া হয়েছে। اَلْمُدَّثِّرُ এটা دَثَّرَ থেকে এসেছে। এটার অর্থ হলো কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যাগমনকারী। এতে ২টি রুকূ', ৫৬টি আয়াত, ২৫৫টি বাক্য এবং ১০১০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরার প্রথম সাততি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কারণ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত জাবির (রা.) হতে বেশ কয়টি হাদীস এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।
আর اِجْمَاعُ اُمَّتْ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .... مَا لَمْ يَعْلَمْ আয়াতগুলো সর্বপ্রথম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। [হেরা গুহায়] এবং এটার পর হুযূর ﷺ -এর উপর বহুদিন যাবৎ ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল এবং এটার পর আবার নতুনভাবে যখন ওহী নাজিল হতে আরম্ভ করল, তখন প্রথমেই সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের প্রথম থেকেই নাজিল হওয়া আরম্ভ করল। [ইমাম যুহরীও এ বর্ণনা প্রদান করেছেন] এটার পর ধারাবাহিকভাবে ওহী নাজিল হতে থাকে। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম ও আরও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা মতে ৮ম আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো ঐ সময় নাজিল হয়েছিল যখন হুযূর ﷺ সরাসরিভাবে ইসলাম প্রচারের কার্য শুরু করলেন এবং মক্কায় প্রথম হজ্জব্রত পালন করতে আসছিলেন।
فَتْرَةُ الْوَحْىِ : ওহী অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকার সময়ের কথা উল্লেখ করে স্বয়ং নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেছেন, একদা আমি পথ চলতে ছিলাম, হঠাৎ আমি উর্ধ্বলোক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পাই– তখনই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে ফেরেশ্‌তাকে যিনি আমার নিকট হেরা গুহায় ওহী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আসমান-জমিনের মাঝে একটি আসনে উপবেশন করে আছেন। এটা দেখে আমি ভীত হয়ে ঘরে চলে গেলাম এবং আমাকে কাপড় জড়িয়ে দিতে বললাম যে, আমার এ কারণে ভয় লাগছে। চাদরাবৃত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটিতে মূলত মহানবী ﷺ-এর নবুয়তি জীবনের জন্য পহেলা কর্মসূচি, কিয়ামতের বর্ণনা, কাফের সর্দার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আলোচনা, কুরাইশগণের ঈমান না আনার কারণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচিত হয়েছে

সূরার ১ থেকে ৭ আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর ইসলামি আন্দোলনের কর্মসূচি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি তৌহিদের পতাকা নিয়ে দণ্ডায়মান হোন এবং তৌহিদের বিপরীত আচরণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করতে থাকুন। আর দুনিয়ায় গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের কথা ঘোষণা করতে থাকুন। তৃতীয়ত আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা এবং সামাজিক পরিবেশের সকল ক্ষেত্রে আপনার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখুন। কাফেরদের প্রতিমাগুলো হতে পূর্ণমাত্রায় দূরে থাকুন এবং কারো কোনোরূপ অনুগ্রহ করলে তা নিঃস্বার্থভাবে করুন। আর এ দাওয়াতি আন্দোলনে আপনার উপর বিরাট বিপদ-আপদ আপতিত হতে পারে এবং পদে পদে দুঃখ-নির্যাতন দেখা দিতে পারে, আপনি এসব কিছু আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করবেন। এতে আদৌ কোনোরূপ ঘাবড়াবেন না।

৮ থেকে ১০ আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়টি হবে কাফেরদের জন্য মহাসংকট কাল; কিন্তু মু'মিন লোকদের পক্ষে কোনো অসুবিধার কারণ হবে না।

১১ থেকে ৩১ আয়াতে কুরাইশ সর্দার মুগীরার আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আমি তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সৃষ্টি করে পার্থিব জীবনে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সুখী করেছি। সামাজিক জীবনে নেতা ও সর্দার বানিয়েছি কিন্তু আমার কুরআন সত্য শাশ্বতবাণী জেনেও তাকে অন্তরে চাপিয়ে সমাজে স্বীয় প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং মহানবীর নামে বদনাম রটিয়েছে। আমি তাকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করবো এবং জাহান্নামের পাহাড়ের চূড়ায় চড়িয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিবো।

৩২ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত জান্নাতী লোকদের সাথে জাহান্নামী লোকদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, জান্নাতী লোকগণ জাহান্নামীদের কাছে এ শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে আমরা পার্থিব জীবনে নামাজ আদায় করতাম না, অভাবীগণকে খাদ্য দিতাম না এবং ইসলামের বিরোধী গ্রুপের সাথে থাকতাম। আর পরকালকে অবিশ্বাস করতাম। এভাবে আমাদের জীবনটি শেষ হয়েছে। ফলে আমরা এ শাস্তি পাচ্ছি।

৪১ থেকে ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, কাফেরদের হলো কি তারা দীনের দাওয়াত শুনে এভাবে কেন পালাচ্ছে যেভাবে শিকারি হতে জংলী গাধা পালিয়ে থাকে। তারা যতই দাবি করুক না কেন কোনোক্রমেই তাদের দাবি পূরণ করা হবে না। এসব দাবি হলো তাদের বাহানামাত্র। মূলত পরকাল সম্পর্কে মনে কোনোরূপ ভয়ই রাখে না। সুতরাং তারা ঈমান না আনলে তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। কুরআনকে তাদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। এটা দেখে যার মনে চায় সে ঈমান আনয়ন করুক। অথবা মন না চাইলে না আনুক। ভালো পথ মন্দ পথ গ্রহণ করা তাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, কাউকেও ভয় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। অপরাধকে একমাত্র তিনি ক্ষমা করতে পারেন। সুতরাং তাদের কৃত অপরাধ হতে তওবা করে ঈমানের পথ গ্রহণ করা উচিত।

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির মক্কায় অবতীর্ণ

اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً : ৫২ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ النَّبِيُّ وَاَصْلُهُ الْمُتَدَثِّرُ اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الدَّالِ اَىِ الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُوْلِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ ـ

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! মহানবী ﷺ مُدَّثِّرٌ শব্দটি মূলত مُتَدَثِّرٌ ছিল। تَاءٌ -কে دَالٌ -এর মধ্যে اِدْغَامٌ করা হয়েছে অর্থ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় স্বীয় বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদনকারী।

٢. قُمْ فَاَنْذِرْ خَوِّفْ اَهْلَ مَكَّةَ بِالنَّارِ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا ـ

২. উঠ, সতর্কবাণী প্রচার করো মক্কাবাসীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করো, যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে।

٣. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ عَظِّمْ عَنْ اِشْرَاكِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো মুশরিকদেরকে শিরক হতে ঊর্ধ্বে হওয়ার কথা বিবৃত কর।

٤. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ عَنِ النَّجَاسَةِ اَوْ قَصِّرْهَا خِلَافَ جَرِّ الْعَرَبِ ثِيَابَهُمْ خُيَلَاءَ فَرُبَّمَا اَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ ـ

৪. তোমার পরিচ্ছদকে পবিত্র রাখো অপবিত্রতা হতে অথবা স্বীয় বস্ত্রকে ছোট করে প্রস্তুত করো। আরবরা যে অহংকার বশত বস্ত্রকে দীর্ঘায়িত করে, যার ফলে প্রায়শ তাতে অপবিত্রতা লেগে যায়, তার বিপরীতে।

٥. وَالرُّجْزَ فَسَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَوْثَانِ فَاهْجُرْ اَىْ دُمْ عَلٰى هَجْرِهِ ـ

৫. আর প্রতিমা হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ اَلرُّجْزَ শব্দটির তাফসীর اَلْاَوْثَانَ প্রতিমা দ্বারা করেছেন দূরে থাকো অর্থাৎ তা হতে দূরে থাকার প্রশ্নে স্থিতিশীলতা অবলম্বন করো।

٦. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ بِالرَّفْعِ حَالٌ اَىْ لَا تُعْطِ شَيْئًا لِتَطْلُبَ اَكْثَرَ مِنْهُ وَهٰذَا خَاصٌّ بِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهُ مَامُوْرٌ بِاَجْمَلِ الْاَخْلَاقِ وَاَشْرَفِ الْاٰدَابِ ـ

৬. আর অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না تَسْتَكْثِرُ শব্দটি পেশ যোগে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ কোনো বস্তু এ উদ্দেশ্যে দান করো না যে, তদপেক্ষা অধিক লাভ করবে। এ আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নির্দিষ্ট। কেননা তিনি সুন্দরতম স্বভাব ও উত্তম শিষ্টাচারের সাথে আদিষ্ট হয়েছেন।

٧. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ عَلَى الْاَوَامِرِ وَالنَّوَاهِىْ

৭. আর তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো আদেশ ও নিষেধসমূহ পালন ক্ষেত্রে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَا تَمْنُنْ : জমহুর وَلَا تَمْنُنْ অর্থাৎ ইদগাম হীনভাবে পড়েছিলেন, আর হাসান বসরী, আবুল ইয়ামান আল-আশহাব আল-উকাইলী একে اِدْغَام করে وَلَا تَمُنَّ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদির]

قَوْلُهُ فِيْ وَلَا تَسْتَكْثِرْ : জমহুর تَسْتَكْثِرُ -এ- حَالٌ হিসেবে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ وَلَا تَمْنُنْ حَالَ كَوْنِكَ مُسْتَكْثِرًا -কেউ কেউ বলেছেন, এটা আসলে وَلَا تَمْنُنْ اَنْ تَسْتَكْثِرُ ছিল। اَنْ -কে حَذْف করে تَسْتَكْثِرُ -তে رَفْع দেওয়া হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে ওয়াচ্ছাব এবং আ'মাশ تَسْتَكْثِرَ -তে একটি اَنْ -কে مُقَدَّرٌ মেনে এবং তার আমলকে বাকি রেখে نَصَبْ দিয়ে تَسْتَكْثِرَ পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদের কেরাত হতে এই কেরাতের তায়ীদ হচ্ছে, তিনি وَلَا تَمْنُنْ اَنْ تَسْتَكْثِرَ অর্থাৎ اَنْ সহ পড়েছেন। হযরত হাসান বারী এবং ইবনে আবূ আবলা تَسْتَكْثِرْ অর্থাৎ تَمْنُنْ -এর بَدَلْ হিসেবে جَزْم দিয়ে পড়েছেন। তবে এ কেরাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, لَا تَمْنُنْ আসলে لَا تَسْتَكْثِرْ -এর بَدَلْ হতে পারে না। কারণ مَنْ আর اِسْتِكْثَارٌ একই জিনিস নয়। আর এটাকে جَوَابُ نَهْىٍ ও বলা যায় না। -[ফাতহুল কাদীর, রুহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ : এগুলো মুবতাদা ও খবর।

قَوْلُهُ قُمْ فَاَنْذِرْ : এগুলো পরস্পর عَطْفٌ وَمَعْطُوْفٌ এবং وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ থেকে وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ পর্যন্ত جُمْلَةٌ সমূহ فَاَنْذِرْ -এর উপর مَعْطُوْفٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَبِّرْ : কাবীর গ্রন্থে فَكَبِّرْ -এর فَاءٌ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পেশ করা হয়েছে।

১. اَبُو الْفَتْحِ الْمَوْصِلِيُّ বলেন, فَاءٌ টি زَائِدَة নেওয়া হয়েছে।

২. আল্লামা যুজাজ (র.) বলেন, فَاءٌ টি جَزَائِيَّةٌ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। وَالْمَعْنٰى قُمْ فَكَبِّرْ رَبَّكَ এবং পরবর্তী বাক্যগুলোও অনুরূপভাবে হবে।

৩. কাশ্শাফ গ্রন্থকার (র.) বলেন, এখানে فَاءٌ টি مَعْنَى الشَّرْطِ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

وَالْمَعْنٰى اَىُّ شَيْءٍ كَانَ فَلَا تَدَعْ تَكْبِيْرَهُ .

قَوْلُهُ تَسْتَكْثِرُ : এটা حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হতে পারে। অর্থাৎ اَىْ لَا تُعْطِ مُسْتَكْثِرًا رَائِيًا لِمَا تُعْطِيْهِ كَثِيْرًا আর হযরত হাসান বসরী (র.) একে جَوَابُ نَهْىٍ হিসেবে بِالسُّكُوْنِ অর্থাৎ طَالِبًا اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَيْتَ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অত্র সূরার শানে নুযূল : অত্র সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথম প্রথম অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ নির্জনতাকে খুবই ভালোবাসতেন। হযরত খাদীজা (রা.) প্রতিদিন তাঁর আহার্য তৈরি করে তাঁর সাথে দিয়ে দিতেন। তিনি তা নিয়ে হেরা গুহার একটি কোণে বসে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বয়ং হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন, একদা আমি সে নির্জনতা হতে ঘরে ফিরে আসছিলাম। অতঃপর যখন ময়দানে গেলাম, তখন গায়েব হতে আমার কানে আওয়াজ আসল, তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। যখন আকাশের দিকে লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম আসমান জমিনের মাঝে চেয়ারের উপর একটি ফেরেশতা বসে আছে বলে অনুভব হয়েছে যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। এমতাবস্থায় ভয়ে আমার শরীর শীতল হয়ে উঠল, তখনই ঘরে এসেছে চাদর ইত্যাদি দ্বারা আবৃত হয়ে গেলাম। এ সময় আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন।

লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ فَتْرَةُ الْوَحْىِ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে বলেন, আমি হাঁটাহাঁটি করছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট আসত সেই ফেরেশতাটি আসমান জমিনের মাঝে অবস্থিত রয়েছে, এতে আমি ভয় পেয়ে ঘরে চলে আসলাম এবং পরিবারকে বললাম زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, অলীদ ইবনে মুগীরা কুরাইশগণের জন্য খাবার তৈরি করে তাদেরকে জমায়েত করল। পানাহার শেষে সে বলল, এ লোকটিকে অর্থাৎ মুহাম্মদকে তোমরা কি বলতে চাও? কেউ বলল, সে তো যাদুকর। অন্য একজন বলল, না সে যাদুকর নয়। কেউ বলল, সে গণৎকার, প্রতিবাদে কেউ বলল, না সে গণৎকার নয়। আবার কেউ বলল, সে কবি। প্রতিবাদে কেউ বলল, সে কবিও নয়। কতক বলল, সে পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত একজন জাদুকর। এ আলোচনার কথা মহানবী ﷺ-এর কর্ণে পৌঁছলে তিনি খুব মর্মাহত হলেন এবং বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তাঁর দেহটি কম্বল দ্বারা জড়িয়ে দেওয়া হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা (يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (الاية আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব, ইবনে কাছীর, খাযেন]

قَوْلُهُ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে কম্বল জড়ানো শয্যাগ্রহণকারী, উঠুন অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করুন।" এ আয়াত দু'টির তাৎপর্য এই যে, আমরা শানে নুযুল উল্লেখ করেছি যে, উপরিউক্ত নির্দেশনামাটি হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাজিলের দীর্ঘ এক মাস পর অবতীর্ণ হয়। নবী করীম ﷺ শূন্যলোকে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর আকৃতি দর্শন করে প্রকম্পিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। বাড়ি ফিরে কম্বল জড়িয়ে শয্যাশায়ী হলেন এবং মাথায় পানি ঢালতে বললেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন– হে কম্বল জড়ানো ব্যক্তি! আপনার কম্বল জড়িয়ে শয্যা গ্রহণের অবকাশ কোথায়। আপনার প্রতি আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার এক বিরাট দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, আপনি উঠুন। আমার একত্ববাদ প্রচার করুন এবং যারা আমার সত্তায়, গুণে ও ক্ষমতায় আমার সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরিক করে তাদেরকে এটার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন। আপনার শয়ন করার সময় নেই। নবী করীম ﷺ -এর প্রতি এ নির্দেশ এমন এক সময় ও পরিবেশে অবতীর্ণ হয়, যখন মক্কাসহ সমগ্র আরবের লোক ও জনপদগুলো শিরক-এর দুর্গন্ধময় কূপে নিপতিত ছিল এবং তিনি ছিলেন একাকী। তাঁর সঙ্গী-সাথী কেউই ছিল না। এহেন পরিবেশে সর্বজন বিরোধী একটি মতাদর্শ নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া এবং তা জনসম্মুখে প্রচার করা কত বড় বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার ছিল তা একটু চিন্তা করলেই বোধগম্য হয়। এহেন পরিবেশের মধ্যেই আল্লাহ বললেন, আপনি তৌহিদের পতাকা নিয়ে দণ্ডায়মান হোন এবং মানুষকে তৌহিদের পরিপন্থি আকীদা-বিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকুন। এটাই আপনার প্রথম কাজ।

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধনের হেকমত : এখানেও সূরা আল-মুয্যাম্মিলের মতো يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। স্নেহ ও আদর প্রকাশের উদ্দেশ্যে এখানে আল্লাহ নিজের হাবীবকে তাঁর ওয়াস্‌ফ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। তাঁর নাম ধরে 'হে মুহাম্মদ' ﷺ বলেননি, উদ্দেশ্য এই যে, এটার মাধ্যমে সহানুভূতি ও আদরে প্রকাশ ঘটুক। রাসূল বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসেন, আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর প্রতি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। দীনের দাওয়াত দান এবং তৌহিদের প্রচারের সময় তিনি তা পাবেন। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ দ্বারা বুঝা যায় যে, সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছির এবং সূরা আল-মুয্যাম্মিল একই ঘটনার পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এটার হাকীকত কি?

তাফসীরে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে যায়েদ তাবেয়ী (র.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা আল-মুয্যাম্মিলটি সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছিরের পূর্বে নাজিল হয়েছে। আর এ বর্ণনাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তবে صَحِيْحَيْن-এর বর্ণনানুসারে সর্ব প্রথম সূরা আল্-মুদ্দাছ্‌ছির অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, এটার হাকিকত সম্পর্কে এ কথাই অনুমান করা যায় যে, فَتْرَةُ وَحْيٍ-এর পর সর্বপ্রথম সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছিরটিই অবতীর্ণ হয়েছে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ اٰيَاتِ السُّوْرَتَيْنِ : সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছিরের যে সকল বর্ণনা রয়েছে, তাতে অধিকাংশই দাওয়াতে ইসলাম ও সকল মানবাত্মার সংশোধন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

আর সূরা আল-মুয্যাম্মিলের শুরুতে যে সকল বিধি-বিধানের আলোচনা করা হয়েছে তার অধিকাংশেই বিশেষত হুযূর ﷺ-এর নিজ আত্মার সংশোধন অথবা সাহাবায়ে কেরামগণের আত্মার পরিশুদ্ধতার আলোচনা করা হয়েছে।

مُدَّثِّرٌ ও مُزَّمِّلٌ শব্দদ্বয়ের অর্থগত পার্থক্য কি ? : এদের অর্থগত দিক দিয়ে তাফসীরকারগণ তেমন কোনো পার্থক্য নির্ণয় করেননি; বরং উভয় শব্দের তাফসীর করেছেন– চাদর দ্বারা শরীরকে আবৃত ব্যক্তি।

হযূর ﷺ আল্লাহর বান্দাদেরকে দোজখের ভীতি এবং বেহেশ্‌তের সু-সংবাদ দান করার জন্য প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয়াতে কেবল اِنْذَارْ -এর কথার উপর হুকুমকে সীমিত করার কারণ : এটার কারণ এই যে, যখন উক্ত আয়াত قُمْ فَاَنْذِرْ নাজিল হয়েছে তখন এমন লোক ছিল না যাদেরকে বেহেশতের শুভ সংবাদ শুনাতে পারেন। একেবারে মুষ্টিময় ও নগণ্য সংখ্যক বেহেশতের শুভ সংবাদ শ্রবণ করার উপযুক্ত ছিল। অতঃপর যখন ইসলামের প্রসার ঘটল এবং লোকজন বৃদ্ধি হলো তখন اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا الخ আয়াত নাজিল হলো এবং বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদ এবং দোজখের কু-সংবাদ শুনানোর জন্য বলা হলো। অন্যথায় মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে بَشِيْر وَنَذِيْر হিসেবেই শ্রবণ করা হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

قَوْلُهُ قُمْ فَاَنْذِرْ -এর অর্থ এবং قِيَامْ -এর অর্থ : সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছিরের মধ্যে যে সমস্ত বিধানাবলির আলোকপাত করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমটি হলো قُمْ فَاَنْذِرْ 'আপনি দণ্ডায়মান হোন এবং সম্প্রদায়কে আল্লাহর ভয় দেখান।' এখানে قِيَامْ -এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য হতে পারে, অর্থাৎ আপনি যে কাপড় জড়িয়ে শুয়েছেন তা হতে উত্থিত হোন। আর এ অর্থও হতে পারে যে, আপনি হিম্মত ও সাহস করে আল্লাহর বান্দাগণকে সংশোধন করার জন্য তৈরি হয়ে যান এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে আনয়ন করার খেদমতে নিয়োজিত হয়ে যান।

اِنْذَارْ বলা হয় এমন ভয় প্রদর্শন করাকে যাতে مُحَبَّتْ এবং شَفْقَتْ রয়েছে। যেমনিভাবে মাতা-পিতা তাদের সন্তানদেরকে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের শানও এমনিভাবে ভয় প্রদর্শন করা। এ কারণেই তাদেরকে بَشِيْر وَنَذِيْر বলে لَقَبْ প্রদান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ : অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে, হে নবী! বর্তমান জগতের মানুষ আমার মহানত্ব, বিরাটত্ব ও অসীমত্বের কথা ভুলে আমার ব্যাপারে নানারূপ কাল্পনিক আকীদা পোষণ করে রয়েছে। আপনি আমার মহানত্ব, বিরাটত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করতে থাকুন এবং লোকদেরকে এটার পরিপন্থি কাজ পরিহার করতে বলুন। এ জগতকে তারা নানারূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তারা বিভিন্ন সত্তাকে আমার উপর দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করছে। এ জগতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত আর কিছুই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জগতের সর্বত্রই থাকবে আমার শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস হতে শুরু করে তাদের কর্মময় জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে থাকবে আমারই শ্রেষ্ঠত্বের ফলিতরূপ। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা করতে থাকুন। এ জন্যই ইসলামি জীবন ব্যবস্থার স্তরে স্তরে আমরা 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ্ মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ) কথাগুলোর সমুচ্চারিত হতে শুনতে পাই। দৈনিক পাঁচবার মুয়াজ্জিন মিনারে দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে 'আল্লাহু আকবার'। নামাজ শুরু হয় 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণের মাধ্যম। পশু জবাই করা হয় বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার বলে। শোভাযাত্রা ও জিহাদের ময়দানে সেনানীগণ আল্লাহু আকবার ধ্বনির সমুচ্চারিত কণ্ঠ দ্বারা দুনিয়ার মানুষ ও প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেয়– আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর দুনিয়ার বুকে গায়রুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব মুছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মহানবী ﷺ -এর প্রতি এই নির্দেশ জারি হওয়ার সাথে সাথেই মু'মিনের কাজকর্ম, ইবাদত-বন্দেগির সর্বত্র প্রতিফলিত হতে শুরু করল فَكَبِّرْ -এর জবাব আল্লাহু আকবার। চরিত্র, আচার-আচরণ জীবনের কর্মময় ভূমিকা হতে প্রকাশ হতে লাগল تَكْبِيْر -এর ফলিত ভাবধারা।

اَلْاَمْرُ بِالْاِنْذَارِ -এর পরে اَلْاَمْرُ بِالتَّكْبِيْرِ উল্লেখ করার তাৎপর্য : উঠুন এবং ভীতি প্রদর্শন করুন– এ কথাটির পর "আপনার প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা করুন" বলার তাৎপর্য এই যে, নবী করীম ﷺ -কে এ বাক্যের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে যে, তিনি যেন কাফিরদেরকে ভয় না করেন, গুরুত্ব না দেন। কারণ, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক ও অধিপতি হচ্ছেন আল্লাহ। সুতরাং কোনো সৃষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়া নবীর জন্য অপ্রয়োজন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করা তাঁর জন্য কখনো উচিত নয়, কারণ সব ক্ষমতাশীলরাইতো আল্লাহ তা'আলার অধীন। –[সাফওয়া]

সুতরাং দাওয়াত দানে এবং আল্লাহর আজাব হতে ভীতি প্রদর্শনকরণের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ -এর কাউকেও ভয় করা উচিত নয় এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَثِيَابَكَ فَطَ : এর একটি প্রকাশ্য অর্থ হলো স্বীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।

াাম কাতাদাহ, মুজাহিদ, ইব্রাহীম, যাহহাক, শা'বী ও যুহরী (র.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হলো– নিজেকে নাহ থেকে পবিত্র রাখুন।

াাম যাহহাক (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো নিজ নিজ আমল ঠিক করে নাও।

াাম সুদ্দী (র.) বলেছেন, নেক আমলকারী মানুষকে পবিত্র পোশাক পরিধানকারী বলা হয় আর বদকার মানুষকে অপবিত্র শাশাকধারী বলা হয়।

ঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো– মন ও গৃহকে পবিত্র করো।

সান বসরী (র.) বলেছেন, নৈতিক গুণাবলি অর্জন করো।

বনে সীরীন এবং ইবনে-যায়েদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখারই আদেশ দেওয়া হয়েছে। কননা, মুশরিকরা তাদের পোশাক পবিত্র রাখত না।

াাম তাউস (র.) বলেন, নিজের ব্যবহারের পোশাককে সুদীর্ঘ করো না। কেনন পোশাকে দৈর্ঘ্য কখনো কখনো অপবিত্রতার াারণ হয়। এক কথায় দৈহিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার পবিত্রতা অর্জনই মানুষের উন্নতি-অগ্রগতি লাভের অন্যতম সোপান। –[নূরুল কোরআন]

ত্রতা অবলম্বনের জন্য রাসূলে কারীম ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়ার কারণ : এটার হিকমত হলো– ব্যক্তি অনুসারে ব্যক্তির শাক-পরিচ্ছদ হয়ে থাকে। পোশাক দ্বারা ব্যক্তির হাকিকত প্রায় অংশই প্রকাশ পেয়ে থাকে। অতএব, যারা আল্লাহভক্ত ও রহম নর অধিকারী তাদের পোশাক অন্যান্যদের পোশাকের ন্যায় হওয়া সমীচীন নয়। সেকালে আরবদের যে নীতি ও চরিত্র ছিল ং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যেরূপ ছিল তা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়, তাদের আদত অভ্যাস আল্লাহর সন্তুষ্টি মতে ছিল না। লে কারীম ﷺ যেন তাদের সে সকল অবস্থা হতে ভিন্ন প্রকৃতি ও উত্তম নীতি বা আদর্শে-আদর্শবান হন, যাতে সকল মানুষ ই এ আদর্শে-আদর্শবান হয়ে উঠতে অতি সহজেই অনুপ্রাণিত হয় আর ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলকামী হতে সক্ষম হয়। এ য জগতবাসীকে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে তাকে আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ঈদেরকে পবিত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ দান : আলোচ্য আয়াতে দাঈদেরকে পাক-পবিত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ ওয়া হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ ছিলেন দীনের দাঈ ও মুবাল্লিগ। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক-পবিত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ দানের মাধ্যমে পরবর্তীকালের সমস্ত দাঈ ও মুবাল্লিগদেরকে তাদের বাহ্যিক াাশাক-পরিচ্ছদকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্মল করার আহ্বান করেছেন, যার দরুন লোকেরা তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে খেন। মানুষের মনে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে যেন কখনোও ঘৃণা জন্মাতে পারে এমন মলিনতা যেন কখনোও তাদের াাশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলনে না থাকে।

আয়াতে মুসলমানদেরকে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, দীনদারী আর পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য বিধানের মধ্যে কোনো কমের দ্বন্দ্ব নেই। পোশাক-পরিচ্ছদকে অপবিত্র ও অসুন্দর করে বৈষ্ণব ও দুনিয়া ত্যাগী হওয়ার কোনো স্থান ইসলামে নেই। ঈ এবং মুবাল্লিগণ হলেন অন্যান্য মুসলমানদের জন্য আদর্শ। সুতরাং এ আদর্শ সমস্ত মু'মিনদের জন্যই গ্রহণীয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ : মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়েদ এবং আবূ সালামা প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, رُجْز অর্থ মূর্তি অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে বর্জন করো, এগুলোর কাছেও যেয়ো না।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো পাপাচার পরিহার করা।
* আবূ আলীয়া এবং রবী (র.) বলেছেন, رِجْز অর্থ– মূর্তি, আর رُجْز অর্থ– অপবিত্রতা এবং গুনাহ, এগুলো পরিহার করো।
* ইমাম যাহহাক (র.) বলেছেন, এর অর্থ শিরক অর্থাৎ তোমরা শিরক বর্জন করো।
* কালবী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো আজাব অর্থাৎ তোমরা এমন আকীদা-বিশ্বাস এবং কর্ম বর্জন করো, যা আজাবের কারণ হতে পারে। –[নূরুল কোরআন]

একটি সন্দেহের নিরসন : এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে উদয় হতে পারে তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কখনোও মূর্তি আর দেব-দেবীর পূজা করেছিলেন? পূজা না করে থাকলে তাঁকে এটা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দানের হেতু কি?

এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে, হাদীস শরীফ হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোটকাল হতে এ মূর্তিপূজার কাজটিকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এটা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার নির্দেশদানের অর্থ এই যে, তুমি যেভাবে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে আসছিলে তেমনি ভবিষ্যতেও এটা পরিত্যাগ করে চলবে। এটা ঠিক اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দ্বারা সত্যপথ প্রার্থনা করার মতো। এটার অর্থ যেমন এই কথা নয় যে, যে মুসলমান এটা বলছেন তিনি সুপথে নেই। সে জন্যই তাঁকে এটা প্রার্থনা করতে হচ্ছে; বরং এটার অর্থ হলো আমাকে সত্যপথে সর্বদা দৃঢ় রাখো। ঠিক তেমনি আয়াতের অর্থও "তুমি সদা-সর্বদা মূর্তিপূজা পরিহার করে চলো।" -[সাফওয়া]

এ প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাব এই হতে পারে যে, মূলত এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়নি- বলা হয়েছে আরববাসীকে উদ্দেশ্য করে। অর্থাৎ হে আরববাসীরা তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করো।

আল্লামা সাবূনী বলেছেন, رُجْزٌ শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটার দ্বারা সর্বপ্রকার খারাপ জিনিস উদ্দেশ্য হতে পারে। এটার তাৎপর্য এই যে, তুমি একজন দাঈ মুবাল্লিগ, সুতরাং তোমার চরিত্রে কোনো রকমের খারাপ কিছু থাকতে পারে না। অতএব, আলোচ্য আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাধ্যমে সমস্ত দাঈদেরকে তাদের চরিত্র হতে সর্বপ্রকারের খারাপ ও নিন্দনীয় জিনিস ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : মুফাসসিরগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন-

১. অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এর অর্থ হলো- এ উদ্দেশ্যে মানুষকে নিজের সম্পদ দিও না যে, তোমাকে তা সঠিক পরিমাণে দেওয়া হবে।
২. ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো জাগতিক বিনিময় প্রাপ্তির লোভে কাউকে কিছুই দিও না; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দিও।
৩. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, নিজের নেক আমলকে অনেক বেশি মনে করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিজের আমলের ইহসান রেখো না। তিনি আরো বলেন, আমলকে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক মনে করো না। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতের মোকাবিলায় তোমার আমল অতি সামান্য।
৪. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো সঠিক পরিমাণ কল্যাণের অন্বেষণে নিজেকে দুর্বল মনে করো না।
৫. ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হে রাসূল! নবুয়তের ইহসানের বিনিময়ে মানুষের নিকট হতে জাগতিক কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবেন না।
৬. এ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে যে, নিজের দানকে বড় মনে করে দরিদ্র মানুষের প্রতি ইহসান রাখবেন না।

-[মাযহারী, ইবনে কাছীর, নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ : এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ কথার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আপনি যে মতাদর্শ নিয়ে সে বিপরীতমুখি পরিবেশে দণ্ডায়মান হয়েছেন, সেখানে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, বিপদের সম্মুখীন হওয়া, নানা প্রকর জুলুম ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব, সর্বাবস্থায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপনাকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় দুঃখ-কষ্টকে অম্লান বদনে সহ্য করতে হবে। অতএব, আপনি এ ব্যাপারে পূর্ব হতেই তৈরি থাকুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ধৈর্যধারণ করতে বলার কারণ : পূর্ববর্তী আয়াতে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন সাধারণভাবে সকল মানব গোষ্ঠীকে সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করেন এবং কুফরি ও শিরক হতে তাদেরকে বিরত রাখতে জোর প্রচেষ্টা চালান। অতএব, এ কথাটিও স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, হঠাৎ করে সকল মানবকে তাদেরর বাপ-দাদার ধর্মত্যাগ করে নতুন একটি ধর্মের প্রতি আহ্বান করলে তাদের মন মেধা এটাকে গ্রহণ করতে চাইবে না, ফলে বহু লোক তাঁর শত্রুতা পোষণ করতে উদ্ধত হবে। সুতরাং নতুন ধর্মের আহ্বায়ক সেই মুহূর্তে যদি ধৈর্যশীল না হয়; বরং কথায় কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে তখন আর কোনো কাজই হবে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে ধৈর্য অবলম্বন করতে বলেছেন।

আর যেহেতু সাধারণত বাতিলপন্থি দুনিয়াতে সর্ব যুগেই অধিক হয়ে রয়েছে। এ জন্য সত্যের পথে অগ্রসর হতে প্রত্যেক পদে পদে বাঁধা ও সমস্যা আসবেই, তাই সে ক্ষেত্রে অধৈর্য হওয়ার কারণে মূল লক্ষ্য অর্জনে ফল পাওয়া যাবে না। অতএব, ধৈর্য ও সহনশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ বলেছেন।

অনুবাদ :

৮. فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ وَهُوَ الْقَرْنُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ ـ

৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এটা দ্বারা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার উদ্দেশ্য।

৯. فَذٰلِكَ اَىْ وَقْتُ النَّقْرِ يَوْمَئِذٍ بَدْلٌ مِمَّا قَبْلَهُ الْمُبْتَدَأُ وَبُنِىَ لِاِضَافَتِهِ اِلٰى غَيْرِ مُتَمَكِّنٍ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يَوْمٌ عَسِيْرٌ وَالْعَامِلُ فِىْ اِذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَ اَىْ اِشْتَدَّ الْاَمْرُ

৯. তবে তা অর্থাৎ ফুৎকারের দিন সেদিন এটা পূর্ববর্তী مُبْتَدَأٌ হতে بَدْل হয়েছে। যেহেতু غَيْرُ مُتَمَكِّنْ শব্দের প্রতি اِضَافَتْ হয়েছে তাই তা فَتْحَةٌ-এর উপর مَبْنِىْ হয়েছে। উক্ত مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرْ হলো পরবর্তী বাক্যাংশ ভীষণ সংকটময় দিন আর اِذَا -এর মধ্যে বাক্যের উদ্দিষ্ট বস্তু مَدْلُوْل جُمْلَة আমিল হয়েছে। অর্থাৎ اِشْتَدَّ الْاَمْرُ ব্যাপার সুকঠিন হয়েছে।

১০. عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ فِيْهِ دَلَالٌ عَلٰى اَنَّهُ يَسِيْرٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ فِىْ عُسْرٍ.

১০. যা কাফেরদের জন্য সহজ নয় এতে এ নির্দেশনা রয়েছে যে, তা মু'মিনদের জন্য সহজ হবে। তা সুকঠিন হওয়া সত্ত্বেও।

১১. ذَرْنِىْ اُتْرُكْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ عَطْفٌ عَلَى الْمَفْعُوْلِ اَوْ مَفْعُوْلٌ مَعَهُ وَحِيْدًا حَالٌ مِنْ مَنْ اَوْ مِنْ ضَمِيْرِهِ الْمَحْذُوْفِ مِنْ خَلَقْتُ اَىْ مُنْفَرِدًا بِلَا اَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَهُوَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ.

১১. আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ত্যাগ করো আর তাকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি এটা مَفْعُوْل-এর প্রতি عَطْف অথবা مَفْعُوْل مَعَهْ একাকীত্বে এটা مَنْ হতে অথবা خَلَقْتُ-এর উহ্য সর্বনাম হতে حَالْ অর্থাৎ পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদশূন্য অবস্থায় একাকী হিসেবে। আর সে হলো ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ।

১২. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا وَاسِعًا مُتَّصِلًا مِنَ الزُّرُوْعِ وَالضُّرُوْعِ وَالتِّجَارَةِ ـ

১২. আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ পরিব্যাপ্ত, যা ক্ষেত-খামার, গৃহপালিত পশু ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ : এটা بِتَاوِيْلِ مُفْرَدْ মুবতাদা হয়েছে, فَذٰلِكَ -এর فَاءْ টি جَزَائِيَّةْ এবং يَوْمَئِذٍ তৎপূর্ববর্তী مُبْتَدَأٌ হতে بَدْل এবং يَوْمٌ عَسِيْرٌ টি مَوْصُوْف وَصِفَتْ মিলে فَاِذَا الخ -এর خَبَرْ হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ : একটি পৃথক বাক্য হবে এবং وَمَنْ خَلَقْتُ টি ذَرْنِىْ হতে مَفْعُوْل مَعَهْ এবং وَحِيْد টি ذَرْنِىْ -এর يَاءْ হতে حَالْ হিসেবে مَنْصُوْبْ হবে।

قَوْلُهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا : টি পৃথক বাক্য অথবা পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف হবে। مَمْدُوْدًا টি مَالًا হতে صِفَتْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন যখন সূরা গাফিরের এ আয়াত- حٰمٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ..... لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ - নাজিল হয় তখন নবী করীম ﷺ মসজিদে হারামে এ আয়াতসমূহ পাঠ করলেন পাশেই ছিল ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ। সে এ আয়াতের পাঠ শ্রবণ করে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ল। তখন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ তার গোত্র বনী মাখযূমের মজলিসে গমন করে বলল, আমি এই মাত্র মুহাম্মদের নিকট এমন বাণী শ্রবণ করেছি যা মানুষের কথা নয়, এমনকি জিনের কথাও নয়; এতে দারুণ আকর্ষণ রয়েছে এবং রয়েছে সৌন্দর্য, সে একদিন বিজয়ী হবে, পরাজিত হবে না। তার এসব কথা শুনে কুরাইশগণ ইসলামের দিকে ধাবিত হতে লাগল। কাফেরদের দলপতি দুর্মতি আবূ জাহল এ সংবাদ শ্রবণ করে বিচলিত হয়ে অতি দ্রুত ওয়ালীদের নিকট অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত অবস্থায় গমন করল।

আবূ জাহল এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ-এর মাঝে কথোপকথন : আবূ জাহল ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ-এর সাথে প্রথমেই এমন সুরে কথাবার্তা বলতে শুরু করল যাতে ওলীদের রাগান্বিত ও ক্রোধান্বিত হওয়া স্বাভাবিক হয়। ওয়ালীদ প্রথমেই আবূ জাহলকে প্রশ্ন করল যে, ভাই তোমাকে এত ব্যথিত মনে হচ্ছে কেন? আবূ জাহল বলল, চিন্তিত হবো না কেন? এ সকল আরববাসী তোমাকে চাঁদা করে সম্পদ দিয়ে থাকে। এখন তুমি বৃদ্ধাবস্থায় পৌছেছ, তবে তাদের এ কথা কর্ণ গোচর হয়েছে যে, তুমি নাকি মুহাম্মদ ﷺ এবং আবূ কোহাফার বেটা (আবূ বকর)-এর নিকট কিছু খাওয়া-দাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে গিয়ে থাক, আর তাদের পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম জানানোর ফলে তুমি তাদের কথাবার্তার প্রশংসা করে থাক, [মূলত এ মিথ্যা কথাগুলো দ্বারা তাকে রাগান্বিত করে তোলাই উদ্দেশ্য ছিল।]

এ কথাগুলো শুনে ওয়ালীদ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। অর্থাৎ তার মধ্যে অবর্ণনীয় ক্ষোভ জাগল। ফলে তার মাথায় পাগলামি সওয়ার হলো এবং সে বলতে লাগল, তোমরা কি জান না আমার সম্পদ কি পরিমাণ রয়েছে? আমি কি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট রুটির মুখাপেক্ষী? তোমরা যে বলছ মুহাম্মদ ﷺ একজন পাগল, এটা একেবারেই মিথ্যা, তোমরা কি কেউ তাঁকে কোনো পাগলামির কাজ করতে দেখেছ? তখন আবূ জাহল স্বীকারোক্তি করে বলল, لَا وَاللّٰهِ না, আল্লাহর কসম! কখনো না। অতঃপর ওলীদ বলল, তোমরা তাকে কবি বলে থাক, কিন্তু কখনো কবিতাবৃত্তি করতে দেখেছ কিনা? এহেন মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে লজ্জিত করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উত্তরে আবূ জাহল বলল, لَا وَاللّٰهِ না, আল্লাহর কসম! কখনোও নয়। অতঃপর ওয়ালীদ বলল, তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলছ, তবে বল কখনো তাঁর হতে মিথ্যা উক্তি শ্রবণ করেছ কিনা? বল। এটার উত্তরেও আবূ জাহল বলল, لَا وَاللّٰهِ অতঃপর ওয়ালীদ বলল, তোমরা তাকে كَاهِنٌ বলে থাক, বলতো দেখি কখনোও كَاهِنٌ গণকদের মতো গল্প বলতে শুনেছ কিনা? আমি كَاهِنٌ দের কথা ভালোভাবেই বুঝি, তার বাক্যসমূহ কোনো كَهَانَتْ হতে পারে না। আবূ জাহল তখনও বলল, لَا وَاللّٰهِ পূর্ণ কুরাইশ বংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ صَادِقُ الْاَمِيْن উপাধিতে ভূষিত রয়েছেন।

আবূ জাহল এখন চিন্তায় পড়ল যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ -এর মন-মস্তিষ্ক যেভাবে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এটা হতে তাকে কিভাবে ফিরানো যায়। তখন সে ফন্দি করে বলল, আচ্ছা দেখ হে ওয়ালীদ! তুমি স্বীয় পিতৃপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে এবং সম্প্রদায়ের নিয়ম-নীতি হতে বঞ্চিত হয়ে নিজের সম্মুখের একটি অবুঝ বাচ্চা মুহাম্মদের ধর্ম অবলম্বন করবে এটা খুবই বিবেকহীনতা এবং বেইজ্জতির কথা। সুতরাং তুমি এখন এমন একটি কথা বলা উচিত হবে, যাতে সকলেরই বিশ্বাস হয় যে, তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্ম প্রকৃতপক্ষেই কখনো বিশ্বাস কর না।

তখন ওয়ালীদ বলল, তোমরা খুব ভালোভাবেই জান যে, বর্তমানে কবিতাবৃত্তি বা কবি হিসেবে সমগ্র আরব বিশ্বে কেউই আমার সমকক্ষ নেই। তবে আমি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর তেলাওয়াতকৃত বাক্যসমূহ এমন মধুর এবং আকর্ষণীয় অনুভব করেছি যার মধুরতা আমি জীবনে কখনো ভুলবো না।

বূ জাহল বলল, তোমাকে এখনই এমন বাক্য প্রকাশ করতে হবে যাতে তোমার বিষয়ে সম্প্রদায়ের সকলের কু-ধারণা দূরীভূত য়ে যায়। তখন ওয়ালীদ বলল, আচ্ছা, এখন যাও আমি চিন্তা করে দেখবো। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে ওয়ালীদ বলে উঠল إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন سِحْرٌ يُؤْثَرُ বলার কারণ ছিল, জাদুকরদের জাদুমন্ত্রের কারণে যেভাবে ব কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে পরিবর্তন করা যায়, তেমনিভাবে মুহাম্মদ ﷺ -এর আনীত সত্য বাণীর প্রভাবেও মানুষকে ল্লাহদ্রোহীতা হতে আল্লাহ অভিমুখি করা যায়, জাহিলকে আলিম বানানো যায়, বিপথগামীকে সৎপথে আনা সহজেই সম্ভব হয়। ই তারা ভাবল سِحْرٌ يُؤْثَرُ বললে মানুষ সহজেই তাকে প্রতারক ভাববে। তবে তারা مَعَاذَ اللّٰهِ অসৎ উদ্দেশ্যেই এটা রটনা রেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আবূ জাহলের কারণেই ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ ইসলাম গ্রহণ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, আর কট্টর ফের থেকে যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে তার পরিণাম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে আল্লামা বাগবী (র.) লিখেছেন এ ঘটনার ই আলোচ্য আয়াত ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا নাজিল হয়। -[মাযহারী, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ : نَقْر শব্দের আভিধানিক অর্থ আওয়াজ, আর نَاقُوْر শব্দটির অর্থ শিঙ্গা। আর গোটা ক্যের অর্থ হলো, যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ করা হবে। গ্রন্থকার এর তাফসীরে বলেছেন, তার অর্থ যখন দ্বিতীয় কার দেওয়া হবে। এখানে ফুৎকারকে দ্বিতীয় ফুৎকার বলে ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, প্রথম ফুৎকারের কারণে সমস্ত জীবিত ী বেহুঁশ হয়ে যাবে। এ ফুৎকারই কেবল কাফেরদের জন্য ভয়ের কারণ হবে না। দ্বিতীয় ফুৎকার দানের পরে সমস্ত মানুষকে বিত করা হবে, তখন কাফেররা তাদের অপকর্মের কারণে প্রচণ্ড ভয় পাবে এবং এ অবস্থায় তাদের দুরবস্থার কথা বুঝতে রবে। -[কাবীর]

নে হাব্বান 'কিতাবুল আযমতে' ওহাব ইবনে মুনাব্বিহের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সাদা চকচকে একটি ল থেকে শিঙ্গা সৃষ্টি করেছেন। এরপর আরশকে আদেশ দিয়েছেন শিঙ্গাকে ধরে রাখো, তখন শিঙ্গা আরশের সাথে ঝুলে ল। এরপর আল্লাহ তা'আলা كُنْ বললেন, তখন হযরত ইস্রাফীল (আ.) সৃষ্টি হলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিঙ্গা গ্রহণ রার আদেশ দিলেন, হযরত ইস্রাফীল (আ.) তাই করলেন এবং যতগুলো রূহ সৃষ্টি হয়েছে তার সংখ্যা অনুযায়ী শিঙ্গায় ছিদ্র য়েছে, একটি ছিদ্র দিয়ে দু'টি রূহ বের হবে না। শিঙ্গার মধ্যস্থলে গোলাকার ছিদ্র রয়েছে। হযরত ইস্রাফীল (আ.) তাতে মুখ খে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ দিয়েছেন, কিয়ামতের জন্য ঘোষণা করার দায়িত্ব আমি তোমার প্রতি অর্পণ রেছি। হযরত ইস্রাফীল (আ.) তখন আরশের সম্মুখভাগে প্রবেশ করেন ডান পা আরশের নিচে এবং বাম পা আরশের ভ্যন্তরে রেখে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। -[নূরুল কোরআন]

ذٰ দ্বারা ইঙ্গিত করার কারণ : আরবি ভাষায় দূরের কোনো বস্তুকে ইঙ্গিত করতে হলে ذٰلِكَ -এর ব্যবহার করা হয়। এখানে ذٰ اِسْمُ اِشَارَة দ্বারা ইঙ্গিত করার কারণ হলো- কিয়ামত দিবসের প্রচণ্ডতা এবং ভয়ঙ্করতা বুঝানো।

-[সাফওয়া, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ فَذٰلِكَ يَوْمَ ..... غَيْرُ يَسِيْرٍ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি অর্থ করা যেতে পারে।

থম অর্থ হলো, সেদিনটি বড়োই কঠোর ও সাংঘাতিক হবে, কাফেরদের জন্য কিছু মাত্র সহজ করা হবে না। অর্থাৎ সেদিনের ব প্রকারের কঠোরতা একান্তভাবে নির্দিষ্ট হবে কাফেরদের জন্য, ঈমানদার লোকদের জন্য সে দিনটি হবে খুবই সহজ ও লকা।

তীয় অর্থ হলো, يَوْمٌ عَسِيْرٌ -এর উপর عَطْف করে অর্থাৎ সেদিনটি হবে বড়োই কঠোর ও সাংঘাতিক, (সকলের জন্য) ফেরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না।

র্থাৎ কিয়ামত দিবস সকলের জন্য কঠোর হবে, বর্ণিত আছে যে, নবী রাসূলগণ পর্যন্ত সেদিন প্রচণ্ড ভয় পাবে, সেদিন এতই য়াবহ হবে যে, তরুণরা ভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তবে কাফেরদের জন্য সেদিনটি ঈমানদারদের তুলনায় অনেক বেশি ভয়ঙ্কর । -[কাবীর]

এ আয়াত দ্বারা বিপরীত অর্থ হুজ্জত হওয়ার পক্ষে দলিল দান : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, সেদিনটি কাফেরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না-এটা হতে বুঝা গেল যে, সেদিনটি মু'মিনদের জন্য সহজ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ উক্তি হতে দলিল গ্রহণ করে কোনো কোনো লোক বলেছেন, কুরআনের আয়াতের বিপরীত অর্থ হুজ্জত না হলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) "সেদিন কাফেরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না" কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে মু'মিনদের জন্য সহজতর হবে এমন কথা বলতেন না। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا : আলোচ্য আয়াতটি তিনটির অর্থ হতে পারে, এবং তিনটি অর্থই সঠিক। মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য আয়াতটি রাসূলে করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আয়াতের তিনটি অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো, আমাকে ছেড়ে দাও, আর সেই ব্যক্তিকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি। এর তাৎপর্য হচ্ছে, যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা হাজীদের মধ্যে তোমাকে জাদুকর বলে প্রচার করার পরামর্শ দিয়েছে, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম তখন তাকে একাকী সম্পদহীন, সন্তান-সন্ততিহীন ও মান-মর্যাদাহীন সৃষ্টি করেছিলাম। পরে তাকে আমি এসব কিছু দান করেছি। এটা সত্ত্বেও যখন সে তোমার নবুয়ত অস্বীকার করেছে তখন এ অস্বীকৃতির প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও। এ ব্যাপার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, "আমাকে একাই [প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য] ছেড়ে দাও, আর সেই ব্যক্তিকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি। এর তাৎপর্য এ যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা হতে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারটি পুরাপুরিভাবে তুমি আমার উপরই ছেড়ে দাও। যেহেতু আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি, তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া আমার জন্য তেমন কঠিন কাজ নয়। সুতরাং আমি একাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। এ ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

তৃতীয় অর্থ হলো "আমাকে ছেড়ে দাও, আর সেই লোকটাকে যাকে আমি এককভাবে সৃষ্টি করেছি।" আমি ছাড়া আর কেউ তার সৃষ্টিকর্তা নয় কোনোদিন ছিল না, যেসব উপাস্য দেবতার খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষত রাখার জন্য এ লোকটি তোমার পেশ করা তাওহিদী দাওয়াতের বিরোধিতায় এতটা তৎপর হয়ে আছে। তাকে সৃষ্টি করার কাজে তারা কেউই আমার সাথে শরিক ছিল না। কারণ আমিই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা। -[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا : অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি তার জন্য বহু সম্পদ দান করেছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে, ওয়ালীদের সম্পদ যথেষ্ট ছিল তার উদাহরণ এতটুকু দিয়েছেন-মক্কা হতে তায়েফ পর্যন্ত তার জমিন ও বাগান ইত্যাদি বিস্তীর্ণ ছিল এবং হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা.)-এর ভাষ্য মতে, তার বাৎসারিক আমদানি বা আয় এক কোটি দিনার হতো।

হযরত মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, তার নিকট হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সুফিয়ান বলেছেন তার নিকট লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ছিল। -[নূরুল কোরআন]

তবে এ কথায় সকল তাফসীরকারগণই একমত যে, শীত গ্রীষ্ম ভেদাভেদে বছরের সকল ঋতুতেই তার ফসল ইত্যাদি বরাবর কাটতে হতো। এতেই অনুমান করা যায় যে সে কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিল। কুরআনুল কারীমের ভাষায় একেই বলেছে وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا সে আরবের সর্দার রূপে সকলেরই নিকট একবাক্যে সু-পরিচিত ছিল, তার لَقَبْ ছিল رَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ সে গর্ব করে নিজেকে নিজেই ওয়াহীদ ইবনুল ওয়াহীদ বলত। অর্থাৎ এককের ছেলে একক, অর্থাৎ আমার পিতা মুগীরা অথবা আমার কোনো নজির আর জগতে নেই। অতএব, এ কারণেও তাকে আল্লাহ তা'আলা হয়তো خَلَقْتُ وَحِيْدًا বলেছেন, অর্থাৎ এককের বেটা একক বলে দাবিকারীকে আমার হাওলা করে দিন।

অনুবাদ :

١٣. وَبَنِيْنَ عَشَرَةً اَوْ اَكْثَرَ شُهُوْدًا يَشْهَدُوْنَ الْمَحَافِلَ وَتُسْمَعُ شَهَادَتُهُمْ .

১৩. এবং পুত্র সন্তান দশ বা ততোধিক সংখ্যক যারা সাক্ষ্যদানকারী তারা সমাবেশসমূহে সাক্ষ্যদান করে এবং তাদের সাক্ষ্যসমূহ গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়।

١٤. وَمَهَّدْتُّ بَسَطْتُّ لَهٗ فِى الْعَيْشِ وَالْعُمُرِ وَالْوَلَدِ تَمْهِيْدًا .

১৪. আর প্রস্তুত করেছি তার জন্য যাবতীয় স্বচ্ছন্দ জীবনোপকরণ তার জন্য প্রশস্ত করেছি, স্বাচ্ছন্দ্য জীবন আয়ুষ্কাল ও সন্তানসন্ততি যথেষ্টরূপে।

١٥. ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ .

১৫. এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাঁকে অধিক দান করবো।

١٦. كَلَّا ط لَا اَزِيْدُهٗ عَلٰى ذٰلِكَ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا اَىِ الْقُرْاٰنِ عَنِيْدًا مُعَانِدًا .

১৬. না, কখনোও নয়; আমি এ অবস্থার উপর তাকে আর বৃদ্ধি করবো না সে তো আমার নিদর্শনাবলির অর্থাৎ কুরআনের উদ্ধৃত বিরুদ্ধাচারী ঔদ্ধত্য সহকারে বিরোধিতাকারী।

١٧. سَاُرْهِقُهٗ اُكَلِّفُهٗ صَعُوْدًا مَشَقَّةً مِنَ الْعَذَابِ اَوْ جَبَلًا مِنْ نَارٍ يَصْعَدُ فِيْهِ ثُمَّ يَهْوِىْ اَبَدًا .

১৭. অচিরেই আমি তাকে আরোহণ করাবো কষ্ট দান করবো জাহান্নামের পাহাড়ে আজাবের কষ্ট অথবা জাহান্নামের পাহাড় যাতে সে আরোহণ করবে এবং সর্বদা নিচে অবতরণ করবে।

١٨. اِنَّهٗ فَكَّرَ فِيْمَا يَقُوْلُ فِى الْقُرْاٰنِ الَّذِىْ سَمِعَهٗ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدَّرَ فِىْ نَفْسِهٖ ذٰلِكَ .

১৮. সে তো চিন্তা করল কুরআনে যা বলা হয়েছে তাতে যা সে নবী করীম ﷺ হতে শ্রবণ করেছে এবং সিদ্ধান্ত করল স্বীয় অন্তরে তদ্বিষয়ে।

١٩. فَقُتِلَ لُعِنَ وَعُذِّبَ كَيْفَ قَدَّرَ عَلٰى اَىِّ حَالٍ كَانَ تَقْدِيْرُهٗ .

১৯. সে অভিশপ্ত হোক অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হোক কিরূপে সে এ সিদ্ধান্ত করল তার এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়েছিল।

٢٠. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ .

২০. পুনঃ সে অভিশপ্ত হোক, কিরূপে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো।

٢١. ثُمَّ نَظَرَ فِىْ وُجُوْهِ قَوْمِهٖ اَوْ فِيْمَا يَقْدَحُ بِهٖ .

২১. পুনঃ সে চেয়ে দেখল তার সম্প্রদায়ের লোকদের মুখপানে কিংবা তৎপ্রতি যার ছিদ্রান্বেষণ করা হয়।

٢٢. ثُمَّ عَبَسَ قَبَضَ وَجْهَهٗ وَكَلَحَهٗ وَكَلَحَهٗ ضَيِّقًا بِمَا يَقُوْلُ وَبَسَرَ زَادَ فِى الْقَبْضِ وَالْكُلُوْحِ .

২২. তৎপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল তার মুখমণ্ডলকে কুঞ্চিত করল ও স্বীয় কথায় হতোদ্যম হয়ে বিমর্ষ হলো। এবং মুখ বিকৃত করল ভ্রূকুঞ্চন ও বিমর্ষতায় আধিক্য সৃষ্টি করল।

٢٣. ثُمَّ اَدْبَرَ عَنِ الْاِيْمَانِ وَاسْتَكْبَرَ تَكَبَّرَ عَنْ اِتِّبَاعِ النَّبِىِّ ﷺ .

২৩. অতঃপর সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল ঈমান আনয়ন করা হতে এবং অহঙ্কার করল মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ করার প্রশ্নে দম্ভ প্রকাশ করল।

٢٤. فَقَالَ فِيْمَا جَاءَ بِهِ اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ يُنْقَلُ عَنِ السَّحَرَةِ.

২৪. এবং সে বলল আনীত বিষয় তথা ওহী প্রসঙ্গে এটা-তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয় জাদুকরগণ হতে উদ্ধৃত।

٢٥. اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ كَمَا قَالُوْا اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ.

২৫. এটাতো মানুষেরই কথা যদ্রূপ মুশরিকগণ বলে বেড়াত যে, কোনো মানুষ মহানবী ﷺ -কে এটা শিক্ষাদান করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا : এটা পূর্ববর্তী مَالًا مَّمْدُوْدًا-এর وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا -এর عَطْف হয়ে মহল্লান মানসূব হয়েছে আর بَنِيْنَ হতে شُهُوْدًا টি حَال হিসেবেও মানসূব হতে পারে। تَمْهِيْدًا টি مَهَّدْتُ হতে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে মানসূব; এটা كَانَ -এর ضَمِيْر হতে خَبَر হয়ে মহল্লান মানসূব হবে।

قَوْلُهُ صَعُوْدًا : এটা أَرْهِقُ -এর ضَمِيْر হতে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হিসেবে মানসূব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا : অর্থাৎ তার সাথে উপস্থিত থাকা বহু পুত্র-সন্তান দান করেছি। ওয়ালীদ তৎকালীন আরবের সেরা ধনী ব্যক্তি ছিল, সন্তানসন্ততিও আল্লাহ তা'আলা তাকে কম দেননি। জালালাইন গ্রন্থকারের মতে, তার দশটি বা আরো অধিক পুত্র সন্তান ছিল। অন্য বর্ণনায় সাতজন তারা হলো– ১. ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, ২. খালেদ, ৩. আম্মারা, ৪. হেশাম, ৫. আস, ৬. কায়েস, ৭. আবদুশ শামস। যারা সর্বক্ষণ তার নিকট উপস্থিত থাকত। বিভিন্ন সভা মজলিসে তারা উপস্থিত হতো এবং তাদের মর্যদা সামাজিক ক্ষেত্রে এত অধিক ছিল যে, তাদের সাক্ষ্য ইত্যাদি সকল প্রকারেই গ্রাহ্য হতো।
–[নূরুল কোরআন]

ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ -এর সন্তানদের ব্যাপারে মতভেদ : ইবনে মুনযির হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদের দশটি পুত্র সন্তান ছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) বর্ণনা করেছেন, ওয়ালীদের তেরোটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে তিনজন ইসলাম গ্রহণ করেন। ১. খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ২. হিশাম, ৩. আম্মার, আবার কারো কারো মতে عَمَّارٌ -এর পরিবর্তে "ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ" ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আম্মার সম্পর্কে অভিমতটি ভুল বর্ণনা। উল্লেখ্য যে, বিখ্যাত বীর কেশরী খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এ ওয়ালীদেরই সন্তান।

شُهُوْدًا শব্দটি আল্লাহ তা'আলা কেন সংযোজন করেছেন? : এর উত্তরে বলা হবে, ওয়ালীদের সম্পদ অশেষ পরিমাণে ছিল, অর্থসম্পদের জন্য তার অভাব ছিল না। রোজগারের জন্য বিদেশ ভ্রমণের প্রয়োজন হতো না। তাই তারা সদা পিতার খেদমতে নিয়োজিত থাকত।

আর তারা সভা মজলিসসমূহে উপস্থিত হওয়ার এবং তাদের কথাবার্তা শ্রবণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো তারা স্বদেশে ও স্ববংশে প্রভাব লাভ করেছে।

অথবা, এর অপর একটি কারণ হতে পারে ওয়ালীদ অর্থবৃত্তের জন্য যেহেতু কারো মুখাপেক্ষী নয়, তাই তার খাদেম-খোদ্দাম যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হতো, এ কারণেও তারা তার নিকটে হাজির থাকত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَهَّدْتُّ لَهُ تَمْهِيْدًا : অর্থাৎ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সম্মান-ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে মক্কার লোকেরা তার কথা শুনত এবং তার আনুগত্য করত ও তাকে মেনে চলত। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তা সত্ত্বেও সে লালসা পোষণ করে এ জন্য যে, আমি তাকে আরো অধিক দিবো। এ কথাটির এক অর্থ হচ্ছে– এতদসত্ত্বেও এ লোকটির লোভ-লালসা শেষ হচ্ছে না। এত কিছু পাওয়ার পরও লোকটি সব সময় আরো বেশি করে নিয়ামত ও ধন-দৌলত লাভ করার জন্য চিন্তান্বিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছে– হযরত হাসান বসরী ও অন্যান্য কয়েকজন মনীষী বলেছেন যে, লোকটি সব সময় বলত– মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কোনো জীবন আছে এবং তাতে জান্নাত নামে-ও কোনো জিনিস অবস্থিত থাকবে। মুহাম্মদ ﷺ -এর একথা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তাহলে সবই জান্নাত তো আমার জন্যই নির্মিত হয়ে থাকবে।

قَوْلُهُ سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا : এর অর্থ হচ্ছে আমি অতি সত্বর তাকে সাউদে আরোহণ করাবো। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা নবী করীম ﷺ বলেছেন, সাউদ হচ্ছে জাহান্নামের একটি পাহাড়। সে পাহাড়ে আরোহণের জন্য বাধ্য করা হবে। যখনই তাতে হাত রাখবে, তখনই হাত পুড়ে উঠবে। হাত উঠালে তা অবস হয়ে যাবে। পা রাখলে পুড়ে উঠবে এবং পা উঠালে অবস হয়ে পড়বে। আয়াতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে জাহান্নামের সে পাহাড়ে চড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

* হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, صَعُوْدٌ দোজখের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি পাহাড়। ওলীদ সত্তর বছর যাবৎ তাতে আরোহণ করতে থাকবে। এরপর তার নিম্নদেশ নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরদিন এ অবস্থায়ই থাকবে।

* কালবী (র.) বলেছেন, صَعُوْدٌ হলো দোজখের একটি উপত্যকা। ওয়ালীদকে তাতে আরোহণের হুকুম দেওয়া হবে। উপর থেকে লৌহ নির্মিত জিঞ্জির দ্বারা তাকে টানা হবে। আর নীচ থেকে হাতুড়ি দ্বারা তাকে প্রহার করা হবে। চল্লিশ বছর যাবৎ উপরের দিকে উঠতে থাকবে। যখন উচ্চ চূড়ায় পৌঁছে যাবে তখন তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে, এরপর পুনরায় উপরের দিকে উঠার আদেশ হবে এবং উপর থেকে টেনে তোলা হবে, এরপর পেছন থেকে প্রহার করা হবে। এ অবস্থা সর্বদা অব্যাহত থাকবে। –[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ .... ثُمَّ نَظَرَ : আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে তার মানসিক অবস্থার প্রতি আলোকপাত করেছেন। বলা হয়েছে যে, সে জানত যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর কালাম। এ কথা জানা সত্ত্বেও কুরআন হতে মানুষকে ফিরানোর উদ্দেশ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এমন এক কথা বলল, যা সম্বন্ধে তার নিজেরও বিশ্বাস ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত সে কিভাবে দিতে পারল", আয়াতগুলোর অর্থ হলো "সে চিন্তা করেছে এবং একটি সিদ্ধান্ত স্থির করেছে। অতএব সে ধ্বংস হোক। কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত স্থির করল। অতঃপর সে আরো ধ্বংস হোক, কেমন করে এ সিদ্ধান্ত স্থির করল, অতঃপর সে চেয়ে দেখল।"

অর্থাৎ সে জেনে-বুঝে কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল। সিদ্ধান্ত কি স্থির করেছিল তা পরে বলা হয়েছে। সে সিদ্ধান্তটি ছিল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে জাদুকর বলা, আর পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে জাদুর কথা, মানুষের বানানো কথা বলে ঘোষণা দেওয়া। এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে কুরআন বিমুখ করে তোলা এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সমাজের মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করা।

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ ... اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর চিন্তাভাবনা করে বক্তব্য স্থির করে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এমনভাবে মুখ বাঁকা ও কপালের চামড়া জড়ো করে তাকাল, যাতে মানুষ ধারণা করতে পারে যে সে বিশেষত এমন চিন্তা করছে যাতে মুহাম্মদ ﷺ সকলেরই শত্রু এবং শত্রুকে খুব নিকৃষ্ট খেতাব দিয়ে শেষ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাই করল এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার মনোভাব ফিরিয়ে ফেলল, আর মনের খেতাবটি উল্লেখ করে দিল যে, কুরআনের ভাষা নামে এটা একটা আকর্ষণীয় জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ দ্বারা এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ওয়ালীদ সত্যই বুঝেছে যে, এ কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত নিশ্চিত সত্য। স্বজাতির নামকে সে ক্ষুণ্ন করবে না। সত্যের প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্তকে ত্যাগ করে অসত্যকে প্রাধান্য দিল এবং গ্রহণ করল। ইসলামকে বড় দৌলত মনে করল না। জাতির কুসংস্কার ও কুপ্রথা এবং বর্বরতাকে মূল্যায়ন করল। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দোজখের অগ্নি পছন্দ করলেন। যেমন কর্ম তেমন ফল।

কেউ কেউ يُّؤْثَرُ শব্দটিকে اِيْثَارٌ হতে গ্রহণ করে তাফসীর করেছেন, অর্থাৎ এটা এমন জাদুমন্ত্র যা অন্যান্য জাদুমন্ত্রসমূহ হতে অতি উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের জাদু। তাহলে অর্থ হচ্ছে– মুহাম্মদ ﷺও অতি বড় ধরনের একজন জাদুকর।

আর তারা বলেছে এটা হলো মানবের কথা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণী– وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ আর এটা কোনো গণকের গণনাও নয়। আল্লাহ চাহেন কাফেরদেরকে রক্ষা করার জন্য, তারা চায় নিজেরা দোজখে যাওয়ার জন্য, এ হেতু আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেন سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ আমি তার জন্য سَقَر নামক দোজখ নির্ধারিত রেখেছি। অচিরেই তাকে তাতে প্রবেশ করাবো।

অনুবাদ :

٢٦. سَاُصْلِيْهِ اُدْخِلُهُ سَقَرَ جَهَنَّمَ .

২৬. অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করবো প্রবিষ্ট করবো। সাকারে সাকার নামক দোজখে।

٢٧. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ تَعْظِيْمٌ لِشَانِهَا .

২৭. তুমি কি জান সাকার কি? এটা দ্বারা জাহান্নামের ভয়াবহতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

٢٨. لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ شَيْئًا مِنْ لَحْمٍ وَلَا عَصَبٍ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ ثُمَّ يَعُوْدُ كَمَا كَانَ .

২৮. এটা অবশিষ্ট রাখবেনা এবং পরিত্যাগ করবে না মাংস ও হাড়ের মধ্য হতে কোনো কিছু; কিন্তু তাকে ধ্বংস করে দিবে। পুনরায় প্রত্যেক বস্তু নতুনভাবে স্ব-স্ব অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে।

٢٩. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ مُحْرِقَةٌ لِظَاهِرِ الْجِلْدِ .

২৯. এটা গায়ের চামড়া দগ্ধ করবে প্রকাশ্য চামড়াকে জ্বালিয়ে ভস্ম করবে।

٣٠. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا خَزَنَتُهَا قَالَ بَعْضُ الْكُفَّارِ وَكَانَ قَوِيًّا شَدِيْدَ الْبَاْسِ اَنَا اَكْفِيْكُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ اكْفُوْنِىْ اَنْتُمْ اِثْنَيْنِ قَالَ تَعَالٰى .

৩০. এর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন উনিশজন প্রহরী ফেরেশতা। একজন কাফের যে অতিশয় শক্তিশালী ছিল, সে বলল, আমি তন্মধ্য হতে সতেরো জনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। তোমরা অবশিষ্ট দু'জনের মোকাবিলা করো। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

٣١. وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً ص اَىْ فَلَا يُطَاقُوْنَ كَمَا يَتَوَهَّمُوْنَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ ذٰلِكَ اِلَّا فِتْنَةً ضَلَالًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا بِاَنْ يَّقُوْلُوْا لِمَ كَانُوْا تِسْعَةَ عَشَرَ لِيَسْتَيْقِنَ لِيَسْتَبِيْنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اَىِ الْيَهُوْدُ صِدْقَ النَّبِىِّ فِىْ كَوْنِهِمْ تِسْعَةَ عَشَرَ الْمُوَافِقَ لِمَا فِىْ كِتَابِهِمْ .

৩১. আমি তো জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ ছাড়া কাউকেও নিযুক্ত করিনি অর্থাৎ তারা তাদের মোকাবিলার শক্তি রাখে না, যেমন তারা ধারণা করছে। আর আমি তো এদের সংখ্যা উল্লেখ করেছি উল্লিখিত পরিমাণ। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিভ্রান্ত করার নিমিত্ত তাদেরকে যারা কুফরি করেছে। যাতে তারা এরূপ বলবে যে, এ উনিশজন কেন? যাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে স্বপ্রমাণিত হয় তাদের নিকট যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ ইহুদিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাদের সংখ্যা উনিশ হওয়ার প্রশ্নে সত্যায়ন করে, যেহেতু তাদের কিতাব তাওরাতের সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سَقَرَ : এটা سَاُصْلِيْهِ হতে مَفْعُوْل فِيْهِ হিসেবে মহল্লান মানসূব।

قَوْلُهُ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ : এখানে مَا শব্দটি মুবতাদা, আর اَدْرٰكَ তার খবর অর্থাৎ اَىُّ شَيْءٍ اَعْلَمَكَ আর مَا سَقَرُ-এর مَا মুবতাদা এবং سَقَرُ তার খবর এবং পুরা বাক্য اَدْرٰكَ-এর মাফউলে ছানী হবে।

قَوْلُهُ تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ : এরা উভয়ই حَالٌ হিসেবে মহল্লান মানসূব এবং عَامِلُ مَعْنَى التَّعْظِيْمِ (كَذَا قَالَهُ اَبُوْ الْبَقَاءِ) অর্থাৎ مَا سَقَرُ প্রশ্নটিই مَعْنَى التَّعْظِيْمِ তখন অর্থ হবে اِسْتَعْظِمُوْا سَقَرَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالِ আর لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ-এর مَفْعُوْل টি مَحْذُوْف হবে اَىْ لَا تُبْقِىْ مَا بَقِىَ فِيْهَا وَلَا تَذَرُهُ بَلْ تُهْلِكُهُ আর কেউ কেউ বলেন لَا تُبْقِىْ عَلٰى مَنْ اُلْقِىَ فِيْهَا وَلَا تَذَرُ غَايَةَ الْعَذَابِ اِلَّا وَصَلَتْهُ اِلَيْهِ অথবা এরা পরস্পর جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ হবে।

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ এটা উহ্য মুবতাদার খবর হবে أَيْ هِيَ আর হাসান ইবনে আবী আবলাহ ও যায়েদ ইবনে আলীর মতে এরা বাক্য লে مَنْصُوْبٌ عَلَى الْحَالِ হবে। এটাও তিন কারণে হবে।

أَنَّهَا حَالٌ مِنْ سَقَرَ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى التَّعْظِيْمِ

أَنَّهَا حَالٌ مِنْ لَا تُبْقِيْ

حَالٌ مِنْ لَا تَذَرُ আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে حَالُ اخْتِصَاصٍ -

রো কারো মতে حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ . عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ এটা শিবহে ফে'লের এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে পৃথক বাক্য তথা مُسْتَقِلٌّ جُمْلَةٌ হবে।

قَوْلُهُ مَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰئِكَةً : এখানে إِلَّا مَلٰئِكَةً টি أَصْحٰبَ النَّارِ হতে مُسْتَثْنٰى এবং উভয় মিলে جَعَلْنَا তে مَفْعُوْلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ إِلَّا فِتْنَةً : এটা جَعَلَ হতে মাফউলে ছানী, আর لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا টি فِتْنَةً -এর সিফাত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ : জমহুর لَوَّاحَةٌ শব্দটিকে উহ্য মুবতাদার خَبَرٌ হিসেবে مَرْفُوْعٌ পড়েছেন। আর কেউ কেউ তাকে سَقَرَ এর صِفَتٌ হিসেবেও مَرْفُوْعٌ পড়েছেন, তবে প্রথম তারকীব-ই হলো উত্তম। হাসান বসরী, নাসর ইবনে কাসেম, ঈসা ইবনে ওমর ইবনে আবূ আবলাহ, যায়েদ ইবনে আলী (র.) হাল হিসেবে মানসূব পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تِسْعَةَ عَشَرَ : জমহুর عَشَرَ-এর شِيْن এ- فَتْح দিয়ে تِسْعَةَ عَشَرَ পড়েছেন। আর আবূ জা'ফর ইবনে কা'কা এবং তালহা ইবনে সোলাইমান شِيْن এ- سَاكِنْ যুক্ত করে عَشْرَ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম বায়হাকী হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক নবী করীম ﷺ -এর এক সাহাবীর নিকট জাহান্নামের প্রহরী সম্পর্কে প্রশ্ন করল। সাহাবী নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে ব্যাপারটি জানালেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[লোবাব, কাষীর]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উপরিউক্ত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াতে জাহান্নামের প্রহরীদের উনিশজনের সংখ্যাটি উল্লেখ হওয়ায় কাফেরদের মনে নতুন এক প্রশ্নের উদ্রেক হলো। তারা বলতে লাগল হযরত আদম হতে শুরু করে জাহান্নামে অগণিত মানুষের জন্য মাত্র উনিশজন প্রহরী হওয়া একটা বিস্ময়কর কথা। অতএব এটা নিয়ে কাফেরগণ হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা বলল, এ কয়জন ফেরেশতাকে কুপোকাত করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। আবূ জাহল প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলল, তোমরা কি এতই দুর্বল যে দশ-দশজন লোকও এক-একজন ফেরেশতার সাথে মোকাবিলা করতে পারবে না? তখন বনী জুহাম গোত্রের একজন পালোয়ান বলল, ১৭ জনের সাথে আমি একাই মোকাবিলা করতে সক্ষম। অবশিষ্ট দু' জনকে তোমরা কাবু করে নিবে। এ ধরনের হাস্যকর কথার জবাবেই আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। -[খাযেন, কাষীর]

আল্লামা সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ অবতীর্ণ হওয়ার পর আবুল আসাদ নামে কুরাইশের এক লোক বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! উনিশজন ফেরেশতা তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারবে না। আমি ডান হাত দিয়ে দশজন এবং বাম হাত দ্বারা নয়জনকে কুপোকাত করবো। তখন আল্লাহ তা'আলা.... أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً আয়াত অবতীর্ণ করেন।

قَوْلُهُ سَقَرَ : উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ওয়ালীদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলে আমি তাকে سَقَرْ নামক দোজখে প্রবিষ্ট করাবো। এখানে سَقَرْ -এর কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন- سَقَرْ দোজখসমূহের মধ্যে খুবই মারাত্মক পীড়াদায়ক ও কঠিন। সুতরাং ওয়ালীদ এমনি ধরনের দুষ্ট প্রকৃতির কাফের ছিল তাকে শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও তেমন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অথবা سَقَرْ সম্পর্কে আমাদের যেমন ধারণা যে তা সাধারণত কঠিন মূলত কেবল তা কঠিনই নয়, বরং তা যে কত বড় কঠিন তা মানবিক ধারণার মাধ্যমে অনুমান সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে তার ভয়াবহতা বুঝাতে গিয়ে বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি কি জানেন যে, سَقَرْ কি প্রকৃতির দোজখ? জেনে রাখুন তাতে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে তাদের রক্ত-মাংশ-হাড় ইত্যাদির কোনো কিছুই তথায় থাকবে না। জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অর্থাৎ দেহের কোনো চিহ্ন বলতে কিছুই থাকবে না। তখন পুনরায় সুগঠন যুক্ত তাজা শরীর তৈরি করে দেওয়া হবে। এটাও পূর্বেকার মতো শেষ হয়ে যাবে। এরূপ হতেই থাকবে।

প্রশ্নের উদ্দেশ্য : وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ "তুমি কি জান সাকার কি?" এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তুমি কি জান সাকার জিনিসটি কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে- তুমি সর্বাধিক জ্ঞানী এবং আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তোমার পক্ষেও সম্ভব নয় যে, সাকার কত ভয়ঙ্কর স্থান-তা জানা। মূল উদ্দেশ্য এখানে সাকার দোজখের ভয়াবহ অবস্থা এবং ভীতিকর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তা অবশিষ্ট রাখে না, ছেড়েও দেয় না।" এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, যে ব্যক্তিই তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তা তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে; কিন্তু জ্বলে মরে গেলেও তা তাকে ছেড়ে দিবে না; একবিন্দু নিষ্কৃতি দিবে না। তাকে আবার জীবিত করা হবে, পরে আবার তাকে জ্বালানো হবে। অপর একটি আয়াতে এ কথাটি বলা হয়েছে এ ভাষায়- لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى সে তাতে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না (আল-আ'লা : আয়াত ১৩) এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আজাব পাওয়ার যোগ্য অধিকারী একজনকেও তা অবশিষ্ট থাকতে দিবে না। তার আয়ত্তের বাইরে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না, আর যে-ই তার আয়ত্তে আসবে তাকে আজাব না দিয়ে ছাড়বে না।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ : এ বাক্যেরও দু'টি অর্থ করা হয়েছে। একটি হলো لَوَّاحَةٌ শব্দটি لَاحَ . يَلُوحُ হতে মুবালাগার সীগাহ, আর بَشَرٌ অর্থ- মানুষ। এ হিসেবে বাক্যের অর্থ হলো, জাহান্নাম বা সাকার মানুষের দৃষ্টির সামনে চমকাতে থাকবে। অর্থাৎ ভয়ঙ্কর হওয়ায় দূর হতে লোকেরা জাহান্নামকে দেখতে পাবে, ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেছেন, পাঁচ শত মাইল দূর হতে লোকেরা জাহান্নামের আগুন দেখতে পাবে। ইমাম রাযী, আল্লামা সাবূনী ও আল্লামা কুরতুবী (র.) এ তাফসীর করেছেন। আল্লামা কুরতুবী (র.) এটা হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত বলে দাবি করেছেন। এটার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, بَشَرٌ -কে بَشَرَةٌ -এর বহুবচন মনে করা। তখন বাক্যের অর্থ হবে, চামড়া ঝলসিয়ে দানকারী। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন দোজখবাসীদের চামড়া ঝলসিয়ে দিবে, কোনো অংশকে বাদ রাখবে না। মুখমণ্ডল এবং শরীরের অন্যান্য চামড়া ঝলসিয়ে দিবে। আল্লামা কুরতুবী, সাবূনী এবং ইমাম রাযী (র.) প্রথমোক্ত অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ "অর্থ তা অবশিষ্টও রাখে না, ছেড়েও দেয় না" -এ কথার পর "চামড়া ঝলসিয়ে দেয়" একথা বলার প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং এটার অর্থ দ্বিতীয়টি-প্রথমটি নয়। তবে কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, চামড়া ঝলসিয়ে দেওয়ার কথা আবার আলাদাভাবে বলার কারণ হলো, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকট ও প্রকাশকারী আসল জিনিস হলো তার মুখাবয়ব ও তার দেহের চর্ম, তার কুশ্রীতাই তাকে খুব বেশি মানসিক অস্বস্তিতে নিমজ্জিত করে। দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকুক না কেন, সে জন্য কেউ তেমন দুঃখিত হয় না, যতটা দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও মানসিক যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয় তার মুখমণ্ডলের কুশ্রীতা কিংবা দেহের প্রকাশ্য অংশের উপর কুশ্রী ক্ষত চিহ্ন থাকলে, কেননা তা দেখে তার প্রতি প্রত্যেকটি লোকই ঘৃণাবোধ করতে পারে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, এ সুন্দর-সুশ্রী মুখাবয়ব ও চাকচিক্যপূর্ণ এবং নির্মম কান্তিধারী দেহের অধিকারী যেসব লোক বর্তমানে দুনিয়াতে নিজেদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে গৌরবে স্ফীত হয়ে আছে, তারা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহর ন্যায় শত্রুতামূলক আচরণ করতে থাকে, তাহলে তাদের মুখাবয়ব ঝলসিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের চামড়া জ্বালিয়ে কয়লার মতো কালো করে দেওয়া হবে।

এ আলোচনা হতে জানা গেল যে, গ্রন্থকার এবং আরো অনেকের কাছে আয়াতের দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণীয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ : ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে যে দোজখে প্রবেশ করানো হবে সে দোজখের উনিশজন রক্ষিবাহিনী থাকবে। যারা কাফেরদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে থাকবে।

একজন ফেরেশতাই কাফেরদেরকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট। তদুপরি ১৯ জন ফেরেশতা তথায় নিযুক্ত করার অর্থ কি?

এটার বিভিন্ন কারণ হতে পারে :

১. হতে পারে জাহান্নামের আজাব বিভিন্ন প্রকারে হবে, প্রত্যেক প্রকারের জন্য এক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে।

২. অথবা, একজন ফেরেশতার মাধ্যমেই আজাবের কাজ সমাধা করা যেত ঠিকই, তবে আজাবের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে সে কাজের সুষ্ঠু আয়োজনের এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একাধিক ফেরেশতা ব্যবহার করা হবে। আজাবের কার্যে কোথাও বিঘ্ন ঘটে কিনা সে দিকের প্রহরী হিসেবে একাধিক ফেরেশতা থাকবে।

৩. অথবা, উনিশ সংখ্যা দ্বারা ফেরেশতাদের আধিক্যের সমাগম হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নয়।

৪. অথবা, تِسْعَةَ عَشَرَ উনিশ দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা আল্লাহ সব চেয়ে ভালো জানেন।

কামালাইন গ্রন্থকার বলেন, تِسْعَةَ عَشَرَ বলে যে সকল ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে তাদের অন্তর থেকে রহমত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর তারা প্রত্যেকেই ৭০ হাজার গুনাহগারকে হাঁকিয়ে দোজখে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদেরকে এ জন্য নির্ধারিত করেছেন।

৫. ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন। আল্লাহ তা'আলা দোজখের ব্যবস্থাপনায় উনিশজন ফেরেশতার যে কথা এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন তার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন تِسْعَةَ عَشَرَ -এর পর আরেকটি কথা উহ্য থাকতে পারে, আর তা হলো صِنْفًا তথা উনিশ প্রকার ফেরেশতা।

৬. আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, تِسْعَةَ عَشَرَ -এর পর صِفٌ শব্দটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ উনিশ কাতার ফেরেশতা। -[কাবীর, মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً : অর্থ- "আমি দোজখের কর্মচারী ফেরেশতা ছাড়া অন্য কাউকেও বানাইনি।" আলোচ্য আয়াতে এক শ্রেণির লোকদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। সে লোকেরা বলাবলি করেছিল যে, হযরত আদম (আ.) হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক পাপ করেছে তাদের সকলকে আজাব দানের জন্য মাত্র ১৯ জন ফেরেশতা কি যথেষ্ট হতে পারে? সে ১৯ জনের মোকাবিলা করাতো কয়েকজন শক্তি-সামর্থ্য মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার জবাব আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- দোজখের কর্মচারী আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকে নিযুক্ত করেননি। যাদেরকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে তারা ফেরেশতা। তাদের শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। তারা সংখ্যায় কম হলেও সমস্ত পাপী লোকদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েও তাদের মোকাবিলা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ফেরেশতাদের শক্তি-সামার্থ্যেরে প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ "আর তোমার প্রতিপালকে সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।" অর্থাৎ তারা কত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।

জাহান্নামের কর্মচারী ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামে কর্মরত ফেরেশতাগণের সংখ্যা উল্লেখ করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১. কাফেরদেরকে পরীক্ষা করা এর উদ্দেশ্য। কেননা শানে নুযূল হতে জানা যায় যে, তারা এ সংখ্যার কথা শুনে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের কথা বলাবলি করেছে এতেই তাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে।

২. আহলে কিতাবগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধিকরণ। এ সংখ্যার কথা শুনে ঈমানদারগণ মেনে নিয়েছেন। সে কারণেই তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আহলে কিতাবগণের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার এবং কতিপয় তাফসীরকার বলেছেন, ইহুদি, খ্রিস্টান, আহলে কিতাবদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতেও দোজখের ফেরেশতাদের এ সংখ্যাই উদ্ধৃত হয়েছে বিধায় এ সংখ্যাটির কথা শুনে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, এ কথাটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর বলা কথা। ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলে এটাই বুঝিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এ তাৎপর্য দু'টি কারণে যথার্থ নয়। একটি এই যে, ইহুদি ও নাসারাদের যেসব ধর্মীয় বই-কিতাব দুনিয়াতে পাওয়া যায়, তাতে শত খোঁজাখুজি করেও দোজখের ফেরেশতাদের এ সংখ্যার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। কাজেই তাফসীরকারদের উক্ত কথার কোনো ভিত্তি নেই। আর দ্বিতীয় হচ্ছে- কুরআন মজীদে এমন অনেক কথাই পাওয়া যায়, যা আহলে কিতাবদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতেও বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে না, উপরন্তু এ বলে মিথ্যা অভিযোগ তোলে যে, মুহাম্মদ ﷺ এসব কথা তাদের গ্রন্থাবলি হতে গ্রহণ করেছেন। এসব কারণে আমাদের মতে, আলোচ্য আয়াতটির সঠিক তাৎপর্য এই হবে যে, মুহাম্মদ ﷺ ভালোভাবেই জানতেন যে, তাঁর মুখে দোজখের উনিশজন ফেরেশতার কথা শুনা মাত্রই তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ ওহীতে যে কথাই বলা হয়েছে, তা তিনি কোনোরূপ ভয়ভীতি ও দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই প্রকাশ্যভাবে লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন এবং কোনোরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপের একবিন্দু পরোয়া করলেন না। আরবের মূর্খ লোকেরা নবীগণের মান-মর্যাদা সম্পর্কে কিছুই জানত না; কিন্তু নবী-রাসূলগণ যে আল্লাহর নিকট হতে আসা প্রত্যেকটি কথাই যথাযথভাবে জনগণের নিকট উপস্থাপিত করে থাকেন- তা লোকদের পছন্দ হোক না-ই হোক -এ কথা আহলে কিতাবগণ ভালোভাবেই জানত। এ কারণে নবী করীম ﷺ-এর কর্মনীতি প্রত্যক্ষ করে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করবে যে, এত কঠিন বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও বাহ্যত এরূপ আশ্চর্যজনক কথাটিও কোনোরূপ দ্বিধা-ভয়-সংকোচ ব্যতীতই জনগণের নিকট পেশ করে দেওয়া কেবলমাত্র প্রকৃত নবী-রাসূলেরই কাজ হতে পারে- আহলে কিতাবদের প্রতি এটা ছিল একটা বড় আশা।

৩. আহলে কিতাব এবং ঈমানদার লোকদের অন্তর হতে সন্দেহ দূরীকরণ। এ কথাটি পূর্বের কথার সম্পূরক। কারণ এ সংখ্যার ব্যাপারে কারো অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিলে অবশ্যই সন্দেহ মন হতে দূরীভূত হয়ে যাবে।

আর মুনাফিক এবং কাফিরগণ বলবে- এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং তার দ্বারা জানতে চান কে এ সংখ্যা বিশ্বাস করে হেদায়েত গ্রহণ করে : আর কে অবিশ্বাস করে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। মূলতঃ জাহান্নামের এ বিবরণ মানুষের জন্য সাবধান বাণী হিসেবেই দেওয়া হয়েছে।

৩১. وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِيْمَانًا تَصْدِيْقًا لِمُوَافَقَةِ مَا اَتٰى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لِمَا فِيْ كِتَابِهِمْ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لا مِنْ غَيْرِهِمْ فِيْ عَدَدِ الْمَلَائِكَةِ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ شَكٌّ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْكَافِرُوْنَ بِمَكَّةَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا الْعَدَدِ مَثَلًا ط سَمُّوْهُ لِغَرَابَتِهِ بِذٰلِكَ وَاُعْرِبَ حَالًا كَذٰلِكَ اَيْ مِثْلَ اِضْلَالِ مُنْكِرِ هٰذَا الْعَدَدِ وَهُدٰى مُصَدِّقِهِ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ لا وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ط وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ الْمَلَائِكَةَ فِيْ قُوَّتِهِمْ وَاَعْوَانِهِمْ اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِيَ اَيْ سَقَرُ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ـ

অনুবাদ :

৩১. আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে তাদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আনয়ন করেছেন, তা তাদের কিতাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর আহলে কিতাব ও মু'মিনগণ সন্দেহে পতিত না হয় অন্যের দ্বারা ফেরেশতাগণের সংখ্যা সম্পর্কে। আর যেন বলে, তারা যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে মদীনায় অবস্থানকারী সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এবং কাফেরগণ মক্কায় অবস্থানকারী আল্লাহ কি ইচ্ছা করেছেন এটা দ্বারা এ সংখ্যা দ্বারা উদাহরণ হিসেবে এর অভিনবত্বের কারণে কাফেরগণ একে উদাহরণ রূপে আখ্যায়িত করেছে এবং حَال রূপে তাতে ই'রাব দেওয়া হয়েছে। এভাবে অর্থাৎ অস্বীকারকারীগণের পথভ্রষ্টতা ও বিশ্বাসীদের হেদায়েতের ন্যায় যাকে ইচ্ছা আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। আর তোমার প্রতিপালকের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে তিনি ব্যতীত অপর কেউ জানে না ফেরেশতাগণের শক্তি ও তাদের সহযোগিতা সম্পর্কে। আর এটা তো জাহান্নামের এ বর্ণনা মানুষের জন্য সাবধান-বাণী মাত্র।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَزْدَادَ : এটা তৎপূর্ববর্তী لِيَسْتَيْقِنَ-এর উপর হয়েছে অর্থাৎ لَامْ كَيْ-এর পর اَنْ مُقَدَّرْ থেকে তাদেরকে نَصَبْ প্রদান করেছে।

قَوْلُهُ اِيْمَانًا : এটা يَزْدَادُ-এর মাফঊল হিসেবে মানসূব হয়েছে। الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ এবং وَالْمُؤْمِنُوْنَ অংশ لَايَرْتَابَ হতে مَحَلْ فَاعِلْ হিসেবে মারফূ' হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِيَقُوْلَ وَالْكَافِرُوْنَ : এরাও يَزْدَادُ-এর উপর আতফ হয়েছে।

كَذٰلِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ উহ্য থাকবে অর্থাৎ مَعْنَى الْجُمْلَةِ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا : এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দোজখের রক্ষক নিযুক্ত করার আর একটি রহস্য বর্ণনা করেছেন– আল্লাহ বলেন, দোজখের রক্ষিবাহিনীর সংখ্যা মাত্র উনিশ, এ কথা শুনামাত্রই ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

اَلْاِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ ـ فَكَيْفَ قَالَ تَعَالٰى وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا ـ

ঈমান বৃদ্ধিও হয় না এবং তাতে কোনো কমতিও হয় না তথাপি আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বলেছেন- وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا জালালাইন গ্রন্থকার তার তাফসীরে এর একটি উত্তর দিয়েছেন, তাহলো- تَصْدِيْقًا لِمُوَافَقَةِ مَا اَتٰى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ كِتَابِهِمْ

১. অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থেও এ উনিশ সংখ্যার কথা বর্ণনা রয়েছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সেই অনুরূপ কথাই পুনরায় ব্যক্ত করেছেন।

অতএব এ বিষয়টিকে তারা মনে-প্রাণে সত্য বলে মেনে নিতে তাদের আর কোনো সন্দেহ রইল না। এতে তাদের একিন ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল যা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা সত্য সত্যই পাওয়া গেছে। যার ফলে মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য বলে মেনে নেওয়ার বিষয়ে সংকোচ বোধ করতে হবে না।

২. অথবা, ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ হলো- ثَمَرَةُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমানের নূর বা ফোকাস বৃদ্ধি হবে, ঈমানের শক্তি ও مَضْبُوْطِيْ বৃদ্ধি হবে, ঈমান ও একিন প্রগাঢ় হবে। এমন বিশ্বাস অন্তরে জন্মিলে, অগাধ সম্পদের বিনিময়েও যাকে প্রাণকেন্দ্র হতে বিলীন হতে দিবে না। নতুবা হাকিকতে ঈমান বৃদ্ধি ও কমতি হয় না। -[মা'আরিফ, মাদারিক]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ ... بِهٰذَا مَثَلًا : وَالْمُؤْمِنُوْنَ .... وَلَا يَرْتَابَ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সংখ্যা বর্ণনার আরো একটি কারণ বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি উক্ত উনিশ সংখ্যার কথা বর্ণনা করেছি এ জন্য যাতে সাধারণ মু'মিন ও মুসলমান এবং ইহুদি ও নাসারাগণ নিঃসন্দেহ হয়ে যায় যে, আমি আল্লাহ যা বলেছি তা-ই সত্য দোজখীদেরকে উনিশজন ফেরেশতার মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া আমার পক্ষে সত্যই সম্ভব, আর এ কথাও যেন তারা জেনে রাখে যে, এ নগণ্য ক্ষমতা দ্বারা আমি অতি বৃহৎ কার্য সমাধান করতে ভালোরূপেই ক্ষমতা রাখি।

আর وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ الخ আয়াত দ্বারা বলা হয়েছে, বক্র অন্তরের অধিকারীগণও আল্লাহর নাফরমানগণ। আল্লাহর কোনো কুদরত বা ক্ষমতাকে বিশ্বাস করতে চায় না, এ বিষয়টি শুনে তারা যেন আরো বেশি বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় এবং নাফরমানির সাগরে আরও বেশি করে হাবুডুবু খেতে থাকে। আল্লাহর কুদরতের সাথে তামাশা করে যেন নিজেদের পাপের বোঝা আরো বাড়িয়ে তোলে, কারণ মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীদেরকে পাপ কাজের সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হলো তাদেরকে ধ্বংসের গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। সুতরাং তারা ধ্বংসের সাগরে লিপ্ত হওয়ার জন্য যেন আরো অধিক সুযোগ গ্রহণ করে, ফলে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার সুব্যবস্থা লাভ করে। আর বলতে থাকে যে, আল্লাহ এত মহান সত্তা অথচ তিনি কত হীন কল্পনায় লিপ্ত হয়েছেন। আর বক্র অন্তরে আল্লাহর হেকমত সম্পর্কে আলোচনা করে কেবল পথভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে ও আদেশাবলিতে মাঝে-মধ্যে এমন কিছু কথা বলে দেন- যা এক শ্রেণির লোকদের জন্য ঈমান পরীক্ষার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। মূলত তাকে একজন সত্যপন্থি, সুস্থ মন-মেজাজ ও সঠিক চিন্তা-ভাবনার লোক শুনতে পেয়ে তার সহজ-সরল অর্থ বুঝতে পেরে সঠিক পথ অবলম্বন করে। সে কথাটিই বক্রবুদ্ধি ও সত্য-সততা এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ শুনতে পেলে তার বাঁকা অর্থই গ্রহণ করে থাকে। আর প্রকৃত সত্য হতে দূরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য একেকটি বাহানা বানিয়ে নেয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজেই যেহেতু সত্যবাদী ও সত্যপন্থি, তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে হেদায়েত দান করেন। কেননা, যে লোক বাস্তবিকই হিদায়েত পেতে চায় তাকে জোরপূর্বক গুমরাহ করে দিবেন, এটা কখনো আল্লাহর নিয়ম নয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যেহেতু নিজেই হেদায়েত পেতে ইচ্ছুক নয়, সে নিজের জন্য পথভ্রষ্টতাকেই পছন্দ করে নিচ্ছে, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে গুমরাহীর পথেই চলার সুযোগ দেন। কেননা যে লোক নিজেই সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় এবং তাকে ঘৃণা করে, আল্লাহ তাকে জোরপূর্বক সত্যের পথে নিয়ে আসবেন তাও তাঁর নিয়ম নয়। উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ : পূর্বে যে উনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তারা দোজখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের অধিনায়ক স্বরূপ। তাদের অধীনে কত ফেরেশতা আছে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন সপ্তম আসমানে রয়েছে বাইতুল মা'মূর, তাতে প্রতি দিন সত্তর হাজার নতুন ফেরেশতা তওয়াফ করে, এরা জীবনে আর কখনো তওয়াফ করার সুযোগ পায় না। অতএব, ফেরেশতার সংখ্যা কত হবে তা কল্পনা করাও কঠিন। -[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

٣٢. كَلَّا اِسْتِفْتَاحٌ بِمَعْنَى اَلَا وَالْقَمَرِ -

৩২. যথার্থই كَلَّا শব্দটি ألا অর্থে اِسْتِفْتَاحٌ -এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে চন্দ্রের শপথ।

٣٣. وَالَّيْلِ اِذَا بِفَتْحِ الذَّالِ دَبَرَ جَاءَ بَعْدَ النَّهَارِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ اِذْ اَدْبَرَ بِسُكُوْنِ الذَّالِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ اَىْ مَضٰى -

৩৩. শপথ রাতের, যখন তা إذَا শব্দের ذَالْ -এ যবর যোগে পঠিত আগত হয় দিনান্তে আগমন করে। অপর এক কেরাতে শব্দটি إِذْ أَدْبَرَ তথা ذَالْ -এ সাকিন যোগে তৎপরে একটি হামযাসহ পঠিত হয়েছে অর্থাৎ অবসান ঘটেছে।

٣٤. وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ ظَهَرَ -

৩৪. আর শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়েছে প্রকাশ লাভ করেছে।

٣٥. اِنَّهَا اَىْ سَقَرَ لَاِحْدَى الْكُبَرِ الْبَلَايَا الْعِظَامِ -

৩৫. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ সাকার নামক জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের একটি বৃহত্তম মসিবতের মধ্যে অন্যতম।

٣٦. نَذِيْرًا حَالٌ مِنْ اِحْدَى وَ ذُكِّرَ لِاَنَّهَا بِمَعْنَى الْعَذَابِ لِلْبَشَرِ -

৩৬. সতর্ককারী এটা إِحْدَى হতে حَالٌ আর তাকে مُذَكَّرٌ অর্থে এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু এটা عَذَابٌ অর্থে ব্যবহৃত মানুষের জন্য ।

٣٧. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ بَدَلٌ مِنَ الْبَشَرِ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اِلَى الْخَيْرِ اَوِ الْجَنَّةِ بِالْاِيْمَانِ اَوْ يَتَاَخَّرَ اِلَى الشَّرِّ اَوِ النَّارِ بِالْكُفْرِ -

৩৭. তোমাদের মধ্য হতে যে চায় এটা পূর্বোক্ত بَشَرٌ হতে بَدَلٌ অগ্রগামী হতে কল্যাণ অথবা বেহেশতের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে কিংবা পশ্চাৎগামী হতে মন্দ বা জাহান্নামের দিকে কুফরির মাধ্যমে।

٣٨. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ مَرْهُوْنَةٌ مَاخُوْذَةٌ بِعَمَلِهَا فِى النَّارِ -

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ رَهِيْنَةٌ শব্দটি مَرْهُوْنَةٌ (দায়বদ্ধ) অর্থে ব্যবহৃত। দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে স্বীয় আমলের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হবে।

٣٩. اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَنَاجُوْنَ مِنْهَا كَائِنُوْنَ -

৩৯. দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত। তারা হলো মু'মিনগণ, তারা তা হতে পরিত্রাণ লাভ করবে।

٤٠. فِىْ جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ بَيْنَهُمْ -

৪০. তারা অবস্থান করবে স্বর্গীয় উদ্যানে এবং পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে তাদের মধ্যে একে অপরকে।

٤١. عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ وَحَالِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ لَهُمْ بَعْدَ اِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ -

৪১. অপরাধীগণ সম্পর্কে এবং তাদের অবস্থা সম্বন্ধে এবং একত্ববাদীদেরকে দোজখ হতে বের করে আনার পর তাদের উদ্দেশ্যে বেহেশতীগণ বলতে থাকবে।

٤٢. مَا سَلَكَكُمْ اَدْخَلَكُمْ فِىْ سَقَرَ -

৪২. কিসে তোমাদেরকে পরিচালিত করেছে প্রবিষ্ট করেছে জাহান্নামে।

٤٣. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ -

৪৩. তারা বলবে, আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

٤٤. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ -

৪৪. আর আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না।

٤٥. وَكُنَّا نَخُوضُ فِى الْبَاطِلِ مَعَ الْخَائِضِيْنَ .

৪৫. আর আমরা ছিদ্রান্বেষণ করতাম বাতিল পন্থায় ছিদ্রান্বেষণকারীদের সাথে।

٤٦. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ .

৪৬. আর আমরা কর্মফল দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করতাম পুনরুত্থান ও প্রতিফলের দিনের।

٤٧. حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ الْمَوْتُ .

৪৭. এমনকি আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল মৃত্যু।

٤٨. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْمَعْنٰى لَا شَفَاعَةَ لَهُمْ .

৪৮. ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না ফেরেশতা, নবী (আ.) ও নেককারগণের সুপারিশ। এর অর্থ হলো, তাদের জন্য কোনোই সুপারিশ নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَلَّا : এটা حَرْفُ رَدْعٍ অথবা حَرْفُ اِسْتِفْتَاحٍ

قَوْلُهُ وَالْقَمَرِ الخ : وَاللَّيْلِ الخ . وَالصُّبْحِ الخ এগুলো مُسْتَقِلْ جُمْلَةٌ অর্থাৎ عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ হয়েছে এবং جُمْلَةٌ قَسَمِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ نَذِيْرًا : এটা اِحْدٰى হতে تَمْيِيْز বা حَالٌ হিসেবে মানসূব مَعْنَى التَّعْظِيْمِ -এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার দরুন। যেমন বলা হয়েছে انذر اَعْظَمُ الْكُبَرِ তখন نَذِيْرٌ অর্থ হবে اِنْذَارٌ যেমন, نَكِيْرٌ بِمَعْنَى اِنْكَارٌ অথবা نَذِيْرًا টি فِعْلٌ مُقَدَّرٌ হবে مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ - অনুরূপ ইমাম ফাররার বক্তব্য। অথবা তা اِنَّهَا -এর ضَمِيْرٌ হতে حَالٌ হিসেবে اِحْدٰى অথবা مَنْصُوْبٌ হতে كُبَرٌ অথবা حَالٌ হতে فَاعِلٌ এর- قَسَمٌ অথবা اَعْظَمُ الْكُبَرِ مُنْذِرَةً তখন অর্থ হবে حَالٌ থেকে ضَمِيْرٌ-এর كُبَرٌ বা حَالٌ এর- ضَمِيْرٌ হতে حَالٌ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ : এটা كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ হতে مُسْتَثْنٰى হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ جَنّٰتٍ : এটা مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ -এর খবর, অথবা اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ হতে হাল, বা يَتَسَاءَلُوْنَ হতে حَالٌ হিসেবে মানসূব।

قَوْلُهُ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ : এটা جُمْلَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ আর الَّذِيْنَ ...... قَالُوْا لَمْ نَكُ বাক্যগুলো جَوَابُ اِسْتِفْهَامٍ স্বরূপ।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَلَّا : আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, "كَلَّا" 'কখনো নয়', একথা বলে আবূ জাহল ও তার সাথীদের ভিত্তিহীন কথার উপর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, এ মর্মে যে, তারা কখনো দোজখের প্রহরীদের মোকাবিলা করতে পারবে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

অথবা, ফেরেশতাগণ যাদের কথা ইতঃপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে।

অথবা, এ সূরাতে বর্ণিত সব বিষয়গুলো হলো মানুষের জন্য উপদেশ কিন্তু কাফেররা এর দ্বারা কখনো উপদেশ গ্রহণ করবে না।

অথবা, এর অর্থ হলো, যারা পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের কথাকে বিদ্রূপ করত তাদের জন্য রয়েছে এতে বিশেষ সতর্কবাণী।

–[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى كَلَّا وَالْقَمَرِ ... إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কখনো নয়, চন্দ্রের শপথ, শপথ রাত্রের– যখন তা প্রত্যাবর্তন করে। আর প্রভাতকালের যখন তা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এ দোজখ বড় বড় জিনিসগুলোর মধ্যের একটি।"

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র, রাত্রি ও প্রভাতের শপথ করেছেন। এ শপথের তাৎপর্য হলো, চন্দ্র, সূর্য এবং রাত্রির প্রত্যাগমন আল্লাহ তা'আলার মহাক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন, যা মানুষের সম্মুখে দেদীপ্যমান, মানুষ এগুলোকে অহরহ অবলোকন করছে; কিন্তু এর কোনো একটিকে যেমন সূর্যকে লুকিয়ে রেখে যদি বলা হতো যে, সূর্য বিরাট একটি অনলকুণ্ড যা জীবকুল ও জড় জগতের জন্য তাপ বিতরণ করে; তবে অনেকের মনে হয়তো বিশ্বাস হতো না। কারণ তারা তো এটাকে দেখছে না, চোখে না দেখলে অবিশ্বাস করা অথবা তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতার কাজ। তাই আল্লাহ চন্দ্র, রাত্রি ও প্রভাতের শপথ দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, এগুলো যেমন আমার কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর, তেমনি জাহান্নামও আমার কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর, তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য, তোমরা বিশ্বাস না করলে তার অবাস্তবতা প্রমাণ হয় না। তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, চন্দ্র ও দিবা-রাত্রির আবর্তন যখন সত্য তখন জাহান্নামও নিঃসন্দেহে সত্য ব্যাপার। চন্দ্র, রজনী ও প্রভাতের শপথ দ্বারা মূলত আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছেন।

সকালবেলা রাত্রি ও চন্দ্রের শপথ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলার দস্তুর রয়েছে, তিনি তাঁর যে কোনো সৃষ্টি অথবা স্বীয় সত্তার শপথ করে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছুর সততা প্রকাশ করে থাকেন। তাই এখানেও উপরোল্লিখিত বিষয়ের শপথ করে سَقَرَ -এর সত্যতা বর্ণনা করেছেন।

অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, চন্দ্র আল্লাহর মহাকুদরতের একটি সৃষ্টি, তা তাঁর কুদরতেই প্রতিদিন নিয়মিতভাবে উদিত ও অস্তমিত হয়। অনুরূপভাবে রাত্রিও তাঁর বিশেষ কুদরতের এক লীলা, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় যা মানুষকে একবার আচ্ছাদিত করে এবং প্রত্যেক রাত্রির শেষে উজ্জ্বল হয়ে দিনের চিহ্ন প্রকাশিত হয়। এগুলো যেমনিভাবে তাঁর মহান কুদরতের মহান লীলা হিসেবে আগমন প্রস্থান করছে, অনুরূপভাবে বুঝে নিতে হবে যে দোজখও সময় সাপেক্ষে আল্লাহর মহান কুদরতে একদিন সংঘটিত হবেই হবে। তা ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি হবে। তাকে অস্বীকার করা চলবে না। যে আল্লাহ কুদরতের এত বড় বড় নিদর্শন দ্বারা দুনিয়া ভরপুর করেছেন, তিনি দোজখ সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে কেউ ধারণা করতে পারে? কেউ যদি তা অস্বীকার করে তবুও তার বাস্তবতা প্রকাশ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ : গ্রন্থকার আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন [إِنَّهَا -এর ضَمِيْر -এর سَقَرُ মَرْجِعْ হিসেবে, আর كُبَرْ -এর অর্থ বিপদ হিসেবে] "এ জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদের অন্যতম।" আর কেউ কেউ ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করাকে মনে করে অর্থ করেছেন, "তাদের হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত অস্বীকারকরণ এক ভয়াবহ অন্যায় বা বিপদ।" আর কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হওয়া হলো ভয়াবহ বিপদের অন্যতম বিপদ।" আবার কেউ বলেছেন, এর অর্থ "এ 'সাকার' জাহান্নামসমূহের মধ্যে অন্যতম।"

قَوْلُهُ تَعَالَى نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ : نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ আয়াতের অর্থ "এটা (জাহান্নাম) মানুষকে সতর্ক করার জন্য"। অর্থাৎ জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'আলা এ আলোচনার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষকে সতর্ক করেছেন। তারা যেন এমন কোনো কাজ না করে যার ফলে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে হয়। এটা ইমাম হাসান বসরী (র.)-এর অভিমত।

আর কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নাযীর' বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন সতর্ককারী এবং আল্লাহর আজাব হতে বাঁচানোর জন্য সাবধানবাণী উচ্চারণকারী।

আর কেউ বলেছেন, نَذِيْرٌ -এর অর্থ হলো পবিত্র কুরআন 'সতর্কবাণী'। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে মানুষকে উদ্দেশ্য করে অসংখ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এখানে মানুষকে হেদায়েতের পথ দেখানো যেমন হয়েছে তেমনি আল্লাহর আজাব হতে বাঁচার জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ : এখানে অগ্রসর হতে চাওয়ার অর্থ হলো ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য হতে পশ্চাতে থাকা। তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– জাহান্নামের শাস্তি হতে কাফের মু'মিন সকলকেই সতর্ক করা হয়েছে, অতঃপর এ সতর্কবাণী শুনে যার ইচ্ছা সে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে; আর যার ইচ্ছা হয় না, সে ঈমান ও আনুগত্যের পথ হতে পশ্চাতে থেকে যেতে পারে।

সুদ্দী (র.) বলেছেন, এটার অর্থ যার ইচ্ছা হয় সে উপরে উল্লিখিত জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে পারে, অথবা ইচ্ছা করলে পশ্চাতে থেকে জান্নাতের দিকে যেতে পারে। –[ফাতহুল কাদীর, মা'আরিফ]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা যার সম্পর্কে চান যে, সে ঈমান এবং আনুগত্যের পথ গ্রহণ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে অথবা কুফরির পথ অবলম্বন করে পশ্চাতে পড়ে থাকতে পারে। আল্লামা শওকানী (র.) বলেন প্রথমোক্ত অর্থই উত্তম। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, প্রত্যেক লোকই স্বীয় কাজের জন্য দায়বদ্ধ। رَهِيْنَةٌ শব্দের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে ঋণের অনুকূলে জামানত রাখা। নির্দিষ্ট সময় ঋণের অর্থ প্রত্যর্পণ করে জামানত ছাড়িয়ে আনতে হয়। নতুবা তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এ জগতে মানুষকে যাবতীয় উপায়-উপকরণ দ্রব-সামগ্রী, শক্তি-যোগ্যতা-ক্ষমতা মানুষকে নেককাজ করার জন্য ঋণ দিয়েছেন। আর বিনিময়ে মানুষের সত্তাটিকে তাঁর নিকট জামানত বা রেহেন রাখা হয়েছে। সুতরাং পরকালে মানব সত্তাকে নেককাজ দ্বারাই ছড়িয়ে আনতে হবে। নতুবা আল্লাহ তাকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করবেন। এ কথাই উপরিউক্ত كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, মানব সত্তাটি তার কৃতকর্মের অনুকূলে আবদ্ধতার সত্তাকে বন্দীদশা হতে ছাড়াতে হলে নেককাজের বিনিময়ে ছাড়াতে হবে। নতুবা চিরদিনের জন্য তা জাহান্নামেরই খোরাকে পরিণত হবে। ইসলাম অতি গুরুত্বপূর্ণ যেসব কথা এবং যে বাস্তব সত্য জিনিস প্রচার করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে– প্রত্যেক লোক স্বীয় আমল দ্বারা দায়বদ্ধ, অন্যের বদ আমল বা গুনাহ তাকে বহন করতে হবে না। তার নিজের আমলই তাকে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি দিবে আর আপন কর্ম ফলেই সে জাহান্নামে যাবে। এখানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) বা মাতা-পিতার অথবা পূর্ব-পুরুষদের দোষে কাউকেও দোষী করা হবে না, কাউকেও পাকড়াও করা হবে না। যেমনটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় মনে করে থাকে। তেমনি কোনো ব্যক্তি দোষী হলে অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজনের সৎকর্ম দ্বারা তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। –[রূহুল কোরআন]

পূর্বে "যার ইচ্ছা সে জান্নাতের পথে অগ্রসর হতে পারে অথবা পশ্চাতেও থেকে যেতে পারে" বলার পর এখানে "প্রত্যেক লোক স্বীয় আমল দ্বারা দায়বদ্ধ" কথাটি বলার তাৎপর্য হচ্ছে– প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আপন আমল দ্বারা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়া। আপন কর্মের ফলে আত্মঘাতি পথ বেছে নেওয়া কারো জন্য কখনো উচিত নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى "إِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ" : অর্থ "দক্ষিণপন্থি লোকদের ব্যতীত।" অন্য কথায় বামপন্থি লোকেরা তো তাদের অর্জন করা গুনাহ-খাতার কারণে গ্রেফতার হয়ে যাবে, কিন্তু দক্ষিণপন্থি লোকেরা নিজেদের এহেন বন্দীদশা থেকে নিজেদেরকে নিজেরাই নিষ্কৃত করে নিবে।

اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ এবং اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ এ কথা দু'টি পবিত্র কুরআনে আখেরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সৌভাগ্যবান লোকদের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। তদ্রূপ যেসব লোক পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জাহান্নামী হবে তাদেরকে বুঝানোর জন্য اَصْحَابُ الشِّمَالِ এবং اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ ব্যবহার করে থাকেন। –[রূহুল কোরআন]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ তারাই হবে যারা পবিত্র সত্তা, যারা মোবারক।

ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন, اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ দ্বারা একনিষ্ঠ ঈমানদারগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত কাসেম (র.) বলেন, যে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে সেই اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ তথা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী।

হযরত আলী (রা.)-এর মতে, اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ দ্বারা মুসলমানদের শিশুদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা শৈশবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তারা কোনো আমলও করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর বর্ণায় এসেছে যে, এর দ্বারা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ : অর্থাৎ বেহেশতবাসীগণ (ডানপন্থিগণ) জাহান্নামীদেরকে তাদের জাহান্নামী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে প্রশ্ন করবে, হে জাহান্নামী দল! তোমাদেরকে কি কারণে দোজখে প্রবেশ করানো হয়েছে?

আর জান্নাতীগণ জান্নাতে স্থায়িত্ব লাভ করার পর এ প্রশ্ন করবেন।

কাবীর গ্রন্থকার يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ -এর তাফসীর করেছেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে স্থান লাভ করবে, তখন গায়েব হতে আওয়াজ আসবে।

يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ بِلَا مَوْتٍ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ بِلَا مَوْتٍ উক্ত আওয়াজ শুনে জান্নাতীগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করবে। দোজখবাসী (اَهْلَ النَّارِ) বলে যাদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তারা কারা? তারা কোথায়? ইত্যবসরেই জান্নাতবাসীদের ও জাহান্নামীদের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর জান্নাতীগণ জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করে স্বয়ং প্রশ্ন করবে যে, مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ তোমাদেরকে কি কারণে দোজখে আসতে হয়েছে?

অথবা, يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ -এর মর্মার্থ এই হবে যে, يَتَسَاءَلُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنْ حَالِ الْمُجْرِمِيْنَ, বেহেশতবাসীগণ নিজেরাও নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ .... بِيَوْمِ الدِّيْنِ" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, জাহান্নামবাসীরা বলবে- "আমরা নামাজি ছিলাম না, আমরা অভাবীগণকে পানাহার করাতাম না। আর আমরা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে কথা রচনাকারীদের সাথে মিলিত হয়ে আমরাও অনুরূপ কথা রচনা করতাম। আর আমরা কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম।" অর্থাৎ এ চারটি কারণেই তাদেরকে জাহান্নামী হতে হয়েছে। এ আলোচনা হতে এ চার কাজের গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝা যাচ্ছে। নিম্নে এ চারটি কাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো-

১. উপরিউক্ত لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ আয়াতের বক্তব্যে প্রকাশ পায় যে বে-নামাজি হওয়ার কারণেই জাহান্নামী হতে হয়েছে। ঈমানদার হয়েও যদি নামাজ আদায় করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামী হবে, কেননা নামাজ হলো ঈমানের ফলিতরূপ। ঈমান গ্রহণের সাথে সাথেই নামাজকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নামাজ আদায় না করলে সে আল্লাহর নিকট ঈমানদার থাকলেও সামাজিক জীবনে তাকে ঈমানদার ভাবা যায় না। নবী করীম ﷺ বলেছেন, নামাজ মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে প্রভেদকারী। তিনি আরো বলেছেন, যে লোক ইচ্ছাপূর্বক নামাজ পরিত্যাগ করল সে যেন কুফরি করল। আল-কুরআনের উপরিউক্ত বক্তব্য এবং হাদীসের বিবৃতি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বে-নামাজির স্থান কোথায় তা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয়।

২. আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ প্রসঙ্গে বলেছে, "আমরা মিসকিনদের খাদ্য খাওয়াতাম না" এটা হতে জানা গেল যে কোনো লোককে ক্ষুধায় কাতর দেখে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে খাবার না খাওয়ানো ইসলামের দৃষ্টিতে অতি বড় গুনাহের কাজ। মানুষ যেসব কারণে দোজখী হবে সে কারণসমূহের মধ্যে এ ব্যাপারটিকেও গণনা করা হয়েছে। এটা হতে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। মিসকিনদেরকে কাপড়-চোপড় দান, বাসস্থান দানও খাদ্য দানের অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ না করার ফলেই তারা অপরাধী এবং তারা অন্যান্য সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। যেমনি তারা সংঘবদ্ধ হয়ে হত্যা, রাহাজানি চালাচ্ছে। এসব কারণেই যারা মিসকিনদেরকে তাদের ন্যূনতম জীবন-যাপনের অধিকার হতে বঞ্চিত করছে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী। -[রূহুল কোরআন]

৩. وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ এর তাৎপর্য হচ্ছে- এ জাহান্নামীরা ইসলাম, কুরআন এবং নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা কথা প্রচার করত। এর ফলেই তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হয়েছে। আজকে যেসব লোক ইসলামি আকীদা, ইসলামের ইবাদত, ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে তাদের ক্ষেত্রেও আলোচ্য আয়াত পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য হবে। -[রূহুল কোরআন, যিলাল]

৪. জাহান্নামী হওয়ার চতুর্থ কারণ হলো পরকাল অবিশ্বাস করা, পরকালকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। তার কারণ হচ্ছে- পরকাল অবিশ্বাস মানুষকে প্রবৃত্তি-পূজারী এবং লাগামহীন করে ছাড়ে। আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে জাগ্রত মন এবং সচেতন করে তোলে, সে প্রতি মুহূর্তে আপন কাজের হিসেব নেয় এবং পরকালে আল্লাহর আজাব হতে বাঁচার উপায় খুঁজতে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ : يَقِيْن অর্থ প্রত্যয়। এখানে প্রত্যয় বলে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, মৃত্যু আসার পর যেসব বিষয় তারা অস্বীকার করত, সেসব বিষয় তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর যেসব জিনিসের অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করত সেসব জিনিস সম্বন্ধে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। তাদের কথার মর্ম হচ্ছে, মৃত্যুর মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ আচরণের উপর অবিচল হয়েছিলাম। মৃত্যুই তাদের বোধোদয় ঘটিয়েছে কিন্তু তাদের এ বোধোদয় তাদের আর কোনো কল্যাণে আসবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ : "এ সময় সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজেই আসবে না।" অর্থাৎ যেসব লোক মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছিল, কোনো শাফায়াতকারী যদি তাদের সম্পর্কে শাফায়াত করেও তবু তারা ক্ষমা পেতে পারে না। শাফায়াত সম্পর্কে কুরআন মজীদের বহু কয়টি আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিত করে বলা হয়েছে। যার ফলে শাফায়াত কে করতে পারে, আর কে করতে পারে না, কোন অবস্থায় করা যাবে, কোন অবস্থায় করা যাবে না, কার জন্য করা যাবে, কার জন্য করা যাবে না, কার জন্য তা কল্যাণকর, আর কার জন্য তা কল্যাণকর নয়- এ সব বিষয়ে বিস্তারিতরূপে জানতে পারা কারো জন্য কঠিন থাকেনি। দুনিয়ার লোকদের গুমরাহীর যতগুলো কারণ রয়েছে শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা এটার মধ্যে একটি। এ কারণে কুরআন মাজীদে এ বিষয়টি এত বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে কার্যত এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় বা কিছুমাত্র অস্পষ্ট অবশিষ্ট থাকেনি।

شَفَاعَةٌ অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ : এর কারণ আয়াত হতেই বুঝে নেওয়া যায়। অর্থাৎ আয়াতের শেষ পর্বে বলা হয়েছে وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ আমরা কিয়ামতকে মানতাম না। কিয়ামতকে না মানার অর্থই হলো তারা كَافِر ছিল। কোনো ঈমানদার মুসলমান কিয়ামতকে অবিশ্বাস করলে তার ঈমান থাকবে না, যদিও সে ঈমান গ্রহণ করে থাকে। কাফেরদের জন্য شَفَاعَتْ করার কোনো হুকুম বর্ণিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلِلْكُفَّارِ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ অথবা فَمَا تَنْفَعُهُمْ অর্থ হবে شَفَاعَتْ করতে পারবে তবে এটা কোনো কাজে আসবে না। যা করার কোনো বৈধতা নেই, তা করা না করা একই সমান।

অনুবাদ :

٤٩. فَمَا مُبْتَدَأٌ لَهُمْ خَبَرُهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اِنْتَقَلَ ضَمِيْرُهُ اِلَيْهِ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ وَالْمَعْنٰى اَىُّ شَيْءٍ حَصَلَ لَهُمْ فِيْ اِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْاِتِّعَاظِ.

৪৯. তবে কি এটা مُبْتَدَأٌ হয়েছে তাদের এটা خَبَرْ এবং উহ্য বক্তব্যের সাথে মুতা'আল্লিক, আর خَبَرْ -এর ضَمِيْر তৎপ্রতি رَاجِعْ হয়েছে। যে, তারা উপদেশ হতে বিমুখ রয়েছে مُعْرِضِيْنَ শব্দটি ضَمِيْر হতে حَالْ অর্থাৎ উপদেশ হতে বিমুখ হওয়ার মাধ্যমে তাদের কি লাভ হয়েছে?

٥٠. كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ وَحْشِيَّةٌ.

৫০. তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ বন্য।

٥١. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ اَسَدٍ اَىْ هَرَبَتْ مِنْهُ اَشَدَّ الْهَرَبِ.

৫১. যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়ন করেছে সিংহ অর্থাৎ তার সম্মুখ হতে প্রাণপণ দৌড়িয়ে পলায়ন করেছে।

٥٢. بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً اَىْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَءُهٗ.

৫২. বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে, যেমন তারা বলেছে, আমরা সে পর্যন্ত আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো না, যে পর্যন্ত আমাদের প্রতি এমন একটি গ্রন্থ অবতারিত হয়, যা আমরা পাঠ করবো।

٥٣. كَلَّا ط رَدْعٌ عَمَّا اَرَادُوْهُ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ اَىْ عَذَابَهَا.

৫৩. না, কখনোও এরূপ হবে না তাদের ইচ্ছার প্রতি অস্বীকৃতি বরং তারা তো আখেরাতের প্রতি ভয় পোষণ করে না অর্থাৎ তার শাস্তির।

٥٤. كَلَّا اِسْتِفْتَاحٌ اِنَّهٗ اَىِ الْقُرْاٰنُ تَذْكِرَةٌ عِظَةٌ.

৫৪. না, কখনো এরূপ হবে না এখানে كَلَّا শব্দটি اِسْتِفْتَاحْ -এর জন্য নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআন উপদেশবাণী নসিহত।

٥٥. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ قَرَأَهٗ فَاتَّعَظَ بِهٖ.

৫৫. সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে তা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক এটা পাঠ করত তা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক।

٥٦. وَمَا يَذْكُرُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى بِاَنْ يُّتَّقٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ بِاَنْ يَّغْفِرَ لِمَنِ اتَّقَاهُ.

৫৬. আর উপদেশ গ্রহণ করবে না শব্দটি يَاءْ ও تَاءْ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে। তিনিই ভয় করার যোগ্য পাত্র যে, তাঁকে ভয় করা হবে এবং ক্ষমা করার অধিকারী যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন, যে তাঁর প্রতি ভয় পোষণ করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ : বাক্যটি তারকীবে مُعْرِضِيْنَ -এর ضَمِيْر হতে حَالْ مُتَدَاخِلَةْ হয়েছে। জমহুর مُسْتَنْفِرَةٌ -এর فَاءْ বর্ণে كَسْرَةْ দিয়ে مُسْتَنْفِرَةْ পড়েছেন, আর নাফে' ইবনে আমের فَاءْ তে فَتْحْ দিয়ে مُسْتَنْفَرَةْ পড়েছেন। আর আবূ হাতিম এবং আবূ ওবাইদ এ দ্বিতীয় কেরাতটি পছন্দ করেছেন।

قَوْلُهٗ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً : জমহুর ش বর্ণকে تَشْدِيْد যুক্ত করে مُنَشَّرَةً পড়েছেন। আর সাঈদ ইবনে জোবাইর تَخْفِيْف করে مُنْشَرَةً পড়েছেন। জমহুর صُحُفًا শব্দটির حَاءْ বর্ণে ضَمَّةْ দিয়ে صُحُفْ পড়েছেন। আর সাঈদ ইবনে জোবাইর তাতে سَاكِنْ যুক্ত করে صُحْفٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ يَذْكُرُوْنَ : জমহুর এটাকে يَاءٌ সহকারে يَذْكُرُوْنَ পড়েছেন। আর নাফে' এবং ইয়াকূব تَاءٌ দিয়ে تَذْكُرُوْنَ পড়েছেন। সকলেই কিন্তু تخفيف করে পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ : এখানে تَذْكِرَةٌ দ্বারা পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা تذكرة -এর শাব্দিক অর্থ স্মরণ করিয়ে দেওয়া বস্তু বা বিষয়, আর কুরআনে হাকীম আল্লাহর صِفَاتُ كَمَالٌ এবং তাঁর রহমত ও গজব, বেহেশতিদের জন্য ছওয়াব ও দোজখীদের জন্য আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তুলনাহীন গ্রন্থ। অতএব, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এমন উত্তম উপদেশবাণী হতে উপদেশ গ্রহণ করবে না তবে আর কোথা হতে উপদেশ নিবে! যেহেতু এত উত্তম উপদেশ গ্রহণ করা যখন তাদের ভাগ্যে জোটেনি তখন তাদের কপালটাই মন্দ।

قَسْوَرَةٌ-এর অর্থ :

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের قَسْوَرَةٌ শব্দটির অর্থ- বাঘ। হযরত আতা ও কালবী (র.) এ মতই পোষণ করেছেন।

২. হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও যাহহাক (র.)-এর মতে قَسْوَرَةٌ শব্দটির অর্থ হলো তীর নিক্ষেপে দক্ষ শিকারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।

৩. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো শক্তি। আর সকল মোটাতাজা হৃষ্ট-পুষ্ট শক্তিশালী বস্তুকেই আরবরা قَسْوَرَةٌ বলে।

৪. হযরত ইকরামা (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আরেক বর্ণনা মতে قَسْوَرَةٌ শব্দের অর্থ শিকারির জাল।

৫. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) শব্দটির অর্থ বলেছেন শিকারি। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَمَا لَهُمْ .... قَسْوَرَةٌ" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অতএব তাদের কি হলো যে, তারা নসিহত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত বন্য গাধা, যা সিংহ হতে পলায়ন করছে।"

এখানে মূল শব্দ হলো اَلتَّذْكِرَةُ বাংলায় যার অর্থ করা হয়েছে নসিহত। কোনো কোনো তাফসীরকারক এর ব্যাখ্যা করেছেন কুরআনের আয়াত, কুরআনী নসিহত এবং কুরআনী বিধি-বিধান ইত্যাদি। আর কেউ কেউ এটার ব্যাখ্যায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ এ সব লোকদের কি হলো যে, তারা কুরআন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ বা কুরআনী নসিহত হতে সেই রকম পলায়ন করছে যে রকম বন্য-গাধারা সিংহ দেখে বা শিকারি দেখে পলায়ন করে। এটা একটি আরবি রূপকথা, আরবের লোকেরা অস্বাভাবিকভাবে দিশেহারা হয়ে পলায়নকারীকে সেই বন্য-গাধার সাথে তুলনা করে, যে গাধা ব্যাঘ্রের গন্ধ ব শিকারির পদধ্বনি শুনা মাত্র পালিয়ে যেতে থাকে।

কুরআন হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রকার : হযরত মুকাতিল বলেছেন, কুরআন হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দু'ভাবে হতে পারে। ১. কুরআনকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা। ২. পুরোপুরিভাবে অস্বীকার না করে কুরআনের মতে আমল না করা। অথবা কুরআনী বিধি-বিধান না-মানা। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের কুরআন বর্জন বর্তমান বিশ্বের সমস্ত উম্মতে মুসলিমার মধ্যে কমবেশি রয়েছে। কোথাও পুরোপুরিভাবে কুরআনের বিধি-বিধান, আইন-কানুন মেনে চলা হচ্ছে না। সুতরাং আয়াত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। -[কুরতুবী]

সত্যকে শ্রবণ করা হতে পলায়ন করার কারণ : কাফেরদের কুরআন বা সত্যের বাণী শ্রবণ করা হতে পলায়নের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। ১. যদি তারা সত্যের সম্মুখে মাথা নত করে তবে তাদের পৌত্তলিকতা এবং স্ব-গোত্রীয় প্রভাব বা ব্যক্তিত্ব টিকে থাকবে না। ২. কুফরি ও নাফরমানির কারণে তাদের অন্তরে সত্যের জ্যোতি স্থান লাভ করার মতো জায়গা ছিল না- অন্তর কুফরির কালিমা দ্বারা ভরে গেছে। ৩. মুহাম্মদ ﷺ ও ইসলাম তখন প্রথমত খুবই সংকীর্ণ অবস্থায় ছিল। তাই তাদের ধারণা ছিল ইসলাম গ্রহণ করলে তারা সংকীর্ণতায় পতিত হয়ে যাবে। ৪. পরকালকে তারা বিশ্বাস করত না ইহজীবনকেই প্রাধান্য দিত।

قَوْلُهُ تَعَالَى بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ ..... صُحُفًا مُّنَشَّرَةً : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "বরঞ্চ তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি প্রেরিত হোক।" অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি বাস্তবিকই মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী নিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে তিনি যেন মক্কার এক-একজন সর্দার ও এক-একজন শায়খের নামে একটি করে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, মুহাম্মদ ﷺ আমার নিয়োজিত নবী। তোমরা সকলে তাঁকে মেনে চলো, তাঁর অনুসরণ করো। আর এ চিঠি যেন এমন হয় যা দেখে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলা লিখে পাঠিয়েছেন। কুরআনের অপর একটি স্থানে মক্কার কাফিরদের এ কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে- "আমরা কিছুতেই মানবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদেরকে তা দেওয়া হবে, যা আল্লাহর রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছে।" [সূরা আল-আনআম : আয়াত ১২৪] অপর একটি আয়াতে তাদের এ দাবিটির উল্লেখ করা হয়েছে এই ভাষায়, "আপনি আমাদের সম্মুখে আকাশে আরোহণ করুন এবং সেখান হতে একটি সম্পূর্ণ লিখিত কিতাব এনে আমাদেরকে দিন, যা আমরা পাঠ করবো।" -[বনী ঈসরাইল : আয়াত ৯৩]

قَوْلُهُ تَعَالَى "كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তা কখনো দেওয়া হবে না, (এদের ঈমান না আনার আসল কারণ হলো) এরা পরকাল সম্পর্কে মনে ভয় পোষণ করে না।" অর্থাৎ তাদের নামে কখনো কোনো চিঠি প্রেরণ করা হবে না। নবুয়তের এত সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আরো প্রমাণ চাওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যেসব প্রমাণ তাদের সামনে রয়েছে তা যথার্থ নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো, আরো জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করা, গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকা। এদের ঈমান না আনার মূল কারণ হলো এরা আসলে পরকালে বিশ্বাসী নয়। পরকালে আল্লাহর সামনে এ জীবনের সব হিসাব দিতে হবে, এ কথা তারা আদৌ বিশ্বাস করে না। এ কারণেই তারা এ জীবনে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নিরুদ্বিগ্ন ও দায়িত্বহীন জীবন যাপন করছে। আর এ কারণেই ঈমান আনয়নের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করছে না। আর এ কারণেই তাদেরকে ঈমান আনয়নের কথা বলা হলে তারা ঈমান না আনার জন্য নিত্য নতুন দাবি-দাওয়া ও দলিল-প্রমাণ খুঁজতে থাকবেই। নতুন নতুন বাহানা খুঁজতে থাকবে। অতএব, তাদের এ কার্যকলাপ দেখে নবীর উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى "كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ" : এর তাৎপর্য হচ্ছে- তাদের এ ধরনের দাবি কখনো পূরণ করা হবে না। পবিত্র কুরআন একটি উপদেশ মাত্র। যার ইচ্ছা সে এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে আল্লাহ যদি তা চান। পবিত্র কুরআনে একজন মু'মিনকে কি বিশ্বাস করতে হবে, কি আমল করতে হবে তা সবই বিস্তারিত আছে। কোনো মানুষ ইচ্ছা করলে কুরআনের এসব বিধি-বিধান হতে শিক্ষা গ্রহণ করে চলতে পারে- কুরআনের আলোকে আলোকিত হতে পারে। তবে শর্ত হলো, তখনই সে শিক্ষা লাভ করতে পারবে যখন আল্লাহও চাইবেন যে, সে নসিহত লাভ করুক এবং নসিহত লাভের তৌফিকও তিনি তাকে দান করেন। -[কুরতুবী]

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর চাওয়া ও ইরাদা দুই প্রকারের-

১. اَلْاِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ - অর্থাৎ শরিয়ত সম্মত যে কোনো কাজ বান্দা করুক এটা আল্লাহ চান। শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ বান্দা করুক এটা আল্লাহ চান না। শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ বান্দা করুক এটা আল্লাহ তা'আলার ইরাদা ও ইচ্ছায় শরীয়ার বিরোধী-পরিপন্থি।

২. اَلْاِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةُ - অর্থাৎ বান্দা যা কিছু করে তা তখনই করতে পারে, যখন তা আল্লাহ তা'আলার এই ইচ্ছা ও ইরাদায়ে কাউনিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বান্দার কোনো আমলই এ দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছা ও ইরাদা বহির্ভূত নয়। তবে বান্দার নাফরমানি ও যাবতীয় শরিয়ত বিরোধী কাজ-কারবার আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে শরীয়ার পরিপন্থি [শারহুল আকীদাতুত ত্বাহাবীয়া] যদিও তা ইরাদায়ে কাউনিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চাইলেই বান্দা কুরআন হতে শিক্ষা লাভ করতে পারবে বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি বান্দার চাওয়ার সাথে আল্লাহর ইরাদায়ে কাউনিয়া সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখনই সে হেদায়েত লাভ করতে পারবে- নতুবা নয়।

قُرْاٰن-কে تَذْكِرَةٌ বলার কারণ : ইতঃপূর্বেও এর একটি আলোচনা করা হয়েছে। تَذْكِرَةٌ শব্দের অর্থ অভিধানে "টিকেট" বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন এমন বস্তু, যার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেই ব্যক্তি জীবন হতে সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বশেষ পরকালীন সম্বন্ধেও তার দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক হয়। যাবতীয় বিধিবিধান ও নিয়ম-নীতিমালাকে

স্মরণ করা হয়ে থাকে। মানুষ সৃষ্টি এবং জগৎ সৃষ্টির সকল ইতিহাস ও সকল রহস্যকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় তাই পবিত্র কুরআনকে تَذْكِرَةٌ বলা হয়েছে।

অথবা, ذِكْرٌ অর্থ যদি হেদায়েত, নসিহত ইত্যাদি নেওয়া হয় তখনো বলা যাবে, পবিত্র কালামুল্লাহ -এর মধ্যেই সকল দিকেরই হেদায়েত নসিহত নিহিত। যে ইচ্ছা করবে সেই এটা হতে হেদায়েত ও নসিহত পাবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ـ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ : অর্থাৎ আসলে আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দিলেই তো তারা তা (কুরআন) দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে। কার কিসের কি পরিমাণ যোগ্যতা রয়েছে আল্লাহই তা ভালো জানেন এবং তদনুসারেই তার সাথে ব্যবহার হয়ে থাকে। আর মানুষ যতই পাপ ও গুনাহ করুক না কেন, যদি আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে তবে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে থাকেন, তওবা কবুল করে থাকেন।

اَهْلُ التَّقْوٰى ও اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ-এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলাকে اَهْلُ التَّقْوٰى এ মর্মে বলা হয়েছে যে, তিনি তাকওয়ার অধিকার রাখেন, তাঁর জন্যই তাকওয়া অবলম্বন করা যায়। আর নাফরমানি হতে রক্ষা পেতে হলে একমাত্র তাঁর নাফরমানি হতেই নিজেদেরকে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

আর اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ তিনি এমন সত্তা যিনি অতি মহান হতে মহান, গুনাহকারীদের গুনাহসমূহ যখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ক্ষমা করে দেন, এরূপ ক্ষমা করার কারো অধিকার বা ক্ষমতা নেই।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ-এর মধ্যে مَشِيَّتُ اللّٰهِ এর তাৎপর্য কি? : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা مَشِيَّتْ-এর কথা বলেছেন, অপরাপর আয়াতসমূহ কখনো اِرَادَةٌ-এর কথা বলেছেন। আবার কখনো কখনো رَضِى-এর কথা বলেছেন।

اَلْمَشِيْئَةُ ও اَلْاِرَادَةُ-এর মধ্যে পার্থক্য : اَلْمَشِيْئَةُ ، اَلْمَرْضِىْ অর্থ হলো চাওয়া, অর্থাৎ কোনো বিষয় করতে বা হতে চাওয়া। اَلْمَرْضِىْ হলো, সন্তুষ্টি, আর اِرَادَةٌ অর্থ হলো মনোবাঞ্ছা করা, ইচ্ছা করা।

অতএব, এক-কথায় বুঝতে হলে এরূপ বুঝতে হবে যে, مَشِيَّتْ এর জন্য مَرْضِى শর্ত হবে না, অর্থাৎ কোনো কিছু করতে চাইলে তা সন্তুষ্টির সাথে হবে, তা আবশ্যক নয়। কারণ অনেক সময় অসন্তুষ্টির মাধ্যমেও অনেক কাজ করতে চাওয়া হয়। আর اَلْمَرْضِىْ-এর জন্য مَشِيَّتْ শর্ত হবে। অর্থাৎ কোনো কাজ সন্তুষ্টির সাথে করলে তাতে ইচ্ছা অবশ্যই থাকবে। বিনা ইচ্ছায় কোনো কাজ সন্তুষ্টির সাথে হয় না।

আর اِرَادَةٌ-এর মধ্যে مَرْضِىْ এবং مَشِيَّتْ পাওয়া যাবে। কেননা সন্তুষ্টি ও মনের প্রেরণা বা আকাঙ্ক্ষা থাকলেই কোনো কাজের জন্য ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাগণের ব্যাপারে এ বিষয়টি প্রায় প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন- وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ এখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করার জন্য ইচ্ছা করার কথা বলা হয়েছে সুতরাং বান্দাকে ক্ষমার জন্য যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি না থাকত তবে তিনি ক্ষমার জন্য আবেগ প্রকাশ করতেন না [আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।]

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ : সূরা আল-ক্বিয়ামাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াত لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ الخ হতে اَلْقِيٰمَةُ শব্দটি দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে। বস্তুত এ সূরায় কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার কারণে এ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ৪০টি আয়াত, ৯৯টি বাক্য এবং ৬৫২ টি অক্ষর রয়েছে।

শানে নুযূল : অত্র সূরা নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে হাদীস শরীফের এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না; কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়ে এমন একটি অন্তর্নিহিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যা হতে জানা যায় যে, তা মক্কার প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। কারণ এর আয়াত لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ -এর অর্থ হলো, ওহী দ্রুত স্মরণ করে নেওয়ার জন্য স্বীয় জিহ্বা নাড়িও না। তা অন্তরে বসিয়ে দেওয়া ও পড়িয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। ইত্যাদি বর্ণনাসমূহ ওহীর প্রথম অবস্থা, সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ ওহীসমূহকে পুরাপুরি সংরক্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হননি। আর সে সময়টুকুই ছিল মাক্কী জীবনের ওহীর প্রথম অবস্থা। সুতরাং তা মাক্কী সূরা -এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার মূলবিষয় হলো কিয়ামত সম্পর্কীয় অবস্থাসমূহের আলোচনা। পরকালে অবিশ্বাসীদের প্রতি সম্বোধন করে তাদের অনেক সন্দেহকে দূরীভূত করে দেওয়া হয়েছে। খুবই অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কিয়ামত ও পরকালের সম্ভাব্যতা, তা সংঘটিত এবং তার অপরিহার্যতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা পরকালকে অস্বীকার করে তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাকে অসম্ভব বলে মনে করে। তার মূল কারণ তাদের মনের কামনা ও বাসনা তা না দেখে মেনে নিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের শপথ ও নফসে লাওয়ামাহ -এর শপথ করে বলেন, মানুষ যত কিছুই মনে করুক না কেন আমি সব কিছুকেই পুনরুজ্জীবনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। পবিত্র কালামের স্থানে স্থানে বহু আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলার পরও তারা জেনেশুনেও যেহেতু আপনাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, তখন আপনি তাদরকে জানিয়ে দিন– কিয়ামত এমন একদিন সংঘটিত হবে, যেদিন মানুষ চক্ষু দ্বারা সরিষাফুল দেখবে। প্রতিপালক ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাবে না। চন্দ্র-সূর্য সেদিন একত্র হয়ে যাবে। সূর্য ১২ গুণ অতিরিক্ত তাপ প্রদান করতে থাকবে।

সকল মানুষের কৃতকর্মসমূহ অর্থাৎ আমলনামা তাদের সম্মুখে পেশ করা হবে। ইচ্ছা করে কিছুই গোপন করার মতো সুযোগ হবে না। স্কন্ধের ফেরেশতাহগণ সবই সত্যভাবে লিখে রাখবে।

১৬ নং আয়াত হতে ধারাবাহিকভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট ওহী নাজিল হওয়ার প্রথম অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। যখন ওহী প্রথম নাজিল হতো তখন তিনি পূর্ণভাবে তা বুঝে স্মরণ রাখতে মুশকিলজনক হতো। তাই ওহীর বিষয়টি সাথে সাথেই পড়তে থাকতেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সহানুভূতির জন্য ওহীকে তাঁর অন্তরে স্থায়ী করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর ২০ নং আয়াত হতে পুনরায় কাফেরদের কিয়ামত অস্বীকার করার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন সত্যবাদীদের কপাল বা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, আর কাফেরদের চেহারা খুবই ঘৃণিত হবে এবং আল্লাহর শাস্তির প্রতিফলে শরীরের সকল হাড় একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাবে।

৩১ নং আয়াত হতে কাফেরদের দুরবস্থার সকল কারণ বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ তারা নামাজ, রোজা ইত্যাদি বলতে সত্যের নিকটও যেত না। প্রত্যেকেরই কড়া-ক্রান্তি হিসাব নেওয়া হবে।

সর্বশেষ মানুষের সৃষ্টির মূলের প্রতি ইঙ্গিত করে সূরাটি খতম করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীনতা হতে এত বড় মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাদের পুনরুজ্জীবিত করতেও নিশ্চয়ই সক্ষম হবেন। পরকাল অবিশ্বাসীরা যেন এ কথা জেনে রাখে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা اَلْمُدَّثِّرُ-এর শেষার্ধে একটি আয়াত হচ্ছে– كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ 'কখনো নয়, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।' যেহেতু কাফেররা পরকালকে ভয় করে না, কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তাই আলোচ্য সূরায় কিয়ামতের বিবরণ রয়েছে এবং ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানবদেহ থেকে কিভাবে রূহ বের হয়ে যাবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لَا زَائِدَةٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

১. উভয়স্থানে ㄥ অতিরিক্ত আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করছি।

٢. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ الَّتِيْ تَلُوْمُ نَفْسَهَا وَإِنِ اجْتَهَدَتْ فِي الْإِحْسَانِ وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ أَيْ لَتُبْعَثُنَّ دَلَّ عَلَيْهِ.

২. আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার পুণ্যকাজে অশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও, যে তার আত্মাকে তিরস্কার করে। এখানে জওয়াবে কসম উহ্য অর্থাৎ لَتُبْعَثُنَّ যৎপ্রতি পূর্ববর্তী বক্তব্য নির্দেশ করছে।

٣. أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيِ الْكَافِرُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ لِلْبَعْثِ وَالْإِحْيَاءِ.

৩. মানুষেরা কি মনে করে অর্থাৎ কাফেরগণ যে, আমি তার অস্থিসমূহকে একত্র করবো না পুনরুত্থান ও পুনর্জীবিত করার জন্য।

٤. بَلٰى نَجْمَعُهَا قٰدِرِيْنَ مَعَ جَمْعِهَا عَلٰى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ وَهُوَ الْأَصَابِعُ أَيْ نُعِيْدُ عِظَامَهَا كَمَا كَانَتْ مَعَ صِغَرِهَا فَكَيْفَ بِالْكَبِيْرَةِ.

৪. হ্যাঁ, অবশ্যই আমি একত্র করবো। আমি তাতেও সক্ষম একত্র করার সাথে যে, আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করবো অর্থাৎ তার অঙ্গুলির ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঙ্গে যেখানে আমি হাড়-মাংস স্থাপন করবো, তবে বৃহৎ অঙ্গসমূহে কেন করব না।

٥. بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اللَّامُ زَائِدَةٌ وَنَصْبُهُ بِأَنْ مُقَدَّرَةٍ أَيْ أَنْ يَّكْذِبَ أَمَامَهُ أَيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ دَلَّ عَلَيْهِ.

৫. তথাপি মানুষ ইচ্ছা করে অস্বীকার করতে لِيَفْجُرَ -এর মধ্যে لَامْ অতিরিক্ত, আর উহ্য أَنْ -এর কারণে তা যবরযুক্ত অর্থাৎ অস্বীকার করার জন্য যা তার সম্মুখে আছে অর্থাৎ কিয়ামত দিবস, যৎপ্রতি পূর্বোক্ত বক্তব্য নির্দেশ করছে।

٦. يَسْأَلُ أَيَّانَ مَتٰى يَوْمُ الْقِيٰمَةِ سُؤَالَ اسْتِهْزَاءٍ وَتَكْذِيْبٍ.

৬. সে প্রশ্ন করে কবে কখন আসবে কিয়ামত দিবস? বিদ্রূপ ও অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَوْلُهُ لَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ : এটার উভয়টিই قَسَم এবং جَوَاب উহ্য মেনে নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার উহ্য جَوَابْ টি لَتُبْعَثُنَّ বলে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اَلَّنْ : উক্ত শব্দটির هَمْزَه ও لَامْ -এর মাঝে কোনো نُوْن মূলত নেই।

قَوْلُهُ قَادِرِيْنَ : তারকীবে এক فِعْل مُقَدَّرْ -এর ضَمِيْر হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ بَلْ نَجْمَعُهَا نَقْدِرُ قَادِرِيْنَ আর কারো মতে তা كَانَ -এর خَبَرْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ بَلْ كُنَّا قَادِرِيْنَ فِي আর ইবনে আবূ আবলাহ ও আবুস সোমাই তাকে مَرْفُوْع অর্থাৎ قَادِرُوْنَ পড়েছেন–الْإِبْتِدَاء এর-مُبْتَدَأ مَحْذُوْف -এর خَبَرْ হিসাবে। تَقْدِيْر হলো, بَلْ نَحْنُ قَادِرُوْنَ।

قَوْلُهُ لِيَفْجُرَ : শব্দটি তারকীবে কয়েক রকম হতে পারে। ১. يُرِيْدُ ক্রিয়ার مَفْعُوْل হলো مَحْذُوْف কিন্তু لِيَفْجُرَ ক্রিয়াটি তা বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ شَهْوَةً وَمَعَاصِيَةً لِيَفْجُرَ ২. لِيَفْجُرَ -এর لَامْ বর্ণটি অতিরিক্ত, তার পূর্বে اَنْ শব্দ مُقَدَّرْ রয়ে তাকে مَنْصُوْب করেছে। যথা– يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ اَنْ يَفْجُرَ اَمَامَهٗ গ্রন্থকার এ শেষ তারকীবই উল্লেখ করেছেন, আর তা-ই উত্তম। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ الخ আয়াতটি নাজিল হয়েছে আদী ইবনে রাবীয়া সম্পর্কে। আদী ছিল আখনাস ইবনে সোরায়েক ছাকাফীর জামাতা। এই আদী ও আখনাস সম্পর্কেই নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে মন্দ প্রতিবেশির ঘৃণ্য আচরণ থেকে রক্ষা করো।

একবার আদী রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, আমাকে বলুন, কিয়ামত কবে হবে? তার অবস্থা কি হবে? নবী করীম ﷺ তার নিকট কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করেন। সব কথা শুনে সে বলল, যদি আমি স্বচক্ষেও কিয়ামত দেখি তবুও আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো না এবং আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেবো না। আল্লাহ কি ভেঙ্গে যাওয়া এ হাড়গুলোকে একত্র করবেন? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিবসের শপথ করছি এবং এমন আত্মার শপথ করছি যা নিজের উপর নিজে ভর্ৎসনা করে থাকে। উক্ত আয়াত বা গোটা সূরাটিকে না-বোধক বাক্য দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এটা হতে ইঙ্গিত মাত্র বুঝা যায় যে, পূর্ব হতে কোনো কথা চলে আসছিল। যার প্রতিবাদে না-বোধক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের স্থূল অর্থ হয় এরূপ।

তোমরা যা বলছ তা সত্য নয়, রাসূল সত্য। আর আমি কসম করে বলছি যে, আমার কথাই সত্য। উক্ত আয়াতে যে শপথ করা হয়েছে এর جَوَابْ আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি; বরং আল্লামা জালালুদ্দীন (র.)-এর মতে এর جَوَابْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ (لَتُبْعَثُنَّ) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। কারণ, পরবর্তী আয়াতটি তার প্রতি ইঙ্গিত করছে।

لَا -এর অর্থ প্রসঙ্গ : উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত لَا অক্ষরটি কোন অর্থে নেওয়া হ' এর মধ্যে তাফসীরকারদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন (র.) -এর মতে لَا অক্ষরটি উভয় আয়াতেই زَائِد বা অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। জমহুরও এ মত প্রকাশ করেছেন। মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী কাফেরদের تَرْدِيْد আকীদার খণ্ডনের উদ্দেশ্যে لَا নেওয়া হয়েছে। ইবনে কাছীর গ্রন্থকারের মতে لَامْ টি এখানে اِبْتِدَاء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, لَا اُقْسِمُ -এর اَصْل হলো لَاُقْسِمُ এবং লাম ل টি مُبْتَدَأ তার خَبَرْ হলো اُقْسِمُ ; কারণ مُصْحَفُ الْإِمَام -এ এর রূপ হলো لَاُقْسِمُ অর্থাৎ اَلِفْ

বিহীন। কারো কারো মতে উক্ত اَلِفْ টি اِشْبَاعْ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, যখন কোনো কথাকে কেউ অস্বীকার করে থাকে, তখন তার কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য حَرْف لَا زَائِدْ নেওয়া হয়ে থাকে। আরবে এরূপ ভাষায় যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে।

আয়াতকে শপথের সাথে নেওয়ার হিকমত : আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত দু'টিতে যে শপথ করেছেন, তাতে কি হিকমত রয়েছে। এর মূল ইলম আল্লাহর নিকটই রয়েছে। অবশ্য পরবর্তী আয়াতের মধ্যে তার সামান্য ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেছেন।

ক. প্রথমে কিয়ামতের প্রসঙ্গই বিবেচনা করা যাক। বস্তুত কিয়ামত যে হবে তা নিঃসন্দেহ। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাই অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দান করে যে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়, শাশ্বতও নয়- এটা চিরকাল ছিলও না। এর পরিবর্তনশীল অবস্থা এ কথা বুঝাচ্ছে যে, তা ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী। আর তার স্থায়িত্বের উপর কোনো অকাট্য প্রমাণও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

খ. অথবা, কাফেরদের কিয়ামতকে অস্বীকার করার ব্যাপারটি যত কঠিন অবস্থা ধারণ করেছিল তা হতে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তত শক্তিশালী ভাষা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে শপথ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে তারা মানতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহর বাণী সঠিক ও কিয়ামত সত্য। অর্থাৎ যেমন অস্বীকার তেমন প্রতিবাদ।

গ. এ বিশ্বলোক বিধ্বংস হওয়ার পর যে পুনরায় হিসাব-নিকাশ হবে। পরকাল শাস্তি ও শান্তির ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তা সেই অজ্ঞ যুগের মানুষ জেনেশুনেও তাকে মূল্যায়ন করত না। সুতরাং রোজ কিয়ামতের নিশ্চয়তা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা শপথ বাক্য ব্যবহার করেছেন।

ঘ. অথবা, আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মানুসারে কোনো বিষয়কে সত্য বলে মানবকুলে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য শপথ করেছেন তা কালামুল্লাহ ভাষায় এক প্রকার অলংকার।

قَوْلُهُ اَلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ : نَفْس অর্থ- প্রাণ বা আত্মা, অথবা রূহ। আর لَوَّامَة অর্থ- ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা, তা لَوْم অর্থাৎ يَلُوْمُ لَامَ হতে উৎপত্তি হয়েছে।

নফস-এর প্রকারভেদ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নফসকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। অর্থাৎ তার তিন প্রকার রূপ দান করেছেন।

১. নফসে লাওয়ামাহ- যেমন অত্র সূরায় বলা হয়েছে وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ নফসে لَوَّامَة ঐ নফসকে বলা হয় যা স্বীয় عَمَلْ কার্যকলাপসমূহ করার পর নিজেকে নিজে তিরস্কার করতে থাকে।

২. নফসে আম্মারাহ প্রসঙ্গে সূরা ইউসুফে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي নফসে আম্মারাহ ঐ প্রকার নফসকে বলা হয় যা সদাসর্বদা মানুষকে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর কার্যের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য উসকানি দিয়ে থাকে। ঈমান অথবা নেক কার্যসমূহের প্রভাবে মানুষ তাতে লিপ্ত হওয়া হতে বাঁচতে সক্ষম হয়।

৩. নফসে মুতমাইন্নাহ ঐ নফসকে বলা হয় যা ভুল বা অন্যায় পথ পরিহার করার দরুন অথবা সঠিক পথে সর্বদা পরিচালিত হওয়ার দরুন মানুষের মধ্যে স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা প্রদান করে থাকে। নফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ফাজর -এ বলেন يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً নফসে মুতমাইন্নাহ -এর প্রভাবে ব্যক্তির আত্মা শরিয়তের পাবন্দ ও অনুসারী হয়ে যায়।

ফায়দা : কারো কারো মতে نَفْس لَوَّامَة দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর আত্মাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তার আত্মা সব সময় এই তিরস্কার তাকে করত যে, তিনি কেন বেহেশত হতে বের হওয়ার কার্যে লিপ্ত হলেন। -[মাদারিক]

قَوْلُهُ تَعَالَى اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ ..... عِظَامَهُ : 'মানুষ কি ধারণা করে, আমি তার অস্থিপুঞ্জ একত্র করতে পারবো না।' অর্থাৎ কিছু কিছু লোক কেবল এ কারণেই পরকাল অস্বীকার করে যে, তাদের কাছে মৃত্যুর পর কবরে মানুষের দেহ পচে যাওয়ার পর আবার মানুষের অঙ্গগুলো একত্র করে পুনরুত্থিত করা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। তারা পরকালের ধারণাকে অবাস্তব ও অসম্ভব মনে করে তা অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى بَلٰى قَادِرِيْنَ اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ : পূর্বে পরকাল অস্বীকারকারীদের সন্দেহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদের সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা হয়েছে, বড় বড় অস্থিগুলো সংগ্রহ ও একত্র করে তোমাদের দেহ কাঠামো পুনঃ নির্মাণ করাতো খুবই সামান্য ও সাধারণ ব্যাপার। তোমাদের সূক্ষ্মতম দেহাংশ এমনকি তোমাদের আঙুলসমূহের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনরায় সেই রকম অমরা বানিয়ে দিতে পারি যেমন তা পূর্বে ছিল।

অঙ্গুলির অগ্রভাগের বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : বিশেষভাবে অঙ্গুলির অগ্রভাগের কথা আলোচনা করার কারণ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ হতে পৃথক করার জন্য তার সর্বাঙ্গে যেসব বৈশিষ্ট্য রেখেছেন তার মধ্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগের রেখা অন্যতম। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- তোমরাতো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর যে, এ মানুষ কিভাবে পুনরায় জীবিত হবে। আরও সামান্য অগ্রসর হয়ে চিন্তা কর যে, কেবল জীবিতই হবে না; তার অঙ্গুলিসমূহের রেখা যেভাবে ছিল পুনঃ সৃষ্টিতেও তদ্রূপই থাকবে। -[মা'আরিফ]

কিয়ামত ও পরকালে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণ : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও নফসের লাউওয়ামার শপথ করার পর তিনি মানবকুলকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম বলে মানুষের কিয়ামত ও পরকালে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণটি উপরোক্ত ৫নং আয়াতে তুলে ধরেছেন। মানুষের ঐ জগতে বন্ধনহারা ও লাগামহারা হয়ে চলাই তার নফসে আম্মারার দাবি। মানুষ মনে যা চায় তা অবাধে করে বেড়ায়, কোনো কাজের জন্য কারো নিকট কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তা তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুতরাং কিয়ামত ও পরকালটিকে স্বীকার করে নিলে স্বাভাবিকভাবেই তাকে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও বাঁধন মেনে নিতে হয়। যার ফলে মন যা চায় এবং প্রবৃত্তি যা করতে চায় তার সবগুলো সে করতে পারে না। করতে পারে না সে মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার। পারে না সে মানুষের হক ও অধিকারকে নস্যাৎ করতে। পারে না অন্যায়-অবিচার-কুসংস্কার ও চরিত্রহানীকর কাজে লিপ্ত হতে। আর কিয়ামত, পরকাল ও পুনরুজ্জীবনকে বিশ্বাস না করলে প্রবৃত্তির প্রত্যেকটি চাহিদা সে পূরণ করতে পারে। বাধা-বন্ধনহীন চিত্তে এই জগতে সে বিচরণ করতে পারে। চালাতে পারে সে মানুষের উপর আকীদার খণ্ডনে বর্ণিত। সুতরাং এ মর্ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা যেরূপ আকীদা পোষণ কর তা কখনই সঠিক নয়। আমি স্বয়ং কিয়ামতের শপথ করে বলছি। আর কতক তাফসীরকারের মতে لَا বচনটি দ্বারা শপথই করা হয়েছে এবং তাকে অধিকতর তাকিদ প্রদান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় তাকীদার্থে وَ কসমিয়ার পূর্বে এমনি لَا বচন অনেক স্থানেই ব্যবহৃত হয়। যেমন ইমরুল কায়েসের এই কবিতার চরণে ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا وَاَبِيْكَ اِبْنَةِ الْعَامِرِىْ * لَا يَدَّعِى الْقَوْمُ اِلٰى اَفِرِ

এ মর্ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয়, 'আমি অবশ্যই শপথ করেছি কিয়ামতের দিনের, যে কিয়ামতের কথা কাফেরগণ অস্বীকার করে'।

قَوْلُهُ تَعَالٰى بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ الخ : উক্ত আয়াতে পরকাল অমান্যকারী লোকদের মূল রোগের স্পষ্ট নির্ধারণ ও নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামত অবিশ্বাসকারীগণ চায় যে, ভবিষ্যৎ জীবনেও তারা নির্ভীকচিত্তে ফিসক ও ফজুরী করতে থাকবে। তাই হঠকারিতার সুরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে থাকে যে, কিয়ামত কখন আগমন করবে? এ প্রশ্নটি আসলে কিয়ামতের সন-তারিখ সম্বন্ধে অবগতি লাভ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তা জানা তাদের উদ্দেশ্য তো দূরের কথা তা জানলে তাদের সকল আনন্দ ম্লান হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা বিভোর হয়ে থাকে। আর পরকাল বিশ্বাস করলে তাদের যে কতগুলো বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হতে হয়, তা মানতে তারা প্রস্তুত নয়। এটাই ছিল এই লোকদের পরকাল অস্বীকৃতির আসল কারণ।

অনুবাদ :

٧. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا دَهِشَ وَتَحَيَّرَ لَمَّا رَأَى مِمَّا كَانَ يُكَذِّبُ بِهِ.

৭. যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে بَرِقَ শব্দটি رَا-এর মধ্যে যের ও যবর যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তারা যে জিনিস অস্বীকার করেছে, তা সম্মুখে দেখতে পেয়ে হতভম্ব ও বিহ্বল হয়ে যাবে।

٨. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اظْلَمَ وَ ذَهَبَ ضَوْءُهُ.

৮. এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং তার জ্যোতি লোপ পাবে।

٩. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَطَلَعَا مِنَ الْمَغْرِبِ أَوْ ذَهَبَ ضَوْءُهُمَا وَ ذٰلِكَ فِيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

৯. আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে তখন তারা পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে অথবা তাদের আলো লোপ পাবে। আর এরূপ কিয়ামতের দিনে হবে।

١٠. يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ الْفِرَارُ.

১০. যেদিন মানুষেরা বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়? কোন দিকে ভাগবো?

١١. كَلَّا رَدْعٌ عَنْ طَلَبِ الْفِرَارِ لَا وَزَرَ لَا مَلْجَأَ يُتَحَصَّنُ بِهِ.

১১. কখনো নয় তা পলায়ন কামনা করার প্রতি অস্বীকার কোনোই আশ্রয়স্থল নেই এমন কোনো আশ্রয়স্থল নেই যাতে আশ্রয় নেওয়া যাবে।

١٢. إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۣ الْمُسْتَقَرُّ مُسْتَقَرُّ الْخَلَائِقِ فَيُحَاسَبُوْنَ وَيُجَازُوْنَ.

১২. সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট ঠাঁই হবে সৃষ্টি জগতের ঠাঁই, তারা হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র হবে।

١٣. يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بِأَوَّلِ عَمَلِهِ وَاٰخِرِهِ.

১৩. সেদিন মানুষকে যে যা অগ্রে পাঠিয়েছে এবং যা পশ্চাতে রেখে এসেছে, তদ্বিষয়ে অবহিত করা হবে তার আমলের শুরু ও শেষ সম্পর্কে।

١٤. بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ شَاهِدٌ تَنْطِقُ جَوَارِحُهُ بِعَمَلِهِ وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ جَزَائِهِ.

১৪. বরং মানুষ তার নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত সাক্ষ্য, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে بَصِيْرَة-এর মধ্যে هَا বর্ণটি مُبَالَغَه-এর জন্য মোদ্দাকথা, আমলের প্রতিদান প্রতিফল অবশ্যম্ভাবী।

١٥. وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهُ جَمْعُ مَعْذِرَةٍ عَلٰى غَيْرِ قِيَاسٍ أَيْ لَوْ جَاءَ بِكُلِّ مَعْذِرَةٍ مَا قُبِلَتْ مِنْهُ.

১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে مَعَاذِيْرَ শব্দটি কিয়াসের বিপরীতে مَعْذِرَةٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ যদিও সবধরনের অজুহাত পেশ করে, তার নিকট হতে তার কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَرِقَ الْبَصَرُ : بَرِقَ শব্দের رَا-তে كَسْرَة এবং فَتْح উভয় যুক্ত করে পঠিত হয়েছে। আবুছাম্মাল بَرِقَ-এর স্থলে بَلِقَ পড়েছেন অর্থ খুলে গেছে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ خَسَفَ الْقَمَرُ : জমহুর خَسَفَ শব্দটি خَا তে এবং سِيْن এ فَتْح দিয়ে خَسَفَ পড়েছেন। অর্থাৎ مَعْرُوْف করে পড়েছেন। আর ইবনে আবূ ইসহাক, ঈসা, আ'রায, ইবনে আবূ আবলাহ, আবূ হাইওয়া خَا-তে ضَمَّه এবং سِيْن-এ كَسْرَة যুক্ত করে مَجْهُوْل করে خُسِفَ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ أَيْنَ الْمَفَرُّ : জমহুর مِيْم এবং فَا، -তে فَتْح দিয়ে مَصْدَرٌ হিসাবে أَيْنَ الْمَفَرُّ পড়েছেন। অর্থাৎ পলায়ন কোথায়। আর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান বসরী, কাতাদাহ مِيْم এ- فَتْح এবং كَسْرَة দিয়ে اِسْمُ مَكَانٍ হিসাবে পড়েছেন। অর্থ পালানোর জায়গা কোথায়। জহুরী مِيْم এ- كَسْرَة এবং فَا، -তে فَتْح দিয়ে أَيْنَ الْمَفَرُّ পড়েছেন। অর্থ- أَيْنَ الْإِنْسَانُ الْجَيِّدُ الْفِرَارُ "খুব পালাতে পারে সে লোকগুলো আজকে কোথায়" বলেছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে পরকাল অস্বীকারকারীগণ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব এবং অবাস্তব মনে করে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং তাচ্ছিল্য করে প্রশ্ন করেছিল- যে কিয়ামতের কথা বলছ সে কিয়ামত কবে কখন সংঘটিত হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের এমন প্রশ্নের প্রতিবাদ হিসাবে কিয়ামত দিবসে বাস্তবে কি ঘটবে তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ : بَرِقَ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- বিদ্যুৎ ছটায় চোখ ঝলসে যাওয়া। আরবি কথনে এরূপ অর্থ হয় না; বরং ভীত, শঙ্কিত, বিস্মিত, হতভম্ব অথবা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে দিশেহারা হয়ে যাওয়া। অথবা কাতর উদ্বিগ্ন করে দেওয়া দৃশ্যের প্রতি চক্ষু ঝলসে যাওয়া বা স্থির হয়ে যাওয়া অথবা চোখে ধাঁধা দেখবে বিস্ফোরিত ক্ষেত্রে তাকাবে ইত্যাদি রকমের অর্থ বুঝাবার জন্য এ বাক্য বলা হয়।

মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, بَرِقَ শব্দটি بِكَسْرِ الرَّاءِ হলে অর্থ হবে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ও অস্থির হওয়া। আর যদি بِفَتْحِ الرَّاءِ হয়, তখন অর্থ হবে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া। অর্থাৎ নবীগণ দুনিয়াতে যে সকল ওয়াদা অঙ্গীকার করেছেন সেগুলো তারা মানেনি। আখেরাতে সেসব কিছু সত্য বলে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে হয়রান হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَخَسَفَ الْقَمَرُ : خَسَفَ শব্দটি خُسُوْفٌ হতে مُشْتَقٌّ হয়েছে। অর্থাৎ চন্দ্রের আলোক নিঃশেষ হয়ে তা অন্ধকার হয়ে যাবে যেমন চন্দ্রগ্রহণের ও সূর্যগ্রহণের সময় হয়ে থাকে। স্পষ্ট দিবাভাগ রাত্রির ন্যায় হয়ে যায়। সে সময় এরূপ অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ : উক্ত আয়াতে কিয়ামতের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কেবল চন্দ্রই আলোকহীন হবে না; বরং সূর্যও আলোকহীন হয়ে পড়বে। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত হলো চন্দ্রের আলোক সূর্য হতে এসে থাকে- চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। সুতরাং যখন চন্দ্র আলোকহীন হবে, সূর্যও আলোকহীন হয়ে পড়া আবশ্যক আর চন্দ্র ও সূর্য উভয় সেদিন একত্র হয়ে যাবে। জালালাইন গ্রন্থকার বলেন وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, অর্থ হলো তারা উভয়ই পশ্চিমাকাশে উদিত হবে। অর্থাৎ সেদিন দুনিয়ার পরিস্থিতি অন্য দিকে ধাবিত হতে থাকবে। যা উল্টো হয়ে যাবে।

অথবা, আয়াতের অর্থ হবে-চন্দ্র সেদিন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে সূর্যের গহ্বরে নিপতিত হবে। সুতরাং جُمِعَ অর্থ এখানে একই দিক হতে উদয় হওয়া। তবে একটি অপরটির সাথে সংঘর্ষে জড়িত হবে না। আর একই সময়ই উদিত হওয়াও আবশ্যক হবে না; বরং ভিন্ন ভিন্ন সময়েও উদিত হতে পারে। অথবা কুদরতের ইচ্ছা হলে একই সময়েও বিনা সংঘর্ষে একই দিক হতে উদিত হওয়াও সম্ভব হবে। অথবা, جُمِعَ হবে তখনই যখন উভয় আলোকহীন অবস্থায় একত্রিত হবে। অথবা, চন্দ্র-সূর্য উভয়কে জ্যোতির্ময় অবস্থায় একত্রিত করা হবে, অতঃপর সাগরে উভয়কে নিক্ষেপ করে মহা অগ্নির পানি তৈরি করা হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'সেদিন মানুষ বলবে পালাবার জায়গা কোথায়? অর্থাৎ সেদিনের ভয়াবহতা আর কঠোরতা দেখে কিয়ামত অস্বীকারকারী কাফেরগণ হতাশ হয়ে বলতে থাকবে এ মহাবিপদ ও আজাব হতে পালানোর জায়গা কোথায়? কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাই? কারণ প্রাথমিক অবস্থা দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে, সেদিন পালানোর স্থান থাকবে না- কোনো আশ্রয় স্থল পাওয়া যাবে না। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ : এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পরে। **এক.** সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে আবাসস্থল। অর্থাৎ অন্য কোথাও তারা কোনো আবাসস্থল পাবে না, কোনো আশ্রয় কেন্দ্র থাকবে না। **দুই.** সেদিন তোমার আল্লাহর কাছেই ঠিকানা হবে জাহান্নাম বা জান্নাত যেকোনো একটি। অর্থাৎ এ দুয়ের যেকোনো একটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও ইরাদায় নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তিনি যাকে পছন্দ করবেন তাকে জান্নাত দিবেন, আর যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে দেবেন। -[কাবীর]

قَوْلُهُ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ : এ বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পূর্বে যা কিছু নেক আমল করেছে ও বদ আমল করেছে তা এবং মৃত্যুর পর তার কাজের ফলে যে ভালো নিয়ম ও খারাপ নিয়ম প্রচলিত হয়েছে সে সম্পর্কে হাশরের দিন মানুষকে পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আর এক মর্ম পাওয়া যায় যে, যা কিছু খারাপ কাজ পূর্বে করেছে এবং পরে যা কিছু ভালো ও নেক কাজ করা হয়েছে, সবগুলো সম্পর্কেই অবহিত করা হবে।

হযরত কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যমূলক যা কিছু কাজ করেছে এবং আল্লাহর যেসব হক ও অধিকার নষ্ট করেছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় ধন-সম্পদ হতে নিজের জন্য যা কিছু ব্যয় করেছে এবং মৃত্যুর পর ওয়ারিসদের জন্য যা কিছু রেখে গেছে, তার সম্পর্কেই মানুষকে হাশরের দিন অবগত করানো হবে।

হযরত আতা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, তা দ্বারা জীবনের প্রথম আমল ও শেষের আমলের কথা বুঝানো হয়েছেন।

–[মা'আলিম, খাযেন]

* আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কাজকে চিরস্থায়ী আখেরাতের কাজের উপর প্রাধান্য দেওয়া বা তার বরখেলাফ করা, উভয় প্রকার কর্ম সম্পর্কে তাকে কিয়ামতের দিন অবহিত করা হবে। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, বরং মানুষ তখন নিজেই নিজের অবস্থান সম্যকভাবে বুঝতে সক্ষম হবে। যদিও মজ্জাগত অভ্যাসবশত সেখানেও মিথ্যা এবং স্থূল কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্নভাবে ওজরখাহী করতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলেন– قَدْ جَاۤءَكُمْ بَصَاۤئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ (অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সকল প্রকার দলিল ও প্রমাণসমূহ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে তার প্রতি লক্ষ্য করবে সে নিজেই উপকৃত হবে। আর যে তা উপেক্ষা করবে তার প্রতিফল নিজেরই উপর পতিত হবে। আর আমি তোমাদের উপর সর্বদা দরবান সমেত থাকবো না। بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ -এর অর্থ কেউ কেউ বলেন, মানুষ যদি নিজের কথায় নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখে তবে সহজেই আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাতে প্রভৃতি সত্য বলে বুঝতে পারবে।

قَوْلُهُ بَصِيْرَةٌ : بَصِيْرَةٌ -এর অর্থ হলো– দর্শক, অথবা بَصِيْرَةٌ অর্থ حُجَّتٌ প্রমাণাদি। বলা হয়ে থাকে اَنْتَ حُجَّةٌ عَلٰى نَفْسِكَ بَصِيْرَةٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো بَصَاۤئِرُ অথবা এর অর্থ شَاهِدٌ সাক্ষী حَاضِرٌ উপস্থিত।

قَوْلُهُ مَعَاذِيْرَهٗ : مَعَاذِيْرَهٗ শব্দটি مِعْذَارٌ -এর সম অর্থ, অর্থাৎ ওজর-আপত্তি, عُذْرٌ এর একবচন। আল্লামা ওয়াহিদী (র.) বলেন, এটা مَعْذِرَةٌ শব্দের অনিয়মিত বহুবচন। আর কাশশাফ গ্রন্থকার বলেন, مَعَاذِيْرَهٗ শব্দটি اِسْمُ جَمْعٍ বরং مَعْذِرَةٌ -এর বহুবচন হলো مَعَاذِرُ - اَلْمَعَاذِيْرُ অর্থ– আবরণ, তার একবচন হলো مِعْذَارٌ সুতরাং বাক্যটির অর্থ হলো, তারা যদি তাদের অপকর্মের উপর পর্দা আবরণ ঢেলে দেয়।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ . فَمَا وَجْهُ الْحُجَّةِ عَلٰى اَعْمَالِ بَنِيْ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

আল্লাহ বলেছেন, প্রত্যেক মানুষই তার কৃত সকল আমল সম্বন্ধে অবহিত থাকবে, সুতরাং বনী আদমের আমলসমূহের উপর রোজ কিয়ামতে حُجَّةٌ পেশ করার প্রয়োজন কি?

এর জবাবে বলা হবে, যদিও اَعْمَالُ بَنِيْ اٰدَمَ সম্বন্ধে প্রত্যেক আদম সন্তানই অবগত রয়েছে এবং কিয়ামতে তারা সবগুলোই স্বচক্ষে ভালোমন্দ দেখতে পাবে, তথাপিও তা আল্লাহর আদালতের বিচার কার্য সমাধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। আল্লাহ যেহেতু দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে অথবা কোনো দলিল-প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমেই বিচার করাকে হক বিচার বলেছেন, তাই ব্যতিক্রমভাবে তার স্বয়ং বিচার করা ইনসাফ হবে না। সেদিন তিনি নিজেই হাকিম হবেন, আর হাকিম কখনো তার নিজ আইনের বহির্ভূত কাজ করা সমীচীন নয়। وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

অনুবাদ :

١٦. قَالَ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ بِالْقُرْاٰنِ قَبْلَ فَرَاغِ جِبْرَئِيْلَ مِنْهُ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ خَوْفَ اَنْ يَنْفَلِتَ مِنْكَ .

১৬. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি তার সাথে সঞ্চালন করো না কুরআনের সাথে, হযরত জিবরাঈল তা আবৃত্ত করা হতে অবসর না হওয়ার পূর্বে তাকে দ্রুত আত্মস্থ করার উদ্দেশ্যে এ ভয়ে যে, না জানি কুরআনের কোনো অংশ ছুটে যায়।

١٧. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِىْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهُ قِرَاءَتَكَ اِيَّاهُ اَىْ جَرْيَانَهُ عَلٰى لِسَانِكَ .

১৭. নিশ্চয় আমারই দায়িত্ব তা সংরক্ষণ করা তোমার বক্ষে এবং তা পাঠ করাবার তুমি তা পাঠ করার অর্থাৎ তোমার মুখে তা জারি করার।

١٨. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ عَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ جِبْرَئِيْلَ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ اِسْتَمِعْ قِرَاءَتَهُ فَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ ثُمَّ يَقْرَأُ .

১৮. সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তোমার নিকট হযরত জিবরাঈলের মাধ্যমে তখন তুমি সে পাঠের অনুসরণ করো তার কেরাত শ্রবণ করো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হতে শ্রবণ করতেন এবং অতঃপর স্বয়ং পাঠ করতেন।

١٩. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ بِالتَّفْهِيْمِ لَكَ وَالْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَمَا قَبْلَهَا اَنَّ تِلْكَ تَضَمَّنَتِ الْاِعْرَاضَ عَنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذِهِ تَضَمَّنَتِ الْمُبَادَرَةَ اِلَيْهَا بِحِفْظِهَا .

১৯. পুনরায় এর বিশদ ব্যাখ্যা দান করা আমারই দায়িত্ব তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। পূর্ববর্তী আয়াতও এ আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যতা এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আয়াত হতে বিমুখতা ছিল, আর এ আয়াতে তা মুখস্থ করার মাধ্যমে তৎপ্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে।

٢٠. كَلَّا اِسْتِفْتَاحٌ بِمَعْنٰى اَلَا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ الدُّنْيَا بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِى الْفِعْلَيْنِ .

২০. না كَلَّا শব্দটি اِسْتِفْتَاح-এর জন্য এবং اَلَا অর্থে ব্যবহৃত বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাস দুনিয়াকে, تُحِبُّوْنَ ও تَذَرُوْنَ এ فِعْل দু'টি يَا ও تَاء যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে।

٢١. وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ فَلَا تَعْمَلُوْنَ لَهَا .

২১. আর আখেরাতকে উপেক্ষা কর তাই তজ্জন্য আমল কর না।

٢٢. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ اَىْ فِىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَّاضِرَةٌ حَسَنَةٌ مُضِيْئَةٌ .

২২. সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল হবে সুদর্শন ও আলোকোজ্জ্বল।

٢٣. اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

২৩. তার প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিদানকারী।

٢٤. وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ كَالِحَةٌ شَدِيْدَةُ الْعُبُوْسِ .

২৪. আর কোনো কোনো মুখমণ্ডল সেদিন বিবর্ণ হয়ে পড়বে মলিন ও ফ্যাকাশে।

٢٥. تَظُنُّ تُوْقِنُ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ دَاهِيَةٌ عَظِيْمَةٌ تَكْسِرُ فَقَارَ الظَّهْرِ .

২৫. এ ধারণায় বিশ্বাসে যে, ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন এমন ভয়ানক বিপদ যার কারণে পাঁজর ভেঙ্গে যাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِتَعْجَلَ بِهٖ : অংশটি لَاتُحَرِّكْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে। قَوْلُهُ اِنَّ عَلَيْنَا الخ এটা পৃথক বাক্য।

قَوْلُهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ : এটা পূর্ববর্তী اِذَا قَرَأْنَاهُ-এর جَوَابٌ হবে, তাই مَجْزُوْم হয়েছে। কেননা جَوَاب شَرْط-এর اِعْرَاب জযম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ : এখানে ثُمَّ টি تَرَاخِيْ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আর এটা حَرْف عَطْف হওয়ার কারণে তার পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف হবে। একে عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ বলে।

قَوْلُهُ نَاضِرَةٌ : এটা وُجُوْهٌ-এর خَبَرْ হিসাবে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ : বাক্য হতে تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ الخ বাক্যটি حَالٌ হিসাবে মহল্লান মানসূব।

تُحِبُّوْنَ এবং تَذَرُوْنَ-এর অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : মদীনাবাসী এবং কূফাবাসীগণ تُحِبُّوْنَ এবং تَذَرُوْنَ অর্থাৎ تَا . দিয়ে পড়েছেন। সম্বোধনসূচক বাক্য হিসাবে। আবূ ওবাইদ এ কেরাত পছন্দ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ সব ক্বারীদের বিরোধিতা করা আমার কাছে অপছন্দনীয় না হলে আমি يَا . যুক্ত করে পড়তাম। কারণ, পূর্বে اِنْسَانٌ উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি ক্বারীগণ খবর হিসাবে يَا . যুক্ত করে পড়েছেন। তা আবূ হাতিমের গ্রহণীয় মত। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কাছে যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি তা মুখস্থ করার জন্য তাড়াতাড়ি করে ওষ্ঠ ও জিহ্বা সঞ্চালন করতে তৎপর থাকতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং বলেন- হে নবী! আপনি কুরআনকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না এবং ব্যস্ত হবেন না। তা আপনার স্মৃতিতে মুদ্রিত করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন তা পাঠ করে, আপনি তখন চুপ থাকবেন। অতঃপর তাকে অনুকরণ করে পাঠ করবেন। তা বর্ণনাকরণ এবং মানুষের নিকট প্রচার করার ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব আমার, আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না। -[খাযেন, লোবাব]

উল্লিখিত কথার পটভূমি : সূরার প্রথম হতে কিয়ামত ও পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল- পরেও আবার কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে; কিন্তু মধ্যের এ আয়াত চারটি ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করে সম্পূর্ণ একটি নতুন কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে- হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন সূরা 'আল-কিয়ামাহ' পাঠ করে তাঁকে শুনাচ্ছিলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মুখস্থ করার জন্য শানে নুযূলে বর্ণিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, এ জন্য প্রসঙ্গ কথা বাদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে এ হেদায়েত দেওয়া হলো যে, আপনি এখনই ওহীর শব্দ ও ভাষা মুখস্থ করার জন্য চেষ্টা করবেন না; বরং আপনি মনোযোগ সহকারে তা শুনতে থাকুন। তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং পরে তা যথাযথভাবে পড়িয়ে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। আপনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন।

এ ব্যাপারটি যেন এমনই যে, একজন শিক্ষক শিক্ষা কক্ষে ছাত্রদেরকে পড়াতে একটি শিক্ষার্থীকে অন্যদিকে মনোনিবেশকারীরূপে পেলেন তিনি তখনই পাঠদান থামিয়ে প্রসঙ্গ ভঙ্গ করে ছাত্রটিকে বলেন 'আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো।' তারপর তিনি তার শিক্ষাদান প্রসঙ্গের কথা বলতে শুরু করে দিলেন। এর কারণেই সূরার মধ্যের এ কথাটি বেখাপ্পা ও অপ্রাসঙ্গিক নয়, তার পটভূমি জানা না থাকলেই কেবল বেখাপ্পা মনে হতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَاتُحَرِّكْ بِهٖ-এর মধ্যকার بِهٖ অর্থ : এর অর্থ দুই পদ্ধতিতে করা যায়। একটি হলো لَاتُحَرِّكْ بِالْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ কালে তা তেলাওয়াতের প্রতি ত্বরান্বিত করবেন না। অর্থাৎ পড়তে তাড়াতাড়ি করবেন না। অপর অর্থ হলো لَاتُحَرِّكْ بِالْوَحْيِ অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণকালে তা তেলাওয়াতের প্রতি ত্বরান্বিত করবেন না. অর্থাৎ পড়তে তাড়াতাড়ি করবেন না। অপর অর্থ হলো لَا تُحَرِّكْ بِالْوَحْيِ অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণকালে তা পাঠ করার জন্য জবানকে হেলাবেন না।

ওহীকে গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়া করার কারণ : মা'আরিফ গ্রন্থকার এর দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন–

১. ওহী যা অবতীর্ণ হচ্ছে তা পরোক্ষণে কিছু অংশ হুজুর ﷺ হতে ছুটে যায় কিনা।

২. অথবা, ওহীর মাধ্যমে যে যে বিষয়ে যে যে নির্দেশ যেমনি পালন করতে বলা হয়েছে সে নিয়ম-পদ্ধতিতে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে যায় কিনা– এই আশঙ্কায় হুযূর ﷺ ওহীসমূহ কণ্ঠস্থ করার জন্য খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ-এর মধ্যে قُرْآنَهُ-এর অর্থ : এর অর্থও সাধারণত দু'টি হতে পারে। এক অর্থ হয়- قِرَاءَتْ পঠন করা, তেলাওয়াত করা, আরেকটি অর্থ হলো– إِثْبَاتُهُ অর্থাৎ إِثْبَاتُ قِرَاءَتِهِ عَلَى لِسَانِكَ তখন অর্থ হবে হযরত জিবরাঈলের কেরাতকে আপনার অন্তরে স্থায়ী করে দেওয়া। দ্বিতীয় অর্থই এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এরপর যে فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ বলা হয়েছে সেখানে قُرْآنَهُ অর্থ হলো قِرَاءَةٌ অর্থাৎ হযরত জিবরাঈলের কেরাতের অনুসরণ করুন।

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ : প্রকাশ থাকে যে, إِتِّبَاعْ অর্থ এই নয় যে, পাঠকের সাথে সাথেই পাঠ করতে হবে; বরং إِتِّبَاعِ قِرَاءَةٌ অর্থ এই হবে যে, যখন পাঠক বা ইমাম قِرَاءَةٌ পড়তে শুরু করবে তখন তাকে ধীরস্থিরভাবে শুনে নেবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উক্ত আয়াত দ্বারা এ মাসআলার إِسْتِدْلَالْ করা যায় যে, ইমাম সাহেবের পিছনে মুক্তাদীগণ কেরাত পড়া নিষিদ্ধ। যেমন হযরত ইমামে আ'যম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মুক্তাদীগণের জন্য ইমমের إِتِّبَاعْ করা ওয়াজিব এবং মুক্তাদীগণ ইমামের إِتِّبَاعْ করার জন্য ইমাম নির্ধারিত করা হয়েছে। সুতরাং রুকু ও সিজদা ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে মুক্তাদীগণকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। ইমামের পূর্বে কেউ কোনো কাজ নামাজের মধ্যে করতে পারবে না।

وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوْبِ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ উক্ত আয়াতে فَاتَّبِعْ - أَمْر টি ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ-এর মধ্যে قِرَاءَةٌ-এর সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি করার কারণ : তার কারণ হচ্ছে– মূলত হযরত জিবরাঈল (আ.) যা তেলাওয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুনাতেন তা প্রকৃতপক্ষে হযরত জিবরাঈলের কেরাত নয়। হযরত জিবরাঈল (আ.) কেবল তার মাধ্যম মাত্র। মূল কালামুল্লাহর রচয়িতা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তার কালাম পাঠ করতেন। এ জন্য قِرَاءَةٌ-এর نِسْبَتْ টি হযরত জিবরাঈলের প্রতি না করে আল্লাহ নিজের প্রতি করেছেন। আল্লাহ পাঠ না করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তা পাঠ করার কোনো ক্ষমতাই রাখেন না।

১. অথবা বলা যায়, হযরত জিবরাঈলকে যদিও আপাত বর্ণনা ভঙ্গিমায় শিক্ষক বলে অনুমান হয় তথাপিও তিনি শিক্ষক নন; বরং আল্লাহর প্রদত্ত শক্তিকেই হযরত জিবরাঈল (আ.) মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রদান করেছেন। অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ সেই শক্তি পেয়ে ওহী তেলাওয়াত করেছেন।

২. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ-এর যদি সরাসরি অর্থ নেওয়া হয় তখন قَرَأْنَا-এর فَاعِل حَقِيْقِيْ আল্লাহ হয়ে থাকেন। অর্থাৎ আমিই তাঁকে পড়িয়েছি। যেহেতু দুনিয়া বস্তু জগৎ তাই কোনো একটা মাধ্যম অবলম্বন করা আবশ্যক। তাই হযরত জিবরাঈলকে প্রকাশ্য বা জাহেরী قِرَاءَةٌ-এর سَبَبْ বানানো হয়েছে। আল্লাহর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বহাল ছিল। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ অর্থাৎ আমি তাকে شِعْر শিক্ষা দেইনি। এখানে সরাসরি تَعْلِيْم-এর সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে। তদ্রূপ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ-এর মধ্যেও قِرَاءَةٌ-এর সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে সাজা হিসেবে। আর হুযূর ﷺ নিজেই বলেছেন بعثت معلما অর্থাৎ তিনি নিজেই শিক্ষক হিসাবে مَبْعُوْث সুতরাং তাঁর কেউই শিক্ষক হওয়া জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'পরে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্বে রয়েছে।' এটা হতে কতিপয় নীতিগত কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, নিম্নে তা উল্লিখিত হলো :

১. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ হতে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ থাকা ওহী ছাড়া নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে আরও জ্ঞান দান করা হতো। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যের তাৎপর্য ওহী দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হতো। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের 'ওহীকে ওহীয়ে খফী' বলা হয়।

২. কুরআনের বক্তব্যের তাৎপর্য এবং তার আদেশ, নিষেধ ও আহকামের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানিয়েছেন এ জন্য যে, রাসূল নিজের কথা ও কাজ দ্বারা লোকদেরকে কুরআন বুঝাবেন এবং কুরআনের বিধি-বিধান মতে আমল শেখাবেন। এ সম্পর্কে কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ "আর হে নবী! এই কিতাব তোমার প্রতি আমি নাজিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যেন তুমি লোকদের সম্মুখে তাদের জন্য অবতীর্ণ সেই শিক্ষা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাক।"

৩. কুরআনের শব্দসমূহের যে ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কথা ও কাজ দ্বারা তার যে শিক্ষা তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন, তা জানার একটি উপায়ই আমাদের নিকট রয়েছে, সেই উপায়টি হলো হাদীস বা সুন্নত।

কোনো কোনো আলিম কর্তৃক নামাজে কুরআন শ্রবণ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণদান : কোনো কোনো আলিম فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ আয়াত হতে এস্তেম্বাত করে বলেছেন, ইমাম যখন নামাজে কুরআন তেলাওয়াত করবেন তখন মুক্তাদীদেরকে তা শুনতে হবে। কারণ, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন তেলাওয়াত করেন তখন চুপ থেকে শুনতে বলা হয়েছে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। -[মা'আরিফুল কোরআন)

পূর্বাপর যোগসূত্র : এখান হতে আবার পূর্বের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা كَلَّا 'কখনো নয়' কথাটির তাৎপর্য হলো, বিশ্বলোক স্রষ্টা মহান আল্লাহকে তোমরা কিয়ামত সৃষ্টি করতে এবং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম মনে কর বলেই যে, তোমরা পরকালকে অস্বীকার করছ তা নয়– এ অস্বীকৃতির মূল কারণও তা নয়। আসল কারণ পরে বিবৃত হয়েছে بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ বাক্যে।

পরকাল অস্বীকৃতির দ্বিতীয় কারণ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরকাল অস্বীকারের দ্বিতীয় কারণ তুলে ধরেছেন। মানুষ এ জগতে আত্মার তাড়নায় ও লোভ-লালসার জন্য কোনো নৈতিক বাঁধনে শৃঙ্খলিত হতে চায় না। এ জগতে আনন্দ ও সুখ-সমৃদ্ধিকেই আসল ভেবে তার জন্য সমস্ত ক্ষমতা ও চেষ্টা-তদবির কেন্দ্রীভূত করে থাকে। পরকালে কি পাবে, না পাবে সে চিন্তা করে না এবং সে জন্য কষ্ট-ক্লেশ করতেও প্রস্তুত নয়। সে যেন 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য রাখ', এ জাহিলিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী। মোটকথা দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা, মায়া-মহব্বত ও এখানের জীবনকেই সব কিছু মনে করে এবং পরকাল না হওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। মূলত তার এই যুক্তি, যুক্তিই নয়। আসলে সত্যকে চাপা দেওয়া। আর বিবেকের বিশ্বাসের পরিপন্থি যুক্তিজাল বুনা। তাই আল্লাহ তা'আলা ২০ নং আয়াতে বলেছেন, তোমরা কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসের পক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন কর না কেন আসল কথা এটা নয়; বরং কিয়ামত ও পরকালকে অস্বীকার করার আসল কারণ হলো দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার জন্য পাগলপারা হয়ে যাওয়া। যাবতীয় কর্মতৎপরতা পার্থিব জীবনের জন্যই কেন্দ্রীভূত করা। এটাই হলো পরকাল। অবিশ্বাসের মূল কারণের দ্বিতীয় কারণ। এটা না হলে তোমরা অবশ্যই পরকালে বিশ্বাসী হতে এবং নৈতিক বাঁধন ও বাধ্য-বাধকতাগুলোও মেনে নিয়ে পবিত্রময় জীবন-যাপন করতে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সেদিন কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উজ্জ্বল হবে।" অর্থাৎ আনন্দ ও খুশিতে উৎফুল্ল ও আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কেননা যে পরকালের প্রতি তারা ঈমান এনেছিল তা এখন তাদের দৃঢ় প্রত্যয় অনুরূপ তাদের সম্মুখে সমুপস্থিত। যে পরকালের প্রতি ঈমান এনে তারা দুনিয়ায় অবৈধ উপায়-উপকরণ পরিহার করেছিল ও প্রকৃতই ক্ষতি স্বীকার করেছিল, তাকে চোখের সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পেয়ে তারা নিশ্চিত মনে করতে পারবে যে, তারা তাদের জীবন-আচরণ গ্রহণে নির্ভুল সিদ্ধান্তই করেছিল এবং এক্ষণে তার সঠিক, শুভ ও সর্বোত্তম ফল পাওয়ার সময় উপস্থিত

কিয়ামত দিবসে আল্লাহকে দেখার প্রমাণ : اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'তারা নিজেদের প্রতিপালকের দিকে তাকাতে থাকবে,' এটি হতে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনরা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দীদার লাভ করবেন। কাফির-মুনাফিকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে কি পাবে না; এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। জান্নাতিরা সকলেই আল্লাহর দীদার লাভ করবেন। তবে স্তর অনুযায়ী কেউ দৈনিক দু'বার, কেউ একবার, কেউ সপ্তাহে একবার লাভ করবেন।

গোটা উম্মাতে মুসলিমার এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, দুনিয়াতে কেউ স্বীয় চোখে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করতে পারবে না। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কিনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। একদল বলেছেন, নিজ চোখেই দেখেছেন, অপরদল বলেছেন অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছেন। এ দ্বিতীয় মতটাকেই সত্য বলে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম মন্তব্য করেছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ নূর কিভাবে দেখবো?
–[শারহু আক্বীদাতুত্ ত্বাহাবিয়া, কুরতুবী]

অতীব দুঃখের বিষয় বর্তমানে এ দেশের কিছু কিছু ভণ্ডপীর দাবি করছে যে, তারা আল্লাহকে দেখতে পায়। তারা কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে এবং জাল হাদীস দ্বারা তাদের বক্তব্য প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে সচেতন আলিম সমাজের প্রতিবাদ করা অপরিহার্য। দুনিয়ার চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়, সেই কারণে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহকে দেখতে চাইলে আল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। যেমন, আল্লাহর বাণী–

قَالَ رَبِّ أَرِنِيْٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِيْ .

'তখন (মূসা) বলল, হে আমার রব আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পার না।' কুরআনের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে– لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ 'দৃষ্টিশক্তিসমূহ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন, তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এ সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।'

আখেরাতে আল্লাহকে দেখার মতো যোগ্যতা ও গুণাবলি দেওয়া হবে। সেখানে চোখের এ দুর্বলতা থাকবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত। –[শরহুল আক্বীদাহতু ত্বাহাবিয়া, আক্বীদাতুল মু'মিন আল-আক্বীদাতুল ইসলামিয়া ওয়া উসুসিহা]

قَوْلُهُ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ ...... بِهَا فَاقِرَةٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে বিষণ্ন। তারা ধারণা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার আচরণ করা হবে।"

অর্থাৎ পরকাল অস্বীকারকারী কাফির-মুশরিকদের চেহারা সেদিন বিষণ্ন হয়ে পড়বে, যখন তারা জানতে পারবে তাদের স্বীয় আমলনামা সম্বন্ধে। তারা আরও মনে করবে যে, আজও তাদেরকে কঠোর আজাব ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যে শাস্তি তাদের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ভেঙ্গে দিতে পারে। কালবী বলেছেন, 'ফাকেরা' অর্থ তাদের প্রভুকে তারা দেখতে পাবে না, কারণ পর্দা টাঙ্গানো হবে (কাবীর)। কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ "কখনো নয়, তারা (গুনাহগার লোকেরা) এদিন নিজেদের রবকে দর্শন হতে বঞ্চিত হবে। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারগণ প্রথম অর্থই গ্রহণযোগ্য মনে করেন।" –[সূরা আল-মুত্বাফ্‌ফিফীন : আয়াত ১৫]

অনুবাদ :

٢٦. كَلَّا بِمَعْنَى أَلَا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ التَّرَاقِيَ عِظَامَ الْحَلْقِ .

২৬. না كَلَّا শব্দটি أَلَا অর্থে ব্যবহৃত যখন পৌঁছাবে প্রাণ কণ্ঠদেশে কণ্ঠস্থিত হাড় পর্যন্ত।

٢٧. وَقِيلَ قَالَ مَنْ حَوْلَهُ مَنْ رَاقٍ يُرْقِيهِ لِيَشْفَى .

২৭. আর বলা হবে আশপাশের লোকজন বলবে কে রক্ষা করবে তাকে আরোগ্য দান করে রক্ষা করবে।

٢٨. وَظَنَّ أَيْقَنَ مَنْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ ذٰلِكَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ فِرَاقُ الدُّنْيَا .

২৮. আর সে ধারণা করবে প্রত্যয় জাগবে, সেই ব্যক্তি যার প্রাণ এ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে, এটা বিদায়ের সময়।

٢٩. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ أَيْ إِحْدٰى سَاقَيْهِ بِالْأُخْرٰى عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْتَفَّتْ شِدَّةُ فِرَاقِ الدُّنْيَا بِشِدَّةِ إِقْبَالِ الْآخِرَةِ .

২৯. এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে অর্থাৎ মৃত্যুকালে তার এক পা অপর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে কিংবা দুনিয়া হতে বিদায় ও আখেরাতে প্রবেশের কঠোরতা একত্র হবে।

٣٠. إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ أَيِ السَّوْقُ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى الْعَامِلِ فِيْ إِذَا الْمَعْنٰى إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ الْحُلْقُوْمَ تُسَاقُ إِلٰى حُكْمِ رَبِّهَا .

৩০. সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাগমন سَاقٌ শব্দটি سَوْقٌ অর্থে ব্যবহৃত, আর এ বাক্যটি إِذَا -এর عَامِلٌ -এর প্রতি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ প্রাণ যখন কণ্ঠদেশে পৌঁছাবে, তখন তার হুকুম পানে অগ্রসর হবে।

٣١. فَلَا صَدَّقَ الْإِنْسَانُ وَلَا صَلّٰى أَيْ لَمْ يُصَدِّقْ وَلَمْ يُصَلِّ .

৩১. সে বিশ্বাস করেনি মানুষেরা এবং সালাত আদায় করেনি অর্থাৎ বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি।

٣٢. وَلٰكِنْ كَذَّبَ بِالْقُرْاٰنِ وَتَوَلّٰى عَنِ الْإِيْمَانِ .

৩২. বরং অসত্যারোপ করেছে কুরআনের প্রতি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঈমান আনয়ন করা হতে।

٣٣. ثُمَّ ذَهَبَ إِلٰى أَهْلِهِ يَتَمَطّٰى يَتَبَخْتَرُ فِيْ مِشْيَتِهِ إِعْجَابًا .

৩৩. অতঃপর তার পরিবার-পরিজনের নিকট সদর্পে ফিরে গেছে আত্ম অহঙ্কারের সাথে সদর্পে হেঁটেছে।

তাহকীক ও তারকীব

إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ এবং وَقِيلَ الخ - وَظَنَّ এবং وَالْتَفَّتِ الخ - شَرْط -এর স্থলাভিষিক্ত। আর إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ বাক্যটি হলো جَزَاء।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ : كَلَّا 'কখনো না' বলার তাৎপর্য এই যে, পরকাল অস্বীকারকারী কাফেরগণের ঈমান গ্রহণ কোনো সহজ ব্যাপার নয় তা সুদূর পরাহত। সুতরাং তাদের ঈমান আনয়নের আশা বৃথা।

اَلتَّرَاقِىْ শব্দটি تَرْقُوَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– কণ্ঠনালী। এখানে تَرَاقِىْ শব্দটি بَلَغَتْ -এর مَفْعُوْل হয়েছে। তার فَاعِلْ -কে বোধগম্য হওয়ার ফলে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন– فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمُ -এ উহ্য রাখা হয়েছে– একই কারণে। تَقْدِيْر হলো إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ التَّرَاقِىَ অর্থাৎ যখন প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে পৌছবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ : আয়াতে رَاقٍ শব্দটির মূল হলো رُقْيَةٌ তার দু'টি অর্থ। একটি হচ্ছে তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁককারী। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে উর্ধ্বে আরোহণকারী। প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হলে, আয়াতের মর্ম হবে, মৃত্যুর সময় রোগীর জীবন বাঁচাবার জন্য ঔষধপত্র হতে নিরাশ হয়ে নিকটবর্তী লোকগণ বলবে, ঔষধে কোনো কাজ হবে না। তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁককারী কে আছে তাকে ডেকে আনো। তাকে তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁক দ্বারা হয়তো রক্ষা করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ এই হয় যে, মৃতব্যক্তির রূহ আজাবের ফেরেশতাগণ কবজ করবে, না রহমতের ফেরেশতা কবজ করবে– তা নিয়ে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ হবে। পরিশেষে লোকটি নেককার হলে রহমতের ফেরেশতা প্রাণ হরণ করে নেবে। আর তা না হলে প্রাণ হরণ করবে আজাবের ফেরেশতা।

কেউ কেউ বলেছেন, "এ রূহকে নিয়ে যাবে" এ কথাটি মালাকুল মাউত ফেরেশতা বলবেন, কারণ কাফেরদের প্রাণ নিয়ে যেতে ফেরেশতারা অস্বীকৃতি জানাবে, তারা কাফেরদের প্রাণের কাছেও যেতে চাইবে না। তা দেখে মালাকুল মাউত প্রথমে বলবে "এটা কে নিয়ে যাবে।" পরে কোনো একজন ফেরেশতাকে তিনি নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন, তখন সে ফেরেশতা অগত্যা নিয়ে যাবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ : উক্ত আয়াতাংশের কয়েকটি তাফসীর বর্ণনা রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন (র.) বলেন, মৃত্যুর সময় মৃত্যুযন্ত্রের তাড়নায় দিশাহারা হয়ে ভয়ভীতির পরে পড়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি এক পাকে অপর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে খিঁচিয়ে যাওয়াকেই اِلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অথবা, দুনিয়ার মৃত্যুযন্ত্রণা ও আখেরাতের যন্ত্রণার সম্মিলিত কঠিন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার মৃত্যুযন্ত্রণায় এবং আখেরাতের শাস্তির ভীষণ অবস্থায় তার পায়ের গুচ্ছসমূহ উলটপালট হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। –[কাবীর]

* মা'আরিফ গ্রন্থকারের মতে এর অর্থ হলো, একটি পাকে অপর পায়ের সাথে মিলিয়ে ফেলা। আর মৃত্যুর কঠিনতার কারণে হাতে হাত এবং পা পায়ের উপর এভাবে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এদিক সেদিক মারতে থাকবে।
* হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এর দ্বারা জীবন ও মৃত্যুর সম্মিলিত ঘণ্টাকে বুঝানো হয়েছে।
* হযরত হাসান (র.) বলেন, এর দ্বারা মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির পদযুগলের নালা দু'টি শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো শুকিয়ে একত্র হয়ে যাবে।
* সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) বলেন, এর অর্থ হলো মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তিকে কাফন পরিয়ে পদযুগলকে কাফনসহ টেনে হেঁচড়ে বাঁধাকে বুঝানো হয়েছে। –[মাদাবিক. খাযেন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَا صَدَّقَ ...... اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিন্তু না সে সত্য মেনে নিল, না সালাত আদায় করল, বরং [সত্যকে] মিথ্যা মনে করল, [মেনে নিতে অস্বীকার করল] এবং ফিরে গেল। পরে অহমিকা সহকারে নিজের ঘরের লোকদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

কে এই লোক যার সম্বন্ধে এইসব কথাবার্তা বলা হয়েছে? কোন কোন তাসীরকারকের মতে 'মানুষ কি মনে করে যে, আমরা তার অস্থিগুলো একত্র করতে পারবো না।' এতে যে মানুষের কথা বলা হয়েছে এখানেও সে মানুষটি উদ্দেশ্য। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ বলেন, এ ব্যক্তি ছিল আবূ জাহল। আয়াতের শব্দসমূহ হতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এখানে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সে সূরা আল-কিয়ামার উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করার পর এ আচরণই গ্রহণ করেছিল।

নামাজের গুরুত্ব এবং তা ঈমানের দাবি হওয়া : এ আয়াতে فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى "না সে সত্য মেনে নিল, না সালাত আদায় করল" বাক্যটি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। তা হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের সত্যতা মেনে নেওয়ার ও তার প্রতি ঈমান আনার প্রাথমিক ও অনিবার্য দাবি হচ্ছে রীতিমত সালাত আদায় করা। আল্লাহর শরিয়তের অন্যান্য বিপুল ও ব্যাপক আইন-বিধান পালন করার পর্যায় তো পরে আসে। ঈমানের পরপরই অনতিবিলম্বে সালাতের সময় উপস্থিত হয় এবং তখনই জানতে পারা যায় যে, মুখে যে সত্যের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে ও মেনে নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবিকই তার অন্তরের প্রতিধ্বনি না একটা মৌখিক কথা মাত্র, যা কতিপয় শব্দের মাধ্যমে তার মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছে এবং ধ্বনিত ও উচ্চারিত হয়েছে। সালাতই হলো ঈমানের বাস্তব প্রমাণ।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى বাক্যটি কিসের উপর عَطْف করা হয়েছে? : আল্লামা যামাখশারীর মতে এ বাক্যটি يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ বাক্যের উপর عَطْف হয়েছে। সুতরাং বাক্যের অর্থ হলো, যে পরকালের কথা বলছে সে পরকাল কবে আসবে? [এটা ঠাট্টা করে এবং পরকাল অস্বীকার করারচ্ছলে বলা হয়েছে।] অতঃপর সে দীনের মূল অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করেনি এবং অন্যতম দাবি অর্থাৎ নামাজ আদায় করেনি। –[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٣٤. اَوْلٰى لَكَ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْكَلِمَةُ اِسْمُ فِعْلٍ وَاللَّامُ لِلتَّبْيِيْنِ اَىْ وَلِيَكَ مَا تَكْرَهُ فَاَوْلٰى اَىْ فَهُوَ اَوْلٰى بِكَ مِنْ غَيْرِكَ .

৩৪. তোমার জন্য দুর্ভোগ এখানে صِيْغَهٔ غَائِبْ হতে صِيْغَهٔ حَاضِرْ -এর প্রতি اِلْتِفَاتْ হয়েছে। আর اَوْلٰى শব্দটি اِسْمِ فِعْلْ আর لَامْ টি بَيَانِيَهْ অর্থাৎ তোমার দুর্ভোগ আগত হয়েছে। এবং দুর্ভোগ অর্থাৎ অন্যের তুলনায় তুমিই এর উপযুক্ত।

٣٥. ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى تَاكِيْدٌ .

৩৫. পুনরায় তোমার জন্য দুর্ভোগ এবং দুর্ভোগ এটি تَاكِيْد হিসাবে দ্বিরুক্ত হয়েছে।

٣٦. اَيَحْسَبُ يَظُنُّ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى هَمَلًا لَا يُكَلَّفُ بِالشَّرَائِعِ اَىْ لَا يَحْسَبُ ذٰلِكَ .

৩৬. তবে কি ধারণা করে মনে করে মানুষেরা যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে অর্থহীনভাবে এবং কোনো শরিয়তের অনুসরণে বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। অর্থাৎ এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়।

٣٧. اَلَمْ يَكُ اَىْ كَانَ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنٰى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ تُصَبُّ فِى الرَّحِمِ .

৩৭. সে কি ছিল না يَكُ ক্রিয়াটি كَانَ অর্থে স্খলিত শুক্রবিন্দু يُمْنٰى শব্দটি يَا ও تَا যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। জরায়ু নিক্ষিপ্ত শুক্রবিন্দু।

٣٨. ثُمَّ كَانَ الْمَنِىُّ عَلَقَةً فَخَلَقَ اللّٰهُ مِنْهَا الْاِنْسَانَ فَسَوّٰى عَدَّلَ اَعْضَاءَهُ .

৩৮. অতঃপর ছিল সে শুক্রবিন্দু জমাট রক্ত, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করেন আল্লাহ তা'আলা তা হতে মানুষ। এবং সুবিন্যস্ত করেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সামঞ্জস্যশীল করে

٣٩. فَجَعَلَ مِنْهُ مِنَ الْمَنِىِّ الَّذِىْ صَارَ عَلَقَةً اَىْ قِطْعَةَ دَمٍ ثُمَّ مُضْغَةً اَىْ قِطْعَةَ لَحْمٍ الزَّوْجَيْنِ النَّوْعَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى يَجْتَمِعَانِ تَارَةً وَيَنْفَرِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ تَارَةً .

৩৯. তৎপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন শুক্রবিন্দু হতে য আলাকা অর্থাৎ জমাট রক্ত এবং তারপর মাংসপিণ্ড অর্থাৎ এক খণ্ড মাংসে পরিণত হয়েছিল যুগল দুই প্রকার নর ও নারী কখনো উভয়টি একত্র হয়, অব কখনো পৃথক পৃথক।

٤٠. اَلَيْسَ ذٰلِكَ الْفَعَّالُ لِهٰذِهِ الْاَشْيَاءِ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى قَالَ ﷺ بَلٰى .

৪০. তিনি কি এ সকল কার্য সম্পাদনকারী সত্তা মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করায় সক্ষম নন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَوْلٰى : প্রথম اَوْلٰى لَكَ হতে ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى টি تَاكِيْد হয়েছে। -[কাবীর] যেমন বলা হয়- فَوَيْلٌ لَكَ فَوَيْلٌ لَكَ ثُمَّ وَيْلٌ لَكَ فَوَيْلٌ لَكَ

قَوْلُهُ اَيَحْسَبُ الخ : এটা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হয়েছে اَىْ لَا يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى এখানে سُدًى শব্দটি حَالْ হয়েছে يُتْرَكَ হতে।

قَوْلُهُ اَلَمْ يَكُ : এতে اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ হয়েছে। আর نُطْفَة টি يَكُ ফে'ল হতে حَالْ হবে। عَلَقَةً টি كَانَ -এর اِسْم হতে حَالْ হবে।

قَوْلُهُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى : এটা اَلزَّوْجَيْنِ হতে بَيَانٌ হবে।

قَوْلُهُ أَلَيْسَ ذٰلِكَ الخ : এটাও اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ হয়েছে।

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً -এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর اَلَمْ يَكُ অর্থাৎ يَا ، সহকারে এবং اِنْسَان -কে- ضَمِيْر -এর- مَرْجِعْ হিসাবে পড়েছেন। আর হাসান বসরী সম্বোধন হিসাবে اَلَمْ تَكُ অর্থাৎ تَا ، দিয়ে পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

تُمْنٰى -এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর تَا ، দিয়ে এবং نُطْفَةً -কে- ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হিসাবে تُمْنٰى পড়েছেন, আর হাফস, ইবনে মুহাইসেন, মুজাহিদ, ইয়াকূব ضَمِيْر -এর- مَرْجِعْ - منى হিসাবে يَا ، দিয়ে يُمْنٰى পড়েছেন। এটা ইবনে ওমর হতেও বর্ণিত আছে। আবূ হাতিম এটাকে পছন্দ করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

بِقَادِرٍ ও اَنْ يُحْيِىَ -এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর এ শব্দটিকে بِقَادِرٍ পড়েছেন। যায়েদ ইবনে আলী তাকে يَقْدِرُ অর্থাৎ فِعْل مُضَارِعْ হিসাবে পড়েছেন।

আর يُحْيِ শব্দটিকে জমহুর اَنْ দ্বারা مَنْصُوْب করে يُحْيِ পড়েছেন। আর তালহা ইবনে সোলাইমান, ফাইয়ায ইবনে গাযওয়ান তাকে تَخْفِيْف করে سَاكِنْ যুক্ত করে يُحْيِ পড়েছেন। অথবা وَقْف -এর স্থানে وَصْل করে পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ [জাহান্নামের উপর উনিশজন পাহারাদার রয়েছে।] আয়াত নাজিল করেন, তখন আবূ জাহল কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের মাতা তোমাদেরকে নিপাত করুক। অপর দিকে ইবনে আবূ কাবশা বলে উঠল যে, মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামে উনিশজন প্রহরী নির্ধারিত রয়েছে। অথচ তোমরা তো অনেকজন রয়েছ, তোমরা দশজন মিলেও কি জাহান্নামের একজন প্রহরীকে নিধন করতে পারবে না?

এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট ওহী প্রেরণ করে বললেন, আবূ জাহল আপনার নিকট আসছে। সুতরাং আপনি তাকে শুনিয়ে দিন أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ثُمَّ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى তুমিই অভিশপ্ত হও, তোমার নিপাত যাক, অনন্তর তোমার নিপাত যাক, তোমার নিপাত ঘটুক।

قَوْلُهُ تَعَالٰى أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى : তাফসীরকারদের হতে এ কথাটির অর্থে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। কতক বলেন, এর অর্থ দুর্ভোগ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, তোমার জন্য দুর্ভোগের পর দুর্ভোগ, অন্তহীন দুর্ভোগ। কতক বলেন, এর অর্থ অভিশপ্ত। সুতরাং এর অর্থ হবে, অভিশপ্ত তুমি, অভিশপ্ত। অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহর অনন্ত লানত। কেউ কেউ এর অর্থ ধ্বংস ও বিপর্যয়ও বলে থাকেন। সকল কথার অর্থ মূলত একই। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এর মর্ম হলো– আবূ জাহলকে বলা হয়েছে, তুমি যখন সৃষ্টিকর্তা, কিয়ামত ও পরকালকে অস্বীকার করেছ, তখন তোমার জন্য এ চালচলনই শোভা পায় যা তুমি অবলম্বন করেছ। আসলে এ কথাটি একটি বিদ্রূপাত্মক কথা।

এ কথাটি প্রথমত কার হতে প্রকাশ পেয়েছে, সে সম্পর্কে সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, অভিশপ্ত হও তুমি (أَوْلٰى لَكَ) কথাটি কি নবী করীম ﷺ আবূ জাহলকে নিজ পক্ষ হতে বলেছেন, না আল্লাহর হুকুমে বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, প্রথমত নবী করীম ﷺ নিজ পক্ষ হতেই বলেছেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা অবতীর্ণ করেছেন। –[মা'আলিম, খাযেন, কাছীর, লোবাব]

قَوْلُهُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى : سُدًى শব্দের অর্থ হলো مُهْمَلٌ নিরর্থক, যাকে কোনো আদেশ-নিষেধ কিছুই করা হয় না। আরবি ভাষায় اِبل سدى বলা হয় ঐ সব উটকে যা বিনা কাজে ছেড়ে দেওয়া হয়, এমনিতেই সে ঘুরে বেড়ায় যাকে বলগা উটও বলা হয়।

সুতরাং আয়াতের তাৎপর্য হবে মানুষ কি আল্লাহর সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহ সারা জীবন উপভোগ করে এবং সকল বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে চলবার পর পরকালে তাদেরকে এমনিতেই অহেতুক ছেড়ে দেওয়া হবে, তার কি কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না? তার কি কৃত-কর্মের খেসারত দিতে হবে না? তাদেরকে কি কর্তব্য ও দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই বের করা যেতে পারে যে, মানুষ যেন এ ধারণা না করে যে, তাদের ইহকালীন স্বাধীনতা পেয়ে তারা মত্ত হয়ে জীবন যাপন করেই চলবে; বরং তারা সকল কৃতকর্মের তিলে তিলে হিসাব দিতেই হবে। তারা কোনো চতুষ্পদ জন্তু অথবা ইতর প্রাণী নয়, সুতরাং ইতর প্রাণী অথবা অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় তাদেরকে বিনা হিসাবে মাটির সাথে মিশিয়ে যেতেও নির্দেশ দেওয়া হবে না।

أَنْ يُتْرَكَ سُدًى -এর অর্থ : আরবি ভাষায় سُدًى বলা হয় ঐ সব উষ্ট্রকে যা অর্থহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং যার কোনো চালক থাকে না, লাগামহীন অবস্থায় থাকে। উপরিউক্ত ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে- মানুষ কি ভাবে যে, তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে? এর তাৎপর্য হলো জন্তু-জানোয়ারগুলোর জীবনের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এ পার্থিব জীবনে তাদের উপর কোনো নৈতিক বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়নি। তারা নিজেদের স্বভাবের স্বাভাবিক তাকিদে চলাফেরা করে। তাদেরকে কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়নি কোনো ইচ্ছা ও স্বাধীনতা। এ কারণে তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরুজ্জীবনের কোনো প্রয়োজন থাকে না। তাদের জন্য জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারণ করা হয়নি। হে মানুষ! তোমরাও কি নিজদেরকে জন্তু-জানোয়ারের মতো ভাবলে যে, তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা হবে না এবং তোমরা তাদের ন্যায়ই মাটির সাথে মিশে যাবে, তোমাদের কর্মের কোনো ফলাফল ঘোষণা করা হবে না এবং জান্নাত-জাহান্নাম তোমাদের জন্য রাখা হয়নি; তোমাদেরকে এ জগতে জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় এমনি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এ জগতে তোমাদের কোনো নৈতিক বাধ্য-বাধকতা ও দায়িত্ব পালন করতে হবে না? এটা তোমাদের ভুল ধারণা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এ পার্থিব জগতেই যদি একটি অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি হওয়া তোমাদের বিবেক সাক্ষ্য দেয়, তবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুন তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না, তা বুঝলে কোন বিবেকে?

কোনো কোনো তাফসীরকার এর তাফসীর করেছেন, "লোকেরা কি মনে করছে যে, তাদেকে কবরে অনর্থক চিরকালের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। আর কখনো তাদেরকে বিচারের জন্য উত্তোলন করা হবে না। এ রকম মনে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।" -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَمْ يَكُ .... يُحْيِ الْمَوْتَى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সে কি নিকৃষ্টতম পানির একটি শুক্র ফোঁটা ছিল না, যা মায়ের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়? পরে তা একটি মাংসপিণ্ড হলো। পরে আল্লাহ তার দেহ বানালেন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ও সংগতিপূর্ণ করে দিলেন। পরে তা হতে পুরুষ ও নারী দুই ধরনের (মানুষ) বানালেন। এ আল্লাহ মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?

মৃত্যুর পর জীবন যে সম্ভবপর, এটাই তার অকাট্য প্রমাণ। প্রাথমিক শুক্রকীট হতে সৃষ্টিকার্য শুরু করার পর একটি পূর্ণাঙ্গ মানব দেহ বানিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই নিজস্ব কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলতার অনিবার্য ফলশ্রুতি- এ কথা যারা মনেপ্রাণে সত্য মেনে নিয়েছে, তাদের নিকট এ প্রমাণটির জবাবে বলবার মতো কোনো কথাই নেই। কেননা যে আল্লাহ এভাবে মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন, তিনি যে পুনরায় এ মানুষকেই অস্তিত্ব দিতে পারেন- তারা যত ধৃষ্টতাই দেখাক না কেন, তাদের বিবেক-বুদ্ধি এটা মেনে নিতে কখনো অস্বীকৃত হতে পারে না। তবে যারা এ বিজ্ঞানসম্মত কার্যক্রমকে নিছক দুর্ঘটনা বলে সাব্যস্ত করে, তারা যদি নিতান্ত হটকারী না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের নিকট কঠিন প্রশ্ন তুলতে চাই। সৃষ্টির সূচনা হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতিটি অংশে ও প্রতিটি জাতিতে একই ধরনের সৃষ্টিকর্মের ফলে মেয়ে সন্তান ও পুরুষ সন্তানের জন্ম ক্রমাগত এমন হারে সংঘটিত হয়ে চলছে যার ফলে কোনো সমাজেই কেবল মেয়ে বা কেবল ছেলেরই জন্ম হয়নি। কেননা তাহলে ভবিষ্যতে তার বংশধারা সম্পূর্ণ অচল হয়ে যেত। সৃষ্টিকর্ম কেবল মাত্র দুর্ঘটনা সঞ্জাত হলে এটা কিরূপে সম্ভবপর হচ্ছে? এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া কি তাদের পক্ষে সম্ভবপর? মেয়ে ও ছেলের আনুপাতিক হারে জন্মগ্রহণও কি একটা দুর্ঘটনারই ফলশ্রুতি? যদি তাই বলা হয় তাহলে বলবো এটা একটা নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক দাবি। এরূপ দাবি একজন নিতান্ত নির্লজ্জ ও দায়িত্বহীন ব্যক্তিই করতে পারে। যদি কেউ দাবি করে বলে যে, লন্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো ও পিকিং প্রভৃতি দুনিয়ার বড় বড় শহর-নগর কেবলমাত্র দুর্ঘটনার ফলেই গড়ে উঠেছে তবে তা যতটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে তাও ঠিক সেই পর্যায়েরই একটি দাবি।

سُوْرَةُ الْاِنْسَانِ/الدَّهْرِ : সূরা আল-ইনসান/আদ্-দাহার

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির দু'টি নাম রয়েছে– একটি হলো اَلدَّهْرُ [আদ্-দাহার] আরেকটি নাম হলো اَلْاِنْسَانُ [আল-ইনসান]। আর এ দু'টি শব্দই অত্র সূরার প্রথম আয়াতে রয়েছে। এ দু'টি শব্দ হতেই এ দু'টি নাম গৃহীত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا আর কেউ কেউ কেবল اَلْاِنْسَانُ নামেই এটাকে ভূষিত করেছেন। তবে তাও যথার্থ। কেননা অত্র সূরায় যে আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে, তাতে মানুষের জীবন বৃত্তান্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব হতে আজীবন কালের অবস্থা এবং মৃত্যুর পর বেহেশত ও দোজখের যাবতীয় সুখ-দুঃখ কার ভাগ্যে কি ঘটবে সেই মর্মে ব্যক্তি বিশেষ, অবস্থা বিশেষ, সময় বিশেষ সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাই উভয় নামেই নামকরণ করা যথার্থ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ৩১টি আয়াত, ২৪০টি বাক্য ও ১০৫৪টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার অবতীর্ণকাল সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্ন মতামত জাহির করেছেন। তবে আল্লামা যামাখশারী, ইমাম রাযী, কাজি বাইযাবী, আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছীর, আল্লামা নিযামুদ্দীন নীশাপুরী (র.) প্রমুখ আরও বহু কয়জন তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) -এর মতে তা সর্বসমর্থিত মতামত বলে গৃহীত। আর কেউ কেউ গোটা সূরাটিকে মাদানী বলে অভিহিত করেছেন। আবার কারো কারো মতে ৮ – ১০ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাকি অংশ মক্কায় অবতীর্ণ। কারো কারো মতে এটা মাক্কী সূরাসমূহের শেষগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারো মতে তার আয়াত قَوْلُهُ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ব্যতীত অবশিষ্ট সকল আয়াত মাদানী। (এটা হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা (র.)-এর অভিমত।) কেউ কেউ বলেন, প্রথম হতে ২৩ নং আয়াত অর্থাৎ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا পর্যন্ত আয়াতগুলো মাক্কী এবং বাকি আয়াতগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য হলো– এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায় এবং তার অবস্থানের স্বরূপ কি? তাদেরকে এ জগতে কেন পাঠানো হয়েছে, এখানে তাদের কর্তব্য কি? এ জগতে তাদেরকে কুফরের পথ ও ঈমানের পথ এ দু'য়ের কোনো একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে– যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করবে তাদের পুরস্কার পরকালে কি হবে এবং যারা কুফরের পথ গ্রহণ করবে তাদের পরিণাম ফলাফল কি হবে, এসব বিষয়ই এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে।

১-৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন নর-নারীর দেহাভ্যন্তরে অণু আকারে শুক্রকীটরূপে অবস্থান করছিল, তখন তারা উল্লেখযোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে নর-নারীর মিলিত শুক্রের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো পার্থিব জীবনটিকে তাদের জন্য একটি পরীক্ষাগার করা। এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই তাদেরকে চক্ষু ও কর্ণ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ভালোমন্দ দেখতে ও শুনতে পায়। আর তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে তাদের নিকট নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা সঠিক পথ কোনটি তা জানবার সুযোগ পায়। সুতরাং এরপর তাদেরকে এ দুনিয়ার জীবনে ভালোমন্দ, ঈমানী ও কুফরি পথের যে কোনো একটি পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে তারা কুফরির পথ গ্রহণ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ঈমানের পথও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যারা কুফরির পথ গ্রহণ করে অকৃতজ্ঞ হবে তাদের শাস্তির জন্য শৃঙ্খল-বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত রয়েছে। আর যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করে নেককার হবে তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে চিরন্তন জান্নাত। তাতে তারা কাফুর মিশ্রিত পানীয় পান করবে।

৭-২২ নং আয়াতে মু'মিন বান্দাদের প্রশংসা করে জান্নাতে তাদের অপূর্ব ও অফুরন্ত অর্থ নিয়ামতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আমার মু'মিন বান্দাগণ আমার নামে যে মান্নত করে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তারা এতিম, মিসকিন ও বন্দীগণকে পানাহার করায় দুনিয়ার কোনো স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য নয়; বরং নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও আশা তারা করে না। তারা ভয়াবহ কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশের ভয় করে। সুতরাং পরকালে তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে পরম আনন্দ ও সুখ ভোগ করবে, তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তাদেরকে এ জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতরাজি– আল্লাহর পথে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনের প্রতিদানে দেওয়া হবে। তথায় তারা রেশমবস্ত্র পরিধান করবে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার তাদের দেহে শোভা পাবে। তাদের সেবাযত্নের জন্য থাকবে হুর-গেলমান। তাদের জন্য উন্নত মানের পানীয়ের ব্যবস্থা থাকবে। তাদের আসবাবপত্রগুলো হবে রৌপ্য নির্মিত ও কাঁচের আসবাব। হে নবী! আপনি যদি এ সব দেখেন, তবে দেখবেন কেবল অথৈ ও রাশি রাশি নিয়ামত এবং বিশাল সাম্রাজ্য। এ সব নিয়ামত আপনাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ এবং আপনাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে প্রদান করা হবে।

২৩–৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআন আমারই কালাম। আমিই বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুসারে খণ্ড খণ্ড করে তা অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং কাফেরগণ যা কিছুই বলুক সেদিকে কর্ণপাত করবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকুন। আপনি পাপিষ্ঠ ও কাফের লোকদের কথা মেনে চলবেন না। আপনি সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের স্মরণে থাকুন এবং রাত্রিকালে দীর্ঘক্ষণ নামাজে অতিবাহিত করুন। কাফেরগণ এ দুনিয়াকে অতিশয় ভালোবাসে বলেই পরকালকে ছেড়ে দিয়েছে। এ কাফের পাপিষ্ঠগণকে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে আমি পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। বস্তুত আমার এ কুরআন হচ্ছে উপদেশ ভাণ্ডার। যার ইচ্ছা হয় সে তার উপদেশ গ্রহণ করে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করুক; অথবা তাকে পরিহার করুক। এ ব্যাপারে মানুষকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন রাখা হয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন; কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরদের প্রতি রয়েছে তাঁর নির্মম চিরন্তন শাস্তি। অতএব, হে মানবকুল সাবধান!

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বর্ণনা রয়েছে। মানুষকে তিনি তাঁর বিশেষ কুদরতে অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর মানুষের সম্মুখে তিনি হেদায়েত ও গোমরাহীর দু'টি স্বতন্ত্র পথ তুলে ধরেছেন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং হেদায়েতের পথ গ্রহণ করে সে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত লাভ করবে। যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে না, হেদায়েতের স্থলে গোমরাহীকে গ্রহণ করবে তার শাস্তি অবধারিত। –[নূরুল কোরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. هَلْ قَدْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ اٰدَمَ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا كَانَ فِيْهِ مُصَوَّرًا مِنْ طِيْنٍ لَا يُذْكَرُ اَوِ الْمُرَادُ بِالْاِنْسَانِ الْجِنْسُ وَبِالْحِيْنِ مُدَّةُ الْحَمْلِ .

٢. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق اَخْلَاطٍ اَىْ مِنْ مَّاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْءَةِ الْمُخْتَلَطَيْنِ الْمُمْتَزِجَيْنِ نَّبْتَلِيْهِ نَخْتَبِرُهُ بِالتَّكْلِيْفِ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ اَوْ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَىْ مُرِيْدِيْنَ اِبْتِلَاءَهُ حِيْنَ تَاَهُّلِهِ فَجَعَلْنٰهُ بِسَبَبِ ذٰلِكَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا .

٣. اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ بَيَّنَّا لَهُ طَرِيْقَ الْهُدٰى بِبَعْثِ الرُّسُلِ اِمَّا شَاكِرًا اَىْ مُؤْمِنًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا حَالَانِ مِنَ الْمَفْعُوْلِ اَىْ بَيَّنَّا لَهُ فِىْ حَالِ شُكْرِهٖ اَوْ كُفْرِهِ الْمُقَدَّرَةِ وَاِمَّا لِتَفْصِيْلِ الْاَحْوَالِ .

অনুবাদ :

১. নিঃসন্দেহে هَلْ অব্যয়টি قَدْ অর্থে মানুষের উপর এসেছিল আদমের কালপ্রবাহে এমন এক সময় চল্লিশ বছর যখন ছিল না সে সময় সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু সে সময় সে মৃত্তিকা নির্মিত এক পুতুল বিশেষ ছিল, যা কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না। অথবা اِنْسَانْ শব্দ দ্বারা মনুষ্যজাতি উদ্দেশ্য, আর حِيْن সময় দ্বারা গর্ভকালীন সময় উদ্দেশ্য।

২. আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মনুষ্যজাতিকে মিলিত শুক্রবিন্দু হতে সংমিশ্রিত অর্থাৎ নর ও নারীর শুক্রবিন্দুকে সংমিশ্রিত করে তা হতে তাকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে শরিয়তের বাধ্যানুগত করার মাধ্যমে পরীক্ষা করার জন্য। আর এ বাক্যটি مُسْتَانِفَه অথবা حَال مُقَدَّرَه অর্থাৎ তার উপযুক্ততা লাভের পর তাকে শরিয়তের বাধ্যানুগত করার উদ্দেশ্যে সুতরাং আমি তাকে করেছি এ কারণে শ্রবণ ও দৃষ্টশক্তি সম্পন্ন।

৩. আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। রাসূল প্রেরণ করে তাকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে মু'মিন হবে না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে শব্দ দু'টি مَفْعُوْل হতে حَالْ অর্থাৎ তার কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা উভয় অবস্থায় আমি তার জন্য হেদায়েতের পথ স্পষ্ট করে দিয়েছি। اِمَّا হলো تَفْصِيْل اَحْوَالْ -এর জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَمْ يَكُنْ شَيْـئًا مَّذْكُوْرًا : لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوْرًا বাক্যটি اَلْاِنْسَانُ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। অথবা حِيْنٌ -এর صِفَتٌ এর হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ نَبْتَلِيْهِ : نَبْتَلِيْهِ বাক্যটি خَلَقْنَا -এর فَاعِلٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب অর্থাৎ مُرِيْدِيْنَ اِبْتِلَائَهُ - তাকে اَلْاِنْسَانُ হতেও حَالٌ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ نَبْتَلِيْهِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَبِالتَّكَالِيْفِ -

قَوْلُهُ تَعَالٰى "شَاكِرًا" وَ "كَفُوْرًا" : شَاكِرًا وَكَفُوْرًا শব্দদ্বয় مَنْصُوْب হয়েছে مَفْعُوْل -এর- هَدَيْنَاهُ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ مَكَّنَّاهُ مِنْ سُلُوْكِ الطَّرِيْقِ فِيْ حَالَتَيْهِ جَمِيْعًا কেউ কেউ سَبِيْلَ হতে مَجَازًا - حَالٌ হয়েছে বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ عَرَّفْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا سَبِيْلًا شَاكِرًا وَاِمَّا سَبِيْلًا كَفُوْرًا -

اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا আয়াতে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর اِمَّا -এর هَمْزَه -তে كَسْرَه দিয়ে পড়েছেন। আর আবূ সাম্মাক, আবুল উজ্জাজ উভয় স্থানে هَمْزَه -তে فَتْح দিয়ে اَمَّا পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

اِمَّا অব্যয়টি অবস্থার বিবরণ দানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى هَلْ اَتٰى عَلَى الخ : উক্ত আয়াতে هَلْ অব্যয়টি اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِيْ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তা بِمَعْنٰى تَقْرِيْب অর্থাৎ নিকটতম সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত। কেননা هَلْ টির অর্থ (قَدْ) নেওয়া হয়েছে আর قَدْ অব্যয়টি নিকটতম অতীতকাল বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যাকে নিশ্চয়তাসূচক অতীতকালও বলা হয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ তখন এরূপ হতে পারে যে, নিশ্চয়ই মানুষের উপর এমন এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর যদি প্রথমোক্ত اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِيْ অর্থে হয় তাতেও এরূপ অর্থ হবে। নতুবা এরূপ অর্থেও বলা যেতে পারে যে, মানুষের উপর কি এমন এক সময় ছিল না যে, সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু হিসাবেই ছিল না। তবে এ সকল তরজমার মূল রূপ একই হবে। মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, هَلْ অব্যয়টি অনেক সময় জানাশুনা বস্তুকে আরও অধিক বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর কাবীর গ্রন্থকার বলেছেন, সূরা আদ্-দাহার-এর প্রথম هَلْ এবং সূরা আল-গাশিয়াহ্ -এর প্রথম অক্ষর (هَلْ) উভয়টি قَدْ অর্থে ব্যবহৃত হবে। জালালাইন গ্রন্থকারও এ অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে সরাসরি প্রশ্নবোধক অর্থে هَلْ -কে ব্যবহার করলে اٰيَة -এর অর্থ মাটির সাথে মিশে যাবে। যাতে আল্লাহ মানুষকে প্রশ্ন করার অর্থ প্রকাশ পাবে। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) এতে আল্লাহর عَاجِزِيْ প্রকাশ লাভ করবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ الخ : আল্লাহ বলেন, মানুষের জীবনের এমন একটি কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই ছিল না। আর মানুষ যদি মনে রাখে যে, একদা সৃষ্টির বুকে তার নাম-নিশানাও ছিল না তখন আর নিজে নিজে তার অস্তিত্ব লাভের প্রশ্নই উঠে না। একমাত্র আল্লাহর মহান কৃপাই তার অস্তিত্ব সম্পদ। তার এ সুন্দর দেহের আকৃতি ও সুগঠন এবং হাত-পা ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি খুব একটা মহা মূল্যবান পদার্থের মাধ্যমে তৈরি করা হয়নি। কিসের দ্বারা সে তৈরি হয়েছে– পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা ইরশাদ করবেন।

اَلْاِنْسَانُ-এর মর্মার্থ : উল্লিখিত আয়াতে ইনসান দ্বারা কি মর্ম গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। একটি হলো, তা দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, হযরত আদম (আ.) প্রথমে চল্লিশ বছর শুধু মাটিরূপে, অতঃপর চল্লিশ বছর বিন্যস্ত ও মাখানো মাটিরূপে, অতঃপর চল্লিশ বছর মাটির কায়ারূপে ছিলেন। একশত বিশ বছর পর তাঁকে পূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়। আর এক অভিমত অনুযায়ী ইনসান দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে। এর দলিলরূপে পরবর্তী আয়াতকে পেশ করা হয়। এ অভিমতকে অধিকাংশ তাফসীরকার গ্রহণ করেছেন। –[খাযেন]

حِيْنٌ -এর অর্থ : একে تَنْوِيْن -এর সাথে যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে অর্থ হবে অনির্দিষ্ট যে কোনো একটি দীর্ঘ সময়কে উদ্দেশ্য করা। এ মতে আল্লামা বাগাবী (র.) -এর মতে حِيْنٌ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে মাটির পুতুল বানানোর পর যে ৪০ বছর যাবৎ নির্জীব অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সেই সময়টুকু উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে যাহ্হাকের বর্ণনা মতে সেই সময়টুকু হলো সর্বমোট ১২০ বছর কাল পর তার মধ্যে যে رُوْحٌ প্রদান করা হয়েছিল সে সময়টুকু উদ্দেশ্য। –[খাতীব]

আর বহু সংখ্যক তাফসীরকারদের মতে এটা দ্বারা গর্ভধারণ করার প্রথম সময় হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়টুকু যা সাধারণত ১০ মাস ১০ দিন পর্যন্ত উদ্দেশ্য। কারণ এতে نُطْفَة হতে আরম্ভ করে রক্ত-মাংশ ও হাড় এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলে রূহ আগমন করা পর্যন্ত সকল অবস্থায়ই শামিল থাকে। এর পূর্বে সে شَيْئٍ غَيْرِ مَذْكُوْر ছিল এবং তার পূর্বে কেউ জানত না যে, তা কি পুরুষ না মেয়ে, আর এর কোনো شَكْل وَصُوْرَتْ সম্বন্ধেও কাঁরো কোন ধারণা ছিল না। আর যদি আরও দীর্ঘতর অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে نُطْفَة-এর পূর্ববর্তী সময় যখন খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ছিল, অতঃপর খাদ্য হতে نُطْفَة হয়েছে এবং খাদ্যগুলো বিভিন্ন ফলমূল ইত্যাদি হতে আর সে ফলমূলগুলো বৃক্ষরাজি হতে, তা মাটি হতে হয়েছে। এভাবে সে حِيْنٌ অর্থ হাজার হাজার বছরকাল হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ "لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তখন উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিস ছিল না।" এর মর্ম এই যে, তখন ব্যক্তি সত্তার একাংশ পিতার শুক্রে একটি অণুবীক্ষণী কীটরূপে এবং তার অপর অংশ মা'র শুক্রে একটি অণুবীক্ষণী ডিম্বরূপে পড়ে রয়েছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ এতটুকু কথাও জানতে পারেনি যে, আসলে তার অস্তিত্ব এ শুক্রকীট ও ডিম্বের সম্মিলনে সম্ভবপর হয়ে থাকে। এ কালে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ দু'টি অণুই গোচরীভূত হয়েছে; কিন্তু মানুষের কতটা অংশ পিতার শুক্রকীটে আর কতটা মাতার এ ডিম্বাণুতে মওজুদ রয়েছে তা এখনও কেউ বলতে পারে না। উপরন্তু গর্ভ সঞ্চার কালে এতদুভয়ের সম্মিলনে যে প্রাথমিক কোষ গড়ে উঠে তা পরিমাণহীন এমনই একটা বিন্দু বা অণু যে, তা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায় না, আর তা দেখেও তার দ্বারা যে একটি মানুষ গড়ে উঠছে, তা প্রথম দৃষ্টিতে কেউই বলতে পারে না। এ নগণ্য সূচনা হতে লালিতপালিত হয়ে কোনো মানবদেহ গড়ে উঠলেও তার আকার-আকৃতি যোগ্যতা ও প্রতিভা কি রকমের হবে, তার ব্যক্তিত্ব কতটা হবে তা এ সময় বলে দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহর বাণী মানুষ তখন কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিস ছিল না– এটাই সঠিক তাৎপর্য। এ সময় মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্বের সূচনা হয়ে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে কি ধরনের মানুষ হবে তা কারো পক্ষে পূর্বাহ্নে জেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّا خَلَقْنَا ...... اَمْشَاجٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমরা মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য হতে সৃষ্টি করেছি।" অতীতের মুফাস্সিরগণ বলেছেন, এর তাৎপর্য এই যে, নারীর ডিম্বাণু আর পুরুষের শুক্রকীটের সংমিশ্রণ হতে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু কথা হলো, পবিত্র কুরআন نُطْفَة (নুতফা)-এর বিশেষণ হিসাবে 'আমশাজ' (اَمْشَاج) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর কুরআনের অপর এক আয়াতে نُطْفَة পুরুষের বীর্য সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ 'নারী-পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণ হতে সৃষ্টি করা হয়েছে'– এটা নয়; বরং আয়াতের অর্থ হলো, "আমরা মানবজাতিকে বিভিন্ন উপাদানে সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করেছি" পবিত্র কুরআনের এ বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ করেছেন আধুনিক বিজ্ঞান শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা, এ আবিষ্কার হতে আবারও প্রমাণ হলো কুরআনের সত্যতা। পবিত্র কুরআন আল্লাহর কিতাব না হলে কিভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানুষের সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে এহেন তত্ত্বপূর্ণ কথা বলা সম্ভব হলো?

শুক্র সম্বন্ধে আধুনিক অভিমত এই যে, তা শুক্রকোষ প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থিনিঃসৃত রস ও অণ্ডকোষ সৃষ্ট শুক্রকীটের সমষ্টি। –[রূহুল কোরআন]

তা হতে জানা যায় যে, মানুষের বীর্য বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি। পবিত্র কুরআন এ কথা চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বলেছে; কিন্তু সেকালের মানুষের পক্ষে পবিত্র কুরআনের এ বক্তব্য বুঝা সম্ভব হয়নি। আধুনিক যুগে নব আবিষ্কারের ফলে তা বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয়, আর এ সব বৈজ্ঞানিক বক্তব্য বুঝার উপর ইসলাম জানা, ইসলামের বিধান মতে আমল করা, দীন মেনে চলা নির্ভর করে না। এ কারণেই আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এ সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেননি। **لَفْظ نُطْفَة টি বহুবচন ব্যবহার করার কারণ** : তা হলো, যে نُطْفَة হতে মানুষ সৃষ্টি হয় তা কেবল পুরুষ অথবা কেবল মহিলার نُطْفَة নয়; বরং উভয়ের মিলিত نُطْفَة -এর প্রতিফলন, যেহেতু দু'জনের نُطْفَة একত্র হয়ে থাকে, সুতরাং نُطْفَة -কে جَمْع ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা نُطْفَة -এর বিভিন্ন اَجْزَاء রয়েছে, সে اَجْزَاء বা অংশগুলোর কিছু অংশ একটু হলুদবর্ণের আবার কিছু অংশ শ্বেতবর্ণের আবার কিছু কঠিন ও কিছু পাতলা ধরনের এবং সমস্ত نُطْفَة গুলো একই খাদ্যের নির্যাস নয়; বরং বিভিন্ন খাদ্যের নির্যাস এই হেতু نُطْفَة শব্দকে তার مَادَّة عُضْو -এর প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ نَبْتَلِيْهِ : نَبْتَلِيْهِ শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা একটি মহাসত্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের দিক-নির্দেশ করেছেন। তা হলো মানুষের বয়স নামের এ পার্থিব জীবনকালটি একটি পরীক্ষার ক্ষেত্রবিশেষ। আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই এ বয়স নামের সময়কালটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এ সময়টিতে মানুষের প্রতিটি কাজই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশেষ। সে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পরীক্ষার মধ্যে কাটাচ্ছে। তার জীবনের এক একটি পল নিঃশেষ হয়ে তাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তার সময় কতটুকু কমে গেল। সে পরীক্ষা হচ্ছে– মানুষের আত্মাসমূহ আত্মিক জগতে অবস্থানকালে আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র রব বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এ পার্থিব জীবনে তারা সে স্বীকারোক্তিতে বহাল থাকে কিনা, তাদের কাজকর্ম, আচার-আচরণে তাই

প্রতিফলিত হয় কিনা, তা প্রমাণ করিয়ে নেওয়াই আল্লাহর উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাঁর ভবিষ্যৎজ্ঞান দ্বারা অবগত রয়েছেন যে, তাঁর বান্দাদের কে পাশ করবে, কে ফেল করবে, কে কোন ডিভিশনে উত্তীর্ণ হবে; কিন্তু প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য এ বাস্তব পরীক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষক পূর্ব হতেই অবগত থাকেন যে, তাঁর কোন ছাত্রটি পাশ করবে এবং কোনটি ফেল করবে। তথাপি তার নিকট হতে হাতে-কলমে পরীক্ষার হলে প্রশ্ন-উত্তর লেখিয়ে নেওয়া হয়, যেন ফল প্রকাশের সময় তাকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করতে পারে। পরীক্ষার সময়কালটিতে যেমন ফল প্রকাশ হয় না, তেমন মানব জীবনের এ পরীক্ষার ফলাফল এ পার্থিব জগতে হবে না; বরং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত একটি সময়ে সকলকে পূর্ণ রেকর্ডসহ তা অবহিত করা হবে। তা-ই হচ্ছে نَبْتَلِيْهِ -এর তাৎপর্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا : মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভের বাহন হলো তার কর্ণ ও চক্ষু। কর্ণ দ্বারা শুনে, চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে মানুষ তা হতে একটি ফল গ্রহণ করে মস্তিষ্কে তা পাচার করে। অতঃপর মস্তিষ্ক, কর্ণ ও চক্ষুর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলটি দ্বারা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এ সিদ্ধান্তই হয় তার পার্থিব জীবনের কর্মনীতি। ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে এ দুনিয়ায় চলে এবং তার নির্দেশিকা মাফিকই হয় তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড। তাই আল্লাহ বলছেন, সুতরাং আমি তাকে শ্রোতা ও দর্শক বানিয়েছি। অর্থাৎ সে যেন আমার বাণী শ্রবণ করে এবং সৃষ্টিলোকে আমার অসংখ্য নিদর্শন অবলোকন করে তা হতে একটি ফল গ্রহণ করতে পারে এবং সে ফল দ্বারা তার জ্ঞান ও মস্তিষ্ক তাকে পরীক্ষার হলে প্রতিটি প্রশ্নের কি উত্তর লিখতে হবে তা যেন নির্দেশ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ মানুষকে শ্রবণশীল যন্ত্র দুটি দান করেছেন। তা-ই হচ্ছে উপরিউক্ত আয়াত অংশের তাৎপর্য।

سَمْع-কে بَصَر-এর উপর অর্থাৎ শ্রবণশক্তিকে দৃষ্টিশক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণ : মানুষকে যখন লক্ষ্য করে কোনো বিষয়ে কিছু বলা হয়, তখন সর্বপ্রথম শ্রবণশক্তিই কার্যকরী হয়ে থাকে। আর দেখার পূর্বে শ্রবণ করা আবশ্যক নতুবা কোনো বিষয় সম্পর্কে না শুনে না বুঝে তা কেবল দেখলেই কোনো ফল হয় না; বরং সে বিষয়ে শুনে জ্ঞানার্জন করা জরুরি হয়ে পড়ে। এ কারণেই قُوَّة سَامِعَه-কে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ ..... كَفُوْرًا : পূর্ববর্তী আয়াতের জন্য অত্র আয়াতটি تَعْلِيْل স্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ব আয়াতে যে মানুষকে اِبْتِلَاء বা পরীক্ষা করা হবে বলা হয়েছে– অত্র আয়াতটি তার কারণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে পরীক্ষা করার কারণ হলো, তাদেরকে অন্যান্য সকল সৃষ্টি হতে অতুলনীয় উত্তম রূপরেখা ও গুণাবলি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও এ কথাটা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ আমি তাকে উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছি। আর সূরা আশ্-শামস -এ এভাবে বলা হয়েছে অর্থাৎ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا আর শপথ নফসের এবং সেই মহান সত্তার যিনি তাদেরকে সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ দিয়ে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। পরে তাদেরকে তাকওয়া ও ফুজূর উভয়ই পথের ইলহাম করেছেন। যে ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র করে নিয়েছে সে সফলতা অর্জন করেছে। আর যে ব্যক্তি তাকে ফুজূরীর মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি অকৃতকামী হয়েছে।

মানুষ কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন : পরীক্ষার হলে ছাত্রকে প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য বাধ্য করা হয় না। কেননা বাধ্য করা হলে বা সঠিক উত্তরটি কি হবে তা ঐ সময় বলে দিলে ফল লাভের কোনোই মূল্য থাকে না। এ পার্থিব জগতের বয়স নামের হলটিতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তার জীবন পাতায় কি উত্তর লিখতে হবে ও লিখতে হবে না তাও জানিয়ে দিয়েছেন। উপরিউক্ত ৩ নং আয়াতে 'আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি' এ কথাটির কয়েকটি তাৎপর্য হয়। ১. আমি তাকে বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছি, যাতে সে ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বাছাই করতে পারে। ২. আমি তাকে নফসে লাওয়ামার অধিকারী করেছি, যাতে তার অন্যায় ও গর্হিত আচরণের জন্য তাকে সর্বদা খোঁচাতে ও তিরস্কার করে সঠিক পথটি জানিয়ে দিতে পারে। ৩. আমি মানুষের নিম্নজগৎ ও উর্ধ্বমণ্ডলে আমার অসংখ্য নিদর্শন রেখেছি, যাতে তারা তা অবলোকন করে সঠিক পথ পেতে পারে। ৪. বর্তমান ও প্রাচীনকালের ইতিহাস তাদের সম্মুখে রেখে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছি। ৫. আমি নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করে সঠিক-অসঠিক উভয় পথ প্রদর্শন করেছি। তা-ই হলো إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ-এর মর্ম। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক পথ লাভের এবং পরীক্ষার হলের জীবন পাতায় সঠিক উত্তর লেখার জন্য এ সব বাহন ও মাধ্যমসমূহ দান করেছেন। অতঃপর তাকে সঠিক উত্তর লেখা অথবা না লেখার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে সঠিক উত্তর না লিখলে আল্লাহ তাকে সঠিক উত্তর লেখার জন্য বাধ্য করবেন না। কেননা তা পরীক্ষকের নীতি বিরোধী কাজ। ইচ্ছা করলে সে সঠিক উত্তর লিখতে পারে, ইচ্ছা না করলে নাও লিখতে পারে। তা হচ্ছে إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا-এর মর্ম। অর্থাৎ তাদের মনে চাইলে এ পার্থিব জীবনে তারা ঈমান ও কৃতকজ্ঞতার পথ গ্রহণ করুক অথবা ইচ্ছা হলে কুফরি ও বেঈমানীর পথ গ্রহণ করুক। উভয় ক্ষেত্রেই তারা স্বাধীন-মুক্ত। যে কোনো পথই গ্রহণ করার স্বাধীনতা তাদের বর্তমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে জীবন-কালের এ পরীক্ষায় পাশকারীগণ কি ফল লাভ করবে এবং ফেলকারীগণ কি ফল লাভ করবে তারই আলোচনা করা হয়েছে। –[আনোয়ার]

অনুবাদ :

٤. إِنَّآ أَعْتَدْنَا هَيَّأْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا يُسْحَبُونَ بِهَا فِى النَّارِ وَأَغْلَٰلًا فِى أَعْنَاقِهِمْ تُشَدُّ فِيهَا السَّلَاسِلُ وَسَعِيرًا نَارًا مُسَعَّرَةً اَىْ مُهَيَّجَةً يُعَذَّبُونَ بِهَا .

৪. আমি প্রস্তুত রেখেছি তৈরি করেছি অকৃতজ্ঞদের জন্য শৃঙ্খল যা দ্বারা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে বন্ধনী তাদের ঘাড়ে যাতে শঙ্খল বাঁধা হবে এবং লেলিহান অগ্নি প্রখর উত্তাপ বিশিষ্ট আগুন। অর্থাৎ শিখাবিশিষ্ট আগুন যাতে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

٥. إِنَّ الْاَبْرَارَ جَمْعُ بَرٍّ اَوْ بَارٍّ وَهُمُ الْمُطِيعُونَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ هُوَ اِنَاءُ شُرْبِ الْخَمْرِ وَهِىَ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِنْ خَمْرٍ تَسْمِيَةً لِلْحَالِ بِاسْمِ الْمَحَلِّ وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ كَانَ مِزَاجُهَا مَا تُمْزَجُ بِهٖ كَافُورًا .

৫. নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ أَبْرَارٌ শব্দটি بَرٌّ অথবা بَارٌّ -এর বহুবচন, আর তারা হলো আনুগত্যশীলগণ। পান করবে এমন পাত্র হতে كَأْسٍ শব্দটির অর্থ পানপাত্র, যা দ্বারা মদ্য পান করা হয়, যখন তাতে মদ বর্তমান থাকে; কিন্তু এখানে পানপাত্র দ্বারা পানীয় উদ্দেশ্য। কারণ, مَحَلّ উল্লেখ করত حَالّ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর مِنْ كَأْسٍ মধ্যকার مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيضِيَّه যার মিশ্রণ হবে যা মিলানো হয় কাফূর নামীয় স্বর্গীয় ঝর্ণাধারা।

٦. عَيْنًا بَدَلٌ مِنْ كَافُورًا فِيهَا رَائِحَتُهُ يَّشْرَبُ بِهَا مِنْهَا عِبَادُ اللّٰهِ اَوْلِيَاءُهُ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يَقُودُونَهَا حَيْثُ شَاءُوا مِنْ مَنَازِلِهِمْ .

৬. এমন প্রস্রবণ এটা كَافُورًا হতে بَدَلٌ তাতে কাফূরের সৌরভ থাকবে। তা দ্বারা পান করবে তা হতে আল্লাহর বান্দাগণ পুণ্যাত্মাগণ তারা উক্ত প্রস্রবণ যথেচ্ছ প্রবাহিত করবে তাদের আবাসস্থলে সেখানে ইচ্ছা তথায় প্রবহমান করে নেবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "سَلَاسِلًا" সَلَاسِلًا : নাফে', কিসায়ী, আবূ বকর আসেম হতে এবং হিশাম ইবনে আমের হতে تَنْوِيْن যুক্ত করে পড়েছেন। কুনবল ইবনে কাছীর হতে এবং হামযা তা اَلِفٌ ছাড়া وَقْف করে অর্থাৎ سَلَاسِلَ পড়েছেন। আর বাকি ক্বারীগণ তা الف সহকারে وَقْف করে পড়েছেন سَلَاسِلَا –[ফাতহুল কাদীর]

عَيْنًا শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কারণ : عَيْن শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কারণ হলো তা كَافُوْر হতে بَدَلٌ হয়েছে। মক্কীর মতে مِنْ كَأْسٍ -এর مَحَلّ হতে بَدَلٌ হয়েছে একটি مُضَاف -কে حَذْف করে যেন বলা হয়েছে– يَشْرَبُوْنَ خَمْرًا خَمْرَ عَيْنٍ আর কোনো কোনো লোক তা مَنْصُوْب হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তা يَشْرَبُوْنَ -এর مَفْعُوْل হয়েছে। আর কোনো কোনো লোক তাকে এক فِعْل مَحْذُوْف -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে বলে দাবি করেছেন। যার تَقْدِيْر হলো يَشْرَبُوْنَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ আল্লামা শাওকানী প্রথম অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য ও উত্তম বলেছেন।

–[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّآ أَعْتَدْنَا ...... وَسَعِيْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমি কাফেরদের জন্য শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।" অর্থাৎ আমি মানুষের সামনে ভালো এবং মন্দ, কল্যাণ এবং অকল্যাণ, হেদায়েত এবং গোমরাহীর পথ স্পষ্ট করে দিয়েছি। নবী-রাসূলগণের মাধ্যম হেদায়েতের পথের দিকে আহ্বান করেছি এবং তাদেরকে দু'য়ের যে কোনো একটি পথ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতাও দান করেছি। অতঃপর যারা স্বেচ্ছায় হেদায়েতের পথ পরিত্যাগ করে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করল এবং কুফরির রাস্তায় চলতে আরম্ভ করল তাদের জন্য তিনটি জিনিস প্রস্তুত রেখেছি। ১. سَلَاسِلَ অর্থাৎ পায়ের বেড়ি। ২. أَغْلَالً অর্থাৎ হাতের শৃঙ্খল। ৩. سَعِيْر অর্থাৎ আগুনের লেলিহান শিখা। অর্থাৎ জাহান্নামে তাদের হাতে-পায়ে বেড়ি ও শৃঙ্খল লাগিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। -[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ الْأَبْرَارَ ..... كَافُوْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নেককার লোকেরা (জান্নাতে) শুরার এমন সব পাত্র পান করবে যার সাথে কর্পূর পানির সংমিশ্রণ হবে।" এখানে মূলে ব্যবহৃত শব্দ হলো أَبْرَارٌ এ শব্দ দ্বারা সেসব লোক বুঝানো হয়েছে, যারা নিজেরা আল্লাহর আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় করেছে, তাঁর ধার্যকৃত যাবতীয় ফরজ যথাযথ আদায় করেছে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করে চলেছে।

হাদীস শরীফে আছে 'আবরার' হলো সেসব লোক যারা কোনো লোককে কষ্ট দেয় না। -[কুরতুবী]

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا এর অর্থ তা কর্পূর মিশ্রিত পানি হবে– তা নয়; বরং এমন একটা নৈসর্গিক ঝরনা বা প্রস্রবণ হবে যার পানি স্বচ্ছতা, শীতলতা ও সুগন্ধি কর্পূরের ন্যায় হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَيْنًا يَّشْرَبُ ...... تَفْجِيْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটি একটি প্রবহমান ঝরনা হবে যার পানির সঙ্গে আল্লাহর বান্দারা পানীয় পান করবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।"

عِبَادُ اللّٰهِ বলতে আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষকে বুঝালেও কুরআনে তা আল্লাহ তা'আলার 'নেক বান্দা' বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নেক বান্দাদেরকে عِبَادُ اللّٰهِ বলে আল্লাহর নামের সাথে সংযুক্ত করে সম্মানিত করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের দু'টি সিফাতের উল্লেখ করেছেন। এক. তাদের আমলের প্রতি লক্ষ্য করে আবরার বা নেককার, দুই. আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের প্রতি লক্ষ্য করে عِبَادُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা, অতঃপর পরের আয়াতে তাদের আরও কিছু গুণাবলি আলোচিত হয়েছে।

يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا-এর অর্থ এই নয় যে, এ লোকেরা সেখানে খন্তা-কোদাল নিয়ে খাল কাটবে এবং এভাবেই সে প্রস্রবণের পানি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে; বরং তাদের একটা ইশারা-ইঙ্গিতই সে জন্য যথেষ্ট হবে। জান্নাতে যেখানেই তাদের ইচ্ছা হবে সেখান হতেই সে প্রস্রবণ উৎসারিত হবে। সহজে বের করে নেবে। কথাটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুবাদ :

৭. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا مُنْتَشِرًا.

৭. তারা কর্তব্য পালন করে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক সম্প্রসারিত।

৮. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ أَيِ الطَّعَامِ وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ مِسْكِينًا فَقِيرًا وَيَتِيمًا لَا أَبَ لَهُ وَأَسِيرًا يَعْنِي الْمَحْبُوسَ بِحَقٍّ.

৮. আর আহার্য দান করে তৎপ্রতি আসক্তি সত্ত্বেও সে খাদ্যের প্রতি নিজেদের আসক্তি সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত দরিদ্র অনাথ পিতৃহীন এবং বন্দীকে যাকে হকের জন্য বন্দী করা হয়েছে।

৯. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لِطَلَبِ ثَوَابِهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا شُكْرًا فِيهِ عَلَى الْإِطْعَامِ وَهَلْ تَكَلَّمُوا بِذٰلِكَ أَوْ عَلِمَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ فَأَثْنٰى عَلَيْهِمْ بِهِ قَوْلَانِ.

৯. আর বলে আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর জন্য আহার্য দান করি তাঁর পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের হতে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি না আহার্য দানের বিনিময়ে, জান্নাতবাসীগণ এ উক্তি করেছে– না আল্লাহ তা'আলা তাদের হতে এ মনোভাব জেনে তাদের প্রশংসাস্বরূপ এ বাণী উচ্চারণ করেছেন, এ সম্পর্কে দুটি মতামত রয়েছে।

১০. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا تَكْلَحُ الْوُجُوهُ فِيهِ أَيْ كَرِيهَ الْمَنْظَرِ لِشِدَّتِهِ قَمْطَرِيرًا شَدِيدًا فِي ذٰلِكَ.

১০. আমরা আমাদের প্রতিপালক হতে আশঙ্কা করি এক ভয়ঙ্কর দিনের যেদিন মুখমণ্ডল বিবর্ণ তথা মলিন হয়ে পড়বে, তার কঠোরতার কারণে ভীষণরূপে বিবর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে।

১১. فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ أَعْطَاهُمْ نَضْرَةً حُسْنًا وَإِضَاءَةً فِي وُجُوهِهِمْ وَسُرُورًا.

১১. পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে সে দিনের বিপত্তি হতে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দান করবেন لَقّٰهُمْ শব্দটি أَعْطَاهُمْ অর্থে উৎফুল্লতা সুদর্শন ও আলোকোজ্জ্বলতা তাদের মুখমণ্ডলে ও আনন্দ।

১২. وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوا بِصَبْرِهِمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ جَنَّةً أُدْخِلُوهَا وَحَرِيرًا أُلْبِسُوهُ.

১২. আর তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন তাদের ধৈর্যশীলতার জন্য পাপ হতে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যশীলতার জন্য স্বর্গোদ্যান যাতে তারা প্রবিষ্ট হবে ও রেশমি পরিধেয় মাধ্যমে যা তারা পরিধান করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى "إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ": إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ বাক্যটি তারকীবে حَالْ হওয়ার কারণে قَوْل উহ্য রেখে مَحَلًّا مَنْصُوب হয়েছে। অর্থাৎ قَائِلِيْنَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ অথবা يَقُوْلُوْنَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে জারীর (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনও ইসলামপন্থিদেরকে বন্দী করতেন না; বরং উপরিউক্ত ৮নং আয়াতে যেসব বন্দীগণের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা হলো মুশরিক বন্দীগণের কথা। তাদেরকে বন্দী করে শাস্তি দেওয়া হতো। তাদের সম্পর্কে যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম ﷺ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন। –[লোবাব]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উপরিউক্ত ৮নং আয়াত আবূ দাহদাহ নামের এক আনসার ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়। তিনি একদিন রোজা রেখেছিলেন। যখন ইফতারের সময় সমাগত হলো তখন এতিম, মিসকিন ও বন্দী লোক আসল। তখন তিনি এ তিনজনকে তিনটি রুটি প্রদান করলেন এবং নিজের ও পরিবারের জন্য মাত্র একটি রুটি রাখলেন। তাঁর প্রশংসায় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[খাযেন]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াত হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তিনি এক ইহুদির কাজ করে বিনিময়স্বরূপ তার নিকট হতে কিছু গম আনলেন। অতঃপর তার এক-তৃতীয়াংশ পিষে তা দ্বারা খাদ্য তৈরি হওয়ার পর একজন মিসকিন আসল। তিনি তাকে এ খাদ্য দান করলেন। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা খাদ্য তৈরি করলে এক এতিম লোক এসে উপস্থিত হলো। সে কিছু খাবার চাইলে তাকে সব খাদ্য দিয়ে দিলেন। অতঃপর বাকি গম দ্বারা খাদ্য তৈরি করলেন। এবারে একজন মুশরিক বন্দী এসে খাদ্য চাইল। তখন তিনি তাকে এ খাদ্য দিয়ে দিলেন। আর পরিবার-পরিজনসহ নিজেরা সকলে দিবারাত্র অনাহারে কাটালেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত এতিম, মিসকিন ও বন্দীগণকে খাদ্যদানকারীদের প্রশংসায় অবতীর্ণ করেন। -[খাযেন]

قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের বয়ানস্বরূপ এ আয়াতটি, অর্থাৎ আল্লাহর নেক বান্দাগণকে নিয়ামতে ভূষিত করার কারণ এই যে, তাদের বিশ্বাসও সঠিক এবং আমলগুলো সঠিক, আর তারা যে কাজ করার মান্নত করে থাকে, তা সঠিকভাবেই পূরণ করে থাকে। অর্থাৎ তারা কথায় এবং কাজে সঠিক থাকে। আর কিয়ামতের অতি কঠিন বিপদকে খুবই ভয় করে থাকে। যে দিনের বিপদ সারা জগৎ জুড়ে হবে, কোনো দোষী ব্যক্তি সে দিন তা হতে রক্ষা পাবে না। মোটামুটি কথা হলো উক্ত আয়াত মান্নত পূর্ণ করা (অঙ্গীকার পূরণ করা) এবং কিয়ামতের ভয়-ভীতিকে আখেরাতের শান্তির কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। -[আশরাফী, মা'আরিফ]

এতে বুঝা যায় যে, বর্ণিত প্রকৃতির লোকগণ যেহেতু নিজেদের পক্ষ থেকে নিজেদের উপর ধার্যকৃত কাজ করতে এতবেশি গুরুত্ব দান করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর ধার্যকৃত ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ ইত্যাদি অর্থাৎ শরয়ী কার্যাদি আদায়ে আরও বহু তৎপর থাকেন। -[মা'আরিফ]

نَذْر-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : نَذْر অর্থ হলো ব্যক্তি নিজের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব করে নেওয়া। আর পরিভাষায়, কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হলে অমুক কাজ করবো, যদি কেউ এরূপ বলে থাকে তবে তাকে মানত বা نَذْر বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণের মতে نَذْر বা মানত চার ভাগে বিভক্ত হতে পারে। ১. যদি কেউ এই বলে ওয়াদা করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সে অমুক নেক কাজটি করবে, তবে তা মানত হবে। ২. আল্লাহ যদি আমার অমুক প্রয়োজন হাসিল করে দেন তবে আমি শোকর আদায়স্বরূপ অমুক নেক কাজটা করবো। এ দুই প্রকারকে ফিকহবিদগণ نَذْر تَبَرُّع নেক কাজ করার মানত বলে থাকেন। আর এ মানত পূর্ণ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। ৩. কোনো নাজায়েজ কাজ করার কিংবা কোনো ওয়াজিব কাজ না করার ওয়াদা করা। ৪. কোনো মুবাহ [জায়েজ] কাজ করাকে নিজের উপর কর্তব্য করে নেওয়া কিংবা কোনো মোস্তাহাব কাজ না করার অথবা, অউত্তম কাজ করার ওয়াদা করা। ৩য় ও ৪র্থ প্রকারের মানতকে ফিকহবিদগণ "নজরে লাজাজ" মূর্খতার মানত বলে নাম দিয়েছেন।

তৃতীয় প্রকারের সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন, এটা মানত হিসাবে সংঘটিত হয় না এবং এটা পূরণ করা ও পালন করা জরুরি নয়। ৪র্থ প্রকারের نَذْر সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে।

কারো মতে তা পূরণ করতে হবে। আবার কারো মতে তাতে কাফ্‌ফারায়ে কসম আদায় করতে হবে। কেউ বলেন, এরূপ মানতকারী তা ইচ্ছা করলে পূরণ করতে পারে, অথবা কাফফারাহ দিয়ে তার দায়িত্ব হতে মুক্তিও লাভ করতে পারে।

শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব অবলম্বীগণের মতে এ 'মানত' সংঘটিত হয় না এবং তা পালন করাও ওয়াজিব হয় না।

হানাফীদের মতে এ উভয় প্রকারের যে কোনো এক সুরতে মানত মানলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

قَوْلُهُ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ : এর কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে। এক. نَذْر-এর অর্থ ওয়াজিব, সুতরাং বাক্যের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যেসব ইবাদত বান্দাদের উপর ওয়াজিব করেছেন তা [এই] মু'মিনরা পালন করে। হযরত কাতাদাহ এবং মুজাহিদ বলেছেন- তার অর্থ নামাজ, হজ ইত্যাদি ইবাদতগুলো তারা পালন করে। দুই. ইকরামা বলেছেন- এর তাৎপর্য এই যে, হককুল্লাহর কোনো মানত যদি তারা করে থাকেন তাহলে তারা সেই মানত পালন করেন। ইসলামি শরয়ী পরিভাষায় মানত হলো, বান্দার নিজের উপর ওয়াজিব নয় এমন কোনো কাজকে ওয়াজিব করে নেওয়া। সুতরাং আয়াতের অর্থ 'তারা যা নিজেদের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছে তা পালন করেন।' তিন. نَذْر-এর অর্থ ওয়াদা, অর্থাৎ তাঁরা যেসব ওয়াদা করে থাকেন তা তাঁরা পালন করেন। আল্লামা শাওকানী (র.) বলেছেন, এখানে نَذْر শব্দটি মানত অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম। -[ফাতহুল কাদীর]

মানতের মাধ্যমে মানুষ নিজের উপর অনাবশ্যক কিছু কাজ আবশ্যক করে নেয়। এ কারণেই মানত করার সময় মানতকারীকে অবশ্যই কয়েকটি জিনসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

এক. এমন কাজের মানত করতে হবে যে কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– إِنَّمَا النَّذْرُ مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ প্রকৃত মানত তো তা-ই যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। –[ত্বাহাবী]

দুই. মানত কেবল আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করতে হবে, গাইরুল্লাহর নামে কখনো মানত করা যাবে না। কারণ মানত ইবাদত। এ ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই হতে হবে। অন্য কারো নামে মানত করলে তা হবে শিরক। সে মানত কখনো পালন করা যাবে না। হাদীস শরীফে আছে– مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ অর্থাৎ যে লোক আল্লাহর আনুগত্য করার মানত মানল তার সেই আনুগত্য করা উচিত। আর যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানির মানত মানে তবে তা তার করা উচিত নয়। –[বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

তিন. এমন কোনো কাজ বা বিষয়ে মানত করবে না যার মালিক সে নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ –

আল্লাহর নাফরমানি করার কোনো মানত পূরণ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন জিনিসেও নয়, মানতকারী যার মালিক নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ الخ : বেহেশতীগণ আল্লাহর পক্ষ হতে এত নিয়ামতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ দর্শিয়ে অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন– আল্লাহর ভালোবাসায় মাতাল হয়ে এ সকল মুসলমান গরিব, এতিম, মিসকিন, ফকির ও বন্দীকৃত ইত্যাদি লোকদেরকে খাবার দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে, বন্দীকৃত লোক যদি জালেম হয় তবেও খুব দুরবস্থায় তার সহানুভূতি করাও মুস্তাহসান বলা হয়েছে। আর যদি বন্দীকৃত ব্যক্তি مَظْلُوْمٌ অবস্থায় হয়ে থাকে তথাপিও তাকে বন্দীকৃত অবস্থায় সেবা করা মোস্তাহাব।

عَلٰى حُبِّهٖ-এর অর্থ : বিভিন্ন তাফসীরকারগণ এ শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন–

ক. হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ (র.) বলেন, عَلٰى حُبِّهٖ -এর অর্থ হলো, عَلٰى حُبِّ الْاِطْعَامِ দরিদ্রদেরকে খাওয়াবার আগ্রহ ও উৎসাহে তারা এ কাজ করে।

খ. হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায ও আবূ সুলাইমানুদ্দারানী বলেন, তারা আল্লাহর ভালোবাসায় এরূপ কাজ করে। আপাত দৃষ্টিতে এ অর্থ উত্তম মনে হয়। কারণ পরবর্তী বাক্য إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ দ্বারা এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে থাকে।

গ. মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, এ আয়াতে عَلٰى حُبِّهٖ -এর মধ্যে عَلٰى بِمَعْنٰى مَعَ নেওয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এ সকল লোক এমন অবস্থায়ও গরিবদেরকে খাওয়া প্রদান করে থাকে, যখন তাদের নিজেদের জন্যই সেই খাওয়া অতি আবশ্যক ও প্রিয় হয়ে থাকে। এই অর্থ নয় যে, নিজেদের খাওয়ার অতিরিক্ত বা খাওয়ার অযোগ্য খাওয়াগুলো এতিম মিসকিনদেরকে দিয়ে থাকে।

اَسِيْر-এর তাফসীর : ১. ইবনুল মুনযির হযরত ইবনে জোবায়ের হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ কোনো মুসলমানকে বন্দি করতেন না। এ জন্য আলোচ্য আয়াতে اَسِيْر শব্দটি দ্বারা মুসলমান বন্দী নয়; বরং অমুসলমান বন্দীই উদ্দেশ্য হবে।

২. কিন্তু মুজাহিদ (র.) এবং সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, এর দ্বারা অমুসলমান কয়েদিও উদ্দেশ্য হতে পারে।

৩. আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَسِيْرًا শব্দ দ্বারা বাঁদি ও গোলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারাও বন্দীদের ন্যায়ই জীবন যাপন করে।

৪. আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীলোক কেননা এরা হলো দুর্বল জনগোষ্ঠী। –[নূরুল কোরআন]

আয়াতসমূহে বর্ণিত নেককার লোকদের গুণাবলি : যেসব গুণাবলির কারণে নেককার লোকেরা জান্নাতে যাবেন এবং বিভিন্ন নিয়ামত ভোগ করবেন, উল্লিখিত আয়াতসমূহে যা বিবৃত হয়েছে– তা নিম্নরূপ :

১. তারা মানত পূর্ণ করে। ২. তারা পরকালকে ভয় করে। ৩. মিসকিন, এতিম ও কয়েদিদেরকে তারা আহার্য দান করে। ৪. এ আহার্যদান কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকে। মানুষের কাছে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার আশায় করে না; বরং কিয়ামত দিবসকে ভয় করে বলে আহার্য দান করে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ (الاية) : আলোচ্য আয়াতে নেককার লোকদের মিসকিন, এতিম ও কয়েদিদেরকে খাদ্য দানের সম্পর্কে বলা হয়েছে– তারা বলেন যে, আমরা এ আহার্য দান কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করে থাকি, দুনিয়ার কোনো লাভের আশায় বা প্রতিদানের আশায় অথবা কৃতজ্ঞতা পাবার আশায় করি না।

এ কথা কি তাদের নিজেদের মুখের বলা কথা, নাকি তাদের অন্তরের কথা, এ বিষয়ে দু'টি মত লক্ষ্য করা যায়। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহর কসম তাঁদের মুখে এ কথা কখনো বলেননি, কিন্তু আল্লাহ তাঁদের অন্তরের কথা জানতে পেরে নিজেই তাঁদের মনের কথা তাঁদের প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছেন। –[সাফওয়া]

ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, মুখে বলার কথা এখানে বলা হয়েছে এ কারণে যে, যার সাহায্য করা হচ্ছে সে যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হতে পারে যে, তার সাহায্য করে তার নিকট হতে কোনোরূপ শুকরিয়া বা বিনিময় চাওয়া হচ্ছে না। তাহলেই সে নিশ্চিন্তে খাবার খেতে পারে বা সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا : "আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ দিনকে ভয় করছি।" এখানে মিসকিন, এতিম ও কয়েদিদেরকে আহার্য দানের দ্বিতীয় কারণ বিবৃত হয়েছে, অর্থাৎ নেককার লোকেরা বলে থাকেন যে, আমরা তাদেরকে আহার্য দান করি এই কারণেও যে, এ কর্মের মাধ্যমে আমরা একটি ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ দিনে আল্লাহর আজাব হতে বাঁচতে পারবো বলে মনে করি। যে দিনের কঠোরতায় মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং যে দিন অতি দীর্ঘ হবে। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الخ : উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন– তাদের এরূপ ইখলাস ও কৃচ্ছ সাধনা এ ভয়ভীতি আল্লাহর দরবারে বৃথা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিত হতে রক্ষা করবেন। তাদেরকে স্বর্গের মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করাবেন। তারা সুখের স্বর্গে মনের সুখে বসবাস করবেন। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসবেন। সেখানে সূর্যের তাপ, অথবা শীতের কষ্ট নেই। ফলমূল ভরা বৃক্ষ শাখা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে থাকবে। স্বর্গীয় পরিবেশ স্বর্গসুখের চিত্রাঙ্কন মানুষের সাধ্যাতীত।

আর এক কথায় মুখমণ্ডলের সবুজতা ও উজ্জ্বলতা এবং মনের আনন্দ সব মু'মিনদের জন্য থাকবে। সকল দুঃখ-দুর্দশা, কঠোরতা এবং ভয়াবহতা কেবল কাফের ও অপরাধী লোকদেরই ললাটে লিপিবদ্ধ থাকবে।

আর ঈমানদারদের ধৈর্যের ফলে তাদেরকে বেহেশতের অভ্যন্তরে রেশমি পোশাকে ভূষিত করে দেওয়া হবে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাদের হাতে হাত মিলিয়ে বলবে, এটা তোমাদের সেদিনটি যেদিন সম্পর্কে দুনিয়াতে তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। আজ তা সত্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ধৈর্যের তাৎপর্য : **اَلصَّبْرُ** অর্থ ধৈর্য ধারণ করা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, অতি আনন্দে বা অতি দুঃখ-কষ্টে দিশাহারা না হওয়া। স্থিরতা অবলম্বন করা। এ শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নেককার ও ঈমানদার লোকদের গোটা বৈষয়িক জীবনটাকেই সবর বা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জীবন বলে অভিহিত করা হয়েছে। সকল পুণ্যের প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে। আল্লাহর উপর এ অবিচল বিশ্বাস রেখে ঈমান গ্রহণের পর মৃত্যু পর্যন্ত স্বীয় অবৈধ কামনা বাসনা দমন করা, আল্লাহর উপর এই অবিচল বিশ্বাস রেখে ঈমান গ্রহণের পর মৃত্যু পর্যন্ত স্বীয় অবৈধ কামনা-বাসনা দমন করা, আল্লাহর সকল নির্দিষ্ট সীমারেখাগুলো মেনে চলা, আল্লাহর সকল ফরজসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের সময়, সম্পদ, শ্রম, মেহনত শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা। এমনকি প্রয়োজনে প্রাণটা পর্যন্ত কুরবানি করে দেওয়া, আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্তকারী সকল প্রকার লোভ-লালসা ও আকর্ষণ উপেক্ষা করা, সত্য অন্বেষণের পথে জীবন পরিচালিত করা, সর্বপ্রকার বিপদ ও দুঃখ কষ্ট অকাতরে বরদাশত করে যাওয়া। হারাম উপায়ে অর্জিত সকল স্বার্থ সুবিধা ও আনন্দ পরিত্যাগ করা, সত্য পন্থা অবলম্বনের কারণে ঘনীভূত হয়ে আসা তিক্ততা ও জ্বালা-যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করে যাওয়া, ইত্যাদি কর্মনীতি মু'মিন ব্যক্তির গোটা জীবনটাকেই সবর -এর জীবন বানিয়ে দেয়। এ ধৈর্যের জীবন গঠন করতে অক্ষম হলে অসত্যের হাওয়ার সাথে মিশিয়ে ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই হয় না। তাই পবিত্র কালামে আল্লাহ বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অনুবাদ :

١٣. مُتَّكِئِيْنَ حَالٌ مِنْ مَرْفُوْعِ اُدْخُلُوْهَا الْمُقَدَّرَةُ وَكَذَا لَا يَرَوْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ ج السُّرُرِ فِى الْحِجَالِ لَا يَرَوْنَ يَجِدُوْنَ حَالٌ ثَانِيَةٌ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا اَىْ لَا حَرًّا وَلَا بَرْدًا وَقِيْلَ الزَّمْهَرِيْرُ الْقَمَرُ فَهِىَ مُضِيْئَةٌ مِنْ غَيْرِ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ.

১৩. তারা হেলান দিয়ে থাকবে এ مُتَّكِئِيْنَ এবং لَا يَرَوْنَ শব্দ দু'টি উহ্য اُدْخُلُوْهَا হতে حَالٌ তথায় সুসজ্জিত আসনে নব দম্পতির জন্য সজ্জিত শয্যা। তারা দেখবে না পাবে না, এটা দ্বিতীয় حَالٌ তথায় সূর্যতাপ, আর না ঠাণ্ডা অর্থাৎ গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়। আর কেউ কেউ বলেছেন- زَمْهَرِيْر শব্দের অর্থ চন্দ্র, সে হিসাবে বেহেশত সূর্য ও চন্দ্র ব্যতিরেকেই আলোকময় হবে।

١٤. وَدَانِيَةً قَرِيْبَةً عَطْفٌ عَلٰى مَحَلِّ لَا يَرَوْنَ اَىْ غَيْرُ رَائِيْنَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ ظِلٰلُهَا شَجَرُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا اُدْنِيَتْ ثِمَارُهَا فَيَنَالُهَا الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ.

১৪. আর নিকটবর্তী করা হবে এটা لَا يَرَوْنَ -এর مَحَلّ -এর প্রতি عَطْف অর্থাৎ যারা দেখবে না, তাদের প্রতি তাদের হতে তার ছায়া তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষের ছায়া আর তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। তার ফলমূল তাদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। যাতে দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত সকলেই পেতে পারবে।

١٥. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ فِيْهَا بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ اَقْدَاحٍ بِلَا عُرًى كَانَتْ قَوَارِيْرَا.

১৫. তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে ও পান পাত্রে হাতলবিহীন পেয়ালাকে اَكْوَابٍ বলা হয়, যা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ।

١٦. قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ اَىْ اِنَّهَا مِنْ فِضَّةٍ يُرٰى بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا كَالزُّجَاجِ قَدَّرُوْهَا اَىِ الطَّائِفُوْنَ تَقْدِيْرًا عَلٰى قَدْرِ رِىِّ الشَّارِبِيْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَذٰلِكَ اَلَذُّ الشَّرَابِ.

১৬. রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে অর্থাৎ তা স্ফটিক নির্মিত তার বাহির হতে ভিতর দৃষ্ট হবে, আয়নার মতো। পূর্ণ করবে অর্থাৎ পরিবেশনকারীগণ তাকে যথাযথভাবে পানকারীদের চাহিদা মোতাবেক, কম বা বেশি করা ব্যতিরেকে। এরূপ পানীয় তৃপ্তিদায়ক হয়ে থাকে।

١٧. وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا اَىْ خَمْرًا كَانَ مِزَاجُهَا مَا تُمْزَجُ بِهٖ زَنْجَبِيْلًا.

১৭. আর তাদের পান করানো হবে সেথায় এমন পানপাত্র অর্থাৎ পানীয় যার সংমিশ্রণ হবে যা দ্বারা পানীয় মিশ্রিত হয় আদ্রক।

١٨. عَيْنًا بَدَلٌ مِنْ زَنْجَبِيْلًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا يَعْنِىْ اَنَّ مَاءَهَا كَالزَّنْجَبِيْلِ الَّذِىْ تَسْتَلِذُّ بِهِ الْعَرَبُ سَهْلُ الْمَسَاغِ فِى الْحَلْقِ .

১৮. সেই প্রস্রবণ তা زَنْجَبِيْل হতে - بَدَلٌ - কে তথায় সালসাবীল নামকরণ করা হয় অর্থাৎ তার পানি আর্দ্রকের ন্যায় হবে, যা আরবদের নিকট পছন্দনীয় এবং সহজে গলাধঃকরণ করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

مُتَّكِئِيْنَ শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ : جَزَاهُمْ-এর مَفْعُوْل হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مُتَّكِئِيْنَ শব্দটি مَنْصُوْب হয়েছে। আবুল বাকা তাকে جَنَّةً হতে صِفَتْ হতে পারে বলে মনে করেছেন। ফাররা তাকে تَابِعْ বলেছেন। যেমন বলা হয়েছে جَزَاهُمْ جَنَّةً مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا আখফাশ مَدْح হিসাবে مَنْصُوْب হতে পারে বলে মনে করেন। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, কাবীর]

قَوْلُهُ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا : এ জুমলাটি جَزَاهُمْ-এর مَفْعُوْل হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। আর এ হিসাবে তা হলো حَالٌ مُتَرَادِفَة ; অথবা مُتَّكِئِيْنَ-এর ضَمِيْر হতে حَالٌ হয়েছে। এ অবস্থায় তা حَالٌ مُتَدَاخِلَة হবে। অথবা তাকে جَنَّةً-এর দ্বিতীয় صِفَتْ বলতে হবে। –[ফাতহুল কাদীর]

دَانِيَةً-এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর دَانِيَةً-কে مَنْصُوْب পড়েছেন لَا يَرَوْنَ-এর স্থানের উপর তাকে عَطْف করে, অথবা مُتَّكِئِيْنَ-এর উপর عَطْف করে, অথবা উহ্য اِسْم-এর উপর عَطْف করে অর্থাৎ وَجَزَاهُمْ جَنَّةً دَانِيَةً যেন বলা হয়েছে; যুজাজ বলেছেন, তা পূর্বে উল্লিখিত جَنَّةً-এর صِفَتْ হিসাবে مَنْصُوْب হয়েছে। ফাররা বলেছেন, তা مَنْصُوْبٌ عَلٰى مَدْحٍ - جَنَّةً دَانِيَةً ;

আবূ হাইওয়া তাকে رَفْع দিয়ে دَانِيَةٌ পড়েছেন خَبَر مُقَدَّمْ হিসেবে, তখন ظِلَالُهَا হলো তার مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ আর গোটা جُمْلَة হলো مَحَلًّا مَنْصُوْب - حَالٌ হিসাবে। ইবনে মাসউদ (রা.) তাকে وَدَانِيًا عَلَيْهِمْ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا-এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর قَدَّرُوْهَا-এর قَافْ-এ فَتْح দিয়ে مَعْرُوْف হিসাবে পড়েছেন। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আস্‌সুলামী, শা'বী, যায়েদ ইবনে আলী, ওবাইদ ইবনে উমাইর, আবূ আমর এক বর্ণনায় قَافْ-এ ضَمَّة দিয়ে এবং دَالْ-এ كَسْرَة দিয়ে مَجْهُوْل হিসাবে قُدِّرُوْهَا পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

عَيْنًا শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কারণ : عَيْنًا শব্দটি كَأْسًا হতে بَدَلٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। তা فِعْل مُقَدَّرٌ দ্বারাও مَنْصُوْب হতে পারে অর্থাৎ يُسْقَوْنَ عَيْنًا আর حَرْف جَرّ-কে حَذْف করেও তা مَنْصُوْب পঠিত হতে পারে, মূলত ছিল مِنْ عَيْنٍ এ مِنْ-কে حَذْف করে দেওয়া হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا الخ : বেহেশতীগণ বেহেশতে অশেষ আরামের সাথে আলীশান খাটসমূহে হেলান দিয়ে থাকবেন। সূর্যতাপ অথবা সর্দি কিছুই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। উক্ত আয়াতের زَمْهَرِيْر শব্দটির অর্থ কারো কারো মতে নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ বেশি শীতও নয় আর বেশি গরমও নয়। কারো কারো মতে زَمْهَرِيْر-এর অর্থ হলো- চন্দ্র সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হবে- তারা বেহেশতে চন্দ্র-সূর্য দেখতে পাবে না; বরং চন্দ্র ও সূর্যালোক ব্যতীতও বেহেশতে

স্থানগুলো নূরের আলোকে আলোকিত থাকবে। চন্দ্র-সূর্যের তাপ বা আলোর প্রয়োজন থাকবে না। মাদারিক গ্রন্থকার বলেন- زَمْهَرِيْر অর্থ চন্দ্র ও সূর্যালোক থাকবে না। এর অর্থ হলো- হাওয়াও সাধারণ থাকবে, আর এমন উত্তাপ থাকবে না; যা অসহ্যকর হবে, এমন শীতও থাকবে না; যা অসহ্যকর হবে। আর হাদীস শরীফেও এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- زَمْهَرِيْرٌ هَوَاءُ الْجَنَّةِ سَجْسَجٌ অর্থ হলো- اَلْبَرْدُ الشَّدِيْدُ অতিশীত। لَا حَرَّ وَلَا قُرَّ

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- বেহেশতের বৃক্ষরাজির ছায়াসমূহ নিয়ামত হিসাবে বেহেশতীদের উপর দিয়ে ঘনীভূত অবস্থায় ছায়া দিতে থাকবে। আর সে সকল বৃক্ষসমূহের ফলগুলো তাদের ইচ্ছার অনুরূপ অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ সর্বদা বিনা কষ্টেই খেতে পারবে। ছড়াসমূহ তাদের হাতের কাছাকাছি হয়ে ঝুলতে থাকবে।

জান্নাতে সূর্য থাকবে না- কিভাবে ছায়া পাওয়া যাবে? : وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا অর্থ "জান্নাতের ছায়া তাদের উপর অবনত হয়ে থাকবে।" তা কিভাবে সম্ভবপর হবে, অথচ পূর্বে বলা হয়েছে, জান্নাতে সূর্য থাকবে না। সূর্য থাকলেই ছায়া দেখা যায়, আর না থাকলে দেখা যায় না। আর গরম না থাকলে ছায়ার প্রয়োজনও হয় না। এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, জান্নাতের বৃক্ষাবলি এমন পর্যায়ে থাকবে যে, সূর্য থাকলে এ সব বৃক্ষ অবশ্যই তাদেরকে ছায়া দান করত- তাই হলো এ আয়াতের তাৎপর্য। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُطَافُ عَلَيْهِمْ .... تَقْدِيْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তথায় তাদেরকে রৌপ্য পাত্র [আহার্য] পরিবেশ করা হবে এবং পানপাত্রসমূহ হবে কাঁচের। আর রজতশুভ্র কাঁচের পাত্রে পরিবেশনকারীগণ তা যথাযথরূপে পূর্ণ করে রাখবে।"

আলোচ্য আয়াতে রৌপ্য পাত্র দ্বারা আহার্য পরিবেশন করার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু সূরা যুখরুফের ৭১ আয়াতে বলা হয়েছে "তাদের সম্মুখে স্বর্ণের পাত্র আবর্তিত হবে।" তা হতে জানা গেল যে, সেখানে কখনো স্বর্ণের পাত্র ব্যবহৃত হবে, কখনো হবে রৌপ্য পাত্র। -[কাবীর]

আর ঐ রৌপ্য পাত্রগুলো হবে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ঝকঝকে। এ ধরনের পাত্র এই দুনিয়ায় পাওয়া যায় না। এটা জান্নাতেরই একটি বিশেষ বিশেষত্ব যে, সেখানে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ রৌপ্য নির্মিত পাত্র জান্নাতী লোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হবে।

زَنْجَبِيْل-এর অর্থ : 'যানজাবীল' জান্নাতের একটি পানীয়ের প্রস্রবণের নাম, যা হতে নেককার লোকগণ পানীয় পান করবে। সে খালেস পানীয় আল্লাহর নিকটতম ও একান্ত প্রিয় বান্দাগণ পান করবে এবং তাতে কর্পূর মিশ্রিত করে সাধারণ জান্নাতীগণকে পান করানো হবে। কেউ কেউ বলেন, জান্নাতীদের জন্য শীতল কাফূরের পানীয় হবে, আর এ যানজাবীল হবে মেশকের সুগন্ধ মিশ্রিত এক শ্রেণির খাবার। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে জান্নাতী লোকদের পানাহারের যেসব বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তা দুনিয়ার কোনো বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়- তাই বাস্তব কথা। কেননা দুনিয়ার যানজাবীলের সাথে জান্নাতের যানজাবীলের কোনো সাদৃশ্য নেই।

سَلْسَبِيْل-এর অর্থ : 'সালসাবীল' বলতে এমন পানি বুঝায় যা মিষ্টি, হালকা, সুপেয় ও সুরুচিসম্পন্ন হবে বিধায় তা কণ্ঠনালী হতে খুব সহজে নির্গলিত হবে। অধিকাংশ তাফসীরকার মনে করেন, 'সালসাবীল' শব্দটি এখানে কোনো নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। তার দ্বারা প্রস্রবণের পরিচিতিই পাওয়া যায় মাত্র।

অনুবাদ :

١٩. وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج بِصِفَةِ الْوِلْدَانِ لَا يَشِيْبُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لِحُسْنِهِمْ وَانْتِشَارِهِمْ فِى الْخِدْمَةِ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا مِنْ سِلْكِهِ اَوْ مِنْ صَدَفِهِ وَهُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فِىْ غَيْرِ ذٰلِكَ ـ

১৯. তাদেরকে পরিবেশন করবে চির-কিশোরগণ কৈশরে স্থিতিশীল, যারা কখনো বৃদ্ধ হবে না। যখন তুমি তাদের দেখবে তখন ধারণা করবে তাদের সৌন্দর্য ও সেবা-কর্মে বিক্ষিপ্ততায় যেন তারা বিক্ষিপ্ত মুক্তা তার মালা অথবা ঝিনুক হতে বিক্ষিপ্ত। অন্য অবস্থার তুলনায় মুক্তার এ অবস্থায়ই অধিকতর মনোমুগ্ধকর হয়।

٢٠. وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ اَىْ وُجِدَتِ الرُّؤْيَةُ مِنْكَ فِى الْجَنَّةِ رَاَيْتَ جَوَابُ اِذَا نَعِيْمًا لَا يُوْصَفُ وَّمُلْكًا كَبِيْرًا وَاسِعًا لَا غَايَةَ لَهٗ ـ

২০. আর তুমি যখন সেথায় দেখবে। অর্থাৎ যদি তোমার বেহেশত দেখার সুযোগ হয় দেখতে পাবে তা اِذَا -এর জওয়াব সুমহান অনুগ্রহরাজি যার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত এবং সুবিশাল রাজ্য সুবিস্তৃত, যার শেষ সীমা নেই।

٢١. عٰلِيَهُمْ فَوْقَهُمْ فَنَصْبُهٗ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَهُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَاِ بَعْدَهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الْيَاءِ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهٗ خَبَرُهٗ وَالضَّمِيْرُ الْمُتَّصِلُ بِهٖ لِلْمَطُوْفِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ حَرِيْرٍ خُضْرٌ بِالرَّفْعِ وَّاِسْتَبْرَقٌ ز بِالْجَرِّ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَهُوَ الْبَطَائِنُ وَالسُّنْدُسُ الظَّهَائِرُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ عَكْسُ مَا ذُكِرَ فِيْهِمَا وَفِىْ اُخْرٰى بِرَفْعِهِمَا وَفِىْ اُخْرٰى بِجَرِّهِمَا وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَفِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْ ذَهَبٍ لِلْاِيْذَانِ بِاَنَّهُمْ يُحَلَّوْنَ مِنَ النَّوْعَيْنِ مَعًا وَمُفَرَّقًا وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا مُبَالَغَةً فِىْ طَهَارَتِهٖ وَنَظَافَتِهٖ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا ـ

২১. সেই বেহেশতীগণের উপর তা ظَرْف হিসাবে مَنْصُوْب এবং পরবর্তী مُبْتَدَأ -এর خَبَر অপর এক কেরাতে শব্দটি يَاء -এর মধ্যে সাকিন যোগে مُبْتَدَأ রূপে পঠিত হয়েছে, তখন পরবর্তী বক্তব্য তার خَبَر হবে। আর তৎসংশ্লিষ্ট ضَمِيْر পূর্ববর্তী مَعْطُوْف عَلَيْه অর্থাৎ اَبْرَار -এর প্রতি رَاجِعْ হবে। রেশমি বস্ত্র سُنْدُسٌ শব্দের অর্থ حَرِيْر যা সূক্ষ্ম-সবুজ পেশ যোগে ও স্থূল রেশমি হবে اِسْتَبْرَقٌ শব্দটি যের যোগে, তা হলো পুরু রেশমি বস্ত্র, যা অভ্যন্তরভাগে ব্যবহৃত হয় এবং سُنْدس যা উপরিভাগে ব্যবহৃত হয়। অপর এক কেরাতে শব্দ দু'টি তার বিপরীতে পঠিত হয়েছে, তৃতীয় আরেক কেরাতে উভয় শব্দ পেশ যোগে পঠিত হয়েছে। অন্য এক কেরাতে উভয় শব্দ যের যোগে পঠিত হয়েছে, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে অন্যত্র স্বর্ণ নির্মিত উল্লিখিত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, উভয় প্রকার কংকনে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে। কখনো একত্রিতভাবে, আর কখনো পৃথক পৃথকভাবে। এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় উৎকর্ষিত, যা জাগতিক পানীয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত

٢٢. اِنَّ هٰذَا النَّعِيْمَ كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ـ

২২. নিশ্চয় তা এ সকল অনুগ্রহ তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রয়াস স্বীকৃত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ" : নাফে', হামযা ও ইবনে মুহাসেন يَاء -তে سَاكِنْ এবং هَا -তে كَسْرَة দিয়ে عَالِيْهِمْ পড়েছেন خَبَر مُقَدَّمْ হিসাবে, তখন ثِيَابُ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ বাকি ক্বারীগণ يَاء -তে فَتْح দিয়ে এবং هَا -তে ضَمَّة দিয়ে عَالِيَهُمْ পড়েছেন। ইবনে সীরীন, মুজাহিদ, আবূ হাইওয়া, ইবনে আবূ আবলাহ عَلَيْهِمْ পড়েছেন, আবূ উবাই প্রথমোক্ত কেরাতকে পছন্দ করেছেন, হযরত ইবনে মাসউদের কেরাত عَالِيَهُمْ -এর উপর ভিত্তি করে। −[ফাতহুল কাদীর]

আর জমহুর ثِيَابُ -কে سُنْدُسٍ -এর দিকে إِضَافَتْ করে ثِيَابُ سُنْدُسٍ পড়েছেন, আর আবূ হাইওয়া, ইবনে আবূ আবলা ثِيَابٌ এ- تَنْوِيْن যুক্ত করে উভয়ের মধ্যে قَطْع করে আর سُنْدُسٌ এ- رَفْع দিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ سُنْدُسٌ -কে ثِيَابٌ -এর صِفَتْ হিসাবে পড়েছেন। আর خُضْرٌ হলো سُنْد -এর صِفَتْ আর إِسْتَبْرَقٌ হলো سُنْدُسٍ -এর উপর عَطْف −[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির হতে বর্ণিত আছে, হযরত আকরামা (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) একবার নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি খেজুর পাতার বুনানো চাটাইতে শায়িত অবস্থায় রয়েছেন। আর চাটাইর দাগ তাঁর দেহ মোবারকে পড়েছে। হযরত ওমর এটা দেখে কেঁদে ফেললেন। তা দেখে নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কারণে কাঁদছ? তখন হযরত ওমর (রা.) রোম সম্রাট ও আবিসিনিয়ার সম্রাটদের বিলাস-পরায়ণতা, চাকচিক্য, আরামপ্রিয়তা এবং তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করলেন। আর বললেন− তারা এমনি শান-শওকতের অবস্থায় রয়েছে, আর আপনি দীন-দুনিয়ার মহান সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে খেজুর পাতার চাটাইতে শয়ন করছেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাদের জন্য এ জগতের সুখ-সম্পদ হোক এবং আমাদের জন্য হোক পরকালের সুখ-সম্পদ− এতে কি তুমি খুশি নও? তখন আল্লাহ তা'আলা وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ .... আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। −[লোবাব]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ الخ : উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরিবেশনের মাধুর্য যে পান ভোজনের আনন্দকে বৃদ্ধি করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বর্গবাসীদের পানীয়-আহার্য ও পানীয়সমূহ পরিবেশনের জন্য এমন সব স্বর্গীয় বালকেরা নির্ধারিত রয়েছে, যারা চিরজীবন বালকই থাকবে, বৃদ্ধ হবে না। আর তারা এমন সুন্দর সুন্দর রং-রূপের অধিকারী হবে যে, [হে শ্রোতাবৃন্দ!] তোমরা যখনি তাদেরকে দেখতে পাবে তোমাদের মনে হবে যে, তারা চলাফেরায় সুন্দর সুন্দর মণি-মুক্তার ন্যায়। মাল্যগাঁথা মণি-মুক্তা হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটিয়ে বিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। অথবা ঝিনুক হতে নিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তার মতো ছড়িয়ে রয়েছে।

বালকসমূহকে মনি-মুক্তার সাথে তুলনা করার কারণ : মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, মণি-মুক্তার সাথে বালকদের তুলনা করার কারণ বালকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রং-রূপের বালকের অনুসারে আর চলাফেরার বিক্ষিপ্ততার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে। কারণ মণি-মুক্তাসমূহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে এক একটি এক এক অবস্থায় ঝলসিতে থাকে, তেমনি বালকগণ অপরূপ সৌন্দর্যের অবস্থায় বেহেশতবাসীদের খেতমতে ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকলে খুবই মনোরম দেখায়। সুতরাং তা অতি উত্তম তুলনা হয়েছে।

আল্লামা কাজি বায়যাবী (র.) বলেছেন, এটা একটি অতি আশ্চর্য ধরনের তুলনা হয়েছে। কারণ মুক্তা যখন ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকে, তখন অধিক সুন্দর দেখায়, একটার জ্যোতি অন্যটির উপর বিচ্ছুরিত হওয়ার ফলে একত্র অবস্থার বিপরীত হয়ে থাকে। −[কাবীর]

তুলনার জন্য لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا -কে নির্দিষ্ট করার কারণ এই যে, বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তার ঝলক সাধারণত মাল্যগাঁথা মুক্তা অপেক্ষা সৌন্দর্য দেখায়। তাই زِيْنَتْ বৃদ্ধির জন্য لُؤْلُؤ مَنْثُور নির্দিষ্ট করা হলো। −[মাদারিক]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তোমরা যখন জান্নাতে তথাকার কোনো দালান ও বিল্ডিং -এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তখন দেখতে পাবে যে, তথায় কোনো জিনিসের দুর্লভতা থাকবে না, সর্বদিকেই শুধু সকল প্রকারের নিয়ামত আর নিয়ামতে পরিপূর্ণ দেখবে। আর একটি বিশাল সাম্রাজ্য বেহেশতের সরঞ্জামাদি দ্বারা আবাদ হয়ে রয়েছে। দুনিয়ার নিঃস্ব ও সর্বনিম্ন প্রকারের দরিদ্রই হোক না কেন সে স্বীয় নেক আমলসমূহের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করলে মনে করবে তথায় সেই প্রতাপশালী সম্রাট। অর্থাৎ যেমনিভাবে মানুষ দুনিয়ার প্রশস্ততাকে ভালোবাসে তদ্রূপ বেহেশতীদের জন্য বেহেশতে তেমন স্থানের প্রসস্ততা মিলবে। আর এ সকল নিয়ামতের প্রকাশ মৃত্যুর পরেই ঘটবে। কেননা ইহকালে থেকে আমরা পরকালের বা রুহানী জগতের সকল অবস্থা অনুধাবন করা কোনো মতেই সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ الخ : কোনো কোনো তাফসীরকার এ সব কাপড় বেহেশতবাসীদের সেবায় সদা কর্মব্যস্ত বালকদের পোশাক হবে, কিংবা বেহেশতবাসীদের পালংকের উপর থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের এ ব্যাখ্যা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয় এ কারণে যে, সূরা কাহাফের ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ .

"জান্নাতিরা সূক্ষ্ম রেশমি ও কিংখাবের সবুজ কাপড় পরিধান করবে। উচ্চ আসনসমূহের উপর ঠেশ লাগিয়ে বসবে।" সুতরাং গ্রন্থকার এবং অন্যান্য অনেক তাফসীরকারদের তাফসীরই আমাদের কাছে গ্রহণীয়। অর্থাৎ তা জান্নাতবাসীরাই পরিধান করবে। তাদের শরীরের উপরেই থাকবে।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে سُنْدُسْ সৃষ্টি হবে, যা দ্বারা জান্নাতীদের পোশাক তৈরি হবে। -[তাবারানী]

শারাবান তাহুরান-এর তাৎপর্য : ইতঃপূর্বে দুই শ্রেণির পানীয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জান্নাতী লোকদের জন্য এক শ্রেণির পানীয় হবে কর্পূর মিশ্রিত। আর এক শ্রেণির পানীয় হবে যানজাবীল প্রস্রবণের পানীয়। তারপরই 'শারাবান তাহুরা' বা পরিচ্ছন্ন পানীয়ের কথা বলা হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, তা অপর দু'টি শ্রেণির তুলনায়ও অনেক উন্নত মানের পানীয়।

কেউ কেউ বলেছেন, এ পানীয় এমন উন্নত মানের হবে যে, তা পান করার পর দেহ হতে মেশকের সুগন্ধী বের হতে থাকবে আবার এরূপ কথাও পাওয়া যায় যে, এ পানীয় জান্নাতের দুয়ারের নিকট একটি প্রস্রবণে থাকবে। যাদের মনে হিংসা-প্রতারণা ও ছল-চাতুরী থাকবে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে। -[খাযেন]

আবূ কালাবা এবং ইবরাহীম (র.) বলেছেন, জান্নাতের যে পানীয়ের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে তা পান করার পর জান্নাতীদের দেহে প্রস্রাবে পরিণত হবে না; বরং তা ঘামে পরিণত হবে। যার সুগন্ধী হবে কস্তুরীর ন্যায়। -(নূরুল কোরআন)

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ هٰذَا ...... مَشْكُورًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "[তখন বলা হবে] এটা তোমাদের কর্মের প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা স্বীকৃত হলো।" এখানে চেষ্টা-প্রচেষ্টা বলতে বান্দা দুনিয়ায় সমগ্র জীবন ব্যাপী যেসব কার্যক্রম করেছে তা বুঝায়। যেসব কাজে সে স্বীয় শ্রম-মেহনত ব্যয়িত করেছে, যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে, সে সবেরই সমষ্টি-সমন্বয় হচ্ছে তার চেষ্টা, আর তার 'স্বীকৃতি' বা যথার্থ মূল্যায়ন হওয়ার তাৎপর্য হলো, তা আল্লাহর নিকট সাদরে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর জন্য বান্দার শুকরিয়ে অর্থ আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার। আর আল্লাহর দিক হতে বান্দার শোকর আদায় করার অর্থ বান্দার কার্যাবলি আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়া। মনিবের সর্বাধিক বড় অনুগ্রহ হলো, বান্দা যখন মনিবের মর্জিমতো স্বীয় কর্তব্য পালন করে তখন মনিব তার শোকর আদায় করেন।

অনুবাদ :

٢٣. اِنَّا نَحْنُ تَاكِيْدٌ لِاِسْمِ اِنَّ اَوْ فَصْلٌ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا خَبَرُ اِنَّ اَىْ فَصَّلْنَاهُ وَلَمْ نُنَزِّلْهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً.

২৩. নিশ্চয় আমি نَحْنُ শব্দটি اِنَّ-اِسْمِ এর تَاكِيْد অথবা ضَمِيْر فِعْل তোমার প্রতি কুরআনকে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি اِنَّ خَبَر এটা অর্থাৎ আমি তাকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করেছি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ অবতীর্ণ করিনি।

٢٤. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ عَلَيْكَ بِتَبْلِيْغِ رِسَالَتِهٖ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اَىِ الْكُفَّارِ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا اَىْ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ قَالَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ وَيَجُوْزُ اَنْ يُرَادَ كُلُّ اٰثِمٍ وَكَافِرٍ اَىْ لَا تُطِعْ اَحَدَهُمَا اَيًّا كَانَ فِيْمَا دَعَاكَ اِلَيْهِ مِنْ اِثْمٍ اَوْ كُفْرٍ.

২৪. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের আদেশ পালনে ধৈর্য ধারণ করো তার রিসালাত প্রচার সম্বন্ধীয় যে আদেশ তোমাকে দেওয়া হয়েছে আর অনুসরণ করো না তাদের মধ্য হতে কাফেরদের মধ্য হতে যে পাপিষ্ঠ ও অবাধ্যাচারী অর্থাৎ আতাবাহ ইবনে রবীয়াহ ও ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, এ কাজ হতে ফিরে এসো। আর প্রত্যেক পাপিষ্ঠ ও অবাধ্যাচারী উদ্দেশ্য হওয়াও জায়েজ হবে। অর্থাৎ তাদের কারো অনুসরণ করো না, সে যেই হোক না কেন। যে তোমাকে পাপ ও অবাধ্যাচারিতার প্রতি আহ্বান করে।

٢٥. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فِى الصَّلٰوةِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ.

২৫. আর তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো সালাতে সকাল ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ ফজর, জোহর ও আসর।

٢٦. وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ يَعْنِى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا صَلِّ التَّطَوُّعَ فِيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ثُلُثَيْهِ اَوْ نِصْفِهٖ اَوْ ثُلُثِهٖ.

২৬. আর রাত্রির কিয়দংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হও অর্থাৎ মাগরিব ও এশা। আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর মহিমা ঘোষণা করো তাতে নফল ইবাদত করো। যেমন ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, অর্ধ রাত্রি ও এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এ সংবাদ পেলেন যে, আবূ জাহল বলেছে– আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজ পড়তে দেখতে পাই তবে তার ঘাড় ধরে তাকে তা হতে বিরত রাখবো। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এ আয়াত উতবা ইবনে রাবীয়াহ ও অলীদ ইবনে মুগীরাকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নবী করীম ﷺ-কে নামাজ পড়তে দেখে বলেছিল– তোমাকে যদি নারীদের ন্যায় পুনরায় আচরণ করতে দেখি তবে তোমাকে ধরে তা হতে ফেরাবো। উতবা বলল, তোমার নিকট আমার কন্যা বিনা মোহরেই বিবাহ দেবো। ওয়ালীদ বলল, আমি তোমাকে অনেক ধন-সম্পদ দেবো যদি তুমি নতুন ধর্মমত ও নতুন আচরণ হতে ফিরে থাকো। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা না শুনার জন্য উপরিউক্ত وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[খাযেন]

أَثِمًا أَوْ كَفُورًا দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতে বর্ণিত أَثِمًا দ্বারা আল্লামা জালালুদ্দীন (র.) উতবাকে উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা সে-ই হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে গুনাহের কার্যের প্রতি ধাবিত করতে চেয়েছিল।

আর كَفُورًا দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা সে কুফর ও নাফরমানির প্রতি শক্তি ব্যয় করতে বেশি বেশি চেয়েছিল। আর সাধারণ অর্থের প্রতি ধাবিত হতে গেলে أَثِمْ أَوْ كَفُوْر দ্বারা সাধারণত সকল গুনাহগার ও ফাসিক-ফাজির কাফেরকেই উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। সুতরাং সকল নাফরমান থেকে বিরত ও হেফাজতে থাকার জন্য নির্দেশ আরোপ করা হয়েছে।

أَثِمْ এবং كَفُوْر-এর মধ্যে পার্থক্য : أَثِمْ শব্দের অর্থ হলো– পাপিষ্ঠ ও গুনাহগার। যে কোনো রকমের গুনাহে লিপ্ত লোককে أَثِمْ বলা হয়। আর كَفُوْر শব্দের অর্থ হলো, অবাধ্যাচারী, সত্য দীন অস্বীকারকারী। সুতরাং সব অবাধ্যাচারীই পাপিষ্ঠ; কিন্তু সব পাপিষ্ঠই অবাধ্যাচারী নয়। কারণ যে লোক গাইরুল্লাহর ইবাদত করে সে পাপিষ্ঠ, সাথে সাথে অবাধ্যাচারীও। কারণ সে গাইরুল্লাহর ইবাদত করে যেমন পাপ করেছে তেমনি আল্লাহর অবাধ্যাচারণও করেছে। –[খাযেন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আবশ্যকীয় ইবাদতসমূহের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রভুর নাম স্মরণ করুন। আর রাত্রের কিছু অংশেও তাকে স্মরণ করুন এবং সিজদা করুন। এখানে রাত্রের অংশে ইবাদত করত বলে বহু সংখ্যক তাফসীরকারদের মতে মাগরিব ও ইশাকে উদ্দেশ্য করা হয়। আর بُكْرَةً وَأَصِيْلًا দ্বারা ফজর, জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারো কারো মতে وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا দ্বারা তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা সাধারণ নফল ইবাদতসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মূলত بُكْرَةً শব্দটির অর্থ সকালবেলা অর্থাৎ صُبْحِ صَادِقْ হতে قَبْلَ الزَّوَالِ বেলা ঠিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর أَصِيْل শব্দটির অর্থ সূর্য হেলে যাওয়া হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বুঝায়। এ কারণেই بُكْرَةً দ্বারা ফজর এবং أَصِيْلًا দ্বারা জোহর ও আসর। আর أَصِيْل দ্বারা مَغْرِبْ وَعِشَاء-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا আয়াতে আমরটি ওয়াজিবের জন্য হয়েছে নাকি نُدُبْ-এর জন্য নেওয়া হয়েছে? : এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ-এর أَمْر টি ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাও কেবল মুহাম্মদ ﷺ -এর ক্ষেত্রে। আর অন্যান্যদের জন্য أَمْر টি نُدُبْ হয়।

অনুবাদ :

٢٧. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ الدُّنْيَا يَخْتَارُوْنَ عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا شَدِيْدًا اَيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يَعْمَلُوْنَ لَهٗ .

২৭. এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দান করে। এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে ভয়ঙ্কর। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এবং তজ্জন্য আমল করে না।

٢٨. نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ قَوَّيْنَا اَسْرَهُمْ ج اَعْضَاءَهُمْ وَمَفَاصِلَهُمْ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا جَعَلْنَا اَمْثَالَهُمْ فِي الْخِلْقَةِ بَدَلًا مِنْهُمْ بِاَنْ نُهْلِكَهُمْ تَبْدِيْلًا تَاكِيْد وَ وَقَعَتْ اِذَا مَوْقَعَ اِنْ نَحْوَ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ لِاَنَّهٗ تَعَالٰى لَمْ يَشَاْ ذٰلِكَ وَاِذَا لِمَا يَقَعُ .

২৮. আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং সুদৃঢ় করেছি সুঠাম করেছি তাদেরকে গঠন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জোড়া। আমি যখন ইচ্ছা করবো, পরিবর্তন করবো সৃষ্টি করবো তাদের অনুরূপ সৃষ্টির মধ্যে তাদের পরিবর্তে তাদেরকে ধ্বংস করত পরিবর্তন করার মতো পরিবর্তন তা تَاكِيْد রূপে উল্লিখিত। এখানে اِذَا অব্যয়টি اِنْ -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ কেননা আল্লাহ তা'আলা তা ইচ্ছ করেননি। অথচ اِذَا বাস্তবে পরিণত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

٢٩. اِنَّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ تَذْكِرَةٌ ج عِظَةٌ لِلْخَلْقِ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا بِالطَّاعَةِ .

২৯. তা এ সূরা একটি উপদেশ মানুষের জন্য নসিহত সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক আনুগত্যের মাধ্যমে।

٣٠. وَمَا تَشَآءُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ اِتِّخَاذَ السَّبِيْلِ بِالطَّاعَةِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط ذٰلِكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِيْ فِعْلِهٖ .

৩০. আর তারা ইচ্ছা করবে না শব্দটি يَا، ও تَا، যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। আনুগত্য মাধ্যমে পথ অবলম্বন করার ব্যাপারে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তা নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানময় তাঁর কার্যে।

٣١. يُدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ط جَنَّتِهٖ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالظّٰلِمِيْنَ نَاصِبُهٗ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ اَيْ اَعَدَّ يُفَسِّرُهٗ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا وَهُمُ الْكَافِرُوْنَ .

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন তাঁর সৃষ্টি বেহেশতে, তারা হলো মু'মিনগণ। আর অত্যাচারীগণ তার নসবদানকারী فِعْل উহ্য। অর্থাৎ اَعَدَّ পরবর্তী বাক্যাংশ তারই ব্যাখ্যা করছে তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি পীড়াদায়ক, তারা হলো কাফেরগণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ : এটা خَبَر اِنَّ আর وَيَذَرُوْنَ الخ -এর উপর عَطْف ।

قَوْلُهُ اِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا : এখানে اِذَا টি اِنْ অর্থে ব্যবহৃত। অথবা اِذَا -এর স্থলে اِنْ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। [যেমনি আল্লামা যামাখশারী (র.) মত ব্যক্ত করেছেন।] এটা আল্লাহর বাণী وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ -এর মতো। অদ্রূপ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ এ প্রসঙ্গে মূলকথা হলো, اِنْ টি কোনো اِحْتِمَالِيْ বিষয়ের জন্য এবং اِذَا টি কোনো تحقيقى বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এখানে আল্লাহর مَشِيَّتْ -এর وُجُوْد বা অস্তিত্ব আসে নাই, তাই এখানে اِنْ ব্যবহার করা اَحَقّ ছিল।

قَوْلُهُ وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ : مَا আর إِلَّا টি حَرْفِ إِسْتِثْنَاء। أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ টি مُسْتَثْنٰى এবং تَشَاءُوْنَ টি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ

قَوْلُهُ وَالظَّالِمِيْنَ : এটা গ্রন্থকারের মতে أَعَدَّ -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অথবা উহ্য يُعَذِّبُ দ্বারা مَنْصُوْب হয়েছে। অথবা উহ্য يُعَذِّبُ দ্বারা مَنْصُوْب হয়েছে। জমহুরের মতে اَلظَّالِمِيْنَ টি مَنْصُوْب এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জোবাইর ও অন্যান্যগণ رَفْع পড়েছেন। ইমাম রাযী (র.) حَالَتِ رَفْع -কে পছন্দ করেননি। কারণ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ -এর عَطْف করলে ظَالِمُوْنَ যেহেতু جُمْلَه إِسْمِيَّه হবে। إِسْمِيَّه-এর عَطْف - فِعْلِيَّه -এর উপর لَازِمْ আসে, তা উত্তম নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الخ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এরা দুনিয়ার মায়া মমতা ও পার্থিব সুখ-সম্পদ আর ভোগ-বিলাসের অত্যধিক আসক্তি হেতুই আপনার নসিহত কবুল করে না। যা সহজ ও শীঘ্রলভ্য তারা তা-ই চায় সব কিছুই তাড়াতাড়ি পেতে চায়, আখেরাতের প্রতি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। আখেরাতকে আদৌ বিশ্বাস করে না, মনে করে জন্মিলাম, বাঁচলাম, আবার মারলাম, মাটির শরীর মাটিতেই মিশে যাবে, আখেরাত আবার কি জিনিস। অথচ আখেরাত একটি ভয়াবহ দিবস দুনিয়ার ভালোবাসা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই সত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে মনে হিংসা জাগে। −[মা'আরিফ, তাহের]

قَوْلُهُ تَعَالٰى نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ..... تَبْدِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমরাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জোড়া জোড়া শক্ত করে দিয়েছি। আমরা যখনই চাইবো, তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলবো।"

এর তাৎপর্য এই যে, যেসব লোক এ পার্থিব জীবনকে ভালোবেসে ঈমান আনয়ন হতে বিরত রয়েছে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, আমরাই তাদেরকে সুন্দর দেহাবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি। আর আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধ্বংস করে অন্যদেরকে সৃষ্টি করতে পারি। এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু করবার নেই। যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম তেমনি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সক্ষম। সুতরাং এ সব কথা ভেবে তাদের ঈমান গ্রহণ করা অপরিহার্য। −[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ...... عَلِيْمًا حَكِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটি একটি নসিহত বিশেষ এক্ষণে যার ইচ্ছা নিজের রবের নিকট যাওয়ার পন্থাবলম্বন করতে পারে। আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ চাইবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী।"

অর্থাৎ এ সূরা বা এ আয়াতগুলো হলো নসিহতস্বরূপ। তা হতে কেউ ইচ্ছা করলে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তা হতে স্বতই প্রমাণিত হলো যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। সেই স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্যলাভের পন্থাবলম্বন করতে পারে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তার এ ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার 'মশিয়াতে কাউনিয়া' বা ইচ্ছার অধীন। আল্লাহর মশিয়াতে কাউনিয়া না থাকলে বান্দার ইচ্ছায় কিছুই হতে পারে না। এ কথাটিই বলা হয়েছে।

পরের আয়াত وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ এ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সামনে মজবুর বা বাধ্য; বরং এর অর্থ এই যে, সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার আযলী ইচ্ছার আওতাধীন, সেক্ষেত্রে শরয়ী ইচ্ছা থাক বা না-ই থাক। বান্দার সৎকর্মে আল্লাহর কাউনী এবং শরয়ী উভয় ইচ্ছার সমন্বয় ঘটে; কিন্তু অপকর্মে কাউনী ইচ্ছা থাকলেও শরয়ী ইচ্ছা অবশ্যই থাকে না। এ কারণেই শাস্তি এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, 'কেউ নিজেকে হেদায়েত করতে পারে না, ঈমানের সীমায় অনুপ্রবেশ করতে পারে না, নিজের কোনো কল্যাণ করতে পারে না; আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া।" −[ইবনে কাছীর, সাফওয়া]

يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ -এর তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করেন।" গ্রন্থকার 'রহমত'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'জান্নাত' দ্বারা। এর তাৎপর্য হলো, জান্নাতে কেউ নিজের যোগ্যতা বলে প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহর অনুগ্রহ দানে, ইহসান ও ইচ্ছার বলে− বান্দার কোনো যোগ্যতার বলে নয় রহমতের ব্যাখ্যা "জান্নাত" এ কারণে যে, আল্লাহর রহমতের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হলো [বান্দার ক্ষেত্রে] জান্নাত দান। ইমাম রাযী (র.) এবং আরো কতক তাফসীরকার 'রহমত' -এর ব্যাখ্যা করেছেন 'ঈমান' দ্বারা। কারণ ঈমানও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম রহমত। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি ঈমান আনয়নের শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলেই কেবল কোনো ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করতে পারে।

আল্লামা খাযেন রহমতের তাফসীর করেছেন, 'দীন' দ্বারা। তখন আয়াতের তাৎপর্য এই হবে যে, দীনে অনুপ্রবেশ করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ যাকে চান তাকে এই দীন গ্রহণের তৌফিক দান করেন। −[খাযেন, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ : সূরা আল-মুরসালাত

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ اَلْمُرْسَلَاتُ অবলম্বনে। এতে ২টি রুকূ', ৫০টি আয়াত, ১৮১টি শব্দ ও ৮১৬ টি অক্ষর রয়েছে। একে সূরাতুল আরফও বলা হয়। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। কেননা সূরার বিষয়বস্তু হতে প্রমাণিত হয় যে, এটা মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন, পরকাল ও মহাবিচার দিন- হাশরের কথা। ১-৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহাপ্রলয় কিয়ামত সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শনে মৃদু বায়ু, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, মেঘ সঞ্চালনকারী বায়ু এবং মেঘ পরিচালনাকারী বায়ুর শপথ করে বলেছেন, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ও অবশ্যই ঘটিতব্য ব্যাপার। কেননা প্রথমে আল্লাহ মানব কল্যাণে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহ করে তাকে ক্রমান্বয়ে সতেজ, প্রচণ্ড ও ঘূর্ণিবায়ুতে পরিণত করেন। অতঃপর বায়ু দ্বারা কালো আঁধারময় মেঘমালা নিয়ে আসেন। ফলে ধরণীর উপরে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হয় এবং গাছপালা, উদ্ভিদ ও ঘরবাড়িকে মথিত ও লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এ প্রলয় সৃষ্টি মুহূর্তে মু'মিন বান্দাদের মনে আল্লাহর স্মরণ জেগে উঠে এবং বেঈমান কাফিরদের মনে সৃষ্টি হয় অনুশোচনা অথবা ভীতি। মহাক্ষমতাবান আল্লাহ যখন এ প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেন তদ্রূপ এ পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করায়ও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৮-১৫ নং আয়াতে সে মহাপ্রলয় তথা কিয়ামত সংগঠনের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে- উর্ধ্বলোকের সমস্ত ব্যবস্থাপনা সেদিন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ স্খলিত হয়ে আলোহীন হয়ে পড়বে। আকাশ ফেটে যাবে। পর্বতমালা পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। আর সেদিন সমস্ত নবী-রাসূলগণকে সাক্ষীর জন্য সমবেত করা হবে যাদের কথা কাফেরগণ অবিশ্বাস করছে। সেদিনটি হলো বিচার দিন এবং চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। এ দিনটির মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পক্ষে খুবই ভয়াবহ ও দুর্গতির দিন হবে। তাদের দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা থাকবে না।

১৬-৪০ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতার অনুকূলে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে এবং দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। বলা হয়েছে- নগণ্য এক বিন্দু পানি যা এ ভূমির উৎপাদিত উপকরণে পরিণত করেছেন। তাকে নির্দিষ্ট একটি সময় নারীর গর্ভাশয়ে রেখে একটি অভিনব পূর্ণ অবয়বরূপী মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তার প্রয়োজনে কত অফুরন্ত সম্পদ ভূমির বুক চিরে বের হয়ে থাকে। আবার সবই সে ভূমির বুকেই লয় হয়। মানুষের লাশটিও সেই ভূমির বুকেই স্থান পায়। সুতরাং যে একক অনন্য শক্তিধর সত্তা এটা করতে সক্ষম হলেন, তিনি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না; এটা কোনো নির্বোধ লোকও স্বীকার করবে না। যারা এ কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হবে না তাদের পরকালে দুঃখের সীমা থাকবে না। প্রচণ্ড সূর্যতাপে তারা ছায়া খুঁজতে থাকবে। সেদিন জাহান্নামের ধুম্রকে কুণ্ডলীর আকারে দেখতে পেয়ে তারা তার তলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটাছুটি করবে; কিন্তু মূলত তার ছায়া না হবে শীতল, আর না পারবে সূর্যতাপকে বাধা দান করতে। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্গতির সীমা থাকবে না। তাদের অপরাধ যখন আল্লাহর আদালতে প্রমাণ হবে তখন তাদের ওজর-আপত্তি করার বা কথা বলার কোনো অবকাশ থাকবে না। এ দিনই হবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন।

৪১-৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঐ দিন মুত্তাকী-পরহেজগার লোকগণ মহাশান্তিতে থাকবে। জান্নাতে মনের স্বাদ মিটিয়ে ফলমূল আহার করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে পরম আনন্দে কাল কাটাবে।

উপসংহারে আল্লাহ কাফেরগণকে ধমক দিয়ে বলেছেন, তোমরা অপরাধী ও জালিম- এ দুনিয়ায় কয়েকটি দিন স্বাদ আস্বাদন নাও, পরকালে পাবে আসল সাজা। তোমাদের উচিত কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হওয়া। এ কুরআনই যদি তোমাদেরকে হেদায়েত করতে না পারে, তবে কোন্ গ্রন্থ তোমাদেরকে হেদায়েত করতে পারবে?

সূরাটির শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বুখারী শরীফে একটি বর্ণনা এই মর্মে পাওয়া যায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা একদা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে লাইলাতুল জিন -এ (لَيْلَةُ الْجِنِّ) ভ্রমণ করছিলাম। মিনা নামক স্থানের একটি গর্তে আমরা উপনীত হলাম। ইত্যবসরেই সূরা وَالْمُرْسَلَاتِ অবতীর্ণ হলো। রাসূলে কারীম ﷺ সূরা আল-মুরসালাত পড়ছিলেন এবং হযরতের মুখ এটার পবিত্র তেলাওয়াতের অবস্থায় একটু রসাল হয়ে উঠল। শুনে আমিও তেলাওয়াত শুরু করলাম। হঠাৎ একটি সাপ এসে আমাদের আক্রমণ করল। হুযূর ﷺ বললেন, একে হত্যা করো। তখনই আমরা তার প্রতি আক্রমণ করলে তা পলায়ন করল। তখন হুযূর ﷺ বললেন, যেভাবে তোমরা উক্ত সর্পের ক্ষতিগ্রস্ত হতে রক্ষা পেলে সেও তোমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। (মা'আরিফ, ইবনে কাছীর, সাবী) কারো কারো মতে, এটা মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে একটি।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আদ-দাহারে মানবজাতির ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমনও সময় ছিল যখন মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না, আল্লাহ তা'আলাই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আর অত্র সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং কিয়ামতের যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। -[নূরুল কোরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا اَيِ الرِّيَاحُ مُتَتَابِعَةً كَعُرْفِ الْفَرَسِ يَتْلُوْ بَعْضُهُ بَعْضًا وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ ـ

১. শপথ বায়ুর যা অগ্রে-পশ্চাতে প্রেরিত হয় অর্থাৎ ধারাবাহিক বাতাস, যেমন ঘোড়াসমূহ একটি অপরটির পিছনে চলতে থাকে, عُرْفًا শব্দটি حَالْ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে।

٢. فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا اَلرِّيَاحُ الشَّدِيْدَةُ ـ

২. আর প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার সজোরে প্রবাহিত বাতাস।

٣. وَالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا اَلرِّيَاحُ تُنْشِرُ الْمَطَرَ ـ

৩. শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর যে বাতাস বৃষ্টি সঞ্চালন করে।

٤. فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا اَىْ اٰيَاتُ الْقُرْاٰنِ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ـ

৪. আর শপথ সে আয়াতসমূহের যা পার্থক্যকারী অর্থাৎ কুরআনের আয়াত যা হক ও বাতিল এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।

٥. فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا اَيِ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِلُ بِالْوَحْيِ اِلَى الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ يُلْقُوْنَ الْوَحْيَ اِلَى الْاُمَمِ ـ

৫. আর তার শপথ যে মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছিয়ে দেয় অর্থাৎ সেই ফেরেশতা যিনি নবী-রাসূলগণের নিকট প্রত্যাদেশ আনয়ন করে, যাতে তিনি তা স্বীয় উম্মতের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

٦. عُذْرًا اَوْ نُذْرًا اَىْ لِلْاِعْذَارِ وَلِلْاِنْذَارِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ ذَالِ نُذُرًا وَقُرِئَ بِضَمِّ ذَالِ عُذُرًا ـ

৬. অনুশোচনাস্বরূপ কিংবা সতর্কতাস্বরূপ অর্থাৎ অনুশোচনার জন্য ও আল্লাহ তা'আলা হতে ভয় প্রদর্শনের জন্য। এক কেরাতে نُذُرًا শব্দটি ذَالْ-এর মধ্যে পেশযোগে এবং عُذُرًا শব্দটি ذَالْ-এর মধ্যে পেশযোগে পঠিত হয়েছে।

٧. اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنَ الْبَعْثِ وَالْعَذَابِ لَوَاقِعٌ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ ـ

৭. নিশ্চয় তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদেরকে পুনরুত্থান ও শাস্তি সম্পর্কে তা অবশ্যম্ভাবী নিশ্চিতরূপে বাস্তব রূপ লাভ করবে

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا" : عُرْفًا শব্দটি مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ اَلْمُرْسَلَاتِ لِاَجْلِ الْعُرْفِ অথবা, حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে আগত। অথবা, مَصْدَر হওয়ার কারণে مَنْصُوْب যেন বলা হয়েছে وَالْمُرْسَلَاتِ اِرْسَالًا অথবা حَرْف جَرّ -কে مَحْذُوْف করে مَنْصُوْب করা হয়েছে, মূলত وَالْمُرْسَلَاتِ بِالْعُرْفِ ছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا : عُذْرًا اَوْ نُذْرًا উভয়ই ذِكْرًا হতে بَدَل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে, অথবা مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ لِلْاِعْذَارِ اَوِ الْاِنْذَارِ আর কারো মতে উভয় حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে مُعْذِرِيْنَ اَوْ مُنْذِرِيْنَ –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا" : জমহুর لَامْ এ- سَاكِنٌ এবং قَافْ -কে تَخْفِيْف করে اِسْم فَاعِل হিসেবে مُلْقِيَاتِ পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) لَامْ -এ فَتْح দিয়ে এবং قَافْ -এ تَشْدِيْد যুক্ত করে تَلْقِيَةٌ হতে উদ্ভূত হিসেবে مُلَقِّيَاتِ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا **আয়াতে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর উভয় শব্দের ذَالْ বর্ণে سَاكِنْ যুক্ত করে عُذْرًا اَوْ نُذْرًا পড়েছেন। আর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) এবং তাঁর ছেলে হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ উভয় শব্দে ذَالْ -এ ضَمَّة দিয়ে عُذُرًا اَوْ نُذُرًا পড়েছেন। আর হারমিয়ান, ইবনে আমের ও আবূ বকর عُذْرًا -এর ذَالْ -এ سَاكِنْ যুক্ত করে আর نُذُرًا -এর ذَالْ -এ ضَمَّة যুক্ত করে عُذْرًا اَوْ نُذُرًا পড়েছেন।

জমহুর اَوْ দ্বারা عَطْف করে عُذْرًا اَوْ نُذْرًا পড়েছেন, আর হযরত ইবরাহীম তাইমী এবং কাতাদাহ اَلِفْ বিহীন কেবল وَاوْ দ্বারা عَطْف করে عُذْرًا وَنُذْرًا পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ "اَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا" : গ্রন্থাকার عُرْفًا -এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে চালিত বা ধারাবাহিকভাবে চালিত। অর্থাৎ যে বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। তাফসীরকারদের মতে এটার তাৎপর্য হলো, সেই আযাবের বা শাস্তির বায়ু যা জালিমদেরকে ধ্বংস করে দেয়। কোনো কোনো তাফসীরকার عُرْفًا -এর অর্থ 'কল্যাণের জন্য' করেছেন। বলাবাহুল্য বৃষ্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, "শপথ সেই বাতাসের যা পরপর ও ক্রমাগতভাবে প্রেরিত হয়।" অথবা "শপথ সেই বায়ুর যা কল্যাণের জন্য প্রেরিত।"

কালবী, মুকাতিল ও আবূ সালেহ বলেছেন, مُرْسَلَاتِ হলো مَلَائِكَة -এর বিশেষণ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় ঐশীবাণী আদেশ-নিষেধ দিয়ে যুগে যুগে পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছেন। অথবা মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদেরকে ঐশীবাণী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।'

কোনো কোনো তাফসীরকার তাকে اَنْبِيَاء -এর বিশেষণ বলে দাবি করেছেন। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হলো, 'শপথ নবীদের নামে যারা আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাঁর শরিয়তের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অথবা মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত।" –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا .... عُذْرًا اَوْ نُذْرًا" : عَاصِفَاتِ শব্দটি عَصْفٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া, উদ্দেশ্য ঝটিকা ও ঘূর্ণিবায়ু। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, 'শপথ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবায়ুর।' কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, عَاصِفَاتِ শব্দটি ফেরেশতার বিশেষণ। সুতরাং অর্থ হলো, 'শপথ ফেরেশতাগণের যাদেরকে ঘূর্ণিবায়ুর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।" –[ফাতহুল কাদীর, খাযেন]

قَوْلُهُ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا : গ্রন্থকার এটার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ছাড়া এটার অপর এক ব্যাখ্যা হলো, 'শপথ সেসব ফেরেশতাদের যারা মেঘমালা এদিক সেদিক সঞ্চালন করে' অথবা যারা ওহী অবতীর্ণকালে স্বীয় ডানা বাতাসে প্রসারিত করে দেয়। যাহহাক বলেছেন, আয়াতের তাৎপর্য হলো, তারা আদম সন্তানদের আমলনামা এবং কিতাবাদি প্রসারিত করে দেয়।

–[ফাতহুল কাদীর, খাযেন]

قَوْلُهُ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا : গ্রন্থকার একে পবিত্র কুরআনের বিশেষণ গণ্য করত তাফসীর করেছেন, "শপথ সেই আয়াতসমূহের যা হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।" আল্লামা ইবনে কাছীর, সাবূনী, শাওকানী ও আরো অনেকেই এটাকে ফেরেশতার বিশেষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, "শপথ সেসব ফেরেশতাদের যারা এমন সব জিনিস নিয়ে আসে যা দ্বারা হক-বাতিল ও হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।" আর কোনো কোনো তাফসীরকার তাকে রাসূলের বিশেষণ গণ্য করে অর্থ করেছেন, "শপথ রাসূলগণের যারা সত্য-মিথ্যার মধ্যে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়।"

قَوْلُهُ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا : জমহুর এটার অর্থ করেছেন, 'শপথ সেসব ফেরেশতাদের যারা জিকির অবতীর্ণ করে।' অতঃপর জিকির -এর ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন উপদেশ, কেউ বলেছেন ওহী, কেউ বলেছেন ওহী সম্বলিত আল্লাহর কিতাব– যা ফেরেশতাগণ নবী-রাসূলদের কাছে বহন করে নিয়ে আসে। কেউ বলেছেন, এটার তাৎপর্য হলো হযরত জিবরাঈল (আ.), তিনিই আল্লাহর ওহী নবীগণের কাছে নিয়ে অবতীর্ণ হন, তবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর সম্মানার্থে। হযরত কুতরুব বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, "রাসূলগণের শপথ যারা আল্লাহর ঐশী বিধান উম্মাতগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেন।" এ সবের মধ্যে প্রথমটাই উত্তম ও অগ্রাধিকার প্রাপ্য।

قَوْلُهُ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا : এ আয়াতটি مُلْقِيَاتِ ذِكْرًا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ জিকির তথা ওহী নবীগণের কাছে অবতীর্ণ করা হয় যাতে তা মু'মিনদের জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে ওজর-আপত্তির কারণ হয় এবং কাফেরদের জন্য সতর্ককারী হয়ে যায়। –[মা'আরেফুল কোরআন] এ আয়াতের অপর এক তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা নবীগণের কাছে ওহী অবতীর্ণ করে তাঁর বিধান বান্দাগণকে জানিয়ে দেন, যাতে বান্দারা এ ওজর-আপত্তি না করতে পারে যে, আমাদের কাছে কোনো বিধান আসেনি, আমরা কোনো নবীর দাওয়াত পাইনি। আর আল্লাহ তা'আলা এ ওহীর মাধ্যমে বান্দাগণকে সতর্ক করে দিতে চান যে, আল্লাহর বিধান না মানলে যে পরকাল অবশ্যই আসবে তাতে তারা শাস্তির মুখোমুখি হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى "إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।" এটার আর একটি অর্থ হতে পারে, তা হলো "তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে অর্থাৎ কিয়ামত ও পরকাল তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।"

অর্থাৎ পরকালে যেসব জিনিস ও কর্মকাণ্ড সংঘটিত হবে বলে ওয়াদা করা হয়েছে অথবা ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সূরায় যেসব জিনিসের নামে শপথ করা হয়েছে তা অস্পষ্ট রাখার কারণ : আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় যেসব জিনিসের নামে শপথ করেছেন তা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত রেখেছেন। এ কারণেই বিভিন্ন তাফসীরকার তা নির্ণয়ে বিভিন্ন রকমের কথা বলেছেন, তবে এ মহাবিশ্বে এবং মানবজীবনে সেসব জিনিসের কি প্রভাব তা উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– এ সব জিনিস অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত হয়েও তার প্রভাব যেমন সত্য তেমনি এ সব জিনিসের শপথ করে যে পরকালের সত্যতার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট হলেও অবশ্যই সত্য ও বাস্তব। যেমন এ সব বস্তু বাস্তব ও সত্য। –[যিলাল]

অনুবাদ :

٨. فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ مُحِيَ نُوْرُهَا.

৮. যখন নক্ষত্ররাজীর আলো নির্বাপিত হবে তার আলো বিলীন হয়ে যাবে।

٩. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ شُقَّتْ.

৯. আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে খণ্ড-বিখণ্ড হবে।

١٠. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ فُتِّتَتْ وَسُيِّرَتْ.

১০. আর যখন পর্বতমালা উন্মূলিত হবে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকবে।

١١. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ بِالْوَاوِ وَبِالْهَمْزَةِ بَدَلًا مِنْهَا اَىْ جُمِعَتْ لِوَقْتٍ.

১১. এবং রাসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। أُقِّتَتْ শব্দটি وَاوْ যোগে এবং তৎপরিবর্তে হামযা যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ যথাসময় উপস্থিত করা হবে।

١٢. لِأَيِّ يَوْمٍ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ أُجِّلَتْ لِلشَّهَادَةِ عَلٰى أُمَمِهِمْ بِالتَّبْلِيْغِ.

১২. কোন দিবসের জন্য মহান দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? তাদের উম্মতগণের প্রতি প্রচার করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দানের জন্য।

١٣. لِيَوْمِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ إِذَا اَىْ وَقَعَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ.

১৩. বিচার দিবসের জন্য সৃষ্টি জগতের মধ্যে এটা হতে إِذَا -এর জওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সকলের বিচারকার্য সংঘটিত হবে।

١٤. وَمَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ تَهْوِيْلٌ لِشَأْنِهِ.

১৪. বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান? এটা সেদিনের ভয়াবহতা নির্দেশক।

١٥. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ هٰذَا وَعِيْدٌ لَهُمْ.

১৫. সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ এটা তাদের প্রতি ধমকীস্বরূপ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ" فِي التَّرْكِيْبِ : এ বাক্যটি قَوْل مُقَدَّرْ -এর مَقُوْلَه, যা إِذَا -এর জবাব হয়েছে, অথবা أُقِّتَتْ-এর ضَمِيْر হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "مَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ" : مَا হলো مُبْتَدَأْ আর أَدْرَاكَ হলো তার خَبَرْ অথবা أَدْرَاكَ হলো مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ আর مَا হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ এটা ইমাম সীবাওয়াইহ-এর অভিমত। আর দ্বিতীয় مَا হলো مُبْتَدَأْ আর يَوْمُ الْفَصْلِ হলো তার خَبَرْ মুবতাদা এবং খবর মিলে أَدْرٰى ক্রিয়ার مَفْعُوْل ثَانِىْ -এর স্থানে পতিত হয়েছে। أَدْرٰى ক্রিয়াটি স্বীয় مَفْعُوْل দু'টিসহ خَبَرْ হয়েছে। আর প্রথম বাক্যটি হলো مُبْتَدَأْ –[ফাতহুল কাদীর]

أُقِّتَتْ-এর هَمْزَة কোথা হতে এসেছে? : أُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيْتٌ হতে উদ্ভূত, তাহলে هَمْزَة আসল কোথা হতে? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা শাওকানী বলেছেন, أُقِّتَتْ-এর هَمْزَة টি وَاوْ مَضْمُوْمَة হতে বদল হয়ে هَمْزَة হয়েছে। কারণ যেসব وَاوْ ضَمَّة বিশিষ্ট হয় আর তার ضَمَّة টি লাযেমী বা আবশ্যকীয় হয়, তখন সেই وَاوْ-কে هَمْزَة দ্বারা বদল করা বৈধ হয়। আবূ আমর, শাইবানী এবং আ'রায وَاوْ দিয়ে وُقِّتَتْ পড়িছেন। বাকি ক্বারীগণ তাকে هَمْزَة দিয়ে أُقِّتَتْ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

قَوْلُهُ إِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ : ইমাম রাযী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি জবাব দিয়েছেন– ১. إِذَا -এর জবাব পূর্বে অর্থাৎ إِنَّ تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ إِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ তিনি বলেছেন, এ জবাবটি শক্তিশালী নয়, কারণ জবাব إِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ -এর উপর (অর্থাৎ শর্তের উপর) পতিত হয়। ২. জবাব উহ্য, যার تَقْدِيْر হলো–

فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ وَ.......وَ........فَحِيْنَئِذٍ تَقَعُ الْمُجَازَاةُ بِالْأَعْمَالِ وَتَقُوْمُ الْقِيَامَةُ .

অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে পড়বে এবং ...... এবং .... তখন আমলের প্রতিফল পাওয়া যাবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ يَوْمُ الْفَصْلِ : এটি لِأَيِّ يَوْمٍ হতে بَدَلْ হিসেবে مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে। আর ইমাম সীবওয়াইহ -এর মতানুসারে مَا أَدْرَاكَ مَا -এর মধ্যে প্রথম (مَا) টি হলো مُبْتَدَأْ আর أَدْرَاكَ তার خَبَرْ অথবা أَدْرَاكَ টি مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ এবং مَا টি خَبَرْ مُقَدَّمْ।

আর দ্বিতীয় (مَا) مُبْتَدَأْ এবং يَوْمُ الْفَصْلِ উহার خَبَرْ এরা جُمْلَه হয়ে أَدْرٰى ক্রিয়ার مَفْعُوْل ثَانِىْ।

قَوْلُهُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ : এটি مُبْتَدَأْ হয়েছে। যদিও এটা نَكِرَه فِي الْأَصْلِ হয়ে থাকে। আর এটা মূলত মাসদার এবং ঐ মাসদারটি قَائِم مَقَامْ হয়েছে فِعْل -এর। আর তার উপর رَفَع হওয়ার কারণ হচ্ছে– حَذَ عَوْلَهُ -এর ধ্বংস ও নিধন হওয়ার উপর যেন দালালত করে। কেননা, دَوَامْ وَثُبَاتْ وَاِسْتِمْرَارْ টি مَصْدَرْ, قَائِم مَقَامْ -এর উপর দালালত করে থাকে। সুতরাং مُبْتَدَأْ হয়ে رَفَع হওয়া জায়েজ হয়েছে। যেমন– سَلَامٌ عَلَيْكَ এটাও نَكِرَه হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হওয়া জায়েজ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ : অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি মলিন হয়ে যাবে, আসমান খান খান হয়ে যাবে আর পর্বতমালাও তুলা বা পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে।

মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন– এটার অর্থ তারকাগুলো বিলীন হয়ে যাবে। অথবা মওজুদ থাকবে বটে, কিন্তু আলো নষ্ট করে দেওয়া হবে। এতে সারা বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

ইমাম রাযী (র.)-এর মতে, এটার অর্থ নক্ষত্ররাজি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ إِنْكَدَرَتْ ও إِنْتَشَرَتْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। (কাবীর) কারো কারো মতে, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি জগতের পরস্পরের বর্তমান যে বন্ধনের মাধ্যমে গতিবিধি রয়েছে তাদের সকল বন্ধন বিনষ্ট ও শিথিল করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا السَّمَاءُ نُسِفَتْ : কাবীর গ্রন্থে বলা হয়েছে– وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ -এর তাৎপর্য দু'টি হতে পারে। একটি হলো পাহাড়গুলোকে যখন ধুনে তুলার ন্যায় করা হবে। অপরটি হলো পাহাড়গুলো স্ব-স্ব স্থান হতে স্বয়ং সজোরে উৎখাত হয়ে যাবে।

জালালাইন গ্রন্থকার তার তাফসীর করেছেন أُتِيَتْ وَسُيِّرَتْ অর্থাৎ আঁশ আঁশ হয়ে যাবে এবং উড়তে থাকবে। সকল তাফসীরকারের তাফসীরের মর্মকথা সর্বশেষে একইরূপ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ : এটার দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথম অর্থ হলো, "যখন পাহাড়কে ধুনে ফেলা হবে।" অর্থাৎ তুলার মতো ধুনে ফেলা হবে। অপর অর্থ হলো, যখন পর্বতমালা স্বীয় স্থান হতে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হবে।" –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ : গ্রন্থকার বলেন, أُقِّتَتْ অর্থ– নির্দিষ্ট সময়েই একত্রিভূত করা হবে, নির্দিষ্ট সময় বলতে কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে– وَالْوَقْتُ الْأَجَلُ الَّذِيْ يَكُوْنُ عِنْدَهُ شَيْءٌ الْمُؤَخَّرُ إِلَيْهِ তখন অর্থ হবে কিয়ামতের জন্য নির্ধারিত সময় করে দেওয়া হয়েছে তখনই সকল ফয়সালা হবে।

মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, أُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيْتٌ হতে مُشْتَقْ হয়েছে। তার অর্থ– নির্ধারিত সময়। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, এটার অর্থ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাওয়া এবং আয়াতের এই অর্থ হবে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় ধার্য করা হয়েছিল যে, তাঁরা তাঁদের উম্মতগণের কার্যাদিতে সাক্ষ্য দানের জন্য হাজির হবেন, তারা সে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে গেছেন এবং তাদের হাজিরা প্রদানের সময় এসে গেছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ : উপরে পরকাল বাস্তবায়ন মুহূর্তের চারটি অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে "কোন দিনের জন্য এ কাজটি বাকি রাখা হয়েছে?" অর্থাৎ মানুষের হিসাব-নিকাশ দেরি করা হচ্ছে কোন দিনের অপেক্ষায়? জবাবে বলা হয়েছে لِيَوْمِ الْفَصْلِ অর্থাৎ সেই কিয়ামতের দিনের অপেক্ষা করা হচ্ছে যেদিন আল্লাহ তা'আলা সত্য-মিথ্যার ফয়সালা করবেন, বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। অতঃপর বলা হয়েছে مَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ অর্থ "সেই ফয়সালার দিনটি কি তা কি তোমার জানা আছে"? এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে– এই দিন এতই ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহ যে, তোমার পূর্বাপর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার ভয়াবহতার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ দিন সম্বন্ধে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অবস্থা তখন অন্যান্য লোকের জন্য তা কত সংকটপূর্ণ হবে তা উপলব্ধি করা যায় না।

কিয়ামত দিবসের এ ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ চিত্র অঙ্কনের পর যেন প্রশ্ন করা হয়েছে এ দিবসকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা কি হবে? তখন স্পষ্ট করে জবাব দেওয়া হয়েছে وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ "সেদিন চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় হবে [অস্বীকারী] অমান্যকারী লোকদের জন্য"। অর্থাৎ যারা কিয়ামত অস্বীকার করে তাদের জন্য এ দিন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে। وَيْلٌ শব্দের অর্থ– ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে وَيْلٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানে পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। –[মা'আরেফুল কোরআন]

اَلْوَيْلُ-এর পরিচিতি : নবী করীম ﷺ বলেছেন, اَلْوَيْلُ হলো দোজখের একটি ঘাঁটি। চল্লিশ বছর যাবৎ কাফেররা তাতে ধাক্কা খেতে থাকবে তবু তারা গভীরে পৌঁছতে পারবে না। –[আহমদ, তিরমিযী, বায়হাকী]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, ওয়াইল হলো দোজখের একটি ঘাঁটি তাতে দোজখীদের পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে। যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান করছে, তাদের শাস্তির জন্যই ঐ স্থানটি নির্দিষ্ট।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র.) বলেছেন, وَيْلٌ হলো দোজখের এমন একটি ঘাঁটি যা দোজখীদের পুঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ। যদি পাহাড়কেও ঐ ঘাঁটিতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তার তাপের কারণে পাহাড় গলে যাবে।

–[বায়হাকী, ইবনে জারীর, ইবনে মোবারক]

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ওয়াইল হলো দোজখের একটি পাহাড়। ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা তাওহীদ, নবুয়ত এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করে। –[কাবীর, মাযহারী]

অনুবাদ :

١٦. اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ بِتَكْذِيْبِهِمْ اَىْ اَهْلَكْنَاهُمْ.

১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? তাদের অসত্যারোপের কারণে অর্থাৎ আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি।

١٧. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ مِمَّنْ كَذَّبُوْا كَكُفَّارِ مَكَّةَ فَنُهْلِكُهُمْ.

১৭. অতঃপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করবো যারা অসত্যারোপ করেছে। যেমন মক্কাবাসী কাফেরগণ সুতরাং আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো।

١٨. كَذٰلِكَ مِثْلَ فِعْلِنَا بِالْمُكَذِّبِيْنَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ بِكُلِّ مَنْ اَجْرَمَ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ فَنُهْلِكُهُمْ.

১৮. এরূপই অসত্যারোপকারীদের সাথে কৃত আমার আচরণের ন্যায় আমি পাপাচারীদের সাথে আচরণ করবো। ভবিষ্যতেও যারা পাপাচারিতায় লিপ্ত হবে আমি তাদেরকে একইভাবে ধ্বংস করবো।

١٩. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ تَاكِيْدًا.

১৯. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ এটা تَاكِيْد স্বরূপ পুনরুক্ত হয়েছে।

٢٠. اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ ضَعِيْفٍ وَهُوَ الْمَنِيُّ.

২০. আমি কি তোমাদেরকে নগণ্য পানি হতে সৃষ্টি করিনি? তুচ্ছ তা হলো শুক্রবিন্দু।

٢١. فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ حَرِيْزٍ وَهُوَ الرَّحِمُ.

২১. তৎপর আমি তাকে নিরাপদ আধারে স্থাপন করেছি সুরক্ষিত, আর তা হলো জরায়ু।

٢٢. اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ وَهُوَ وَقْتُ الْوِلَادَةِ.

২২. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা হলো প্রসবকালীন সময়।

٢٣. فَقَدَرْنَا عَلٰى ذٰلِكَ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ نَحْنُ.

২৩. অনন্তর আমি তাকে সুগঠিত করেছি এটার উপর সুতরাং কতই নিপুণ স্রষ্টা আমি।

٢٤. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

২৪. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

٢٥. اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا مَصْدَرُ كَفَتَ بِمَعْنٰى ضَمَّ اَىْ ضَامَّةً.

২৫. আমি কি পৃথিবীকে ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করিনি? كَفَتَ শব্দটি ضَمَّ অর্থে مَصْدَرْ অর্থাৎ ضَامَّةً ধারণকারী।

٢٦. اَحْيَاۤءً عَلٰى ظَهْرِهَا وَّاَمْوَاتًا فِىْ بَطْنِهَا.

২৬. জীবিতদের জন্য তার পৃষ্ঠে এবং মৃতদের জন্য তার গর্ভে।

٢٧. وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ جِبَالًا مُّرْتَفِعَاتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّاۤءً فُرَاتًا عَذْبًا.

২৭. আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উঁচু পর্বতমালা সুউচ্চ পাহাড় এবং তোমাদেরকে সুপেয় পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করেছি মিষ্টি।

٢٨. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ وَيُقَالُ لِلْمُكَذِّبِيْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

২৮. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ। আর কিয়ামতের দিন মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হবে।

তাহকীক ও তারকীব

نُتْبِعُهُمْ-এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর عَيْن ও ضَمَّة দিয়ে جُمْلَة مُسْتَانِفَة হিসেবে ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ পড়েছেন। অর্থাৎ ثُمَّ نَحْنُ نُتْبِعُهُمْ আবুল বাকা বলেন, এটা مَعْطُوْف নয়, কারণ عَطْف হলে এটার অর্থ হবে "পূর্বের লোকদেরকে ধ্বংস করেছি অতঃপর তাদের পরে পরবর্তী লোকদেরকেও ধ্বংস করেছি" –এটা সত্য নয়, কারণ পরবর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করা হয়নি।

হযরত ইবনে মাসউদ (র.) তাকে ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ পড়েছেন। আ'রায হযরত আব্বাস, ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করে عَيْن-এ جَزْم দিয়ে نُتْبِعْهُمْ পড়েছেন نُهْلِكْ-এর উপর عَطْف হিসেবে। শেহাবুদ্দিন বলেছেন, نُتْبِعُهُمْ ক্রিয়াটি اَلَمْ نُهْلِكْ পূর্ণ বাক্যটির উপর عَطْف হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

كِفَاتًا : এটি نَجْعَلْ-এর ضَمِيْر হতে حَالْ হিসেবে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে।

شَامِخٰتٍ : এটা رَوَاسِىَ-এর صِفَتْ হয়েছে।

فَقَدَرْنَا-এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর فَقَدَرْنَا শব্দটিকে تَخْفِيْف করে পড়েছেন, নাফে', কিসায়ী তাতে تَشْدِيْد যুক্ত করে تَقْدِيْر হতে উদ্ভূত হিসেবে فَقَدَّرْنَا পড়েছেন। ফাররা এবং কিসায়ী বলেছেন, উভয়ের অর্থ অভিন্ন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا : ফাররা বলেছেন, اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا শব্দদ্বয় مَنْصُوْب হয়েছে كِفَاتٌ তার উপর পতিত হওয়ার কারণে। অর্থাৎ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا কেউ কেউ বলেছেন, اَرْضَ হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ مِنْهَا كَذَا وَمِنْهَا كَذَا –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ الخ : তাফসীরকারগণের বর্ণনা মতে, এর তাৎপর্য এই যে, ১৬-১৯ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ বলতে চান যে, যারা কিয়ামত অবিশ্বাস করে তারা তাদের অতীত জাতিদের ইতিহাস দেখে না যে, আল্লাহ তাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে তাদের দৌরাত্ম্য ও ধৃষ্টতা হেতু নিপাত করে দিয়েছেন। তবে তাই বলে এ পৃথিবীও মানবশূন্য নেই। বসুন্ধরার কোনো অংশ খালি হয়নি। আল্লাহ অন্যান্য জাতিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের স্থানে সৃষ্টি করেছেন। এক গেছে অন্য এসে তার স্থান দখল করেছে। অতএব, বর্তমান দৌরাত্ম্যদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। দুর্বৃত্ত ও দৌরাত্ম্যদের সঙ্গে এটাই আল্লাহর চিরাচরিত নীতি চলে এসেছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَلْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ" : এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, 'আউয়ালীন' বলতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পূর্বের সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি কি তোমার পূর্বের সমস্ত কাফিরদেরকে ধ্বংস করিনি?

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ এ বাক্যটি جُمْلَة مُسْتَانِفَة অর্থাৎ ভবিষ্যতেও পরের কাফেরদেরকে পূর্বের কাফেরদের অনুগামী করবো। অর্থাৎ তাদেরও একই পরিণতি হবে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, এটা আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত ও স্থায়ী বিধান।

–[কাবীর]

গ্রন্থকার বলেছেন, এখানে পরবর্তী বলে মক্কাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। এটার তাৎপর্য হচ্ছে– মক্কার কাফেরদেরকেও পূর্বের কাফেরদের মতো ধ্বংস করা হবে, কারণ তারা অপরাধী। আর অপরাধীদের সম্বন্ধে আমাদের শাশ্বত ও চিরাচরিত বিধান হলো, ধ্বংস করা। সুতরাং ভবিষ্যতে যত অপরাধী অপরাধ করবে তাদের সকলকেই ধ্বংস করা হবে।

এটাতো দুনিয়াতে হবে আর পরকালে? : পরকালে মিথ্যারোপকারী মুজরিম বা অপরাধীদের কি হবে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য বড়োই দুর্ভোগ রয়েছে।' অর্থাৎ দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় স্থানেই তাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে। যেমন কুরআনের একস্থানে বলা হয়েছে– خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ 'দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় নষ্ট হলো।' –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ : এটার অর্থ 'সেই সময়টা সুনির্দিষ্ট' কিন্তু প্রকৃত অর্থ শুধু এতটুকুই নয়। এটার তাৎপর্য হলো যে, তার সময় বা মিয়াদটা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কোন শিশু কতমাস, কতদিন, কত ঘণ্টা, কত মিনিট ও কত সেকেণ্ড মাতৃগর্ভে অবস্থান করবে এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঠিক সময় কি? তা পূর্বাহ্নে জেনে নেওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেকটি শিশুর জন্য আল্লাহ তা'আলাই এ সময়কালটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনিই এ সময় ও মিয়াদ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিবহাল রয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَمْ نَجْعَلِ ...... وَأَمْوَاتًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্য কিফাত করিনি?" كِفَاتٌ শব্দটি كَفْتٌ থেকে উদ্ভূত, এটার অর্থ হলো মিলানো বা জমায়েত করা, এই ভূমি সমস্ত মানবজাতিকে একত্র করে তার গর্ভে। জীবিত মানুষেরা তার পৃষ্ঠে আর মৃত মানুষেরা তার গর্ভে অবস্থান করে। -[সাফওয়া]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى "এখান থেকেই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে, আবার তোমাদেরকে এখানেই ফিরিয়ে আনবো, পুনরায় এখান হতে তোমাদেরকে বের করবো।"

ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, "ভূমির গর্ভ হলো তোমাদের মৃত মানুষদের জন্য, আর পৃষ্ঠদেশ হলো তোমাদের জীবিতদের জন্য। -[সাফওয়া]

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ-কে বারংবার আনয়ন করার কারণ : কাফেরদের যে যেই বিষয়ে যেই প্রকারের মিথ্যারোপের প্রকাশ লাভ করেছে সে সেই বিষয়ে ও স্থানেই আল্লাহ তাদের ধ্বংসের কথা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ যত তাকযীব, তত তাহদীদ بِحَسْبِ عَلَى قَدْرِ التَّكْذِيبِ التَّهْدِيدُ প্রত্যেক প্রকারের মিথ্যাবাদীর জন্য পৃথক পৃথক শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাই আয়াতটিতে تَكْرَارٌ এসেছে। আবার হয়তো তাদের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা আল্লাহর সমীপে খুবই মারাত্মক অপরাধরূপে গণ্য হয়েছে। তাই অপরাধের স্থানে আল্লাহ বারংবার শাস্তির ধমকি দিয়েছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এ ধমকির আয়াতগুলোকে تَكْرَارٌ আনয়ন করার দুটি কারণ ব্যক্ত করেছেন

১. আরবের ফাসাহাত ও বালাগাত বিশারদদের নীতি ছিল যে, তাদের বক্তব্যের মধ্যে তারা কয়েকটি কথা বলার পর একটি বিশেষ বাক্য ব্যবহার করে থাকেন; আবার কয়েকটি বাক্য ব্যবহার করার পর পুনরায় ঐ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকেন, যাতে তাদের বক্তব্যটি শ্রোতাবৃন্দ খুব গভীর মনযোগের সাথে শ্রবণ করে। আর এতে শ্রোতাদেরকে বক্তব্যের প্রতি আকর্ষিত করা হয়।

   তদ্রূপ এটাও অর্থাৎ কালামুল্লাহর প্রতি এবং তাতে বর্ণিত উদ্দেশ্য আদর্শ ও আদেশ-নিষেধের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করার জন্যই এ বাক্যটি বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে। আর কালামুল্লাহর প্রভাবে যেন তারা প্রভাবান্বিত হয়ে উঠে।

২. এ বাক্যটি وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ-কে অত্র সূরায় মোট দশবার ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করে থাকে তাদের উপর দশটি কারণে সেদিন মসিবত এসে পড়বে এবং ভয়াবহ বিপদে পতিত হবে। সে দশটি বিষয়ে প্রত্যেকটি ব্যক্ত করার ব্যাপারেই একবার সেই আয়াতটি বলা হয়েছে।

ভূ-পৃষ্ঠের উপর পাহাড়সমূহকে উঁচু উঁচু করে স্থাপনের কারণ ও হিকমত : ভূপৃষ্ঠের উপর পাহাড়সমূহকে উঁচু উঁচু করে স্থাপনের কারণতো আল্লাহ তা'আলাই স্পষ্ট ভাষায় পবিত্র কালামে বলে দিয়েছেন যে, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا আমি কি জমিনকে সমতল বিছানারূপে তৈরি করিনি এবং পাহাড়গুলোকে পেরেক স্বরূপ স্থাপন করিনি? [সূরা আন-নাবা] অন্য আয়াতে আরো বলেন- وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا তিনি ভূপৃষ্ঠে তোমাদের হজুরে পাহাড়সমূহকে স্থাপন করেননি? যাতে তোমরা পৃথিবীতে হেলতে না থাক আর নহর ও পথসমূহ সৃষ্টি করিনি? মূলত যদি আল্লাহ এই জমিনের বুকে পাহাড়-পর্বত সৃজন না করতেন তথাপিও জমিন হেলতে দোলতে হতো না; কারণ কুদরত সব কিছুই করতে সক্ষম, সুতরাং পাহাড়গুলোকে জমিন নড়াচড়া করার থেকে রক্ষা করার জন্য স্থাপন করাটা একটা অসিলা মাত্র, আর অপর পক্ষে এটো তার মহান কুদরতের নিদর্শন যে, তিনি সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম।

জমিন নড়াচড় করার কারণতো মূলে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, তথাপিও কুরআন-হাদীস হতে যা জানা যায় তাতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্বভূমি সাগরের পানির মাঝে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং পানির উপর টলমল অবস্থা হতে রক্ষা করার জন্য পাহাড়কে পেরেকস্বরূপ স্থাপন করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٢٩. اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ تُكَذِّبُوْنَ ـ

২৯. চল তারই দিকে যার ব্যাপারে শাস্তি সম্পর্কে তোমরা মিথ্যারোপ করেছিলে ।

٣٠. اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلَاثِ شُعَبٍ هُوَ دُخَانُ جَهَنَّمَ اِذَا ارْتَفَعَ اِفْتَرَقَ ثَلَاثَ فِرَقٍ لِعَظْمَتِهٖ ـ

৩০. চল, ত্রিশাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে তা জাহান্নামে ধুম, এটা উঁচু হওয়ার পর বিরাটত্বের কারণে তিনভাগে বিভক্ত হবে।

٣١. لَا ظَلِيْلٍ كَنِيْنٍ يُظِلُّهُمْ مِنْ حَرِّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَّلَا يُغْنِىْ يَرُدُّ عَنْهُمْ شَيْئًا مِنَ اللَّهَبِ لِلنَّارِ ـ

৩১. যে ছায়া শীতল নয় যা সেই দিনের উত্তাপ হতে বাঁচিয়ে ছায়া দিতে পারে এবং রক্ষা করবে না তাদের হতে কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করবে না অগ্নি শিখা হতে দোজখের।

٣٢. اِنَّهَا اَىِ النَّارَ تَرْمِىْ بِشَرَرٍ هُوَ مَا تَطَايَرَ مِنْهَا كَالْقَصْرِ مِنَ الْبِنَاءِ فِىْ عَظْمِهٖ وَارْتِفَاعِهٖ ـ

৩২. নিশ্চয় তা অর্থাৎ জাহান্নাম উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ যা তথা হতে উৎক্ষিপ্ত হবে অট্টালিকা তুল্য তার বিশালত্ব ও উচ্চতা বিচারে অট্টালিকার ন্যায়।

٣٣. كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ جَمْعُ جِمَالَةٍ جَمْعُ جَمَلٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ جِمَالَةٌ صُفْرٌ فِىْ هَيْئَتِهَا وَلَوْنِهَا وَفِى الْحَدِيْثِ شِرَارُ جَهَنَّمَ اَسْوَدُ كَالْقِيْرِ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى سُوْدَ الْاِبِلِ صُفْرًا لِشَوْبِ سُوْدِهَا بِصُفْرَةٍ فَقِيْلَ صُفْرٌ فِى الْاٰيَةِ بِمَعْنٰى سُوْدٍ لِمَا ذُكِرَ وَقِيْلَ لَا وَالشَّرَرُ جَمْعُ شَرَرَةٍ وَالشِّرَارُ جَمْعُ شِرَارَةٍ وَالْقِيْرُ الْقَارُ ـ

৩৩. যেন তা উষ্ট্র শ্রেণি جِمٰلَتٌ শব্দটি جِمَالَةٌ এর বহুবচন, যা جَمَلٌ এর বহুবচন। অপর এক কেরাতে শব্দটি جِمَالَةٌ পীতবর্ণ তার আকৃতি ও বর্ণে। হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে যে, জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ আলকাতরার ন্যায় কাল হবে আর আরবগণ কালো উষ্ট্রকে صُفْر বলে থাকে। কারণ কাল ও পীতবর্ণ প্রায় একইরূপ। এ জন্য কারো মতে আয়াতে উল্লিখিত صُفْر শব্দটির অর্থ سُوْد বা কাল। আর কেউ বলেন, না, এরূপ অর্থ ঠিক নয়। আর, শব্দটি شَرَرَةٌ-এর বহুবচন এবং شِرَارٌ শব্দটি شِرَارَةٌ-এর বহুবচন। আর قِيْرٌ শব্দটি قَارٌ অর্থে ব্যবহৃত।

٣٤. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ـ

৩৪. সেই দিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَالْقَصْرِ : জমহুর তাকে صَادْ-এ سَاكِنْ যুক্ত করে كَالْقَصْرِ পড়েছেন, قَصْرٌ হলো قُصُوْرٌ -এর একবচন। অর্থ- প্রাসাদ বা অট্টালিকা। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হোমাইদ, আস্সুলামী صَادْ-এ فَتْح দিয়ে كَالْقَصَرِ পড়েছেন। অর্থাৎ উষ্ট্রের কল্লা বা গর্দান قَصَرٌ টি قَصَرَةٌ -এর বহুবচন [ফাতহুল কাদীর], আর সাঈদ ইবনে জোবাইর তার قَافْ-এ كَسْرَه দিয়ে আর صَادْ-এ فَتْح দিয়ে كَالْقِصَرِ পড়েছেন। তাও قَصَرَةٌ -এর বহুবচন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "تَرْمِىْ بِشَرَرٍ" : জমহুর شِيْن-এ فَتْح দিয়ে بِشَرَرٍ পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাকছাম شِيْن-এ كَسْرَه এবং দুই رَا-এর একটি اَلِفْ যুক্ত করে بِشِرَارٍ পড়েছেন। হযরত ঈসাও হযরত ইবনে আব্বাসের মতানুসারে, তবে তিনি شِيْن বর্ণে فَتْح দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ "جِمَالَاتٌ" : জমহুর جِيْم-এ كَسْرَه দিয়ে جِمَالَاتٌ পড়েছেন। হামযা-কিসায়ী ও হাফস جِمَالَةٌ পড়েছেন। অর্থাৎ جَمَلٌ -এর বহুবচন। ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জোবাইর, কাতাদাহ এবং আবূ রেজা جِيْم-এ ضَمَّة দিয়ে جُمَالَاتٌ পড়েছেন, অর্থ নৌকার বৈঠা। -[ফাতহুল কাদীর]

هٰذَا يَوْمُ -এর তারকীব এবং তাতে অবতীর্ণ কেরায়াতসমূহ : জমহুর يَوْمُ-এ رَفْع দিয়ে اِسْمِ اِشَارَة-এর خَبَرْ হিসেবে পড়েছেন। যায়েদ ইবনে আলী, আ'রায, আ'মাশ, আবূ হাইওয়া এবং এক বর্ণনায় আসেমও مَبْنِىْ হিসেবে فَتْح দিয়ে পড়েছেন, ক্রিয়ার দিকে اِضَافَتْ হওয়ার কারণে, মূলত তার স্থান হলো رَفْع . خَبَرْ হবার কারণে। কেউ কেউ তাকে ظَرْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا ..... يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ বলেন- [কিয়ামতের দিবসে কাফের সম্প্রদায়কে বলা হবে।] তোমরা এখনই সেই ভয়াবহ শাস্তির দিকে ধাবিত হও যাকে তোমরা দুনিয়ার জীবনে অসত্য মনে করেছিলে। এটাই পরকাল অমান্যকারীদের প্রাপ্ত শাস্তি। তাদের একটি শাস্তির বর্ণনা এই দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ বলবেন, তোমরা এমন এক প্রকার ছায়ার আশ্রয়ে চল, যা তিনটি শাখাযুক্ত হবে, তবে তাতে কোনো ঠাণ্ডা পাবে না। বরং তা জাহান্নাম থেকে নির্গত এক প্রকার ধোঁয়া, আধিক্যের দরুন তা উঁচু হয়ে খান খান হয়ে প্রথমতঃ তিন খণ্ডে বিখণ্ডিত হবে। কাফেরগণকে আল্লাহ তা'আলা সেই দিবসের সকলের হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধোঁয়ায় নিমজ্জিত করে রাখবেন। আর আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণ আরশের রহমতে ছায়াতলে শান্তিতে এই সময় কাটাবে।

আর সেই ধোঁয়ার আরও ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে বলেন- সেই ধোঁয়াসমূহ হতে এমন কতগুলো অগ্নির টুকরা চতুর্দিকে বিস্ফুরিত ও উথলিয়ে পড়তে থাকবে সেগুলো দেখতে মনে হবে যেন বড় বড় দালান ও রাজপ্রাসাদ। আর মনে হবে হলুদ বর্ণের লম্পদানকারী আরবের উটগুলো খুব ক্ষীপ্ত হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে এবং يَوْمُ الْقِيَامَةِ -কে অবিশ্বাস করবে তারা যেন জেনে রাখে যে, সেই দিন তাদের এই দুরবস্থার অগ্নিতে দগ্ধ হতে হবে।

জাহান্নামের ধোঁয়া তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়ার কারণ : দোজখের ধোঁয়া তিনটি শাখায় বিভক্ত হওয়ার কারণ হলো দোজখে তিন শ্রেণির মানুষ প্রবেশ করবে।

১. সেসব কাফের যারা সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

২. সেসব বিদআতী যারা পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং এর অপব্যাখ্যা করে আর যেসব বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করে তার বিরোধিতা করে।

৩. যারা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পাপাচারে লিপ্ত থাকে, ফরজসমূহ পরিত্যাগ করে। এ তিনটি দলের অপকর্মের শাস্তিস্বরূপই দোজখের ধোঁয়া তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-

আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে দোজখ থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যা তিনটি শাখায় বিভক্ত হবে।

১. একটি শাখা নূর হবে, যা মু'মিনদের মাথার উপর এসে বসবে।

২. দ্বিতীয় শাখাটি ধোঁয়া, যা মুনাফিকদের মাথার উপর এসে বসবে।

৩. তৃতীয় শাখাটি জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা কাফেরদের মাথার উপর এসে বসবে অথবা এর ছায়া দোজখে নেওয়ার তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে যাতে তিন ধরনের লোক গমন করবে।

১. প্রকাশ্যে যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

২. পরোক্ষভাবে যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

৩. যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

আয়াতসমূহে বর্ণিত ছায়ার সিফাতসমূহ : জাহান্নামবাসী কাফেরদেরকে বলা হবে, আজকে তোমরা ছায়ার দিকে যাও যাতে নিম্নবর্ণিত সিফাতসমূহ বিদ্যমান– ১. ত্রিশাখা বিশিষ্ট। ২. ছায়াদাতা বা শীতল নয়। ৩. আগুনের লেলিহান বা উত্তাপ হতে রক্ষা করে না। ৪. অট্টালিকার মতো স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপণ করে যা পীতবর্ণের উষ্ট্রসমূহের মতো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّهَا تَرْمِىْ .... صُفْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সেই আগুন প্রাসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। (তা লাফাতে থাকলে মনে হবে) যেন তা হলুদ বর্ণের উষ্ট্র।" অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গ এক একটি প্রাসাদের মতো হবে, আর এই বড় বড় স্ফুলিঙ্গসমূহ যখন বিস্ফুরিত হবে ও চতুর্দিকে উড়তে শুরু করবে, তখন মনে হবে, যেন হলুদ বর্ণের উষ্ট্র লম্ফঝম্প করছে।

আল্লামা আফীফ তাব্বারা বলেছেন, পবিত্র কুরআন– অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যখন আগুন হতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাকে প্রাসাদের সাথে তুলনা করেছে। আর যখন নীচু হয়ে পড়ে এবং অসংখ্য শাখায় চতুর্দিকে উড়তে থাকে তখন তাকে হলুদ বর্ণের লম্ফঝম্পকারী উষ্ট্রের সাথে তুলনা করেছে। আয়াতে এই তুলনা ব্যবহার করার সময় আরবজাতির মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে এবং তাদের অতি পরিচিত বস্তুর ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরি করা হতো এবং বাড়ির আশেপাশে উষ্ট্রের ঝাঁক থাকত। পবিত্র কুরআন আগুনের ভয়াবহতার চিত্র অংকন করেছে তার স্ফুলিঙ্গের চিত্র অংকন করে। কারণ স্ফুলিঙ্গ আগুনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই হয়। –[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَاَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ : কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী صُفْر শব্দটির অর্থ سُوْد করেছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের উষ্ট্রের ন্যায় এখানে প্রথম দৃষ্টান্তটিতে স্ফুলিঙ্গগুলোর উচ্চতা এবং ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে আগুনের বর্ণ এবং তার গতিশীলতা বুঝানোর জন্য। –[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

٣٥. هٰذَا اَىْ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ فِيْهِ بِشَىْءٍ.

৩৫. এটা অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এমন একদিন যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবে না তথায় কোনো বিষয়ে।

٣٦. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فِى الْعُذْرِ فَيَعْتَذِرُوْنَ عَطْفٌ عَلٰى يُؤْذَنُ مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ عَنْهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِىْ حَيِّزِ النَّفْيِ اَىْ لَا اِذْنَ فَلَا اِعْتِذَارَ.

৩৬. এবং তাদেরকে অনুমতি দান করা হবে না অজুহাত পেশ করার জন্য যে, অজুহাত পেশ করবে এটা يُؤْذَنُ -এর প্রতি عَطْف সাবাবের মধ্যে শরিক হওয়া ব্যতিরেকে। সুতরাং এটা نَفِىْ -এর স্থলে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যেহেতু অনুমতি নেই, কাজেই অজুহাত পেশ করার অবকাশ নেই।

٣٧. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

৩৭. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

٣٨. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ اَيُّهَا الْمُكَذِّبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَالْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ قَبْلَكُمْ فَتُحَاسَبُوْنَ وَتُعَذَّبُوْنَ جَمِيْعًا.

৩৮. এটাই ফায়সালার দিন, আমি তোমাদেরকে একত্র করব হে এই উম্মতের মধ্য হতে মিথ্যারোপকারীগণ। এবং পূর্ববর্তীদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী মিথ্যারোপকারীগণ। তাই তোমাদের সকলেরই হিসেব-নিকাশ ও শাস্তি কার্যকরী হবে।

٣٩. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ حِيْلَةٌ فِىْ دَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ فَكِيْدُوْنِ فَافْعَلُوْهَا.

৩৯. যদি তোমাদের কোনো কৌশল থাকে তোমাদের হতে শাস্তি প্রতিরোধ করার কোনো ফন্দি থাকে তবে তোমরা সেই কৌশল প্রয়োগ করো তা কাজে লাগাও।

٤٠. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

৪০. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَمَعْنٰكُمْ : এটা তৎপূর্ববর্তী اَلْفَصْلُ হতে تَقْرِيْر وَبَيَان হয়েছে (بَيْضَاوِىْ) আর اَلْاَوَّلِيْنَ টি جَمَعْنٰكُمْ -এর كُمْ-এর উপর عَطْف হয়েছে। অথবা اَلْاَوَّلِيْنَ টি مَفْعُوْل مَعَهُ হয়েছে جَمَعْنَا ফে'ল হতে- اَىْ لَا يُنْفَصَلُ بَيْنَ الْمُحِقِّ وَالْمُبْطِلِ اِلَّا اِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمْ.

قَوْلُهُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ : এর মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, فَا، এবং وَاوْ দ্বারা যা عَطْف হয় সেই مَعْطُوْف টি مَنْصُوْب হয়ে থাকে, এটাই নাহবিদগণের নীতি, কিন্তু وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ -এর মধ্যে এটা বহাল রইল না কেন?

এটার উত্তর এই যে, فَا، এবং وَاوْ দ্বারা مَعْطُوْف তখনই مَنْصُوْب হবে যখন مَعْطُوْف টি مَنْفِىْ হতে مُتَسَبَّبْ হবে যথা- لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا অর্থাৎ (فَاَنْ يَمُوْتُوْا) নতুবা مَعْطُوْف তখন مَنْصُوْب হবে না।

قَوْلُهُ يَعْتَذِرُوْنَ : এটা مَرْفُوْع হওয়ার কারণ سَمِيْن গ্রন্থকারের মতে দু'টি রয়েছে।

১. এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হিসেবে مَرْفُوْع مَحَلًّا হয়েছে। অর্থাৎ فَهُمْ يَعْتَذِرُوْنَ

২. অথবা, এটা يُؤْذَنُ -এর উপর مَعْطُوْف হবে। তখন مَرْفُوْع مَحَلًّا হবে এবং جُمْلَه مَنْفِىْ হবে। হযরত ইবনে আতিয়্যাহ বলেন, এখানে مَنْصُوْب না হওয়ার কারণ হলো تَشَابُهُ رُؤُوْسِ الْاٰيِ ।

لَا يُؤْذَنُ এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর তাকে فِعْل مَجْهُوْل হিসেবে يُؤْذَنُ পড়েছেন। আর যায়েদ ইবনে আলী فِعْل مَعْرُوْف হিসেবে لَا يَأْذَنُ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব : যদি প্রশ্ন করা হয় যে, هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ আর ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ এবং وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ এবং وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا আয়াতগুলোকে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব?

অর্থাৎ প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসে তারা কোনো কথা বলবে না। আর পরের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, তারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবে এবং বিভিন্ন ওজর-আপত্তি করবে। সুতরাং আয়াতগুলোর পরস্পর বিরোধী হলো। এই প্রশ্নটির কয়েক রকম উত্তর দেওয়া হয়েছে।

১. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, আজকে তারা কোনো দলিল পেশ করতে পারবে না, যেহেতু তাদের বাকি অন্যান্য কথাগুলো যেন কোনো কথাই নয়।
২. ফাররা বলেছেন, তারা সেদিন কোনো কথা বলবে না অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশের মুহূর্তে কোনো কথা বলবে না। কারণ পালা ইতঃপূর্বেই খতম হয়ে গেছে। এখন কথা বলে আর কোনো লাভ হবে না, সুতরাং চুপচাপ জাহান্নামের দিকে চলে যাবে।
৩. 'কথা বলবে না' অর্থ সব সময় নিশ্চুপ থাকবে এমন নয়। কারণ কিয়ামত দিবসে কাফেররা কখনো বিভিন্ন ওজর-আপত্তি করবে, আবার কোনো কোনো সময় কথা বলবে না। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

ওজর পেশ করতে না দেওয়া ইনসাফের খেলাফ : وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ আয়াত হতে মনে হয়, তাদের ওজর থাকবে, কিন্তু তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে না। এটা ইনসাফের খেলাফ।

এ সন্দেহের জবাব এই যে, তাদের অপরাধ পূর্বেই এমন অকাট্য দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, পুনর্বার পেশ করবার মতো কোনো ওজর আসলেই তাদের থাকবে না। আর যেসব সন্দেহ তাদের মনে উদিত হবে তা মূলত কোনো ওজরই নয়, হয়তো তাদের মনে আসতে পারে যে, আমরা তোমারই বান্দা যা করেছি সবই তোমারই ইচ্ছায়– ইরাদায় তোমার জ্ঞাতার্থে এবং ফয়সালায় করেছি। সুতরাং কেন আমরা অপরাধী হবো, কেন আমাদেরকে শাস্তি দেবে? তাদের এ ওজর অবশ্যই অবান্তর, কারণ অপরাধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাধ্য করেননি। আল্লাহ তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সত্য-মিথ্যা জানবার জন্য নবী পাঠিয়েছিলেন। এরপরও তারা স্বেচ্ছায় অপরাধ করে এ কথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবান্তর। -[কাবীর]

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, অপরাধীদের কীর্তিকলাপের পক্ষে পেশ করার মতো কোনো ওজর-আপত্তিও থাকবে না। তাদের কৃতকর্মের সাক্ষী হবে তাদের আমলনামা।

দ্বিতীয়ত দুনিয়ার জীবনে তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করবে।

তৃতীয়ত প্রত্যেকটি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الخ : আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে তো তোমরা প্রতারণামূলক কাজ খুবই করেছ, সকল প্রকারের কৌশল কার্যে পরিণত করেছ। (وَهٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ) এটাতো ফয়সালার দিন। তোমরা একে অস্বীকার করতে, সুতরাং আমি তোমাদেরকেও তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সেই বিষয় ফয়সালার জন্য সমবেত করেছি। যদি তোমরা আমার ফয়সালা হতে বাঁচবার কোনো ব্যবস্থা করতে পার তবে কর। আমি একটু দেখে নেই। তবে জেনে নাও সত্যকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের আজ নিস্তার নেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ : এক্ষণে তোমরা যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পার তাহলে তা প্রয়োগ করে দেখ। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো তোমরা খুব বেশি প্রতারণামূলক কাজ করেছ, বহু প্রচারের ছলা-কৌশল অবলম্বন করেছ, কিন্তু এখানে তোমরা কোনোরূপ কৌশল অবলম্বন করে একটুও বাঁচতে পারবে না।

এটা তাদেরকে লজ্জা এবং মানসিক শাস্তি ও যন্ত্রণা দানের লক্ষ্যে বলা হবে।

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে ইসলামের বিরুদ্ধে যাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে তাদের সকলকে আমি একসাথ করে দিয়েছি, অতএব সম্ভব হলে তাদের সাথে পরামর্শ করে দোজখের আজাব থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা কর। দুনিয়াতে মু'মিনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তোমরা ছিলে সিদ্ধহস্ত। এখন চেষ্টা করে দেখ তেমন কিছু করা যায় কিনা।

দুনিয়াতে আবূ জাহল তার সমর্থকদেরকে বলত, তোমরাতো শক্তিশালী বীরপুরুষ– তোমরা দশজন মিলেও দোজখের একজন প্রহরীকে কাবু করতে পারবে না? কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, এখন চেষ্টা করে দেখ আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থা করতে পার কিনা? -[কবীর; রুহুল মাআনী, মাযহারী]

অনুবাদ :

٤١. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ اَىْ تَكَاثُفِ اَشْجَارٍ اِذْ لَا شَمْسَ يُظِلُّ مِنْ حَرِّهَا وَّعُيُوْنٍ نَابِعَةٍ مِّنَ الْمَاءِ.

৪১. নিশ্চয় মুত্তাকীগণ অবস্থান করবে সুশীতল ছায়ায় ঘন বৃক্ষের নিচে, কারণ সেখানে সূর্য থাকবে না যে, তার উত্তাপ ও প্রখরতা হতে বাঁচার জন্য ছায়ার প্রয়োজন হবে এবং প্রস্রবণ বহুল স্থানে যার পানি প্রবহমান।

٤٢. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ فِيْهِ اِعْلَامٌ بِاَنَّ الْمَاكَلَ وَالْمَشْرَبَ فِى الْجَنَّةِ بِحَسْبِ شَهَوَاتِهِمْ بِخِلَافِ الدُّنْيَا فَبِحَسْبِ مَا يَجِدُ النَّاسُ فِى الْاَغْلَبِ وَيُقَالُ لَهُمْ.

৪২. আর তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে এটা দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বেহেশতে আহার্য ও পানীয় প্রত্যেকের অভিরুচি মতো সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। পার্থিব আহার্য ও পানীয় এটার বিপরীত। কারণ দুনিয়ায় মানুষ সাধারণত তাই পানাহার করে যা সে সংস্থান করতে সক্ষম হয়।

٤٣. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْـًٔا حَالٌ اَىْ مُتَهَنِّئِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الطَّاعَاتِ.

৪৩. আর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার কর هَنِيْـًٔا শব্দটি حَالٌ অর্থাৎ مُتَهَنِّئِيْنَ তোমাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ ইবাদত-বন্দেগি ও আনুগত্য হতে।

٤٤. اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَا الْمُتَّقِيْنَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

৪৪. নিশ্চয় আমি এভাবে যদ্রূপ তোমাদের পুরস্কৃত করেছি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

٤٥. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

৪৫. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

٤٦. كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا خِطَابٌ لِلْكُفَّارِ فِى الدُّنْيَا قَلِيْلًا مِنَ الزَّمَانِ وَغَايَتُهُ اِلَى الْمَوْتِ وَفِىْ هٰذَا تَهْدِيْدٌ لَهُمْ اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ.

৪৬. তোমরা পানাহার কর এবং উপভোগ কর কাফেরদের প্রতি দুনিয়ায় সম্বোধন। সামান্য পরিমাণ সময়, যার শেষসীমা মৃত্যু পর্যন্ত, এটা দ্বারা তাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।

٤٧. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

৪৭. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

٤٨. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا صَلُّوْا لَا يَرْكَعُوْنَ لَا يُصَلُّوْنَ.

৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা রুকু কর সালাত আদায় কর তারা রুকু করে না সালাত আদায় করে না।

٤٩. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

৪৯. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

٥٠. فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ اَىِ الْقُرْاٰنِ يُؤْمِنُوْنَ اَىْ لَا يُمْكِنُ اِيْمَانُهُمْ بِغَيْرِهٖ مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَعْدَ تَكْذِيْبِهِمْ بِهٖ لِاشْتِمَالِهٖ عَلَى الْاِعْجَازِ الَّذِىْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ غَيْرُهٗ.

৫০. সুতরাং তারা এটার পরিবর্তে কোন কথায় অর্থাৎ কুরআনের পরিবর্তে ঈমান আনয়ন করবে অর্থাৎ কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপ করার পর তাদের পক্ষে অপর কোনো আসমানি কিতাবে ঈমান আনয়ন সম্ভব নয়। যেহেতু কুরআন মজীদে এমন সমস্ত অলৌকিক বিষয় স্থান পেয়েছে, যা অপর কোনো আসমানি গ্রন্থে স্থান পায়নি। এতদসত্ত্বেও তারা যখন কুরআনকে অস্বীকার করছে, তবে তাদের পক্ষে অন্য কোনো আসমানি গ্রন্থের উপর ঈমান আনার কল্পনা করা যায় না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ظِلَالٍ : জমহুর ظِلَالٍ পড়েছেন। আর আ'মাশ, যুহরী, তালহা, আ'রায ظُلَّةٌ -এর বহুবচন হিসেবে ظُلَلٍ পড়েছেন।
–[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يُؤْمِنُوْنَ : জমহুর صِيْغَةُ غَائِبٍ হিসেবে يُؤْمِنُوْنَ পড়েছেন। আর ইবনে আমের এক বর্ণনায় এবং ইয়াকূব صِيْغَهْ خِطَابْ হিসেবে تَاء দিয়ে تُؤْمِنُوْن পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ فِىْ ظِلَالٍ وَّعُيُوْنِ الخ : এটা إِنَّ خَبَرِ হয়ে مَحَلاًّ مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ هَنِيْئًا : এটা كُلُوْا -এর ضَمِيْر হতে حَالْ হয়ে مَحَلاًّ مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَرْكَعُوْنَ : এটা قِيْلَ إِذَا হতে شَرْط হিসেবে ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (র.) বলেন– উল্লিখিত ৪৮ নং আয়াতটি ছাকীফ সম্প্রদায়কে উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়। তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে নামাজ পড়ার কথা বললেন এবং নামাজের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। তখন তারা বলল, আমরা রুকু দিতে পারবো না। কেননা রুকু করতে আমাদের লজ্জা হয়। মানুষকে সোজা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। রুকু করা হলে মানুষকে গরুর ন্যায় দেখায়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে ধর্মে রুকু-সিজদা করার বিধান নেই, তাতে উত্তম কোনো কিছু নেই। এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে উপরিউক্ত ৪৮ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلَالٍ الخ : ঈমানদারগণের নেককার্যসমূহের প্রতিদান সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে আল্লাহ বলেন, পক্ষান্তরে মু'মিন-মুত্তাকীগণ আল্লাহর আরশ এবং বেহেশ্তের মনোরম ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে থাকবে। তাদের স্বাদের পানাহারের জন্য মনের মতো যাবতীয় বেহেশ্তী ফলমূল এবং দুধ, মধু, সরবত, পানি ইত্যাদির নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখান থেকে ইচ্ছামতো পান করা সম্ভব হবে। আর তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে– দুনিয়াতে তোমরা যে পুণ্য সাধনা করেছ, তারই বদৌলতে আজ এখানে মনের সুখে পানাহার করতে থাক, আল্লাহ তার পুণ্যাত্মা লোকদেরকে এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এটাই আল্লাহর শাশ্বত বিধান। বেহেশতীগণ বেহেশ্তের নিয়ামত ভোগ করা যেমন আনন্দের ব্যাপার হবে তেমনি আনন্দ ভোগ করার জন্য যে নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে তাও পরম আনন্দের কারণ হবে। (روح) আর দুনিয়ার বহু স্বাদের বস্তু রয়েছে, যা সময়ের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু বেহেশতে এ স্বাদ সর্বদা বহাল থাকবে।

আয়াতে اَلْمُتَّقِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মুকাতিল, কালবী এবং ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেসব লোককে যারা দুনিয়ার জীবনে শিরক থেকে আত্মরক্ষা করত।

কারো মতে, اَلْمُتَّقِيْنَ শব্দ দ্বারা সেসব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা যাবতীয় পাপাচার হতে বেঁচে চলত।
–[কবীর, নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا ..... تَعْمَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, [তাদেরকে বলা হবে] তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

এ কথাটি হয়তো আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন। আল্লাহর এ সম্বোধন এবং কথাটি হবে তাদের জন্য একটি অত্যন্ত বড় নিয়ামত, হবে তাদের জন্য সম্মান ও আনন্দের বস্তু। অথবা এ কথাটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ফেরেশ্তাগণ বলবেন, তাদের সম্মানার্থে। –[রূহুল কোরআন]

অতঃপর এটার কারণ ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, আমাদের শাশ্বত বিধান ও নিয়ম এই যে, আমরা সৎকর্মশীল লোকদেরকে এভাবে পুরস্কৃত করে থাকি; কিন্তু যারা সৎকর্মশীল নয় এবং যারা পরকাল স্বীকার করে না তাদের জন্য বড়োই দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا ..... مُجْرِمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, [হে কাফেরগণ!] 'তোমরা অল্প কিছু দিনের জন্য পানাহার ভোগ করে নও। তোমরা তো অপরাধী নিঃসন্দেহে।'

সমস্ত কাফেরদেরকে সম্বোধন করে এ কথাটি বলা হয়েছে। এটার তাৎপর্য এ যে, তোমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে, খেল-তামাশায়, আনন্দ-উল্লাসে মশগুল হয়ে যে আখেরাতকে অস্বীকার করছে, এ দুনিয়ায় যতদিন আছ ভোগ করে নাও। আনন্দ-ফূর্তি যতটুকু সম্ভব করে নাও। মনে রাখবে যে, পরকাল অস্বীকার করে তোমরা মুজরিম বা অপরাধী হয়ে গেছ। আর অপরাধীদের সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত শাশ্বত বিধান হলো অপরাধীদেরকে শাস্তি দান। সুতরাং শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাক। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا الخ : অর্থাৎ যখন তাদেরকে রুকু করতে বা নামাজ পড়তে আদেশ দেওয়া হয় তখন তারা তা করে না, তবে রোজ কিয়ামতে তারা আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! দুনিয়াতে যদি আমরা আল্লাহর হুজুরে মাথা নত করতাম, তবে আমাদের মাথা আজ এমনিভাবে হেঁট হতো না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শ্রবণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, হে রাসূল– কুরআনের ন্যায় এত ফসীহ ও বলীগ অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ প্রভাব বহুল বাণীকে যারা অস্বীকার করল অতঃপর আর কোনো এমন বাণী নেই যাতে তারা ঈমান আনয়ন করতে পারবে। সুতরাং আপনি তাদের ঈমান আনয়নের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করুন।

এ আয়াত দ্বারা أَمْر ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলিল দান : যেসব লোক "আমর ওয়াজিব বুঝায়" বলে দাবি করেন, তারা এ আয়াত দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। কারণ এ আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল নির্দেশ পালন না করার কারণেই তাদের নিন্দা করেছেন। এটা হতে বুঝা যায় যে, আমর বা আদেশ ওয়াজিবের জন্য। কারণ ওয়াজিবের জন্য না হলে নিন্দা করা কিভাবে সঙ্গত হয়। –[কাবীর]

কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ কথাটি তাদেরকে আখিরাতে বলা হবে; কিন্তু যখন তাদেরকে সিজদা করতে বলা হবে তখন তারা শত চেষ্টা করেও সিজদা করতে পারবে না। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটার পর [অর্থাৎ কুরআনের পরিবর্তে] কোন কথার প্রতি তারা ঈমান আনবে?" অর্থাৎ মানুষকে হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ বুঝাবার এবং হেদায়েতের পথ দেখাবার জন্য সবচেয়ে বড় যা হতে পারে তা কুরআনরূপে নাজিল করে দেওয়া হয়েছে। এটা পাঠ করে, শুনে-বুঝেও যদি কেউ ঈমান না আনতে পারে তাহলে অতঃপর তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসার আর কি জিনিস থাকতে পারে? বস্তুত এমন দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা কোনো ভালো কথাকেই বিশ্বাস করে না। তাই তাদের শাস্তি অবধারিত, ধ্বংস অনিবার্য। –[নূরুল কোরআন]

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ-কে বারবার উল্লেখের কারণ : আলোচ্য সূরায় মহান আল্লাহ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ-কে দশবার উল্লেখ করেছেন। দশটি কারণে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য তাই দশবার উল্লেখ করেছেন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলার এমন যোগ্যতা ও শক্তি দান করেছেন যদি এর সদ্ব্যবহার করা হয়, তবে জীবন সাধনা সার্থক হয়। পক্ষান্তরে যদি তা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হয়। কাফের ও মুশরিকরা এদিক থেকে হতভাগা। কেননা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করেনি বরং তাঁর সাথে শিরক করেছে।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছে এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলেছে।

তৃতীয়ত ফেরেশতাদের ব্যাপারেও তারা ভ্রান্ত ধারণা করেছে।

চতুর্থত তারা ধারণা করেছে, মানুষের জীবন এ পৃথিবীতেই সীমিত। এরপর হাশর-নশর ও পুনর্জীবন বলতে কিছুই নেই।

পঞ্চমত তারা তাকদীরকে অস্বীকার করেছে।

ষষ্ঠত তারা পূর্বকালের নবী-রাসূলগণকে এবং আসমানি কিতাবসমূহকে অস্বীকার করেছে। এ ছাড়া মানুষের যে দৈহিক শক্তি রয়েছে তার অপপ্রয়োগ করে মানুষ অন্যের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে। প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লাগে এমনিভাবে হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় মানুষ একে অন্যকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে।

এ ছাড়া নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার যে বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা লঙ্ঘন করার কারণে মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে চতুষ্পদ জন্তুর পর্যায়ে অবনমিত হয়। মূলত যারা কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে না, যারা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে নিজের জীবনে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে বলে ভয় করে না তারাই উল্লিখিত অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকে। এমনিই দশটি অপরাধের প্রেক্ষিতেই وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ কথাটি বারংবার উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

اَلْجُزْءُ الثَّلَاثُوْنَ : ৩০তম [ত্রিংশতিতম] পারা

سُوْرَةُ النَّبَأِ : সূরা আন-নাবা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার নাম 'আন-নাবা'। সূরার দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ-এর মধ্য হতে اَلنَّبَأُ শব্দকে কেন্দ্র করেই اَلنَّبَأُ নামকরণ করা হয়েছে। 'নাবা' শব্দটির অর্থ সংবাদ বা খবর। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ দেওয়া হয়েছে, কারণে اَلنَّبَأُ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এ সূরাকে عَمَّ ও عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ এবং 'তাসাওল'ও বলা হয়। এতে ২টি রুকূ', ৪১টি আয়াত, ১৩৭টি শব্দ এবং ৬৯০টি অক্ষর রয়েছে। -[খাযেন, কাবীর, নূরুল কোরআন]

সূরাটির মূলকথা ও আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরাটিতে প্রধানত কিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সূরা আল-মুরসালাতে'ও অনুরূপভাবে পরকাল ও কিয়ামতের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরার প্রথম অংশে নাবায়ে আযীম বা কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। এর সমর্থনে পরবর্তী ৬ হতে ১৩ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর নাবায়ে আযীম-এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে ১৭ হতে ২০ আয়াতে। কিয়ামতের পরে দোজখবাসী ও বেহেশতবাসীদের পর্যায়ক্রমে শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উপসংহারে হাশরের ময়দানে অবিশ্বাসীদের অনুশোচনার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এ সূরায় বলা হয়েছে- পরকালের কথা শুনতে পেয়ে মক্কাবাসীরা শহরের প্রতিটি অলিতে-গলিতে আলোচনা সমালোচনা শুরু করেছিল। তাই সূরার প্রথম বাক্যেই সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তোমরা কি এ পৃথিবী ও এ জমিনকে দেখতে পাও না? একে তো আমিই তোমাদের শয্যারূপে বানিয়ে দিয়েছি। এ সুউচ্চ পর্বতমালা কি তোমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না? একে আমিই খুঁটির মতো মাটিতে পুঁতে রেখেছি। তোমরা কি নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখ না? আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন হিসেবে সৃষ্টি করেছি। রাতকে আচ্ছাদনকারী এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের উপায় বানিয়ে দিয়েছি। সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ এবং আলো ও তাপ প্রদানকারী উজ্জ্বল সূর্য সৃষ্টি করেছি। আকাশে ভাসমান মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং ঐ বৃষ্টির পানির দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য, শাক-সবজি ও ঘন বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছি। এটা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না? আমি যদি এ সমস্ত কর্মকাণ্ড করতে পারি তবে এ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে আবার পুনঃ সৃষ্টি করতে পারবো না- এটা তোমরা কিভাবে ধারণা কর? এ বিশ্ব জগতের যাবতীয় সৃষ্টি লক্ষ্যহীন নয়। সৃষ্টিলোকের এ বিরাট কারখানা মূলত মানবজাতির কল্যাণের জন্যই পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানশীলতা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাই মানবজাতিকে এর উৎকৃষ্ট ব্যবহারের প্রচুর ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ যথেচ্ছভাবে এসব কিছুর ভোগ-ব্যবহার করবে, আর সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ মানবে না, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না, তা কেমন করে বোধগম্য হতে পারে?

এ সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের পরে বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন নিঃসন্দেহে যথাসময়ে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমরা যে যেখানে বা যখনই মৃত্যুবরণ করে থাক না কেন, সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে দলে দলে পুনরুত্থান করে তোমাদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। সে দিন আকাশসমূহের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো স্থানচ্যুত হয়ে ছিন্নভিন্ন বালুকণায় পরিণত হবে। পুনরুত্থানের পরে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে- যারা আল্লাহদ্রোহী তাদের জন্য জাহান্নাম হবে ঘাঁটি বিশেষ। অনন্তকাল তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে। তৃষ্ণায় তারা ঠাণ্ডা পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। শাস্তিস্বরূপ অসহনীয় গরম পানীয় ও পুঁজ পরিবেশন করা হবে। যেহেতু তারা হিসাব-নিকাশের ভবিষ্যদ্বাণীকে তোয়াক্কা করেনি; বরং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে ঈমানদারদের পুরস্কার সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ সফলকাম হবে। তাদেরকে বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর সমবয়স্কা যুবতী নারী এবং উপচে পড়া পানপাত্র প্রদান করা হবে। অনুরূপভাবে আরো বিচিত্র রকমের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হবে।

শেষ দিকের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার আদালতের চিত্র পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঐ দিন জীবাত্মাসমূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। যা বলবে তাও যথার্থ বলবে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে আগাম যে খবর দেওয়া হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। যার ইচ্ছা সে দিনটির সত্যতা স্বীকার করে আল্লাহর পথ অবলম্বন করতে পারে। এ সতর্কবাণী শুনেও যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করবে, তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তাদের চোখের সামনে উপস্থাপন করা হবে। তখন অনুতাপ করা ছাড়া আর তাদের কোনো উপায় থাকবে না। তখন তারা অনুতাপ করে বলবে, হায়! আমরা যদি দুনিয়াতে সৃষ্টি না হতাম, অথবা পশু-পাখি ও বৃক্ষ-লতার মতো মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতাম তবে কতইনা ভালো হতো। -[খাযেন, কাবীর]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. عَمَّ عَنْ اَيِّ شَيْءٍ يَتَسَاءَلُوْنَ يَسْأَلُ بَعْضُ قُرَيْشٍ بَعْضًا .

১. কি সম্পর্কেকোন বিষয় সম্পর্কে এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কুরাইশগণ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছে।

٢. عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ بَيَانٌ لِذٰلِكَ الشَّيْءِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِتَفْخِيْمِهٖ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ .

২. সে মহাসংবাদ বিষয়েসে বিষয়ের বিবরণ। আর প্রশ্নবোধকটি এর মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ আনীত কুরআন। যাতে পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

٣. اَلَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ فَالْمُؤْمِنُوْنَ يُثْبِتُوْنَهٗ وَالْكَافِرُوْنَ يُنْكِرُوْنَهٗ .

৩. সে বিষয় যাতে তারা পরস্পরে মতভেদ করছে মু'মিনগণ তা সাব্যস্ত করে আর কাফেরগণ তা অস্বীকার করে।

٤. كَلَّا رَدْعٌ سَيَعْلَمُوْنَ مَا يَحِلُّ بِهِمْ عَلٰى اِنْكَارِهِمْ لَهٗ .

৪. কখনো নয় এটা তিরস্কার ও ধমকদান উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অর্থাৎ তাদের ধারণা ঠিক নয়। অচিরেই তারা জানতে পারবে এটা অস্বীকার করার পরিণতিতে তাদের উপর কি আপতিত হয়?

٥. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ تَاكِيْدٌ وَجِيْءَ فِيْهِ بِثُمَّ لِلْاِيْذَانِ بِاَنَّ الْوَعِيْدَ الثَّانِيْ اَشَدُّ مِنَ الْاَوَّلِ .

৫. আবার বলি, কখনো নয়, তারা অচিরেই জানতে পারবে এটা পূর্ববর্তী বক্তব্যের তাকিদ, আর এখানে ثُمَّ টি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় সাবধান বাণীটি পূর্ববর্তী বক্তব্য অপেক্ষা অধিক কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ "عَمَّ" : ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, عَمَّ শব্দটির মূল عَنْ مَا ছিল। নূন কে মীমের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। কেননা, উভয় অক্ষর গুন্নাহর দিক দিয়ে একই রকম। তারপর اَلِفْ-কে হযফ করা হয়েছে।

–[কুরতুবী, সাফওয়া, কামালাইন, ফাতহুল কাদীর]

আরবি ভাষায় আটটি শব্দ থেকে مَا-এর اَلِفْ-কে অধিক ব্যবহার হওয়ার কারণে হযফ করে দেওয়া হয়। যেমন–

عَنْ - مِنْ - بَا - فِيْ - عَلٰى - اِلٰى - حَتّٰى - لَا

এভাবে ব্যবহার করা হয়- لِمَ - حَتَّامَ - اِلَامَ - عَلَامَ - فِيْمَ - بِمَ - مِمَّ - عَمَّ -[কামালাইন, কাবীর]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, এখানে عَنْ হরফটি প্রশ্নবোধক مَا -এর উপর এসেছে। তারপর প্রশ্নবোধক এবং অপ্রশ্নবোধকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য اَلِفْ -কে হযফ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্নবোধক হলে مَا হতে اَلِفْ পড়ে যাবে।

-[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আল-মুরসালাতের সাথে সূরা আন-নাবার যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় ইরশাদ হয়েছে যে, اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি দ্বারা সৃষ্টি করিনি?' আরো ইরশাদ হয়েছে যে, اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا তথা 'আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে?' আর অত্র সূরায় এসেছে যে, اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا অর্থাৎ 'আমি কি ভূমিকে করিনি বিছানাস্বরূপ?' এটাই হলো পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক। এ ছাড়া পূর্বোক্ত সূরায় কিয়ামত দিবসের যে বিপদাপদ দেখা দেবে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায়ও কিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এটিও হলো সম্পর্কের ভিত্তি। -[নূরুল কোরআন]

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, সূরা আল-মুরসালাত فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ এ আয়াত দিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে حَدِيْث শব্দটি দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তারা যদি এমন কুরআনকে বিশ্বাস না করে, যে কুরআন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতের পূর্ণ স্বীকৃতি দিচ্ছে, তাহলে তাঁর আর কোনো কথাকে বিশ্বাস করবে? আর এ সূরাতে اَلنَّبَاُ বলে সেই কুরআন মাজীদের আলোচনাকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনি]

অথবা, সূরা আন-নাবার প্রথমে পুনরুত্থানের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে, আর সূরা আল-মুরসালাতে কাফেরদের পক্ষ হতে পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি উল্লিখিত হয়েছে। মনে হয় যেন এ সূরাতে তাদের ঐ অস্বীকৃতির দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করা হয়েছে।

সূরার শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে আবূ হাতিম ও হাসান (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পরেই মক্কাবাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন। তখন মক্কার কুরাইশগণ একে অপরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন।

-[লোবাব, ফাতহুল কাদীর]

অথবা, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হিজরতের পূর্বে মক্কার মানুষকে তাওহীদের প্রতি, তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, কিয়ামত ও হাশর মাঠের পুনরুত্থান, বিচার অনুষ্ঠান, পাপ-পুণ্যের পরিণাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান, তখন মক্কার কাফেরগণ এসব বিষয়সমূহকে অলীক ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়। আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে একে অপরকে বলতে থাকে, ওহে! আমাদের ধ্বংসের দিন কখন আসবে? মৃত লোকদের হাড়-মাংস একসাথ হয়ে তারা কবে পুনরুজ্জীবিত হবে এবং কখনই বা শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করবে? কাফেরদের উপহাস ও হঠকারিতার জবাবে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

-[খাযেন, হোসাইনী]

এখানে প্রশ্নবোধক দ্বারা উদ্দেশ্য : عَمَّ শব্দটির মধ্যে যে প্রশ্নবোধক রয়েছে তা দ্বারা নিছক প্রশ্নবোধক উদ্দেশ্য নয়, বরং ব্যাপারটিকে খুব বড় করে দেখানো উদ্দেশ্য। কেননা, কাফেরগণ কিয়ামতের ব্যাপারে বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে শুনত তারা একে কঠোরভাবে অস্বীকার করে যেত এবং ঠাট্টাচ্ছলে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বেড়াত। অতএব, আল্লাহ তাদের অবস্থাকে মারাত্মকভাবে শ্রোতার সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, দেখ, এদের অবস্থা দেখ, কি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে?

-[সাফওয়া, কাশ্শাফ, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর, জালালাইন]

اَلنَّبَاُ الْعَظِيْم : দ্বারা উদ্দেশ্য : আভিধানিক অর্থ- মহাসংবাদ, মহান বাক্য বা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

ইমাম রাযী বলেন, মুফাস্সিরগণ اَلنَّبَاُ الْعَظِيْم -এর তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

∴ এর দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য, আর এটাই প্রকৃত অর্থ, ইবনে যায়েদ এ মত পোষণ করেন। আর এটি কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য।

ক. পরবর্তী আয়াতে سَيَعْلَمُوْنَ আছে "অর্থাৎ অনতিবিলম্বে তারা জানতে পারবে" আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তারা যে বিষয়ে প্রশ্ন করছে, ঐ ব্যাপারটি অনতিবিলম্বে মরে যাওয়ার পর জানতে পারবে; কিন্তু তখন 'এ জানা' তাদের কোনো ফায়দা দিবে না। ফায়দা না আসার ব্যাপারটি হলো কিয়ামতের দিন।

খ. সামনে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, نَبَإِ الْعَظِيْمِ কথাটি পরের আলোচনার ভূমিকাস্বরূপ।

গ. অথবা, اَلْعَظِيْمِ শব্দটি কিয়ামতের একটি পরিচিত নাম। যেমন, কুরআন মাজীদের অপর আয়াতে রয়েছে যে,

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

২. نَبَأٌ বলে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে, এটা মুজাহিদের অভিমত। এ কথার পেছনে দু'টি দলিল রয়েছে–

ক. যে বড় ব্যাপারটি নিয়ে কাফেরগণ মতবিরোধ করছে, তা হলো কুরআন। কেননা তাদের মধ্য হতে কেউ কুরআনকে জাদু, কেউ কবিতা, কেউ পূর্ববর্তী যুগের কিংবদন্তী বলেছিল।

খ. কেননা, اَلنَّبَأُ শব্দটি خَبَرٌ-এর مُخْبَرٌ عَنْهُ - اِسْم-এর اِسْم নয়। অতএব اَلنَّبَأُ শব্দটির তাফসীর 'পুনরুত্থান' বা 'নবুয়ত' করার চেয়ে 'কুরআন' করাই উত্তম।

৩. اَلنَّبَإِ الْعَظِيْمِ বলে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তকে বুঝানো হয়েছে। কেননা হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন কাফেরগণ পরস্পর বলাবলি শুরু করেছিল যে, কি হলো? এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ অবতীর্ণ করলেন। –[কাবীর, খাযেন]

প্রকৃতপক্ষে এখানে اَلنَّبَإِ الْعَظِيْمِ দ্বারা কুরআনে হাকীম, নবুয়তে মুহাম্মদী ﷺ এবং কিয়ামত সবই উদ্দেশ্য। কেননা, এগুলোর একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

"عَمَّ" হতে আলিফ হযফ করার কারণ : ইমাম রাযী (র.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন যে, কয়েকটি কারণে اَلِف-কে হযফ করা হয়েছে, যেমন–

১. গুন্নাহর সময় এক আলিফ বরাবর গুন্নাহ করতে হয়, যেন গুন্নাহতেই আলিফের কাজ আদায় হয়ে যায়।

২. জুরজানী (র.) বলেন, প্রশ্নবোধক مَا এবং ইসমে মাওসূলের مَا -এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য প্রশ্নবোধক مَا হতে اَلِف -কে হযফ করা হয়েছে।

৩. হরফে জার عَنْ -এর সাথে مَا -এর এমন সংযোগ হয়েছে যে, এখন মনে হয় مَا টি عَنْ-এর একটি অংশ বিশেষ। اَلِف থাকলে এ সংযোগ বুঝা যায় না। কেননা اَلِف সহ مَا ভিন্ন একটি শব্দ।

৪. اَلِف -কে এখানে تَخْفِيْف [সংক্ষিপ্তকরণ] -এর জন্য হযফ করা হয়েছে। কেননা এ শব্দটি উচ্চারণে বারবার আছে। –[তাফসীরে কাবীর]

عَمَّ তে কয়েকটি কেরাত : عَمَّ শব্দটিতে নিম্নোক্ত কয়েকটি কেরাত দেখা যায়।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), উবাই, ইকরামা ও ঈসা (র.) প্রমুখ عَمَّ-এর স্থলে عَمَّا আলিফ যুক্ত করে পড়েন।

২. আলিফ ব্যতীত عَمَّ এই কেরাতটি হলো জমহুরের। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

৩. আলিফ ব্যতীত হায়ে সাকতা (ة) যুক্ত করে পড়তেন ইমাম বাযযী এবং ইবনে কাছীর (র.)। যেমন– عَمَّهْ কিন্তু দ্বিতীয় কেরাতটি অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য। –[ফাতহুল কাদীর]

يَتَسَآءَلُوْنَ -এর সর্বনামের مَرْجِع ও অর্থ :

১. يَتَسَآءَلُوْنَ -এর মধ্যে যে সর্বনামটি আছে, তা কুরাইশী কাফেরদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন অর্থ হবে কতিপয় কুরাইশ অন্য কুরাইশীদেরকে প্রশ্ন করছে। –[জালালাইন, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

২. ইমাম রাযী (র.) বলেন, সর্বনামটির দ্বারা কাফের এবং মু'মিন সকলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সকলেই কিয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিল; কিন্তু মু'মিনগণ তাদের ঈমান পরিপক্ক করার নিয়তে প্রশ্ন করেছিল, আর কাফেরগণ করেছিল ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ : কিয়ামত ও আখেরাতের ব্যাপারে মানুষ বিভিন্ন মতামত পোষণ করে থাকে। এ ব্যাপারে যারা ইসলামি আকিদার সাথে দ্বিমত পোষণ করে তাদের মধ্যেও আবার মতবিরোধ দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ ঈসায়ী চিন্তাধারায় প্রভাবিত। তারা পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে স্বীকার করে, তবে তাদের কথা হলো শরীর নয়; বরং আত্মা জীবিত হবে। কারো মতে, শুধু শরীর উঠে দাঁড়াবে। কেউ আবার এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পোষণ করেন, তারা বলেন যে, পরকাল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ [আমরা নিছক ধারণা করি মাত্র–এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী নই।] একে তারা অস্বীকার করে না আবার পুরোপুরি স্বীকারও করে না। অন্য এক দল একে পরিষ্কার অস্বীকার করে। তাদের মতে এ পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন। এর পরে আর কিছু নেই। মৃত্যুর পর কখনো পুনরায় জীবিত করা হবে না তাদের উক্তি নিম্নোক্তভাবে কুরআন মাজীদে তুলে ধরা হয়েছে। "مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰى مَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ" [আমাদের দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। এখানে আমরা কেউ মৃত্যুবরণ করি আবার কেউ জন্ম গ্রহণ করি। যুগই আমাদের ধ্বংসকর্তা।] "إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ" [দুনিয়ার জীবন একমাত্র জীবন আমরা পুনরুজ্জীবিত হবো না।] আবার কেউ বা আল্লাহকে স্বীকার করত, কিন্তু কিয়ামতকে অস্বীকার করত। যাদের হাড়-মাংসের অস্তিত্বই থাকবে না তারা কিভাবে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে তা তাদের বুঝে আসছিল না। মোটকথা, যত জন তত মত।

যেহেতু তাদের নিকট এ ব্যাপারে কোনো নির্ভুল জ্ঞান ছিল না, সেহেতু অনুমানের উপর নির্ভর করে যার যা মনে চাইত তা বলত। সঠিক জ্ঞান থাকলে সকলেই একথা বলত। যেমন ঈমানদারগণের নিকট এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকায় তারা ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছে। সুতরাং হযরত আদম (আ.) হতে এ পর্যন্ত সকল নবীগণও তাঁদের অনুসারী মু'মিনগণের বক্তব্য হলো শরীর ও আত্মা উভয় [একযোগে] পুনরায় জীবিত হবে। তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে।

–[রুহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

কিয়ামতের ব্যাপারে কারা মতবিরোধ করত? :

ক. কাফের ও মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে কিয়ামতের ব্যাপারে মতবিরোধ করত, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে 'নানা মুনীর নানা মত, প্রচলিত ছিল।

খ. কাফের ও মু'মিনগণ এ ব্যাপারে মতবিরোধ করত। কাফেররা একে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করত। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ একে স্বীকার ও সাব্যস্ত করত।

قَوْلُهُ تَعَالَى "كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ" : নবী ও রাসূলগণ সর্বসম্মতভাবে পুনরুত্থানের ও পরকালের ঘোষণা করে গেছেন। তথাপি তারা উক্ত আকীদা বা বিশ্বাসকে মান্য করছে না; বরং নিজেদের ভুল আকীদা-বিশ্বাসের উপর অটল থেকেছে। সুতরাং সে দিবস দূরে নয়, যখন সে বিভীষিকাময় দৃশ্য সামনে পেশ করা হবে যে ব্যাপারে তারা সমালোচনা করছে, তা তারা নিজেরাই স্বচক্ষে দেখতে পাবে। যখন হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করবে যে, কিয়ামত কাকে বলে? আর এটাও বুঝতে পারবে যে, একে অস্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মহানবী ﷺ-এর প্রতিটি কথা হাতে হাতে পাবে। ثُمَّ ও كَلَّا শব্দদ্বয়কে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাকিদের জন্য আনা হয়েছে। আর কারো কারো মতে প্রথমটি বরযখকে এবং দ্বিতীয়টি কিয়ামতকে সাব্যস্ত করার জন্য নেওয়া হয়েছে। বরযখের শাস্তি তো খেয়াল করার মতো হবে। আর কিয়ামতের শাস্তি ও প্রতিদান বাস্তবেই হবে। তথায় শরীর ও আত্মা এক সাথেই থাকবে। দুনিয়ায় যদ্রূপ আত্মার উপর শরীরের প্রাধান্য রয়েছে তদ্রূপ বরযখে শরীরের উপর আত্মার প্রাধান্য থাকবে। মোটকথা এ দৃশ্যমান জগতে শরীর প্রধান এবং আত্মা অপ্রধান। আর সে অদৃশ্য জগতে আত্মা প্রধান ও শরীর অপ্রধান হবে। এর প্রকৃত অবস্থা মৃত্যুর পূর্বে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

একটি অভিযোগ ও এর জবাব : আল্লাহ তা'আলা এখানে কিয়ামত দিবসের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন–"كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ" অথচ সূরা আত-তাকাছুরে কিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন–كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ এখন প্রশ্ন হয় যে, مُضَارِعْ-এর পূর্বে س হলে অদূর ভবিষ্যৎকে বুঝায় এবং سَوْفَ হলে দূরবর্তী ভবিষ্যৎকে বুঝায়। সুতরাং একই কিয়ামতের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী উক্ত দু'টি শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, সূরা আন-নাবার মধ্যে যেহেতু ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা কিয়ামতকে স্বীকার করেন, তাই سَيَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে, যা নিকট ভবিষ্যৎকে বুঝায়। পক্ষান্তরে সূরা আত-তাকাছুরের মধ্যে কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। এ জন্য سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে– যা দূর ভবিষ্যৎকে বুঝায়। কেননা অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَنَرَاهُ قَرِيْبًا অর্থাৎ কাফেররা মনে করে কিয়ামত সুদূর পরাহত, অথচ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে, এটা অতি নিকটে।

كَلَّا 'কখনো না', এটা حُرُوْف غَيْر عَامِلَة বা কার্যকর শক্তিহীন অব্যয়সমূহের অন্যতম। একে حَرْف رَدْع তথা অস্বীকারবোধক বা বিরতমূলক অব্যয়ও বলা হয়। كلا শব্দটির সাধারণ রীতি হলো, এটা পূর্ববর্তী বাক্য বা বাক্যাংশের হুকুম রহিত করে পরবর্তী বাক্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। বলা বাহুল্য, কুরআন মাজীদের প্রথমার্ধে কোথাও كَلَّا শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তবে শেষার্ধের বিভিন্ন স্থানে ধমক এবং সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমার্ধে নরম ও মার্জিত ভাষায় মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে, আর শেষার্ধে কঠিন ও রুক্ষ ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে كَلَّا শেষার্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও হরফটি সতর্ক করার জন্য এসেছে। -[আযীযী]

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ -কে দু'বার উল্লেখ করার কারণ কি? : তাফসীর বিশারদগণ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ -কে দু'বার উল্লেখের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন–

ক. প্রথমটির তাকিদের জন্য দ্বিতীয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ثُمَّ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় সতর্ক বাণী প্রথমটি অপেক্ষা কঠোরতর।

খ. প্রথম বাক্য দ্বারা سَكَرَاتُ الْمَوْتِ বা মৃত্যু যন্ত্রণা -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা কিয়ামতের বিভীষিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ. প্রথম বাক্য দ্বারা যারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে সাবধান করা হয়েছে।

ঘ. প্রথম বাক্যের দ্বারা পুনরুত্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার প্রতিফলের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

ঙ. প্রথম বাক্যের দ্বারা কাফিরদের অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা মু'মিনগণের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাফেররা প্রথমত নিজেদের অবস্থা জানতে পারবে এবং তারপর মু'মিনগণের হাল-হাকিকত অবগত হবে।

চ. প্রথমোক্ত বাক্য দ্বারা শারীরিক শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা রূহানী শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

ছ. প্রথমোক্ত سَيَعْلَمُوْنَ -এর কর্তা হলো মু'মিনগণ এবং দ্বিতীয় سَيَعْلَمُوْنَ -এর কর্তা হলো কাফেররা। আর উভয়ের مَفْعُوْل (কর্ম) হলো اَلْعَاقِبَةُ [পরিণাম]। অর্থাৎ সে দিবস মু'মিন ও কাফের উভয়ই তাদের স্ব-স্ব কর্মফল লাভ করবে। এমতাবস্থায় প্রথমটি وَعْدٌ ও দ্বিতীয়টি وَعِيْد-এর জন্য হবে।

জ. ইবনে মালিক (র.) বলেছেন, উক্ত বাক্যদ্বয়ে তাকীদে লফযী (শাব্দিক তাকিদ) হয়েছে।

ঝ. কারো মতে, প্রথমটি দ্বারা বরযখ ও দ্বিতীয়টি দ্বারা কিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

سَيَعْلَمُوْنَ -এর বর্ণিত কেরাতসমূহ : এখানে দু'টি আয়াতে سَيَعْلَمُوْنَ শব্দটি এসেছে। অতএব,

১. জমহুরের কেরাত হলো 'ইয়া' দ্বারা অর্থাৎ سَيَعْلَمُوْنَ

২. ইমাম হাসান, ইবনে আমের ও মালিক ইবনে দীনার (র.) উভয় স্থানে 'তা' দ্বারা অর্থাৎ سَتَعْلَمُوْنَ পড়েছেন।

৩. ইমাম যাহহাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি প্রথমটিতে 'তা' দ্বারা سَتَعْلَمُوْنَ এবং দ্বিতীয়টিতে 'ইয়া' দ্বারা سَيَعْلَمُوْنَ পড়েছেন। -[রূহুল মা'আনী, কাবীর]

অনুবাদ :

٦. ثُمَّ اَوْمَأَ تَعَالَى اِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ فَقَالَ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا فِرَاشًا كَالْمَهْدِ .

৬. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে পুনরুত্থানে সক্ষম, সেদিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন- আমি কি পৃথিবীকে শয্যা করিনি বিছানা, দোলনার ন্যায়।

٧. وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا يُثَبِّتُ بِهَا الْاَرْضَ كَمَا يُثَبِّتُ الْخِيَامَ بِالْاَوْتَادِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ .

৭. আর পাহাড়সমূহকে কীলক? যা দ্বারা পৃথিবী স্থির হয়েছে, যেমন তাঁবুসমূহ কলকের দ্বারা স্থির থাকে। আর প্রশ্নবোধকটি সাব্যস্ত করণার্থে।

٨. وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ذُكُوْرًا وَاِنَاثًا .

৮. আর আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারীরূপে।

٩. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا رَاحَةً لِاَبْدَانِكُمْ .

৯. আর তোমাদের নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছি তোমাদের দেহের জন্য প্রশান্তি।

١٠. وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا سَاتِرًا بِسَوَادِهِ .

১০. আর রাতকে আবরণ করেছি স্বীয় অন্ধকারে আচ্ছাদনকারী।

١١. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَقْتًا لِلْمَعَايِشِ .

১১. আর দিবসকে জীবিকার সময় করেছি জীবিকা আহরণ করার সময়।

١٢. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سَبْعَ سَمٰوٰتٍ شِدَادًا جَمْعُ شَدِيْدَةٍ اَىْ قَوِيَّةٍ مُحْكَمَةٍ لَا يُؤَثِّرُ فِيْهَا مُرُوْرُ الزَّمَانِ .

১২. আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরে সাতটি সপ্ত আকাশ। যা সুস্থিত شِدَادٌ শব্দটি شَدِيْدَةٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ সুদৃঢ় ও মজবুত, দীর্ঘকালের অতিক্রম তাতে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

١٣. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا مُنِيْرًا وَّهَّاجًا وَقَّادًا يَعْنِى الشَّمْسَ .

১৩. আর আমি সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ আলোকবর্তিকা যা সমুজ্জ্বল আলোকবিকীরণকারী অর্থাৎ সূর্য।

١٤. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ السَّحَابَاتِ الَّتِىْ حَانَ لَهَا اَنْ تُمْطِرَ كَالْمُعْصِرِ الْجَارِيَةِ الَّتِىْ دَنَتْ مِنَ الْحَيْضِ مَاءً ثَجَّاجًا صَبَّابًا

১৪. আর বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে বর্ষণ আসন্ন মেঘমালা সে যুবতী মেয়ের ন্যায় যার ঋতুস্রাব আসন্ন হয়েছে। প্রচুর বারি মুষলধারে বৃষ্টি।

١٥. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا كَالْحِنْطَةِ وَنَبَاتًا كَالتِّبْنِ .

১৫. যাতে আমি উৎপন্ন করতে পারি শস্য যেমন গম এবং উদ্ভিদ যেমন, ঘাসের চারা।

١٦. وَجَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ اَلْفَافًا مُلْتَفَّةً جَمْعُ لَفِيْفٍ كَشَرِيْفٍ وَاَشْرَافٍ .

১৬. আর উদ্যানসমূহ বাগানসমূহ ঘন-সন্নিবিষ্ট জড়িয়ে থাকা, اَلْفَافٌ শব্দটি لَفِيْفٌ-এর বহুবচন, যেমন اَشْرَافٌ শব্দটি شَرِيْفٌ-এর বহুবচন

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا : বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের نَجْعَلُ ক্রিয়ার সাথে و হরফে আতফ দ্বারা যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ اَلَمْ نَجْعَلِ الْجِبَالَ اَوْتَادًا পূর্ববর্তী বাক্যে اَرْض ও مَهْد শব্দদ্বয় نَجْعَلُ ক্রিয়ার যথাক্রমে ১ম ও ২য় مَفْعُوْل। পরবর্তী বাক্যের

أَوْتَادًا ও اَلْجِبَالَ অনুরূপভাবে نَجْعَلْ ক্রিয়ার যথাক্রমে ১ম ও ২য় مَفْعُوْل হয়ে প্রথম বাক্যের সাথে مَعْطُوْف হয়েছে। اَلْجِبَالُ : [পর্বতসমূহ] বহুবচন, একবচনে اَلْجَبَلُ - أَوْتَادُ : পেরেকসমূহ, খুঁটাসমূহ, কীলকসমূহ, বহুবচন, একবচনে وَتَدٌ। -[রুহুল মা'আনী]

وَهَّاجًا-এর মহল্লে ই'রাব : وَهَّاجًا শব্দটি তার পূর্বে উল্লিখিত سِرَاجًا শব্দের বিশেষণ (صِفَةٌ) হয়েছে। جَعَلَ -কে- وَهَّاجًا ক্রিয়ার দ্বিতীয় মাফউল বলা যায় না। কেননা جَعَلْنَا এমন দু'টি اِسْم-কে مَفْعُوْل বানায়, যাদের মধ্যে একটি مَعْرِفَةٌ হবে। এ কারণেই এ আয়াতে جَعَلْنَا-এর অর্থ خَلَقْنَا করা হয়েছে। অতএব, سِرَاجًا শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণে এর সিফাত وَهَّاجًاও মানসূব হয়েছে। -[কামালাইন ও কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের কিয়ামত ও পরকালকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। তারা মূলত এ জন্যই একে অস্বীকার করেছে যে, এটা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যা দ্বারা বস্তুত তারা আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতকেই অস্বীকার করেছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন কুদরতের পরিচয় বাণী। সুতরাং যিনি এ সকল বিষয় সম্পাদন করতে সক্ষম তিনি কিয়ামত সঙ্ঘটনেও পূর্ণ সক্ষম।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا" : আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا এখানে اَلْمِهَادُ অর্থ বিছানা বা সমতল ভূমি। আর مَهْد শব্দের আভিধানিক অর্থ দোলনা বিশেষ। مِهَادٌ শব্দটি مَهْدٌ হতেই উদ্গত হয়েছে। দোলনা এক রজ্জুর সাথে ঝুলন্ত থাকে অথচ এ দোদুল্যমান অবস্থায়ই তাতে শিশু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। এ পৃথিবী দোলনার সাথে তুলনীয়। মহাশূন্যে এ দোদুল্যমান পৃথিবীকেও মানুষের জন্য আরামদায়ক করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ এ পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কক্ষপথে এর গতি ঘণ্টায় ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার মাইল। এর গর্ভে এমন তাপ বিদ্যমান রয়েছে যে, কঠিন শিলাখণ্ডও গলে যাবে। আগ্নেয়গিরির অগ্নুদগীরণের গলিত লাভাস্রোতই এর যথার্থ প্রমাণ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা এ পৃথিবীকে এমন প্রশান্ত বানিয়েছেন যে, তোমরা এর সাথে মধ্যাকর্ষণের শক্তিতে উল্টাভাবে ঝুলেও আদৌ কোনো কিছু অনুভব করতে পারছ না। তোমরা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করছ। বন্দুকের গুলীর চেয়েও দ্রুতগামী বাহনের উপর তোমরা সওয়ার হয়ে আছ, অথচ আদৌ বুঝতে পারছ না। মহাশূন্যে গতিবান পৃথিবীর পৃষ্ঠে আল্লাহর কুদরতি শক্তিতে মধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে পৃথিবীর বস্তুনিচয়কে স্থির রেখে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট-জীবের জন্য বসবাস উপযোগী করার অতুলনীয় ক্ষমতার কথা অত্র আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। اَلْمَهْدُ-এর শাব্দিক অর্থ বিছানা হলেও একে বসবাসের উপযোগী স্থান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। اَلْمِهَادُ-এর বহুবচন হলো مُهُدٌ [মুহুদ] এবং اَمْهِدَةٌ [আমহিদাতুন]।

قَوْلُهُ "مِهَادًا" : অধিকাংশ ক্বারীগণ مِهَادًا-কে মীমের নিচে যের দিয়ে পড়েন। আর মুজাহিদ, ঈসা ও কিছু কূফাবাসী ওলামায়ে কেরামের কেরাত হলো مَهَادًا মীমের উপর যবর দিয়ে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا" : 'পর্বতসমূহকে কি কীলক স্বরূপ নির্মাণ করিনি?' অবশ্যই করেছি। অর্থাৎ এ পৃথিবী পৃষ্ঠকে শূন্য-সমতল প্রান্তর না বানিয়ে; বরং তাতে স্থানে স্থানে ছোট-বড় পর্বতমালা স্থাপন করে পৃথিবীর তারসাম্য রক্ষা করেছি যাতে তা নড়াচড়া করতে না পারে। বিজ্ঞানীদের মতে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের মতো পৃথিবীও নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় পৃথিবী সর্বদা দুলতে থাকলে এর পৃষ্ঠে নিশ্চিন্তে বসবাস করা সম্ভবপর ছিল না। দোলায়মান নৌকায় ভারি পাথর বোঝাই করলে তা স্থির হয়ে সঠিকভাবে চলতে পারে। তদ্রূপ আবর্তনশীল পৃথিবীতে স্থানে স্থানে পর্বত সৃষ্টি করে এর ভারসাম্য ও স্থিরতা বজায় রাখা হয়েছে। ফলে মানুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারছে। এটাও আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরতের নিদর্শন। -[তাফসীরে হক্কানী]

এ ছাড়া এ সমস্ত মওসুম পরিবর্তনে, বৃষ্টি বর্ষণে, ঝর্ণা, খাল ও নদী সৃষ্টিকরণে, শস্য-শ্যামল উর্বর উপত্যকা সৃষ্টিতে, বড় বড় কাণ্ডসম্পন্ন বৃক্ষরাজি উৎপাদনে, নানা ধরনের খনিজ ও শিলা সংগ্রহে এ সমস্ত পর্বতমালার ব্যাপক অবদান রয়েছে। সমুদ্রের লোনা পানি হতে বাষ্পীভূত মেঘমালা কীলক সদৃশ পর্বত গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মিঠা পানির বৃষ্টি বর্ষণ করে। বর্ষণ প্রবাহই স্রোত সৃষ্টি করে নদ-নদীগুলোর নাব্যতা বজায় রাখে। পর্বতমালাকে কীলক বা খুঁটার মতো সৃষ্টি করার মধ্যে মাখলুকের আরো হাজারও রকমের কল্যাণ রয়েছে। এটা রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরতের অন্যতম প্রমাণ।

পাহাড় কখন সৃষ্টি করা হয়েছে? : এ ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়, হাদীসটি নিম্নরূপ–

আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তা ভীষণভাবে কাঁপছিল। অতঃপর জমিনের উপর পহাড়কে স্থাপন করা হলো। এতে জমিন স্থির হয়ে গেল। ফেরেশতাগণ আরজ করলন– হে আমাদের রব! পাহাড় থেকে ভারি শক্ত আর কোনো বস্তু কি সৃষ্টি করেছেন? উত্তর দিলেন, নিশ্চয় তা হলো লৌহ। তারপর তারা আবার প্রশ্ন করলেন, হে আমদের রব! লৌহ থেকে মারাত্মক কি কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? উত্তর দিলেন, নিশ্চয় তা হলো আগুন। ফেরেশতাগণ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হে আমাদের রব! আগুন থেকে অধিকতর মারাত্মক কোনো বস্তু কি সৃষ্টি করেছেন? উত্তর করলেন, তা হলো পানি। আবার প্রশ্ন হলো যে, হে আমাদের রব, পানি থেকে মারাত্মক কোনো জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ–বাতাস। তারপর প্রশ্ন হলো বাতাস হতে তীব্রতর কোনো বস্তু কি সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে বললেন, বনী আদম যারা ডান হাতে এমনভাবে দান করবে যে, বাম হাতে তা জানবে না।

এ হাদীসটির উপর ভিত্তি করে সকল দার্শনিকগণ ঐকমত্যে পৌছেছেন যে, জমিন সৃষ্টির পরই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, প্রথম পাহাড়ের নাম আবূ কায়েস। এ হাদীসটিকে হাকিম সহীহ বলেছেন।

১. জোড়া জোড়া অর্থ পুরুষ এবং স্ত্রীরূপে। পুরুষ সৃষ্টি করে বিপরীতে স্ত্রী এবং স্ত্রীর বিপরীতে পুরুষ সৃষ্টি করা বুঝিয়েছেন।
২. আবার ব্যাপক অর্থে কোনো গুণের বিপরীতেও হতে পারে। যেমন– ভালো ও মন্দ, সুন্দর ও অসুন্দর, সাদা ও কালো, ধনী ও গরিব, জ্ঞানী ও মূর্খ ইত্যাদি। –[হোসাইনী, হাক্কানী, কাবীর]
৩. কারো মতে أَزْوَاجًا অর্থ اَلْوَانًا [বিভিন্ন রঙের]। –[কুরতুবী ও ফাতহুল কাদীর]

প্রকৃতপক্ষে "জোড়া জোড়া" সৃষ্টি বলতে যদি মানবজাতির নর-নারীকেই ধরা হয় তবুও সৃষ্টিকর্তার অসীম সৃষ্টি-নৈপুণ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। নর ও নারী মানবতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হলেও দৈহিক কাঠামো, আবেগ-আবেদনের দিক হতে পরস্পর স্বতন্ত্র। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের জন্য পরিপূরক ও জুড়ি হওয়ার ব্যাপারে একটা অনুকূল সামঞ্জস্য রয়েছে। আর এ সামঞ্জস্য সৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি চলছে। কোনো মানুষ ইচ্ছা করে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারে না। তবু এমন দেখা যায়নি যে, পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে শুধু পুত্র-সন্তান বা শুধু কন্যা-সান্তান জন্মলাভ করে নর ও নারীর সংখ্যাগত ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছে। আবার কন্যা সন্তানেরা ক্রমাগত নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং পুত্র সন্তানেরা ক্রমাগত পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে এক অব্যক্ত আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে একশ্রেণি অপর শ্রেণির উপযুক্ত জুড়ি হতে পারছে। নারী-পুরুষের জন্মও ক্রমাগত এমন মাত্রায় সামঞ্জস্য মণ্ডিত, যার উপরে মানুষের কোনো হাত নেই। এ কর্মকুশলতা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তা সংসার-সংগঠন, বংশ সংরক্ষণ এবং মানবীয় সভ্যতা ও তামাদ্দুন সৃষ্টি করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا" : কোনো কোনো নাস্তিকের পক্ষ হতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, سُبَاتٌ শব্দের অর্থ نَوْمٌ (নিদ্রা)। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ نَوْمًا অর্থাৎ 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে নিদ্রা করেছি।' এ কথাটির মধ্যে কোনো বালাগাত আছে বলে বুঝা যায় না। আর এটা বলারই বা দরকার কি ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তরে মুফাসসিরীনে কেরামের উক্তিগুলো উল্লেখ করা যায় তা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা যুজাজ বলছেন, سُبَاتٌ 'সুবাত' অর্থ এ স্থানে 'মৃত্যু' নেওয়া হবে। তখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াবে– 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে মৃত্যুসম করেছি।' কেননা 'সুবাত' শব্দটি سَبْتٌ হতে নির্গত। সাবত্ অর্থ– কেটেফেলা, বন্ধ হয়ে যাওয়া। মৃতব্যক্তির যেমন সর্বপ্রকার চিন্তাভাবনা এবং নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। এ কথার পেছনে দু'টি দলিল দেওয়া হয়েছে।
ক. وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ 'তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে রাতে মৃত্যু দেন।' এখানে রাতের ঘুমকে মৃত্যু বলা হয়েছে।
খ. نَوْم-কে যখন مَوْت বলা হয়েছে, তখন يَقْظَةٌ বা জাগ্রতকে مَعَاشٌ বলা হয়েছে। আর مَعَاشٌ অর্থ حَيَاةٌ বা জীবন। অতএব, বুঝা যায় যে, এখানে سُبَاتٌ অর্থ 'মৃত্যু' এবং সামনের আয়াতে مَعَاشٌ অর্থ 'জীবন' হবে।
২. ইমাম লাইছ বলেছেন, سُبَاتٌ বলা হয় ঐ নিদ্রাকে যে নিদ্রায় মানুষের প্রায় হুঁশ থাকে না। ঐ রুগীকে مَسْبُوْتٌ বলা হয় যে রুগী হুশ হারিয়ে ফেলেছে।

৩. মূলত اَلسُّبَاتُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ– কেটে ফেলা, বন্ধ করা। বলা হয়ে থাকে যে, سَبَتَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ অর্থাৎ লোকটি নিজের মাথা কেটেছে। إِذَا حَلَقَ شَعْرَهُ অর্থাৎ যখন মাথার চুল মুড়ে ফেলে। কেটে ফেলা অর্থের কয়েকটি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো–

ক. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ نَوْمًا مُنْقَطِعًا لَا دَائِمًا অর্থাৎ "তোমাদের ঘুমকে আমি সময় মতো ভাগ ভাগ করে দিয়েছি। একাধারে নিদ্রার ব্যবস্থা করিনি।" কেননা প্রয়োজন অনুযায়ী ঘুম যাওয়া মানব জীবনের জন্য সর্বোপকারী ব্যাপার; পক্ষান্তরে সব সময় বা একাধারে নিদ্রা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। অতএব, 'ভাগ-ভাগ নিদ্রা' বা 'কাটা-কাটা নিদ্রা' যখন মানব জীবনের জন্য বিরাট নিয়ামত, তখন ঐ নিদ্রাকে নিয়ামত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া যথার্থ হয়েছে।

খ. কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষ স্বাভাবিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিদ্রার মাধ্যমে ঐ ক্লান্তি দূর হয়। ঐ 'দূর হওয়া' -কে قَطْع বা سَبْت বলা হয়েছে। এ কারণেই ইবনে কুতাইবা سُبَاتًا-এর অর্থ رَاحَةً বা প্রশান্তি করেছেন। কেননা নিদ্রা মানুষের ক্লান্তিকে কেটে দিয়ে প্রশান্তি আনয়ন করে।

গ. অথবা, অর্থ এভাবে করতে হবে যে, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ نَوْمًا خَفِيفًا يُمْكِنُكُمْ دَفْعُهُ وَقَطْعُهُ অর্থাৎ আমি তোমাদের নিদ্রাকে হালকা করে রেখেছি, যেন তোমাদের পক্ষে তা কেটে উঠা সম্ভব হয়। যদি তাদের উপর নিদ্রা প্রবল হতো, তাহলে নিদ্রা হতে উঠা কষ্টকর হতো। নিদ্রাই তখন একটি মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হতো। –[কাবীর, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

মূলত নিদ্রা মানুষের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বড় নিয়ামত, এর মাধ্যমে মানুষ তার অবসাদগ্রস্ততা দূর করে পুনঃ কার্যক্ষমতা ফিরে পায়। এটা মানুষের মৌলিক চাহিদা। এটা ব্যতীত মানুষ বাঁচতে পারে না। জোর করে একে প্রতিরোধ করতে চাইলে মানুষের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু মানুষ কেন অন্যান্য প্রাণীও ঘুম ব্যতীত বাঁচতে পারে না। মানুষ ও অপরাপর সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্যই মহান আল্লাহ ঘুমকে সৃষ্টি করেছেন। এর নিগূঢ় ও অপার রহস্য একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا" : রাত্রিকে পোশাক বানিয়ে দেওয়ার মর্মার্থ হলো– এর মধ্যে মানুষ তাদের গোপনীয় কার্যাবলি নির্বিঘ্নে করতে পারে। যেমন– স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং ভালো-মন্দ পরামর্শ করা ইত্যাদি। গোপন শলা-পরামর্শ, শত্রু হতে আত্মরক্ষা, আনন্দ উপভোগ, হাসি-তামাশা, চুরি-ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, তাহাজ্জুদ ও মুরাকাবাহ ইত্যাদি বহু কার্য রাতের বেলায় উত্তমভাবে করা যায়। জনৈক কবি বলেছেন–

اَللَّيْلُ لِلْعَاشِقِيْنَ سِتْرًا * يَا لَيْتَ أَوْقَاتَهُ تَدُوْمُ

অর্থাৎ প্রেমিকদের জন্য রাত হলো আবরণ স্বরূপ। হায়! কতই না উত্তম হতো যদি সর্বদা রাত থাকত।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, লেবাসের মাধ্যমে যেমন মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, গরমের প্রখরতা হতে নিষ্কৃতি পায়, ঠাণ্ডার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে– তদ্রূপ রাত্রের ঘুমের মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্য বাড়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সজীব ও মোলায়েম হয়, শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়, কর্ম ক্ষমতা ফিরে পায়, মানসিক অস্থিরতা দূর হয়।

উল্লেখ্য যে, আখেরাতে না রাত হবে আর না ঘুম। বিবেকের দাবিও হলো এগুলো না হওয়া। কেননা নেককার সর্বদা আনন্দে বিভোর থাকবে। প্রথমত নিদ্রার তথায় প্রয়োজন হবে না। তা ছাড়া ঘুমের কারণে বড় বড় উপকার হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং স্থায়ী প্রতিদান হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–"لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ" [বেহেশতবাসীগণ বলবে কষ্টকর ও অনর্থক কিছুই তথায় আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।] পক্ষান্তরে কাফের মুশরিক সর্বদাই আজাবে লিপ্ত থাকবে। নিদ্রা যাওয়ার সুযোগ তাদের কোথায়?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কেউ প্রশ্ন করল যে, বিবাহের মজলিস দিনে হওয়া ভালো না রাতে। তিনি জবাবে বললেন, রাতে হওয়া ভালো। কেননা রাতকেও লেবাস বলা হয়েছে। আবার মহিলাদেরকেও লেবাস বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–"هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ" কাজেই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا" : রাতকে তো আরাম লাভের জন্য অন্ধকারের আবরণ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে দিবসকে এ জন্য আলোক উজ্জ্বল করা হয়েছে যে, মানুষ যেন অনায়াসে এবং সহজে জীবিকা অর্জন করতে পারে। বস্তুত দিনকে এভাবে অনবরত পরিবর্তন করার মধ্যে অগণিত হেকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে। এটা গতানুগতিকভাবে সংঘটিত হচ্ছে না। মানুষ না একাধারে দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারে আর না একেবারে অলস হয়ে বসে থাকতে পারে। আর এ জন্য দিন-রাতের উক্ত রুটিন করে দেওয়া হয়েছে। জান্নাতে যেহেতু জান্নাতীগণের নিকট নিয়তের চাহিদা থাকবে না। আর না জাহান্নামীরা শান্তির প্রয়োজন অনুভব করবে, সেহেতু দিবারাত্র হবে না। لَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা দিবসকে জীবিকা অর্জনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে مَعَاشٌ-এর মধ্যস্থিত মীমটি মাসদারের مِيْم ও হতে পারে, তখন এর পূর্বে মুযাফ উহ্য মেনে তাকে ظَرْف করতে হবে। অর্থাৎ "جَعَلْنَا النَّهَارَ وَقْتَ مَعَاشٍ" অর্থাৎ আমি দিবসকে রুজির সময় বানিয়েছি।

অথবা مِيْم টি ظَرْف -এর জন্যও হতে পারে, তখন এটা ظَرْف زَمَانٌ বা ظَرْف مَكَانٌ হবে। –[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

ঘুমের জন্য سُبَاتٌ এবং দিনের জন্য مَعَاشٌ উল্লেখ করার তাৎপর্য : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিদ্রার সময় সমস্ত কার্যাবলি বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি কার্যাবলি এবং নিদ্রা একই ব্যক্তি থেকে একই সময়ে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নিদ্রা ও কাজ এক সময় হয় না। কেননা নিদ্রা মানুষের জন্য মৃত্যুসম। মৃতব্যক্তির মতো তার সকল কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নিদ্রার জন্য কাজ বন্ধ করে দিতেই হয়। এ কারণেই নিদ্রার ব্যাপারে سُبَاتٌ (বন্ধ করা, কেটে ফেলা) ব্যবহার করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে দিনকে রুজি-রোজগারের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কেননা রুজি-রোজগার করতে হলে নড়াচড়া করতে হয়, যা সম্পূর্ণভাবে ঘুমের বিপরীত। অতএব, দিনে জেগে থেকে নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবিকার্জন করতে হয়। এ কারণেই نَهَارٌ -এর জন্য مَعَاشٌ -কে ব্যবহার করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى "سَبْعًا شِدَادًا" : বাক্যটির প্রকৃতরূপ سَبْعًا شِدَادًا سَبْعَ سَمٰوَاتٍ شِدَادًا আসমান বা সামাওয়াত শব্দটি উহ্য করে বস্তুর গুণের বিশালত্বের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। আমি তোমাদের ঊর্ধ্বালোকে সাতটি মজবুত আসমান তৈরি করেছি যাতে কালের আবর্তন সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না।

–[জালালাইন, হোসাইনী]

'সাত মজবুত' দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরকারই 'সাত আসমান' ব্যাখ্যা করেছেন। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুরূপ। সাত আসমান তথা নভোমণ্ডলের সাতটি স্তরে বা সাতটি শূন্য তরঙ্গের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর এক স্তর হতে অন্য স্তরের দূরত্ব পাঁচশত আলোকবর্ষ মাইল। গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-এর প্রথম স্তরেই বিচরণ করছে। আমাদের এ পৃথিবী হতে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় গ্রহ-নক্ষত্র এতে লাটিমের মতো ঘূর্ণায়মান ও আবর্তনশীল হয়ে রয়েছে। সূর্য হতেও হাজার হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল তারকা এতে জ্বলজ্বল করছে। আমাদের এ গোটা সৌরজগতটা এক একটি ছায়াপথের এক কোণে রয়েছে। এ একটি ছায়াপথেই সূর্যের মতো তিনশত কোটিরও বেশি নক্ষত্ররাজি রয়েছে। অদ্যাবধি মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঐরূপ দশ লক্ষেরও বেশি ছায়াপথের (থটফটসহ) সন্ধান পাওয়া গেছে। এ লক্ষ লক্ষ ছায়াপথগুলোর মধ্যে আমাদের নিকটতম ছায়াপথের দূরত্ব এতটা যে, এর আলো প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হলে দশ লক্ষ বৎসরে পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সুবিশাল রাজত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেওয়া মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে, আল্লাহর সাম্রাজ্য নিঃসন্দেহে তা হতে অনেক ব্যাপক ও বিশাল হবে। মানুষের সংকীর্ণ জ্ঞান ও অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা অদ্যাবধি নভোমণ্ডলের প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শক্তি মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে আমি তোমাদের উপর মজবুত কাঠামো বিশিষ্ট সাতটি স্তরে মহাকাশ নির্মাণ করেছি এবং পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য (তোমাদের নিকটতম নক্ষত্র) সূর্যকে প্রদীপের মতো অফুরন্ত জ্যোতির্ময়রূপে সৃষ্টি করেছি? আর আমারই আদেশে বর্ষণশীল মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ হয় এবং এ বর্ষণের মাধ্যমেই সমগ্র মাখলুকাতের জন্য পৃথিবীর বুকে শস্য-সবজি, বৃক্ষরাজি ও পত্র-পুষ্পে সুশোভিত উদ্যানসমূহের উৎপত্তি হয়।" কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে সাতটি মজবুত দ্বারা পৃথিবীর ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত সাতটি প্রধান গ্রহ-বৃহস্পতি, শনি, শুক্র, মঙ্গল, বুধ, নেপচুন ও চন্দ্র বুঝিয়েছে। شِدَادًا অর্থ– শক্ত, মজবুত, এটা شَدِيْدٌ-এর বহুবচন।

بَنَيْنَا শব্দটি ব্যবহারের রহস্য : কোনো ঘরের নিচের অংশকে بِنَاءٌ বলা হয়। নিচের অংশ তৈরি করা বুঝাতে اَلْبِنَاءُ ব্যবহার করা হয়; কিন্তু আকাশ আমাদের মাথার উপরে রয়েছে, এখানে بِنَاءٌ শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে কি রহস্য নিহিত রয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া হয় যে, بِنَاءٌ [ভিত্তি] সবসময় মসিবত থেকে দূরে থাকে। بِنَاءٌ থেকে কোনো মসিবত আসার সম্ভাবনা থাকে না, আর না এর উপর কোনো মসিবত অর্পিত হয়। কেননা তা মাটির নিচে সুদৃঢ়ভাবে বসে থাকে। আর যা নড়বড় হয়, তা بِنَاءٌ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এক কথায় ছাদ ভেঙ্গে পড়ে মানুষ বা অন্য কিছুর ক্ষতি হয়, কিন্তু بِنَاءٌ কোনো দিকে পড়ে না। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে এখন ছাদ হিসেবে দিয়েছেন যা بِنَاءٌ-এর মতো দৃঢ় মজবুত। তাহলে কোনো কিছু পড়ে বা তা ভেঙ্গে পড়ে কোনো কিছুর ক্ষতি হবে না। এ কারণেই رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ না বলে بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ বলা হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী]

سِرَاجًا وَهَّاجًا -এর মর্মার্থ : উল্লিখিত আয়াতে سِرَاج বলে তার বিশেষণ হিসেবে وَهَّاج শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। سِرَاج অর্থ- প্রদীপ। وَهَّاج শব্দের ধাতু وَهْج। এর অর্থ স্বয়ং উজ্জ্বল ও অন্যকে দীপ্তি ও তাপদানকারী (রাগেব)। এ আলোক ও উত্তাপের সংস্থান হয়ে থাকে সূর্য হতে। এখানে তারই কথা বলা হয়েছে।

وَهَّاجًا : অর্থ অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অতিশয় উজ্জ্বল। اِسْمُ فَاعِلٍ مُبَالَغَة মূলবর্ণ وهج - وَهَّاجًا শব্দটি পূর্ববর্তী سِرَاجًا মাওসূফের সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত একত্র হয়ে جَعَلَ ফে'লের মাফউল হয়েছে। এ বাক্যে جَعَلَ-এর দ্বিতীয় মাফউল নেই। কেননা প্রথম মাফউল কখনো نَكِرَه হতে পারে না। -[কামালাইন]

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, اَلْوَهَّاجُ শব্দের অর্থ নিয়ে ভাষাবিদগণ বেশ ব্যস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ এ শব্দটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে–

১. اَلْوَهْجُ هُوَ مَجْمَعُ النُّوْرِ وَالْحَرَارَةِ অর্থাৎ এটা আলো এবং গরমের সমাগম। আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে আলো এবং গরমের চরম সীমা দান করেছেন। যে আলো আর গরম অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না।

২. কালবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, اِنَّ الْوَهَّاجَ مُبَالَغَةٌ فِى النُّوْرِ فَقَطْ অর্থাৎ وَهَّاجٌ শব্দটির অর্থ শুধু অতিরিক্ত আলো। অর্থাৎ আলোর চরম সীমাকে وَهَّاجٌ বলা হয়।

৩. খলীল বলেন, حَرُّ النَّارِ وَالشَّمْسِ অর্থাৎ দোজখ এবং সূর্যের তাপকে وَهْج বলা হয়। উপরোল্লিখিত কয়েকটি অর্থের মধ্য হতে সবকয়টি অর্থই আয়াতে প্রযোজ্য। -[কবীর, খাযেন]

এ প্রদীপ [সূর্য] কোথা অবস্থিত? : আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, সূর্য কোথায় অবস্থিত এ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ মতটি হলো সূর্য চতুর্থ আসমানে রয়েছে। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.)-এর একটি হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, 'সূর্য চতুর্থ আকাশে অবস্থিত, সে স্থান হতেই তা আমাদের দিকে এর আলো এবং তাপ প্রেরণ করে।'

বৈজ্ঞানিকদের বইতে পাওয়া যায় যে, সাত আকাশের জন্য সাতটি গ্রহ দেখা যায়। সেগুলো নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করছে- সপ্ত আকাশে (زُحَلْ) যাহল, ষষ্ঠতে (مُشْتَرِىْ) মুশতারী, পঞ্চম আকাশে (مُرِيْخ) মুরীখ, চতুর্থতে সূর্য, তৃতীয়তে (زُهْرَة) যাহরা, দ্বিতীয়তে (عُطَارِدْ) আতারিদ এবং প্রথম আকাশে চন্দ্র। -[রূহুল মা'আনী]

সূর্য সৃষ্টির রহস্য : আল্লাহ বলেন, 'আমি (সূর্যকে) করেছি একটি প্রদীপ যা সমুজ্জ্বল' এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে আল্লাহর অসীম কুদরত ও বিরাট নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূর্যের ব্যাস পৃথিবী হতে ১০৯ গুণ এবং আয়তন ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। এর তাপমাত্রা ১ কোটি ৪ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবী হতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এর রশ্মি এতই উত্তপ্ত যে, পৃথিবীর কোনো কোনো অংশ এর প্রভাবে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিশেষ সৃষ্টি-কুশলতায় এটা হতে পৃথিবীকে এতটা দূরত্বে রেখেছেন যে, পৃথিবী বেশি উত্তপ্ত হয় না এবং ঠাণ্ডায়ও জমে যায় না। নাতিশীতোষ্ণ করে সৃষ্ট জীবের বসবাস উপযোগী করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا" : ইমাম রাযী (র.) লিখেন, مُعْصِرَاتِ সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়–

১. হযরত মুজাহিদ, মুকাতিল, কালবী, কাতাদাহ (র.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দু'টি মতের একটিতে مُعْصِرَاتُ শব্দের অর্থ 'ঐ বাতাস, যে বাতাস মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।' এ মতের স্বপক্ষে তাঁরা কুরআন মাজীদের একটি আয়াত পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا অর্থাৎ 'তিনি আল্লাহ যিনি বাতাসকে প্রবাহিত করেন, সে বাতাস মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে।'

এ অর্থের উপর একটি আপত্তি আসে যে, যদি مُعْصِرَاتٌ-এর অর্থ বাতাস হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা مِنْ الْمُعْصِرَاتِ না বলে بِالْمُعْصِرَاتِ (بَاءْ مِنْ স্থলে) বলতেন।

এ আপত্তির জবাবে দু'টি কথা বলা যায়–

ক. বৃষ্টি মেঘ থেকে হয়, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু বাতাস উক্ত মেঘকে বৃষ্টি আকারে জমিনে পড়ার ব্যবস্থা করে। যেহেতু বাতাস বৃষ্টি হওয়ার একটি سَبَبٌ বা মাধ্যম। অতএব, سَبَبٌ বলে مُسَبَّبٌ মুরাদ নেওয়ায় দোষ নেই।

খ. অথবা, এখানে مِنْ অর্থ بَاءْ তখন মূলবাক্য এরূপ দাঁড়াবে, وَاَنْزَلْنَا بِالْمُعْصِرَاتِ অর্থাৎ بِالرِّيَاحِ الْمُثِيْرَةِ لِلسَّحَابِ

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দ্বিতীয় মত, যে মতকে আবুল আলিয়া, রবী এবং যাহহাক (র.) গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন তা হলো, اَلْمُعْصِرَات অর্থ- মেঘমালা।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, مُعْصِرَاتٌ অর্থ سَحَابٌ বা মেঘমালা নেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা অধিকাংশ ভাষাবিদদের মতে مُعْصِرٌ ঐ মেঘকে বলা হয়, যে মেঘ হতে বর্ষণ সন্নিকটে।

মুবারাবাদ বলেন, مُعْصِرٌ ঐ মেঘরকে বলা হয়, যে মেঘ পানি ধারণ করে থাকে এবং সেখান হতে অল্প অল্প করে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে থাকে। এ অর্থেই مَلْجَأ -কে اَلْعَصْرُ বলা হয়। কেননা مَلْجَأ অর্থ- আশ্রয়স্থল। আর اَلْعَصْرُ -এর মধ্যে পানি আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ বালিকাকে مُعْصِرٌ বলা হয়, যে বালিকা বালেগা হওয়ার পথে। কেননা তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। তখন ঘর তার জন্য مَلْجَأ বা আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়।

ইমাম কুরতুবী مُعْصِرَاتٌ-এর তৃতীয় অর্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

৩. উবাই ইবনে কা'ব, হাসান ইবনে জুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান اَلسَّمٰوَاتُ -مُعْصِرَاتٌ-এর অর্থ করেছেন। مِنَ الْمُعْصِرَاتِ অর্থ- مِنَ السَّمٰوَاتِ -[কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

৪. ইবনে কাইসান (র.) বলেন, اَلْمُعْصِرَات হলো বৃষ্টি বর্ষণকারী বাদল। -[নূরুল কোরআন]

سَحَابٌ উল্লেখ না করে مُعْصِرَاتٌ উল্লেখ করার কারণ : তাফসীর বিশারদগণ এ প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন-

১. কেননা, কুরইশদের ভাষায় مُعْصِرَاتٌ অর্থ- سَحَابٌ -

২. ইমাম মাযেনী বলেছেন, مُعْصِرَاتٌ এখানে ঐ سَحَابٌ বা মেঘমালাকে বলা যায়, যে سَحَابٌ -এ প্রবল বাতাস রয়েছে। কেননা যে মেঘকে প্রবল বাতাসে পেয়ে বসে, সে মেঘ হতে অবশ্যই বৃষ্টি নামে, سَحَابٌ বললে শুধু মেঘ বুঝায়, বৃষ্টিওয়ালা মেঘ বুঝায় না।

৩. مُعْصِرَاتٌ বলা হয় ঐ মেঘকে যা বর্ষণের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, যেমন- أَعْصَرَتِ الْجَارِيَةُ ঐ সময় বলা হয়, যখন ঐ বালিকার হায়েয আসা নিকবর্তী হয়ে পড়ে। -[কাবীর]

ثَجَّاجٌ-এর অর্থ : ইমাম রাযী (র.) বলেন, মুষলধারে বর্ষণকে اَلثَّجُّ বলা হয়। যেমন বলা হয়, مَطَرٌ ثَجَّاجٌ অর্থাৎ মুষলধার বৃষ্টি। دَمٌ ثَجَّاجٌ অর্থাৎ অনর্গল প্রবাহিত রক্ত। اَلثَّجُّ শব্দটি কখনো لَازِمٌ হয়ে থাকে, আবার কখনো مُتَعَدِّيْ- যে সময় لَازِمٌ হবে তখন অর্থ হবে اَلْاِنْصِبَابُ অর্থাৎ প্রবাহিত হওয়া। আর যখন مُتَعَدِّيْ হবে তখন অর্থ হবে اَلصَّبُّ অর্থাৎ প্রবাহিত করা। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, اَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ অর্থাৎ উত্তম হজ হলো, উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া এবং কুরবানির জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে مِثَجٌّ বলা হতো। কেননা তিনি তাঁর খুতবায় অনলবর্ষী ছিলেন। ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেন, ثَجَّاجًا-এর অর্থ হলো সর্বদা বর্ষণকারী; আর মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ হলো প্রচুর বৃষ্টিপাতকারী। -[নূরুল কোরআন]

حَبٌّ - نَبَاتٌ ও جَنَّةٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : উদ্ভিদকে আমরা প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করতে পারি- ১. কাণ্ডযুক্ত- একে আরবিতে شَجَرٌ বলে। ২. কাণ্ডবিহীন- এটা আবার দু'প্রকার- ক. উপরে আবরণযুক্ত। যেমন শস্যদানা। একে আরবিতে حَبٌّ বলে। খ. আবরণ থাকবে। যেমন ঘাস একে আরবিতে نَبَاتٌ বলে। এ শস্যদানা ও ঘাস তথা শাক-সবজির দিকে ইঙ্গিত করে কুরআন মাজীদে (অন্যত্র) বলা হয়েছে- "كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ" "তোমরা খাও এবং চতুষ্পদ জন্তু চরাও।" এমনিভাবে বিভিন্ন প্রকার তরুলতা ও গাছ-পালা যেখানে একসাথে হয় সে স্থানকে جَنَّةٌ বা বাগান বলে। جَنَّةٌ শব্দের অর্থ মূলত ঢাকা, অন্ধকার। অধিক গাছ-পালার কারণে বাগান ঢাকা অবস্থায় থাকে, যার ফলশ্রুতিতে বাগান অন্ধকার হয়ে যায়। এ জন্য বাগানকে জান্নাত (جَنَّةٌ) বলে।

কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর মানুষের সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনা ঢাকা পড়ে যাবে। এ জন্য জান্নাতকে জান্নাত বলা হয়।

জমহুর মুফাসসিরে কেরামের মতে حَبٌّ বলতে মানুষের খাদ্য যেমন- গম, আটা, যব, ধান, চাউল ইত্যাদিকে বুঝায়। আর نَبَاتٌ বলতে চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য যেমন- ঘাস, ভূষি ইত্যাদিকে বুঝায়।

প্রয়োজন ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে প্রথমে حَبٌّ তারপর نَبَاتٌ এবং সর্বশেষে جَنّٰتٌ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। حَبٌّ বা শস্যদানাকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটাই মৌলিক খাদ্য। আর গুরুত্বের দিক দিয়ে نَبَاتٌ বা শাক-সবজির স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে হওয়ায় একে তারপর উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে বাগানের ফল-ফলাদি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় না হওয়ার কারণে একে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে। -[কাশশাফ, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

حَبٌّ - نَبَاتٌ ও جَنّٰتٌ-কে একের পর এক সাজিয়ে বলার কারণ : حَبٌّ বা শস্যদানাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। কেননা, এটাই মূল খাদ্য। তারপর نَبَاتٌ-কে উল্লেখ করেছেন। কেননা, বাগানের ফল-ফলাদি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় নয়। মোদ্দাকথা, গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনটি বিষয়কে সাজানো হয়েছে। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত বস্তু প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থানে সক্ষম : আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের উপরিউক্ত নিদর্শনাবলি উল্লিখ করত কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদেরকে বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা যদি চক্ষু মেলে তোমাদের জন্য, নিদ্রা-জাগরণ, দিবা-রাতের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন, জমিন-আসমান এবং পাহাড়-পর্বতকে দেখ, সূর্যের ন্যায় বিশাল অগ্নিকুণ্ডের প্রতি দৃষ্টি দাও, মেঘ হতে বর্ষিত বৃষ্টি এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচার প্রতি গভীর মনোনিবেশের সাথে তাকাও, তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, যে আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতায় এ সকল কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে, সে আল্লাহর পক্ষে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা এবং হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত করা মোটেই কঠিন নয়।

এত বিশাল একটি কারখানা সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না-এর কোনো পরিণাম ও পরিণতি থাকবে না তা কি করে হতে পারে? নিঃসন্দেহে এর পিছনে আল্লাহর একটি বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। এর একটি অনিবার্য পরিণতিও রয়েছে। উক্ত পরিণতিকেই আমরা আখেরাত বা পরকাল বলি। ঘুমের পর যেমন জাগরণ এবং রাতের পর দিন আগমন করে তদ্রূপ দুনিয়ার শেষে আখেরাতের আগমন অনিবার্য।

মোটকথা, আল্লাহর অসীম কুদরত ব্যতীত এ বিশাল পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত বস্তু নিয়ে না অস্তিত্ব লাভ করতে পারত আর না একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-রীতিতে চালু থাকত। তাঁর কোনো কার্যই হেকমত ও উদ্দেশ্যশূন্য নয়। এটা শুধু কোনো গণ্ড-মূর্খের মুখেই শোভা পায় যে, যে মহীয়ান আল্লাহ এ সুবিশাল জগৎ সৃষ্টি করতে ও এটা ধ্বংস করতে সক্ষম সে পবিত্র সত্তা তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। আর এটা কোনো নাদানই বলতে পারে যে, যে আল্লাহ উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুই সৃষ্টি করেন না- তিনি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করবেন, সমগ্র সৃষ্টির উপর তাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছেন, মানুষ তাদের যথেচ্ছা ব্যবহার করবে; অথচ এর জন্য তাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। কেউ আজীবন পুণ্যের কাজ করে মৃত্যুবরণ করবে অথচ এর জন্য কোনো পুরস্কার পাবে না। অন্যপক্ষে কেউ সারাজীবন পাপাচারে মশগুল থাকবে অথচ এর কোনো প্রতিফল লাভ করবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا" : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে বাগানে রকমারি গাছ-পালা, ফল-ফলাদি ইত্যাদি থাকে, তাকে جَنَّة বলা হয়। جَنَّة শব্দের অর্থ- 'ঢাকা', 'অন্ধকার'। কেননা অধিক গাছপালার কারণে এ বাগানটি ঢাকা অবস্থায় থাকে, যার ফলশ্রুতিতে বাগান অন্ধকার হয়ে যায়। এ কারণে বাগানকে জান্নাত বলা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে মানুষের সকল কষ্ট-ক্লেশ জান্নাতে প্রবেশ করার সাথে সাথে ঢাকা পড়বে বা মুছে যাবে। এ কারণে জান্নাতকে 'জান্নাত' বলা হয়।

اَلْفَافٌ-এর বিশ্লেষণ : اَلْفَافٌ শব্দটির ব্যাপারে মুফাসসিরীনের মধ্যে নিম্নোক্ত মতভেদ দেখা যায়-

১. এ শব্দটি এমন যে, এর একবচন নেই। যেমন اَوْزَاعٌ এবং اَخْيَافٌ-এর একবচন নেই।

২. ভাষাবিদদের মধ্য হতে অনেকেই একবচন আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে-

ক. আখফাশ, কিসাঈর মতে একবচন হলো لِفٌّ [লামের নিচে যের দিয়ে]।

খ. কাসাঈ লামের উপরে পেশ দিয়েও সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

গ. মুবাররাদ বলেছেন, لِفَاءٌ-এর বহুবচন لُفٌّ এবং لُفٌّ-এর বহুবচন اَلْفَافٌ

ঘ. কারো মতে اَلْفَافٌ শব্দ لَفِيْفٌ-এর বহুবচন। যেমন- اَشْرَافٌ শব্দটি شَرِيْفٌ-এর বহুবচন।

-[কাবীর, রূহুল মা'আনী, কাশশাফ, ফাতহুল কাদীর

৩. কারো মতে مُلْتَفَّةٌ-এর বহুবচন। বহুবচনের সময় অতিরিক্ত হরফগুলো বাদ পড়ে গেছে। -[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

١٧. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلَائِقِ كَانَ مِيْقَاتًا وَقْتًا لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ.

১৭. নিশ্চয়ই ফয়সালার দিন সৃষ্টি জগতের মাঝে [সুনির্ধারিত রয়েছে] পুরস্কার ও শাস্তিদানের জন্য নির্ধারিত সময়।

١٨. يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ الْقَرْنِ بَدْلٌ مِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ اَوْ بَيَانٌ لَهُ وَالنَّافِخُ اِسْرَافِيْلُ فَتَاْتُوْنَ مِنْ قُبُوْرِكُمْ اِلَى الْمَوْقِفِ اَفْوَاجًا جَمَاعَاتٍ مُخْتَلِفَةً.

১৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে صُوْر শব্দের অর্থ শিঙ্গা, এটা ফয়সালার দিন হতে بَدْلٌ অথবা তার بَيَانٌ আর ফুৎকারদানকারী ইসরাফীল (আ.)। তখন তোমরা আগমন করবে তোমাদের সমাধি ক্ষেত্র হতে অবস্থান ক্ষেত্র পানে দলে দলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে।

١٩. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ شُقِّقَتْ لِنُزُوْلِ الْمَلَائِكَةِ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ذَاتَ اَبْوَابٍ.

১৯. আর আকাশ উন্মুক্ত করা হবে فُتِحَتْ শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থ ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিদীর্ণ হবে। ফলে তা বহু দ্বার বিশিষ্ট হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।

٢٠. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ ذُهِبَ بِهَا عَنْ اَمَاكِنِهَا فَكَانَتْ سَرَابًا هَبَاءً اَىْ مِثْلَهُ فِىْ خِفَّةِ سَيْرِهَا.

২০. আর গতিশীল করা হবে পর্বতমালাকে এদেরকে স্বস্থান হতে হটিয়ে নেওয়া হবে ফলে তা মরীচিকা হয়ে পড়বে ধুলাবালি অর্থাৎ ধুলাবালির ন্যায়, এর চলার দ্রুততায়।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ يُنْفَخُ...اَفْوَاجًا-এর বিশ্লেষণ : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার ব্যাপারে দু'টি মত উল্লেখ করেছেন।

ক. রূহগুলোকে শরীরের মধ্যে ফুঁকের মাধ্যমে স্থাপন।

খ. শিঙ্গা একটি শিং-এর নাম যেখানে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা ফুঁক দেবেন। এ ফুঁকের সাথে সাথে সৃষ্টজীব প্রাণবন্ত হয়ে একস্থানে একসাথে থাকবে। -[কাবীর]

يَوْمَ يُنْفَخُ ও اَفْوَاجًا-এর মহল্লে ই'রাব : يَوْمَ يُنْفَخُ পূর্বে উল্লিখিত يَوْمَ الْفَصْلِ থেকে بَدْلٌ হয়েছে।

অথবা, عَطْفُ بَيَانٍ হয়েছে।

অথবা, اَعْنِىْ উহ্য ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, কাবীর, ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَفْوَاجًا : শব্দটি تَاْتُوْنَ ক্রিয়ার فَاعِلٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

فَتَاْتُوْنَ-এর ـفَا-এর অর্থ : فَتَاْتُوْنَ-এর মধ্যে যে فَاءٌ দেখা যায়, এ ধরনের فَاءٌ-কে فَصِيْحَةٌ বলা হয়। এ فَاءٌ একটি বাক্যের কাজ দেয়। যে বাক্যটির অর্থ অবস্থার আলোকে বুঝা যায় এবং ঐ বাক্যটি 'মানুষের আসাটা খুব তাড়াতাড়ি হবে' এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে। মূলবাক্যটি এভাবে ছিল-

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتُحْيَوْنَ فَتُبْعَثُوْنَ مِنْ قُبُوْرِكُمْ فَتَاْتُوْنَ اِلَى الْمَوْقِفِ عَقَبَ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ اَصْلًا اَفْوَاجًا

-[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : সূরার প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামতের ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে তাঁর এমন কিছু কুদরতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাদের সামনে রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলে কিয়ামত ও পরকালের সম্ভাবনা সহজেই অনুধাবন করা যায়। উপরন্তু পরকালের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতাও যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

অতঃপর আলোচ্য আয়াত কয়টিতে মহান আল্লাহ সরাসরি কিয়ামত ও পুনরুত্থানের আলোচনা করেছেন এবং এগুলো সংঘটিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى : "مِيقَاتًا" : مِيقَاتًا-এর অর্থ : নিশ্চয়ই বিচারের একটি নির্দিষ্ট দিন পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এটা দেরিতেও আসবে না; আগেও চলে আসবে না। তবে কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানবে না। ঐ নির্ধারিত দিন এসে পড়লে দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটবে।

অথবা, অর্থ এই হবে যে, إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ حَدٌّ لِلْخَلَائِقِ يَنْتَهُوْنَ إِلَيْهِ অর্থাৎ নিশ্চয় ফয়সালার দিন সৃষ্টজীবের জন্য শেষ সীমা হিসেবে নির্ধারিত হবে তারা ঐ সীমা পর্যন্ত পৌছবে। প্রথম نَفْخَةٌ-এর সাথে সাথে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে।

অথবা, كَانَ مِيقَاتًا لِمَا وَعَدَ اللّٰهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ অর্থাৎ ঐদিন সৃষ্টজীবের জন্য ঐ ওয়াদা কার্যকর হবে, যে ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা পুণ্য ও পাপের জন্য করেছেন।

অথবা, كَانَ مِيقَاتًا لِاجْتِمَاعِ كُلِّ الْخَلَائِقِ فِيْ فَصْلِ الْحُكُوْمَاتِ وَقَطْعِ الْخُصُوْمَاتِ, অর্থাৎ ঐ দিন সমস্ত সৃষ্টজীবের একত্র হওয়ার দিন, ঐদিনে সমস্ত অধিকারের ফয়সালা হবে এবং ঝগড়ার মীমাংসা হবে।

–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কাশশাফ]

يَوْمَ الْفَصْلِ নামকরণের কারণ : চূড়ান্ত বিচারের দিনকে يَوْمَ الْفَصْلِ বলা হয়েছে। অথচ فَصْلٌ অর্থ কেটে ফেলা, পৃথক করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ঐদিন সকল মানুষের মধ্যে [তথা শাসক-শাসিত, জালিম-মজলুম ইত্যাদির মাঝে] পার্থক্য করে দেবেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কাজের জন্য এক আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে। –[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া, কুরতুবী]

শিঙ্গায় ফুঁকের সংখ্যা : কুরআন মাজীদের সূরা আয্-যুমার -এর ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى দ্বারা বুঝা যায়– শিঙ্গায় ফুঁক দু'বার হবে; কিন্তু সূরা নমলের আয়াতে এ দু'টি ফুঁকের পূর্বে আরো একটি ফুঁকের উল্লেখ রয়েছে। ঐ তিনটি ফুঁকের তারতীব বিন্যাস নিম্নে দেওয়া হলো,

১. نَفْخَةُ الْفَزَعِ -এ ফুঁকের মাধ্যমে উপস্থিত সকল প্রাণী হতবুদ্ধি বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে।
২. نَفْخَةُ الصَّعْقِ -এ ফুঁকের মাধ্যমে সবাই মরে যাবে।
৩. نَفْخَةُ الْقِيَامِ -এ ফুঁকের মাধ্যমে সমস্ত মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য স্ব-স্ব শয়নকক্ষ থেকে বের হয়ে পড়বে।

আলোচ্য আয়াতে উক্ত ফুঁকের পর কি ঘটবে? : আলোচ্য আয়াতে শিঙ্গার শেষ ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। এ ফুঁক ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে সকল মানুষ মৃত অবস্থা হতে জীবিত হয়ে উঠবে। এখানে 'তোমরা' বলে শুধু তাদেরকে বুঝানো হয়নি। যারা এ আয়াত নাজিল হওয়ার সময় বর্তমান ছিল; বরং প্রথম সৃষ্টি সূচনার দিন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় আগমন করেছে সকলকেই 'তোমরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের অন্যান্য কয়েকটি আয়াতের ন্যায় এখানেও কিয়ামতের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের উল্লেখ এক সঙ্গে করা হয়েছে প্রথম আয়াতে সে অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে, যা শেষ বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর সংঘটিত হবে। আকাশমণ্ডল উন্মুক্ত করে দেওয়ার অর্থ হলে উর্ধ্বতন জগতে কোনোরূপ বাধা প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব থাকবে না। পাহাড় চালিয়ে দেওয়া ও সেগুলো মরীচিকার ন্যায় হয়ে যাওয়ার অর্থ এই যে, চোখের সামনেই পাহাড় নিজ স্থান হতে উৎপাটিত হয়ে শূন্যলোকে উড়তে এবং

করবে। অতঃপর এটা চূর্ণবিচূর্ণ ও বিন্দু বিন্দু হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, কিছুক্ষণ পূর্বেও যেখানে বিশাল পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে বিরাট বালু সমুদ্র ব্যতীত আর কিছুই নজরে পড়বে না। সূরা ত্বাহা-এর মধ্যে এ ব্যাপারে নিম্নরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে– এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে সে দিবসে এ পাহাড়সমূহ কোথায় উধাও হয়ে যাবে? তাদেরকে বল, আমার রব এদেরকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দেবেন। আর ভূ-পৃষ্ঠকে এমন সমতল করে দেবেন যে, তোমরা তাতে কোনোরূপ উঁচু-নিচু ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।

হযরত থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে লিখেন, বিচারের সময় নিকটবর্তী হলে পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করে নিম্নভূমির সমান করে দেওয়া হবে। যাতে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ সমতল ভূমিতে পরিণত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠের একাংশ হতে অন্য অংশের সকল মানুষকে একই মাঠে দেখা যায়। প্রথম ফুৎকারের সময় যদি পাহাড় স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনাটিকে ধরে নেওয়া হয়, তবে বলা যায় যে, প্রথম ফুৎকার পৃথিবী ধ্বংসের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হবে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। অতঃপর সেগুলো বালুকারাশির আকারে উড়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। –[কামালাইন, বয়ানুল কুরআন]

কিয়ামত কখন এবং কোথায় সংঘটিত হবে : কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য হতে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না; বরং শুধু বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে মাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর প্রথম শিঙ্গার ফুঁক এবং শেষ শিঙ্গার ফুঁকের মাঝখানে একটি বিশেষ সময়ে যা কেবল আল্লাহ-ই জানেন পৃথিবী ও আকাশসমূহের বর্তমান রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। আর তদস্থলে অপর এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অন্য ধরনের প্রাকৃতিক আইন সহকারে চালু করে দেওয়া হবে। এটা হলো পরকালের জগৎ বা হাশরের ময়দান। অতঃপর শেষবারের শিঙ্গা ফুঁকের সঙ্গে আদম হতে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টির সমস্ত মানুষকে নতুন করে জীবন্ত করা হবে এবং তারা বিভিন্ন দলে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। কুরআনের ভাষায় এটাই হাশর। হাশর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো চারদিক হতে গুছিয়ে আনা বা একত্রিত করা। কুরআনের ভাষা ও ইঙ্গিতে এবং হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণায় এ কথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জমিনের উপরই হাশর অনুষ্ঠিত হবে। আদালত এখানেই কায়েম হবে এবং পাপ-পুণ্য ওজনের দাঁড়িপাল্লা এখানেই বসানো হবে। হাশর শুধু আধ্যাত্মিক হবে না; বরং তথায় মানুষ, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে (স্বশরীরে) উত্থিত হবে।

শিঙ্গায় কখন ফুঁক দেওয়া হবে এবং কিয়ামত কখন কায়েম হবে, তা নির্ধারিত রয়েছে। তবে তা আমাদের জানা নেই। তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন।

কিয়ামত কোন অবস্থায় কায়েম হবে : কিয়ামত অকস্মাৎ ও অতি দ্রুত সংঘটিত হবে। পূর্ব হতে মানুষ মোটেই তা আঁচ করতে পারবে না। মানুষ পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কাজ করতে থাকবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিন্দুমাত্র ধারণাও মানুষের মনে জাগবে না। হঠাৎ একটি বিকট শব্দ হবে। এক মুহূর্তেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে এবং সকলেই ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, মানুষ রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে থাকবে, বাজারে বেচাকেনা করতে থাকবে, বসে আলাপরত থাকবে এমন সময় হঠাৎ শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। কেউ কাপড় ক্রয় করতে থাকবে অথচ হাত হতে কাপড়টি রাখার সময় পাবে না, মৃত্যু এসে পড়বে। কেউ জন্তুকে পানি পান করানোর জন্য পানি দ্বারা হাউজ ভর্তি করতে থাকবে অথচ পানি পান করানোর পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে। কেউ খাদ্য খেতে বসবে অথচ এক গ্রাস শেষ করারও সুযোগ পাবে না– কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

'দলে দলে' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : কিয়ামতের ময়দানে লোকেরা দলে দলে উপস্থিত হবে। এ দলে দলে দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

প্রত্যেক নবীর উম্মতগণ পৃথক পৃথকভাবে দলবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হবে।

আবার প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেও বিভিন্ন দল হবে। নবী করীম ﷺ-কে أَفْوَاجًا শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, আমার উম্মত দশ প্রকারের রূপ ধারণ করে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। যেমন– ১. বানর, ২. শূকর, ৩. উল্টামুখ, ৪. অন্ধ, ৫. বোবা-বধির, ৬. জিহ্বা বক্ষের উপর ঝুলন্ত, নিজের জিহ্বা নিজে চর্বন করবে। তাদের দেখে হাশরবাসীগণ ঘৃণায় নাক ছিটকাবে, ৭. হাত-পা কর্তিত, ৮. অগ্নির শূলে বিদ্ধ, ৯. মৃতের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধযুক্ত, ১০. আগুনের পোশাক পরিহিত।

প্রথম দল হলো চুগলখোর, তারা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াত। এ জন্য তাদেরকে বানরের আকারে হাশরে উত্থাপিত করা হবে। **দ্বিতীয়ত** হারাম ভক্ষণকারী। তাদেরকে শূকরের আকৃতিতে উঠানো হবে। **তৃতীয় দল** হলো সুদখোর–তাদেরকে উল্টোমুখি করে উপস্থিত করা হবে। **চতুর্থ দল** হলো অবিচারকারী বিচারক। তারা অন্ধ হয়ে উত্থিত হবে। **পঞ্চম দল** হলো জাদু প্রদর্শনকারী ও অশ্লীল পোশাক পরিধানকারী– তারা বোবা ও বধির হয়ে উঠবে। **ষষ্ঠ দল** হলো এমন আলিম যাদের কথা ও কাজে মিল ছিল না– তারা নিজের জিহ্বা নিজে চর্বন করবে। **সপ্তম দল** হলো যারা প্রতিবেশির সাথে দুর্ব্যবহার করেছে– তাদের হাত-পা কর্তিত হবে। **অষ্টম দল** হলো চুগলখোর শাসক ও বিচারকদের ব্যাপারে মিথ্যা অভিযোগকারী– তাদের শূলিতে চড়ানো হবে। **নবম দল** হলো যারা জাকাত আদায় করেনি এবং কামভাবে মগ্ন ছিল– তারা দুর্গন্ধময় অবস্থায় থাকবে। **দশম দল** হলো যারা অহঙ্কারী ও বিলাসী ছিল– তাদরকে আগুনের পোশাক পরিয়ে উঠানো হবে। –[বয়ানুল কুরআন, রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ আমাদের নিকট সত্যই বলছেন যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করা হবে।

১. একদল হবে, যারা পানাহারে তৃপ্ত থাকবে, উত্তম পোশাক পরিহিত থাকবে এবং যানবাহনে আরোহী থাকবে।

২. দ্বিতীয় দল পদব্রজে দাঁড়াতে থাকবে।

৩. তৃতীয় দল মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়বে এবং সে অবস্থায়ই চলতে থাকবে। –[নাসায়ী, হাকিম, বায়হাকী]

فَتَأْتُونَ-এর মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : فَتَأْتُونَ শব্দটি বহুবচন, মধ্যম পুরুষের। অর্থ– 'তোমরা আসবে।' এখানে 'তোমরা' বলতে কেবল সে লোকদের বুঝানো হয়নি, যারা এ আয়াত নাজিল হওয়ার সময় বর্তমান ছিল; বরং প্রথম সৃষ্টির সূচনার দিন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ার বুকে জন্মগ্রহণ করেছে, সেসব মানুষকেই 'তোমরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا" : অর্থাৎ "আর আকাশসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং এতে অসংখ্য দুয়ার হবে।" এর অর্থ ঊর্ধ্ব আকাশসমূহে কোনো প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। তখন চতুর্দিক হতে আসমানি মসিবত এমন অব্যাহত ধারায় বর্ষিত হতে থাকবে যে, মনে হবে এটার বর্ষণের সব দুয়ারই যেন খুলে দেওয়া হয়েছে।

অথবা, ফেরেশতাদের ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করার জন্যই এভাবে আসমানের মধ্যে বহু সংখ্যক ছিদ্রপথ করে দেওয়া হবে। সূরা ফোরকানের يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ আয়াতেও এ কথারই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসমানের ছিদ্র পথসমূহ দেখা দিবে এবং তাতে ফেরেশতাগণ অবতরণ করবে। অথবা, আকাশের অনেক দরজা আছে। ঐ দরজাগুলো সহই আকাশের সৃষ্টি। ঐ দরজাগুলোই খুলে দেওয়া হবে। –[কাবীর, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

কারো মতে, فُتِحَتْ অর্থ قُطِعَتْ অর্থাৎ আকাশকে দরজার ন্যায় টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে।

অথবা, প্রত্যেক বান্দার জন্যে আসমানের মধ্যে দু'টি দরজা আছে। একটি তার রিজিকের জন্য আর একটি আ'মালের জন্য কিয়ামত যখন এসে পড়বে তখন ঐ দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। –[ফাতহুল কাদীর ও কুরতুবী]

আর কারো মতে, এর অর্থ হলো আসমানে এত ফাটল ধরবে যে, সমগ্র আসমান যেন বহু দ্বারে পরিণত হয়ে যাবে। –[নূরুল কোরআন]

পূর্ণ আকাশ দরজাময় হয়ে যাওয়ার অর্থ : আকাশ খুলে দেওয়ার পর এটা দরজা হয়ে যাবে। বাক্যটির মূল বক্তব্য এটা নয়; বরং আয়াতটির অর্থ করতে হলে কিছু উহ্য শব্দ মেনে নিতে হবে। সুতরাং فُتِحَتْ শব্দের পরে اَبْوَابًا মুযাফ উহ্য ধরতে হবে। মূলে فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ ছিল।

অথবা, اَبْوَابًا-এর পূর্বে ذَاتَ মুযাফ উহ্য ধরতে হবে। মূলে فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ ذَاتَ اَبْوَابٍ ছিল। তখন অর্থ এই দাঁড়াবে– আকাশের সকল দরজা খুলে দেওয়া হবে, তখন পূর্ণ আকাশটিই দরজায় পরিণত হবে।

দরজায় পরিণত হওয়ার কারণ : বেশি ফেটে যাওয়ার কারণে, অথবা আগে থেকেই দরজা থাকার কারণে, অথবা ফাটা অংশটি বেশি ফাঁক হয়ে যাওয়ার কারণে। অথবা, আকাশের দরজা অর্থ এর পথসমূহ, অথবা যখন আকাশের দরজা বেশি হবে, তখন শুধু দরজা আর দরজা দেখা যাবে। সব দরজাগুলো খোলা থাকবে। বেশি দরজার কারণে পূর্ণ আকাশটিকে দরজাময় দেখা যাবে। –[রূহুল মা'আনী, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

অতীতকালের শব্দ উল্লেখের কারণ : আয়াতে কারীমায় فُتِحَتْ শব্দটি অতীতকালের। আকাশ খোলার ঘটনা ভবিষ্যতে কিয়ামতের সময় হবে। ভবিষ্যৎকালের শব্দ تُفْتَحُ উল্লেখ না করে অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো– কেননা এ ঘটনা অবশ্যই এবং নিশ্চিতভাবেই ঘটবে। যে ঘটনা নিশ্চিত ঘটবে এর ব্যাপারে অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করার নিয়ম রয়েছে। যেমন–পূর্ণ বিবরণী লেখার পর 'চিঠি' হয়, কিন্তু লেখা শুরুর পূর্বেই বলা হয়–'চিঠি' লিখবো।

–[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا" : কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের সময় পাহাড়ের ছয়টি অবস্থা হবে, যেমন–

১. حَالَةُ الْاِنْدِكَاكِ তথা চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থা। যেমন, কুরআন মাজীদের আয়াত– وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ ভূতল এবং পর্বতরাশিকে উপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।

২. اَلْحَالَةُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ তথা ধুনা পশমের মতো অবস্থা। যেমন, আল্লাহর ঘোষণা– وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ অর্থাৎ পাহাড় রঙ-বেরঙ-এর ধুনা পশমের ন্যায় হবে।

৩. اَلْحَالَةُ كَالْهَبَاءِ তথা ধূলিকণার ন্যায় অবস্থা। এ অবস্থাটি ধুনা পশমের মতো হওয়ার পর হবে। যেমন, কুরআনের বাণী– وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا . فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا অর্থাৎ পাহাড় এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেওয়া হবে যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।

৪. حَالَةُ النَّسْفِ তথা ধূলিকণায় পরিণত হয়ে পড়ে থাকা অবস্থা। যেমন, কুরআন মাজীদের আয়াত– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا অর্থাৎ তারা পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বলুন, আমার রব এগুলোকে ধূলিকণায় পরিণত করে দিবেন। এ অবস্থায় ধূলিকণাগুলো মাটির উপর পড়ে থাকবে। মাটি দেখা যাবে না। শুধু ধূলি আর ধূলি।

৫. حَالَةُ الْغُبَارِ তথা উল্লিখিত ধূলিকণা জমিনের উপর হতে প্রবল বাতাসের মাধ্যমে উড়তে থাকবে। এমতাবস্থায় জমিন দেখা যাবে, সমস্ত ধূলি উপরে উড়তে থাকবে। যেমন, আল্লাহর বাণী– وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً . تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

৬. حَالَةُ السَّرَابِ তথা মরীচিকার ন্যায়। অর্থাৎ পাহাড়ের স্থানগুলো এমন হবে যে, কিছুই বিদ্যমান থাকবে না। মরীচিকার ন্যায় পাহাড় আছে ধারণা হবে, কিন্তু সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলে কিছুই পাওয়া যাবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا –[কাবীর, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে سَرَابًا অর্থ : سَرَابًا শব্দটির আভিধানিক অর্থ– মরীচিকা, যা দিনের মধ্যভাগে সূর্যের প্রখরতার মধ্যে পানির ন্যায় মনে হয়; কিন্তু আয়াতে سَرَابًا অর্থ কি – এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়।

১. জালালাইনের ব্যাখ্যাকার বলেন, سَرَابًا اَىْ هَبَاءً অর্থাৎ سَرَابٌ অর্থ এখানে ধুলাবালি।

২. কারো মতে سَرَابٌ এখানে আভিধানিক (মরীচিকা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন আয়াতে তাশবীহ উদ্দেশ্য হবে। অর্থ এই দাঁড়বে– ঐ পাহাড়গুলো মরীচিকার ন্যায় দেখাবে। তবে سَرَابٌ-এর অর্থ هَبَاءٌ হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলা হয় যে, এ অর্থ কোনো অভিধানে পাওয়া যায় না। অতএব, سَرَابٌ-এর আসল অর্থ 'মরীচিকা' করাই উত্তম। কেননা অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ –[জালালাইনের প্রান্ত টীকা, রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٢١. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا رَاصِدَةً اَوْ مُرْصَدَةً .

২১. অবশ্যই জাহান্নাম একটি ঘাটি বিশেষ, এটা ওতপেতে রয়েছে। অথবা এটা ওতপেতে থাকার স্থান [এ স্থলে مِرْصَادًا-শব্দটি رَاصِدَةً অথবা مُرْصَدَةً-এর অর্থে হবে।

٢٢. لِلطَّاغِيْنَ الْكَافِرِيْنَ فَلَا يَتَجَاوَزُوْنَهَا مَاٰبًا مَرْجِعًا لَهُمْ فَيَدْخُلُوْنَهَا .

২২. আল্লাহদ্রোহীদের জন্য তথা কাফেরদের জন্য; কাজেই তারা তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না. আশ্রয়স্থল অর্থাৎ তা তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে; সুতরাং অবশ্যই তাতে তারা প্রবেশ করবে।

٢٣. لٰبِثِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَىْ مُقَدَّرًا لُبْثُهُمْ فِيْهَا اَحْقَابًا دُهُوْرًا لَا نِهَايَةَ لَهَا جَمْعُ حُقْبٍ بِضَمِّ اَوَّلِهٖ .

২৩. তারা অবস্থান করবে لٰبِثِيْنَ শব্দটি حَالٌ مُقَدَّرَةٌ হয়েছে। অর্থাৎ তাদের তথায় অবস্থান করা অবধারিত তথায় যুগ যুগ ধরে অশেষ কালব্যাপী। বহু যুগ পর্যন্ত যার কোনো শেষ নেই। এ স্থলে اَحْقَابٌ শব্দটি حُقْبٌ [প্রথম অক্ষর তথা ح অক্ষরটি পেশযোগে] -এর বহুবচন।

٢٤. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا لَا نَوْمًا وَّلَا شَرَابًا مَا يُشْرَبُ تَلَذُّذًا .

২৪. তারা আস্বাদন করবে না ঠাণ্ডা তথা ঘুম এবং কোনো পানীয় যা স্বাদ আস্বাদনের জন্য পান করা হয়। [অর্থাৎ পান উপযোগী]।

٢٥. اِلَّا لٰكِنْ حَمِيْمًا مَاءً حَارًّا غَايَةَ الْحَرَارَةِ وَغَسَّاقًا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مَا يَسِيْلُ مِنْ صَدِيْدِ اَهْلِ النَّارِ فَاِنَّهُمْ يَذُوْقُوْنَهٗ جُوْزُوْا بِذٰلِكَ .

২৫. তবে কিন্তু ফুটন্ত উত্তপ্ত গরম পানি অত্যধিক গরম পানি। আর পুঁজ [ক্ষতের ক্ষরণ] غَسَّاقٌ শব্দটি তাশদীদ যোগে এবং তাশদীদ ব্যতীত উভয়ভাবেই পড়া জায়েজ। غَسَّاقٌ দ্বারা এখানে জাহান্নামীদের শরীর হতে প্রবাহিত পুঁজকে বুঝানো হয়েছে। তারা এর স্বাদ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।

٢٦. جَزَاءً وِّفَاقًا مُوَافِقًا لِعَمَلِهِمْ فَلَا ذَنْبَ اَعْظَمُ مِنَ الْكُفْرِ وَلَا عَذَابَ اَعْظَمُ مِنَ النَّارِ .

২৬. সমুচিত প্রতিফল তাদের কৃতকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল। সুতরাং কুফরির চেয়ে মহাপাপ আর কিছুই নেই এবং জাহান্নাম অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তিও হতে পারে না।

٢٧. اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ يَخَافُوْنَ حِسَابًا لِاِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ .

২৭. নিশ্চয় তারা আশা করত না, আশঙ্কা করত না, হিসাব-নিকাশের, কেননা তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত।

٢٨. وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ كِذَّابًا تَكْذِيْبًا .

২৮. আমার আয়াতসমূহকে তারা অস্বীকার করত। অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করত সম্পূর্ণভাবে, অর্থাৎ মোটেই বিশ্বাস করত না।

٢٩. وَكُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ أَحْصَيْنٰهُ ضَبَطْنَاهُ كِتٰبًا كَتْبًا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لِنُجَازِيَ عَلَيْهِ وَمِنْ ذٰلِكَ تَكْذِيْبُهُمْ بِالْقُرْاٰنِ.

২৯. আর সব কিছু সকল প্রকার আমলকে আমি সংরক্ষণ করেছি, রেকর্ড করেছি। লিপিবদ্ধ আকারে লাওহে মাহফূযে [সংরক্ষিত ফলকে] যাতে আমি তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দিতে পারি। আর তাদের আমলসমূহের মধ্যে কুরআন অস্বীকার করাও অন্তর্ভুক্ত।

٣٠. فَذُوْقُوْا أَيْ فَيُقَالُ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عِنْدَ وُقُوْعِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ ذُوْقُوْا جَزَاءَكُمْ فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَوْقَ عَذَابِكُمْ.

৩০. সুতরাং আস্বাদন কর অর্থাৎ আখেরাতে তাদের উপর শাস্তি অবতরণকালে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে। তোমাদের প্রতিফল আস্বাদন করো। আমি তো তোমাদেরকে শাস্তি ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করবো না তোমাদের শাস্তির উপরে।

তাহকীক ও তারকীব

لِلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا-**এর তারকীবী অবস্থা :** এ আয়াতটির তারকীবী অবস্থা কয়েকটি হতে পারে। যথা–

ক. طَاغِيْنَ শব্দটি পূর্বের আয়াতের مِرْصَادًا-এর বিশেষণ (صِفَةٌ) হয়েছে। তখন মূলবাক্য এভাবে হবে–
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا كَائِنًا لِلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا

খ. অথবা, لِلطَّاغِيْنَ শব্দটি مَاٰبًا হতে حَالٌ হয়েছে। তখন অর্থ এই হবে যে, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مَرْجِعًا مَأْوٰى كَائِنًا لَهُمْ يَرْجِعُوْنَ إِلَيْهِ لَا مُحَالَةَ জাহান্নাম তাদের আশ্রয়স্থল এবং প্রত্যাবর্তনের স্থান, এমতাবস্থায় যে, তারা তথায় অবশ্যই ফিরে যাবে।

গ. অথবা, كَانَتْ -এর দ্বিতীয় খবর।

ঘ. অথবা, مِرْصَادٌ শব্দের সাথে সম্পর্কিত (مُتَعَلِّقٌ) তখন مِرْصَادٌ শব্দের অর্থ হবে مُعَدَّةٌ [প্রস্তুত]। আর مَاٰبًا শব্দটির তারকীবেও কয়েকটি দিক দেখা যায়–

ক. مَاٰبًا শব্দটি مِرْصَادًا হতে بَدَلٌ হয়েছে।

খ. কারো মতে– كَانَتْ -এর দ্বিতীয় خَبَرٌ হয়েছে।

গ. অথবা, مِرْصَادًا শব্দের বিশেষণ হয়েছে।

ঘ. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে مِرْصَادًا হতে حَالٌ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, এখানে দু'টি দিক রয়েছে–

ক. যদি আমরা বলি– তা শুধু কাফেরদের জন্য مِرْصَادٌ বা ঘাঁটি। তাহলে لِلطَّاغِيْنَ কথাটি পূর্বের কথার পরিপূরক হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তখন বাক্য এভাবে হবে যে, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِيْنَ তারপর مَاٰبًا শব্দটি مِرْصَادًا হতে بَدَلٌ হবে।

খ. আর যদি বলি– তা সাধারণভাবে মু'মিন ও কাফের সকলের জন্য ঘাঁটি বা অতিক্রম করার রাস্তা, তাহলে আয়াতটি مِرْصَادًا পর্যন্ত যাবে لِلطَّاغِيْنَ হতে নতুন আয়াত এবং নতুন কথা শুরু। মনে হয় যেন বলা হয়েছে–إِنَّ جَهَنَّمَ مِرْصَادٌ لِلْكُلِّ وَمَاٰبٌ لِلطَّاغِيْنَ خَاصَّةً অর্থাৎ জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্য অতিক্রমস্থল ; কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা এবং প্রত্যাবর্তনস্থল।

প্রথম অর্থ করলে مِرْصَادًا-এর উপর وَقْف করা যাবে না, আর দ্বিতীয় অর্থ করলে مِرْصَادًا-এর উপর وَقْف করতে হয়।
–[কাবীর]

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا -**এর মহল্লে ই'রাব :**

১. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا আয়াতটি مَنْصُوْبٌ অবস্থায় রয়েছে। কেননা, এটা طَاغِيْنَ হতে حَالٌ হয়েছে।

২. অথবা أَحْقَابٌ-এর বিশেষণ (صِفَتٌ) হিসেবে مَنْصُوْبٌ-এর অবস্থায় আছে।

৩. অথবা, এটা মুস্তানাফা অর্থাৎ নতুন বাক্য। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

وَغَسَّاقًا **আয়াতটির তারকীব :** আয়াতটি সম্পূর্ণ مُسْتَثْنٰى হয়েছে। মুসতাছনা মুত্তাসিল এবং মুনকাতি' উভয় ধরনের হতে পারে।

১. যদি اَلْبَرْدُ-এর অর্থ نَوْم হয়, তাহলে মুসতাছনা মুনকাতি' হবে।

২. আর যদি اَلْبَرْدُ অর্থ اَلْبُرُوْدَةُ হয়, তাহলে بَدَل হবে। -[কুরতুবী]

৩. আর যদি شَرَابًا হতে মুসতাছনা হয়, তাহলে মুসতাছনা মুত্তাসিল হবে। -[ফাতহুল কাদীর, হাশিয়ায়ে জালালাইন]

جَزَاءً وِّفَاقًا-**এর মহল্লে ই'রাব :** কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আয়াতটির মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, جَزَاءً মাফউলে মুতলক হিসেবে মানসূব হয়েছে এবং وِفَاقًا তার صِفَتٌ [বিশেষণ] হয়েছে। মূলবাক্য এভাবে হবে-

جَازَيْنَاهُمْ جَزَاءً وَافَقَ اَعْمَالَهُمْ.

আর কেউ কেউ মূলবাক্য এভাবে দেখাচ্ছেন যে, جُوْزُوْا جَزَاءً وَافَقَ اَعْمَالَهُمْ -[সাবী, ফাতহুল কাদীর, জালালাইন]

আল্লামা আলূসী (র.)-এর মতে جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ হিসেবেও মানসূব হতে পারে। অথবা, فِعْل مُقَدَّرٌ সহ মুস্তানাফা বাক্য হতে পারে। -[রূহুল মা'আনী]

وِفَاقٌ **শব্দের বিশ্লেষণ :** এ শব্দটির বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত মতামত পরিলক্ষিত হয়-

১. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, اَلْوِفَاقُ শব্দটি اَلْوَفْقُ-এর বহুবচনে আর اَلْوَفْقُ এবং اَلْمُوَافِقُ একই অর্থ প্রকাশ করে। -[ফাতহুল কাদীর]

২. আল্লামা আলূসী (র.)-এর মতে- اَلْوِفَاقُ শব্দটি وَافَقَ ক্রিয়ার মাসদার। -[রূহুল মা'আনী]

৩. সর্বাবস্থায় অর্থ নিতে হবে-উপযুক্ত, উপযোগী, অনুকূল বা অনুরূপ।

كِذَّابًا **-এর মহল্লে ই'রাব :**

১. مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে।

২. مَفْعُوْل بِه হিসেবে মানসূব হয়েছে। এ সময় كِذَّابًا - كَاذِبٌ শব্দের বহুবচন হবে। অথবা كِذَّابٌ মাসদারটি ইসমে ফায়েল-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। -[কাবীর]

৩. আবূ হাতিম (র.) كِذَّابًا-কে حَالٌ হিসেবে মানসূব বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে যোগসূত্র : সূরার প্রথমে কাফেরদের পক্ষ হতে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিস্তারিত ভূমিকা পেশ করা হয়েছে। তারপর যুক্তি-প্রমাণসহ তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেই উত্তরে يَوْمَ الْفَصْلِ-এর আলোচনা এসেছে। এখন قَوْلُهُ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا হতে يَوْمَ الْفَصْلِ-এর আহকামের বিস্তারিত বিবরণ আরম্ভ হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্তির প্রকৃত বর্ণনা করে এর কারণসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ২৯ নং আয়াতে اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا বাক্যাংশ দ্বারা মানুষের আমলনামার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা অগণিত মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় কার্যাবলি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করে রাখার কথাকে অসম্ভব ও অযৌক্তিক মনে করত। উক্ত আয়াতে এ সমস্ত অবিশ্বাসীর ধারণার পূর্ণ জবাব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে- তাদের এ অবিশ্বাস ও নাফরমানির সমুচিত প্রতিফল হিসেবে তারা অপেক্ষ্যমাণ জাহান্নামে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তৃষ্ণায় তাদের ছাতি ফেটে যাবে, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের উপযোগী কোনো পানীয় তারা পাবে না। অতিরিক্ত শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে অসহনীয় গরম বা ঠাণ্ডা বস্তু এবং পচা রক্ত ও পুঁজ জাতীয় ঘৃণ্য বস্তুসমূহ পিপাসা নিবারণের জন্য পরিবেশন করা হবে।

مِرْصَادٌ শব্দটি مِفْعَالٌ-এর ওজনে اَلرَّصْدُ থেকে নির্গত। مِفْطَارٌ - مِغْمَارٌ এবং مِطْعَانٌ-এর ওজনে مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ অর্থ- অধিক অপেক্ষমাণ। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে- জাহান্নাম কাফেরদের জন্য অধিক অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ -[কাবীর]

১. আযহারী বলেন, যেখানে পাহারাদার শত্রুকে পাহারা দেয়, সে স্থানকে مِرْصَاد বলা হয়। -[ফাতহুল কাদীর]

কেননা, জাহান্নামের পার্শ্ব দিয়ে সবাই গমন করবে, সেখানে সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উভয়ের প্রতিদানদাতা ফেরেশতাগণ অপেক্ষা করতে থাকবে। জাহান্নামীদের গ্রেফতার করা হবে এবং জান্নাতীদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেওয়া হবে। -[মাযহারী]

২. হযরত হাসান (রা.) বলেন, জাহান্নামের পুলের উপর ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, তাদেরকে অতিক্রম করে কেউ সামনে যেতে পারবে না।
যাদের হাতে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতিপত্র পাওয়া যাবে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যাদের হাতে ঐ পত্র না থাকবে তাদেরকে আটক করা হবে। −[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

মুকাতিল (র.) বলেন− مِرْصَادٌ এখানে مَحْبَسٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আটক করার স্থান, কয়েদখানা, বন্দী করার স্থান। কেননা, জাহান্নাম তার অধিবাসীদের জন্য কয়েদখানা হবে। কেউই ঐ স্থান হতে বের হতে পারবে না।

কারো মতে مِرْصَادٌ এখানে রাস্তা এবং অতিক্রম করার স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা বেহেশতে যেতেও দোজখ পথে পড়বে। এ জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামকে ঘাঁটিস্থল বলেছেন। হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, জাহান্নামের রাস্তা অতিক্রম ছাড়া কোনো ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। যদি পুণ্যবান হয় তবে কোনো কষ্ট ছাড়া পার হয়ে যাবে। আর যদি পাপী হয়, তবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের পুলের উপরে সাতটি কারাগারের দ্বার থাকবে। বান্দাদেরকে প্রথম কারা-ফটকে কালিমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বান্দা সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারলে সম্মুখে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় কারা ফটকে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সঠিক জাবাবদানকারীরা কৃতকার্য হবে এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তৃতীয় ফটকে পৌছবে। তৃতীয় ফটকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কামিয়াব বান্দারা চতুর্থ ফটকে পৌছবে। অনুরূপভাবে চতুর্থ ফটকে রোজা সম্পর্কে, পঞ্চম ফটকে হজ সম্পর্কে, ষষ্ঠ ফটকে ওমরা সম্পর্কে এবং সপ্তম ফটকে পারস্পরিক জুলুম-অত্যাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যারা সঠিক উত্তর প্রদান করবে তারা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে। −[নূরুল কোরআন, খাযেন]

পুলসিরাতের স্বরূপ : বায়হাকী হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, পুলসিরাত তলোয়ারের চেয়েও ধারালো এবং সূক্ষ্ম হবে। ফেরেশতাগণ ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের হেফাজত করবে। হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার কোমর ধরে রাখবে। আমি বলতে থাকবো হে আল্লাহ! রক্ষা করো, হে আল্লাহ! রক্ষা করো, আর হোঁচট খেয়ে বহু নারী ও পুরুষ পড়ে যাবে।

ইবনে মুবারক (র.) বায়হাকী এবং ইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দোজখের উপর যে পুল রয়েছে তা তলোয়ারের চেয়ে বেশি ধারালো হবে। −[নূরুল কোরআন]

জাহান্নাম ঘাঁটি হওয়ার কারণ : শিকার ধরার জন্য তৈরি করা বিশেষ স্থানকেই مِرْصَادٌ বা ঘাঁটি বলা হয়। শিকার অজানাভাবে আসে এবং তাতে আটকা পড়ে। এখানে জাহান্নামকে ঘাঁটি বলা হয়েছে। এ জন্য যে, আল্লাহদ্রোহী লোকেরা জাহান্নামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে দুনিয়ার বুকে নেচে-কুদে বেড়ায় এ কথা মনে করে যে, আল্লাহর এ বিশাল জগৎ যেন তাদের জন্য এক উন্মুক্ত লীলা ক্ষেত্র এবং এখানে ধরা পড়ার কোনোই আশঙ্কা নেই; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জাহান্নাম তাদের জন্য এক প্রচ্ছন্ন ঘাঁটি হয়ে রয়েছে। তাতে তারা আকস্মিকভাবেই আটকা পড়বে এবং তাতে আটকা থাকবে। −[যিলাল]

জান্নাতবাসী জাহান্নাম অতিক্রম করার কারণ : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে− নেককারদের মধ্য হতে কিছু লোক বিদ্যুতের মতো, কিছু লোক চোখের পলকে, কিছু লোক প্রবল বায়ুর ন্যায়, কিছু লোক দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে প্রবশে করবে। এভাবে কতিপয় পাপী মুসলমান ধীরে ধীরে সাত হাজার বৎসরে এ পুলসিরাত পার হবে। হযরত ফুযাইল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, পুলসিরাতের দূরত্ব তিন হাজার বৎসরের পথ। এটা চুল হতে চিকন এবং তরবারি হতে ধারালো হবে। −[আযীযী]

জাহান্নামের উপর দিয়ে জান্নাতবাসীদের রাস্তা নির্মাণ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এটা হতে পারে যে, যারা নেক বান্দা তারাও স্বচক্ষে জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা দেখে যাবে। জাহান্নামের সীমাহীন আজাবের সাথে নিজেদের প্রাপ্ত জান্নাতের অনাবিল শান্তি ও নিয়ামতকে তুলনা করে রাব্বুল ইয্যতের শুকরিয়া ও হামদ পাঠ করবে।

طَاغِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : طَاغِيْنَ-এর ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।
১. যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে অহংকার করে এবং তাঁর বিরোধিতায় মেতে উঠে, তাকে طَاغِىْ বলা হয়। −[কাবীর]
২. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, طَاغِىْ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কুফরির মধ্যে সীমা অতিক্রম করে। −[ফাতহুল কাদীর]
৩. আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, যারা অবাধ্যতার মধ্যে সীমা অতিক্রম করে। −[রূহুল মা'আনী]

৪. যারা কুফরির মাধ্যমে তাদের দীনের মধ্যে অথবা দুনিয়াতে অত্যাচারের মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করে। -[কুরতুবী]

৫. যারা আল্লাহর রাসূলের চরম বিরোধিতা করেছে তাদেরকেই طَاغِيْن বলা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর]

মোটকথা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছিল, তারাই হলো طَاغِيْن তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

اَحْقَابًا-এর ব্যাপারে একটি সন্দেহ ও তার নিরসন : আল্লাহর বাণী اَحْقَابًا-এর উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জান্নাত তো চিরন্তন থাকবে; কিন্তু জাহান্নাম চিরদিন থাকবে না। তাদের যুক্তি হলো اَحْقَابٌ (যুগসমূহ) একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। এর ধারাবাহিকতা অসীম হতে পারে না; বরং কোনো না কোনো এক সীমায় গিয়ে তা নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য। নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

১. আরবি ভাষায় اَحْقَابٌ এমন সময়কে বলে যার শেষ নেই। এটা সীমাহীন সময়।

২. কুরআন মাজীদের ৩৪ স্থানে জাহান্নামের ব্যাপারে خُلُوْد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো চিরন্তন।

৩. কুরআন মাজীদের তিন স্থানে خُلُوْد-এর সঙ্গে اَبَدًا শব্দটিকে আনয়ন করা হয়েছে যা জাহান্নাম চিরন্তন হওয়াকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে।

৪. সূরা আল-মায়িদার মধ্যে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামীরা জাহান্নাম হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে। কিন্তু কোনোমতেই বের হতে পারবে না।

৫. জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ এতদসত্ত্বেও জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে এ পার্থক্য কিভাবে আবিষ্কার করা যায় যে, জান্নাত চিরন্তন হবে, কিন্তু জাহান্নাম চিরন্তন হবে না।

৬. শাহ আব্দুল আযীয (র.) বলেন, حُقْبٌ-এর মুদ্দত যদিও জানা রয়েছে তথাপি اَحْقَابٌ-এর মুদ্দত জ্ঞাত হওয়া কিভাবে এটা দ্বারা সাব্যস্ত হয়?

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সময়সীমার কথা বলা হয়নি; বরং পরকালের সময়ের পরিমাপ জ্ঞাপক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়াতে যেমন সপ্তাহ, মাস, বৎসর ও যুগ ইত্যাদির মাধ্যমে সময় পরিমাপ করা হয়; তদ্রূপ আখেরাতে حُقُبٌ-এর মাধ্যমে সময়ের হিসাব করা হবে।

নাহুবিদ ফাররা (র.) বলেছেন, اَحْقَابًا শব্দটি لٰبِثِيْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়নি; বরং এটা لَا يَذُوْقُوْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ এ দীর্ঘ সময় ধরে তো তারা অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে এবং ঠাণ্ডার ছোঁয়াও পাবে না। অতঃপর তাদেরকে জামহারীর (প্রচণ্ড শৈত্য)-এর স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। বহু যুগ পর্যন্ত শৈত্য দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পর পুনরায় আগুনের স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। অশেষ সময় পর্যন্ত পালাক্রমে এরূপ শাস্তি চলতেই থাকবে।

ইমাম কুরতুবী (র.)-এর মতে عَشَرَةُ اَحْقَابٍ বা خَمْسَةُ اَحْقَابٍ বলা হলে সসীম সময় উদ্দেশ্য করা সঠিক হতো। কিন্তু যখন শুধু اَحْقَابٌ বলা হয়েছে; তখন এর দ্বারা অসীম সময়ই উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম যুজাজ (র.)-এর মতে, কয়েক হুকবা সময় হবে গরম পানি এবং রক্ত পুঁজের জন্য। অর্থাৎ তারা এক নির্দিষ্ট কাল ব্যাপি গরম পানি এবং রক্ত পুঁজ পান করবে, তারপর আজাব শুরু হবে। -[কুরতুবী]

অথবা, اَحْقَابٌ-এর আয়াতটি فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا" : فِيْهَا-এর সর্বনাম দুই দিকে ফিরতে পারে।

ক. সর্বনামটি اَحْقَابٌ-এর দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ হবে 'তারা ঐ হোকবাতে ঠাণ্ডা ও পানীয় বস্তুর স্বাদ পাবে না।' এমতাবস্থায় উক্ত আয়াতটি পিছনের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি ইমাম যুজাজ (র.) বলেছেন।

খ. সর্বনামটি جَهَنَّمَ-এর দিকে ফিরেছে। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি পিছনের আয়াতের সাথে সম্পর্ক না রেখে মুস্তানাফা হবে। তখন অর্থ হবে তারা অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে ঠাণ্ডা এবং পানীয় বস্তুর স্বাদ পাবে না। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে بَرْدًا-এর অর্থ : আয়াতে بَرْدًا অর্থ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়।

১. হযরত আবূ উবায়দা (রা.) بَرْد-এর অর্থ নিদ্রা (نَوْم) করেছেন। এ অর্থটিই হযরত মুজাহিদ, সুদ্দী, কিসায়ী, ফযল ইবনে খালেদ এবং আবূ মু'আয (র.) হতে বর্ণিত। জালালাইনে এ অর্থকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এ মতের উপর এক বিরাট আপত্তি আছে- হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ একদা জিজ্ঞাসিত হলেন যে, বেহেশতে কি নিদ্রা আছে? তদুত্তরে তিনি বললেন 'না, নিদ্রা তো মৃত্যুর ভাই, আর বেহেশতে মৃত্যু নেই।'

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) بَرْدٌ-এর অর্থ بَرْدُ الشَّرَابِ (পানীয় বস্তুর পানের ঠাণ্ডা) করেছেন। অর্থাৎ জাহান্নামীগণ জাহান্নামে পানীয়বস্তু পান করে ঠাণ্ডা অনুভব করবে না; বরং এমন বস্তু পান করবে যা তাদের জন্য আজাবের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে نَوْم অর্থও বর্ণিত আছে।

৩. যুজ্জাজ বলেন, بَرْدُ رِيْحٍ وَلَا ظِلٍّ وَلَا نَوْمٍ অর্থাৎ 'তারা না বাতাসের ঠাণ্ডা পাবে, না ছায়ার ঠাণ্ডা, আর না নিদ্রার প্রশান্তি।' তিনি بَرْد বলতে প্রত্যেক বস্তুর ঠাণ্ডাকে বুঝিয়েছেন, যা ব্যক্তিকে আরাম প্রদান করে। কেননা এমন ঠাণ্ডা আছে যা মানুষকে অতিশয় কষ্ট দেয় যেমন– اَلزَّمْهَرِيْر অর্থাৎ বায়ুর সে স্তর যেখানে পৌছে বাষ্প অতিশয় শীতলতা প্রাপ্ত হয়। এ ঠাণ্ডাকেও দোজখে আজাব হিসেবে দেওয়া হবে।

৪. হযরত হাসান, আতা এবং ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, بَرْد অর্থ رَوْحًا তথা আরাম-আয়েশ বা প্রশান্তি। –[কুরতুবী, কাবীর]

ইমাম রাযী (র.) بَرْد অর্থ ঠাণ্ডা বা প্রশান্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা তাবীল (জটিল ব্যাখ্যা) না করে শব্দকে সরাসরি অর্থে ব্যবহার করাই উত্তম।

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا আয়াতে حَمِيْمًا-এর অর্থ : حَمِيْمًا শব্দের কয়েকটি অর্থ দেখা যায়। যেমন–

ক. اَلْمَاءُ الْحَارُّ বা গরম পানি। এটা হযরত আবূ উবায়দার উক্তি।

খ. ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, জাহান্নামীদের চোখের পানি একটি হাউজে ভর্তি করে রাখা হবে, তারপর ঐ পানি তাদেরকে পান করানো হবে, এটাই حَمِيْم।

মূলত حَمِيْم গরম পানিকেই বলা হয়। এখান থেকেই حُمَّى ও حَمَا ব্যবহার করা হয়। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, জাহান্নামীগণ যা কিছুই ঠাণ্ডার জন্য পান করবে সব কিছুই সেখানে মারাত্মক গরম হবে। –[কুরতুবী]

হযরত রাবী' ইবনে আনাস (র.) বলেন, حَمِيْم ঐ গরমকে বলা হয় যার গরম শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছেছে। –[ইবনে কাছীর]

غَسَّاقًا-এর অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরদের অভিমত : غَسَّاقٌ শব্দের অর্থ নিয়ে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন–

১. কারো মতে ঠাণ্ডার দ্বারা যা মরে যায় তাকে غَسَّاقٌ বলা হয়। রাত্রকে غَاسِقٌ বলা হয়, কেননা তা দিন হতে ঠাণ্ডা।

২. ইবনে আবী হাতিম ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, غَسَّاقٌ হলো একটি ঝরনা যাতে সাপ বিচ্ছু সহ সকল বিষাক্ত জন্তুর বিষ প্রবাহিত হয়ে একসাথ হবে আর যখন কোনো লোককে তাতে একবার নিমজ্জিত করা হবে তখন সাথে সাথে লোকটির চর্ম এবং গোশত খসে পড়ে যাবে। –[মাযহারী]

৩. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, ব্যভিচারিণীদের গুপ্তাঙ্গ হতে যা বিগলিত হবে এবং কাফেরদের গোশত এবং চামড়ার গন্ধকে غَسَّاقٌ বলা হয়। –[ফাতহুল কাদীর]

৪. হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রা.) বলেন, জাহান্নামীদের পুঁজ, ঘাম, অশ্রু এবং রক্ত মিশ্রিত বস্তুকে غَسَّاقٌ (গাস্‌সাক) বলা হয়। তা হবে অসহনীয় ঠাণ্ডা আর মারাত্মক দুর্গন্ধ। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী]

৫. ইমাম রাযী (র.) বলেন, غَسَّاقٌ শব্দে কয়েকটি অর্থ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন–

ক. আবূ মু'আয বলেন, আমি আমাদের মাশায়েখদেরকে বলতে শুনেছি যে, غَسَّاقٌ শব্দটি ফারসি غَاسَاقْ বা غَاسَاقٌ হতে গৃহীত, অথবা خَاشَاكْ হতে এ শব্দটি তারা দুর্গন্ধ-ময়লাযুক্ত বিষয়ের ব্যাপারে ব্যবহার করে থাকে।

খ. অকল্পনীয়-অসহ্য ঠাণ্ডাকে غَسَّاقٌ বলা হয়। আর এ ঠাণ্ডাকে اَلزَّمْهَرِيْر [যামহারীর] বলা হয়।

গ. غَسَّاقٌ বলা হয় যা জাহান্নামীদের চক্ষু এবং চামড়া হতে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হবে। যেমন–পুঁজ, রক্ত, কফ, ঘাম এবং অন্যান্য দুর্গন্ধ ভিজা প্রবহমান বস্তু।

ঘ. দুর্গন্ধ ছড়ায় এমন সব বস্তুকেই غَسَّاقٌ বলা হয়। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِنَ الْغَسَّاقِ يُهْرَاقُ عَلَى الدُّنْيَا لَاَنْتَنَ اَهْلَ الدُّنْيَا অর্থাৎ যদি এক বালতি গাসসাক দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হতো তাহলে সারা দুনিয়াবাসী সে গন্ধ পেত।

ঙ. غَاسِقٌ শব্দের অর্থ অন্ধকার। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অতএব غَسَّاقٌ ঐ কালো ঘৃণিত পানীয়বস্তুকে বলা হয় যা অন্ধকারের ন্যায় ঘৃণিত। –[কাবীর]

অবাধ্যদের জন্য এ (ধরনের মারাত্মক) প্রতিফলের কারণ : ইমাম হাসান বসরী এবং ইকরামা (র.)-এর মতে কাফেরদের সকল কার্যাবলি ছিল মারাত্মক খারাপ ও ধ্বংসাত্মক, এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ ধরনের মারাত্মক প্রতিফল দিবেন। আর মুকাতিল (র.) বলেন, তাদের ভূমিকানুযায়ীই শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। তাদের পক্ষ হতে যে শিরক পাওয়া গেছে সে শিরক হতে বড় আর কোনো গুনাহ্ নেই। অতএব, বুঝা যায় যে, শিরকই বড় অপরাধ। তাই বড় অপরাধের জন্য বড় শাস্তি নির্ধারিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত আর সে বড় শাস্তির জন্য নরকই প্রযোজ্য। কেননা নরকের চেয়ে বড় শাস্তি আর হয় না।

-[ফাতহুল কাদীর, জালালাইন]

جَزَآءً وِّفَاقًا আয়াতের ব্যাখ্যা : কাফেরদেরকে জাহান্নামে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা তাদের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি। এখানে একটি সন্দেহ হতে পারে যে, কুফর ও শিরক তো সসীম, অথচ জাহান্নামের শাস্তি হলো অসীম। কাজেই জাহান্নামের আজাব কুফর ও শিরকের জন্য যথোচিত হয় কিভাবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, ঈমান ও কুফরের সম্পর্ক হলো আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলির সাথে, আর তা হলো অসীম। কাজেই ঈমান এবং কুফরও অসীম হবে। তা ছাড়া কুফর ও শিরক এবং এগুলোর কার্যাবলি তাদের রূহের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আর রূহ যেহেতু চিরন্তন সেহেতু অভ্যাস ও আমল এর তাবে' বা অনুগামী। নিধেন পক্ষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলিকে সীমিত বলা যেতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস ও অবিশ্বাস আত্মার মতোই চিরন্তন। এটা রূহের সাথে চিরস্থায়ী হবে। কাজেই এটা [অবিশ্বাসী] -এর শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে। মোটকথা, কুফরের চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু নেই এবং জাহান্নামের ন্যায় কঠোর আজাবও আর হতে পারে না। "যেমন কর্ম তেমন ফল।"

মুফাসসির (র.)-এর جُوْزُوْا بِذٰلِكَ কথার কারণ : তাফসীরে জালালাইনের লেখক এবং হযরত যুজাজ (র.) جَزَآءً وِّفَاقًا-এর তাফসীর করতে গিয়ে جُوْزُوْا بِذٰلِكَ শব্দযোগ করে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, جَزَآءً وِّفَاقًا একটি উহ্য فِعْل-এর মাফউলে মুতলাক হয়েছে। -[কামালাইন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا" :

১. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, اَىْ لَا يَرْجُوْنَ ثَوَابَ حِسَابٍ অর্থাৎ তারা কিয়ামতের দিনে প্রতিদানের আশা করে না। -[যিলাল]

২. আল্লামা যুজাজ (র.) বলেন, তারা ঐ পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসই রাখে না, যা দ্বারা তারা হিসাবের আশা করতে পারে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, খাযেন]

৩. আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, উল্লিখিত শাস্তি এ কারণে যে, তারা তাদের কৃতকর্মের হিসেবের ব্যাপারে ভয় করে না। -[রূহুল মা'আনী, জালালাইন]

৪. ইবনে কাছীর (র.) বলেন, তারা এ বিশ্বাস রাখে না যে, সেখানে আরো একটি সংসার হবে। তথায় তাদের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান দেওয়া হবে।

মোদ্দাকথা, لَا يَرْجُوْنَ -এর তিনটি অর্থ করা হয়েছে- ১. لَا يُؤْمِنُوْنَ ২. لَا يَتَوَقَّعُوْنَ ৩. لَا يَخَافُوْنَ

لَايَرْجُوْنَ-এর স্থলে لَايَخَافُوْنَ উল্লেখ না করার কারণ : ইমাম রাযী (র.) বলেন, হিসাব-নিকাশ মানুষের উপর বিরাট কষ্টের ব্যাপার। কষ্টসাধ্য বস্তুর ব্যাপারে رَجَاءٌ বা 'আশা করা' শব্দ ব্যবহার করা হয় না; বরং উচিত ছিল لَا يَرْجُوْنَ -এর স্থলে لَا يَخَافُوْنَ বা يَخْشَوْنَ বলা। এ اِعْتِرَاضٌ বা আপত্তির কয়েকটি উত্তর দেওয়া যায়। যেমন-

১. মুকাতিল (র.) এবং অনেক মুফাসসিরদের মতে لَا يَرْجُوْنَ -এর অর্থ এখানে لَا يَخَافُوْنَ কেননা, رَجَاءٌ -এর আভিধানিক অর্থ خَوْفٌ ও ব্যবহৃত হয়।

২. মু'মিনদের উচিত, যেন তারা আল্লাহর রহমত কামনা করে। কেননা, সর্বব্যাপারে তাঁর রহমতই চূড়ান্ত। আল্লাহর উপর বিশ্বাসের ছওয়াব, সমস্ত গুনাহের শাস্তির উপর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। অতএব, গুনাহ করেও ঈমান থাকার কারণে হিসেবের আশা করতে পারে, কিন্তু কাফেরগণের ঈমান না থাকার কারণে সে আশা করে না।

৩. অথবা, এখানে رَجَاءٌ অর্থ تَوَقُّعٌ অর্থাৎ আশা করা এবং تَوَقُّعٌ অর্থ কোনো বস্তুর আশা করে অপেক্ষা করা। কেননা কোনো বস্তুর আশা পোষণকারী رَاجِيٌّ ঐ বস্তুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, تَوَقُّعٌ-এর প্রকারভেদের মধ্যে অন্যতম উন্নত প্রকার হলো رَجَاءٌ অতএব, উন্নত প্রকারের উল্লেখ করে جِنْسٌ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. এ আয়াতে আল্লাহর সাথে হিসাবের ব্যাপারে আশা-ভরসার দিকটা خَوْف-এর চেয়ে অধিক। কেননা ওয়াদা করার কারণ আল্লাহর উপর ছওয়াব দানের ব্যাপারে বান্দার হক রয়েছে। পক্ষান্তরে বান্দার উপর শাস্তি দানের ব্যাপারে আল্লাহর হক রয়েছে। আর কারীম ব্যক্তি কখনো কখনো নিজের হক ছেড়ে দিয়ে থাকেন। কিন্তু তার উপর অন্যের হককে বাদ দেন না। (অর্থাৎ আল্লাহ নিজের হক ছেড়ে দিতে পারেন; কিন্তু তাঁর উপর বান্দার যে হক রয়েছে তা তিনি বাদ দিবেন না। অতএব, এখানে আশার দিকটাই প্রকট। এ কারণেই এখানে رَجَاءٌ ব্যবহার করা হয়েছে, خَوْف ব্যবহার করা হয়নি। –[কাবীর]

শুধু হিসাবকে উল্লেখ করার কারণ : ইমাম রাযী (র.) বলেন, কাফেরগণ বিভিন্ন প্রকারের মন্দকাজ এবং নানা রকম কুফরি কাজ করে থাকে, কোনোটির উল্লেখ না করে শুধু হিসাব-নিকাশ অর্থাৎ আখেরাতের কথা উল্লেখ করার কারণ কি?

এর উত্তর এই যে, ভালো কাজের প্রতি মানুষের সাধারণত ঝোঁক প্রবণতা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা বেশি থাকে। এটা এ কারণে যে, ঐ ভালো কাজ দিয়ে তাঁরা আখেরাতে উপকৃত হওয়ার আশা পোষণ করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ আখেরাতের জন্য পেশ করে না। এমনকি খারাপ কাজ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রও করে না। অতএব, إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا এ আয়াত দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, কাফেরগণ সমস্ত খারাপ কাজ করে এবং সমস্ত ভালো কাজকে বর্জন করে। –[কাবীর]

آيَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম শাওকানী (র.) آيَاتٌ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য নির্ণয় করেছেন–

১. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত সমস্ত আয়াত।

২. অথবা সাধারণ আয়াত, যার অধীনে নিদর্শন বলতে যত কিছু বুঝায় সব শামিল হয়ে যায়। –[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, সমস্ত নবীগণ যা কিছু নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন সব কিছুই 'আয়াত'।

কারো কারো মতে, যত কিতাব নবীদের উপর নাজিল হয়েছিল, সবগুলোকেই আয়াত বলা হয়েছে। –[কুরতুবী]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, যা তাওহীদ, নবুয়ত, পুনরুত্থান, শরিয়ত এবং কুরআনের ব্যাপারে রয়েছে সব কিছুই আয়াত। –[কাবীর]

কাফেরগণ শাস্তির যোগ্য হওয়ার কারণ : তারা দুনিয়ায় জীবন-যাপন করছে একথা মনে করে যে, আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কাজকর্মের হিসেব-নিকাশ পেশ করতে হবে এমন দিন ও ক্ষণ কখনোই আসবে না। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের হেদায়েতের জন্য যেসব আয়াত ও নিদর্শন পাঠিয়েছেন, তা মেনে নিতে তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিল ও সেগুলোকে মিথ্যা মনে করেছিল।

كُلَّ شَيْءٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : كُلَّ شَيْءٍ দ্বারা সকল সৃষ্ট বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। যাতে মানুষের أَعْمَالٌ ও শামিল রয়েছে। আবূ হাইয়ান (র.) বলেন, যে সমস্ত বস্তুতে পুণ্য এবং শাস্তি রয়েছে তাই এখানে উদ্দেশ্য। –[কাবীর, সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا : আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের হেদায়েতের জন্য যে সব আয়াত ও নিদর্শন পাঠিয়েছিলেন তা মেনে নিতে তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিল। সেগুলোকে তারা মিথ্যা মনে করেছিল। যা তারা আদৌ বিশ্বাস করেনি। আজ তাই তাদের চোখের সামনে বাস্তব আকারে দেখা দিয়েছে। আজ স্বচক্ষে তারা তাই দেখতে পাচ্ছে।

এখানে একটি সন্দেহ হতে পারে যে, কুফর ও শিরক তো অন্তরের কার্য, যা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তার সম্পর্ক নেই। কাজেই জাহান্নামের বাহ্যিক শাস্তিসমূহ কেন দেওয়া হবে? وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ-এর দ্বারা উক্ত সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। অন্তরের কার্য হোক আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য হোক সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার ইলমে রয়েছে। তদনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে দপ্তরসমূহে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ভালোমন্দ কোনো কার্যই সংরক্ষিত থাকে না। কথা, কার্য, নড়াচড়া এমনকি তারা অন্তরে যা কল্পনা করে তাও রেকর্ড করা হয়। অথচ কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন মনে করে বসেছে যে, তাদের মনে যা চায় তাই তারা করতে পারে। তাদেরকে এর জন্য কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। বস্তুত তাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে কড়া-ক্রান্তি করে হিসাব দিতে হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى "فَذُوقُوا الخ" : দুনিয়ার জীবনে তোমরা মহান আল্লাহর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ ছিলে, তোমাদের পাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তোমরা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় যেভাবে মেতে ছিলে যদি মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান তোমাদের ব্যাপারে কার্যকর না হতো, তবে তোমরা চিরদিন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতেই লিপ্ত থাকবে। তাই আজ থেকে তোমরা চিরদিন আল্লাহ তা'আলার আজাব ভোগ করতে থাকো। তোমাদের কীর্তিকলাপের পরিণতি ভোগ করতে থাকো। আর কখনো এ আশা করো না যে, এ আজাব কোনো এক সময় কম হয়ে যাবে, তোমাদের জন্য আজাব ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করা হবে না, বরং সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রতি আজাব বৃদ্ধি করা হবে, কেননা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের পাপাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের প্রতি দিনের পর দিন আজাব বৃদ্ধি করা হবে। -[নূরুল কোরআন]

زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ : অর্থাৎ আমি তাদের আজাবের উপর আরো আজাব বাড়িয়ে দিয়েছি।

অবশ্য গুনাহগার মু'মিন- যারা জাহান্নামে যাবে তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না। কেননা তাদের আত্মা ঈমানের কারণে পবিত্র ছিল। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরাধী ছিল। কাজেই তাদের শাস্তি সীমিত এবং সাময়িক হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মসিবত এবং কষ্ট যখন স্থায়ী হয়ে যায় তখন তা মসিবত থাকে না; বরং এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কজেই জাহান্নামী কাফেরদের জাহান্নামে আজাবের কিছু দিন পর আজাবই থাকবে না; বরং এটা তাদের গা সওয়া হয়ে যাবে এবং অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং এটা কিভাবে তাদের জন্য আজাব হতে পারে?

এর জবাবে বলা যায় যে, শাস্তি ও কষ্ট শরীরের চামড়ায় অনুভূত হয়ে থাকে। চামড়া যদি গলে যায় তাহলে যন্ত্রণা অনুভূত হওয়ার স্থান বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তথায় পুনরায় নতুন চামড়া গজিয়ে যায় তাহলে অনুভূতিও পূর্ববৎ; বরং ততোধিক মাত্রায় ফিরে আসে। জাহান্নামীদের এক চামড়া গলে পড়লে তথায় নতুন চামড়া গজিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তারা পূর্ণ মাত্রায় উক্ত আজাব ভোগ করতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে- "بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ"

অথবা, আজাব এক ধরনের হলে উপরিউক্ত প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু তাদেরকে বিচিত্র ধনের আজাব দেওয়া হবে।

অথবা, আখেরাতকে দুনিয়ায় অবস্থার উপর কেয়াস করা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা আখেরাতের অবস্থা দুনিয়ার বিপরীত।

চরম আজাবের ঘোষণা : এ আয়াতটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, এটা আজাবের ঘোষণার জন্য একটি চূড়ান্ত আয়াত। কেননা এতে কয়েকটি দিক পরিলক্ষিত হচ্ছে, যে দিকগুলো অন্য স্থানে পাওয়া যায় না। যেমন-

১. "لَنْ لِلتَّاكِيْدِ فِى النَّفْى" অর্থাৎ আজাবকে তাদের সাথে খাস করার জন্য حَصْر ব্যবহার করতে গিয়ে এমন 'নফী' [নিষেধসূচক হরফ] ব্যবহার করা হয়েছে, যা 'নফীতে' তাকিদ বুঝায় এবং যা দ্বারা আজাবের স্থায়িত্ব বুঝায়।

২. كَانُوا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا আয়াতে তাদের আলোচনা গায়েব হিসেবে করা হয়েছে, এখন এ আয়াতে সরাসরি তাদরেকে ذُوْقُوْا বলে আজাবের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

৩. এ সূরার প্রথম হতে বিভিন্ন শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি তাদের কৃতকর্মের অনুরূপই হয়েছে। অর্থাৎ 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' তারপর তাদের কুকর্মের ধরনও আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা فَذُوْقُوْا বলেছেন, মনে হয় যেন তিনি ফতোয়া দিলেন এবং দলিল তুলে ধরেছেন, তারপর হুবহু এ ফতোয়াগুলো পুনরায় উল্লেখ করেছেন। এটা দ্বারা কাফেরদের জন্য চূড়ান্ত আজাবের ঘোষণা বুঝায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'জাহান্নামীদের ব্যাপারে এ আয়াতটি কুরআন মাজীদের সবচেয়ে কঠোরতম আয়াত।" -[কাবীর, রুহুল মা'আনী]

হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি একদা আবূ বারযা আসলামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুরআন মাজীদে জাহান্নামীদের ব্যাপারে কোন আয়াতটি বেশি মারাত্মক। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বাণী- فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে বেশি মারাত্মক আয়াত জাহান্নামীদের ব্যাপারে আর অবতীর্ণ হয়নি। -[ইবনে কাছীর]

অনুবাদ :

٣١. إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا مَكَانَ فَوْزٍ فِي الْجَنَّةِ.

৩১. মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য বেহেশতে সাফল্যের স্থান।

٣٢. حَدَائِقَ بَسَاتِيْنَ بَدْلٌ مِنْ مَفَازًا اَوْ بَيَانٌ لَهُ وَاَعْنَابًا عَطْفٌ عَلَى مَفَازًا.

৩২. বাগানসমূহ উদ্যানসমূহ, এটা পূর্বোক্ত مَفَازًا হতে بَدْل অথবা এর بَيَان ও আঙ্গুরসমূহ এটা مَفَازًا-এর উপর عَطْف

٣٣. وَكَوَاعِبَ جَوَارِيَ تَكَعَّبَتْ ثُدِيُّهُنَّ جَمْعُ كَاعِبٍ اَتْرَابًا عَلَى سِنٍّ وَاحِدٍ جَمْعُ تِرْبٍ بِكَسْرِ التَّاءِ وَسُكُوْنِ الرَّاءِ.

৩৩. আর নব যৌবনা তরুণী যাদের স্তন যুগল ফুলে উঠেছে, كَوَاعِبٌ শব্দটি كَاعِبٌ-এর বহুবচন, যারা পরস্পর সমবয়সী একই বয়সী, اَتْرَابٌ শব্দটি تِرْبٌ (تَاءٌ মধ্যে যের ও رَاءٌ-এর মধ্যে সাকিন যোগে)-এর বহুবচন।

٣٤. وَكَاْسًا دِهَاقًا خَمْرًا مَالِئَةً مَحَالَّهَا وَفِي الْقِتَالِ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ.

৩৪. আর পূর্ণ পানপাত্র শরাবের পানপাত্র যা শরাবে পূর্ণ সূরায়ে মুহাম্মদ -এর মধ্যে একই বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ

٣٥. لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا اَيِ الْجَنَّةِ عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْاَحْوَالِ لَغْوًا بَاطِلًا مِنَ الْقَوْلِ وَلَا كِذّٰبًا بِالتَّخْفِيْفِ اَيْ كَذِبًا وَبِالتَّشْدِيْدِ اَيْ تَكْذِيْبًا مِنْ وَاحِدٍ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا يَقَعُ فِي الدُّنْيَا عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ.

৩৫. সেথায় তারা শ্রবণ করবে না বেহেশতে মদ্য পান ও অন্যবিধ অবস্থায়, অসার বাক্য বাতিল কথা হতে আর না মিথ্যা كِذَّابًا শব্দটি তাখফীফ-এর সাথে অর্থাৎ كَذِبًا মিথ্যা এবং তাশদীদ যোগে অর্থাৎ تَكْذِيْبًا তথা একে অন্যের প্রতি মিথ্যারোপ, যেমন পার্থিব জগতে মদ্য পায়ীদের মধ্যে মদ্যপানকালে এরূপ হয়ে থাকে।

٣٦. جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ اَيْ جَازَاهُمُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ جَزَآءً عَطَآءً بَدْلٌ مِنْ جَزَاءً حِسَابًا اَيْ كَثِيْرًا مِنْ قَوْلِهِمْ اَعْطَانِيْ فَاَحْسَبَنِيْ اَيْ اَكْثَرَ عَلَيَّ حَتّٰى قُلْتُ حَسْبِيْ.

৩৬. এটা পুরস্কার তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে এর মাধ্যমে পুরস্কৃত করবেন। দান স্বরূপ এটা পূর্বোক্ত جَزَاءً হতে بَدْل পরিমিত অর্থাৎ প্রচুর, যেমন লোকেরা বলে থাকে اَعْطَانِيْ فَاَحْسَبَنِيْ অর্থাৎ আমাকে এ পরিমাণ দিয়েছে যে, আমি حَسْبِيْ বা যথেষ্ট বলেছি।

তাহকীক ও তারকীব

حَدَائِقَ وَاَعْنَابًا-এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতটিতে দু'টি শব্দ রয়েছে। উভয়টি পূর্বে উল্লিখিত مَفَازًا হতে بَدْلَ الْاِشْتِمَالِ অথবা بَدْلَ الْكُلِّ হিসেবে মানসূব হয়েছে। যখন بَدْلَ الْكُلِّ হবে– তখন مَفَازًا-এর মুবালাগা হিসেবে حَدَائِقَ وَاَعْنَابًا-কে ধরতে হবে।

অথবা, حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا একটি উহ্য ক্রিয়া أَعْنِيْ -এর مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। উভয় অবস্থাতে مَفَازًا -কে ইসমে যরফ পড়তে হবে। আর যদি مَفَازًا অর্থ فَوْز হয়, তখন একটি উহ্য مُضَاف মেনে নিতে হবে। এমতাবস্থায় মূলবাক্য এভাবে হবে যে, فَوْز حَدَائِقَ -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

অথবা, بَدَلُ بَعْضٍ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

أَتْرَابًا শব্দের বিশ্লেষণ এবং অর্থ : أَتْرَابًا শব্দটি মানসূব -এর হালতে রয়েছে। أَلْمُتَّحِدَاتُ فِى السِّنِّ -কে أَتْرَابٌ বলা হয় أَتْرَابًا অর্থাৎ সমবয়স্কা রমণীগণকে অথবা أَلْمُتَسَاوِيَاتُ فِى الْحُسْنِ অর্থাৎ সমান সুন্দরীদেরকে أَتْرَابٌ বলা হয়। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, যারা পরস্পর ভগ্নিসম হয়ে বসবাস করবে, হিংসা-বিদ্বেষ যাদের মধ্যে অনুপস্থিত তাদেরকে أَتْرَابٌ বলা হয়।

-[ফাতহুল কাদীর]

কোনো কোনো তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, বেহেশতী রমণীগণ ষোল বৎসরের যুবতী হবে, আর পুরুষগণ তেত্রিশ বৎসরের হবে। -[রূহুল মা'আনী]

আবার কোনো কোনো তাফসীরে বেহেশতী পুরুষ ও রমণী সকলেরই বয়স তেত্রিশ বৎসর এবং পূর্ণ উজ্জ্বল যৌবনের অধিকারী হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। -[বায়ানুল কুরআন]

جَزَاءً ও وَعَطَاءً -এর মহল্লে ই'রাব : جَزَاءً শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার মাফউলে মুতলাক হয়েছে। উহ্য বাক্য এভাবে হবে- جَزَاهُمْ جَزَاءً এমনিভাবে عَطَاءً শব্দটিও উহ্য ক্রিয়ার মাফউলে মুতলাক হয়েছে। মূল ইবারত এভাবে ছিল أَعْطَاهُمْ عَطَاءً -[কুরতুবী]

আল্লামা যমখশরী বলেন, عَطَاءً শব্দটি جَزَاءً মাসদারের কারণে [মাফউলে বিহী হিসেবে] মানসূব হয়েছে। -[কাশ্শাফ]

আল্লামা আলূসী (র.) جَزَاءً তাকীদী মাসদার [অর্থাৎ মাফউলে মুতলাক] হয়েছে। আর তাকীদী মাসদার কোনো সময় আমল করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের আয়াতগুলোর সাথে যোগসূত্র : সূরার প্রথম হতে কাফেরদের কৃতকর্ম এবং এর পরিণামের কথা আলোচিত হয়েছে। তাদের জীবনের চরম ব্যর্থতা এবং সীমাহীন লাঞ্ছনার কথাও ঘোষিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا হতে আল্লাহতে বিশ্বাসী তথা মুত্তাকীনদের সফলতা এবং সীমাহীন শান্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হলো, এক পক্ষের আলোচনা হলে সাথে সাথে অন্য পক্ষের আলোচনাও হয়। ঠিক একই নিয়মে কাফেরদের আলোচনার সাথে সাথে মু'মিনদের আলোচনা শুরু হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর, কবীর]

এখানে 'মুত্তাকীন' দ্বারা উদ্দেশ্য : মুত্তাকীন-এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহভীতিপূর্ণ সাবধানী ব্যক্তিবর্গ। এখানে মুত্তাকীন শব্দটি কাফের ও অবিশ্বাসী লোকদের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা কোনোরূপ হিসাব-নিকাশ হবে বলে মনে করে না এবং যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অমান্য করেছিল। এ ক্ষেত্রে মুত্তাকীন-এর অর্থ হবে সেসব লোক, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ মেনেছিল এবং ইহকালে সকল সময় এ অনুভূতি সহকারে জীবন যাপন করে যে, তাদের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে এবং নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে বাধ্য হবে।

قَوْلُهُ "مَفَازًا" : مَفَازً শব্দটি একবচন। এর বহুবচন مَفَاوِزُ-এর মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা আছে- ক. এটি মাসদার হবে। [মীম মাসদারের জন্য হবে।] এমতাবস্থায় অর্থ হবে فَوْز সফলতা, খ. অথবা, এটা ইসমে যরফ (إِسْمُ ظَرْفٍ) হবে। তখন এর অর্থ হবে "مَكَانُ الْفَوْزِ" সফলতার স্থান।

ইমাম রাযী (র.) -এর মতে এখানে مَفَازً-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে-

১. اَلْفَوْزُ بِالْمَطْلُوْبِ কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাসিলের মাধ্যমে সফলতা অর্জন, ২. اَلْفَوْزُ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْعَذَابِ তথা শাস্তি হতে নিষ্কৃতি লাভের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন, ৩. أَوْ كِلَاهُمَا مَعًا অথবা উভয় সফলতা একসাথে অর্জন।

ইমাম রাযী (র.)-এর মতে উপরিউক্ত তিনটি অর্থের মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থই অগ্রগণ্য। কেননা সফলতার মধ্যে শাস্তি পাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

حَدَائِقَ-এর অর্থ ও এর নামকরণ : حَدَائِقَ শব্দটি حَدِيْقَةٌ-এর বহুবচন। মুফাস্‌সিরগণ حَدِيْقَةٌ-এর বিভিন্ন তাফসীর করেছেন।

ক. ইমাম রাগিব (র.)-এর মতে পানিসহ জমিনের টুকরাকে حَدِيْقَةٌ বলে। অর্থাৎ حَدِيْقَةٌ অর্থ উদ্যান।

খ. তাফসীরে খাযেন-এর ভাষ্যমতে যে বাগানে চাহিদানুযায়ী সব ধরনের গাছ-পালা ও ফল-ফলাদি মওজুদ রয়েছে,তাকে حَدِيْقَةٌ বলে।

গ. কারো কারো মতে যে বাগানের চতুর্দিকে দেয়াল বা অন্য কিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাকে حَدِيْقَةٌ বলে।

ঘ. অন্য এক দল মুফাস্‌সিরের মতে حَدِيْقَةٌ এমন বাগানকে বলে যাতে ফলদার বৃক্ষরাজি, সুন্দর পরিবেশ এবং রকমারি ফুল রয়েছে। -[খাযেন, কাবীর, রূহুল মা'আনী, কাশশাফ]

حَدِيْقَةٌ-এর নামকরণ : حَدِيْقَةٌ-কে حَدِيْقَةٌ নামকরণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন। আরবিতে اَحْدَقُوْا بِهٖ কথাটি اَحَاطُوْا بِهٖ-এর অর্থে হয়ে থাকে; اِحْدَاقٌ শব্দটি اِحَاطَةٌ-এর অর্থে হয়ে থাকে। সুতরাং حَدِيْقَةٌ অর্থাৎ مُحْدَقَةٌ মানে যা পরিবেষ্টিত। যেহেতু এরূপ বাগানের চারিদিক দেয়াল বা অন্য কিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে সেহেতু একে حديقة বলে।

আল্লামা আলূসী (র.)-এর মতে حَدِيْقَةُ الْعَيْنِ-এর সাথে সামঞ্জস্য থাকার দরুন حَدِيْقَةٌ-কে حَدِيْقَةٌ নামকরণ করা হয়েছে। চোখের পুতুলী যেমনটি পরিবেষ্টিত ও পানি পানি থাকে তদ্রূপ حَدِيْقَةٌ ও পরিবেষ্টিত ও পানি পানি অবস্থায় থাকে। -[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا" : জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য এমন নব যৌবনা কুমারী মহিলা থাকবে যাদের স্তনযুগল স্ফীত [উঁচু] সুগঠন ও সুদর্শন হবে। যারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। অথবা তাদের স্বামীগণের সমবয়স্কা হবে। কেননা সমস্ত রূহ একই সময় তথায় শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সময় তাদের স্ব-স্ব শরীরে প্রবেশ করবে। অথবা তারা সকলে একই সময় জন্মগ্রহণ করবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- "اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ـ عُرُبًا اَتْرَابًا لِاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ"

যা হোক, জান্নাতী স্ত্রীগণ তা তাদের স্বামীগণের সমগোত্রীয় ও সমবয়সী হবে। যাতে তারা পরিপূর্ণভাবে দাম্পত্য সুখ-সম্ভোগ করতে পারে। কেননা অসমগোত্রীয় হলে যদ্রূপ আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে তদ্রূপ বয়সের তারতম্যের কারণে ভালোবাসা পূর্ণ হয় না। এ জন্য যুবক যুবতীর সঙ্গে বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের মিল-মহব্বত ও বনি-বনা হয় না। অধিকাংশ তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ আছে যে, জান্নাতী পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বয়স হবে তেত্রিশ বছর। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনাতে মহিলাদের বয়স হবে ১৭/১৮ এবং পুরুষের বয়স হবে তেত্রিশ। সুতরাং পুরুষরা হবে পোক্তা ফল সাদৃশ্য। আর মহিলারা হবে সে ফলের তুল্য যার পাকা অপেক্ষা কাঁচা উত্তম। যেমন- খিরা, শসা ইত্যাদি।

كَوَاعِبَ-এর অর্থ : كَوَاعِبُ শব্দটি كَاعِبَةٌ-এর বহুবচন। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, নব যৌবনা এমন কুমারীকে كَاعِبَةٌ বলা হয় যার স্তনযুগল কেবল মাত্র উঁচু ও গোলাকার হয়ে উঠেছে।

খ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ-এর মতে এখানে كَوَاعِبُ দ্বারা নব যৌবনে পদার্পণকারিণী জান্নাতী হুরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল শব্দের শব্দমূলে (ك ـ ع ـ ب) রয়েছে এদের মধ্যে উঁচু -এর অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং كَاعِبَةٌ অর্থ উঁচু স্তনযুগলধারিণী। كَعْبَةٌ কা'বা শরীফকে বলে যা ভূমি হতে উঁচু। كَعْبٌ পায়ের ছোট গিরাকে বলে যা উঁচু।

-[ইবনে কাছীর, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ "دِهَاقًا" : আল্লামা শাওকানী (র.) دِهَاقًا শব্দের কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন-

১. دِهَاقًا اَىْ مُمْتَلِئَةً অর্থাৎ পরিপূর্ণ। এ তাফসীর হলো হযরত হাসান, কাতাদাহ এবং ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতে। যেমন বলা হয়, اَدْهَقْتُ الْكَاْسَ اَىْ مَلَاْتُهَا "আমি পেয়ালা ভর্তি করলাম"।

২. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরামা এবং মুজাহিদ (র.) বলেন, دِهَاقًا اَىْ مُتَتَابِعَةً يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا অর্থাৎ পর পর পেয়ালা আসতে থাকবে।

৩. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, دِهَاقًا اَىْ صَافِيَةً অর্থাৎ স্বচ্ছ। -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কাবীর]

আল্লামা কুরতুবী دِهَاقٌ শব্দের আরো কয়েকটি অতিরিক্ত অর্থ উল্লেখ করেছেন।

৪. হযরত আসমায়ী বলেন, নরম, মোলায়েম ও উত্তম খাদ্যকে دِهَاقٌ বলা হয়।

৫. دَهْقٌ এক প্রকার আজাবকে বলা হয়। [অর্থাৎ পেয়ালাকে অবসর না দিয়ে পর-পর বেহেশতবাসীর সামনে পেশ করা হবে, যা পেয়ালার জন্য এক প্রকার শাস্তি বলা চলে।]

৬. ইমাম মুবাররাদ বলেন, اَلْمَدْهُوْقُ : اَلْمُعَذَّبُ بِجَمِيْعِ الْعَذَابِ الَّذِيْ لَا فُرْجَةَ فِيْهِ অর্থাৎ অনর্গল সর্বপ্রকারের আজাবপ্রাপ্ত বস্তুকে مَدْهُوْق বলা হয়। এ অর্থ ৫ম অর্থের সাথে মিল দেখা যায়। –[কুরতুবী]

মোটকথা, বেহেশ্‌তবাসীদের পানের জন্য পবিত্র-স্বচ্ছ শরবত-ভর্তি পেয়ালা ইচ্ছামতো অনর্গল পরিবেশন করা হবে।

كَاْس -এর অর্থ : اَلْكَأْسُ هُوَ الْاِنَاءُ الْمَعْرُوْفُ অর্থাৎ كَاْس ঐ পাত্রকে বলা হয় যা সমাজে সুপরিচিত; কিন্তু সকল পাত্রকে كَاْس বলা হয় না, শুধুমাত্র পানীয়ভর্তি পেয়ালাই كَاْسٌ হিসেবে পরিগণিত। –[ফাতহুল কাদীর]

হযরত যাহ্‌হাক বলেন, কুরআন মাজীদে যত كَاْسٌ ব্যবহৃত হয়েছে, সব كَاْسٌ দিয়ে خَمْر বা মদ উদ্দেশ্য। –[কাবীর]

لَغْو -এর অর্থ : মুফাসসিরগণ لَغْو -এর বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন–

অনর্থক ও বেহুদা কথাবার্তা ও গল্পগুজবকে لَغْو বলে। কখনও মন্দ অশ্লীল কথাকেও لَغْو বলে। কোনো কোনো সময় এমন অগ্রহণীয় কথাকেও لَغْوٌ বলে, যা বলার পর কেউ এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।

মূলত চড়ুই পাখির কিচিরমিচির ধ্বনিকে আরবের লোকেরা لَغْو বলে। অতঃপর যে সমস্ত কথার মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না; কোনোরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই যা প্রকাশিত হয়, তাকে রূপকার্থে لَغْو বলা হয়েছে।

وَلَا كِذَّابًا -এর অর্থ : আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, বেহেশতবাসী পরস্পর একে অপরকে মিথ্যা সম্বোধন করবে না। –[ফাতহুল কাদীর]

কোনো কোনো মুফাসসিরদের মতে, জান্নাতে লোকেরা কর্ণকুহরে মিথ্যা ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একে জান্নাতের অসংখ্য বড় বড় নিয়ামতের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ কারো নিকট মিথ্যা কথা বলবে না, কেউ কাউকেও মিথ্যাবাদী বলবে না, কেউ কাউকেও অবিশ্বাস করবে না। দুনিয়ায় গালিগালাজ, মিথ্যা অভিযোগ, দোষারোপ, ভিত্তিহীন দুর্নাম রটনা, অন্যের উপর অকারণে দোষ চাপানো প্রভৃতি অবাঞ্ছিত কাজের যে তুফান সৃষ্টি হয়েছে, জান্নাতে এর নাম-চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে না।

কিভাবে একই বস্তুকে প্রতিফল এবং পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত করা হলো? : উল্লিখিত আয়াতে একটি প্রশ্ন জাগে তা নিম্নরূপ– একই বস্তু প্রতিফল এবং পুরস্কার উভয়টি হতে পারে না, অসম্ভব; কেননা প্রতিফল হলো পাওনা, আর পুরস্কার পাওনা নয়। 'পাওনা' আর 'পাওনা নয়' কোনো দিন একত্রিত হতে পারে না।

উত্থাবিত প্রশ্নটির জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, পরস্পর দ্বন্দ্বশীল দু'টি বিষয় একসাথে হতে পারে না এ কথাটি যথার্থ। কিন্তু এ আয়াতে উভয়টি একত্রিত হয়েছে এ অর্থে যে, আল্লাহর ওয়াদার কারণে বেহেশতবাসীগণ 'পাওনা' পাবে, তবে এ অর্থে নয় যে, এটা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অতএব, এদিক থেকে একে প্রতিফল বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ প্রতিফল পরিশোধ করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। তিনি পুরস্কারের ন্যায় দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। অতএব, এদিক দিয়ে এটা পুরস্কারও বটে। –[কাবীর]

ওলামায়ে কেরামগণ এ প্রশ্নের সুন্দর একটি সমাধান উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, প্রতিফল-এর পর পুরস্কার দানের উল্লেখ হওয়ার মোটামুটি অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ লোকদেরকে কর্মফল কাজ অনুপাতে কেবলমাত্র ফল-দান করেই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না। কেননা তারা তো নিজেদের নেক আমলের কারণে এটুকু পাওয়ার অধিকারী হবে; বরং তাদেরকে এরও অধিক পুরস্কার দান করা হবে। এর বিপরীতে জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তাদেরকে শুধু তাদের কাজের পুরোপুরি বদলা দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাদের অপরাধ অনুপাতে যতটুকু শাস্তি প্রাপ্য হতে পারে তার কম দেওয়া হবে না এবং তার বেশিও দেওয়া হবে না।

حِسَابًا-এর অর্থ : حِسَابًا-এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

ক. হযরত আবূ উবায়দাহ (র.) বলেছেন– حِسَابًا اَيْ كَافِيًا অর্থাৎ তাদরকে যথেষ্ট পতিদান দেওয়া হবে।

খ. ইবনে কুতাইবাহ (র.)-এর মতে حِسَابًا এখানে كَثِيْرًا-এর অর্থে হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে অত্যধিক পরিমাণে দান করা হবে। যেমন, বলা হয়– اَحْسَبْتُ فُلَانًا اَيْ اَكْثَرْتُ لَهُ الْعَطَاءَ অর্থাৎ আমি তাকে অধিক দান করেছি।

গ. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন– حسابا এখানে قدر-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নির্ধারিত প্রতিদান কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যেমন কারো জন্য একটি নেক কাজের দশটি ছওয়াব, কাউকে সাত শত আবার কাউকেও বা অসংখ্য [আল্লাহ যতটুকু ইচ্ছা করেন] দান করার ওয়াদা করা হয়েছে। তদনুযায়ী হিসেব করে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। –[কবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

٣٧. رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْجَرِّ وَالرَّفْعِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ كَذٰلِكَ وَبِرَفْعِهِ مَعَ جَرِّ رَبِّ السَّمٰوٰتِ لَا يَمْلِكُوْنَ اَيِ الْخَلْقُ مِنْهُ تَعَالٰى خِطَابًا اَيْ لَا يَقْدِرُ اَحَدٌ اَنْ يُخَاطِبَهُ خَوْفًا مِنْهُ .

৩৭. যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এটা মাজরূর ও মারফূ' উভয়রূপে পঠিত হয়েছে। এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের যিনি দয়াময় তেমনিভাবে, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি মারফূ' পঠিত হবে, যদি رَبِّ السَّمٰوٰتِ -কে মাজরূররূপে পড়া হয়। তারা অধিকারী হবে না সৃষ্টির মধ্য হতে তাঁর পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আবেদন নিবেদন করার অর্থাৎ তাঁর ভয়ের কারণে সৃষ্টি জগতের কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে সক্ষম হবে না।

٣٨. يَوْمَ ظَرْفٌ لِلَا يَمْلِكُوْنَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ جِبْرِيْلُ اَوْ جُنْدُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا حَالٌ اَيْ مُصْطَفِّيْنَ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اَيِ الْخَلْقُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ فِى الْكَلَامِ وَقَالَ قَوْلًا صَوَابًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ كَاَنْ يَّشْفَعُوْا لِمَنِ ارْتَضٰى .

৩৮. সেদিন এটা لَا يَمْلِكُوْنَ -এর ظَرْف দণ্ডায়মান হবে রূহ জিবরাঈল বা আল্লাহর সৈন্যগণ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে এটা حَالٌ অর্থাৎ مُصْطَفِّيْنَ সারিবদ্ধ হয়ে তারা কথা বলবে না অর্থাৎ সৃষ্টিজগত দয়াময় যাকে অনুমতি দান করবেন সে ভিন্ন কথাবার্তা বলার ব্যাপারে আর সে বলবে কথা যথার্থ মুমিন অথবা ফেরেশতা হোক, তারা এমন লোকের জন্যই সুপারিশ করবে, যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি তারদেরকে প্রদান করা হবে।

٣٩. ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ج الثَّابِتُ وُقُوْعُهُ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا مَرْجِعًا اَيْ رَجَعَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِطَاعَتِهٖ لِيَسْلَمَ مِنَ الْعَذَابِ فِيْهِ .

৩৯. এ দিবস সুনিশ্চিত তা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, আর তা হলো কেয়ামত দিবস। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল ঠিক করুক ঠিকানা, অর্থাৎ সেদিনকার শাস্তি হতে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করুক।

٤٠. اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ عَذَابًا قَرِيْبًا اَيْ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ الْاٰتِيْ وَكُلُّ اٰتٍ قَرِيْبٌ .

৪০. আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম হে মক্কাবাসী কাফেরগণ! আসন্ন শাস্তির ব্যাপারে কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে যা অবগত হবে। আর প্রত্যেক আগত বস্তুই নিকটবর্তী।

٤١. يَوْمَ ظَرْفٌ لِعَذَابًا بِصِفَتِهٖ يَنْظُرُ الْمَرْءُ كُلُّ اَمْرِءٍ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا حَرْفُ تَنْبِيْهٍ لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا يَعْنِيْ فَلَا اُعَذَّبُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ عِنْدَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْبَهَائِمِ بَعْدَ الْاِقْتِصَاصِ مِنْ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ كُوْنِيْ تُرَابًا .

৪১. সেদিন এটি সমুদয় বিশেষণসহ عَذَابٌ -এর ظَرْف লোকেরা প্রত্যক্ষ করবে প্রত্যেক লোক যা তার হস্ত যুগল অগ্রে প্রেরণ করেছে ভালো ও মন্দ হতে আর কাফের বলবে, হায় يَا অব্যয়টি حَرْفُ تَنْبِيْهٍ আমি যদি মৃত্তিকায় পরিণত হতাম। অর্থাৎ তাহলে আমি শাস্তি পেতাম না। তারা এ কথা তখন বলবে, যখন আল্লাহ তা'আলা জীব-জন্তুসমূহের পরস্পর হতে পরস্পরের প্রতিশোধ গ্রহণ শেষে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমরা মাটিতে পরিণত হও।

তাহকীক ও তারকীব

رَبّ ও اَلرَّحْمٰن শব্দদ্বয়ের মহল্লে ই'রাব : ই'রাবের দিক দিয়ে اَلرَّحْمٰنُ ও رَبّ শব্দদ্বয়ের তিনটি অবস্থা দেখা যায়–

১. উভয়টি رَفْع-এর অবস্থায় আছে, এটা ইবনে কাছীর, নাফে' ও আবূ আমর -এর পঠিত কেরাত।

২. আসিম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমের উভয়টিকে যের দিয়ে পড়েছেন।

৩. হামজা এবং কিসায়ী رَبّ-কে যের এবং اَلرَّحْمٰنُ-কে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। –[কাবীর]

প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ উভয়টি مَرْفُوْع হলে তারকীবের কয়েকটি ধরন হতে পারে। যেমন–

১. رَبُّ السَّمٰوٰتِ মুবতাদা এবং اَلرَّحْمٰنُ খবর। তারপর لَا يَمْلِكُوْنَ হতে নতুন বাক্য শুরু হয়েছে।

২. অথবা, رَبُّ السَّمٰوٰتِ মুবতাদা الرَّحْمٰن বিশেষণ (صِفَةٌ) এবং لَا يَمْلِكُوْنَ খবর হয়েছে।

৩. অথবা, هُوَ মুবতাদা উহ্য আছে এবং رَبُّ السَّمٰوٰتِ খবর, তারপর আবার মুবতাদা এবং اَلرَّحْمٰنُ খবর।

৪. অথবা, اَلرَّحْمٰن এবং لَا يَمْلِكُوْنَ মুবতাদার দু'টি খবর হিসেবে رَفْع অবস্থায় আছে।

আর যখন উভয়টিকে যের দিয়ে পড়া হয়, তখন পূর্বের رَبِّكَ হতে بَدَل ধরতে হবে। আর اَلرَّحْمٰنُ-কে صِفَةٌ বলতে হবে। আর যখন رَبّ-কে যের দিবে তখন بَدَل হিসেবে দিবে। আর اَلرَّحْمٰنُ-কে পেশ দিবে مُبْتَدَأٌ হিসেবে, ঐ সময় لَا يَمْلِكُوْنَ শব্দ اَلرَّحْمٰن মুবতাদার খবর হবে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ : ذٰلِكَ ইসমে ইশারা মুবতাদা, اَلْيَوْم হলো খবর এবং اَلْحَقُّ শব্দটি اَلْيَوْم-এর সিফাত বা বিশেষণ। অথবা, ذٰلِكَ ইসমে ইশারা এবং اَلْيَوْمُ মুশারুন ইলাইহ, উভয়টি মিলে মুবতাদা এবং اَلْحَقُّ খবর। –[ফাতহুল কাদীর]

يَوْمَ يَنْظُرُ আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব : এখানে يَوْمَ শব্দটি عَذَابٌ শব্দ হতে بَدَل অথবা একটি উহ্য ضَمِيْر-এর ظَرْف হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। তখন উহ্য বাক্য এভাবে হবে, ... عَذَابًا كَائِنًا يَوْمَ অথবা قَرِيْبًا-এর ظَرْف হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের আয়াতের সাথে বর্তমান আয়াতের যোগসূত্র : সূরার প্রথমে অবিশ্বাসীদের জন্য ব্যাপক ধমকের কথা আলোচনা হয়েছে। তারপর মুত্তাকীনদের জন্য বিভিন্ন ওয়াদার কথা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান আয়াত رَبُّ السَّمٰوٰتِ দ্বারা সে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ..... خِطَابًا" : আলোচ্য আয়াতে মূলত কিয়ামতের বিচার ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহ তা'আলার দানশীলতা ও দয়া দাক্ষিণ্যের উল্লেখ করা হয়েছিল। আর অত্র আয়াতে এর পাশাপাশি আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বিশালত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব এমনভাবে প্রকাশ পাবে যে, কেউ তাঁর সামনে টু শব্দটি করার সাহস পাবে না। আল্লাহর আদালতের সামনে কেউই মুখ খোলার সাহস করবে না। কাজেই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত আপনা হতে কেউই কিছু বলবে না।

বক্ষ্যমাণ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি গুণের বিশেষ তাৎপর্য এবং বর্ণিত বিষয়ের সাথে সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। সুতরাং رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا অর্থাৎ আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় বস্তু নিচয়ের মালিক ও প্রতিপালক দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই কিয়ামত ও হাশর দিনের যাবতীয় কার্য পরিচালনায় সক্ষম। رَحْمٰن-এর দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়া করতে সেদিন বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না। لَا يَمْلِكُوْنَ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবেন– আল্লাহর আদালতে এমন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করবে যে, কি আসমানবাসী আর কি জমিনবাসী কেউই তাঁর

সামনে মুখ খোলার সাহস করবে না বা বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করার প্রয়াস পাবে না। অবশ্য পরবর্তী আয়াতে আলোচ্য বক্তব্যের জের টেনে বলা হয়েছে إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ অর্থাৎ 'তবে দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন।' যা হোক আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুমতি দিবেন সে-ই কেবল সুপারিশ করতে পারবে। কেউ স্বাধীনভাবে আপনা হতে সুপারিশ করতে পারবে না। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী তিনিই যে প্রকৃত প্রভু, পুরস্কার ও প্রতিদানদাতা এবং সম্মানের উচ্চাসনের সমাসীন– আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ ও দাপট এমনভাবে প্রকাশ পাবে আসমান জমিনের কেউই তাঁর সামনে মুখ খোলার কিছু বলার কিংবা বিচারকার্যে হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র সাহস করবে না। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

يَمْلِكُونَ-এর সর্বনামের মারজি' : يَمْلِكُونَ-এর মারজি' নিয়ে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বনামটি মুশরিকদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অতএব, মুশরিকগণ আবেদন করার শক্তি রাখবে না, কিন্তু মু'মিনগণ সুপারিশ করবে এবং আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন।

২. অথবা, মু'মিনদের দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ এই দাঁড়াবে যে, মু'মিনগণ কোনো ব্যাপারে আবেদন করতে পারবে না। কেননা যখন একথা প্রমাণিত যে, তিনি ন্যায় বিচারক, তখন কাফেরদের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, তাও ন্যায্য, তাদের হক নষ্ট করা হয়নি। অতএব, কেন তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে? –এই মতটি প্রথম মতের চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা এ আয়াতের পূর্বে মু'মিনদের উল্লেখ হয়েছে, কাফেরদের নয়।

৩. অথবা সর্বনামটি أَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টজীব। আর এ মতটি সর্বাধিক গ্রহণীয়, কেননা কোনো মাখলুক ঐ দিন আল্লাহকে সম্বোধন করে কিছু বলার সাহস রাখবে না। তবে সুপারিশ করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা এটা আল্লাহরই অনুমতিক্রমে করা হবে। لَا يَمْلِكُونَ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুপারিশ মানুষ বা কোনো মাখলুকের মালিকানায় নয়। তা আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। মাখলুকের মালিকনায় হলো خِطَابٌ তারই নফী করা হয়েছে। –[কাবীর]

শুধুমাত্র مَلَائِكَةٌ-এর উল্লেখ করার কারণ : সম্মান ও মার্যাদার দিক দিয়ে ফেরেশতাগণ অন্যান্য মাখলুক হতে অধিক মর্যাদার অধিকারী, শক্তি ও সাহসের দিক দিয়ে প্রাচুর্যতার শীর্ষে অবস্থিত, এতদসত্ত্বেও তাঁরা হাশরের ময়দানে আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সামনে বিনীত হওয়ার কারণে টু শব্দ পর্যন্ত করতে পারবে না। ফেরেশতাদের যদি এ অবস্থা হয়, অন্যদের তো কোনো কথাই নেই। অন্যদের কি অবস্থা হবে, তা সহজেই বুঝা যায়। –[কাবীর]

رُوْحٌ-এর অর্থ নিয়ে মতভেদ : কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আয়াতে اَلرُّوْحُ শব্দের অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে সমস্ত ফেরেশতাদের মধ্য হতে এমন একজনকে رُوْحٌ বলা হয়েছে। তিনি সপ্তাকাশ, সপ্ত জমিন এবং সমস্ত পাহাড়সমূহ হতে বড়।

২. ইমাম শা'বী, যাহ্হাক এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.)-এর মতে اَلرُّوْحُ বলে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।

৩. আবূ সালেহ এবং মুজাহিদ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ সৈন্যদলকে رُوْحٌ বলা হয়েছে, ফেরেশতাগণ নয়।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল (রা.) বলেন, رُوْحٌ বলতে ফেরেশতাদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত পাহারাদারদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৫. ইবনে আবী মুজাইহ্র মতে رُوْحٌ বলতে ফেরেশতাদের পাহারাদারদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৬. হাসান এবং কাতাদাহ (র.) বলনে, رُوْحٌ বলতে বনী আদমকে বুঝানো হয়েছে।

৭. আতিয়্যা আল-আওফী (র.) বলেন, রূহ হলো বনী আদমের রূহ। তারা একটি সারিতে দাঁড়াবে এবং ফেরেশতাগণ একটি সারিতে দাঁড়াবেন। আর এটা হবে দুই نَفْخَةٌ-এর মধ্যবর্তী সময়ে এবং শরীরে রূহকে ফেরত দেওয়ার পূর্বে।

৮. যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, رُوْحٌ বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে।

–[ফাতহুল কাদীর, কাবীর, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

৯. কারো মতে আদম (আ.) অবয়বে এমন এক সৃষ্টি যা বণী আদম নয়। –[কাবীর]

১০. আবুশ শেখ হযরত আলী (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, রূহ হলো একজন ফেরেশতা। যার সত্তর হাজার মুখ রয়েছে। প্রত্যেক মুখে সত্তর হাজার জিহ্বা রয়েছে। আর প্রত্যেক জিহ্বায় সত্তর হাজার ভাষা রয়েছে। সে সমস্ত ভাষায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে।

১১. আবুশ শেখ আতা (র.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, রূহ একজন ফেরেশতা যার দশ হাজার বাহু রয়েছে এবং এটাও বর্ণিত আছে যে, দৈহিক দিক থেকে ফেরেশতাদের মধ্যে রূহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

১২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রূহ আল্লাহর সৈন্যদের মধ্যে একটি সৈন্যের দল যা ফেরেশতা নয়, তার মাথা আছে হাত পাও আছে এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। -[নূরুল কোরআন]

إِلَّا مَنْ أَذِنَ (الاية) আয়াতে মুস্তাছনা মিনহু : مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর ব্যাপারে দু'টি মত দেখা যায়-

১. مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো اَلرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ তখন অর্থ এভাবে হবে যে, রূহ এবং ফেরেশতাগণ কোনো কথাই বলবে না, হ্যাঁ, তখন বলবে যখন আল্লাহ তাদের মধ্য হতে কাউকে কথা বলার অনুমতি দিবেন।

২. مُسْتَثْنٰى مِنْهُ শুধু 'মালাইকা' নয়; বরং সকল আকাশ ও জমিনবাসী। তখন অর্থ হবে এই যে, আকাশ ও জমিনবাসীদের মধ্য হতে কেউ কোনো কথা বলবে না, হ্যাঁ তখন বলবে, যখন আল্লাহ তাদের মধ্য হতে কাউকেও কথা বলার অনুমতি দিবেন। -[কাবীর]

وَقَالَ صَوَابًا -এর উল্লেখ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে প্রথমে কেউ কোনো কথা বলার সাহস করবে না; কিন্তু যখন অনুমতি মিলবে, তখন স্বভাবত আল্লাহর সামনে সত্য ও যথার্থ কথাই বলবে। অতএব, وَقَالَ صَوَابًا বলার প্রয়োজন ছিল না বলে বুঝা যায়। কোন ধরনের ফায়দাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা وَقَالَ صَوَابًا বলেছেন? এ প্রশ্নের দু'টি জবাব হতে পারে।

১. করুণাময় আল্লাহ সাধারণভাবে কথা বলার অনুমতি প্রদান করবেন। অনুমতি প্রাপ্তির পর তারা সত্য ব্যতীত কোনো কথাই বলবে না। মনে হয় যেন আয়াতের মূল বক্তব্য এই যে, তারা কোনো কথা-ই বলবে না তবে অনুমতি পাওয়ার পর বলবে। এ অনুমতি পাওয়ার পর সত্য বলারই চেষ্টা করবে। এটা তাদের যথার্থ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ বৈ আর কিছু নয়।

২. অথবা, উহ্য বাক্য এভাবে হবে যে, لَا يَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا فِيْ حَقِّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا অর্থাৎ ঐ সে ব্যক্তির ব্যাপারেই শুধু সুপারিশ করা যাবে, যার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহ দিবেন এবং ঐ ব্যক্তি যথার্থ সত্য বলা লোকদের মধ্য হতে হবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ-এর সত্য বাণী উচ্চারণ করে মু'মিন হয়েছিল, কিন্তু পাপকার্য করে পাপী হয়ে গেছে। -[কাবীর]

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ এর মর্মার্থ : اَلْيَوْمَ শব্দটির সঙ্গে একটি বিশেষ বিশেষণ যোগ করা হয়েছে যে, তা اَلْحَقُّ বা যথার্থ সত্য। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. কেননা ঐ দিন সর্বপ্রকার সত্য প্রকাশিত হবে এবং সর্বপ্রকার প্রকার অসত্য বিলুপ্ত হবে। যেহেতু সকল সত্য ঐ দিনে প্রকাশিত হবে সেহেতু ঐ দিনকেই হক বা সত্য বলা হয়েছে। যেমন- কোনো ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশ দিক ভালো বুঝাতে বলা হয় فُلَانٌ خَيْرٌ كُلُّهُ অতএব, ঐ দিনটিই প্রকৃত সত্য, ঐ দিন ছাড়া সব দিনই বাতিল। কেননা দুনিয়ার দিনগুলো অধিকাংশই বাতিল।

২. অথবা, اَلْحَقُّ শব্দের অর্থ এখানে اَلثَّابِتُ অর্থাৎ মওজুদ। এ অর্থেই আল্লাহর ব্যাপারে বলা হয়- إِنَّ اللّٰهَ حَقٌّ অর্থাৎ তিনি মওজুদ আছেন, কোনো সময় তিনি ধ্বংস হবেন না। এমনিভাবে يَوْمَ الْقِيَامَةِও হক এবং মওজুদ হবে, ধ্বংস হবে না।

৩. অথবা, অর্থ এভাবে হবে যে, ঐ দিনটিই দিন হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা এ দিন সকল কিছু উদ্ঘাটিত হবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার দিনগুলোতে ঐসব ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ গোপন থাকে। এমতাবস্থায় اَلْحَقُّ অর্থ اِسْتِحْقَاقٌ [যোগ্যতা] ধরা হয়েছে। -[কাবীর]

فَمَنْ -এ فَاءٌ -এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলার বাণী فَمَنْ شَاءَ তে যেই فَاءٌ রয়েছে, এটা একটি উহ্য শর্তের جَزَاءٌ হয়েছে। এরে আরবি ভাষায় اَلْفَاءُ الْفَصِيْحَةُ বলা হয়ে থাকে। উহ্য বাক্য এভাবে বলা যায়- اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَمَا ذُكِرَ مِنْ تَحَقُّقِ الْاَمْرِ الْمَذْكُوْرِ لَا مُحَالَةَ فَمَنْ شَاءَ .... -[রূহুল মা'আনী]

مَآبًا শব্দের অর্থ : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, مَآبًا اَىْ سَبِيْلًا অর্থাৎ পথ। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে- এখন যার ইচ্ছা নিজে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করার পথ গ্রহণ করুক।

অন্যান্য মুফাসসিরদের মতে مَآبًا-এর অর্থ مَرْجِعًا প্রত্যাবর্তন স্থল। তখন পূর্ণ অর্থ করতে হলে رَبِّه-এর পূর্বে ثَوَابُ শব্দ مُضَافٌ হিসেবে উহ্য মানতে হবে, উহ্য বাক্য এভাবে হবে, فَمَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ مَرْجِعًا اِلٰى ثَوَابِ رَبِّه فَلْيَفْعَلْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার রবের নিকট ছওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আমলের মাধ্যমে গমন করতে চায় সে যেন তা করে।

ثَوَابُ শব্দ কেন উহ্য ধরা হয় এ ব্যাপারে বলা হয় যে, আল্লাহর ذَاتُ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়, বিধায় ثَوَابُ শব্দ উহ্য ধরে অর্থ করতে হয়। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, সাফওয়া]

عَذَابٌ قَرِيْبٌ-এর মর্মার্থ : 'নিকটতম আজাব'-এর মর্মার্থ নিরূপণ করতে গিয়ে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন-

১. অধিকাংশ মুফাসসিরগণ কিয়ামতের বা আখেরাতের শাস্তিকে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ অর্থের উপর একটি প্রশ্ন জাগে যে- عَذَابًا قَرِيْبًا তথা 'সন্নিকটবর্তী শাস্তির' ভয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমসাময়িক কালের মক্কার কাফেরদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছিল তারপর অদ্যাবধি প্রায় দেড় হাজার বছর সময়কাল অতীত হয়ে গেছে। এখনো বলা যায় না যে, কিয়ামত কখন বা কত সহস্র বছর পরে অনুষ্ঠিত হবে। তাহলে কেনইবা 'অতি নিকটবর্তী শাস্তি' বলে উল্লেখ করা হলো। আর সূরার শুরুতে কেনবা 'অতিশীঘ্রই জানতে পারবে' বলে বলা হলো। তফসীরে আযিযীতে বর্ণিত হয়েছে- এখানে عَذَابًا قَرِيْبًا দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর 'আলমে বরযখের' শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, মানুষ যতদিন এ দুনিয়ায় স্থান ও কালের সীমার মধ্যে দৈহিকভাবে জীবন যাপন করছে, কেবল ততদিনই তাদের সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকবে। মৃত্যুর পর যখন কেবল রূহই অবশিষ্ট থাকবে তখন সময় ও কালের কোনো চেতনা থাকবে না। কিয়ামতের দিন মানুষ যখন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে, তখন তাদের মনে হবে এইমাত্র কেউ তাদেরকে গভীর নিদ্রা হতে জাগিয়ে দিয়েছে। তারা যে হাজার হাজার বছর মৃত থাকার পর পুনরায় জীবিত হয়েছে সে অনুভূতি তাদের মোটেই থাকবে না।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, দুরবর্তী বস্তু তো তাই যা অতীত হয়ে গেছে, আর নিকটবর্তী বস্তু হলো তাই, যা এখনো আসার অপেক্ষায় রয়েছে। অতএব, কিয়ামতের শাস্তি আসবেই, এ কারণে একে নিকটতম শাস্তি বলা হয়েছে।

অথবা, আল্লাহর কাছে এটা অতি নিকটে তাই عَذَابًا قَرِيْبًا বলা হয়েছে।

অথবা, আখেরাতের জীবন মৃত্যু হতে শুরু হয়। আর মৃত্যু নিকটবর্তী বলে সবাই বিশ্বাস করে।

২. হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, عَذَابًا قَرِيْبًا বলতে 'আযাবে দুনিয়া'কে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা আখেরাতের আজাবের তুলনায় অতি নিকটবর্তী।

৩. হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, عَذَابًا قَرِيْبًا বলে বদরের প্রান্তরে কুরাইশ বাহিনীর চরম শোচনীয় পরাজয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

يَنْظُرُ الْمَرْءُ-এর মধ্যস্থ اَلْمَرْءُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَرْءُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের তিনটি অভিমত দেখা যায়-

১. اَلْمَرْءُ দ্বারা عَامٌ ভাবে সকলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, যদি ব্যক্তির সামনে মুত্তাকীনদের আমল পেশ করা হয়, তাহলে সে উত্তম প্রতিদানই পাবে। আর যদি কাফিরদের আমল পেশ করা হয়, তাহলে শুধু শাস্তিই তার জন্য অবধারিত। অতএব, এ দুটি ব্যাপার ছাড়া হাশরের ময়দানে অন্য কোনো ব্যাপার বা ব্যবস্থা দেখা যাবে না।

২. হযরত আতা (র.) বলেন اَلْمَرْءُ দ্বারা কেবল কাফেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মু'মিন যেমন পেশকৃত আমলের অপেক্ষা করবে তেমনি আল্লাহর ক্ষমা এবং করুণারও প্রত্যাশা করবে। আর কাফের তো শুধু আজাবই দেখতে পাবে। সে অন্য কিছুই দেখতে পাবে না; বরং দেখতে পাবে শুধু তার দুনিয়ার কৃতকর্ম। কেননা যে আজাব তার কাছে আসবে, তা তার বদ কর্মেরই ফলাফল।

৩. হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.) বলেন, اَلْمَرْءُ বলতে মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। তাঁরা এ মতের পক্ষে দু'টি দলিল পেশ করে থাকেন–

ক. কেননা, আল্লাহ তা'আলা এ কথার পর পরই বলেছেন وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا এটা যদি কাফেরদের অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে এ কথার পূর্বে নিশ্চয় মু'মিনদের অবস্থার বর্ণনা হবে। অতএব, اَلْمَرْءُ দ্বারা মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে।

খ. মু'মিন যখন ভালো-মন্দ উভয় কাজই করেছেন, তখন ভালো কাজের সুফল আর মন্দের জন্য ক্ষমার আশা করে অপেক্ষা করতে থাকবে। পক্ষান্তরে কাফের শুধু মন্দই করেছে, অতএব তার জন্য আজাব তো অবধারিত। কোনো কিছুর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। –[কাবীর]

আল্লামা শাওকানী (র.) চতুর্থ একটি মত উল্লেখ করে বলেন, اَلْمَرْءُ দ্বারা উবাই ইবনে খালফ এবং উকবা ইবনে আবী মুয়ীত-কে নির্দেশ করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ "يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا" :

يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا আয়াতাংশের মর্মার্থ : কাফেরের উক্তি 'হায়' আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম এর মর্মার্থের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১. হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, চতুষ্পদ জন্তুদের পরস্পরের কেসাস গ্রহণের পর তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা মাটি হয়ে যাও।" এটা দেখে কাফেররা বলবে যে, হায় যদি আমরাও মাটি হয়ে যেতাম, তাহলে জাহান্নামের আজাব হতে মুক্তি পেতাম।

২. কেউ কেউ বলেছেন, কিয়ামতের আজাব দর্শনে কাফেররা মনে করবে যে, তাদের রূহ অবশিষ্ট থাকার দরুনই তারা আজাব ভোগ করছে। যদি তারা নিছক শরীরে বা মাটিতে পরিণত হয়ে যেত তাহলে আর আজাব অনুভব করত না।

৩. কাফের দ্বারা যদি ইবলীস উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর মর্মার্থ হবে ইবলীস আদম (আ.) ও আদম সন্তানদের আনন্দ উৎসব দেখে জ্বলে পুড়ে মরবে এবং আফসোস করে বলবে হায়! আমি যদি আগুনের তৈরি না হয়ে মাটির তৈরি হতাম।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো আমি যদি মোটেই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ না করতাম, আমাকে যদি মাটি থেকে পয়দাই করা না হতো, কিংবা মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতাম, পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠার সুযোগ না হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। কেননা তাহলে আমি আজকে যে আজাবের সম্মুখীন হয়েছি তা হতে মুক্তি পেতাম।

৫. সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, এখানে মাটি হওয়ার অর্থ হলো নম্র হওয়া এবং অহংকারী না হওয়া। অর্থাৎ কাফের সেদিন আফসোস করে বলবে 'হায়' আমরা যদি দুনিয়ায় অহংকারী না হতাম, আল্লাহ ও রাসূলের কাছে মাথা নত করে দিতাম, তাহলে আজ এ কঠোর আজাবের সম্মুখীন হতাম না।

৬. আল্লামা বাগাবী (র.) বলেন, যিয়াদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন ফয়সালা করে ফেলবেন এবং জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং দোজখীদেরকে দোজখে প্রেরণ করার আদেশ দিয়ে দেবেন এবং অন্যান্য জীব জন্তুর ব্যাপারেও মীমাংসা দিয়ে দেবেন এবং তারা মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে তখন কাফেররা বলবে, হায়! আফসোস যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ : সূরা আন-নাযি'আত

সূরাটির নামকরণের কারণ : اَلنَّازِعَاتُ শব্দ نَزْعٌ হতে নিষ্পন্ন। نَازِعٌ-এর বহুবচন نَازِعَاتٌ-এর আভিধানিক অর্থ- আকর্ষণকারীগণ, সজোরে কোনো বস্তুকে টেনে আনয়নকারীগণ। সূরাটি نَازِعَاتٌ শব্দ যোগে শুরু করা হেতু এর নামকরণ হয়েছে اَلنَّازِعَاتُ। এ ছাড়া এ সূরার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন- طَامَّةٌ ও سَاهِرَةٌ এ সূরায় ২টি রুকু', ৪৬টি আয়াত, ১৭৩টি বাক্য এবং ৯৫৩টি অক্ষর রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামত দিবসের আজাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা শপথ করে বলেছেন যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করে তাদের শাস্তির ঘোষণা এসেছে, আর অত্র সূরায় শপথ করে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন, এর পাশাপাশি এ কথাও ইরশাদ হয়েছে যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা হককে বাতিলের উপর বিজয়ী করেন। এ মর্মে হযরত মূসা (আ.) -এর ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে, কিভাবে হযরত মূসা (আ.) অহংকারী ফেরাউনকে সত্য গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন এবং কিভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন। -[বাহ্‌রুল মুহীত]

শানে নুযূল : হিজরতের পূর্বে যেসব অকাট্য প্রমাণসহ আয়াত নাজিল হয়েছিল মক্কার হঠকারী কাফেররা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির ফলে ঐ সকল আয়াত বিশ্বাস করত না এবং এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করত না। অথচ কিয়ামতের ধ্বংস-প্রলয় সম্পর্কে বারবার তাদেরকে বলা হচ্ছিল। আল্লাহর অসীম কুদরতের কথাও তাদের নিকট বারবার বিবৃত হচ্ছিল। তবু তারা বলত কিয়ামত হবেই এ কথাটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরা নাজিল করে কিয়ামতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে প্রমাণ করেন। -[মা'আলিম]

সূরাটির ফজিলত : সূরা আন-নাযি'আত দুশমনের সামনে পাঠ করলে তার শত্রুতা এবং অনিষ্টতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে উক্ত সূরাটি তেলাওয়াত করতে দেখে অথবা এমনিতেই দেখে, তার অন্তর হতে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়। -[নূরুল কুলূব]

একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে যে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আন-নাযিরাত সর্বদা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে কবর ও হাশরে এত আরামে রাখবেন যে, তার মনে হবে, সে যেন এই মাত্র এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় পরিমাণ তথায় অবস্থান করেছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় কিয়ামত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং এর সংশ্লিষ্ট কতিপয় অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

সুতরাং জান কবজকারী, আল্লাহর হুকুম অবিলম্বে পালনকারী ও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এরূপ কথা দ্বারা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে। মৃত্যুর পর অন্য এক জীবন অবশ্যই যাপন করতে হবে। উক্ত দু'টি বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা যেসব ফেরেশতার হাতে এখানে জান কবজ করানো হচ্ছে, তাদের হাতেই পুনরায় তাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার করানো কঠিন কিছু নয়। যে ফেরেশতারাই সেদিন সে আল্লাহর হুকুম মোতাবেকই সমস্ত সৃষ্টি লোকের বর্তমান শৃঙ্খলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নতুনভাবে অপর একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয় যে, একটি ধাক্কায় বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আর তার পুনরুজ্জীবনের জন্যও একটি ধাক্কারই প্রয়োজন মাত্র। আজ যারা এর অস্বীকার করছে তাদের চোখের সামনেই তা সংঘটিত হবে, তখন তারা ভীত-বিহবল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাসূলকে অবিশ্বাসকারী, হেদায়েতকে অস্বীকারকারী এবং রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা তাদের উক্ত অপকর্মসমূহ বর্জন করত হেদায়েতের পথে না আসে তাহলে তাদেরকে ফেরাউনের ন্যায় মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

পুনরায় জীবিত হওয়ার দলিল পেশ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে–তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা কঠিন কাজ; কিংবা মহাশূন্যে অসংখ্য কোটি গ্রহ-নক্ষত্রসহ বিস্তীর্ণ এ বিরাট-অসীম বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর পক্ষে এ কাজটি করা কঠিন ছিল না– তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? পরকাল হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণের জন্য এ অকাট্য যুক্তি একটি কার্যে সমাপ্ত করা হয়েছে। তারপর পৃথিবী এবং তাতে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রদত্ত সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এখানে প্রতিটি জিনিসই উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করছে, এটা অতি উচ্চ কর্মকুশলতা সহকারে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ হতে মানুষের বিবেকের নিকট একটি অতি বড় প্রশ্ন রাখা হয়েছে। তা এই যে, এ সুবিশাল সৃষ্টিলোকে মানুষকে ক্ষমতা এখতিয়ার দেওয়ার পর তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত মনে হয় না। পৃথিবীতে যথেচ্ছা বিচরণ করা ও স্বেচ্ছাচারিতা করে মৃত্যুবরণ করা ও মাটির সাথে চিরতরে মিলেমিশে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিভাবে প্রয়োগ করেছে, কিভাবে পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উপর কোনোরূপ আলোচনা ব্যতীতই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে মানুষের স্থায়ী ফয়সালা হয়ে যাবে। আর তা এ ভিত্তিতে হবে যে, কে দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-বিলাসকেই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছে? পক্ষান্তরে কে স্বীয় প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়ে নাফরমানদের কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসাকে সামলিয়েছে? সুতরাং যে ব্যক্তি হঠকারিতা পরিহার করে বিশ্বাসী অন্তর নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা করবে সে আপনা হতেই উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব পাবে। কেননা বিবেক, যুক্তি ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে মানুষের উপর কোনো দায়িত্ব অর্পণের অর্থ এই যে, পরিশেষে তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, এর হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তার সফলতার কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পক্ষান্তরে ব্যর্থতার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

পরিশেষে কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? জবাবের সারমর্ম এই যে, পয়গাম্বরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পয়গাম্বরের দায়িত্ব তো শুধু সতর্ক করে দেওয়া যে, সেদিন অবশ্যই আসবে। কখন আসবে তা জানা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বের বিষয় হলো, তোমরা এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সুতরাং যার মনে চায় সে একে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করে নিক। আর যার ইচ্ছা সে যথেচ্ছভাবে সময় কাটিয়ে দিক। যখন বিচারের দিন সমাগত হবে, তখন যারা এ পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে বসেছিল, তারা অনুভব করবে যে, দুনিয়াতে তারা মাত্র কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিল। তখন তারা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে যে, দুনিয়ার অল্প কয় দিনের জীবনের সুখ-শান্তির মোহে পড়ে কিভাবে ভবিষ্যতের স্থায়ী শান্তিকে খুইয়ে বসেছিল।

سُوْرَةُ وَالنَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আন-নাযি'আত মক্কায় অবতীর্ণ

سِتٌّ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً : ৪৬ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. وَالنّٰزِعٰتِ الْمَلٰۤئِكَةِ تَنْزِعُ اَرْوَاحَ الْكُفَّارِ غَرْقًا نَزْعًا بِشِدَّةٍ.

১. শপথ উৎপাটনকারীদের সে ফেরেশতাদের যারা কাফেরদের রূহ উৎপাটন করবে নির্মমভাবে কঠোরভাবে উৎপাটন করার মাধ্যমে।

২. وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا الْمَلٰۤئِكَةِ تَنْشِطُ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ تَسُلُّهَا بِرِفْقٍ.

২. আর যারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্তকারী সে ফেরেশতাগণ যারা মু'মিনদের রূহকে সন্তুষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ সহজভাবে তাদের রূহকে বের করে নেয়।

৩. وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا الْمَلٰۤئِكَةِ تَسْبَحُ مِنَ السَّمَاۤءِ بِاَمْرِهٖ تَعَالٰى اَىْ تَنْزِلُ.

৩. আর যারা সন্তরণে সন্তরণকারী সে ফেরেশতারা যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে আকাশ হতে সন্তরণ করে অর্থাৎ অবতরণ করে।

৪. فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا اَىِ الْمَلٰۤئِكَةِ تَسْبِقُ بِاَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى الْجَنَّةِ.

৪. এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে অর্থাৎ সে ফেরেশতাগণ যারা মু'মিনগণের রূহকে নিয়ে বেহেশত পানে ছুটে যায়।

৫. فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا الْمَلٰۤئِكَةِ تُدَبِّرُ اَمْرَ الدُّنْيَا اَىْ تَنْزِلُ بِتَدْبِيْرِهٖ وَجَوَابُ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ مَحْذُوْفٌ اَىْ لَتُبْعَثُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ وَهُوَ عَامِلٌ فِىْ.

৫. অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে সে ফেরেশতারা যারা পার্থিব কর্মকাণ্ড নির্বাহ করে। অর্থাৎ এরা নির্বাহ উদ্দেশ্যে অবতরণ করে। আর এ সকল শপথের জবাব উহ্য। অর্থাৎ لَتُبْعَثُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ "অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে, হে মক্কাবাসী কাফেরগণ!" আর তাই পরবর্তী আয়াত মধ্যকার يَوْمَ -এর মধ্যে عَامِلٌ

তাহকীক ও তারকীব

غَرْقًا-এর মহল্লে ই'রাব : غَرْقًا শব্দটি তারকীবে মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসুব হয়েছে। মূলবাক্যটি এভাবে ছিল যে, وَالنَّازِعَاتِ اَىِ النُّفُوْسُ النَّازِعَاتُ الَّتِىْ تُغْرِقُ اِغْرَاقًا (فَحُذِفَتِ الزَّوَائِدُ وَبَقِىَ غَرْقًا) এখানে মূলে اِغْرَاقًا ছিল, অতিরিক্ত বাবে اِفْعَالٌ-এর হরফগুলোকে হযফ করে غَرْقٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

অথবা, غَرْقٌ শব্দটি حَالٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

قوله "وَالنّٰزِعٰتِ الخ" : وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا এটা একটি বাক্য। এখানে وَاوْ কসমের জন্য اَلنَّازِعَاتُ শিবহে ফে'ল, هِيَ সর্বনাম এতে ফায়েল এবং غَرْقًا মাফউলে মুতলাক। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে কসম হয়েছে। لَتُبْعَثُنَّ উহ্য ক্রিয়াটি কসমের জবাব। কসম ও জবাবে কসম মিলে جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে। [অন্যান্য বাক্যগুলোর তারকীবও একই রূপ হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا" আল্লাহ তা'আলা এখানে সে সকল ফেরেশতার শপথ করেছেন, যারা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে কাফেরদের আত্মসমূহ টেনে-হেঁচড়ে বের করে আনেন।

اَلنَّازِعَاتُ-এর অর্থ : اَلنَّازِعَاتُ শব্দটি اَلنَّازِعُ-এর বহুবচন। মুফাস্সিরগণ -এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে اَلنَّازِعَاتُ-এর দ্বারা এখানে যোদ্ধা এবং তীরন্দাজদের বুঝানো হয়েছে।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর মতে কাফেরদের দেহের গভীরে পৌছে প্রতিটি ধমনি, প্রতিটি লোমক, প্রত্যেকটি নখ এবং প্রত্যেকটি পায়ের পাতা হতে অতি কঠোরভাবে প্রাণ টেনে বের করে। আবার ফেরত দেয় আবার বের করে, এভাবে টানা-হেঁচড়া করে তাদের রূহ কবজ করা হয়।

৩. কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, মালাকুল মউত কাফেরদের প্রাণকে রগসহ টেনে বের করেন।

৪. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে اَلنَّازِعَاتُ দ্বারা সেসব ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে, যারা অতি কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা সহকারে কাফেরদের আত্মা টেনে বের করে; তাদের রূহ কবজ করেন।

نَزْعٌ-এর অর্থ হলো কঠোরতার সাথে টেনে বের করা। আর غَرْقًا-এর অর্থ– অতি কঠোর। অথবা غَرْقًا-এর দ্বারা ডুবে তথা দেহের গভীরে পৌছে রূহকে টেনে আনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, نَزْعٌ এমনভাবে সম্পন্ন হবে যা অন্যদের দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরি নয়। কাজেই কোনো সময় মৃত্যুযন্ত্রণা পরিলক্ষিত হয় আবার কোনো সময় পরিলক্ষিত হয় না। এতে বলার জো নেই যে, কাফেরদের মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না; বরং আত্মার উপর সকল শাস্তি অতিবাহিত হয় বলে অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারে না। –[কামালাইন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, নূরুল কোরআন]

اَلنَّاشِطَاتِ শব্দের মর্মার্থ : اَلنَّاشِطَاتُ শব্দটি نَشْطٌ শব্দ হতে নির্গত। نَشْطٌ শব্দটির অর্থ হলো– বন্ধন খুলে দেওয়া। এ সমস্ত ফেরেশতাদেরকে نَاشِطَاتٌ বলা হয়েছে, যারা মানব শরীর হতে সহজে তাদের নফসকে বের করে আনে। যেমন– উটের পা হতে রশি খুলে আনা হয়।

আবার نَاشِطٌ ঐ বন্য ষাঁড়কে বলা হয়, যা একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যায়। অর্থাৎ যথা ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়ায়। যোদ্ধারা যুদ্ধ যাত্রার পর এবং গন্তব্যস্থানে পৌছবার পূর্বে পথিমধ্যে যে গনিমতের মাল হস্তাগত হয়, তাকেও 'নাশিতা' বলা হয়। অমুক লোক ডোল দ্বারা কূপ হতে পানি নাশত করল– অর্থাৎ ডোল কূপ হতে সহজে উঠে আসল।

এখানে نَاشِطَاتٌ দ্বারা মু'মিনের রূহ কবজকারী ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। তথা তারা অতি সহজে অনায়াসে মু'মিনের রূহকে কবজ করে নেন, কোনোরূপ কঠোরতা করে না। –[মা'আরিফুল কুরআন]

ফেরেশতাদরকে نَاشِطَاتٌ -এর সাথে তুলনা করার কারণ : সহজতার দিক থেকে ঈমানদারদের রূহ বের করাকে نَاشِطَاتٌ -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, যে সকল ফেরেশতাকে ঈমানদারদের রূহ বের করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা অতি সহজে তাদের রূহ বের করে নিয়ে যায়, কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না। এ সহজতা যদিও দেখা যায় না, কিন্তু মু'মিন ব্যক্তির রূহ তা অনুভব করে। অনেক সময় মু'মিনের মৃত্যুর সময় কষ্ট পেতে দেখা যায়, যদিও বাহ্যত কষ্ট দেখা যায়; কিন্তু তা কষ্ট নয়। মৃত্যুর সময় মু'মিনের সামনে বেহেশত তুলে ধরা হয়, এ কারণে তাদের রূহ তাড়াতাড়ি সেদিকে যাওয়ার জন্য পাগল প্রায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাফেরদের সামনে দোজখের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত করা হয়, তাই তাদের রূহ শরীর হতে বের হতে চায় না জোর করে বের করতে হয়। –[মাযহারী, কুরতুবী]

اَلسَّابِحَاتُ -এর মর্মার্থ : اَلسَّابِحَاتُ শব্দটি سَبْحٌ থেকে নির্গত। سَبْحٌ অর্থ সাতার কাটা। আয়াতে سَابِحَاتٌ বলতে ঐ সমস্ত ফেরেশতারাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা রূহ বের করার জন্য শরীরের রগরেষায় বিচরণ করে থাকে। যেমন সমুদ্রের অতল গভীরে অবস্থিত মণি-মুক্তা সংগ্রহকারী সমুদ্রে সহজে বিচরণ করে থাকে।

ক. হযরত আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), মুজাহিদ (র.), সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবূ সালিহ (র.) প্রমুখগণের মতে اَلسَّابِحَاتِ-এর দ্বারা সে সকল ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর হুকুম পালনে এত দ্রুত গতিশীল ও তড়িৎকর্মী যে, মনে হয় তারা মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।

খ. কারো কারো মতে سَابِحَاتٌ -এর দ্বারা ঐ সমস্ত ফেরেশতারাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা রূহ বের করার জন্য শরীরের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে থাকে। যেমন সমুদ্রের অতল গভীরে অবস্থিত মণি-মুক্তা সংগ্রহের জন্য ডুবুরিগণ সহজেই সমুদ্রে বিচরণ করে থাকেন।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর سَابِحَاتٌ-এর দ্বারা মু'মিনগণের ঐ সমস্ত আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর দিকে যাওয়ার জন্য দ্রুত ভ্রমণ করতে চায়।

ঘ. হযরত আতা (র.) -এর মতে سَابِحَاتٌ-এর অর্থ ঐ নৌকা বা জাহাজসমূহ যা পানিতে বিচরণ করে বেড়ায়।

ঙ. হযরত মুজাহিদের এক বর্ণনা অনুযায়ী এটা ঐ মৃত্যু যা বনূ আদমের নাফসে ভ্রমণ করে।

চ. কেউ কেউ বলেছেন, দ্রুতগতিশীল ঘোড়াকে سَابِحَاتٌ বলে।

ছ. হযরত মুজাহিদ (র.) ও আবূ সালিহ (র.) হতে অন্যমত অনুযায়ী তারা ঐ ফেরেশতা যারা আল্লাহর নির্দেশে আকাশ হতে অতি তাড়াতাড়ি অবতরণ করে এবং তড়িৎ গতিতে ঊর্ধ্বলোকে চলে যায়।

চ. হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.)-এর মতে سَابِحَاتٌ-এর দ্বারা সে তারকারাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ করা হয়েছে- وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ অর্থাৎ আর এরা [তারকারাজি] স্ব-স্ব কক্ষপথে গতিশীল-প্রদক্ষিণরত।

اَلسَّابِقَاتُ-এর মর্মার্থ : اَلسَّابِقَاتُ শব্দটি سَبْقٌ হতে নির্গত। তা اَلسَّابِقَةُ-এর বহুবচন। অর্থাৎ দ্রুতগামী- প্রতিযোগিতায় যারা অন্যদেরকে অতিক্রম করে যায়। এখানে এর উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. জমহুরের মতে তারা সে সকল ফেরেশতা যারা মু'মিনগণের রূহ নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে জান্নাতের দিকে ধাবিত হন।

খ. ইমাম রাযী (র.) -এর মতে سَابِقَاتٌ-এর দ্বারা মু'মিনগণের আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর পানে যাওয়ার জন্য রূহ বহনকারী ফেরেশতাদের দিকে অগ্রগামী হয়।

গ. হযরত আতা (র.) বলেন, যুদ্ধের দিকে অগ্রগামী ঘোড়াকে سَابِقَةٌ বলে।

ঘ. হযরত কাতাদাহ, হাসান ও মা'মার (র.) প্রমুখগণের মতে سَابِقَاتٌ-এর দ্বারা সে তারকারাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা ভ্রমণে একটি অপরটি হতে অগ্রগামী হয়ে যায়।

ঙ. হযরত মাসরূক ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখগণের মতে ফেরেশতাগণ শয়তানের আগে নবীগণের (আ.) ওহী নিয়ে যায়, বিধায় তাদেরকে 'আস-সাবিকাত' বলে।

চ. হযরত আবূ রাওফ (র.) বলেন, ফেরেশতাগণ যেহেতু মানুষের পূর্বে ভালো ও যোগ্য কাজ করে অগ্রগামী হয়েছিল, তাই তাদেরকে سَابِقَاتٌ বলে।

ছ. ফেরেশতারা মু'মিনদের রূহ নিয়ে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হয় বলে তাদেরকে سَابِقَاتٌ বলে। এটা হযরত মুকাতিল (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে। -[কামালাইন, কুরতুবী, কাবীর]

اَلْمُدَبِّرَاتِ-এর মর্মার্থ : ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, এ কথাটি স্বতঃসিদ্ধ যে, এখানে اَلْمُدَبِّرَاتِ বলতে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে।

ইমাম মাওয়ারদী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয় তন্মধ্যে জমহুরের অভিমত হলো মালাইকাহ বা ফেরেশতাকুল। আর মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি সাতটি তারকা বলে উল্লেখ করেছেন।

এখন যদি ফেরেশতা অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا -এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ফেরেশতাগণ হালাল-হারাম এবং সকল বিধানের বিশ্লেষণ নিয়ে আসেন, তাই তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সকল কাজের তাদবীরকারী একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু যখন ফেরেশতাগণ তা নিয়ে অবতরণ করেন, তখন তাদেরকে এ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। অথবা ফেরেশতাগণ দুনিয়াবাসীর জন্য বাতাস, বৃষ্টিসহ অন্যান্য বিষয়ের তদবীর করে থাকেন। এ তদবীর আল্লাহর নির্দেশেই হয়। তাই তাদেরকে তদবীরকারী বা আঞ্জামদাতা বলা হয়েছে।

আব্দুর রহমান ইবনে সাবাত (র.) বলেন, দুনিয়ার ব্যাপারগুলো চারজন ফেরেশতার উপর ন্যস্ত। হযরত জিবরাঈল, হযরত মীকাঈল, হযরত আযরাঈল ও হযরত ইসরাফীল (আ.)। ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) বাতাস এবং সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতার কাজে লিপ্ত, হযরত মীকাঈল (আ.) বৃষ্টি এবং গাছপালার দায়িত্বে, হযরত আযরাঈল (আ.) রূহ গ্রহণের দায়িত্বে এবং হযরত ইসরাফীল শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। ইমাম রাযী (র.) বলেন, কোনো কোনো ফেরেশতা বনী আদমের হেফাজতের দায়িত্বে রয়েছেন। তাদের মধ্য হতে একদল মানুষের কর্মকাণ্ড রেকর্ড করবার দায়িত্ব পালন করেন।
-[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

অথবা, এর দ্বারা মুজাহিদদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তথা মুজাহিদদের হাতে থাকে কামান, তারা নিজেদের শক্তি একত্রিত করে দুশমনের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, তারা সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং দুশমনের মোকাবিলায় একসাথ হয় এবং সামরিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে। -[নূরুল কোরআন]

أُمُورًا না বলে أَمْرًا বলার কারণ : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা أَمْرًا বলেছেন, أُمُورًا বলেননি। অথচ ফেরেশতাগণ অনেক কাজেরই তাদবীর বা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন একটি ব্যাপার বা একটি কাজ নয়।

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেন, এখানে أَمْر বলতে أَمْر-এর جِنْس উদ্দেশ্য। আর কোনো শব্দ দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য হলে সেখানে বহুবচনের অর্থ লুক্কায়িত থাকে। অতএব, এখানে أَمْرً বলতে جِنْس أَمْر বা সকল প্রকার أَمْر-ই উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

আল্লাহ তা'আলার কসমকৃত বিষয়সমূহের কসমের জবাব : কসমের জবাব উহ্য রয়েছে। মূলবাক্য এভাবে ছিল যে, وَالنَّازِعَاتِ ..... لَتُبْعَثُنَّ অর্থাৎ 'তোমরা পুনরুত্থিত হবেই' এ কথাটি উহ্য আছে। কেননা পরবর্তী আয়াতসমূহ হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, শপথের জবাব لَتُبْعَثُنَّ হবে।

* আর শপথের জবাব সকল শ্রোতার নিকট পরিষ্কার হওয়ার কারণে উহ্য রাখা হয়েছে।
* কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, কসমের জবাব হলো إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ইবনে আম্বারী (র.) বলেন, এ মতটি যুক্তিতে টিকে না, কেননা কসম এবং জবাবে কসমের মাঝে অনেক কথাবার্তা অতিক্রম হয়েছে।
* কারো মতে هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسٰى আয়াতটি হলো কসমের জবাব।
* কারো মতে يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ আয়াতটি হলো কসমের জবাব।

উল্লিখিত কয়েকটি মতের মধ্য হতে প্রথম মতটিই উত্তম-গ্রহণযোগ্য। -[ফাতহুল কাদীর]

আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত ফেরেশতাগণের শপথ করেছেন কেন? : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত কয়টিতে বিভিন্ন প্রকারের ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অন্য কথায় বিভিন্ন শ্রেণির ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে, যদিও অনুরূপ তাফসীর স্বয়ং নবী করীম ﷺ হতে সরাসরি বর্ণিত হয়নি তথাপি কতিপয় বড় বড় সাহাবী ও তাঁদের শাগরেদ তাবেয়ীগণ এরূপ অর্থই বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এ অর্থ তাঁরা নবী করীম ﷺ হতে জেনেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কিয়ামত ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গে এসব ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হলো কেন? অথচ কিয়ামত ও পুনরুত্থানের মতো ফেশেতারাও ইন্দ্রিয় অগোচর- দৃষ্টি সীমার বাইরে। সুতরাং একটি অদৃশ্য বস্তুকে সাব্যস্ত করার জন্য অন্য একটি অদৃশ্য বস্তুর শপথ কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন, মক্কার কাফেররা যদিও কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত তথাপি তারা ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতারাই জান কবজ করে। তারা আরো বিশ্বাস করত, ফেরেশতাগণ অত্যন্ত তীব্র গতিসম্পন্ন। চোখের পলকে তাঁরা পৃথিবী হতে আকাশে চলে যেতে পারেন। যে কোনো কাজ তাঁরা নিমিষে সুসম্পন্ন করতে পারেন। তাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে বিশ্ব জাহানের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তারা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী ও স্বপরিচালিত নন। তাঁদের নিজস্ব মত বলতে কিছু নেই। অবশ্য মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। তারা ফেরেশতাদের ইবাদতও করত। অবশ্য ফেরেশতাদেরকে তারা বিশ্ব-জাহানের মূল পরিচালক মনে করত না।

উপরিউক্ত কারণেই কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে প্রমাণ করার জন্য উক্ত পরিচিতিসহ ফেরেশতাদের শপথ করেছেন। সুতরাং এর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা তোমাদের জান কবজ করে, তাঁরাই নির্দেশে তারা তোমাদের মধ্যে পুনরায়, প্রাণের সঞ্চার করতে পারবে। আল্লাহর হুকুমে যেমন তারা বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনার কাজ চালাচ্ছেন তারাই আবার তাঁর হুকুমেই এ বিশ্ব-জগতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছারখার করে দিবে। আল্লাহর নির্দেশেই তারা এক নবতর জগৎ নির্মাণ করবে। আল্লাহর হুকুম পালনে তারা বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবে না।

অনুবাদ :

٦. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى بِهَا يَرْجُفُ كُلُّ شَيْءٍ اَىْ يَتَزَلْزَلُ فَوُصِفَتْ بِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا .

৬. সেদিন প্রকম্পনকারী প্রকম্পিত করবে প্রথম শিঙ্গাধ্বনি দ্বারা প্রত্যেক বস্তু প্রকম্পিত হবে। অর্থাৎ কম্পমান হয়ে উঠবে। এ জন্য শিঙ্গাকে তা দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে।

٧. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ وَبَيْنَهُمَا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الرَّاجِفَةِ فَالْيَوْمَ وَاسِعٌ لِلنَّفْخَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَصَحَّ ظَرْفِيَّتُهُ لِلْبَعْثِ الْوَاقِعِ عَقِبَ الثَّانِيَةِ .

৭. একে অনুসরণ করবে পরবর্তী আগমনকারী দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি আর উভয়য়ের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। এ বাক্যটি رَاجِفَةٌ হতে حَالٌ হয়েছে, কিয়ামত দিবসে উভয় শিঙ্গাধ্বনি ও অন্যান্য ঘটনাবলি সংঘটিত হবে। সে জন্য দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির পর সে পুনরুত্থান সংঘটিত হবে, এটা তজ্জন্য ظَرْف হতে পারে।

٨. قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ خائفة قلقة .

৮. বহু অন্তর সেদিন সন্ত্রস্ত হবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে।

٩. اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ذَلِيْلَةٌ لِهَوْلِ مَا تَرٰى .

৯. এদের দৃষ্টি ভীত-বিহ্বলতায় অবনমিত হবে। ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলি দেখে ভয়ে জড়োসড় হয়ে পড়বে।

١٠. يَقُوْلُوْنَ اَىْ اَرْبَابُ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ اِسْتِهْزَاءً وَّاِنْكَارًا لِلْبَعْثِ اَئِنَّا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِى الْمَوْضَعَيْنِ لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ اَىْ اَنُرَدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ اِلَى الْحَيٰوةِ وَالْحَافِرَةُ اِسْمٌ لِاَوَّلِ الْاَمْرِ وَمِنْهُ رَجَعَ فُلَانٌ فِىْ حَافِرَتِهٖ اِذَا رَجَعَ حَيْثُ جَاءَ .

১০. তারা বলে অর্থাৎ আত্মমর্যাদা ও দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা, বিদ্রূপ ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে আমরা কি শব্দটি উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয়টিকে সহজ করে এবং উভয় ক্ষেত্রে মধ্যখানে আলিফ বৃদ্ধি করে পঠিত হয়েছে। পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনকারী অর্থাৎ আমরা কি মৃত্যুর পর জীবিতাবস্থায় ফিরে যাবো। প্রত্যেক প্রথম বিষয়কে حَافِرٌ বলা হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে رَجَعَ فُلَانٌ فِىْ حَافِرَتِهٖ যখন কেউ পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে।

١١. ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً وَفِىْ قِرَاءَةٍ نَاخِرَةً بَالِيَةً مُتَفَتِّتَةً نُحْيٰى .

১১. গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও কি এক কেরাতে نَخِرَةً শব্দটি نَاخِرَةً পঠিত হয়েছে। খণ্ড-বিখণ্ড, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও কি আমরা জীবিত হবো?

١٢. قَالُوْا تِلْكَ اَىْ رَجْعَتُنَا اِلَى الْحَيَاةِ اِذًا اِنْ صَحَّتْ كَرَّةٌ رَجْعَةٌ خَاسِرَةٌ ذَاتُ خُسْرَانٍ .

১২. তারা বলে, তা অর্থাৎ জীবতাবস্থার প্রতি আমাদের প্রত্যাবর্তন তবে যদি সত্য এমন হয় এ প্রত্যাবর্তন পুনরায় ফিরে যাওয়া হবে সর্বনাশা অপমানকর।

١٣. قَالَ تَعَالٰى فَاِنَّمَا هِىَ اَىْ الرَّادِفَةُ الَّتِىْ يُعَقِّبُهَا الْبَعْثُ زَجْرَةٌ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ـ

১৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা তো পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি যার পর পুনরুত্থান সংঘটিত হবে এক বিকট ধ্বনি ফুৎকার, অনন্তর যখন শিঙ্গাধ্বনি শ্রুত হবে।

١٤. فَاِذَا نُفِخَتْ فَاِذَا هُمْ اَىْ كُلُّ الْخَلَائِقِ بِالسَّاهِرَةِ بِوَجْهِ الْاَرْضِ اَحْيَاءً بَعْدَ مَا كَانُوْا بِبَطْنِهَا اَمْوَاتًا ـ

১৪. তখনই তারা অর্থাৎ সকল সৃষ্টি ময়দানে আবির্ভূত হবে ধরাপৃষ্ঠে জীবিতাবস্থায় যার গর্ভে তারা মৃত অবস্থায় বিরাজ করছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ : অত্র আয়াতে হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা সমস্ত বস্তুর মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হবে, বিধায় একে اَلرَّاجِفَةُ বলা হয়েছে। এটা পৃথিবী ও এর সব কিছুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে। সূরা জুমু'আ-এ এহেন অবস্থার কথা বলা হয়েছে এ ভাষায়– "এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন জমিন ও আসমানে যা কিছু আছে তা সবই মরে পড়ে যাবে। সেসব ব্যতীত যেসবকে জীবিত রাখা আল্লাহর ইচ্ছা হবে। পরে আর একবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সহসা তারা সকলে উঠে দেখতে শুরু করবে।"

اَلرَّاجِفَةُ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ اَلرَّاجِفَةُ শব্দটির একাধিক অর্থ উল্লেখ করেছেন–

১. কারো কারো মতে এখানে اَلرَّاجِفَةُ দ্বারা ভারি পদার্থ যেমন– জমিন, পাহাড় ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেছেন, اَلرَّاجِفَةُ দ্বারা জমিনের কম্পনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন– يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ

৩. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, اَلرَّاجِفَةُ দ্বারা হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম ফুৎকার উদ্দেশ্য। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

৪. অথবা এর অর্থ বিকট শব্দ, যা মেঘের গর্জন رَجَفَ الرَّعْدُ يَرْجُفُ رَجْفًا যেমন কুরআনে এসেছে যে, فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

اَلرَّادِفَةُ শব্দের অর্থ : জমহুরে মুফাসসিরীনের মতে اَلرَّادِفَةُ বললে দ্বিতীয় নাফ্খাহ বা ফুঁক বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা পুনরুত্থান হবে। আর رَادِفَةٌ-কে রাদফাহ্ এ কারণে বলা হয়েছে যে, এ ফুঁকটি প্রথম ফুঁকের পরে হবে। কেননা رَدِفَتْ শব্দের অর্থ অনুগামী যে পরে আসে অন্যের পিছনে আসে।

ইবনে যায়েদের মতে اَلرَّادِفَةُ দ্বারা উদ্দেশ্যে কিয়ামত।

মুজাহিদ (র.) বলেন, কম্পন সৃষ্টির পর যে শব্দের সৃষ্টি হবে, একে اَلرَّادِفَةُ বলা হয়। –[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রথম শিঙ্গাধ্বনিকে رَاجِفَةٌ বলার কারণ হলো এর ফলে সারা বিশ্বে ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখা দেবে, সৃষ্টি জগতের সব কিছুই চুরমার হয়ে যাবে এবং সকল প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে। আর দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনিকে এ জন্য رَادِفَةٌ বলা হয়েছে যে, তা প্রথম শিঙ্গাধ্বনির পরে আসবে। আর উভয় শিঙ্গাধ্বনির মাঝে চল্লিশ বছর কাল অতিবাহিত হবে। –[নূরুল কোরআন]

اَلْوَاجِفَةُ-এর মর্মার্থ : আলোচ্য আয়াতে اَلْوَاجِفَةُ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন

ক. জালালাইন গ্রন্থকার (র.) লিখেছেন– وَاجِفَةٌ এটা وَجِيْفٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো شَدِيْدُ الْاِضْطِرَابِ অর্থাৎ অত্যন্ত অশ্বস্তিবোধ করা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়া ইত্যাদি।

খ. ইমাম সুদ্দী (র.) বলেছেন, وَجِيْفٌ হলো যা স্থানান্তর হয়। অর্থাৎ যা অস্থির ও ব্যস্ত-ত্রস্ত।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, যে মানসিক অস্থিরতার দরুন কি করবে ভেবে পায় না, তাকে اَلْوَاجِفَةُ বা اَلْوَجِيْفَةُ বলে।

ঘ. কারো কারো মতে وَجَفَ الْقَلْبُ দ্বারা এখানে اِضْطِرَابُ الْقَلْبِ-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানসিক অশান্তি।

قُلُوْب দ্বারা উদ্দেশ্য : قُلُوْبٌ যদিও বহুবচন, কিন্তু এখানে কতিপয় অন্তর উদ্দেশ্য। যদি সমস্ত অন্তর উদ্দেশ্য হতো, তাহলে বলা হতো جَمِيْعُ الْقُلُوْبِ অথবা جَمِيْعُ قُلُوْبِ الْاِنْسَانِ কিন্তু তা না বলে শুধু বহুবচনের শব্দই বলা হয়েছে। তাই এখানে কতিপয় অন্তর উদ্দেশ্য।

কারো মতে 'কতিপয় অন্তর' এ জন্য বলা হয়েছে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে কেবল কাফের, নাফরমান ও মুনাফিকরাই কিয়ামতের দিন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। নেককার মু'মিন লোক সেদিন ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া হতে সুরক্ষিত থাকবে। সূরা আম্বিয়ায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– সে অতীব বিভীষিকাপূর্ণ সময় তাদেরকে একবিন্দু কাতর করবে না এবং ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে তাদেরকে দু'হাতে সাদরে গ্রহণ করবে। আর বলবে, এটা সেদিন যেদিনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল। –[কাবীর]

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ বাক্যের قُلُوْبٌ শব্দটি نَكِرَةٌ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে مُبْتَدَأٌ হওয়া বৈধ হলো? : উত্থিত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে বাক্যটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। قُلُوْبٌ মুবতাদা, وَاجِفَةٌ সিফাত এবং يَوْمَئِذٍ মুতা'আল্লিক হয়েছে وَاجِفَةٌ-এর সাথে।

উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব এই যে, কোনো نَكِرَةٌ শব্দের যখন সিফাত আসে তখন ঐ শব্দটি মুবতাদা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ এ উদাহরণে عَبْد শব্দটি অনির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হয়েছে। কেননা مُؤْمِن সিফাতটি তার সাথে যুক্ত হয়েছে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ আয়াতের মর্মার্থ : কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে মানুষের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, তারই একটি বাস্তব চিত্র আল্লাহ তা'আলা এখানে তুলে ধরেছেন। যদিও ঐ সময়ের অবস্থা আরো মারাত্মক হবে; যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়; অনুভূতির ব্যাপার। সেদিন বিনয়তার পূর্ণ ছাপ তাদের মাঝে বিকশিত হবে। তাদের সকল ঔদ্ধত্য সেদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে; ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবে।

হযরত আতা (র.) বলেন, এখানে أَبْصَار বলতে ঐ সমস্ত লোকের أَبْصَارٌ উদ্দেশ্য, যারা অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। –[ফাতহুল কাদীর]

أَبْصَار শব্দটি بَصَر-এর বহুবচন, بَصَرٌ অর্থ– চক্ষু। এখানে بَصِيْرَةٌ বোধশক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন কোন দিক হতে কি হচ্ছে কিছুই টের করা যাবে না। সবাই নির্বাক দর্শকের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে, কিয়ামতের ভয়াবহতার সম্মুখে তারা যেন এক নিশ্চল প্রাণ অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : أَبْصَارُهَا -এর যমীরের هَا এর مَرْجِعْ হলো قُلُوْب সুতরাং অর্থ দাঁড়াচ্ছে أَبْصَارُ الْقُلُوْبِ বা অন্তরের চক্ষুসমূহ। অথচ অন্তরের জন্য أَبْصَارٌ হতে পারে না। তথাপি কিভাবে أَبْصَارُهَا বলা হলো?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, এখানে أَبْصَارُ الْقُلُوْبِ-এর দ্বারা أَبْصَارُ أَصْحَابِ الْقُلُوْبِ অর্থাৎ অন্তরসমূহের মালিকের চক্ষুকে বুঝানো হয়েছে। এর পরবর্তী বাক্য يَقُوْلُوْنَ-এর দ্বারা তা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। কেননা يَقُوْلُوْنَ-এর فَاعِل হলো هُمْ যার مَرْجِعْ হলো أَبْصَارٌ ও قُلُوْب-এর মালিকগণ।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, قُلُوْبٌ শব্দটি نَكِرَةٌ হওয়া সত্ত্বেও এটা মুবতাদা হলো কিভাবে?

এর জবাব হচ্ছে– قُلُوْبٌ শব্দটি نَكِرَةٌ হলেও তার সাথে وَاجِفَةٌ সিফাতের উল্লেখ রয়েছে। আর نَكِرَةٌ-এর সাথে যখন صِفَة-এর উল্লেখ থাকে তখন এটা مُبْتَدَأٌ হতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে "وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ" এখানে عَبْد শব্দটির সাথে مُؤْمِنٌ (সিফাত)-এর উল্লেখ থাকায় এটা نَكِرَةٌ হওয়া সত্ত্বেও مُبْتَدَأٌ হতে পেরেছে।

اَلْحَافِرَةُ-এর অর্থ : আরবদের নিকট اَلْحَافِرَةُ হলো কোনো বস্তু বা কোনো বিষয়ের শুরু বা প্রথম অবস্থার নাম। এ কারণেই তারা বলে থাকে– رَجَعَ فُلَانٌ عَلٰى حَافِرَتِهٖ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তার ঐ রাস্তায় ফিরে এসেছে, যে রাস্তা দিয়ে সে প্রথমে

এগিয়েছে। আরো বলে- اِقْتَتَلَ الْقَوْمُ عِنْدَ الْحَافِرَةِ তথা عِنْدَ اَوَّلِ مَا الْتَقَوْا অর্থাৎ কওমের লোকেরা সংঘর্ষের প্রথম স্থানে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়েছে, যে রাস্তা দিয়ে আসা হয় সে রাস্তাকে حَافِرَةٌ বলার কারণ হলো ঐ রাস্তার উপর দিয়ে চলার কারণে রাস্তায় পায়ের চিহ্ন পড়ে যায়। কেননা, حَفْرٌ-এর অর্থ গর্ত করা বা চিহ্ন।

১. কারো মতে, اَلْحَافِرَةٌ অর্থ اَلْعَاجِلَةُ অর্থাৎ দুনিয়া, তখন মূলবাক্যের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, "اِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ اِلَى الدُّنْيَا" আমরা কি পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাবো?

২. কারো মতে, اَلْحَافِرَةٌ বলা হয় ঐ গর্তকে যা তাদের জন্য কবর হিসেবে করা হয়ে থাকে। তখন মূলবাক্যের অর্থ এ হবে যে, اِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى قُبُوْرِنَا اَحْيَاءً অর্থাৎ আমরা কি আমাদের কবরে জীবন্ত ফিরে যাবো? এটা খলীল, ফাররা এবং হযরত মুজাহিদের অভিমত।

৩. হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, 'হাফেরা' বলতে نَارٌ তথা দোজখেকে বুঝানো হয়েছে।

-[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

৪. হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেছেন, حَافِرَةٌ অর্থ হলো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, অর্থাৎ মুশরিকরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে বলত যে, আমাদের মৃত্যুর পরও কি পুনরায় জীবন লাভ করবো? আর তা কি করে সম্ভব? আমাদের হাড় গোশত সবই তো নিঃশেষ হয়ে যাবে। -[নূরুল কোরআন]

نَخِرَةٌ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : এখানে দু'টি কেরাত রয়েছে نَاخِرَةٌ ও نَخِرَةٌ কেউ কেউ বলেছেন, এতদুভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে পুরানো [জীর্ণ-শীর্ণ] টুকরো টুকরো ও পচাগলা। এটাই জমহুরের মাযহাব। অন্যান্যরা উভয়ের অর্থের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য করেছেন। সুতরাং

ক. কেউ কেউ বলেছেন, نَخِرَةٌ বলে এমন বস্তুকে, যার সম্পূর্ণ অংশ নষ্ট হয়ে গেছে, আর نَاخِرَةٌ বলে যার অংশ বিশেষ পচে গেছে।

খ. কারো কারো মতে نَخِرَةٌ অর্থ হচ্ছে যা পচে গেছে, আর نَاخِرَةٌ এমন বস্তুকে বলে যা শীঘ্রই পচে যাবে।

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে نخرة দ্বারা এখানে এমন হাড়কে বুঝানো হয়েছে, যা পচে গেছে এবং এর মধ্যে বায়ু প্রবেশ করেছে। যা হোক نَخِرَةٌ ও نَاخِرَةٌ যাই পড়া হোক না কেন এদের অর্থে খুব একটা পার্থক্য হবে না।

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا আয়াতে قَالُوْا উল্লেখের কারণ : পিছনের আয়াতে বলা হয়েছে يَقُوْلُوْنَ দ্বারা কাফেরদের কুফরির স্থায়িত্ব বুঝায়, কিন্তু এ আয়াতে قَالُوْا (অতীত কালের শব্দ) ব্যবহারের দ্বারা বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট এ কুফরিটি তাদের পক্ষ হতে অতীতেই হয়েছিল। সব সময় স্থায়ী ছিল না। হয়তো দু' একজন বা দু' একবার এ কথাটি বলা হয়েছে। এ কারণেই এখানে قَالُوْا বলা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

خَاسِرَةٌ শব্দের অর্থ : خَاسِرَةٌ অর্থ- অনিষ্টকর, ক্ষতি। ইমাম হাসান (রা.) বলেন, خَاسِرَةٌ অর্থ كَاذِبَةٌ মিথ্যা। অর্থাৎ এটা অবশ্যই হওয়ার নয়।

রবী' ইবনে আনাস (রা.) বলেন, خَاسِرَةٌ অর্থ خَاسِرَةٌ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ بِهَا অর্থাৎ পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর উপর ধ্বংস এসে পড়বে। -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ "تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ" : কাফেররা কিয়ামতের মতো এমন সুনিশ্চিত ব্যাপারের প্রতিও সন্দেহ পোষণ করত এবং ব্যঙ্গ করে বলত, আমরা যখন গলিত হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো, তখন বুঝি পুনরায় আমাদেরকে আগের অবস্থার দিকে ফিরে যেতে হবে? যদি এমন হয়, তাহলে তো মহাসর্বনাশ, সন্দেহ নেই। আমরা তো এ নতুন জন্ম লাভের জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। -[যিলাল]

আয়াতে কাফেরদের উক্তিগুলো প্রশ্নের আকারে উল্লিখিত হলেও জিজ্ঞাসা করে কথাটি জানা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এটা অভিনব ও অসম্ভব ব্যাপার, একথা বুঝাবার জন্যই তারা প্রশ্ন করেছে।

ইমাম শাওকানী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা হলো মৃত্যুর পরে যদি আমাদেরকে আবার পুনরুজ্জীবিত করানো হয়, তাহলে তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মুহাম্মদের কথানুযায়ী তো আমাদের উপর বিরাট অমানিশা নেমে আসবে।

হযরত কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র.) বলেন, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমাদেরকে যদি পুনরায় জীবিত করা হয়, তাহলে তো আমরা আগুনের দ্বারা/দোজখের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবো। তারা এ কথা এ কারণেই বলেছিল যে, তাদেরকে দোজখের ভয় দেখানো হয়েছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ زَجْرَةً : زَجْرَةٌ অর্থ صَيْحَةٌ বা বিকট শব্দ। আরবগণ বলে থাকে যে, زَجَرَ الْبَعِيْرَ এটা ঐ সময় বলা হয় যখন উটের ব্যাপারে কেউ চিৎকার দেয়, কিন্তু আয়াতে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁককে বলা হয়েছে, যা হযরত ইসরাফীল (আ.) -এর মাধ্যমে সংঘটিত হবে। মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ মাটির পেটে সকলকে জীবিত করবেন, অতঃপর ঐ বিকট আওয়াজ তারা শ্রবণ করবে তারপর তাদের কিয়ামত হবে (অর্থাৎ সবাই দাঁড়িয়ে যাবে) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে ইরশাদ করেছেন, وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, ইবনে কাছীর]

اَلسَّاهِرَةُ -এর অর্থ : ইমাম ওয়াহেদী (র.) বলেন, اَلسَّاهِرَةُ বলতে সমতল ময়দানকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশের মতে প্রকাশ্য ময়দানকেই اَلسَّاهِرَةُ বলা হয়েছে।

ইমাম ফাররা (র.) বলেন, জমিনকে سَاهِرَةٌ এ কারণে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীব-জন্তু সেখানে নিদ্রা যায় এবং জাগে। [কেননা سَهَرٌ অর্থ– জাগ্রত হওয়া।]

কেউ কেউ বলেন, ময়দানে ভয়ে মানুষ জাগ্রত থাকে, বিধায় سَاهِرَةٌ বলা হয়েছে। কারো মতে সাদা জমিনকে سَاهِرَةٌ বলা হয়। কারো মতে, যে জমিনে আল্লাহর নাফরমানি হয়নি। কেউ সপ্তম জমিনকে, কেউ সিরিয়ার জমিনকে এবং কাতাদাহ জাহান্নামকে বুঝিয়েছেন। কেননা সেখানে কেউ ঘুমাতে পারবে না। –[নূরুল কোরআন, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَاِنَّمَا هِىَ جَزْرَةٌ ..... بِالسَّاهِرَةِ" : এ লোকেরা তো কিয়ামতকে অসম্ভব বিষয় মনে করে একে বিদ্রূপ করছে। অথচ আল্লাহর পক্ষে এটা বিন্দুমাত্র কঠিন কাজ নয়। এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য খুব বড় ও ব্যাপক কোনো প্রস্তুতি গ্রহণেরও কোনো প্রয়োজন নেই। এর জন্য কেবলমাত্র একটি হুমকি বা ধমকই যথেষ্ট। এর সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের মৃত্তিকা বা ছাই যেখানেই পড়ে থাকুক না কেন সর্বদিক হতে গুটিয়ে এসে তা একস্থানে সঞ্চিত হয়ে যাবে এবং নিমিষের মধ্যে তোমরা নিজেদেরকে পৃথিবীর উপর জীবন্ত উপস্থিত পাবে। এ প্রত্যাবর্তনকে এভাবে জীবনে পুনরায় ফিরে আসাকে তোমরা যতই ক্ষতির প্রত্যাবর্তন মনে কর না কেন এবং এটা হতে যতই পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা কর না কেন, এটা তো অবশ্যই হবে, এটা হতে নিষ্কৃতি নেই। তোমাদের অস্বীকৃতি কিংবা পলায়ন অথবা ঠাট্টা বিদ্রূপ একে রুখে রাখতে পারে না। কিয়ামত ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে পক্ষান্তরে তোমরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছ। –[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

١٥. هَلْ أَتٰكَ يَا مُحَمَّدُ حَدِيْثُ مُوْسٰى عَامِلٌ فِيْ .

১৫. তোমার নিকট কি পৌছেছে হে মুহাম্মদ! মূসার বৃত্তান্ত এটা পরবর্তী إِذْ نَادَاهُ -এর মধ্যে عَامِلٌ ।

١٦. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اِسْمُ الْوَادِيْ بِالتَّنْوِيْنِ وَتَرْكِهِ فَقَالَ .

১৬. যখন তাকে তার প্রতিপালক তুয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন طُوًى শব্দটি তানবীনসহ ও তানবীন ব্যতীত পঠিত হয়েছে, একটি উপত্যকার নাম এবং বলেছেন,

١٧. اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْكُفْرِ .

১৭. ফেরাউনের নিকট গমন করো, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে কুফরির মধ্যে সীমা অতিক্রম করে গেছে :

١٨. فَقُلْ هَلْ لَّكَ اَدْعُوْكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الزَّايِ بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصْلِ فِيْهَا تَطَهَّرُ مِنَ الشِّرْكِ بِاَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

১৮. এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে? আমি কি তোমাকে আহ্বান করবো তোমার পবিত্র হওয়ার প্রতি এক কেরাতে শব্দটি زَا -এর মধ্যে তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় تَا -কে মূলবর্ণের সাথে পরিবর্তিত করে اِدْغَامْ করা হয়েছে। অর্থাৎ তখন শব্দটি মূলত تَتَزَكّٰى ছিল তথা তুমি 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই' এ সাক্ষ্যদান পূর্বক শিরক হতে পবিত্র হবে।

١٩. وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ اَدُلُّكَ عَلٰى مَعْرِفَتِهِ بِالْبُرْهَانِ فَتَخْشٰى فَتَخَافَهُ .

১৯. আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি তাঁকে চিনবার প্রশ্নে প্রমাণ দ্বারা আমি তোমাকে পথনির্দেশ করি। যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর তাঁর প্রতি ভয় পোষণ কর।

٢٠. فَاَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى مِنْ اٰيَاتِهِ التِّسْعِ وَهِيَ الْيَدُ اَوِ الْعَصَا .

২০. অনন্তর যে তাকে মহা নিদর্শন প্রদর্শন করল তাঁর নয়টি নিদর্শনাবলির মধ্য হতে, আর তা শুভ্র হাত বা লাঠি।

٢١. فَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ مُوْسٰى وَعَصٰى اللّٰهَ تَعَالٰى .

২১. অতঃপর সে মিথ্যারোপ করল ফেরাউন মূসাকে ও অবাধ্যাচরণ করল আল্লাহ তা'আলার।

٢٢. ثُمَّ اَدْبَرَ عَنِ الْاِيْمَانِ يَسْعٰى فِي الْاَرْضِ بِالْفَسَادِ .

২২. অতঃপর সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল ঈমান আনয়ন হতে সচেষ্ট হলো পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কাজে

٢٣. فَحَشَرَ جَمَعَ السَّحَرَةَ وَجُنْدَهُ فَنَادٰى .

২৩. অনন্তর সে সমবেত করল জাদুকর ও তার সৈন্য-সামন্তদেরকে এবং ঘোষণা প্রদান করল

٢٤. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى لَا رَبَّ فَوْقِيْ .

২৪. আর বলল, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক নেই।

٢٥. فَأَخَذَهُ اللّٰهُ أَهْلَكَهُ بِالْغَرَقِ نَكَالَ عُقُوبَةَ الْآخِرَةِ أَيْ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَالْأُولٰى أَيْ قَوْلِهِ قَبْلَهَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِيْ وَكَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ سَنَةً.

২৫. অতঃপর আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করেন তাকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেন, শাস্তি আজাব স্বরূপ শেষোক্ত এ বাক্যের অর্থাৎ উপরিউক্ত বাক্যের শাস্তিস্বরূপ আর পূর্ববর্তী বাক্যের অর্থাৎ ইতঃপূর্বে তার কথিত বাক্যের, তা এই যে, সে বলেছিল, আমি ভিন্ন তোমাদের আর কোনো উপাস্যের সন্ধান আমি পাইনি। আর এতদুভয়ে বাক্য উচ্চারণ করার মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল।

٢٦. إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُورِ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشَى اللّٰهَ تَعَالٰى.

২৬. নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বর্ণনায় উপদেশে রয়েছে তার জন্য যে ভয় করে আল্লাহ তা'আলাকে।

তাহকীক ও তারকীব

اِذْهَبْ .... طَغٰى-এর মহল্লে ই'রাব : কেউ কেউ একে আল্লাহর قَوْل (নিজস্ব কথা) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারো মতে এটা পিছনের نِدَاءٌ -এর তাফসীর। অর্থাৎ তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে ডাক দিয়েছেন এই বলে যে, যাও ....।

কারো মতে اِذْهَبْ-এর পূর্বে أَنْ-এ مُفَسِّرَةٌ উহ্য রয়েছে। এ মতের পক্ষে ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর কেরাতই যথেষ্ট। তিনি এভাবে পড়েছেন– اِنْ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى

আর اِنَّهُ طَغٰى বাক্যাংশটি পিছনের (اِذْهَبْ) নির্দেশসূচক ক্রিয়ার ইল্লত বা কারণ। –[ফাতহুল কাদীর]

نَكَالَ-এর মহল্লে ই'রাব : نَكَالَ শব্দটি এখানে মহল্লান মানসূব হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে।

ক. এটা (نَكَالَ) উহ্য فِعْل-এর مَفْعُوْل مُطْلَق হয়েছে। মূলত বাক্যটি ছিল فَاَخَذَهُ اللّٰهُ وَنَكَلَ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ الخ অর্থাৎ আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেছেন এবং ইহ-পরকালের কঠোর আজাব দিয়েছেন।

খ. অথবা এটা مَفْعُوْل لَهُ হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে اَخَذَ اللّٰهُ لِاَجَلِ نَكَالِ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ইহ ও পরকালের আজাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেছেন।

গ. অথবা এটা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। মূলবাক্য হবে فَاَخَذَهُ اللّٰهُ بِنَكَالِ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ আল্লাহ তাকে ইহ-পরকালীন আজাবের দ্বারা পাকড়াও করলেন। সুতরাং بَاءٌ -কে হযফ করত (এর পরিবর্তে) نَكَالَ -এর উপর যবর দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : নবুয়ত প্রাপ্তির পর নবী করীম ﷺ মক্কার লোকদেরকে ঈমান আনার জন্য আহ্বান করলেন। তারা ঈমান তো গ্রহণ করলেই না; বরং নবী করীম ﷺ ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করল। এতে মহানবী ﷺ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মধ্যে সংঘটিত কতিপয় ঘটনার বিবরণ পেশের উদ্দেশ্যে এ আয়াতগুলো নাজিল করেন। যাতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে জানিয়ে দিলেন যে, এটা যে শুধু আপনার বেলায় হয়েছে তা নয়; বরং ইতঃপূর্বে যত নবী রাসূল দুনিয়ায় আগমন করেছে সকলের বেলায়ই তা ঘটেছে। হযরত মূসা (আ.) -এর ন্যায় প্রভাবশালী রাসূলও ফেরাউনকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে গিয়ে এমনতর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। কাজেই এতে আপনার মর্মাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

পূর্বাপর যোগসূত্র : ইমাম রাযী (র.) বলেন, বর্তমান ভাষ্যের সাথে পূর্বের আলোচনা দু'দিক হতে মিল রয়েছে-

ক. পূর্বের আলোচনায় কাফেরদের হঠকারিতা বিবৃত হয়েছে, এ হঠকারিতা যে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টায় রূপ পরিগ্রহ করেছে তাও আলোচিত হয়েছে। আর এটা বরদাশত করা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। অতএব, হযরত মূসা (আ.) -এর কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তিনি ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সুতরাং আপনার কষ্ট নতুন নয়, দাওয়াতের কাজ সর্ব যুগেই ছিল কঠিন।

খ. ফেরাউনের শক্তি কুরাইশদের শক্তির চেয়েও বেশি ছিল, তার জনশক্তি ও বাধা ছিল প্রকট, এতদসত্ত্বেও যখন সে হঠধর্মীতা করেছিল, আল্লাহ তাকে চরম বে-ইজ্জতের সাথে পাকড়াও করেছিলেন। এমনিভাবে এ মুশরিকগণ যখন আপনার সাথে বেয়াদবি করবে আল্লাহ তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করবেন। অতএব, কোনো বিকল্প চিন্তার প্রয়োজন নেই। -[কাবীর]

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা কি? : এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বলতে নিম্নোক্ত ঘটনাবলিকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের নিকট গেলেন এবং বললেন যে, তুমি যদি তোমার কল্যাণ চাও এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চাও তাহলে আমি তোমাকে সেদিকে পথ নির্দেশ করতে পারবো। যাতে তোমার অন্তরে আল্লাহভীতির সঞ্চার হবে এবং আল্লাহর মারেফত (পরিচয়) লাভ করতে পারবে। কেননা আল্লাহর পূর্ণ মারেফত অধ্যয়ন করা ব্যতীত তাঁর ভীতি হাসিল হয় না।

এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বনী ইরসাঈলকে স্বাধীন করাই শুধু হযরত মূসা (আ.) -এর লক্ষ্য ছিল না; বরং ফেরাউনকে সংশোধন করাও ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রমাণ স্বরূপ হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে মোকাবিলা করার জন্য জাদুকরদের প্রস্তুত করলেন। লোকদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা করলেন যে, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব। সুতরাং মূসাকে আবার কে প্রেরণ করল? এভাবে ফেরাউন কুফরের মধ্যে সীমা ছাড়িয়ে গেল।

কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যে নীল নদের ব্যাপারে ফেরাউনের গর্ব ছিল, যার উপর তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল, সে নীল নদেই আল্লাহ তা'আলা তাকে দলবল সহ ডুবিয়ে মারলেন। আখেরাতের আজাব তো রয়ে গেছে। তার বিরাট শক্তি তাকে আল্লাহর শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারেনি। যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য অবশ্যই উপরিউক্ত ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

طُوًى দ্বারা উদ্দেশ্য : بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى বাক্যাংশ দ্বারা তাফসীরকারকগণ সাধারণত অর্থ করেছেন- 'সে পবিত্র উপত্যকা যার নাম তুয়া।' এটা সিরিয়ার পবিত্র সিনাই পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত এর আরো দু'টি অর্থও বলা হয়েছে।

এক : এটা সে উপত্যকা যা দু'বার পবিত্র করা হয়েছে। একবার যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয়বার যখন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলগণকে মিসর হতে বের করে এনে এখানে পৌঁছেছিলেন।

দুই : রাতের বেলা পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছেন। আরবি কথোপকথনে جَاءَ بَعْدَ طُوًى বললে বুঝায় অমুক ব্যক্তি রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে আমার নিকট এসেছে।

এ অর্থদ্বয় ছাড়াও ইমাম রাযী (র.) আরো দু'টি অর্থ করেছেন-

এক : طُوًى অর্থ يَا رَجُلُ [হে ব্যক্তি] ইবরানী ভাষায়। তখন অর্থ হবে- হে লোকটি, ফেরাউনের নিকট যাও।

দুই : মদীনা এবং মিসরের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম।

طُغْيَانٌ-এর অর্থ : طُغْيَانٌ অর্থ হলো مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ সীমালঙ্ঘন করা, কিন্তু ফেরাউন কোন ব্যাপারে- কোন জিনিসে সীমালঙ্ঘন করেছে তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, সে আল্লাহর উপরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে এবং তাঁকে অস্বীকার করেছে।

অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, সে বনী ইসরাঈলের উপর অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন করেছে।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, আমার নিকট উত্তম হলো উভয় মতকে এক করে অর্থ নেওয়া। অর্থাৎ ফেরাউন আল্লাহকে অস্বীকার করে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর মানুষের সাথে সীমালঙ্ঘন করেছে এভাবে যে, তাদের উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে এবং তাদের নিকট থেকে ইবাদতের প্রত্যাশী হয়েছে।

মোদ্দাকথা, ফেরাউন তার প্রজা সাধারণকে সমবেত করে ঘোষণা করল, 'আমি তোমারে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান রব'। তার রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দল, উপদল ও শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল, দুর্বল শ্রেণির উপর সে অমানুষিক অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছিল। গোটা জাতিকে বোকা বানিয়ে তাদরকে নিজের নিকৃষ্ট দাসে পরিণত করে নিয়েছে। -[কাবীর]

فَتَخْشَى ...... قَوْلُهُ تَعَالَى فَقُلْ هَلْ لَكَ : আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি ফেরাউনের নিকট গিয়ে তাকে বল যে, হে ফেরাউন তুমি কি পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত আছ। "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" এ ঘোষণা দিয়ে তুমি শিরক হতে পবিত্রতা অর্জন করতে চাও কিনা? তাহলে আমি প্রমাণের দ্বারা তোমাকে আল্লাহর পরিচয় লাভের পথ প্রদর্শন করবো। যাতে তোমার অন্তরে আল্লাহভীতির সৃষ্টি হবে।

সূরা ত্বা-হা-এর ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন–"তুমি ও হারূন দু'ভাই ফেরাউনের নিকট গিয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহকে ভয় করতে পারে।" বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতে এ নম্র কথার একটা নমুনা পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদের এ সকল আয়াতে দীনি দাওয়াত ও তাবলীগের নির্ভুল পন্থা ও পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে।

এখানে পবিত্রতা অর্জন করার যে কথাটা বলা হয়েছে এর অর্থ আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র এবং আমল বা বাস্তব জীবনের সব সর্বক্ষেত্রে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অর্জন করা। অন্য কথায় এটাই ছিল ইসলাম কবুল করার দাওয়াত।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, কুরআন মাজীদের যেখানেই تَزَكّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেই এর তাৎপর্য হবে ইসলাম কবুল করা। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত তিনটি আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

১. وَ ذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ এটা তার প্রতিফল যে পবিত্রতা কবুল করে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।

২. وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى অর্থাৎ তুমি কি জান, সে হয়তো পবিত্রতা কবুল করতে পারে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

৩. وَمَا عَلَيْكَ اَنْ لَّا يَزَّكّٰى অর্থাৎ সে পবিত্রতা তথা ইসলাম গ্রহণ না করলে তার জন্য তোমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই।

আমি তোমাকে তোমার আল্লাহর দিকে (চলার) পথ দেখাবো, তাহলে তাঁর ভয় হয়তো তোমার দিলে জাগবে। এ বাক্যের তাৎপর্য এই যে, তুমি যখন তোমার রব আল্লাহকে চিনতে পারবে ও জানতে পারবে যে, তুমি তাঁরই বান্দা, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি নও, তখন অবশ্যই তোমার দিলে তাঁর ভয়ের সঞ্চার হবে। আর আল্লাহর ভয়ই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দুনিয়ার মানুষের নির্ভুল ও সঠিক পথ চলা এর উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ পরিচিতি ও আল্লাহভীতি ব্যতীত পবিত্রতা লাভ করা যায় না।

اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى আয়াতাংশটি কিসের সাথে সম্পর্ক : মহান প্রভুর বাণী اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى উহ্য اَدْعُوْكَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। কেননা, এখানে هَلْ لَكَ অংশটুকু اَدْعُوْكَ-এর অর্থে হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা উহ্য رَغْبَةٌ অথবা قَبُلٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

পথ প্রদর্শক ছাড়া আল্লাহকে চিনার উপায় আছে কি? : যাঁরা আধ্যাত্মিকতাকেই শুধু প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তাঁরা উক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলে বেড়ান যে, هَادِيٌ ছাড়া সঠিকভাবে আল্লাহকে চিনা-বুঝা যায় না। কেননা ফেরাউনের মতো নাস্তিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, আর তিনি তথায় গিয়ে বলেছেন যে, "আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো।"

আর যারা আধ্যাত্মিকতার সাথে সাথে ইসলামি নীতিমালাকেও সংযোজন করে থাকেন তাঁরা বলেন, আল্লাহর মারেফত প্রদর্শক ছাড়াও অর্জন করা ফরজ। যে সম্প্রদায়ে রাসূল বা মুয়াল্লিম আসবে না, সে কওমের লোকদের উপর আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তাকিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে স্রষ্টাকে বের করা ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ। –[কাবীর]

মারেফত ব্যতীত ভয় হয় না : আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মূসা (আ.)-কে দাওয়াতের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে اَهْدِيَكَ কে فَتَخْشٰى-এর উপর মুকাদ্দাম করেছেন। এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, خَشْيَةٌ অর্থাৎ আল্লাহর ভয় মনে বদ্ধমূল করতে হলে প্রথমে মারেফত অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

আল্লাহর ভয়ই হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। দুনিয়ায় মানুষের নির্ভুল ও সঠিক পথ চলা এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর পরিচিতি ও আল্লাহভীতি ব্যতীত কোনোরূপ পবিত্রতা লাভের ধারণামাত্র করা যায় না।

হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করার কারণ : হযরত মূসা (আ.) কেবল বনী ইসরাঈলদের মুক্ত করানোর উদ্দেশ্যেই ফেরাউনের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন না। যেমন কোনো কোনো লোক এ ধারণা করে নিয়েছেন; বরং প্রকৃতপক্ষে তাঁকে পাঠাবার প্রথম উদ্দেশ্য হলো ফেরাউন এবং তার জাতিকে দীনের পথ দেখানো।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সে যদি হেদায়েত কবুল না করে, তাহলে বনী ইসরাঈলীদেরকে-যারা মূলত এক মুসলমান জাতি-তাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে মিসর হতে বের করে নিয়ে যাওয়া। আলোচ্য আয়াতসমূহ হতেও এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা এ আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলীদের মুক্ত করার কোনো কথা আদৌ উল্লিখিত হয়নি; বরং হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের সামনে কেবলমাত্র সত্য দীনের দাওয়াত পেশ করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেসব আয়াতে হযরত মূসা (আ.) ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বনী ইসরাইলীদের মুক্তির দাবিও জানিয়েছেন বলে উদ্ধৃতি হয়েছে। তাতেও একথা প্রমাণিত হয়।

আল্লাহর পথে ডাকার পন্থা : উক্ত আয়াতে দাওয়াতের সুন্দর একটি প্রক্রিয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নরম নরম কথায় যাতে প্রতিপক্ষ বিরক্ত হয়ে না যায়। এ পন্থাকে সূরা 'ত্বা-হা' তে এভাবে বলা হয়েছে- فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ অর্থাৎ তুমি ও হারুন দু'ভাই এর (ফিরাউনের) সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহকে ভয় করতে পারে।

এটা হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিভ্রান্ত ও শত্রু স্বভাবের ব্যক্তিকে হেদায়েতের পথে আনার জন্য এরূপ মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতেই কথা বলতে হবে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى "فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى" : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউনকে ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিলেন। ফেরাউন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল যে, তুমি যে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছ তার প্রমাণ কি? তখন হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে একটি মহা অলৌকিক ক্ষমতা (আল্লাহর পক্ষ হতে পাওয়া একটি মহা নিদর্শন) দেখালেন।

মহা নিদর্শন দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, এখানে اَلْآيَةَ الْكُبْرَى [বড় নিদর্শন]-এর দ্বারা عَصَا [লাঠি] অথবা يَدٌ بَيْضَاءُ সমুজ্জ্বল হস্ত-কে বুঝানো হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, বড় নিদর্শন অর্থ লাঠির অজগররূপে প্রতিভাত হওয়া কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। বস্তুত একটি নিষ্প্রাণ লাঠি স্পষ্ট দর্শকদের চোখের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে অজগর হয়ে যাবে। এটা অপেক্ষা বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে। তাঁর মোকাবিলা করতে এসে জাদুকররা লাঠি ও রশিকে কৃত্রিম অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর অজগর সেসব কিছুকেই গিলে ফেলল। অথচ পর মুহূর্তেই হযরত মূসা (আ.) যখন একে নিজের হাতে তুলে নিলেন তখন এটা মূল লাঠিই হয়ে গেল। এটা একটি অকাট্য প্রমাণ। এটা হতে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক-ই প্রেরিত হয়েছিলেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে যে সমস্ত নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা প্রদান করা হয়েছিল তা দু' প্রকার, এক প্রকার নীল দরিয়া পারাপারের পূর্বে, অন্য প্রকার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এর বর্ণনা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকারে করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের নয়টি নিদর্শনের বর্ণনা সূরা বনী ইসরাঈলে করা হয়েছে। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ অর্থাৎ (আমি মূসা (আ.)-কে নয়টি নিদর্শন দিয়েছি) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটা বর্ণিত আছে যে, কুরআনে উল্লিখিত এ নয়টি অলৌকিক বস্তু হচ্ছে-

১. লাঠি, ২. সমুজ্জ্বল হস্ত, ৩. দুর্ভিক্ষ, ৪. ফল-মূলের স্বল্পতা, ৫. তুফান, ৬. টিড্ডি, ৭. উকুন, ৮. ভেক ও ৯. রক্ত।

উপরিউক্ত নয়টির মধ্যে প্রথম দু'টি ছাড়া অন্য সাতটি ফিরাউন এবং মিসরবাসীদের জন্য আজাব-স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রকারের নিদর্শনসমূহ হচ্ছে- ১. নীল দরিয়া ভাগ হওয়া, ২. মান্ন ও সালওয়া, ৩. মেঘমালার ছায়া, ৪. পাথর হতে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া, ৫. বনী ইসরাঈলের মাথার উপরে পাহাড় উত্তোলন, ৬. ধন-সম্পদ পাথরে পরিণত হওয়া, ৭. তাওরাত অবতীর্ণ হওয়া। -[কাসাসুল কুরআন]

فَأَرَاهُ الخ আয়াতে فَاءٌ কি অর্থে হয়েছে? : আল্লাহর বাণী فَأَرَاهُ الخ-এর মধ্যে فَاء শব্দটি عَاطِفَةٌ হয়েছে। এটা এখানে কয়েকটি উহ্য বাক্যের কাজ দেয় বলে একে فَصِيْحَةٌ বলে। মূলত বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ- فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ مَا ذُكِرَ فَأَرَاهُ الخ
نَطَلَبَ مِنْهُ آيَةً فَرَاهُ الخ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের নিকট গেলেন এবং যা বলার ছিল বললেন। হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফেরাউন মু'জিযা তলব করে। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে মহা মু'জিযা দেখালেন।

فَأَرَاهُ-এর মধ্যে إِرَاءَةٌ-এর অর্থ : আলোচ্য আয়াতে إِرَاءَةٌ-এর দু'টি অর্থ হতে পারে-

১. اَلتَّبْصِيْرُ অর্থাৎ দেখানো। অর্থাৎ তিনি মহা নিদর্শন ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন, যা সে চর্মচোখে দেখতে পেয়েছে।

২ اَلتَّعْرِيْفُ (اَلتَّفْهِيْمُ) অর্থাৎ তার নিকট আল্লাহর নিকট আল্লাহর মারেফত (পরিচয়) তুলে ধরেছেন, সত্যকে তার বোধগম্য করে দিয়েছেন। কিন্তু স্বীয় হঠকারিতার কারণে সে তা গ্রহণ করেনি। -[রূহুল মা'আনী]

فَأَرَاهُ-এর মধ্যে فَاعِلْ [কর্তা] : আল্লাহর বাণী فَأَرَاهُ-এর মধ্যে ضَمِيْر مُسْتَتِرْ তথা ضَمِيْر فَاعِلْ-এর مَرْجِعْ হলো হযরত মূসা (আ.)। আর ضَمِيْر بَارِزْ তথা ضَمِيْر مَفْعُوْل (ه)-এর مَرْجِعْ হলো ফেরাউন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে মহানিদর্শন দেখিয়েছিলেন।

অবশ্য কোনো আয়াতে মু'জিযা [নিদর্শন] দেখানোর নিসবত স্বয়ং আল্লাহর দিকে করা হয়েছে। তা এ জন্য যে, মু'জিযা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু তা জাহির করা হয় নবী-রাসূলের মাধ্যমে। কাজেই একে কখনো নবী-রাসূলের দিকে নিসবত করা হয়, আবার কখনো খোদ আল্লাহর দিকেই নিসবত করা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

يَسْعٰى ...... فَكَذَّبَ وَعَصٰى আয়াতে عَصٰى উল্লেখের কারণ : একথা প্রত্যেকই জানে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করবে সে ব্যক্তিই عِصْيَانٌ তথা নাফরমানি করবে। এ জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কেন كَذَّبَ-এর পরে عَصٰى শব্দটির উল্লেখ করেছেন?

এর উত্তর: এখানে আল্লাহ তা'আলা এ কথা বুঝাতে চান যে, كَذَّبَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَصٰى بِاَنْ اَظْهَرَ التَّمَرُّدَ অর্থাৎ অন্তর এবং জবান দ্বারা অস্বীকার করল, আর নাফরমানির পরিচয় দিল এভাবে যে, অবাধ্যতা এবং হঠকারিতা প্রকাশ করল। -[কাবীর]

قَوْلُهُ "فَكَذَّبَ وَعَصٰى" : ফিরাউনের সামনে আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) যখন বড় বড় নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তখন ফেরাউন নিজের হঠকারিতার কারণে হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকার করল এবং তাঁর মু'জিযাকে জাদু বলে উড়িয়ে দিল। আর পূর্ণ ব্যাপারটির সত্যতা অনুধাবন করার পরও অবাধ্যতার পরিচয় পেশ করে আল্লাহর নাফরমানি করল, ইবাদত করার জন্য প্রস্তুত হলো না; বরং পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক চরম বিরোধিতায় মেতে উঠল।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى আয়াতে اِدْبَارٌ অর্থ : اِدْبَارٌ-এর কয়েকটি অর্থ দেখা যায়-

ক. ইবাদত হতে বিমুখ হওয়া, অনুকরণ হতে ফিরে থাকা। যেহেতু ফেরাউন আল্লাহর ইবাদত হতে বিমুখ হয়ে বিরোধিতায় মেতে উঠেছিল, সেহেতু তার ব্যাপারে اَدْبَرَ বলা হয়েছে।

খ. অথবা, ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত তাঁর মজলিস হতে ফিরে গিয়েছিল, বিধায় তার ব্যাপারে اَدْبَرَ ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় এর আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য হবে।

গ. অথবা, হযরত মূসা (আ.) লাঠি ছেড়ে দেওয়ার পর যখন এটা বিশালাকার অজগর সর্পে পরিণত হলো তখন ফেরাউন ও তার দলবল দৌড়ে পালাল।

সুতরাং বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর হাতের লাঠি ছেড়ে দিলেন, লাঠি বিশাল এক অজগর সর্পে পরিণত হলো। এর হাড় ষাট গজ হয়েছিল নিচের চোয়াল মাটিতে এবং উপরের চোয়াল রাজ প্রাসাদের উপর গিয়ে পৌঁছেছিল। এতদর্শনে ফেরাউন ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। উপস্থিত জনতার মধ্য হতে ২৫ হাজার লোক ভয়ে ছুটাছুটি করতে গিয়ে মারা যায়।

অপর এক বর্ণনা মতে উক্ত লাঠি সর্পে পরিণত হওয়ার পর এক মাইল ঊর্ধ্বলোকে উঠে গিয়েছিল। অতঃপর এটা ফেরাউনের সামনে পতিত হয় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আদেশ কামনা করল। এতে ফেরাউন আরো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে বলল, সে সত্তার কসম! যে তোমাকে প্রেরণ করেছেন! সাপটিকে বারণ করো। এরপর হযরত মূসা (আ.) একে ধরে ফেললেন সাথে সাথে তা লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল।

ঘ. অথবা এখানে اَدْبَرَ শব্দটি اَقْبَلَ-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর বিরোধিতায় এগিয়ে আসল। কিন্তু اَقْبَلَ শব্দটি একটি ভালো গুণের ইঙ্গিতবাহী হওয়ার কারণে اَدْبَرَ শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা বিরোধিতায় এগিয়ে আসার অর্থ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত গ্রহণ হতে পিছিয়ে যাওয়া। এ জন্য اَقْبَلَ শব্দ ব্যবহার না করে اَدْبَرَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। -[কাবীর]

হযরত মূসা (আ.) কিভাবে পিছিয়ে গেলেন এবং কি চেষ্টা করলেন? : ফেরাউন যখন বুঝতে পারল যে, হযরত মূসা (আ.) তার সিংহাসন দখল করে ফেলবে, তার দাসত্বের পরিবর্তে আল্লাহর দাসত্ব কায়েম করবেন, তার প্রতিপত্তি লোপ করবে, তখন সে মিসরের বাহির হতে বড় বড় প্রখ্যাত জাদুকরদের ডেকে এনেছিল। উক্ত জাদুকররা হাজার হাজার জনতার সামনে তাদের লাঠি ও রশিকে অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিল। যাতে লোকেরা বিশ্বাস করে যে, হযরত মূসা (আ.) কোনো নবী নয়; বরং তিনিও অন্যান্য জাদুকরদের মতোই একজন জাদুকর। হযরত মূসা (আ.) যা দেখাতে পারেন অন্যান্য যাদুকররাও তা দেখাতে পারে। লাঠিকে অজগর বানানোর যে কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন, তা অন্যান্য জাদুকররাও অনায়াসেই দেখাতে পারে। কিন্তু তার এ চাল তারই বিরুদ্ধে কাজ করল, উল্টা ফল দেখাল; কেননা জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পরাজিত হওয়ার পর মুসলমান হয়ে গেল। তা ছাড়া তারা ঘোষণা করল যে, হযরত মূসা (আ.) যা দেখিয়েছেন তা কখনো জাদু হতে পারে না; বরং অবশ্যই তা ঐশী ক্ষমতা।

فَحَشَرَ আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য : فَحَشَرَ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন।

১. কারো মতে جَمَعَ جُنُوْدَهٗ لِلْقِتَالِ وَالْمُحَارَبَةِ অর্থাৎ সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী একত্রিত করল।

২. কারো মতে جَمَعَ السَّحَرَةَ لِلْمُعَارَضَةِ অর্থাৎ বিরোধিতা ও প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে সকল জাদুকরদের একত্রিত করল।

৩. অথবা, جَمَعَ النَّاسَ لِلْحُضُوْرِ لِيُشَاهِدُوْا مَا يَقَعُ অর্থাৎ সকল জনতাকে দৃশ্য দেখার নিমিত্তে উপস্থিত করেছিল।

৪. অথবা, তাকে সাপ হতে রেহাই দেওয়ার জন্য সকল শ্রেণির জনতাকে উপস্থিত করেছিল। جَمَعَ النَّاسَ لِيُنْقِذُوْهُ مِنَ الْحَيَّةِ। -[কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

فَنَادٰى -এর অর্থ এবং কিভাবে ডাক দিয়েছিল? : এ প্রশ্নদ্বয়ের জবাবে মুফাসসিরগণের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য–

১. সমস্ত উপস্থিত জনতার সামনে ডাক দিয়ে ফেরাউন তার নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেছিল।

২. অথবা, ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল।

৩. অথবা, ফেরাউন নিজে বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফেরাউন জনতার সামনে দু'টি বক্তব্য রেখেছিল, তন্মধ্যে একটি হলো 'আমি ছাড়া তোমার কোনো ইলাহ নেই'; দ্বিতীয়টি হলো 'আমিই তোমাদের বড় রব বা প্রতিপালক'।

উপরোল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা অভিশপ্ত ফেরাউন নিজেকে ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং নিজের মাহাত্ম্য এবং উত্তমতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, কাবীর]

ডাকের আগে কি একত্র হওয়া যায়? : কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, فَحَشَرَ فَنَادٰى "সমবেত করল তারপর ডাক দিল।" এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে সমবেত করা হয়েছে তারপর ডাক দিয়েছে। অথচ ডাক দেওয়ার আগে সমবেত করা সম্ভব নয়। এ কারণে বলা হয়েছে, বাক্যটির মধ্যে আগ-পর রয়েছে। মূলবাক্য এভাবে ছিল যে, فَنَادٰى فَحَشَرَ -[কুরতুবী]

অথবা, فَنَادٰى অর্থ ডাক বা আহ্বান হয়; বরং ঘোষণা করা। তখন অর্থ হবে, ফেরাউন সকলকে একত্র করল, তারপর কিছু ঘোষণা দিল।

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى আয়াতের মর্মার্থ : ফেরাউনের উপরিউক্ত দাবিটি কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। এক জায়গায় সে হযরত মূসা (আ.) -কে লক্ষ্য করে বলে, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও আল্লাহ বানাও, তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করবো। (সূরা শু'আরা : আয়াত ২৯) একবার সে নিজ দরবারের লোকজনদেরকে সম্বোধন করে বলল, হে জাতির নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ আছে– এ কথা আমার জানা নেই। (সূরা আল-কাসাস : আয়াত ৩৮) কিন্তু এ ধরনের কথা বলে বাহ্যত খোদা হওয়ার দাবি করলেও মূলত সে তা দাবি করতে চায়নি যে, সেই বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা এবং এ সবকিছু সে সৃষ্টি করেছে। বস্তুত সে নিজে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না এবং নিজেকে রাব্বুল আলামীন বলে কখনো মনে করত না। এ সঙ্গে ধর্মীয় অর্থের দিক দিয়ে কেবলমাত্র নিজেকেই সে মাবুদ ঘোষণা করত এমন কথাও নয়। কুরআনেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধর্মীয় দিক দিয়ে সে নিজেই অন্য মাবুদের উপাসনা করত। তার দরবারের লোকেরা একবার তাকে বলেছিল, আপনি কি মূসা ও তার লোকজনকে এ স্বাধীনতা দিতে থাকবেন যে, তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আপনাকে ও আপনার উপাসকদেরকে ত্যাগ করবে? [সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১২৭] এটা হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউন ধর্মীয় সৃষ্টিতে ইলাহ হবার দাবি করেনি। সে একান্তই রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নিজেকে ইলাহ বা শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক বলে দাবি করত। অন্যকথায় তার দাবির তাৎপর্য এই যে, সে নিজেকে সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক বলে দাবি করত। তার বক্তব্য এরূপ ছিল যে, আমার এ রাজ্যে আমি ছাড়া আইন-বিধান চালাবার অধিকার আর কারো নেই এবং আমার উপর অন্য কোনো উচ্চতর এমন ক্ষমতাশালী কেউ নেই, যার ফরমান এখানে কার্যকর হতে পারে। -(ফাতহুল কাদীর, কাবীর)

এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, ছা'লাবী তার 'আরায়েস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মিসরের একটি গোসলখানায় ফেরাউনের সামনে শয়তান মানুষের ছবি ধরে এসেছিল; কিন্তু ফেরাউন তাকে চিনতে পারেনি। শয়তান তাকে বলল, তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? উত্তরে সে বলল, না। শয়তান বলল, তাহলে ব্যাপারটি কেমন হলো– আমাকে তুমি সৃষ্টি করলে অথচ আমাকে চিনছ না? তুমি কি বলনি যে, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى অর্থাৎ আমিই তোমাদের মহান-শ্রেষ্ঠ রব? -[কুরতুবী]

رَبّ -এর অর্থ এবং আয়াতে তা দ্বারা উদ্দেশ্য : আরবি ভাষায় 'রব' শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়–

১. মালিক, প্রভু, মনিব। ২. লালনপালনকারী, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৩. আদেশদাতা, বিধানদাতা, শাসক, বিচারক, কার্যনির্বাহক, শৃঙ্খলা বিধায়ক। আল্লাহ তা'আলা এ সকল অর্থেই বিশ্বের 'রব'।

আয়াতে نِدَاءٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : অত্র আয়াতে نِدَاءٌ-এর অর্থে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ক. ফেরাউন নিজেই বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছিল। খ. অথবা কোনো ঘোষণাকারীর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিল। গ. অথবা, উপস্থিত জনতা তার বক্তব্য শোনার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেছিল। ঘ. রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, ফেরাউন তার বক্তব্যে দু'টি দাবি করেছিল, এক. আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো মা'বুদ আছে বলে আমার জানা নেই। দুই. আমিই তোমাদের বড় রব-প্রভু।

মোটকথা, ফেরাউন আত্ম অহংকারে লিপ্ত হয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে জাহির করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন, জমা করল ও আহ্বান করল, অথচ আহ্বান করা তো একত্রিত করার পূর্বে হয়? : মুফাসসিরগণ আলোচ্য প্রশ্নের দু'টি উত্তর দিয়েছেন–

১. আল্লাহর বাণী فَحَشَرَ فَنَادَىٰ -এর মধ্যে আগপর (تَقْدِيم - تَاخِير) হয়ে গেছে। মূলত বাক্যটি এরূপ فَنَادَى فَحَشَرَ অর্থাৎ প্রথমে আহ্বান জানাল, তারপর একত্রিত করল, কেননা প্রথমে সমবেত হওয়ার জন্য জনতাকে আহ্বান করতে হয় তারপর তারা একত্রিত হয়। এমন নয় যে, আগে তারা একত্রিত হয়, তারপর তাদেরকে আহ্বান করা হয়।

২. অথবা এখানে نداء -এর দ্বারা আহ্বান উদ্দেশ্য নয়; বরং বক্তব্য পেশ করা কিংবা কোনো কথার দ্বারা স্বীয় বক্তব্যের প্রতি জনতার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন তার সেনাবাহিনীকে কখন এবং কেন পাকড়াও করেছিলেন? : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের দু'টি উক্তির কারণে তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। তার প্রথম উক্তিটি হলো, সে তার অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিল–"مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي" অর্থাৎ 'আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ [মাবুদ] আছে বলে আমার জানা নেই।' অতঃপর আবার সে তার লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলল, "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ" অর্থাৎ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব আমার উপর তোমাদের অন্য কোনো রব নেই।

উক্ত দু'টি দাবির মাঝে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। প্রথম উক্তিটি করার পরও আল্লাহ তা'আলা তাকে সংশোধনের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সেই সুযোগ গ্রহণ করেনি; বরং তার ঔদ্ধত্য ও আল্লাহদ্রোহীতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেল। হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত সে শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হলো না; বরং বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে দিল। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। তাকে ও তার অনুসারী (সৈন্য) দেরকে নীল নদে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিলেন।

"نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ"-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : এ ব্যাপারে মুফাসসিরের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

ক. এখানে "نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ" দ্বারা ফেরাউনের প্রথম উক্তি ও শেষ উক্তিকে বুঝানো হয়েছে। প্রথম উক্তি হলো "مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي" অর্থাৎ আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ আছে বলে আমার জানা নেই। আর দ্বিতীয় উক্তি দ্বারা তার নিম্নোক্ত উক্তিকে বুঝানো হয়েছে "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ" অর্থাৎ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত মুজাহিদ ও ইকরামাহ (র.) প্রমুখগণ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, "نَكَالَ الْأُولَىٰ" দ্বারা তার প্রথম বয়সের শাস্তি এবং "نَكَالَ الْآخِرَةِ"-এর দ্বারা তার শেষ বয়সের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে,

গ. একদল মুফাসসিরের মতে "نَكَالَ الْأُولَىٰ" দ্বারা হযরত মূসা (আ.) -কে অস্বীকার করার শাস্তি এবং "نَكَالَ الْآخِرَةِ" -এর দ্বারা أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ বলার আজাবকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ. কারো কারো মতে "نَكَالَ الْأُولَىٰ" হলো নীল নদীতে ডুবিয়ে মারা আর نَكَالَ الْآخِرَةِ হলো পরকালের শাস্তি। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

পরকালের শাস্তিকে ইহকালের শাস্তির পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কেন? : আলোচ্য আয়াতে "نَكَالَ الْآخِرَةِ" -কে "الْأُولَىٰ"-এর পূর্বে নেওয়া হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে।

ক. পরকালের শাস্তি স্থায়ী এবং ইহকালের শাস্তি ক্ষণস্থায়ী।

খ. পরকালের তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি নগণ্য ও লঘু।

গ. পরকালের শাস্তিই প্রকৃত শাস্তি, দুনিয়ার শাস্তি শুধু শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেওয়া হয়।

ঘ. অন্যান্য আয়াতের সাথে قَافِيَة -এর সমতা রক্ষার জন্য الْآخِرَةِ শব্দটিকে পরে এবং الْأُولَىٰ-কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। –[যিলাল]

ফেরাউনের ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় : একথা দিবালোকের মতো সত্য যে, দুনিয়ার শাস্তি ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের শাস্তির তুলনায় তা কিছুই নয়। তারপরও ফেরাউনের শাস্তি ছিল মারাত্মক। তার জন্য দুনিয়ার শাস্তি যদি এমন মারাত্মক হয়, তাহলে আখেরাতের শাস্তি কত মারাত্মক হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যে ফেরাউন এতবেশি শক্তির অধিকারী ছিল, ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছিল, তার যদি শেষ পরিণাম এই হয় তাহলে অন্যদের কি অবস্থা হতে পারে? –[যিলাল]

অতএব, সকল প্রকার ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও সমাজপতির উচিত ফেরাউনের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, আল্লাহর অবাধ্যতা ছেড়ে দেওয়া, নবীদেরকে স্বীকার করে নেওয়া, নচেৎ ফেরাউনের যে পরিণতি হয়েছিল এখনও তাদের ঐ পরিণতি হতে পারে। কেননা যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদের সহযোগিতা করেছিলেন। বস্তুত হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের এ ঘটনায় বিরাট শিক্ষা রয়েছে, একমাত্র আল্লাহভীরুদের জন্য।

অনুবাদ :

২৭. أَأَنْتُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا وَتَسْهِيلِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرَى وَتَرْكِهِ أَيْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ج أَشَدُّ خَلْقًا بَنٰهَا بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ خَلْقِهَا .

২৭. তোমরাই কি শব্দটি উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয়টিকে আলিফ রূপে পরিবর্তিত করে তাসহীল করত তাসহীলকৃত হামযা ও অপরটির মাধ্যখানে আলিফ বর্ধিত করে এটা বর্জন করে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত অস্বীকারকারীগণ। সৃষ্টিকরণ কঠিনতর, না আকাশ? সৃষ্টিকরণে কঠিনতর। তিনিই তা স্থাপন করেছেন এটা সৃষ্টির প্রকৃতি সম্পর্কিত বর্ণনা।

২৮. رَفَعَ سَمْكَهَا تَفْسِيرٌ لِكَيْفِيَّةِ الْبِنَاءِ أَيْ جَعَلَ سَمْتَهَا مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ رَفِيعًا وَقِيلَ سَمْكَهَا سَقْفَهَا فَسَوّٰهَا جَعَلَهَا مُسْتَوِيَةً بِلَا عَيْبٍ .

২৮. তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন এটা স্থাপন করার প্রকৃতির ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তার আকৃতিকে উচ্চতার দিক হতে সমুচ্চ করেছেন। আর কেউ কেউ তা দ্বারা ছাদ উদ্দেশ্য করেছেন এবং তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তাকে ত্রুটিমুক্তভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন।

২৯. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا أَظْلَمَهُ وَأَخْرَجَ ضُحٰهَا أَبْرَزَ نُورَ شَمْسِهَا وَأُضِيفَ إِلَيْهَا اللَّيْلُ لِأَنَّهُ ظِلُّهَا وَالشَّمْسُ لِأَنَّهَا سِرَاجُهَا .

২৯. আর তিনি তার রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন তাকে অন্ধকার করেছেন আর তার সূর্যালোককে প্রকাশিত কারেছেন তার সূর্যের আলোক প্রকাশ করেছেন। রাত্রিকে আকাশের প্রতি এ জন্য সম্পর্কিত করেছেন, যেহেতু তা তারই আলোকবর্তিকা।

৩০. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا بَسَطَهَا وَكَانَتْ مَخْلُوقَةً قَبْلَ السَّمَاءِ مِنْ غَيْرِ دَحْوٍ .

৩০. আর পৃথিবীকে তারপর বিস্তৃত করেছেন সম্প্রসারিত করেছেন। আর পৃথিবী আকাশের পূর্বে অবিস্তৃত অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল।

৩১. أَخْرَجَ حَالٌ بِإِضْمَارِ قَدْ أَيْ مُخْرِجًا مِنْهَا مَاءَهَا بِتَفْجِيرِ عُيُونِهَا وَمَرْعٰهَا مَا تَرْعَاهُ النَّعَمُ مِنَ الشَّجَرِ وَالْعُشْبِ وَمَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ مِنَ الْأَقْوَاتِ وَالثِّمَارِ وَإِطْلَاقُ الْمَرْعٰى عَلَيْهِ اسْتِعَارَةٌ .

৩১. বহির্গত করেছেন এটা قَدْ উহ্য করে حَالٌ অর্থাৎ مُخْرِجًا তা হতে এটার পানি তা হতে ঝরনাধারা সৃষ্টি করে এবং এর তৃণরাজি বৃক্ষচারা ও ঘাস যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে এবং যা কিছু মানুষ খাদ্য ও ফল ভক্ষণ করে। সেক্ষেত্রে এর উপর مَرْعٰى শব্দের ব্যবহার اِسْتِعَارَةٌ হিসেবে গণ্য হবে।

৩২. وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا أَثْبَتَهَا عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ لِتَسْكُنَ .

৩২. আর পর্বতকে তিনি প্রোথিত করেছেন পৃথিবীর উপরিভাগে স্থাপন করেছেন, যাতে এটা স্থির থাকে।

٣٣. مَتَاعًا مَفْعُوْلٌ لَهُ الْمُقَدَّرِ اَىْ فَعَلَ ذٰلِكَ مُتْعَةً اَوْ مَصْدَرٌ اَىْ تَمْتِيْعًا لَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ جَمْعُ نَعَمٍ وَهِىَ الْاِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ـ

৩৩. ভোগ সম্পদ এটা উহ্য فَعَلَ অর্থাৎ فَعَلَ ذٰلِكَ এবং مَفْعُوْل لَهُ অথবা مَصْدَرٌ অর্থাৎ تَمْتِيْعًا তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য اَنْعَامٌ শব্দটি نَعَمٌ-এর বহুবচন, আর তা হলো উষ্ট্র, গরু ও ছাগল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَالْاَرْضَ دَحٰهَا" : উক্ত আয়াতে اَلْاَرْضَ-এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. এটা مَرْفُوْعٌ-এর মহল্লে হবে। এমতাবস্থায় এটা মুবতাদা হবে এবং دَحٰهَا এটার খবর হবে। আবূ হাসান, আমর ইবনে মায়মূন, ইবনে আবী আবলা, আবু হাইওয়াহ,আবুস সিমাক ও ইবনে আসেম (র.) প্রমুখগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২. এটা মহল্লান মানসূব হবে। এমতাবস্থায় এটা "مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ" -এর শ্রেণিভুক্ত হবে। মূলত বাক্যটি ছিল دَحَا الْاَرْضَ دَحٰهَا এটা জমহুরের মাযহাব।

اَلْجِبَالَ-এর মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী اَلْجِبَالَ-এর মধ্যেও দু' ধরনের ই'রাব প্রযোজ্য।

১. এটা مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ হিসেবে মানসূব-এর মহল্লে হবে। মূলত বাক্যটি হবে اَرْسٰى الْجِبَالَ اَرْسٰهَا

২. অথবা এটা মুবতাদা হিসেবে মহল্লান মারফূ' হবে।

مَتَاعًا-এর মহল্লে ই'রাব : مَتَاعٌ-এর মহল্লে ই'রাব সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়–

১. 'মাফউলে লাহু' হিসেবে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ পিছনের সকল বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন– কেন করেছেন? একমাত্র مَتَاعًا لَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর ভোগের জন্য।

২. مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে। এর পূর্বে একটি ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। তা হলো মূলবাক্য এভাবে হবে যে, مَتَّعَكُمْ بِذٰلِكَ مَتَاعًا ـ

৩. অথবা, مَصْدَرٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ হয়েছে। কেননা, পিছনের اَخْرَجَ ক্রিয়াটি مَتَّعَ-এর অর্থ দেয়। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা প্রথমত কাফের ও মুশরিকদের কর্তৃক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ফেরাউনের ঘটনার উল্লেখ করত পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতগুলোতে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতার উপর দলিল পেশ করেছেন। অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় বিষয়টি বিরোধীদেরকে বোধগম্য করাতে চেয়েছেন। কাজেই একেবারে সহজ-সরল ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, যিনি এ মহাসৌরজগৎকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।

اَنْتُمْ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : উল্লিখিত আয়াতে ঐ সমস্ত মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে। তাদের ধারণা ছিল যে, পুনরুত্থান একটি কঠিন কাজ, এটা কোনোরূপেই সম্ভব নয়। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

অথবা, সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

কিয়ামতের যৌক্তিকতা : আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে ভ্রান্ত মানব! তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না এ আকাশ সৃষ্টি করা কঠিনতর। যে সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টা এ বিশাল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং তার ছাদকে সুউচ্চ করে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন এবং যিনি রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করত দিনকে আলোক উদ্ভাসিত করেছেন, তাঁর পক্ষে আকাশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র মানবকে সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত করা কি একান্তই তুচ্ছ ব্যাপার নয়? –[কাবীর]

এখানে কাজের গুরুত্ব ও লঘুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই কেবল কঠিন ও সহজ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট কোনো কিছুই কঠিন নয়। সকল কাজই সমান সহজ।

উদ্ধৃত আয়াতে 'আকাশের রাত্র' এবং 'আকাশের দিন' এ জন্য বলা হয়েছে যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত দ্বারাই রাত্র ও দিন আসে। তা ছাড়া সূর্য আকাশের মধ্যে অবস্থিত।

পুনরুজ্জীবন আল্লাহর পক্ষে সহজ : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমরা আরো লক্ষ্য করে দেখ যে, এ পৃথিবী তোমাদের জন্য কিরূপে সম্প্রসারিত করে সমভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার কিছু অংশ পানিপূর্ণ নদী ও প্রস্রবণ আর কিছু সমভূমি। এ সমভূমির মধ্যে আবার কিছু অংশে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আর কিছু অংশে তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য শস্যশ্যামল ও তৃণলতাপূর্ণ চারণভূমি তৈরি করেছি। এটা প্রত্যক্ষ করলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, পরকালে পুনরুজ্জীবন দান করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا আয়াতাংশের وَقْف নিয়ে মতভেদ : ইমাম কিসায়ী, ফাররা, যুজাজ (র.) اَلسَّمَاءُ শব্দের পরে وَقْف করে পড়েছেন এবং بَنَاهَا হতে নতুন বাক্য শুরু বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আর আবূ হাতিমের নিকট بَنَاهَا-এর পরে وَقْف কেননা بَنَاهَا শব্দদ্বয় اَلسَّمَاءُ-এর صِلَةٌ মূল্যবাক্য এভাবে ছিল أَمِ السَّمَاءُ الَّتِي بَنَاهَا এখানে اَلَّتِي -কে উহ্য করা হয়েছে। এরূপ উহ্য বৈধ। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

بَنَاهَا ক্রিয়ার কর্তা : بَنَاهَا ক্রিয়ার কর্তা উহ্য রয়েছে। তা হলো اَللّٰهُ আকাশের সৃষ্টিকর্তাকে এ কথা সর্বসম্মতিক্রমে সকলের নিকট পরিষ্কার আছে বলে উল্লেখ করা হয়নি। এতে আল্লাহর শান বুলন্দ বুঝায়। -[রূহুল মা'আনী]

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا আয়াতে سَمْك ও سَوَّاهَا-এর অর্থ : মুফাসসির سَمْك-এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন।

ক. কেউ কেউ বলেছেন اَلسَّمْكُ هُوَ الْاِرْتِفَاعُ অর্থাৎ سَمْك অর্থ উপরে উঠানো। যেমন- বলা হয় سَمَكْتُ الشَّيْءَ অর্থাৎ বস্তুকে হাওয়ার উপর উঠিয়ে দিলাম।

খ. ইমাম বাগাবী (র.) বলেছেন, اَلسَّمْكُ هُوَ السَّقْفُ অর্থাৎ سَمْك অর্থ- ছাদ।

গ. কারো কারো মতে আসমানের দিককে سَمْك বলে।

ঘ. কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, জমিন হতে আসমান পর্যন্ত দূরত্বকে سَمْك বলে। এর দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা। -[কুরতুবী, যিলাল]

سَوَّاهَا-এর অর্থ : মহান আল্লাহ আসমানকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ত্রুটিমুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে কোনোরূপ ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা নেই, যেমনি বলা হয় سَوّٰى فُلَانٌ اَمْرَهٗ অর্থাৎ সে তার কাজটি পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্তভাবে সমাপন করেছে।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا বাক্যে اَلْغَطْشُ - اَلْغَطْشُ -এর অর্থ : اَلْغَطْشُ শব্দের অর্থ হলো اَلظُّلْمَةُ অন্ধকার। আর اَغْطَشَ অন্ধকার করেছেন। যখন পুরুষ এবং মহিলা হেদায়েত গ্রহণ না করে তখন বলা হয়- رَجُلٌ اَغْطَشُ ও اِمْرَأَةٌ غَطْشٌ

ইমাম রাগিব (র.) বলেন, اَلْاَغْطَشُ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার চক্ষুতে দুর্বলতা এসেছে ঐ দুর্বলতার কারণে সে রাস্তা-ঘাট দেখতে পায় না। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়, فَلَاةٌ غَطْشٌ অর্থাৎ যে মাঠে পথ পাওয়া যায় না। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

রাত্রকে আকাশের দিকে সম্বোধন করার কারণ : اَغْطَشَ لَيْلَهَا আয়াতাংশে لَيْل শব্দটিকে هَا সর্বনামের দিকে اِضَافَتْ করা হয়েছে। আর هَا দ্বারা اَلسَّمَاءُ-ই উদ্দেশ্য। অর্থ দাঁড়ায় 'আকাশের রাত্রি'। কেননা, সূর্যাস্তের মাধ্যমে রাত্রি হয়। আর সূর্য হলো আকাশে। এ কারণে نُجُوْمُ اللَّيْلِ বা রাত্রের তারকারাজি বলা হয় ঐ তারকাপুঞ্জকে যেগুলো রাত্রে উদিত হয়। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

ضُحٰى অর্থ এবং আয়াতে ضُحٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়কে ضُحٰى বলা হয়; কিন্তু আয়াতে পূর্ণ দিনই উদ্দেশ্য। তবে প্রশ্ন হলো نَهَار না বলে ضُحٰى কেন বলা হয়েছে? মুফাসসিরগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, ضُحٰى এমন একটি সময় যা দিনের উত্তম সময়কে বুঝায়। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মূল অংশের দ্বারা পূর্ণ বস্তুর নাম রাখা যায়। যেমন- رَأْسٌ বলে পূর্ণ শরীর বুঝানো যায়। এ ব্যাপারে ইমাম রাযী (র.) বলেন, ضُحٰى তে আলো বেশি, তাই ضُحٰى দিয়ে نَهَارٌ বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ "وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا" : "অতঃপর জমিনকে সমভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন" এ কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান সৃষ্টির পর জমিন সৃষ্টি করেছেন। এখানে কথার ধরনটি এমন, যেমন আমরা কোনো প্রসঙ্গে বলে থাকি, তারপর এ কথাও চিন্তা করতে হবে ইত্যাদি। এতে কখনো ঘটনার পরপর বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না। দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা কথাটি অনিবার্যভাবে প্রথম কথাটির পরে হতে হবে এমন জরুরি নয়। আসলে একটা কথার পর আর একটা কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এ ধরনের কথার মূল উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বাক্যরীতির একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সূরা আল-কালামে বলা হয়েছে عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ অর্থাৎ অত্যাচারী, অতঃপর জারজ। এটার সঠিক অর্থ হলো সে লোকটি দুর্ধর্ষ অত্যাচারী, উপরন্তু জারজও।

পবিত্র কুরআনে সূরা হা-মীম সাজদাহ এবং সূরা বাক্বারার ২৯ আয়াতে ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ "অতঃপর আকাশের দিকে লক্ষ্য করলেন" বা মনোযোগ করলেন। এ বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবী প্রথমে সৃষ্টি করার পর আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ প্রথমে জমিন সৃষ্টি করেন, অতঃপর আকাশ সৃষ্টি করেন। অতঃপর আকাশকে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করলেন, তারপর জমিনকে প্রশস্ত করে বিছিয়ে দিলেন। ফলে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকছে না। ইমাম হাকেম হতে বর্ণিত হয়েছে– রবি ও সোমবারে ভূ-মণ্ডল, মঙ্গলবারে পাহাড়-পর্বত, বুধবারে বৃক্ষরাজি লতাপাতা এবং বৃহস্পতি ও শুক্রবারে নভোমণ্ডলকে সৃজন করা হয়েছে। –[জালালাইন]

কেউ কেউ বলেন– عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ এবং وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا উভয় আয়াতেই بَعْدَ ذٰلِكَ-এর পরিবর্তে প্রকৃত অর্থে مَعَ ذٰلِكَ 'উক্ত' হবে। অর্থ হবে– উপরন্তু জমিনকে সমভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন। –[খাযেন, রূহুল মা'আনী]

কেউ কেউ বলেন, بَعْدَ অর্থ قَبْلَ [পূর্বে] যেমন কুরআন মাজীদে আছে وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ الذِّكْرِ –[ফাতহুল কাদীর]

دَحٰى-এর অর্থ : আরব ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ হতে دَحَا-এর কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

ক. دَحَا অর্থ بَسَطَ অর্থাৎ বিছিয়ে দিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জমিনবাসীর জন্য জমিনকে সমতল করে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

খ. دَحَا অর্থ سَوّٰى অর্থাৎ সমান করে দিয়েছেন, যাতে তা বসবাস উপযোগী হয়।

গ. ইমাম রাগিব (র.)-এর মতে دَحْى-এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে এর মূল স্থান হতে হটিয়ে দেওয়া। এটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতে পৃথিবী মূলত আকাশের একটি [নক্ষত্রের] অংশ যাকে তা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

مَاءٌ ও مَرْعٰى দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন যে, এখানে مَاءٌ-এর দ্বারা নদী-নালাকে বুঝানো হয়েছে এবং مَرْعٰى-এর দ্বারা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য যেমন গাছ-পালা, তরুলতা, খাদ্য-দ্রব্য ও ফলমূল ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.)ও অনুরূপ লিখেছেন।

যা হোক مَرْعٰى দ্বারা যদিও সাধারণত চতুষ্পদ জন্তু খাদ্য (যা উদ্ভিদ জাতীয় হয়ে থাকে) তাকে বুঝানো হয়ে থাকে, তথাপি এখানে শুধু তাই উদ্দেশ্য নয়; বরং যেসব উদ্ভিদ মানুষ ও জন্তু উভয়েরই খাদ্য রূপে গণ্য, তাকে বুঝানো হয়েছে। আরবি ভাষায় رَعْى ও رَتْع বলতে যদিও সাধারণত জন্তু-জানোয়ারের চারণ (খাদ্য) বুঝায় তথাপি কখনো কখনো মানুষের (খাদ্যের) বেলায়ও তার প্রয়োগ হতে দেখা যায়। সূরা ইউসুফে আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর ভাইয়েরা তাদের পিতাকে বলল– اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ অর্থাৎ আগামী কাল ইউসুফকে আপনি আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে খানিকটা বিচরণ করে নিবে এবং খেলা-বেড়া করবে। সুতরাং অত্র আয়াতে জঙ্গলে বিচরণ করে ফলমূল খাওয়াকে يَرْتَعْ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

এসব কিছুই আল্লাহ ও জীব-জন্তুর কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে তাদের আহার ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আল্লাহর নিকট তাদের নত হওয়া এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

পানি এবং চারণভূমিকে পাহাড় গাড়া'র উপর অগ্রগামী করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলেছেন– اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا তারপর বলেছেন وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا অথচ ভূমি বিন্যস্ত করার সময় প্রথমে পাহাড় সংস্থাপন করেছেন, তারপর ঝরনাধারা এবং চারণভূমির ব্যবস্থা করেছেন। এটার জবাবে বলা হয় যে, খাওয়া-দাওয়া এবং পানীয় বস্তুর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য সেগুলোকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

اَرْسٰهَا-এর অর্থ : اَلْاِرْسَاءُ-এর অর্থ اَلْاِثْبَاتُ সংস্থাপন করা, সুদৃঢ় করা, মজবুত করা। আর আয়াতে কারীমায় অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলা পাহাড়কে পেরেক হিসেবে দিয়ে জমিনকে সুদৃঢ় করেছেন, মজবুত করেছেন। –[কুরতুবী]

পাহাড় স্থাপন ও পানি এবং গাছ-পালা সৃষ্টির অর্থ ও রহস্য : اِرْسَاءُ الْجِبَالِ-এর অর্থ হলো জমিনের মধ্যে পাহাড়-পর্বতকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করে দেওয়া, যাতে জমিন হেলেদুলে না পড়ে।

اِخْرَاجُ الْمَاءِ তথা পানি বের করার অর্থ হলো, নদী-নালা সমুদ্র সৃষ্টি করা, যাতে পানির দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য জীব জীবন ধারণ করতে পারে।

اِخْرَاجُ الْمَرْعٰى তথা চারণভূমি সৃষ্টি করার অর্থ হলো গাছপালা ও শস্যদানা ও অন্যান্য জীবনোপকরণ সৃষ্টি করা যাতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা হয়।

অনুবাদ :

٣٤. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ.

৩৪. অনন্তর যখন মহাসঙ্কট উপস্থিত হবে দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুৎকার।

٣٥. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ بَدَلٌ مِنْ إِذَا مَا سَعٰى فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ.

৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে এটা إِذَا হতে بَدَلٌ যা সে সাধন করেছে দুনিয়ায় পুণ্য ও পাপ।

٣٦. وَبُرِّزَتْ أُظْهِرَتِ الْجَحِيْمُ النَّارُ الْمُحْرِقَةُ لِمَنْ يَّرٰى لِكُلِّ رَاءٍ وَجَوَابُ إِذَا.

৩৬. আর প্রকাশ করা হবে উন্মুক্ত করা হবে জাহান্নামকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড দর্শককুলের জন্য সকল দর্শকের জন্য। আর إذا-এর জওয়াব হলো পরবর্তী বক্তব্য।

٣٧. فَأَمَّا مَنْ طَغٰى كَفَرَ.

৩৭. অন্তর যে বিরুদ্ধাচরণ করেছে কুফরি করেছে।

٣٨. وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ.

৩৮. আর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

٣٩. فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى مَأْوَاهُ.

৩৯. নিশ্চয় জাহান্নাম হবে আবাসস্থল তার আশ্রয়স্থল।

٤٠. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ قِيَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَهَى النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ عَنِ الْهَوٰى الْمُرْدِيْ بِاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ.

৪০. আর যে ভয় করেছে তার প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিতিকে তাঁর সম্মুখে হাজির হওয়াকে এবং নফসকে বারণ রেখেছে নফসে আম্মারাহকে নফসানি খাহেশ হতে যে খাহেশ অনুসরণে ধ্বংস অনিবার্য।

٤١. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى وَحَاصِلُ الْجَوَابِ فَالْعَاصِيْ فِي النَّارِ وَالْمُطِيْعُ فِي الْجَنَّةِ.

৪১. নিশ্চয় জান্নাত তার আবাসস্থল জবাবের সারমর্ম এই যে, পাপাচারী জাহান্নামে যাবে এবং বাধ্যানুগত ব্যক্তি বেহেশতে গমন করবে।

٤٢. يَسْئَلُوْنَكَ أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا مَتٰى وُقُوْعُهَا وَقِيَامُهَا.

৪২. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরগণ কিয়ামত সম্পর্কে, এটা কখন সংঘটিত হবে তা কখন সংঘটিত হবে ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

٤٣. فِيْمَ فِيْ أَيِّ شَيْءٍ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا أَيْ لَيْسَ عِنْدَكَ عِلْمُهَا حَتّٰى تَذْكُرَهَا.

৪৩. কি সম্পর্ক فِيْ أَيِّ شَيْءٍ শব্দটি فِيْمَ অর্থে ব্যবহৃত তোমার এই আলোচনার সাথে অর্থাৎ তোমার নিকট এর ইলম নেই যে, তুমি তা আলোচনা করবে.

٤٤. إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا مُنْتَهٰى عِلْمِهَا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.

৪৪. তোমার প্রতিপালকের নিকটই এর শেষ সীমা এর জ্ঞানের শেষ সীমা। তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না।

٤٥. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ إِنَّمَا يَنْفَعُ إِنْذَارُكَ مَنْ يَّخْشٰهَا يَخَافُهَا.

৪৫ তুমি তো ভয় প্রদর্শনকারী তোমার ভয় প্রদর্শনই যে উপকার করবে তাকে যে ভয় করে একে ভয় করে

٤٦. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا فِي قُبُوْرِهِمْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا أَيْ عَشِيَّةَ يَوْمٍ أَوْ بُكْرَتَهُ وَصَحَّ إِضَافَةُ الضُّحٰى إِلَى الْعَشِيَّةِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُلَابَسَةِ إِذْ هُمَا طَرَفَا النَّهَارِ وَحَسَّنَ الْإِضَافَةَ وُقُوْعُ الْكَلِمَةِ فَاصِلَةً.

৪৬. যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা অবস্থান করেনি তাদের কবরসমূহে এক সন্ধ্যা কিংবা এক সকাল মাত্র অর্থাৎ একদিনের সন্ধ্যা বা এর সকাল। সকালের সম্পর্ক সন্ধ্যার সাথে এ জন্য করা হয়েছে, যেহেতু এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা এরা দিবসের দু'প্রান্ত। আর বাক্যটির ব্যবধানের কারণে এই إِضَافَتْ বা সম্পর্কিতকরণের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى এ আয়াতটির মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতটির মহল্লে ই'রাব নিয়ে নাহুবিদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায় إِذَا جَاءَتْ হতে بَدَل كُلّ অথবা بَدَل بَعْض হয়েছে।

কারো মতে- اَلطَّامَّةُ الْكُبْرٰى হতে بَدَلْ হয়েছে, তখন তা মারফূ' হবে কিন্তু বাহ্যিকভাবে يَوْمَ শব্দের উপরে فَتْح দেখা যায়। কেননা কূফাবাসীদের মতে يَوْمَ ক্রিয়ার দিকে إِضَافَةْ হওয়ার কারণে فَتْح হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, جَاءَتْ-এর ظَرْف হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে।

কারো মতে أَعْنِيْ উহ্য ক্রিয়ার মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। আর তা اَلطَّامَّةُ-এর তাফসীর হয়েছে।

-[ফাতহুল কাদীর, রুহুল মা'আনী]

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى আয়াতের মহল্লে ই'রাব : পূর্বে উল্লিখিত إِذَا যদি شَرْطِيَّة হয়, তাহলে ঐ فَأَمَّا مَنْ طَغٰى শর্তের জবাব হবে। কারো মতে إِذَا-এর জবাব উহ্য আছে। আর ঐ উহ্য জবাবের ব্যাখ্যা হলো فَأَمَّا مَنْ طَغٰى -[রুহুল মা'আনী]

هِيَ الْمَأْوٰى-এর هِيَ সর্বনামটির মহল্লে ই'রাব : هِيَ সর্বনামটি ضَمِيْر فَصْل এমতাবস্থায় لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ অর্থাৎ ঐ সর্বনামটির কোনো মহল্লে ই'রাব হবে না।

অথবা, هِيَ সর্বনামটি جَحِيْم-এর দিকে ফিরেছে, তারকীবে মুবতাদা হয়েছে। আর এ هِيَ দিয়ে বাক্যটিকে حَصْر করা হয়েছে। তখন অর্থ এই দাঁড়াবে যে, ঐ জাহান্নামই তাদের ঠিকানা। এটা ছাড়া তাদের আর কোনো ঠিকানাই নেই।

-[রুহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হাশর-নশর-এর উপর শক্তিশালী। প্রথম সৃষ্টি ছিল কঠিন, কিন্তু প্রথমবার-ই যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর নিকট একেবারেই সহজ। এ কথা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন তিনি ঐ হাশরের বাস্তব প্রকাশ সম্পর্কে আলোকপাত শুরু করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ .. -[কাবীর]

পেছনে مَتَاعًا لَّكُمْ আয়াত দ্বারা মানব জীবনের সমস্ত مَعَاشْ [জীবিকা]-এর অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে, এখন مَعَادْ (পুনরুত্থান) সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। [অর্থাৎ পূর্বে দুনিয়ার আলোচনা ছিল, এখন আখেরাতের আলোচনা শুরু হয়েছে।]

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى............ هِيَ الْمَأْوٰى উক্ত আয়াত কয়টির শানে নুযূল : উক্ত আয়াত কয়টির একাধিক শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে।

১. রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াতসমূহ হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) ও তাঁর ভাই আবূ আমির ইবনে ওমায়েরের শানে নাজিল হয়েছে। এ দুই ভাই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু' চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) ছিলেন পূর্ণ মু'মিন, আখেরে রাসূল ও পরকালমুখি। পক্ষান্তরে তার ভাই আবূ আমির ছিল কাফের। রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রাণের শত্রু এবং দুনিয়াদার। আবূ আমির যখন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় তখন মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা.)-এর খাতিরে সাহাবীগণ তাকে বাঁধেননি। হযরত মুসআব (রা.) তা শুনে ক্ষিপ্ত হন এবং তাকে বাঁধার জন্য বলেন। তিনি আরো বলেন যে, তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা-পয়সা ও সম্পদ তার মায়ের নিকট রয়েছে।

আল্লামা কাশ্শাফ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে মুসআব (রা.) তার ভাই আবূ আমিরকে হত্যা করেছিলেন।

উহুদের ময়দানে যখন অন্যরা নবী করীম ﷺ -এর পাশ হতে সরে গিয়েছিল, তখন মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) নিজের জীবন দিয়ে মহানবী ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন। নবী করীম ﷺ -এর চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল।

তাঁর এ আত্মত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবীগণকে বলেছেন যে, আমি তাকে এমতাবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর গায়ে দামী দু'খানা চাদর রয়েছে এবং তাঁর জুতার ফিতা ছিল স্বর্ণের। মুসআব (রা.)-কে নবী করীম ﷺ হিজরতের পূর্বে মদীনায় পাঠিয়ে ছিলেন নবদীক্ষিত মুসলিমদেরকে দীনের তা'লীম দেওয়ার জন্য।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী প্রথমোক্ত আয়াতগুলো মুসআব এবং আবূ আমিরের ব্যাপারে এবং শেষোক্ত আয়াতগুলো আবু জাহলের শানে নাজিল হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম প্রকারের আয়াতগুলো নযর ও তার ছেলে হারিছ-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

মূলত আলোচ্য আয়াতগুলো কারো ব্যাপারে খাস নয়; বরং সকল মু'মিন ও কাফেরের ব্যাপারে প্রযোজ্য। এর সারকথা হলো, আল্লাহর নাফরমান জাহান্নামী হবে এবং তাঁর আনুগত্যকারী জান্নাতী হবে।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ الخ আয়াতসমূহের শানে নুযূল : মক্কার কাফিররা বারবার বিদ্রূপ করে মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করত যে, হে মুহাম্মদ! তুমি যে কিয়মাত (বা পুনরুত্থান)-এর ওয়াদা করছ তা কবে সংঘটিত হবে? মূলত তা জানা ও মানার উদ্দেশ্যে তারা জিজ্ঞাসা করত না; বরং বিদ্রূপ ও রসিকতা করার জন্য তারা এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করত। তাদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত কয়টি নাজিল করেন।

فَاِذَا جَآءَتِ-এর মধ্যকার فَا -এর অর্থ : উক্ত আয়াতে فَا অক্ষরটি تَرْتِيْب (ধারাবাহিকতা) বুঝানোর জন্য হয়েছে। কেননা এর পূর্বে দুনিয়ার সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এখানে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সৃষ্টির পরই ধ্বংস। তা ছাড়া পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে যে مَتَاعٌ [সম্ভোগ উপকরণ]-এর উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ এর কিরূপ ব্যবহার করেছে কিয়ামতের দিবসে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। সুতরাং কাজের পরই পরিণামের ধারাবাহিকতায় এর প্রতিদান হবে।
–[রুহুল মা'আনী]

فَاِذَا جَآءَتِ الخ -এর মধ্যস্থিত اِذَا -এর জবাব কি? : আলোচ্য আয়াতে اِذَا-এর জওয়াব সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মতামত দেখা যায়।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে اِذَا-এর জওয়াব হলো فَاَمَّا مَنْ طَغٰى الخ অর্থাৎ যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে; জাহান্নামকে প্রত্যেক দৃষ্টিমান ব্যক্তির সম্মুখে পেশ করা হবে; তখন আল্লাহর নাফরমান হবে জাহান্নামী এবং আল্লাহর ফরমাবরদারগণ হবে জান্নাতি। এটা জমহুরের মাযহাব।

খ. কারো কারো মতে উক্ত اِذَا-এর জওয়াব উহ্য রয়েছে, তবে সেই উহ্য জওয়াব কি তার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়— উহ্য জওয়াব হলো عَايَنُوْا অর্থাৎ তারা প্রত্যক্ষ করবে।

তা হলো عَلِمُوْا অর্থাৎ তারা জানতে পারবে।

অথবা, তা হলো اُدْخِلَ اَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَاَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ তখন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে এবং জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হবে।

اَلطَّآمَّةُ -এর মর্মার্থ : اَلطَّآمَّةُ-এর অর্থ নিরূপণে মুফাসসিরীনের পক্ষ হতে কয়েকটি মতামত পরিলক্ষিত হচ্ছে–

১. ঐ মহাবিপদ যা অন্যান্য সকল বিপদকে ঢেকে ফেলবে।

২. হযরত হাসান (র.) বলেন, শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক।

৩. হযরত যাহ্হাকসহ আরো কয়েকজনের মতে কিয়ামত, কিয়ামতকে طَآمَّةٌ বলা হয়েছে; কেননা এটা অন্যান্য মসিবত হতে ভয়াবহতার দিক হতে বড় হবে।

৪. ইমাম মুবাররিদ বলেন, আরবদের নিকট طَآمَّةٌ বলা হয় دَاهِيَةٌ বা বিপদকে যা শক্তির বাইরে হয়। আমার ধারণা যে, طَآمَّةٌ শব্দটি তাদের প্রচলিত কথা طَمَّ الْفَرَسُ طَمِيْمًا হতে গৃহীত হয়েছে। কেননা এটা ঐ সময় বলা হয়ে থাকে, যখন ঘোড়া তার গতিতে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করতে শুরু করে। طَمَّ الْمَآءُ বলা হয় ঐ সময় যখন নালা সম্পূর্ণ পানিতে ভর্তি হয়ে যায়।

৫. মুজাহিদসহ আরো কয়েক জনের মতে طَآمَّةٌ বলতে এখানে ঐ সময়ের কথাকে বুঝানো হয়েছে, যে সময় বেহেশতীকে বেহেশতে এবং দোজখীকে দোজখে পৌঁছে দেওয়া হবে। –[ফাতহুল কাদীর, রুহুল মা'আনী]

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেন, দুনিয়ার জীবন ভোগের জীবন, সুবিধার জীবন; কিন্তু ঐ ভোগ সূক্ষ্ম এবং মজবুতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত, ঐ ভোগ এমন একটি নিয়মের অধীনে যে নিয়ম পূর্ণ সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। তবে এ ভোগ একটি সীমায় গিয়ে বিদায় নিবে, আর এসে পড়বে মহাবিপদ যে মহাবিপদ সকল কিছুকে ঢেকে ফেলবে। ঢেকে ফেলবে পূর্ণ সৃষ্টিকে আকাশ, জমিন আর পাহাড়-পর্বতমালাকে।

৬. ইবনে আবী শায়বা, ইবনুল মুনযির, কাসেম ইবনুল ওয়ালীদ (র.) হামানীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, اَلطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى সেই মুহূর্ত, যখন দোজখীদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। –[নূরুল কোরআন]

হাশরের ময়দানের অবস্থা : পরলোকে অবধারিত পুনরুত্থানের সত্যতা সম্বন্ধে নিজের অলৌকিক সৃষ্টিশক্তির বিষয় বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যেদিন সে মহাসংকট দিবস উপস্থিত হবে, সেদিন মানব নিজেদের কৃতকর্মকে স্মরণ করবে ঐ দিনই সেই ভয়াবহ জাহান্নামকে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করা হবে। তখন অবস্থা এরূপ হবে, যে ব্যক্তি সত্যপথ ছেড়ে নাফরমানি করেছে এবং পরকালের প্রতি আস্থাহীন হওয়ার কারণে দুনিয়ার জিন্দেগিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার জন্য জাহান্নামই বাসস্থান হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় থাকতে নিজের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে, অর্থাৎ পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখার কারণে হাশরের বিচার সম্বন্ধে ভয় পোষণ করেছে ও আত্মাকে কুপ্রবৃত্তির হাত হতে বাঁচিয়ে রেখেছে অবশ্যই তার স্থান বেহেশতে হবে। বেহেশতে তার কোনো কামনাই অপূর্ণ থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ব্যভিচার হতে বিরত থাকে, কিংবা আল্লাহর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নির্জনে রোদন করে, এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ মহান আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

مَا سَعٰى আয়াতাংশের مَا-এর অর্থ : مَا سَعٰى-এর مَا দুধরনের হতে পারে–

ক. مَا মাওসূলাহ্, এর সেলাতে একটি সর্বনাম উহ্য রয়েছে। তা হলো ه, তখন মূলবাক্য এভাবে হবে يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى لَهُ مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ -

খ. مَا মাসদারিয়াহ্, তখন মূলবাক্য এভাবে হবে যে, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ سَعْيَهُ –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى-এর মর্মার্থ : কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভালোমন্দ কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করবে, দেখতে পাবে যে, সমস্ত কর্মকাণ্ড দফতরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অথচ তা সে চরম গাফিলতির দরুন অথবা অধিক সময়ের ব্যবধানে অথবা হাশরের ময়দানে ভয়াবহতার কারণে অথবা নিজের কৃতকর্মের কারণে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ –[রূহুল মা'আনী]

মানুষ যখন নিজেই প্রত্যক্ষ করবে যে, যে হিসাব-নিকাশ হবে বলে তাকে আগাম খবর দেওয়া হয়েছিল, তাই আজ সম্মুখে উপস্থিত, তখন তার হাতে তার আমলনামা এসে পৌঁছার আগেই দুনিয়ার জীবনে তার নিজের কৃতকর্ম এক একটি করে তার স্মরণে ভেসে উঠবে। এরূপ যে হতে পারে কোনো কোনো লোক এ দুনিয়ায়-ই তার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। কেউ যদি এমন কোনো কঠিন বিপদে নিপতিত হয়, যখন মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত বলে মনে হয়, তখন তার নিজের অতীত জীবনে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা ও কাজকর্ম ফিল্মের রূপালী পর্দার মতো মানস পটে সহসাই ভাস্বর হয়ে উঠে।

মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে, স্মৃতিপটে উপস্থাপন করবে, এমতাবস্থায় তার আফসোস আর আফসোসই বাড়বে, অন্য কোনো উপকারে আসবে না। আর কিছুক্ষণ পরে সেই ওয়াদাকৃত প্রকট শাস্তি পাবে–এ কথাও তার স্মৃতিপটে ভাসতে থাকবে। –[যিলাল]

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى বাক্যে এর-بُرِّزَتْ এর অর্থ : بُرِّزَتْ অর্থ أُظْهِرَتْ إِظْهَارًا তথা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে, কারো নিকট গোপন থাকবে না।

হযরত মুকাতিল বলেন, জাহান্নামের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হবে, তখন সকল সৃষ্টজীব তা প্রত্যক্ষ করবে।
–[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

এক কথায়, সেদিন জাহান্নাম সকলের নিকট প্রকাশিত হবে, কারো নিকট গোপন থাকবে না।

بُرِّزَتْ শব্দটি তাশদীদযুক্ত করার কারণ : মূলত بَرَزَ - يَبْرُزُ বাবে إِفْعَالٌ হতেও إِبْرَازٌ অর্থ 'প্রকাশ করা' আসে; কিন্তু ঐ বাব হতে সীগাহ ব্যবহার না করে বাবে تَفْعِيْلٌ হতে তাশদীদযুক্ত ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা- كَثْرَةُ الْحُرُوْفِ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِيْ (শব্দের মধ্যে বেশি অক্ষর হলে অর্থও বেশি) বুঝায়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, تَشْدِيْد যুক্ত শব্দ যেমন পড়তে একটু شَدِيْد তদ্রূপ অর্থেও شَدِيْد বা কঠিন।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেন, بُرِّزَتْ শব্দে তাশদীদযুক্ত হওয়ায় অর্থেও তাশদীদ বুঝায়। এমতাবস্থায় দর্শকের অবস্থা হিসেবে জাহান্নাম দেখা যাবে। যে যত মারাত্মক তার দৃষ্টিতে ততই মারাত্মক অনুভূত হবে। –[যিলাল]

لِمَنْ يَّرٰى আয়াতাংশে দ্বারা উদ্দেশ্য : কারা দেখবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়–

কারো মতে, কাফেরগণ দেখবে মু'মিনগণ নয়– মূলত প্রত্যেক দর্শকই দেখবে। তবে মু'মিনগণ দেখামাত্র আল্লাহর নিয়ামতের কদর বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তাদেরকে এমন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু কাফেরগণের চিন্তার পরিবর্ধন ঘটবে, পূর্বের হায়-হুতাশ আরো বৃদ্ধি পাবে। –[ফাতহুল কাদীর]

জাহান্নাম প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক চক্ষু ও দৃষ্টিবান ব্যক্তি তা দেখতে পাবে। তাতে মু'মিন ও কাফের উভয়ই শামিল, কিন্তু তা একমাত্র কাফেরদের আবাসস্থল, আর মু'মিনগণ তার উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। এ ব্যাখ্যার পিছনে অন্য একটি আয়াত পূর্ণ সহযোগিতা করছে। যেমন– وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا হতে ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا তবে শুধু কাফিরদের ব্যাপারে একটি আয়াত পাওয়া যায় وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ এখানে غَاوِيْنَ দের জন্য খাস করা হয়েছে। তখন জবাব দেওয়া হয়েছে যে, প্রকাশিত করা হবে غَاوِيْنَ দের জন্য, কিন্তু মু'মিনগণ যখন এর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতে থাকবে তখন তা দেখবে।
–[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ...... الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে আল্লাহর নাফরমানদের কার্যকলাপ ও এর পরিণাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

যারা এ দুনিয়ায় অবস্থানকালে সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়ে কুফরকে এখতিয়ার করেছে, নিজের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে আখেরাতে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম তথায় সে স্থায়ী আজাব ভোগ করবে।

অপরদিকে যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করেছে এবং এ ভয় করেছে যে, পরকালে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে তার প্রতিটি কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। তার কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। উপরন্তু সে নিজেকে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বিরত রেখেছে, আখেরাতে তার আবাসস্থল হবে জান্নাত, তথায় সে চিরকাল শান্তিতে অবস্থান করবে।

পরকালে ফয়সালার মাপকাঠি [ভিত্তি] কি হবে? : পরকালে আসল ফয়সালার ভিত্তি কি হবে এখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দে তা বলে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত দুনিয়াই জীবনের একটি আচরণ এরূপে যে, মানুষ আল্লাহর দাসত্ব সীমা অতিক্রম করে স্পষ্ট আল্লাহ দ্রোহিতায় নিমজ্জিত হবে এবং সিদ্ধান্ত করে নিবে যে, যে কোনো উপায়েই সম্ভব দুনিয়ার স্বার্থ সুযোগ-সুবিধা ও স্বাদ আস্বাদন লাভ-ই তার চরম লক্ষ্য। অন্য একটি আচরণ এরূপ যে, এখানে জীবন যাপন করতে গিয়ে প্রতিটি ব্যাপারে মানুষ পরকালে আল্লাহর নিকট হাজির হয়ে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এ কথা মনে রাখবে এবং নফসের খারাপ বাসনা-কামনা দমন করে রাখবে। এ কথা মনে রাখবে যে, এখানে যদি সে নিজের প্রবৃত্তির তাকিদ মেনে নিয়ে জায়েজ নাজায়েজ নির্বিশেষে স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে তা হলো সে আল্লাহর নিকট কি জবাব দিবে, নিজের সে কাজের কি কৈফিয়ত দিবে? মানুষ এ দুনিয়ায় উপরিউক্ত দু' আচরণের মধ্যে কোন প্রকারের আচরণ গ্রহণ করল, পরকালে তাই হবে চূড়ান্ত ফয়সালার মাপকাঠি (ভিত্তি)। প্রথমোক্ত ধরনের আচরণ যারা এখানে গ্রহণ করবে জাহান্নামই হবে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি। পক্ষান্তরে যারা দ্বিতীয় প্রকারের আচরণ গ্রহণ করবে, জান্নাতে যাওয়া ও থাকাই হবে তাদের ভাগ্যলিপি।

আয়াতাংশের উদ্দেশ্য : مَقَامَ رَبِّهٖ বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনের পক্ষ হতে কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়–

১. مَنْ خَافَ مَقَامَهٗ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهٖ অর্থাৎ যে তার প্রভুর সামনে তার নিজের দণ্ডায়মানকে ভয় করেছে।

২. হযরত রবী' বলেন, مَقَامَهٗ يَوْمَ الْحِسَابِ অর্থাৎ হিসাবের দিন তার নিজের অবস্থানকে ভয় করেছে।

৩. হযরত কাতাদাহ্ বলেন– إِنَّ لِلّٰهِ مَقَامًا قَدْ خَافَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য একটি অবস্থান রয়েছে মু'মিনগণই ঐ অবস্থানকে ভয় করে।

৪. হযরত মুজাহিদ বলেন, هُوَ خَوْفُهٗ فِي الدُّنْيَا مِنَ اللّٰهِ عِنْدَ مُوَاقِعِهِ الذَّنْبَ অর্থাৎ এটা হলো দুনিয়াতে পাপ করার সময় মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, যেন তা হতে বিরত থাকতে পারে। –[ফাতহুল কাদীর]

আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখার গুরুত্ব : কুপ্রবৃত্তি হতে আত্মাকে বিরত রাখা, ধৈর্যের সাথে দুনিয়ার জন্য অশ্লীলতা হতে মনকে নিয়ন্ত্রণ করাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য। ভালো দিকগুলোকে গ্রহণ ও নিছক দুনিয়ার ভোগকে বর্জন করা দরকার। দুনিয়ার কৃত্রিম চাকচিক্যে নিজেকে ভাসিয়ে না দেওয়া; বরং যতটুকু করলে দুনিয়াও চলে আখেরাতও পাওয়া যায়; আখেরাতের ক্ষতি হয় না ততটুকু গ্রহণ করা বৈধ। হযরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল (রা.) বলেন, কোনো এক ব্যক্তি পাপ করার ইচ্ছা করল; কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে হিসাব দেওয়ার কথা স্মরণ করে ভয় করল এবং তা ছেড়ে দিল একেই نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى বলা হয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ .....إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সম্পর্কে কাফেরদের জিজ্ঞাসা ও এর জবাব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, হে হাবীব! মক্কায় কাফেররা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, এটা কখন সংঘটিত হবে? অথচ এর সাথে আপনার কি সম্পর্ক? যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে তা অবহিত না করবো ততক্ষণ আপনার পক্ষে তা জানা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহই তা জানেন। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

মক্কার কাফিররা রাসূলে কারীম ﷺ -কে বারবার এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিয়ামত আগমনের দিন সন বা তারিখ জেনে নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করা এবং একে নিয়ে তামাশা বা রসিকতা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

أَيَّانَ مُرْسٰهَا -এর মর্মার্থ :

১. জমহুর মুফাসসিরীনের মতে– أَيَّانَ مُرْسٰهَا অর্থ مَتٰى وُقُوْعُهَا وَقِيَامُهَا অর্থাৎ কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে?

২. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, مُنْتَهٰى قِيَامِهَا অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হওয়ার শেষ সীমা কি? নোঙ্গর দ্বারা যেরূপ নৌকার সীমা নির্ধারণ করা হয় তেমনি কিয়ামতের সীমা কোথায়? এ ব্যাপার তাদের প্রশ্ন।

৩. আবূ উবায়দা (র.) বলেন, مُرْسَى السَّفِيْنَةِ حَيْنَ تَنْتَهِيْ অর্থাৎ জাহাজের যেখানে চলন শেষ হয় সেখানে এর مُرْسٰى বা শেষ সীমা। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ "فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا" :

১. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো– হে রাসূল! কিয়ামত সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না। এটা তো একমাত্র আল্লাহই জানেন। এটা কাফেরদের প্রশ্নের একটি জবাব। অর্থাৎ কোথায় কিয়ামতের জ্ঞান, আর কোথায় আপনি? এই ব্যাপারটি আপনার জানার কথা নয় যে, তারা এসে আপনাকে প্রশ্ন করতে থাকবে। –[ফাতহুল কাদীর]

২. ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর অর্থ– আপনি-ই সেই কিয়ামতের একটি স্মরণ। অর্থাৎ আমি (আল্লাহ) আপনাকে শেষ নবী করে পাঠিয়েছি। আর 'শেষ নবী' বলাটা-ই কিয়ামতের একটি নিদর্শন। 'কিয়ামত নিকটবর্তী' এ কথা বুঝানোর জন্য 'আপনি শেষ নবী' এ দলিলই যথেষ্ট। অতএব, কিয়ামতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব, প্রশ্ন করার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। –[কাবীর]

৩. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এর অর্থ– কিয়ামতের জ্ঞান না আপনার কাছে দেওয়া হয়েছে, আর না কোনো মাখলুকের কাছে; বরং পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। নির্দিষ্টভাবে তিনিই জানেন। যেমন– অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ বলুন, কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটে। –[ইবনে কাছীর]

৪. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো তা তো আপনার জানা নেই যে, আপনি তাদেরকে অবহিত করে দেবেন। –[জালালাইন]

قَوْلُهُ "إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا" : আপনি একমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত, কিয়ামতের সময় বর্ণনাকারী বা ঘোষক হিসেবে নয়। -[রূহুল মা'আনী]

কিয়ামতের ভয়ে যারা ভীত, তাদের জন্য আপনি ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত, ভয় প্রদর্শন করা-ই আপনার কাজ। এটা ছাড়া অন্য কিছুর খবর প্রদান আপনার দায়িত্ব নয়, যেমন দায়িত্ব নয় কিয়ামতের বিষয় খবর প্রদান করা। কেননা, এটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাজ। তিনি এটা নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

মূলত নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ক্ষণ গোপন রাখার মধ্যে হেকমত নিহিত রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى "كَأَنَّهُمْ يَوْمَ ...... عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا" : কারো মতে এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো لَمْ يَلْبَثُوا فِيْ قُبُوْرِهِمْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا অর্থাৎ দুনিয়ার সময়ের স্বল্পতা। কারো মতে- تَقْلِيْلُ مُدَّةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ তারা কবরে একটি দিনের সন্ধ্যা বা প্রভাত বেলা মাত্র অবস্থান করেছে। -[ফাতহুল কাদীর]

কারো মতে, তারা মনে করবে যে, মনে হয় যেন দুনিয়াতে দিনের কিয়দংশ অবস্থান করেছিল।

ضُحٰى -কে عَشِيَّة-এর দিকে إِضَافَتْ করার কারণ : আয়াতে ضُحٰهَا অর্থ ضُحَى الْعَشِيَّةِ অথচ عَشِيَّة-এর জন্য কোনো ضُحٰى নেই। عَشِيَّة এবং ضُحٰى ভিন্ন দু'টি সময়ের নাম তথা সকাল এবং সন্ধ্যা।

এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ه ও اَلِفْ অর্থাৎ هَا পিছনের বাক্যের শেষাংশের সাথে মিলানোর জন্য যোগ করা হয়েছে। মূলবাক্য এভাবে হতো- إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰى

ইমাম ফাররা এবং যুজাজ (র.) বলেন, মূল إِضَافَةٌ এভাবে ছিল- إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰى يَوْمِهَا অর্থাৎ সন্ধ্যা অথবা সন্ধ্যার দিনের সকাল। আরবদের মধ্যে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন বলা হয় أَتَيْتُكَ الْعَشِيَّةَ أَوْ غَدَاتَهَا -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

তাদের সকাল-সন্ধ্যা উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অবিশ্বাসী কাফেররা যে কিয়মাত ও পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করছে, পরকালে যখন সেই মহাসংকটময় কিয়মাতকে তারা প্রত্যক্ষ করবে, তখন ঐ প্রজ্বলিত দিনের কঠোরতাকে দুনিয়ার জীবনের সাথে তুলনা করলে এটা বর্তমান দীর্ঘ জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হবে। এমনকি মনে হবে, যেন মাত্র একদিন দুনিয়াতে অবস্থান করেছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, সন্ধ্যা বা সকাল উল্লেখ করে আরবি বাক্যরীতি অনুযায়ী একদিনকে বুঝানো হয়েছে কোন কোনো তাফসীরকার বলেন, সন্ধ্যা অথবা সকাল শব্দ দ্বারা কবরে অবস্থান (আইয়ামে বারযাখ)-এর সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। কবরে যারা হাজার হাজার বৎসর ধরে ঘুমিয়েছিল তারা হাশর ময়দানে পুনরুত্থিত হয়ে মনে করবে যে, দুনিয়ার জিন্দেগির পরে কবরে মাত্র এক সন্ধ্যা ঘুমিয়েছিল। আর দুনিয়াতে মাত্র এক সকাল অবস্থান করেছে। অথবা সন্ধ্যা অতীত হতে না হতেই কিয়ামত বা হাশর সংঘটিত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ও প্রভাত শব্দ দ্বারা দুনিয়া ও কবরের সুদীর্ঘ জীবনকে অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর ও স্বল্প বলে মনে হওয়া বুঝিয়েছে। -[খাযেন]

বস্তুত কাফেররা কিয়ামত সম্পর্কে যত চেচামেচিই করুক না কেন যখন তারা কিয়ামত দেখতে পাবে সে কঠিন মুহূর্তটি যখন আসবে তখন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, দুনিয়ার এ সুদীর্ঘ জীবন কিছুই নয়, তা বেশি হলে একটি সকাল বা এক সন্ধ্যার ন্যায়। দুনিয়ার জীবন ও মধ্যলোকের জীবন যতই সুদীর্ঘই হোক না কেন তা সীমিত এক সময় শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন থেকে যে জীবন আসবে তা কখনো শেষ হবে না, তাই তখন দুনিয়ার জীবনকে শুধু একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা বলে মনে হবে। -[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ عَبَسَ : সূরা আবাসা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির প্রথম শব্দ عَبَسَ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে 'আবাসা' –কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ-এর রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সূরাটির আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন- الْأَعْمٰى ও السَّفَرَةُ وَالصَّاخَّةُ ইত্যাদি।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : মুফাসসির মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অনুযায়ী আলোচ্য সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর সাথে নবী করীম ﷺ -এর একটি আচরণকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একবার নবী করীম ﷺ -এর দরবারে মক্কার কতিপয় বড় বড় সরদার ও সমাজপতি বসেছিল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে ইবনে উম্মে মাকতূম নামে একজন অন্ধ সাহাবী নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন। এ সময়ে নবী করীম ﷺ -এর বাক্যালাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এতে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এ সময় আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনা হতে আলোচ্য সূরাটি নবী করীম ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামের প্রথম দিকেই নাজিল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার ও ইবনে কাছীর (র.) প্রমুখগণ লিখেছেন– إِنَّهُ أَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيْمًا

দ্বিতীয়ত হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত ঘটনার সময় তিনি হয়তো পূর্ব হতেই মুসলমান ছিলেন, না হয় তখন ইসলাম গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় আছে, তিনি এসে বললেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ অন্য দিকে অত্র সূরার ৩নং আয়াত لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى-এর তাফসীরে ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন– لَعَلَّهُ يُسْلِمُ

তৃতীয়ত নবী করীম ﷺ-এর দরবারে তখন যারা বসা ছিল হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তারা হলো উতবাহ, শাইবাহ, আবু জাহল ও উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখগণ। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, তখনো তাদের সাথে মহানবী ﷺ-এর মেলামেশা ও উঠাবসা চালু ছিল এবং সংঘাত চরম আকার ধারণ করেনি। উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যায় যে, উক্ত সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় নাজিল হয়েছে।

আয়াতের সংখ্যা : অত্র সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এতে ৪২টি আয়াত, ১৩০টি বাক্য এবং ৫৩৫ টি অক্ষর রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় দানের পদ্ধতি, উপদেশ গ্রহণ না করার প্রতি তিরস্কার, উপদেশ গ্রহণে বিমুখ ব্যক্তিদের পারলৌকিক শাস্তি এবং উপদেশ গ্রহণকারীদের পারলৌকিক পুরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সূরার প্রথমাংশ মধ্যমাংশের ভূমিকা এবং মধ্যমাংশ শেষাংশের ভূমিকা, আর শেষাংশ হলো মূলবক্তব্য বিষয়।

প্রথমাংশে শুরু করার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অমনোযোগিতা ও বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সাগ্রহ মনোযোগিতা প্রদর্শন করায় নবী করীম ﷺ -এর প্রতি শাসন ও তিরস্কারমূলক বাণী অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ সূরাটির প্রতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে জানা যায়, এ সূরায় মূলত কাফের কুরাইশ সর্দারদের প্রতিই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা তারা সত্যবিমুখতার কারণে দীনের দাওয়াতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর সে সঙ্গে নবী করীম ﷺ-কে দীন প্রচারের সঠিক পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রাথমিকভাবে নবুয়তের কাজ সম্পাদনের যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর ভ্রান্তি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ কুরাইশ সরদারদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং অন্ধকে অবজ্ঞা করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও মূল ব্যাপারটি ছিল ভিন্নতর। মূলত কোনো মতাদর্শ প্রচারকের প্রাথমিক

লক্ষ্যই থাকে সামনের প্রভাবশালী লোকদের প্রতি। অন্ধ ব্যক্তি কর্তৃত্বহীন ও দুর্বল বলে তার প্রতি উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল না আর এর মূলে দীনি দাওয়াতের উৎকর্ষের প্রতি গভীর আন্তরিকতাই ছিল একমাত্র কারণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামি আদর্শ প্রচারের এটা সঠিক পন্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, সে যত দুর্বল ও প্রভাবহীনই হোক না কেন। পক্ষান্তরে যাদের সত্যানুরাগ নেই তারা সামাজিকভাবে যত প্রভাব, প্রতিপত্তিশালীই হোক না কেন, তারা গুরুত্বহীন।

প্রথম হতে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এ কথাগুলো বলার পর ১৭ আয়াত হতে ঐ সমস্ত কাফেরদের প্রতি সরাসরি রোষ প্রকাশ করা হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ-এর দীনি দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছিল। এ পর্যায়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি যে আচরণ অবলম্বন করেছিল এর প্রতি প্রথমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শেষে পরকালে তাদেরকে একজন চরম সংকটের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : এ সূরার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিয়ামতের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার শেষেও কিয়মাতের বিষয় বিবৃত হয়েছে। এ জন্য অনুমিত হয় যে, কিয়ামতের বর্ণনাই এ সূরার উদ্দেশ্যগত অঙ্গ। শেষাংশে কিয়ামত বিষয়ক বর্ণনায় বিশেষভাবে কাফেরদের কঠোর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, সূরার মধ্যমাংশের قُتِلَ الْإِنْسَانُ এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের উল্লেখ করত একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়মাতগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো কিছুই প্রতিবন্ধকতা ছিল না; এতদসত্ত্বেও তারা যে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, এটা চরম ধর্মদ্রোহিতা বৈ কিছু নয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি কঠোর আজাব হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

ধর্মদ্রোহীদের এ চরম অকৃতজ্ঞতা সংশোধনের জন্য নবী করীম ﷺ সর্বদা সচেষ্ট ও চিন্তান্বিত থাকতেন। এ কারণে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়ার সময় অন্ধ সাহাবী কর্তৃক মাঝখানে তার কথায় ব্যাঘাত ঘটানোটা তাঁর নিকট কিছুটা বিরক্তিকরই ঠেকেছিল, কিন্তু কাফেরদের প্রতি হযরতের এ মনোযোগ এবং একজন ঈমানদারের প্রতি এ সামান্যতম উদাসীনতাকেও আল্লাহ পছন্দ করেননি। এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ ঈমানের চেয়ে কাফেরদের প্রতি অধিক মর্যাদা প্রদর্শিত হয়ে যেতে দেখে মার্জিত ভাষায় আল্লাহ হযরতকে কাফেরদের হেদায়েতের প্রশ্নে এত বেশি ব্যস্ত হতে নিষেধ করেছেন এবং সত্যিকার প্রেমিক ও ধর্মান্বেষীদের প্রতি সবিশেষে দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।

সূরাটির শানে নুযূল : মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে কুরাইশ কাফেরদের কতিপয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনাতে তারা হলেন আবূ জাহল ইবনে হিশাম, উকবাহ ইবনে রাবীয়াহ, উবাই ইবনে খাল্ফ, উমাইয়া ইবনে খাল্ফ এবং শাইবাহ। রাসূলে কারীম ﷺ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম নামে এক অন্ধ সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ তার এরূপ আচরণে রুষ্ট হলেন। কাজেই তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায় যে, উক্ত সূরাটি নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গমন করে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। এরপর যখন ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মহানবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হতেন তখন নবী করীম ﷺ তার জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِيْ رَبِّيْ অর্থাৎ যার কারণে আমার প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন তাকে সুস্বাগতম। মাঝে মাঝে সফরে যাওয়ার সময় নবী করীম ﷺ হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। তিনি তাকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনও নিয়োগ করেছিলেন। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটির মর্যাদা : একটি হাদীসে বর্ণিত আছে "مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ عَبَسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আবাসা পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে উজ্জ্বল চেহারায় উত্তোলন করবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত হাদীসখানা মাওযূ'।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. عَبَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَحَ وَجْهَهُ وَتَوَلّٰى اَعْرَضَ لِاَجْلِ.

১. তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখমণ্ডলে বিরক্তি ফুটে উঠল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন চেহারা ফিরিয়ে নিলেন, এ কারণে যে,

٢. اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَقَطَعَهُ عَمَّا هُوَ مَشْغُوْلٌ بِهٖ مِمَّنْ يَرْجُوْ اِسْلَامَهُ مِنْ اَشْرَافِ قُرَيْشٍ الَّذِيْ هُوَ حَرِيْصٌ عَلٰى اِسْلَامِهِمْ وَلَمْ يَدْرِ الْاَعْمٰى اَنَّهُ مَشْغُوْلٌ بِذٰلِكَ فَنَادَاهُ عَلِّمْنِيْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى بَيْتِهٖ فَعُوْتِبَ فِيْ ذٰلِكَ بِمَا نُزِّلَ فِيْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَهُ اِذَا جَاءَ مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِيْ فِيْهِ رَبِّيْ وَيَبْسُطُ لَهُ رِدَاءَهُ

২. তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করল আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.), যার কারণে তাঁর সে মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে, যা তিনি সম্ভ্রান্ত কুরাইশদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশায় নিবদ্ধ রেখেছিলেন। আর তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু অন্ধ লোকটি তাঁর এ ব্যস্ততা বুঝতে পারেনি। তাই সে নিবেদন করল, আমাকে তা শিক্ষা দান করুন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দান করেছেন। মহানবী ﷺ উঠে স্বগৃহে চলে যান। এ কারণে এ সূরায় যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার মাধ্যমে তাঁকে শাসানো হয়। অতঃপর যখনই উক্ত অন্ধ সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন করত তিনি তাকে এই বলে স্বাগত জানাতেন যে, তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার কারণে আল্লাহ আমাকে শাসিয়েছিলেন এবং তার জন্য নিজ চাদর বিছিয়ে দিতেন।

٣. وَمَا يُدْرِيْكَ يُعْلِمُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الزَّايِ اَيْ يَتَطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوْبِ بِمَا يَسْمَعُ مِنْكَ.

৩. তোমার কি খবর ইলম আছে যে, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো এখানে يَزَّكّٰى মূলত يَتَزَكّٰى ছিল, تَا-কে زَا -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ পাপাচার হতে পবিত্র হতো তোমার নিকট হতে যা শ্রবণ করত এর মাধ্যমে।

٤. أَوْ يَذَّكَّرُ فِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ أَيْ يَتَّعِظُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى الْعِظَةُ الْمَسْمُوْعَةُ عَنْكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ تَنْفَعَهُ جَوَابُ التَّرَجِّيْ .

৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এখানে يَذَّكَّرُ শব্দটি يَتَذَكَّرُ ছিল, تَا -কে ذَال-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে অর্থাৎ নসিহত গ্রহণ করত। ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। অর্থাৎ আপনার উপদেশ তার জন্য উপকারী হতো অন্য এক কেরাতে تَنْفَعَهُ -এর মধ্যকার নসব تَرَجِّيْ -এর জওয়াব হিসেবে পঠিত হয়েছে।

٥. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى بِالْمَالِ .

৫. পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না সম্পদের কারণে।

٦. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الصَّادِ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِيْهَا تُقْبِلُ وَتَتَعَرَّضُ

৬. তুমি তারই প্রতি মনোযোগ দিয়েছ تَصَدّٰى শব্দটি অন্য এক কেরাতে صَادْ -কে তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শব্দটি মূলত تَتَصَدّٰى ছিল, تَا -কে صَادْ-এর মধ্যে ইদগাম করায় تَصَّدّٰى হয়েছে অর্থাৎ তুমি মনোযোগী হবে এবং আগ্রহ প্রদর্শন করবে।

٧. وما عليك الا يزكى يؤمن .

৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই ঈমান আনয়ন না করলে।

তাহকীক ও তারকীব

أَنْ جَاءَهُ আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব : أَنْ جَاءَهُ আয়াতাংশ تَوَلّٰى ক্রিয়া বা عَبَسَ ক্রিয়ার দ্বারা মানসূব হয়েছে। যারা تَوَلّٰى -এর মানসূব বলেন, তারা নিকটতম ক্রিয়ার আমলকে অগ্রাধিকার দেন। আর যারা أَبْعَدُ বা দূরবর্তী ক্রিয়ার আমলকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন তারা عَبَسَ ক্রিয়ার মানসূব বলে থাকেন। -[কাবীর]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, أَنْ নসবের স্থলে আছে। কেননা এটা মাফউলে লাহু হয়েছে। মূলবাক্য ছিল- لِأَنْ جَاءَهُ الْأَعْمٰى -[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মধ্যম পুরুষ ব্যবহারের স্থলে عَبَسَ ক্রিয়াকে নাম পুরুষ হিসেবে ব্যবহার : عَبَسَ ক্রিয়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তখনকার কার্য তার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ এখানে নাম পুরুষের সীগাহ ব্যবহার না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খেতাব করে মধ্যম পুরুষের সীগাহ ব্যবহার করা দরকার ছিল। এর কারণ এই ছিল যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ব্যাপারটি অপছন্দনীয় হয়েছিল, এমন ধরনের একটি কাজ তার পক্ষ হতে হওয়া ঠিক হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তাই ঐ অপছন্দনীয় কাজের সরাসরি সম্বোধন করতে চাননি। এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পা, দয়া ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিন্দাজ্ঞাপন ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমত : বিশ্বনবী ﷺ সমস্ত উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। সকলেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হোক এটাই ছিল তাঁর কামনা। এ নিয়তে তিনি কুরাইশ সরদারদের সাথে আলাপ করছিলেন, কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় 'ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)' বাধা প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তিরস্কারের যোগ্য তিনিই ছিলেন; কিন্তু উল্টা বিশ্বনবী ﷺ তিরস্কারের যোগ্য হয়েছেন। এটা কয়েকটি কারণে হয়েছে যে,

১. 'ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)' যদি জানতেন যে, বিশ্বনবী ﷺ বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ আলাপ করছেন, তাহলে তিনি এমন ধরনের ডাক এবং আবেদন করতেন না। জানার পরও যদি তিনি এরূপ করতেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়তো তাঁকে তিরস্কার করা হতো।

২. তিনি ছিলেন সহায় সম্বলহীন, এমতাবস্থায় হয়তো তিরস্কার বরদাশ্‌ত করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলবেন। আল্লাহ দুর্বল সম্বলহীন ব্যক্তিদের মন ভাঙ্গতে চাননি।

৩. অথবা, এ প্রশিক্ষণের জন্য যে, বিত্তবান-কাফের হতে গরিব-মু'মিন অত্যধিক ভালো-উত্তম। গরিব হলেও মু'মিনের দিকে তাকানো দরকার। ধনী ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী কাফের গরিব-মু'মিনের সামনে কিছুই নয়। -[কুরতুবী]

৪. ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-এর সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে তিরস্কার করেছেন।

৫. যেন তাঁর সহচরদেরকে সর্ব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন এবং তাদেরকে নিজের নিকট হতে দূরে ঠেলে না দেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

৬. অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহ্যিক প্রকাশিত কাজের নিন্দা ছিল না; বরং তাঁর অন্তরের ঝোঁক প্রবণতার নিন্দা করা হয়েছে। এটা ছিল- তাঁর অন্তর কাফেরদের প্রতি ঝুঁকে গেছে। কেননা, তারা ছিল তাঁর নিকটাত্মীয়, সামাজিক প্রতিপত্তিশালী ও উচ্চ পদাধিকারী। পক্ষান্তরে তাঁর মন ইবনে উম্মে মাকতুম হতে দূরে সরে গিয়েছিল। কেননা তিনি ছিলেন অন্ধ, আত্মীয় ও প্রতিপত্তিহীন ব্যক্তি। তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে মলিনতা ও বিমুখতার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে উপদেশযুক্ত নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। -[কাবীর]

ঐ সময় বিশ্বনবী ﷺ-এর কাছে যারা ছিল : বিশ্বনবী ﷺ-এর নিকট ঐ সময় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ছিল। উতবা, শায়বা, আবূ জাহল, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ। -[রূহুল মা'আনী]

আল্লামা কুরতুবী ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং উমাইয়া ইবনে খালফের ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলেন, এটা একটি বাতিল কথা মাত্র। এমনকি ঐ মুফাসসিরীনদের অজ্ঞতাও বটে, যারা দীনকে তাহকীক করে গ্রহণ করে না। কেননা, উমাইয়া এবং ওয়ালীদ মক্কায় ছিল আর ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ছিলেন মদীনায়। তাদের সাথে উপস্থিত হননি, আর না তারা তাঁর সাথে উপস্থিত হয়েছে; বরং তাদের উভয়ই কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, একজন হিজরতের পূর্বে আর অন্য জন বদর প্রান্তরে। -[কুরতুবী]

চিন্তার দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায় যে, আল্লামা কুরতুবীর এ ধরনের মন্তব্য অমূলক। কেননা সূরাটি মক্কী। মদীনার কোনো কথা টেনে এনে অন্যান্য মুফাসসিরদের কথাকে এভাবে উঠিয়ে দেওয়া আদৌ ঠিক হয়নি।

ইবনে উম্মে মাকতুমের পরিচিত : ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)-এর মামাত ভাই। তাঁর প্রকৃত নাম আমর ইবনে কায়েস ইবনে যায়েদা ইবনে জুনদুব ইবনে হারাম ইবনে রাওয়াহা ইবনে হুজর ইবনে মুয়ীছ ইবনে আমের ইবনে লুয়াই আল-কুরাশী। কারো মতে তাঁর নাম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, কারো মতে আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাইহ্ ইবনে মালিক। তবে প্রথম মতই প্রসিদ্ধ। উম্মে মাকতূম তাঁর আম্মার উপনাম। তাঁর নাম হলো আতিকা বিন্‌তে আব্দুল্লাহ আল-মাখযূমিয়া। তিনি প্রথমে অন্ধ ছিলেন না; বরং পরে অন্ধ হয়ে গেছেন। কারো মতে তিনি অন্ধত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

তাঁর নাম 'অন্ধ' বলে উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা ইবনে উম্মে মাকতুমের সম্মানার্থে তাঁর প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধমক পর্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু সম্মানিত ব্যক্তির নাম না বলে এমন এক গুণবাচক বিশেষ্য বলা হয়েছে যা দ্বারা সম্মান বুঝা যায় না; বরং হেয় বুঝা যায়। কেননা এমন গুণ দিয়ে ডাক দিলে ঐ ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত বুঝা যায়। এর জবাব হচ্ছে-

'অন্ধ' বলে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়নি, বা ক্ষুণ্ন করার জন্য বলা হয়নি; বরং এ কথা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে, তিনি 'অন্ধ' হওয়ার কারণে অধিক সাহচর্য ও করুণা পাওয়ার যোগ্য। অথচ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি তাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার দেখিয়েছেন। -[কাবীর]

গায়েব হতে খেতাবের দিকে ইলতিফাতের কারণ : সূরার প্রথমে عَبَسَ এবং تَوَلّٰى-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গায়েবের সীগাহ দ্বারা দূর হতে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে وَمَا يُدْرِيْكَ দ্বারা সরাসরি খেতাব করেছেন। এটা এ জন্য যে, সরাসরি عِتَابٌ নিন্দা বা ক্রোধ প্রকাশ করলে বেশি কার্যকরি হয়। অর্থাৎ সরাসরি রাগ দেখানো হলে, রাগ যেমন বেশি বুঝা যায়, তেমন কার্যকরিও বেশি হয়। -[ফাতহুল কাদীর]

গায়েবের সীগাহ দ্বারা দূর বুঝা যায়, তারপর নিকটতম করা এবং ভালোবাসা বুঝানোর জন্য সরাসরি খেতাব করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

لَعَلَّهُ-এর যমীরের مَرْجِعْ কি? : আল্লাহর বাণী لَعَلَّهُ-এর মধ্যস্থিত ه যমীরের مَرْجِعْ-এর ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. উক্ত যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْاَعْمٰى অন্ধ লোকটি তথা ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) অর্থাৎ আপনি কি জানেন অবশ্যই সে পরিশুদ্ধি লাভ করত।

২. অথবা, উক্ত যমীরের مَرْجِعْ হলো কাফের। অর্থাৎ আপনি তার হেদায়েতের চিন্তা করতে থাকুন। আপনি কি জানেন হয়তো সে হেদায়েত কবুল করতেও পারে।

এখানে لَعَلَّ-এর অর্থ : আল্লাহর বাণী لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى-এর মধ্যে لَعَلَّ শব্দটি সন্দেহ বা সংশয়ের অর্থে হয়নি (যদিও সাধারণত তা উক্ত অর্থেই হয়ে থাকে)। বরং এখানে এটা নিশ্চয়তার অর্থেই হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় لَعَلَّ শব্দটির হাকীকী অর্থ সংশয় না হয়ে (আল্লাহর দিকে নিসবত হওয়ার দরুন) নিশ্চয়তা -এর অর্থে হয়েছে। সাধারণ রাজা বাদশাহ ও ক্ষমতাধরদের বেলায়ও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উক্ত শব্দটি সম্ভাবনা ও সংশয়ের অর্থে না হয়ে নিশ্চয়তার অর্থ প্রদান করে থাকে।

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى-এর মধ্যে اِسْتَغْنٰى কোন অর্থে হয়েছে? : উক্ত আয়াতে اِسْتَغْنٰى শব্দটি কোন অর্থে হয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো طَلَبُ غِنًى অর্থাৎ সম্পদ তলব। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা তারা নবী করীম ﷺ -এর নিকট সম্পদ তালাশের জন্য আসেনি।

খ. আল্লামা কালবী (র.)-এর মতে এখানে اِسْتَغْنٰى মানে اِسْتَغْنٰى عَنِ اللّٰهِ অর্থাৎ সে আল্লাহর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

গ. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) مَنِ اسْتَغْنٰى-এর তাফসীরে লিখেছেন "مَنْ اَظْهَرَ الْاِسْتِغْنَاءَ عَنْكَ وَعَنْ دِيْنِكَ وَعَمَّا عِنْدَكَ مِنَ الْهُدٰى وَالْخَيْرِ وَالطَّهَارَةِ" অর্থাৎ হে হাবীব! সে বিমুখতা প্রকাশ করে আপনার থেকে, আপনার দীন থেকে, আপনার নিকট যে হেদায়েত, কল্যাণ, আলো ও পবিত্রতা রয়েছে তা থেকে।

ঘ. কারো কারো মতে এর অর্থ হলো اِسْتَغْنٰى عَنِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে।

تَصَدّٰى-এর মর্মার্থ কি? : আল্লাহর বাণী فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى-এর মধ্যস্থিত تَصَدّٰى-এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, আপনি তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, তার বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দিলেন এবং তার পরিশুদ্ধি কামনা করলেন। আল্লামা শাওকানী (র.) বলেছেন, এখানে تَصَدّٰى-এর অর্থ হলো, আপনি তার বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, তার কথা কান পেতে শুনেছেন।

وَمَا عَلَيْكَ আয়াতে مَا-এর অর্থ : مَا না-বোধক তখন বাক্যের অর্থ হবে– সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার উপর কোনো দায়িত্ব বর্তাবে না। مَا-কে প্রশ্নবোধকও বলা যায়। তখন অর্থ হবে– আপনার উপর কি দায়িত্ব আছে তার পরিশুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে? তবে প্রশ্নবোধক অর্থ করলেও ফলাফল না-বোধকই হয়। –[রূহুল মা'আনী]

٨. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى حَالٌ مِنْ فَاعِلِ جَاءَ

৮. অপর দিকে যে তোমার নিকট ছুটে আসল এটা جَاءَ -এর فَاعِل হতে حَال

٩. وَهُوَ يَخْشَى اللّٰهَ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَسْعٰى وَهُوَ الْأَعْمٰى .

৯. আর সে ভয় পোষণ করে আল্লাহকে, এটা يَسْعٰى -এর فَاعِل হতে حَال আর সে হলো অন্ধ ব্যক্তিটি।

١٠. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى فِيْهِ حَذْفُ التَّاءِ الْأُخْرٰى فِي الْأَصْلِ أَيْ تَتَشَاغَلُ .

১০. আর তুমি তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করলে এখানে দ্বিতীয় تَاء বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অমনোযোগিতা প্রদর্শন করলে।

١١. كَلَّا لَا تَفْعَلْ مِثْلَ ذٰلِكَ إِنَّهَا أَيِ السُّوْرَةُ أَوِ الْاٰيَاتُ تَذْكِرَةٌ عِظَةٌ لِلْخَلْقِ .

১১. না এরূপ করো না, এটা তো অর্থাৎ সূরা বা আয়াতসমূহ উপদেশবাণী সৃষ্টির জন্য নসিহত।

١٢. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ حَفِظَ ذٰلِكَ فَاتَّعَظَ بِهِ .

১২. যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে সংরক্ষণ করবে এবং উপদেশ গ্রহণ করবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَسْعٰى-এর মহল্লে ই'রাব : يَسْعٰى ক্রিয়াটি جَاءَ ক্রিয়ার ফায়েল হতে 'হাল' হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ جَاءَ إِلَيْكَ حَالَ كَوْنِهِ مُسْرِعًا فِي الْمَجِيْءِ

"وَهُوَ يَخْشٰى" আয়াতের মহল্লে ই'রাব : وَهُوَ يَخْشٰى আয়াতটির মহল্লে ই'রাব হলো মানসূব। কেননা পূর্ণ বাক্যটি يَسْعٰى ক্রিয়ার কর্তা হতে অথবা جَاءَكَ ক্রিয়ার কর্তা হতে حَال হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রতি রাগ হওয়ার কারণে ভর্ৎসনা করেছেন, পাশাপাশি ইসলামের দায়িত্বশীলদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত এর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অতি সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখন উল্লিখিত আয়াত কয়টিতে ইবনে উম্মে মাকতূমের গ্রহণযোগ্য পরিচিতি তুলে ধরার সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর জন্য একটি চিরস্থায়ী সার্টিফিকেট [সনদ] প্রদান করা হয়েছে।

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ আয়াতে مَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَنْ অর্থ 'যে ব্যক্তি'। এখানে مَنْ বলতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছুটে এসেছিলেন ঐ সময়, যখন তিনি কুরাইশ নেতাদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন।

ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) কিসের ভয় করতেন ? : আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে ভয় করে। এখন প্রশ্ন হলো কিসে ভয় করে? জবাব তিনটি হতে পারে।

১. يَخْشَى اللّٰهَ وَيَخَافُهُ অর্থাৎ সে আল্লাহকে ভয় করে। যেন কোনো প্রকারেই কোনো নির্দেশ বাস্তবায়নে তার পক্ষ হতে অলসতা পাওয়া না যায়।

২. يَخْشَى الْكُفَّارَ وَأَذَاهُمْ অর্থাৎ সে কাফেরগণ ও তাদের যন্ত্রণাকে ভয় করে। যেন কোনো প্রকারেই তাদের যন্ত্রণা তাকে পেয়ে না বসে।

৩. يَخْشَى الْكَبْوَةَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْمٰى অর্থাৎ সে [গর্তে বা রাস্তার পাশে] পড়ে যাওয়াকে ভয় করত। কেননা সে ছিল অন্ধ- তার কোনো বহনকারী পথ প্রদর্শক ছিল না। এখানে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

تَلَهّٰى শব্দের অর্থ : تَلَهّٰى-এর صِلَة যখন بَاء আসে, তখন খেল-তামাশার অর্থ দেয়, অথবা এগিয়ে আসার অর্থ হয়। আর যখন عَنْ হবে, তখন অর্থ হবে অমনোযোগী হওয়া। আয়াতে কারীমায় عَنْ সিলাহ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, تَلَهّٰى অর্থ এখানে 'অমনোযোগী, কোনো কাজ হতে বিরত থাকা' হবে। -[ফতহুল কাদীর]

ক্রিয়ার উপর أَنْتَ -কে মুকাদ্দাম করার কারণ : أَنْتَ সর্বনামটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। একে বাক্যের প্রথমে এবং ক্রিয়ারও আগে উল্লেখ করার কারণ হলো–

১. আয়াতের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য أَنْتَ -কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে।

২. অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য। কেননা তিরস্কারের স্থলে কিছু অনুগ্রহ প্রকাশ করা মানবিক চাহিদা, নচেৎ মন ভেঙ্গে যায়।

৩. তথা لِلْفَاصِلَةِ পৃথকীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. لِلْحَصْرِ তথা বাক্যকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সীমিত করার নিমিত্তে। –[রূহুল মা'আনী]

تَلَهّٰى শব্দে কয়েকটি কেরাত :

১. আল্লামা ইবনে কাছীর تَا.-কে মুযারি'-এর বাবের تَا.-এর উপর إِدْغَامْ করে পড়েন। عَنْهُ تَّلَهّٰى অর্থাৎ تَا.-এর উপর তাশদীদ। পিছনের هَا. এসে تَا. -এর সাথে যুক্ত হয়ে পঠিত হয়।

২. হযত আবূ জা'ফর تَا. -কে পেশ দিয়ে মাজহূল পড়েছেন।

৩. আর জমহুর এক تَا. -কে হযফ করে تَلَهّٰى. تَا -এর উপর যবর দিয়ে পড়েন।

৪. হযরত তাল্‌হা দুই تَا. -কে প্রকাশ করে تَتَلَهّٰى পড়েছেন– হযফ করে নয়।

৫. হযরত তাল্‌হা হতে দ্বিতীয় বর্ণনানুযায়ী এক تَا.; কিন্তু লামের উপর জযম হবে। –[রূহুল মা'আনী]

كَلَّا-এর বিশ্লেষণ ও অর্থ : كَلَّا একটি অব্যয়। এর কোনো আমল নেই। এটা পূর্ববর্তী বাক্যকে নাকচ করে এবং পরবর্তী বাক্যকে সমর্থন করে। হযরত হাসান (রা.) বলেন; হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের সাথে যে ব্যবহার হয়ে গেছে, এতে বিশ্ব নবীর চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়ে গেছে। তিনি চিন্তা করছিলেন যে, কি ফয়সালা নাজিল হয়ে যায়; কিন্তু যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ সহ কয়েকটি আয়াত নিয়ে আসলেন তখন তাঁর চেহারা হতে চিন্তার চিহ্ন দূরীভূত হয়ে গেছে। আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, كَلَّا না, এরূপ করবেন না। –[কাবীর]

শায়খ আলূসী (র.) বলেন : كَلَّا দ্বারা রাসূলুল্লা হ ﷺ -কে এ কথার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তিরস্কারযোগ্য এমনি ধরনের কোনো কাজের পুনরাবৃত্তি না করেন । এটাতে অবতীর্ণ হয়েছিল ঐ সময়, যখন তিনি তার কথা শেষে বাড়ি চলে গেছেন। এ ঘটনার পর দেখা যায় যে, ফকির নিঃস্ব ব্যক্তিগণ তাঁর দরবারে আমিরের মর্যাদা পেতেন। –[রূহুল মা'আনী]

অথবা, كَلَّا অর্থ কখনই এরূপ কাজ করবে না। আল্লাহকে যারা ভুলে গেছে এবং নিজেদের বৈষয়িক মান-মর্যাদায় যারা আত্মহারা হয়ে রয়েছে সে লোকদেরকে অকারণে বেশি গুরুত্ব দিতে যাবেন না। ইসলাম এমন মূল্যহীন জিনিস নয় যে, যারা এর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের সম্মুখে অনুনয়-বিনয় সহকারে কাতর কণ্ঠে এটা পেশ করতে হবে। এ ছাড়া হে নবী! তোমার নিজের মর্যাদার দিক দিয়েও এ পদ্ধতি শোভনীয় নয়। এ অহংকারী লোকদেরকে ইসলামের দিকে আনার জন্য এমন ভঙ্গি গ্রহণ করা, এমনভাবে চেষ্টা করা যাতে এ লোকেরা মনে করবে যে, তোমার কোনো স্বার্থ তাদের নিকট আটকা পড়েছে, যা তুমি উদ্ধার করতে চাও, তা কিছুতেই উচিত হবে না। এ লোকেরা ইসলাম কবুল করলে তবেই এটা উৎকর্ষ লাভ করবে, নতুবা এটা ব্যর্থ হয়ে যাবে, এরূপ ধারণা মূলত অর্থহীন। বস্তুত সত্যদীন, এদের প্রতি বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নয় এবং তাদের উপর নির্ভরশীলও নয়, যেমন তারাও নিজেদেরকে এর মুখাপেক্ষী মনে করে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ" : অর্থাৎ যে কুরআনে কারীম থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় সে তা সহজেই করতে পারে, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আরবের যেসব তথাকথিত নেতৃস্থানীয় লোকেরা কুরআনকে না মানে, কুরআনে কারীম তেলাওয়াত না করে, পবিত্র কুরআনের মহান বাণী বা উপদেশের প্রতি কর্ণপাত না করে, তাতে কুরআনে কারীমের কিছু যায় আসে না। পবিত্র কুরআন স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল। যারা ভাগ্যবান তারাই কুরআনে কারীম পাঠ করে, তার অনুশীলন করে এবং নিজ নিজ জীবনে তার বাস্তবায়ন করে। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যাহত তারা কুরআনে কারীম পেয়েও পায় না। কুরআনে কারীমের উপদেশে নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে না। –[নূরুল কোরআন]

إِنَّهَا-এর هَا সর্বনাম এবং ذَكَرَهُ-এর ه সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল : إِنَّهَا-এর هَا সর্বনাম এবং ذَكَرَهُ-এর ه সর্বনাম একই বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অথচ هَا সর্বনামটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং ه সর্বনামটি পুংলিঙ্গ। এর জবাব হচ্ছে,

১. ইমাম মুকাতিল (র.) বলেন, إِنَّهَا أَيْ أَنَّ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ এখানে هَا.-এর মারজি' হলো اٰيَاتُ الْقُرْاٰنِ আর এটা মুয়ান্নাস। আর ইমাম কালবী (র.) বলেন, هٰذِهِ السُّوْرَةُ -এবং ذَكَرَهُ-এর ه পূর্বে উল্লিখিত تَذْكِرَةٌ শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর تَذْكِرَةٌ শব্দটি অর্থগত দিক হতে পুংলিঙ্গ। কেননা এর অর্থ হলো اَلذِّكْرُ ও اَلْوَعْظُ ।

২. নাজম প্রণেতা বলেছেন, إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ দিয়ে اَلْقُرْاٰنُ উদ্দেশ্য। আর اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি পুংলিঙ্গ। এ কারণে ذَكَرَهُ-এর সর্বনাম পুংলিঙ্গ নেওয়া হয়েছে। আর قُرْاٰنٌ -কে تَذْكِرَةٌ বলা হয়েছে, সে কারণে একে هَا. স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম দিয়ে تَعْبِيْر করা হয়েছে। –[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

١٣. فِىْ صُحُفٍ خَبَرٌ ثَانٍ لِاَنَّهَا وَمَاقَبْلَهُ اِعْتِرَاضٌ مُكَرَّمَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى .

১৩. তা আছে লিপিসমূহে এটা দ্বিতীয় خَبَرٌ পূর্বোক্ত إِنَّهَا -এর জন্য, আর তৎপূর্ববর্তী বক্তব্য جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ যা সম্মানিত আল্লাহ তা'আলার নিকট।

١٤. مَرْفُوْعَةٍ فِى السَّمَاءِ مُطَهَّرَةٍ مُنَزَّهَةٍ عَنْ مَسِّ الشَّيَاطِيْنِ .

১৪. যা সমুন্নত আকাশে এবং পবিত্র শয়তানের স্পর্শ হতে পূত-পবিত্র।

١٥. بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كَتَبَةٍ يَنْسِخُوْنَهَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ .

১৫. যা এমন লিপিবদ্ধকারীর হাতে লিখিত সে সকল লিপিবদ্ধকারী যারা লাওহে মাহফূয হতে লিপিবদ্ধ করে।

١٦. كِرَامٍ بَرَرَةٍ مُطِيْعِيْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ .

১৬. যারা সম্মানিত ও পূত-পবিত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগত, আর তারা হলো ফেরেশতারা।

١٧. قُتِلَ الْاِنْسَانُ لُعِنَ الْكَافِرُ مَآ اَكْفَرَهُ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ اَىْ مَا حَمَلَهُ عَلَى الْكُفْرِ .

১৭. লানত বর্ষিত হোক এ মানুষদের প্রতি অর্থাৎ কাফেরদের উপর (আল্লাহর) অভিশাপ হোক। তারা কতইনা অকৃতজ্ঞ [সত্য অমান্যকারী]। এখানে প্রশ্নবোধক (مَا) ধমক দেওয়ার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ কিসে তাকে কুফরের প্রতি উদ্বুদ্ধ [দুঃসাহাসী] করেছে?

١٨. مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ ثُمَّ بَيَّنَهُ فَقَالَ .

১৮. তাকে আল্লাহ তা'আলা কি বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? এখানে প্রশ্নবোধক ইতিবাচক [সাব্যস্তকরণ]-এর অর্থে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন।

١٩. مِنْ نُطْفَةٍ ط خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً اِلٰى اٰخِرِ خَلْقِهِ .

১৯. এক ফোঁটা শুক্রকীট দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার পরিমিত বিকাশ ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ জমাট রক্ত অতঃপর মাংসপিণ্ড এভাবে তার [পূর্ণাঙ্গ] সৃষ্টি পর্যন্ত।

٢٠. ثُمَّ السَّبِيْلَ اَىْ طَرِيْقَ خُرُوْجِهِ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ يَسَّرَهُ .

২০. তারপর পথ অর্থাৎ তার মাতার গর্ভ হতে বের হওয়ার পথ– তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

٢١. ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ جَعَلَهُ فِىْ قَبْرٍ يَسْتُرُهُ .

২১. অতঃপর তাকে মৃত্যু দিলেন এবং কবরে পৌছাবার ব্যবস্থা করলেন। কবরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন।

٢٢. ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهُ لِلْبَعْثِ .

২২. অতঃপর যখন ইচ্ছা করবেন তিনি তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিবেন। পুনরুজ্জীবিত করার জন্য।

٢٣. كَلَّا حَقًّا لَمَّا يَقْضِ لَمْ يَفْعَلْ مَآ اَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ .

২৩. কখনো নয়, অবশ্যই সে পূর্ণ করেনি সে পালন করেনি যা নির্দেশ দিয়েছিল তাকে (তার) তার প্রভু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

صُحُفٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : صُحُفٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে صَحِيْفَةٌ শাব্দিক অর্থ- কিতাবের পৃষ্ঠাসমূহ, গ্রন্থ বা পুস্তিকা অর্থে, এর ব্যবহার যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এসেছে- إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى

সুহুফে মুকাররামাহ অর্থ সম্মানিত পুস্তিকা। উদ্ধৃত আয়াতের অর্থ লাওহে মাহফূযে রক্ষিত কুরআন। কেউ কেউ বলেন, নবীদেরকে প্রদত্ত কিতাব বা সহীফাসমূহ। যেমন আল্লাহর বাণী- إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى তে صُحُفٌ শব্দ দ্বারা নবীদের সহীফাকে বুঝানো হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فِيْ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ....مُطَهَّرَةٍ : হে হাবীব! আপনি কি মনে করে বসেছেন যে, এ অহংকারী মুশরিকদের দ্বারা কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে? কুরআন সম্মানের উচ্চাসনে আসীন হবে? তা কখনো নয়। কুরআন তো আপনা হতেই এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে, এর আয়াতসমূহ আসমানে অত্যন্ত সম্মানের আসনে সমাসীন আছে, পবিত্র লিপিসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তা ছাড়া মু'মিনগণ এ পৃথিবীতে ও কুরআনকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে পবিত্র ও উচ্চ স্থানে রাখেন।

কুরআন মাজীদ সর্বপ্রকার ভেজাল ও মিশাল হতে পবিত্র। এতে অবিমিশ্রিত নির্জলা সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোনো প্রকারের বা কোনো ধরনেরই বাতিল এবং নষ্ট চিন্তা-বিশ্বাস বা মতাদর্শ এতে অনুপ্রবেশের একবিন্দু সুযোগ পায়নি। যেসব পুঁতিগন্ধময় আবর্জনায় দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ভরপুর হয়ে গেছে এবং একবিন্দুও কুরআন মাজীদে শামিল হতে পারেনি। মানবীয় চিন্তা কল্পনা কিংবা শয়তানী ভাবধারা সবকিছু হতেই কুরআনকে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ : এখানে সে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে, যারা কুরআন মাজীদের এ সহীফাসমূহকে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি হেদায়েত অনুযায়ী লিখছিল, এগুলো সংরক্ষণ ও হেফাজত করছিল এবং নবী করীম ﷺ পর্যন্ত সেগুলোকে যথাযথভাবে পৌছাচ্ছিল। এদের পরিচয় স্বরূপ কুরআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, একটি হলো كِرَامٍ অর্থাৎ সুসম্মানিত। আর দ্বিতীয়টি হলো بَرَرَةٍ অর্থাৎ নেক ও সততাসম্পন্ন। প্রথম শব্দটি বলে এ কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, তারা এতই সম্মানিত যে, যে আমানতই তাদের সোপর্দ করা হবে তাতে তাদের ন্যায় অতি উচ্চ মর্যাদাবান সত্তা দ্বারা কোনোরূপ খেয়ানত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা বুঝাবার জন্য যে, এ সহীফাসমূহ লিখনে, এগুলোর হেফাজতকরণে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত তা যথাযথ পৌছানোর যে কর্তব্য তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে, পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ববোধ সহকারে তারা তা পালন করে থাকে।

কুরআন নিজেই সম্মানিত : যে ধারাবাহিকতায় এ আয়াত কয়টি উদ্ধৃত হয়েছে সে বিষয়ে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এখানে কুরআনের এ পরিচয় কেবল এর মাহাত্ম্য বুঝবার জন্যই নয়; বরং অবিশ্বাসীগণকে বলা হয়েছে যে, এটা অতি মূল্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন। তোমাদের সম্মুখে এটা পেশ করা হলে তোমরা অনুগ্রহ করে এটা গ্রহণ করবে, এরূপ আচরণ এ মহান কিতাবের পক্ষে অপমানকর। এটা এরূপ আচরণের অনেক উর্ধ্বে। কেননা কুরআন তোমাদের মুখাপেক্ষী নয়; বরং তোমরাই এর মুখাপেক্ষী। তোমরা নিজেদের কল্যাণ চাইলে তোমাদের মন-মগজ হতে শয়তানী মনোভাব উৎখাত করে সরাসরি এর দাওয়াত কবুল কর। তোমরা একে যত ক্ষুদ্র-নগণ্যই মনে কর না কেন তাতে এর মহত্ত্ব কিছুমাত্র লাঘব হবে না। অবশ্য তোমাদের আচরণের জন্য তোমাদের সকল অহমিকা ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে। -[কামালাইন]

صُحُفٌ-এর বিশ্লেষণে مُكَرَّمَةٌ নেওয়ার কারণ : مُكَرَّمَةٌ শব্দের অর্থ- সম্মানিত صُحُفٌ দ্বারা এখানে কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন বা অন্যান্য আসমানি গ্রন্থসমূহ সম্মানিত হওয়ার কারণ হলো আসমানি সকল গ্রন্থ বিশেষ করে কুরআনুল কারীম ইলম এবং হিকমতে ভরপুর, এ কারণে এটা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। অথবা এটা লাওহে মাহফূয হতে নাজিল হওয়ার কারণে সম্মানিত। -[ফাতহুল কাদীর]

অথবা, এটা সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক অবতারিত হওয়ার কারণে। অথবা, সম্মানিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত হওয়ার কারণে। -[কুরতুবী]

مَرْفُوْعَةٌ-এর অর্থ এবং এটা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য : مَرْفُوْعَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো উর্ধ্বে। এখানে এটা দ্বারা নিম্নবর্ণিত কয়েকটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. اِنَّهَا رَفِيْعَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা অত্যন্ত সম্মানিত।
২. مَرْفُوْعَةٌ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ আকাশে অতি সম্মানিত।
৩. مَرْفُوْعَةٌ عَنِ الشُّبْهَةِ وَالتَّنَاقُضِ অর্থাৎ সন্দেহ-সংশয় ও স্ববিরোধিতা হতে উর্ধ্বে।
৪. مَرْفُوْعَةٌ عِنْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ মু'মিনগণের নিকট অতি সম্মানিত।

مُطَهَّرَةٌ-এর অর্থ এবং এটা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য : مُطَهَّرَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ- পবিত্র। এখানে মুফাসসিরগণ এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. এর অর্থ কুরআনে কারীম এমন পবিত্র যে, পবিত্র ব্যক্তিগণ ছাড়া কেউ এটা স্পর্শ করতে পারবে না. لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ
২. অথবা, এটা সমস্ত পঙ্কিলতা হতে পবিত্র- مُطَهَّرَةٌ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ
৩. مَحْفُوْظَةٌ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ لَا يَنَالُوْنَهَا অর্থাৎ এটা মুশরিকদের ধরাছোঁয়া হতে সম্পূর্ণ মাহফূয।
৪ অথবা. মুশরিকদের উপর নাজিল হওয়া হতে পবিত্র- مُطَهَّرَةٌ مِنْ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ لِاَنَّهُمْ نَجَسٌ

سَفَرَةٌ-এর অর্থ এবং আয়াতে এটা দ্বারা উদ্দেশ্য : سَفَرَةٌ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো سَافِرٌ যেমন كَاتِبٌ-এর বহুবচন كَتَبَةٌ এবং كَافِرٌ-এর বহুবচন كَفَرَةٌ ইত্যাদি। এখানে سَفَرَةٌ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

১. এখানে سَفَرَةٌ দ্বারা সে ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মাঝে দূত হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।

২. এরা সে সম্মানিত ফেরেশতা যারা বান্দার কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করে থাকেন। سَافِرٌ শব্দটি কোনো কোনো সময় كَاتِبٌ-এর অর্থেও হয়ে থাকে। اَلسِّفْرُ কে- اَلْكِتَابُ (সীন অক্ষরটি যের যোগে) ও বলা হয়। এর বহুবচন اَسْفَارٌ হয়ে থাকে।

৩. اَلسَّفَرَةُ দ্বারা এখানে কারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা কিতাব (اَسْفَارٌ) পাঠ করে থাকেন।

৪. سَفَرَةٌ দ্বারা এখানে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে।

৫. سَفَرَةٌ শব্দটিকে এখানে ফেরেশতাদের বিশেষ গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যা হোক, এখানে سَفَرَةٌ দ্বারা ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য হওয়াই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

كِرَامٌ-এর অর্থ : كِرَامٌ শব্দটি كَرِيْمٌ-এর বহুবচন। অর্থ- অভিজাতবর্গ, মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, আয়াতে ফেরেশতা উদ্দেশ্য। হযরত কালবী (র.) বলেন, كِرَامٌ عَلٰى رَبِّهِمْ অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে সম্মানিত। হযরত হাসান (র.) বলেন, كِرَامٌ عَنِ الْمَعَاصِىْ فِيْهِمْ يَرْفَعُوْنَ اَنْفُسَهُمْ عَنْهَا অর্থাৎ যারা গুনাহ-নাফরমানি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। অতএব, তারা স্ব-স্ব আত্মাকে পাপ হতে উর্ধ্বে রাখে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- يَتَكَرَّمُوْنَ اَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ ابْنِ اٰدَمَ اِذَا خَلَا بِزَوْجَتِهٖ اَوْ تَبَرَّزَ لِغَائِطِهٖ অর্থাৎ বনী আদম যখন স্ত্রীর সাথে নির্জনে যায় অথবা পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য একাকী হয় তখন তারা বনী আদমের সম্মানার্থে সাথে থাকে না। কারো কারো মতে يُؤْثِرُوْنَ مَنَافِعَ غَيْرِهِمْ عَلٰى مَنَافِعَ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ তারা নিজের সুবিধার উপর অন্যের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

যারা মু'মিনদের জন্য ইসতিগফারের মাধ্যমে করুণাকামী এবং তাদের কল্যাণের পথ প্রদর্শক তারাই كِرَام -[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতের كِرَام শব্দটির অর্থ হলো যারা কুরআন মাজীদ পাঠে ও লিপিবদ্ধ করায় রত তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত। -[নূরুল কোরআন]

بَرَرَةٌ-এর অর্থ : بَرَرَةٌ শব্দটি بَارٌّ-এর বহুবচন, যেমন كَفَرَةٌ শব্দটি كَافِرٌ-এর বহুবচন। بَرَرَةٌ অর্থ আল্লাহর অনুগত সত্যবাদী মু'মিন। -[ফাতহুল কাদীর]

শায়খ আলূসী (র.) বলেন, بَرَرَةٌ শব্দটি بَرٌّ-এর বহুবচন। আর اَبْرَارٌ শব্দটি بَرٌّ এবং بَارٌّ-এর বহুবচন, যেমন رَبٌّ-এর বহুবচন اَرْبَابٌ. صَاحِبٌ-এর বহুবচন اَصْحَابٌ।

কেউ কেউ বলেন, কুরআন মাজীদে بَرَرَةٌ শব্দ দিয়ে مَلَائِكَة বা ফেরেশতাকুল এবং أَبْرَارٌ দিয়ে মানবকুল বুঝানো হয়েছে। আর এটা এ কারণে যে, أَبْرَارٌ শব্দটি جَمْعُ الْقِلَّةِ-এর শব্দ। এটা মানুষের সাথেই প্রযোজ্য। কেননা মানুষের মধ্যে মুত্তাকীর সংখ্যা কম হবে। পক্ষান্তরে بَرَرَةٌ শব্দটি جَمْعُ الْقِلَّةِ নয়। এটা ফেরেশতাকুলের ব্যাপারে প্রযোজ্য। কেননা তাদের মধ্যে মুত্তাকীর সংখ্যা মানুষের তুলনায় অনেক বেশি।

কারো মতে, أَبْرَارٌ শব্দটি بَرَرَةٌ হতে বেশি বাগ্মিতাপূর্ণ। কেননা أَبْرَارٌ শব্দটি بَارٌّ-এর বহুবচন, আর بَرَرَةٌ শব্দটি بَرٌّ-এর বহুবচন بَارٌّ এবং أَبْرَارٌ লিখতে অক্ষর বেশি এবং بَرَرَةٌ ও بَرٌّ লিখতে অক্ষর কম লাগে। আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী كَثْرَةُ الْمَبَانِيْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِيْ অর্থাৎ বেশি হরফ বেশি অর্থ বহন করে। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বনী-আদমে সব গুণ পাওয়া যায়, আর তা হলো صِفَات كَامِلَة وَنَاقِصَة তথা পূর্ণ গুণ এবং অসম্পূর্ণ গুণ থাকা। এ কারণে তাদের পরিপূর্ণ গুণে أَبْرَارٌ বলা হয়েছে। আর ফেরেশতাদের মধ্যে صِفَات نَاقِصَة পরিপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত এ কারণেই তাদের জন্য بَرَرَةٌ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তাদের মাঝে মূল গুণই বিদ্যমান, মুবালাগা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। আর বনী আদমের ফজিলতের জন্য মুবালাগা ব্যবহার করা দরকার। কেননা صِفَات نَاقِصَة থাকা সত্ত্বেও صِفَات كَامِلَة-এর উপযোগী হওয়া সহজ কথা নয়।

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক : ইতঃপূর্বে সূরাটির প্রথম হতে ষোল আয়াত পর্যন্ত কেবল নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন ও উপলক্ষ করেই কথা বলা হয়েছে। এর বর্ণনা ও বাচনভঙ্গি ছিল এরূপ যে, 'হে নবী! সত্যের সন্ধানকারী ব্যক্তির পরিবর্তে আপনি এ কেমন সব লোকের প্রতি বেশি লক্ষ্য আরোপ করছেন, সত্য দীনের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদের তো কোনোই মূল্য বা গুরুত্ব নেই। আর আপনার ন্যায় মহাসম্মানিত নবী কুরআনের ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থকে এদের সম্মুখে পেশ করবেন। এর যোগ্য তারা নয়। আর অত্র আয়াত (قُتِلَ الْإِنْسَانُ الخ) হতে সে কাফিরদের প্রতি রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে যারা সত্য দীনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল।

আয়াতের শানে নুযূল : আবূ লাহাবের পুত্র উতবা বলল, আমি নক্ষত্রের প্রভুকে স্বীকার করি না, আর তাদের মালিককেও মানি না। তখন এ আয়াত قُتِلَ الْإِنْسَانُ নাজিল হয়। –[লোবাব, মা'আলিম]

কেউ কেউ বলেন, ওতবা নয়– উমাইয়া ইবনে খালফের কুফরি প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। আবার কোনো কোনো মুফাসসিরীনের মতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফেরদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[খাযিন]

এ ব্যাপারে ইবনুল মুনযির হযরত ইকরামা (রা.) হতে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, উক্ত আয়াত উতবা ইবনে আবী লাহাব সম্পর্কে নাজিল হয়, সে তার পিতাকে রাগান্বিত করে ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু পরে তার পিতা তাকে অনেক ধন-সম্পদ দিয়ে ঠিক করে ফেলল, আর শাম দেশে পাঠিয়ে দিল। সেখান হতে সে নিজের খবর দিয়ে বিশ্বনবী ﷺ-এর কাছে খবর পাঠাল যে, সে নক্ষত্রের প্রভুকে স্বীকার করে না। তখন বিশ্বনবী ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তার উপর তোমার কুকুর পাঠিয়ে দাও যেন তাকে শিকার করে।' যখন সে রাস্তায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্ত বদদোয়ার কথা স্মরণ হয়। তাই তার জীবিত থাকার নিমিত্তে তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য এক হাজার দীনার ঘোষণা করল। অতএব, সঙ্গীরা তাকে তাদের মধ্যখানে রাখল এবং মাল-সামানা দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টন রাখল। অতঃপর একটি বাঘ এসে উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে টুকরা করে ফেলল। তার পিতা আহাজারি করতে করতে বলছিল, 'মুহাম্মদ যা কিছুই বলত তাই ঘটত।' –[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

الْإِنْسَانُ-এর অর্থ : الْإِنْسَانُ দ্বারা এখানে 'উতবা ইবনে আবী লাহাব' উদ্দেশ্য। কারো মতে– الْإِنْسَانُ দ্বারা পেছনে যাদের কথা أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে তারাই উদ্দেশ্য।

কারো মতে মানবজাতি উদ্দেশ্য– এ মতটি উত্তম।

অতএব, এ মতানুযায়ী কট্টর কাফির الْإِنْسَانُ শব্দে শামিল হবে, আর যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সে প্রথম বারেই শামিল হবে। –[ফাতহুল কাদীর]

কারো মতে, الْإِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসেছিল, যাদের কারণে আল্লাহর নবী ইবনে উম্মে মাকতূমকে তখনকার জন্য বর্জন করেছিলেন। কারো মতে الْإِنْسَانُ দ্বারা ঐ সমস্ত ধনী লোক উদ্দেশ্য, যাদের ধন-মালের প্রাচুর্যতা নিয়ে অহংকার রয়েছে। –[কাবীর]

قُتِلَ বলার কারণ :

১. قُتِلَ শব্দটি এখানে বদদোয়া এবং অভিশাপের অর্থ বহন করছে। কেননা দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য হত্যাই বড় অভিশাপ, হত্যা ছাড়া আর কোনো শাস্তি তাদের জন্য নেই। এটাই মারাত্মক শাস্তি। –[কাবীর]

২. قُتِلَ শব্দটি এ কথার ইঙ্গিত বহন করছে যে, অনতিবিলম্বে কিতালের (যুদ্ধের) আয়াত অবতীর্ণ হবে, তখন সকল [illegible] কাফেরদের কবর রচিত হবে। -[রূহুল মা'আনী]

৩. قُتِلَ এমন একটি সীগাহ যদ্দ্বারা রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে সেই কাফেরদের প্রতি যারা সত্য দীনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল। এ সীগাহটি এ কথার ফায়দা দিচ্ছে যে, মানুষ বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এমন কাজ করবে যার শাস্তি একমাত্র হত্যা। -[যিলাল]

مَا أَكْفَرَهُ আয়াতাংশে مَا-এর অর্থ : مَا أَكْفَرَهُ আয়াতাংশে مَا-এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. اِسْتِفْهَامِيَّة তথা প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত। তখন অর্থ দাঁড়াবে أَيُّ شَيْءٍ دَعَاهُ إِلَى الْكُفْرِ অর্থাৎ কোন বস্তু তাকে কুফরির দিকে নিয়ে গেল?

২. لِلتَّعَجُّبِ আশ্চর্যবোধক অর্থে ব্যবহৃত। আরবদের অভ্যাস ছিল যখন তারা কোনো বস্তু সম্পর্কে আশ্চর্য বোধ করত তখন বলত قَاتَلَهُ اللّٰهُ مَا أَحْسَنَهُ এবং أَخْزَاهُ اللّٰهُ مَا أَظْلَمَهُ -[কুরতুবী]

اَلْإِنْسَانُ উল্লেখের কারণ : ইনসান অর্থ মানবজাতি বা মানব। উদ্ধৃত আয়াতে ইনসান শব্দ ব্যবহার করে মানবজাতির সব লোককে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে কেবল সে সকল লোককে, যাদের দুষ্কর্মের বর্ণনা করা সেখানে লক্ষ্য। কুরআনে 'ইনসান' শব্দ কোথাও এ কথা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, মানবজাতির অনেক লোকের মধ্যেই কথিত দোষটি পাওয়া যায়, আর কোথাও নির্দিষ্ট কারো নাম না করে সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো এরূপ তিরস্কারে তাদের মধ্যে জিদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ জন্য সেখানে সাধারণ ভঙ্গিতে উপদেশ দেওয়ার জন্য 'ইনসান' বলে উল্লেখ করা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়েছে।

মানুষের তিনটি ধাপ : একথা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর তিনটি ধাপ রয়েছে- প্রথম, মধ্য ও শেষ। এ তিনটি ধাপ মানুষের জন্যও আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন।

১. প্রথম ধাপ হলো مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ অর্থাৎ শুক্রবিন্দু হতে তাকে সৃষ্টি করেছেন।

২. দ্বিতীয় ধাপ হলো ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন, যেখানে আল্লাহ তার চলার পথ সুগম করে দিয়েছেন।

৩. তৃতীয় ধাপ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ অর্থাৎ মৃত্যুদান ও কবরস্থ ধাপ। এ ধাপের জন্য আবার তিনটি স্তর রয়েছে- اَلْإِنْشَارُ . اَلْإِقْبَارُ . اَلْإِمَاتَةُ অর্থাৎ মৃত্যু, কবরস্থ হওয়া ও পুনরুত্থান। -[কাবীর]

মানুষের সৃষ্টি نُطْفَة হতে একথা উল্লেখ করার কারণ : এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, نُطْفَة [বীর্য-শুক্র] একটি ঘৃণিত বস্তু। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ শব্দ উল্লেখ করে একথা বুঝাতে চান যে, যে ব্যক্তির সৃষ্টিমূল نُطْفَة -এর ন্যায় একটি ঘৃণিত বস্তু, সে ব্যক্তি আবার গর্ব-অহংকার করে কিভাবে?

হযরত হাসান বলেন, কিভাবে ঐ ব্যক্তি অহংকার করতে পারে, যে ব্যক্তি মূত্রনালী দিয়ে বের হয়ে এসেছে।

-[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

এখানে نُطْفَة বলে এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, কুফরি করার আগে মানুষের উচিত তার নিজের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করা। চিন্তা করা উচিত তার অস্তিত্ব কী জিনিস দিয়ে এবং কিভাবে সে তৈরি হয়েছে। কোথায় সে লালিত-পালিত হয়েছে। কোন পথে সে এ দুনিয়ায় এসেছে এবং কিরূপ অসহায়-অক্ষম অবস্থায় এ দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে, এসব কথা। নিজের প্রকৃতি ও সঠিক পরিচয় ভুলে গিয়ে বিভ্রান্তিতে এরা কিভাবে পড়ে গেল? নিজের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এদের মন-মগজে কিরূপে স্থান লাভ করতে পারল?

قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ : উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে যে, মানুষ কিভাবে দেখেছে যে, আমি তাকে কোন জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি? আমি তো এক ফোঁটা অপবিত্র শুক্রকীট হতে তাকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তার পরিমিত বিকাশ ঘটিয়েছি। সে শুক্রকীটকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি। তারপর একে মাংসপিণ্ডে রূপান্তর করেছি। এভাবে তোমার সৃষ্টিকে পূর্ণরূপ দান করেছি।

কুফরি করার আগে মানুষের উচিত তার নিজের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করা। চিন্তা করা উচিত তার অস্তিত্ব কি জিনিস দিয়ে এবং কিভাবে তৈরি হয়েছে। কোথায় সে লালিত-পালিত হয়েছে। কোন পথে সে এ দুনিয়ায় এসেছে এবং কিরূপ অক্ষম ও অসহায় অবস্থায় এ দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে? এসব কথা। নিজের প্রকৃতি ও সঠিক অবস্থা ভুলে গিয়ে কিভাবে তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল? নিজের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এদের মন-মগজে কিভাবে স্থান লাভ করতে পারল?

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে ব্যক্তিকে এক ফোঁটা নাপাক নুতফা [বীর্য] হতে সৃষ্টি করা হয়েছে তার আবার গর্ব ও অহংকার করার কি আছে?

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ আয়াতের অর্থ : ইমাম শাওকানী উক্ত আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, يَسَّرَ لَهُ الطَّرِيقَ إِلَى الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভ হতে বের করে ভালো-মন্দের রাস্তা তার জন্য সহজসাধ্য করে দিয়েছেন।

২. ইমাম সুদ্দী, মুকাতিল, 'আতা এবং কাতাদাহ (র.) বলেন, يَسَّرَهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মায়ের গর্ভ হতে বের হওয়ার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। প্রথম অর্থ এখানে অধিক গ্রহণযোগ্য। –[ফাতহুল কাদীর]
ইমাম কুরতুবী (র.) আরো দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন–

৩. হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, এর অর্থ سَبِيلَ الْإِسْلَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় আসার পর ইসলামের রাস্তা বর্ণনা করে দিলেন।

৪. হযরত আবূ বকর ইবনে তাহের (র.) বলেন, يَسَّرَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَا خَلَقَهُ لَهُ وَقَدَّرَهُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা অর্জনের জন্য সহজ পথ বলে দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ অর্থাৎ আমল করতে থাক, যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এটা (তোমার কাছে) সহজ করে দেওয়া হয়েছে। –[কুরতুবী]

৫. কারো মতে, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য দুনিয়ায় সব উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন সে ঐগুলো ব্যবহার করে কাজে লাগাতে পারে।

فَقَدَّرَهُ-এর অর্থ : قَدَّرَهُ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, মানুষ সৃষ্টির কয়েকটি ধাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমত نُطْفَة [বীর্য], তারপর عَلَقَة [গোশতের টুকরা], তারপর সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত, পুরুষ অথবা মহিলা হওয়া পুণ্যবান ও সৌভাগ্যশালী হওয়া অথবা পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য হওয়া।

২. ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, قَدَّرَهُ অর্থ সৃষ্টিতে সমতা রক্ষা করেছেন।

৩. এ অর্থও হতে পারে যে, প্রত্যেকটি অঙ্গ পরিমাণ এবং গুণগত দিক হতে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। পুরুষ ও নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠামোর ব্যবধান মায়ের পেটেই করা হয়ে থাকে। দুনিয়াতে নর ও নারীর শারীরিক গঠন কাঠামো, আকৃতি-প্রকৃতি, চলন-বলন কিরূপ হবে তা মায়ের গর্ভেই পূর্ব নির্ধারিত মতো সঠিক পরিমাপে করে দেওয়া হয়। –[তাফসীরে হাক্কানী, খাযেন, জালালাইন]

আবার কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এ শব্দটি تَقْدِيْر শব্দ হতে রূপান্তরিত। অর্থ মানুষ যখন মায়ের গর্ভে গঠিত ও বর্ধিত হয়ে উঠতে থাকে, ঠিক তখনি তার তকদীর বা নিয়তি নির্দিষ্ট করা হয়। সে কোন লিঙ্গের হবে; তার বর্ণ, আকৃতি, অবয়ব কেমন হবে; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতটা নিখুঁত ও কতটা অসম্পূর্ণ হবে; দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য, মেধাশক্তি কতটা হবে; কোন ভূখণ্ডে, কোন অবস্থা বা পরিবেশে সে ভূমিষ্ঠ ও লালিত-পলিত হবে; দুনিয়ায় সে কি করবে এবং কত দিন বাঁচবে এ সবই মায়ের পেটে থাকতেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, এটাই তাকদীর। উদ্ধৃত আয়াতে তাকদীরের কথাই বলা হয়েছে।

ইমাম ফাররা বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন, পাখি এবং হিংস্রজন্তুর মতো এখানে সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকার মতো ব্যবস্থা করেননি। কেননা কবরস্থ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্মান দিয়েছেন। তাদের লাশ সংরক্ষিত হয়ে থাকে– অসম্মানে পড়ে থাকে না, শৃগাল কুকুরের খাদ্য হয় না। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। স্রষ্টা যখন মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠাতে চাইবেন, তখন সে জীবিত হতে ও উঠতে অস্বীকার করবে এমন কোনো ক্ষমতা তার নেই। প্রথমে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল তখনো সে তাকে জিজ্ঞাসা করে সৃষ্টি করা সে দুনিয়াতে আগমন করতে ইচ্ছুক কিংবা প্রস্তুত কি সে বিষয়ে তার কোনো মতই তখন গ্রহণ করা হয়নি। যদি সে দুনিয়ায় আসতে অস্বীকার করত, তবুও তাকে সৃষ্টি করা হতো, দুনিয়ায় তাকে আসতে হতো। তার অস্বীকৃতি কোনো কাজেই আসত না। অনুরূপভাবে পুনর্বার সৃষ্টি করাও তার ইচ্ছা ও মর্জির উপর বিন্দুমাত্র নির্ভরশীল নয়। এমন নয় যে, সে মরার পর পুনরুজ্জীবিত হতে চাইলে তবেই তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে আর তা অস্বীকার করলে সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠা হতে রেহাই পেয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব কথা; বরং স্রষ্টার ইচ্ছার সম্মুখে মানুষ এ ব্যাপারেও সম্পূর্ণভাবে অক্ষম ও অসহায়। তিনি যখনই চাইবেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠাবেন, দাঁড় করিয়ে দিবেন। সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে একান্তভাবে বাধ্য হবে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কোনো অবকাশ রাখা হবে না, তার ধার ধরা হবে না।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে إِنْشَارٌ-এর দ্বারা بَعْث বা পুনরুত্থানকে বুঝানো হয়েছে। আর إِذَا شَاءَ অর্থ হলো যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন। পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও কখন তা সংঘটিত হবে তা একমাত্র তিনি জানেন।

أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ-এর মর্মার্থ : 'তাকে মৃত্যুদান করত সমাধিস্থ করেন' -এর অর্থ নিজের জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো মানুষ বাধ্য নয়। নিজের মৃত্যুর ব্যাপারেও সে আল্লাহর সমীপে একান্তই অসহায়। নিজের জন্ম বা মৃত্যু কোনোটির উপরই মানুষের এখতিয়ার নেই। মৃত্যুকে সে এক মুহূর্তের জন্যও এড়াতে পারে না। যে স্থান বা যে অবস্থায়ই তার মৃত্যুর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঠিক সে সময়, সে স্থানে ও সে অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে। আর যে ধরনের কবর হওয়া তার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, ঠিক সেই ধরনের কবরেই তাকে সমাহিত হতে হবে। চাই তা মাটির গর্ভে হোক, কিংবা সমুদ্রের গর্ভে অথবা অগ্নিকুণ্ডে হোক, কিংবা কোনো হিংস্র জন্তুর উদরে হোক।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, কবর শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৃত্যুর পরে তাকে সমাধিস্থ করা বা কবর দেওয়া তার নিজস্ব বিধান বলে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মৃতের জন্য এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ঐশী বিধান। মৃতদেহ দগ্ধ করা বা উন্মুক্ত মাঠে ফেলে রাখা অস্বাভাবিক ও ঐশী বিধানের বিপরীত প্রথা। সামাজিক, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দিক দিয়েও সমাধি-প্রথা সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় বহু মূল্যবান দ্রব্যের ন্যায় তাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সযত্নে ভূগর্ভে রক্ষণ করা হয়। পক্ষান্তরে জীব-জন্তু ও পশু-পাখির মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়, আবার আবর্জনা পুড়ে ফেলা হয়। সমাধিস্থ করার মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুর পরেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনের অন্তরে তার অবিকৃত ও পরিপূর্ণ স্মৃতিই বিরাজমান থাকে।

অনেক মৃতদেহ কবরে দাফন করা হয় না, তবু أَقْبَرَهُ বলার তাৎপর্য হচ্ছে– কোনো কোনো মানুষের মৃতদেহ পানির গভীরে, আগুনে বা হিংস্র জীবের পেটে যায়; কিন্তু পরিণামে কোনো না কোনো সময় মাটির সাথে মিশে মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। এ হিসেবে কবরে সমাধিস্থ করার কথাটা ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে মাটিতেই মিশিয়ে দিবো। –[বায়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ : সত্যি কথা হলো, তার প্রভু তাকে যা করার জন্য আদেশ করেছেন তা সে পালন করেনি।

كَلَّا-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : كَلَّا শব্দটি ধমকি ও হুমকির অর্থে হয়ে থাকে। এখানে এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, كَلَّا শব্দটি حَقًّا-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবিকই সে [কাফের] তার প্রভুর আদেশ পালন করেনি।

২. কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে এর উদ্দিষ্ট অর্থ হলো– لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُوْلُ الْكَافِرُ অর্থাৎ কাফেররা যা ধারণা করেছে প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কেননা পুনরুত্থানকে একেতো তারা বিশ্বাসই করত না, তা ছাড়া তারা এটাও বলত যে, وَلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّىْ إِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى অর্থাৎ যদি আমাদেরকে আল্লাহর নিকট (পুনরুজ্জীবিত হয়ে) ফিরেই যেতে হয়, তাহলে তাঁর নিকট অবশ্যই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩. অথবা, তাদেরকে গর্ব ও অহংকার হতে দূরে থাকার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করার নিমিত্তে كَلَّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. অথবা, তাদেরকে কুফরের উপর হঠকারিতা হতে সাবধান করা হয়েছে।

৫. অথবা, যারা পরকাল ও হাশর-নশরকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে।

لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ-এর অর্থ : মহান আল্লাহ মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আবার তিনিই তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। তিনিই তার মালিক, মনিব, তিনিই তার সব কিছু করেন। এসব জানা সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না, তার আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলে না।

ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হলো কোনো মানুষই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আরোপিত সকল দায়িত্ব সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারে না। ইমাম রাযী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে যে মানুষটির কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইতঃপূর্বে এরশাদ করেছেন যে, قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ।

أَنْشَرَهُ আয়াতাংশে বর্ণিত দু'টি কেরাত : জমহুর أَنْشَرَهُ আলিফসহ পড়েছেন। আর আবূ হায়াত, নাফে' এবং শোয়াইব হতে আলিফ ব্যতীত نَشَرَهُ পঠিত হয়েছে। উভয় অবস্থাতে একই অর্থ এবং উভয় কেরাতই শুদ্ধ। –[কুরতুবী]

অনুবাদ :

٢٤. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ نَظَرَ اِعْتِبَارٍ إِلَى طَعَامِهِ كَيْفَ قُدِّرَ وَ دُبِّرَ لَهُ .

২৪. সুতরাং মানুষ লক্ষ্য করুক উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে লক্ষ্য করা। তার খাদ্য পানে যে, তিনি কিভাবে তার জন্য এর আয়োজন ও বন্দোবস্ত করেছেন?

٢٥. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ مِنَ السَّحَابِ صَبًّا .

২৫. আমিই বারি বর্ষণ করি মেঘমালা হতে প্রচুর পরিমাণে

٢٦. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ شَقًّا .

২৬. অতঃপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করি উদ্ভিদ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে।

٢٧. فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ .

২৭. অতঃপর আমি তাতে উৎপন্ন করি শস্য যেমন- গম, যব।

٢٨. وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا هُوَ الْقَتُّ الرَّطَبُ .

২৮. আঙ্গুর ও শাক-সবজি কাঁচা তরকারি।

٢٩. وَّ زَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا .

২৯. আর যায়তুন ও খেজুর।

٣٠. وَّحَدَائِقَ غُلْبًا بَسَاتِيْنَ كَثِيْرَةَ الْأَشْجَارِ .

৩০. অনেক বৃক্ষমণ্ডিত উদ্যান অধিক বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগান।

٣١. وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا مَا تَرْعَاهُ الْبَهَائِمُ وَقِيْلَ التِّبْنُ .

৩১. ফল ও গবাদির খাদ্য যাতে চতুষ্পদ জন্তু বিচরণ করে আর কারো মতে ঘাস উদ্দেশ্য।

٣٢. مَتَاعًا مُتْعَةً أَوْ تَمْتِيْعًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي السُّوْرَةِ قَبْلَهَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تَقَدَّمَ فِيْهَا أَيْضًا .

৩২. ভোগ সম্পদ مَتَاعًا শব্দটি مُتْعَةً বা تَمْتِيْعًا অর্থে ব্যবহৃত। যেমন পূর্ববর্তী সূরায় আলোচিত হয়েছে। তোমাদের জন্য ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য এর আলোচনাও পূর্ববর্তী সূরায় উল্লেখ হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : কুরআন মাজীদের مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ আয়াতটির মহল্লে ই'রাব কয়েকটি হতে পারে–

ক. مَفْعُوْل لَهُ হিসেবে مَنْصُوْب মূলবাক্য এভাবে হবে যে .... فَعَلَ ذٰلِكَ تَمْتِيْعًا لَكُمْ

খ. অথবা مَصْدَر مُؤَكِّد তথা مَفْعُوْل مُطْلَق হিসেবে মানসূব হয়েছে। তখন মূলবাক্য এভাবে হবে يُمَتِّعُكُمْ بِذٰلِكَ مَتَاعًا
-[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : কুরআন মাজীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যেখানেই নফসের মধ্যে বিরাজমান প্রমাণাদি পেশ করেছেন, সেখানেই পরপর আশে-পাশে বিরাজমান প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন। এটা তাঁর এক সাধারণ নিয়ম, এখানেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ঐ নিয়মানুযায়ী এখন আশে-পাশে বিরাজমান প্রমাণাদি উত্থাপন করছেন। যেগুলোর প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মুখাপেক্ষী। -[কাবীর]

আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, মানুষ-সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ামতগুলোর আলোচনার পর ঐ নিয়ামতগুলোর সংখ্যা এক এক করে আলোচিত হয়েছে, যেন সকলেই ঐ নিয়ামতগুলো স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করতে পারে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ : ইমাম রাযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এটা চিন্তা করে দেখা দরকার যে, যে খাদ্যের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন– তা তিনি কিভাবে করেছেন। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মানুষের খাদ্যের দু'টি অবস্থা রয়েছে–

১. প্রাথমিক অবস্থা, এটা এমন সকল প্রক্রিয়া যা খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন হয়। যেমন, মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এবং তা হতে বিভিন্ন প্রকারের শস্যাদি ও ফল-মূল জন্ম লাভ করে।

২. দ্বিতীয় অবস্থা, এটা এমন সব প্রক্রিয়া যা খাদ্য-দ্রব্য হতে উপকৃত হওয়ার জন্য তার শরীরের মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।

শেষোক্ত অবস্থা সম্পর্কে সাধারণত মানুষ অবহিত নয়, কেননা এটা মানুষের উপকারে আসবে না অপকার করে বসবে তা সঠিকভাবে কেউই কিছু বলতে পারে না।

কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থাটি মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টির সম্মুখে সংঘটিত হয় বলে এটা সম্পর্কে সকলেই অবহিত। কাজেই প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য বলা হয়েছে।

মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাকে সে অতি সাধারণ মনে করে। কিন্তু এটা কিভাবে সৃষ্টি হলো তা গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। তার এ কথাও চিন্তা করা উচিত যে, যেসব কার্যকারণের ফলশ্রুতিতে মানুষ খাদ্য পায় তাতো একান্তভাবে আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি সেগুলোকে সংগ্রহ করে না দিলে জমিনের বুকে খাদ্যের একটি কণাও মানুষ সংগ্রহ করতে পারত না। এ কথা মানুষ যতই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করবে, আল্লাহর অস্তিত্ব, অসীম ক্ষমতার কার্যকারিতা ও প্রভাবকে সে ততই স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আল্লাহর এ অসীম কুদরত বোধগম্য হলে পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করা তার জন্য মোটেই কঠিন হবে না।

اَنَّا তে বর্ণিত তিনটি কেরাত : اَنَّا তে তিনটি কেরাত বর্ণিত আছে।

১. জমহুর اِنَّا যথা হামযার নিচে যের দিয়ে পড়েছেন। তখন বাক্যটি اِنَّا হতে নতুন করে 'শুরু' ধরতে হবে।

২. কূফাবাসী এবং রুয়াইস ইয়াকূব হতে বর্ণনা করছেন যে, اَنَّا হামযার উপরে যবর হবে। এমতাবস্থায় اَنَّا হালতে জার-এ হবে। কেননা, اَنَّا হতে শেষ পর্যন্ত طَعَامِهٖ -এর بَدَلْ হবে। অথবা لِاَمُ الْعِلَّةِ উহ্য থেকে যের দিবে। এ কেরাত অনুযায়ী طَعَامِهٖ -এর উপর وَقْف করা সহীহ হবে না।

৩. হুসাইন ইবনে আলী (রা.) اَنّٰى তথা يَاء যুক্ত করে كَيْفَ অর্থে পড়েছেন। এ কেরাত অনুযায়ী طَعَامِهٖ -এর উপর وَقْف করা সহীহ। কেউ কেউ اَنّٰى অর্থ اَيْنَ-ও বলেছেন। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

اَلْاَرْضُ এবং اَلسَّمَاءُ উল্লেখের কারণ : আল্লামা রাযী (র.) বলেন, اَلسَّمَاءُ বলে اَلسَّحَابُ তথা আকাশ থেকে পতিত বারিধারাকে বুঝানো হয়েছে। আর اَلْاَرْضُ বলে ফলনের উপযুক্ত জমিনকে বুঝানো হয়েছে। একথা সকলের-ই জানা যে, আকাশ হতে পতিত বারিধারা জমিনে পড়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের জন্ম হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশ হলো পুরুষ আর জমিন হলো মহিলা। পুরুষ ও মহিলার সংমিশ্রণ ছাড়া যেমন সন্তান আসতে পারে না, তেমনি পানি ছাড়া জমিনে উদ্ভিদ গজাতে পারে না।

পানি বর্ষণের প্রতি লক্ষ্য করার কারণ : কুরআন মাজীদের اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا আয়াতে اَلْمَاءَ দ্বারা বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। অতঃ এ বৃষ্টিতে যে কীর্তি আল্লাহর পক্ষ হতে বিদ্যমান রয়েছে তা একবার ভেবে দেখা দরকার। কিভাবে কঠিন ভারি পানি আকাশে উড়ছে? এত ভারি হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তা খোলা আকাশে ঝুলে রয়েছে।

একটু চিন্তা করা আবশ্যক, নিকটতম ও দূরতম কারণগুলো খুঁজে বের করা দরকার। কে এবং কার মাধ্যমে এ সমস্ত কঠিন কার্য সম্পাদিত হচ্ছে? নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত সকলের সামনে একথা উজ্জ্বল দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এটা একমাত্র আল্লাহর নূর, ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা এবং বিচক্ষণতা ও নিপুণতার ফলশ্রুতি। –[কাবীর]

কেন এবং কিভাবে আল্লাহ পানি বর্ষণ করেন? : সূর্য তাপের সাহায্যে সমুদ্র হতে অপরিমেয় পানি শূন্যলোকে তুলে নেওয়া হয়। এটা হতে ঘন-ভারি মেঘ তৈরি হয়। বাতাস এ মেঘমালাকে আকাশের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। পরে শূন্যলোকে শীতল হিমের চাপে সে বাষ্প পুনরায় পানিতে পরিণত হয় এবং প্রতি অঞ্চলে একটি বিশেষ পরিমাণে তা বর্ষিত হয়। সেই পানি সরাসরি পৃথিবীর উপর পড়ে, মাটির গভীরে কূপ ও ঝর্ণাধারার রূপ পরিগ্রহ করে, নদী ও খাল-বিলে সে পানি সঞ্চিত হয়ে প্রবাহিত হয়। পর্বত-চূড়ায় বরফরূপে জমে তা গলে এবং বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য মৌসুমে তা প্রবাহিত হয়ে ঝর্ণা-খাল, নদী ও সমুদ্রে পরিণত হয়। এসব ব্যবস্থা কি মানুষ নিজে করেছে? মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা রিজিক -এর ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পানি বর্ষণের এ স্বাভাবিক ব্যবস্থা যদি না করতেন, তাহলে মানুষ কি ভূ-পৃষ্ঠে বেঁচে থাকতে পারত?

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তারপর আমি জমিনকে বিদীর্ণ করেছি। এখানে জমিনকে বিদীর্ণ করা এর দ্বারা এতে বীজ বা দানা অথবা চারাগাছের মূল গ্রহণ করার স্থান করে দেওয়া। এটা এমনভাবে হয় যে, মানুষ যখন বীজ বা দানা অথবা কোনো চারাগাছ বপন করে অথবা বাতাসে ভর করে কিংবা পানীয় চঞ্চুতে বসে বা অন্য কোনো উপায়ে যখন তা মাটির বুকে পৌছায়, তখন মাটি নিজের বুক দীর্ণ করে একে গ্রহণ করে। এটা অঙ্কুরিত হয়, এর শিকড় মাটির গভীরে বসে যায় এবং গাছ ফুটে বের হয়। এ ব্যাপারে মানুষের কাজ নিতান্ত নগণ্য। সে হয়তো মাটি খোদাই করে, কিংবা তাতে হাল চালিয়ে মাটির উপরিভাগ ওলট পালট করে এবং আল্লাহর সৃষ্ট বীজ এতে লাগিয়ে দেয় মাত্র। এটা ছাড়া আর সব কাজই আল্লাহর। তিনি অসংখ্য রকমের উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সে বীজসমূহে এ গুণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তা জমিনে বপন করা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠে। প্রত্যেকটি বীজ হতে তার স্বজাতীয় বা স্বপ্রজাতীয় উদ্ভিদ উদ্ভূত হয়। এর অন্যথা হয় না। মাটি পানির সাথে মিলেমিশে বীজসমূহকে অঙ্কুরিত করে এবং প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদকে এরই অনুকূল খাদ্য, উপাদান ও পরিবেশ, নিয়মিত ও পরিমিতভাবে দিয়ে একে সমৃদ্ধ করে– এ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যও আল্লাহরই সৃষ্টি। এ বীজসমূহকে এহেন যোগ্যতা দিয়ে এবং মাটির উপরিভাগকে এ সব গুণ দিয়ে যদি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষ এখানে নিজেদের জন্য কোনো খাদ্য জোগাড় ও তৈরি করতে পারত না।

আয়াতে উল্লিখিত কয়েকটি উদ্ভিদ : আল্লাহ তা'আলা উক্ত কয়েকটি আয়াতে যে আট প্রকারের উদ্ভিদের আলোচনা করেছেন, তা নিম্নরূপ–

১. اَلْحَبُّ বা শস্যদানা, যা মানুষ শস্য হিসেবে কেটে থাকে। যেমন– গম, যব। اَلْحَبُّ-কে সর্বপ্রথমে আনার কারণ হলো তা খাদ্য হিসেবে প্রধান খাদ্য।

২. عِنَبٌ বা আঙ্গুর, حَبٌّ-এর পর عِنَبٌ-কে উল্লেখ করার কারণ হলো– এটা একদিকে যেমন খাদ্য, অপর দিকে তা ফল।

৩. قَضْبٌ-এর দু'টি অর্থ– ক. সতেজ তরকারী। খ. ঘাস।

৪. ও ৫. زَيْتُوْنٌ ও نَخْلٌ বা যায়তুন এবং খেজুর।

৬. حَدَائِقَ غُلْبًا অর্থাৎ ঘন বন বা বাগ-বাগিচা। এর দু'টি অর্থ হতে পারে– ক. ঐ সমস্ত বাগান যেগুলোর গাছপালা ঘন ঘন। খ. বড় বড় গাছপালা বিশিষ্ট বাগান।

৭. فَاكِهَةً বা ফলমূল। কোনো কোনো মুফাসসির দলিল পেশ করেন যে, এখানে فَاكِهَةً-কে عِنَبٌ ـ زَيْتُوْنٌ এবং نَخْلٌ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। অতএব, আঙ্গুর, যায়তুন এবং খেজুর فَاكِهَةً-এর ভিতর শামিল হবে না। কেননা عَطْف-এর মধ্যে বৈপরীত্য থাকতে হয়।

৮. اَبٌّ বা চারাগাছ, যেখানে জন্তু চরে। –[কাবীর]

قَضْبٌ-কে قَضْبٌ বলে নাম রাখার কারণ : قَضْبٌ অর্থ قَطْعٌ বা কাটা। সতেজ তরকারি এবং ঘাসকে قَضْبٌ বলার কারণ হলো– এটা পরপর কয়েকবার কাটা পড়ে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) قَضْبٌ অর্থ খেজুর করেছেন। কেননা, এটা খেজুর গাছ হতে কাটা হয়। –[কুরতুবী]

قَضْبٌ-এর অর্থ : قَضْبٌ এর কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১. ঘাস এবং তৃণ যা জন্তুর খাদ্য।

২. গাছ থেকে যে সমস্ত ডাল কাটা হয়, যেন এটা দ্বারা তীর-ধনুক বানানো যায়।

৩. ঘাস এবং শাক-সবজি হওয়ার স্থান।

৪. ঐ সমস্ত শাক-সবজি যা মূল রেখে বাকি অংশ কেটে ব্যবহার করা হয়।

৫. কারো মতে এর দ্বারা শুকনো ঘাসকে বুঝানো হয়েছে।

৬. খেজুর। –[কুরতবী]

غُلْبًا-এর অর্থ : غُلْبًا অর্থ عِظَامًا বা বড়। মূলত এটা أَغْلَبُ-এর বহুবচন। এখানে বাগানের বড় বড় গাছকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি غُلْبًا-এর অর্থ غِلَاظٌ শক্ত এবং اَلطِّوَالُ লম্বা করেছেন। হযরত কাতাদাহ (র.) এবং ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, اَلْغُلْبُ অর্থ اَلنَّخْلُ الْكِرَامُ বা উত্তম খেজুর গাছ। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, غُلْبًا অর্থ ঐ গাছ যার নিচে ছায়া নেওয়া যায়। –[ইবনে কাছীর]

اَلْاَبُّ-এর অর্থ : اَلْاَبُّ অর্থাৎ চারাগাছ। যেখানে চতুষ্পদ জন্তু বিচরণ করে। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন

ইমাম যাহ্হাক (র.) বলেছেন যে, اَبٌّ -এর দ্বারা কৃষি ফসল কেটে নেওয়ার পর যে অংশ পরিত্যক্ত হিসেবে পড়ে থাকে তাকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম যাহ্হাক (র.) হতে অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে সাধারণত যেসব তৃণ-লতা উদ্গত হয়, তাকে اَبٌّ বলা হয়েছে।

ইমাম শাওকানী (র.)-এর মতে ভূ-পৃষ্ঠে উদ্গত ঐ সব বস্তুকে اَبٌّ বলা হয় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এবং মানুষ তার চাষাবাদও করে না যেমন– ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি।

হযরত ইবনে আবী তালহা (রা.)-এর মতে, পাকা সতেজ ফলকে اَبٌّ বলে। ইমাম কুরতুবী (র.)-এর মতে চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য তথা ঘাসকে اَبٌّ বলে। কেউ কেউ বলেছেন, শুকনা ফলকে اَبٌّ বলে। কেননা এটা শুকিয়ে শীতকালের জন্য রাখা হয়। কারো কারো মতে ঘাস ও ঘাসের স্থানকে اَبٌّ বলে। যেসব উদ্ভিদ মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব ভক্ষণ করে, তাকে اَبٌّ বলে।

মোটকথা, এর দ্বারা এখানে চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য বিশেষত ঘাসকে বুঝানো হয়েছে।

এখানে উক্ত আটটি বস্তুর উল্লেখের উদ্দেশ্য কি? : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে উক্ত আটটি বস্তুর উল্লেখ করে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

১. আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর অকাট্য দলিল পেশ করা।
২. পুনরুত্থানের উপর অকাট্য প্রমাণ পেশ করা।
৩. এ কথাটি বুঝিয়ে দেওয়া এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে, যে আল্লাহ তা'আলা এ সব নিয়ামতের মাধ্যমে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। মানুষ তার বিবেককে একটুখানি খাটালেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহর এ সব ইহ্সানকে ভুলে গিয়ে তাকে অস্বীকার করা বা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা অথবা পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাঁকে অক্ষম মনে করা চরম অকৃতজ্ঞতা ও মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, উপরে যে সকল খাদ্য-দ্রব্যের ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করা হয়েছে তা তোমাদের ভোগের সামগ্রী হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তোমাদের জন্যই নয়, বরং যেসব জন্তু-জানোয়ার হতে তোমরা গোশ্‌ত, চর্বি, মাখন প্রভৃতি খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করে থাক এবং যেসব তোমাদের জীবিকার জন্য আরো অনেক প্রকারের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। সে সবের জন্যও এ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর প্রদত্ত এ সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহার ও ভোগ করে তাঁকেই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এটা অপেক্ষা চরম ধৃষ্টতা আর কি হতে পারে?

আয়াতে مَتَاعًا শব্দটি কোন অর্থে হয়েছে? : আল্লাহর বাণী مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ -এর মধ্যে مَتَاعًا শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. এটা مُتْعَةً -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ فُعِلَ ذٰلِكَ مُتْعَةً لَّكُمْ এটা তোমাদের সম্ভোগের বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।
২. অথবা এটা تَمْتِيْعًا -এর আগে হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর উপকারার্থে আমি এ সব কিছু সৃষ্টি করেছি।

অনুবাদ :

٣٣. فَاِذَا جَاۤءَتِ الصَّاۤخَّةُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ .	৩৩. অনন্তর যখন কর্ণবিদারক ধ্বনি উচ্চারিত হবে দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকার।
٣٤. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ .	৩৪. সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে;
٣٥. وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ .	৩৫. আর তার মাতা ও পিতা।
٣٦. وَصَاحِبَتِهٖ زَوْجَتِهٖ وَبَنِيْهِ يَوْمَ بَدَلٌ مِنْ اِذَا وَجَوَابُهَا دَلَّ عَلَيْهِ .	৩৬. তার সঙ্গিনী স্ত্রী ও তার সন্তান হতে يَوْمَ শব্দটি اِذَا হতে بَدَلٌ আর এর জওয়াবের প্রতি পরবর্তী আয়াত নির্দেশ করছে।
٣٧. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ حَالٌ يَشْغَلُهٗ عَنْ شَاْنِ غَيْرِهٖ اَيْ اِشْتَغَلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهٖ .	৩৭. তাদের মধ্য হতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেদিন এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা তাকে ব্যস্ত করে রাখবে এমন অবস্থা যা তাকে অন্যের অবস্থা হতে অমনোযোগী রাখবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে
٣٨. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ مُضِيْئَةٌ .	৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হাস্যোজ্জ্বল হবে আলোকিত
٣٩. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ فَرِحَةٌ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ .	৩৯ সহাস্য ও উৎফুল্ল প্রফুল্লচিত, তারা হলো মু'মিনগণ
٤٠. وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ غُبَارٌ .	৪০. আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি-ধূসর হবে ধূলিপূর্ণ, বিমলিন।
٤١. تَرْهَقُهَا تَغْشَاهَا قَتَرَةٌ ظُلْمَةٌ وَسَوَادٌ .	৪১. সেগুলোকে আচ্ছাদিত করবে আচ্ছন্ন করবে কালিমা অন্ধকার ও কালিমা।
٤٢. اُولٰۤئِكَ اَهْلُ هٰذِهِ الْحَالَةِ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ اَيِ الْجَامِعُوْنَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْفُجُوْرِ .	৪২. এরাই এ অবস্থায় বিরাজমানগণ কাফির ও পাপাচারী অর্থাৎ কুফরি ও পাপ উভয় অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিগণ।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ يَفِرُّ আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব : يَوْمَ يَفِرُّ আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব কয়েকটি হতে পারে–

ক. পূর্বোক্ত اِذَا جَاۤءَتِ হতে بَدَلٌ হয়েছে।

খ. অথবা, اَعْنِىْ উহ্য فِعْل -এর মাফউল হয়েছে।

গ. অথবা, اَلصَّاۤخَّةُ হতে বদল হয়ে فَتْح-এর উপর مَبْنِىْ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমটি হলো তাওহীদের উপর অকাট্য দলিল-প্রমাণ, দ্বিতীয়টি হলো– পুনরুত্থানের উপর দলিল এবং তৃতীয়টি হলো– যিনি এ পৃথিবীর নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরই ইবাদত করা দরকার।

এ তিনটি মৌলিক বিষয় উল্লেখ করে এখন পুনরুত্থানের দিনের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যখনই ঐ ভয়াবহতার কথা শ্রবণ করবে, ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে। আর এ ভয়-ই তাকে আল্লাহর পেশকৃত প্রমাণাদির উপর চিন্তা-গবেষণা, এর প্রতি বিশ্বাস এবং কুফরি থেকে বিরত থাকার প্রতি আহ্বান করবে, এমনকি মানুষের উপর গর্ব-অহংকার করার মানসিকতাটুকুও বর্জন করার প্রতি আহ্বান করবে এবং মানুষের প্রতি নম্র ও ভদ্র হওয়ার দিকে আকৃষ্ট করবে। -[কাবীর]

জীবিকা অর্জনের ব্যাপারসমূহ আলোচনার পর পুনরুত্থানের ব্যাপারসমূহের আলোচনা শুরু হয়েছে, যেন পুনরুত্থান দিনের জন্য যথার্থভাবে আমলে সালেহের মাধ্যমে পুঁজি অর্জন করে নিতে পারে। -[কুরতুবী]

কিয়ামতের দিনের ভায়াবহতা : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইসরাফীল (আ.) দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক প্রদান করলে যখন সমস্ত মানবকুল মহাবিচার ক্ষেত্রে উঠে আসবে; সে ঘোর সঙ্কটময় দিবসে ভাই তার ভাইয়ের নিকট হতে, পিতামাতা পুত্র-কন্যার নিকট হতে ও পুত্র-কন্যা পিতামাতার নিকট হতে এবং স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের নিকট হতে পলায়ন করবে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আত্মচিন্তায় বিভোর হয়ে পড়বে। কেউ কারো দিকে ফিরে দেখবে না এবং কেউ কারো কোনোরূপ উপকার করতে পারবে না। -[কাবীর]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন- "কিয়ামতের দিবসে হাশরের ময়দানে সব মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় উঠবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিদের একজন হযরত আয়েশা (রা.) মতান্তরে সাওদা (রা.) ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গুপ্ত অঙ্গসমূহ সেদিন সকলের সম্মুখে অনাবৃত হবে? জবাবে নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পাঠ করে বলে দিলেন 'সেদিন কারো প্রতি কারো তাকাবার মতো হুঁশ-জ্ঞান থাকবে না।"

-[নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে আবূ হাতেম, ইবনে জরীর, তাবারানী, বায়হাকী, হাকিম]

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলবে- আমি দুনিয়ার জীবনে তোমার কিরূপ স্বামী ছিলাম? স্ত্রী জবাবে বলবে- খুব ভালো ছিলে। তখন লোকটি বলবে- তাহলে এ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাকে একটা নেকী দাও না? প্রত্যুত্তরে স্ত্রী বলবে, আমিও তোমার মতো বিপদের ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। তোমাকে কোনো নেকী দান করার সামর্থ্য আমার নেই। এরূপে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে জবাব দিবে।

অতঃপর মু'মিন ও কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার বিবরণ ব্যক্ত করা হচ্ছে-

সেদিন মু'মিন ও পুণ্যবান লোকেরা আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবে এবং তাদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে যারা কাফের ও পাপী লোক- আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও লাঞ্ছনার ভয়ে সেদিন তাদের মুখমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং সে শাস্তি ও লাঞ্ছনা হতে কিছুতেই পরিত্রাণ হবে না।

اَلصَّاخَّةُ -এর অর্থ : اَلصَّاخَّةُ হলো কর্ণ বিদারী মহাধ্বনি। লৌহখণ্ডের উপর লৌহখণ্ড দ্বারা আঘাতের শব্দ, প্রলয়ের ধ্বনি, কিয়ামত। এটা দ্বিতীয়বার শিঙ্গাধ্বনি। যার শব্দ অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিকট। এ আওয়াজ ধ্বনিত হওয়ার পরই কিয়ামত হবে। মৃতব্যক্তিগণ এ আওয়াজেই পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

উক্ত বিকট শব্দ সমস্ত কানগুলোকে বধির করে ফেলবে, কিছুই শুনতে পাবে না। ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, اَلصَّاخَّةُ এমন এক বিকট শব্দকে বলা হয় যা বধিরতার জন্ম দিবে। আল্লাহর কসম, কিয়ামতের এ বিকট শব্দ মানুষকে দুনিয়া হতে বধির বানাবে এবং আখেরাতের সমস্ত ব্যাপারে শ্রোতা বানাবে। -[কুরতুবী]

ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন যে, اَلصَّاخَّةُ এমন এক বিকট শব্দকে বলে যা বধিরতার জন্ম দেয়। আল্লাহর কসম শিঙ্গায় উক্ত বিকট শব্দ মানুষকে দুনিয়া হতে বধির বানাবে এবং পরকালের সমস্ত ব্যাপার এর দ্বারা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লামা কুতুব শহীদ (র.)-এর মতে এটা শিঙ্গার এমন বিকট ধ্বনি যা বাতাস ভেদ করে দ্রুত গতিতে কানে পৌছবে- যাতে কানের ছিদ্র ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে।

يَفِرُّ الْمَرْءُ আয়াতাংশের অর্থ : يَفِرُّ الْمَرْءُ অর্থ 'মানুষ পালাবে' উক্ত কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. মানুষ তার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সেদিন কঠিন বিপদের সম্মুখীন দেখতে পেয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না; বরং সে দূরে সরে যাবে এ ভয়ে যে, এরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকলে সে কিছুই করতে পারবে না।

২. দুনিয়ায় পরকালকে উপেক্ষা করে মানুষ যেভাবে পরস্পরের জন্য গুনাহ করেছে এবং একে অপরকে গোমরাহ করেছে, এর অশুভ পরিণতি সম্মুখে আসতে দেখে তাদের প্রত্যেকেই অপরের নিকট হতে দূরে পালাবে, যেন সে নিজের গুনাহের জন্য তাকে দায়ী করে না বসে। ভাই ভাইকে, সন্তান পিতামাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতামাতা সন্তানকে ভয় করবে যে, সে হয়তো তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিবে। এ ভয়ে সে আপনজন হতে দূরে পালাবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, فِرَارٌ অর্থ দূরে সরে যাওয়া। কেননা কিয়ামতের দিন এক ভাই অপর ভাইকে বলবে, তুমি তোমার মালের ব্যাপারে আমাকে অংশীদার বানাওনি। মাতা-পিতা বলবে তুমি আমাদের খিদমতে ত্রুটি করেছ। স্ত্রী বলবে, তুমি আমাকে হারাম খাইয়েছ। ছেলে-সন্তান বলবে, আমাদেরকে তুমি শিক্ষা দাওনি এবং সঠিক পথ দেখাওনি।

কথিত আছে– প্রথম যে ব্যক্তি তার ভাই থেকে পলায়ন করবে সে হলো হাবীল, যে তার পিতামাতা হতে পলায়ন করবেন তিনি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.), বিবি হতে প্রথম হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.) এবং ছেলে হতে প্রথম হযরত নূহ (আ.) পলায়ন করবেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে যাময়া (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন কিয়ামতের দিন সকল মানুষ খালি পায়ে ও উলঙ্গ শরীরে হাশরের মাঠে উঠবে, ঘাম এবং চর্বি তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একে অপরের সতরের প্রতি তো তাকাবে! তিনি জবাবে বললেন, এটা হতে মানুষ বিরত থাকবে (কোনো খবরই থাকবে না) সাথে সাথে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন– يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ الخ –[রূহুল মা'আনী]

হযরত যাহ্হাক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, কাবীল তার ভাই হাবীল হতে পালাবে। নবী করীম ﷺ তাঁর আম্মা হতে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পিতা হতে, হযরত নূহ (আ.) তাঁর ছেলে হতে, হযরত লূত (আ.) তাঁর স্ত্রী হতে আর হযরত আদম (আ.) তাঁর সন্তানের খারাপ কর্ম হতে পলায়ন করবেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ الخ : কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের এমন অবস্থা হবে যে একে অপরের দিকে তাকাবার অবস্থাই থাকবে না।

নির্দিষ্ট কয়েকজনের কথা উল্লেখের কারণ : يَوْمَ يَفِرُّ .... الخ হতে শুরু করে পর পর কয়েকটি আয়াতে أَخٌ (ভাই), أُمٌّ (মাতা), صَاحِبَةٌ (স্ত্রী), بَنِىْ (সন্তান)-এর মতো কয়েকজন নিকটতম ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেক মানুষের একান্ত নিকটতম হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা দেখে সহযোগিতার স্থলে পলায়নের পথ বেছে নিবে। দুনিয়াতে মায়া-মমতা এবং হৃদ্যতার দিক দিয়ে এরাই হলো প্রথম কাতারের; কিন্তু হাশরের ময়দানের অবস্থা দেখে সমস্ত মায়া-মমতার জাল ছিন্ন হয়ে যাবে। কেউ কারো প্রতি তাকাবে না। 'ইয়া নাফ্সী ইয়া নাফ্সী' করতে থাকবে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ..... مُسْتَبْشِرَةٌ : কিয়ামতের দিন মু'মিন ও পুণ্যবান লোকেরা আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবে এবং তাদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে যারা কাফির ও পাপী হবে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও লাঞ্ছনার ভয়ে সেদিন তাদের মুখমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং সে শাস্তি ও লাঞ্ছনা হতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'মিনদের চেহারা রাত জাগরণের মাধ্যমে ইবাদতে মশগুল হওয়ার কারণে দীপ্তিমান হবে। কেননা হাদীসে আছে مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ রাতে যার নামাজ বেশি হবে দিনে তার চেহারা সুন্দর হবে।

হযরত যাহ্হাক (র.) বলেন, অজুর নিদর্শনে তাদের চেহারা সুন্দর হবে। কারো মতে– আল্লাহর রাস্তায় অধিক সময় ব্যয় করার কারণে তাদের চেহারা দীপ্তিমান হবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, আলমে কুদ্সের সাথে সম্পর্ক এবং মানাযেলে রেদওয়ান অর্জনে আকাঙ্ক্ষী হওয়ার কারণে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা হবে।

হযরত কাল্‌বী (র.) বলেন, কিয়মাতের দিনে ভয়াবহ হিসাব হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কারণে তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। –[কাবীর]

غَبَرَةٌ -এর অর্থ : غَبَرَةٌ অর্থ غُبَارٌ বা ধুলাবালি, অথবা كُدُوْرَةٌ বা ময়লা। মূল আয়াতের মর্মার্থ হবে– কাফেরদের চেহারা আল্লাহর আজাব দেখা মাত্র ধুলা-মলিন অথবা ময়লাযুক্ত (কালো) হয়ে যাবে। –[ফাতহুল কাদীর]

চিন্তা এবং দুঃখ-বেদনার মলিনতা তাদের চেহারায় উজ্জ্বলভাবে দেখা দিবে। –[যিলাল]

যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, যার গতি জমিনের দিকে, তাকে غَبَرَةٌ বলে। –[কুরতুবী]

قَتَرَةٌ -এর অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, قَتَرَةٌ أَيْ كُسُوْفٌ وَسَوَادٌ অর্থাৎ قَتَرَةٌ হলো সূর্যগ্রহণ এবং কালো। তিনি আরো বলেন, ذِلَّةٌ وَشِدَّةٌ বা অপমান এবং কাঠিন্যতা। অতএব, আয়াতের অর্থ এ দাঁড়াবে যে, কাফেরদের উপর কালিমা, অপমান এবং কাঠিন্যতা ছেয়ে থাকবে।

আরবি ভাষায় اَلْقَتَرَةُ শব্দটি اَلْقَتَرُ -এর একবচন, অর্থ হলো اَلْغُبَارُ বা ধুলাবালি। হাদীসে আছে 'জন্তু যখন কিয়ামতের দিন মাটি হয়ে যাবে তখন ঐ মাটি কাফেরদের চেহারায় মারা হবে।' হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, যা আকাশের দিকে উঠে, তাই قَتَرَةٌ যেমন– ধূম্র। –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

اَلْفَجَرَةُ -এর অর্থ : اَلْفَجَرَةُ শব্দটি فَاجِرٌ-এর বহুবচন, فَاجِرٌ শব্দটি زَانِيْ বা ব্যভিচারী অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে فَجَرَ অর্থ كَذَبَ বা 'মিথ্যা প্রতিপন্ন করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা কাফের আল্লাহর দিকে মিথ্যার নিসবত করে। মূলত এর অর্থ اَلْمَائِلُ عَنِ الْحَقِّ তথা 'সত্য বা হক হতে বিমুখকারী'। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

اَلْكَفَرَةُ اَلْفَجَرَةُ এ দু'টি বিশেষণ একত্রীকরণের কারণ : পিছনে একদল লোকের অবস্থা বলা হয়েছে, যাদের চেহারা মলিন এবং কালো হয়ে যাবে। এখন দু'টি বিশেষণ এমনভাবে বলা হয়েছে যে, যে দু'টি তাদের সকল অপকর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। ঐ লোকেরা কুফর এবং ফুজূরকে একত্রকারী। এ কারণে তাদের ব্যাপারে আরো দু'টি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে غَبَرَةٌ ও قَتَرَةٌ. غَبَرَةٌ হবে فُجُوْرٌ -এর কারণে আর قَتَرَةٌ হবে كُفْر -এর জন্য। –[রূহুল মা'আনী]

খারেজী ও মুরজিয়্যাহগণের এ আয়াতের দ্বারা গৃহীত মাযহাব : মুরজিয়্যাহগণ বলেন, مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ বা কবীরা গুনাহকারীগণ তথা যারা ঈমান এনেছে তারা কখনো দোজখে যাবে না এবং কোনো শাস্তি ভোগ করবে না আর খারেজীদের মতে مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। তাদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

মুরজিয়ারা এভাবে দলিল পেশ করেছে যে, অত্র আয়াতগুলো হতে বোধগম্য হয় যে, হাশরবাসীগণ দু'দলে বিভক্ত হবে। একদল হলো পুরস্কারযোগ্য তারা হলেন মু'মিনগণ। আর অন্যদল হলো শাস্তিযোগ্য তারা হলো কাফের। ফাসিকরা কাফের নয়; বরং মু'মিন, কাজেই তারা শাস্তিযোগ্য হবে না; বরং তারা চিরকালের জন্যই জান্নাতী হবে– কখনো জাহান্নামে যাবে না। মোটকথা, কবীরা গুনাহকারী জান্নাতী হবে কখনো সে দোজখে যাবে না।

খারেজীগণ এভাবে দলিল পেশ করেছেন যে অত্র আয়াতগুলো হতে প্রতীয়মান হয় যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তারা কাফের আর অপরাপর দলিল [কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য] হতে বুঝা যায় যে, কবীরা গুনাহকারী শাস্তিযোগ্য হবে। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, কবীরা গুনাহকারী কাফের– সে চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে।

আহলে হক তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে মুরজিয়া ও খারেজীদের দলিলের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলোতে শুধু কাফের ও খালেস মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত দল চিরকালের জন্য জাহান্নামী এবং শেষোক্ত দল চিরদিনের জন্য জান্নাতী হবে। কিন্তু তৃতীয় দল যারা ঈমান আনার পর ফিস্‌ক-ফুজূরীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। সুতরাং অন্যান্য আয়াত ও হাদীস হতে জানা যায় যে, তারা প্রাপ্য শাস্তি ভোগের পর তাদেরকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ : সূরা আত-তাকভীর

সূরাটির নামকরণের কারণ : تَكْوِيْر অর্থ– সংকোচন। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের كُوِّرَتْ শব্দের মাসদার তাকভীর হতে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ সংকুচিত করা বা গুটিয়ে নেওয়া। এর এ নামকরণের বিশেষত্ব হলো, সূরাটিতে সূর্যরশ্মিকে সংকুচিত করা বা নিষ্প্রভ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এতে ২৯টি আয়াত, ১০৪টি বাক্য এবং ৫৩৩টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আবাসায় কিয়ামতের দিনের মহা বিপদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সে বিপদ সংকুল সময় একান্ত আপনজনও একে অন্যের খবর নিবে না; বরং একে অপরের নিকট হতে পলায়নপর হবে। আর এ সূরায় কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ স্থান পেয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার আলোচিত বিষয়াদি এবং কথার ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট মনে হয়– এটা মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি। এর বিষয়বস্তু জানার জন্য তাফসীরে খাযেনে উল্লিখিত সহীহ তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসই যথেষ্ট। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কারো কিয়ামতের দিনকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে, সে যেন সূরা আত-তাকভীর ও সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় দু'টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি পরকাল অপরটি রিসালাত। প্রথম তেরটি আয়াতে 'কিয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দশটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি আয়াতে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ বিভীষিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, নক্ষত্রমালা কক্ষচ্যুত হয়ে খসে পড়বে, পর্বতসমূহ উৎপাটিত হয়ে মেঘের মতো শূন্যে উড়তে থাকবে, ভয়-বিহ্বল মানুষের একান্ত প্রিয় বস্তুর প্রতিও লক্ষ্য থাকবে না। বন-জঙ্গলের জীব-জন্তু দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে একস্থানে সমবেত হবে, সমুদ্রের পানি উদ্বেলিত হয়ে আগুন জ্বলে উঠবে। এর পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ সময় আত্মাসমূহ নতুন করে দেহের মধ্যে সংযোজিত হবে, আমলনামা দেখানো হবে, অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আকাশসমূহের সমস্ত আবরণ দূর হবে এবং বেহেশত ও দোজখ তখন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। পরকালের এ বর্ণনা প্রদানের পর মানুষকে চিন্তা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেদিন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, সে ইহকাল হতে কি সম্বল নিয়ে পরকালে এসেছে।

অতঃপর কুরআন ও রিসালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে মক্কাবাসী কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কাছে যা পেশ করছে, তা পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের কুমন্ত্রণা নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার এক সম্মানিত বার্তাবাহক ফেরেশতা তথা হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর পক্ষ হতে আনীত বাণী। হযরত মুহাম্মদ ﷺ উজ্জ্বল আকাশ প্রান্তে দিবালোকে নিজ চোখে তাঁকে দেখেছেন। এ মহান আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে তোমরা কেন বিপথগামী হচ্ছ?

সূরার শেষ তিনটি আয়াতই সূরার উপসংহার। পবিত্র কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যে কেউ ইচ্ছা করলে এ কুরআনকে বরণ করে ইহকাল ও পরকালকে সার্থক করতে পারে। আর এটা আল্লাহর কালাম হলেও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছে করলে মানব মনে এর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, "مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ التَّكْوِيْرِ أَعَاذَهُ اللّٰهُ أَنْ يَفْضَحَهُ حِيْنَ تُنْشَرُ صَحِيْفَتُهُ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আত-তাকভীর পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আমলনামা খোলার সময় লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করবেন। [অবশ্য বলা হয়েছে যে উক্ত হাদীসখানা জাল।]

সূরাটির শিক্ষণীয় বিষয় : অত্র সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষদেরকে (কিয়ামতের দিন) জুড়ে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন,

يُقْرَنُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ وَيُقْرَنُ الرَّجُلُ السُّوْءُ مَعَ الرَّجُلِ السُّوْءِ فِى النَّارِ فَذٰلِكَ تَزْوِيْجُ النُّفُوْسِ

অর্থাৎ লোকদেরকে জুড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, নেককার নেককারের সাথে জান্নাতী হবে এবং পাপী পাপীর সাথে জাহান্নামী হবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" অর্থাৎ লোক যাকে ভালোবাসবে তার সঙ্গ লাভ করবে। এটা হতে বোধগম্য হয় যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়–শায়খ ও মুরিদের সম্পর্কের তাৎপর্য এখানেই।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আত-তাকভীর মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ لُفِفَتْ وَ ذُهِبَ بِنُوْرِهَا .

২. وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ إِنْقَضَتْ وَتَسَاقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ .

৩. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ذُهِبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا .

৪. وَإِذَا الْعِشَارُ النُّوْقُ الْحَوَامِلُ عُطِّلَتْ تُرِكَتْ بِلَا رَاعٍ أَوْ بِلَا حَلْبٍ لِمَا دَهَاهُمْ مِنَ الْأَمْرِ وَلَمْ يَكُنْ مَالٌ أَعْجَبَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا .

৫. وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ جُمِعَتْ بَعْدَ الْبَعْثِ لِيَقْتَصَّ لِبَعْضٍ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ تَصِيْرُ تُرَابًا .

৬. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ أُوْقِدَتْ فَصَارَتْ نَارًا .

অনুবাদ :

১. যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে ঢেকে দেওয়া হবে এবং এর আলো বিদূরিত হবে।

২. যখন তারকারাজি খসে পড়বে নিঃশেষ হয়ে যাবে ও ভূমিতে খসে পড়বে।

৩. আর যখন পর্বতমালাকে চলমান করা হবে ধরাপৃষ্ঠ হতে একে উপড়ে ফেলা হবে এবং তা বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকবে।

৪. আর যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে রাখালবিহীনভাবে বা দুগ্ধ দোহন ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া হবে, ভীতি বিহ্বলতার কারণে। অথচ আরবদের নিকট এর তুলনায় অধিক আদরণীয় সম্পদ ছিলনা।

৫. আর যখন বন্য পশুকে একসাথ করা হবে একত্রিত করা হবে পুনরুত্থানের পর, তাদের পরস্পর একে অপর হতে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। অতঃপর তারা মৃত্তিকায় পরিণত হবে।

৬. সমুদ্র যখন স্ফীত হবে শব্দটি তাখফীফ ও তাশদীদ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ ধূমায়িত করে আগুনে পরিণত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَكْوِيْرٌ -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : আলোচ্য সূরায় বর্ণিত تَكْوِيْرٌ শব্দটি بَاب تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর অর্থ হলো পেঁচিয়ে দেওয়া। মাথায় পাগড়ি পেঁচানোকে আরবিতে تَكْوِيْرُ الْعِمَامَةِ বলে। সাধারণত দেখা যায় যে, পাগড়ি লম্বা ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। পাগড়িকে মাথার চারদিকে পেঁচানো হয়ে থাকে।

এখানে تَكْوِيْرُ الشَّمْسِ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

* আয়াতে সূর্যের বেলায় تَكْوِيْرُ শব্দটি مَجَازِيْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সূর্যের যে রশ্মি তা হতে বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ব্যাপ্তি লাভ করে থাকে, কিয়ামতের দিন সে বিস্তৃত রশ্মিকে গুটিয়ে ফেলা হবে।
* সূর্যকে আলোহীন-নিষ্প্রভ করে দেওয়া হবে।
* হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, يَمْحِىْ ضَوْءُهَا অর্থাৎ এর আলো দূরীভূত হয়ে যাবে।
* হযরত আবুল হাসান আল-আশ'আরী (র.) বলেছেন যে, সূর্যকে আসমান হতে ফেলে দেওয়া হবে– যাতে তা জমিনে লুটিয়ে পড়ে যাবে।
* সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো সূর্য শীতল হয়ে যাবে, এর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিভে যাবে। এর কর্ম ক্ষমতা বিলোপ করা হবে।

হযরত আবূ সালমাহ ইবনে আব্দুর রহমান নবী করীম ﷺ হতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাওলা দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "চন্দ্র এবং সূর্যকে কিয়ামতের দিন দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।" হযরত হাসান (র.) আবূ সালমাকে জিজ্ঞেস করলেন, চন্দ্র ও সূর্যের দোষ কি? তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে কেন? আবূ সালমা (রা.) বললেন, আমি তো নিজে বানিয়ে কথা বলছি না; বরং স্বয়ং নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করছি, কাজেই প্রশ্ন করা উচিত নয়। হযরত হাসান (র.) এটা শুনে চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম রাযী (র.) মন্তব্য করেছেন যে, হযরত হাসান (র.)-এর প্রশ্নই যথার্থ ছিল না। কেননা চন্দ্র-সূর্য জড়পদার্থ -এরা অনুভূতিহীন। কাজেই এগুলোকে আজাব দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে হয়তো দোজখের আগুনকে আরো তেজোদীপ্ত করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, কিয়ামতের দিন চন্দ্র এবং সূর্যকে আলোহীন করে দেওয়া হবে। –[নূরুল-কোরআন]

اَلشَّمْسُ وَالنُّجُوْمُ পেশযুক্ত হওয়ার কারণ : জমহুর বসরীদের নিকট اَلشَّمْسُ শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়ার فَاعِلْ হিসাবে মারফূ' হয়েছে। কেননা, যে اِذَا শর্তের জন্য আসে তা فِعْلٌ-এর উপরই বসে। আয়াতে اِذَا শব্দটি اَلشَّمْسُ-এর উপর দেখা যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে একটি ক্রিয়া উহ্য রয়েছে।

আখফাশ এবং কূফাবাসীদের নিকট اَلشَّمْسُ শব্দটি مُبْتَدَأ হওয়ার কারণে মারফূ' হয়েছে। কেননা তাদের নিকট اِذَا ক্রিয়ার উপরে বসা শর্ত নয়। আর বাক্যে উহ্য মেনে নেওয়া নিয়মের খেলাফ।

একই ধরনের মতভেদ اَلنُّجُوْمُ শব্দেও রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

اَلنُّجُوْمُ-এর অর্থ : اَلنُّجُوْمُ অর্থ– নক্ষত্রসমূহ। نَجْمٌ-এর বহুবচন। اَلنُّجُوْمُ অর্থ اَلظُّهُوْرُ প্রকাশিত হওয়া। নক্ষত্রকে نَجْم বলার কারণ হলো তা আকাশে আলোকরশ্মি নিয়ে প্রকাশিত হয়। –[কুরতুবী]

نَجْم বলতে شَمْس (সূর্য)-কে বুঝায় না। এ কারণেই প্রথম আয়াতে شَمْس এবং দ্বিতীয় আয়াতে نَجْم-এর উল্লেখ কর হয়েছে। কারো মতে نَجْم বলতে شَمْس-কেও বুঝায়। তখন ذِكْرُ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ (খাস শব্দ উল্লেখের পর আম শব্দ উল্লেখ করা)-এর নিয়ম প্রযোজ্য হবে। –[রূহুল মা'আনী]

اِنْكَدَرَتْ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : اِنْكَدَرَتْ-এর অর্থ হলো ভেঙ্গে যাওয়া ও জমিনে লুটিয়ে পড়া।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় আছে اَلنُّجُوْمُ হলো قَنَادِيْل বা আলোক উজ্জ্বল বাতির সমষ্টি। এদেরকে আসমান ও জমিনের মাঝে নূরের ফেরেশতার হাতে শিকলের দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আকাশ ও জমিনবাসী সকল জীব মৃত্যুবরণ করার পর ফেরেশতাদের হাত হতে তা খসে পড়বে।
* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিয়ামতের দিবসে সকল তারকা আসমান হতে খসে পড়বে কোনো নক্ষত্রই আকাশে অবশিষ্ট থাকবে না।

কেউ কেউ এর তাফসীরে বলেছেন, মহাশূন্যে কোটি কোটি তারকা নক্ষত্রকে যে বাঁধন পরস্পর সংযুক্ত ও একই কেন্দ্রবিন্দুর সাথে সংযোজিত করে রেখেছে, কিয়ামতের দিন সে বাঁধন খুলে দেওয়া হবে। ফলে সব গ্রহ নক্ষত্র মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এটা ছাড়া মূল إِنْكَدَرَ শব্দের অর্থে অন্ধকারও শামিল রয়েছে। তা হতে বুঝা যায় যে, গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ কেবল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নই হবে না, উপরন্তু এরা অন্ধকারাচ্ছন্নও হয়ে পড়বে।

* আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.), ইমাম মুজাহিদ (র.) ও কাতাদাহ (র.) -এর মতে এ স্থলে إِنْكَدَرَتْ-এর অর্থ হলো, إِنْقَضَّتْ وَسَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ অর্থাৎ এরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পতিত হবে। বাজপাখি যখন তার শিকারের উপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পতিত হয় তখন বলা হয়– إِنْكَدَرَ الْبَازِيُّ

তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, সেদিন আসমান হতে জমিনের উপর তারকারাজির বৃষ্টি হবে, কোনো তারকাই অবশিষ্ট থাকবে না। সবগুলো জমিনে পড়ে যাবে। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে বলেছেন যে, ذُهِبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ হতে একে উপড়ে ফেলা হবে তখন তা বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকবে।

* শেখ আলূসী (র.) বলেন, পাহাড়গুলোকে নিজস্ব স্থান হতে কম্পনের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলাকে تَسْيِيْر বলা হয়েছে।

* কেউ কেউ বলেছেন, পাহাড়কে খোলা আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার পর চলমান করা হবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ অর্থাৎ তুমি তো পাহাড়গুলোকে জমাট (প্রাণহীন) বস্তু মনে করছ, অথচ এরা মেঘমালার ন্যায় চলতে (উড়তে) থাকবে।

* ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, قُلِعَتْ مِنَ الْأَرْضِ وَسُيِّرَتْ فِي الْهَوَاءِ অর্থাৎ তাদেরকে জমিন হতে উপড়ে ফেলা হবে এবং হাওয়ার মধ্যে চলমান করে দেওয়া হবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– يَوْمَ تَسِيْرُ الْأَرْضُ

* কেউ কেউ বলেছেন, سُيِّرَتِ الْجِبَالُ-এর অর্থ হলো একে পাথরের আকার হতে পরিবর্তন করে এমন হালকা বায়ুতে পরিণত করা হবে যে, তা বাতাসের উপর তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে এবং মরীচিকার মতো মনে হবে। জমিন সম্পূর্ণ সমতল হবে– এতে বিন্দুমাত্র উঁচু-নিচু থাকবে না।

* কেউ কেউ বলেছেন, পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণের কারণে বর্তমানে পর্বতসমূহ ভারি হয়ে বসে আছে এবং এক স্থানে দৃঢ়মূল ও অবিচল হয়ে রয়েছে, তাই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তাই যখন অবশিষ্ট থাকবে না; তখন স্বাভাবিক নিয়মেই সমস্ত পাহাড় নিজ নিজ স্থান হতে উৎপাটিত হয়ে যাবে এবং ভারহীন (হালকা) হয়ে পৃথিবীর উপর এমনভাবে চলতে থাকবে, যেমন এখন মেঘমালা শূন্যলোকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

اَلْعِشَارُ উল্লেখের কারণ : এখানে আরববাসীদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য খুবই উপযুক্ত একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানকালের ট্রাক ও বাস আবিষ্কৃত ও চালু হওয়ার পূর্বে আরবদের নিকট আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রীর তুলনায় অধিক মূল্যবান জিনিস আর কিছুই ছিল না। উষ্ট্রীর বাচ্চুর প্রসব-মুহূর্ত যখন নিকটবর্তী হতো তখন খুব বেশি রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করা হতো। উষ্ট্রী হারিয়ে না যায়, চুরি করে নিয়ে না যায়; কিংবা অন্য কোনোভাবে তা নষ্ট হয়ে না যায়; সেদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখা হতো। এ ধরনের উষ্ট্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন আরবদের নিকট খুবই আপত্তিকর অপরাধ। কেননা, তাতে মনে হয় যে, উষ্ট্রীর মালিক এতই আত্মসম্বিতহারা হয়ে পড়েছিল যে, নিজের এ মহামূল্যবান ও অত্যন্ত প্রিয় সম্পদেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনি। এ কথাটি বলে এখানে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এক ব্যক্তির ঠিক যেরূপ অবস্থা হলে সে তার মূল্যবান ও প্রিয় জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, দিশেহারা ও স্বস্তিহীন হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের ঠিক সে অবস্থা হবে।

عُطِّلَتْ-এর অর্থ এবং এখানে উদ্দেশ্য : عُطِّلَتْ -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. تُرِكَتْ مُهْمَلَةً لَا رَاعِيَ لَهَا وَلَا طَالِبَ অর্থাৎ দশ মাসের গাভীন উষ্ট্রীগুলো সেদিন এমনভাবে বিনা যত্নে ছেড়ে রাখা হবে যে, তাদের না কোনো রাখাল থাকবে, না কোনো অনুসন্ধানকারী।

২. কারো মতে عَطَّلَهَا اَهْلُهَا عَنِ الْحَلْبِ وَصَرٍّ অর্থাৎ উষ্ট্রীর মালিক দুগ্ধ দোহন এবং বাচ্চুর বেঁধে রাখা হতে বিরত থাকবে।

৩. কেউ কেউ বলেন, عَطَّلَهَا اَهْلُهَا عَنْ اَنْ يُرْسِلَ فِيْهَا الْفُحُوْلَ অর্থাৎ মালিক উষ্ট্রীর জন্য উটের ব্যবস্থা হতে দূরে থাকবে। এ অবস্থাগুলো কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার অল্প পূর্বে পরিলক্ষিত হবে। কেননা ঐ সময় তারা কিয়ামত ঘনিয়ে আসার কারণে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কারো মতে এটা কিয়ামতের দিনই হবে।

ঘ. আল্লামা কুরতুবী বলেন– আয়াতটি উপমা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ঐ সময় কোনো عِشَارٌ বা সন্তান সম্ভবা উষ্ট্রী থাকবে না। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, لَوْ كَانَتْ عِشَارٌ لَعَطَّلَهَا اَهْلُهَا وَاشْتَغَلُوْا بِاَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ যদি ঐ দিন কোনো গাভীন উষ্ট্রী থাকে, তাহলে তার মালিক একে এমনিতেই ছেড়ে রাখবে এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

ঙ. কারো মতে এখানে عِشَارٌও আছে, عُطِّلَও আছে। আর এটা কিয়ামতের দিনই সংঘটিত হবে, এভাবে যে, যখন মানুষ কবর হতে দলে দলে উঠবে তখন বন্য পশু, চতুষ্পদ জন্তু এবং গৃহপালিত পশুকে পালে পালে দেখতে পাবে। সাথে সাথে দেখতে পাবে যে, দুনিয়ার প্রিয়তম সম্পদ عِشَارٌ অর্থাৎ গাভীন উষ্ট্রী; কিন্তু ঐ দিনের ভয়াবহতার কারণে এবং নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন ঐ গুলির প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করবে না।

কারো মতে عِشَارٌ অর্থ মেঘমালা, তখন تَعْطِيْلٌ বা 'বৃষ্টি বন্ধ করা' হবে। –[রূহুল মা'আনী]

عِشَارٌ-এর অর্থ এবং এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য : عِشَارٌ শব্দটি عُشَرَاءُ-এর বহুবচন, যেমন نِفَاسٌ শব্দটি نُفَسَاءُ-এর বহুবচন। দশ মাসের গাভীন উষ্ট্রীকে عُشَرَاءُ বলা হয়। আর গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত তা এ নামে পরিচিতি থাকে। গর্ভ খালাস হওয়ার পরও কোনো কোনো সময় তাকে عُشَرَاءُ বলা হয়। এটা আরবদের নিকট অতীব প্রিয় ছিল।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, এখানে عِشَارٌ বলতে বাস্তব عِشَارٌ-কে বুঝানো হয়নি; বরং عِشَارٌ বলে উপমা দেওয়া হয়েছে যে, যদি ঐ দিন কোনো عِشَارٌও থাকে, তাহলে তার মালিক তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করবে না; বরং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। কারো মতে, ঐ দিন বাস্তবেই عِشَارٌ হাজির করা হবে; কিন্তু তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করা হবে না।

কারো মতে, আয়াতে عِشَارٌ দ্বারা سَحَابٌ [মেঘমালা] উদ্দেশ্য। 'দশ মাসের গাভীন উষ্ট্রী'র সাথে 'বৃষ্টি-সম্ভাবা মেঘ-মালা'কে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে।

কারো মতে عِشَارٌ অর্থ دِيَارٌ বা ঘর-বাড়ি। কেননা এ দিন ঘর-বাড়ির প্রতি কারো ঝোঁক থাকবে না। সবাই ঘর-বাড়ি বিমুখ হবে। কেউ কেউ বলেছেন, عِشَارٌ বলা হয় ঐ জমিনকে যে জমিনের ফসলে ওশর হয়ে থাকে। ঐ জমিনই ফসলবিহীন পড়ে থাকবে এর প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

اَلْوُحُوْشُ-এর অর্থ : اَلْوُحُوْشُ শব্দটি اَلْوَحْشُ-এর বহুবচন। বন্যপশুকে وُحُوْش বলা হয়। وَحْشٌ শব্দের অর্থ হলো- নিক্ষেপ করা। যেহেতু বন্যপশু মানবসমাজ থেকে নিক্ষিপ্ত জীবন যাপন করে, মানুষের সাথে তাদের ভালোবাসা স্বাভাবিকভাবে জমে উঠে না; বরং জমাতে হয়।

حُشِرَتْ-এর মর্মার্থ : حُشِرَتْ-এর অর্থ করতে গিয়ে মুফাসসিরগণ বলেন–

১. جُمِعَتْ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক দিক হতে একত্রিত করা হবে।

২. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, يُحْشَرُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الذُّبَابِ لِلْقِصَاصِ অর্থাৎ সকল বস্তুকে একত্রিত করা হবে, এমনকি কিসাসের জন্য মাছিকেও। এ মত জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)ও পেশ করেছেন।

৩. মু'তাযিলাগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সেদিন সকল প্রাণীকে একত্রিত করবেন। তারপর মৃত্যু, কতল ইত্যাদি দ্বারা যে সমস্ত কষ্ট একে অপরকে দিয়েছিল তার প্রতিদান দিবেন। সে কষ্টের বদলা দেওয়ার পর আল্লাহ ইচ্ছা করলে কাউকে বেহেশতে রাখতে পারেন অথবা ধ্বংস করে মিটিয়ে দিতে পারেন। –[কাবীর]

৪. কারো মতে حُشِرَتْ অর্থ بُعِثَتْ পুনরুত্থিত করা হবে। যেন পরস্পর পরস্পর হতে কিসাস নিতে পারে। শিংবিহীন জন্তু শিং ওয়ালা হতে কিসাস গ্রহণ করবে।

৫. কারো মতে حَشْرُهَا مَوْتُهَا অর্থাৎ মৃত্যুকে حَشْر বলা হয়েছে। অতএব, তাদের মৃত্যুই হলো হাশর।

৬. কারো মতে জন্তুগুলো দুনিয়াতে মানুষের কাছ হতে দূরে থাকা সত্ত্বেও কাল-কিয়ামতে তাদের সাথে একসঙ্গে একত্রিত হয়ে উঠবে। –[ফাতহুল কাদীর]

৭. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (র.) حُشِرَتْ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, বন্যপশুদের মধ্যে সেদিন এক অস্বাভাবিক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হবে যে কারণে তারা ছুটোছুটি করবে, তাদেরকে সেদিন একত্রিত করা হবে, যাতে একে অন্যের নিকট হতে কিসাস গ্রহণ করতে পারে।

وُحُوْش-এর উল্লেখের কারণ : বন্যপশু স্বাভাবিকভাবে মানুষের সংস্পর্শে আসতে চায় না– আসে [illegible] বনের মধ্যে আল্লাহর দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে। ইবাদত-বন্দেগি দ্বারা আদিষ্ট নয়। এতদসত্ত্বেও যখন তাদেরকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে, তখন মানুষের ব্যাপারটিতো সহজেই বুঝা যায়।

বন্যপশু পরস্পর ঝগড়া করে থাকলে তাদেরকে قِصَاصْ -এর জন্য হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। পক্ষান্তরে বনী আদমের কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

অথবা, বর্তমান দুনিয়াতে বন্যপশু বা অন্যান্য জন্তু মানুষের সাথে একসাথ হয় না, যদি হয় তাহলে মানুষ তাদের দ্বারা ফায়দা লুটতে চায়; কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন যখন মানুষের সাথে অন্যান্য জন্তুদেরকে একসাথ করা হবে, তখন কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে কেউ কারো প্রতি তাকাবে না। –[কাবীর, কুরতুবী]

অথবা, বন্যপশুর কোনোরূপ আকল (বিবেক) নেই। তথাপি তাদেরকে পুনরুত্থিত করে বিচারের (কিসাসের) সম্মুখীন করা হবে। তাহলে যে মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন, তাদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, মানুষকে তা হতে শিক্ষা নেওয়ার জন্যই وُحُوْش-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

سُجِّرَتْ শব্দের বিশ্লেষণ এবং অর্থ : سُجِّرَتْ শব্দটি একবচন, স্ত্রীলিঙ্গের নামপুরুষ, বাবে تَفْعِيْل-এর অর্থের ব্যাপারে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা হচ্ছে–

১. কারো নিকট سُجِّرَتْ অর্থ مُلِئَتْ مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ ঐ সমুদ্র পানি দ্বারা ভর্তি হয়ে যাবে। যখন কোনো হাউজ পানি দ্বারা ভর্তি করা হয় তখন বলা হয় سَجَّرْتُ الْحَوْضَ অর্থাৎ আমি হাউজ ভর্তি করলাম।

২. ইবনে আবী যাম্‌নীন (র.) বলেন, سجرت-এর মূল অর্থ হলো مُلِئَتْ অর্থাৎ ভরপুর হয়েছে। যখন সমস্ত সমুদ্র পানিতে ভরপুর হয়ে যাবে, তখন একটির পানি অন্যটিতে গড়িয়ে প্রবাহিত হবে। এমতাবস্থায় সকল সমুদ্রকে এক রকম দেখা যাবে, মনে হবে যেন একটি সমুদ্র।

৩. কেউ কেউ বলেন, أُرْسِلَ عَذْبُهَا عَلٰى مَالِحِهَا وَمَالِحُهَا عَلٰى عَذْبِهَا حَتّٰى امْتَلَأَتْ অর্থাৎ সমুদ্রের মিঠা পানিকে লবণাক্ত পানির উপর এবং লবণাক্ত পানিকে মিঠা পানির উপর পাঠানো হবে। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রগুলো ভরে যাবে।

৪. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, সমুদ্রগুলো উথলে উঠবে, অতঃপর সকল সমুদ্রগুলো একটিতে রূপান্তরিত হবে। এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা দু' নদীর মধ্য হতে বাঁধ উঠিয়ে নিবেন, অতঃপর সব পানি উথলে জমিনের উপর চলে আসবে। আর তখন একটি সমুদ্রই দেখা যাবে।

৫. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, সমুদ্রের পানি শুকিয়ে যাবে এবং তাতে এক ফোঁটা পানিও থাকবে না।

৬. কালবী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো যখন সমুদ্রগুলোকে পরিপূর্ণ করা হবে। অথাৎ সমুদ্রগুলোকে যখন অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করা হবে। –[নূরুল কোরআন]

৭. আল্লামা কুরতুবী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত উল্লেখ করেছেন। এর মধ্য হতে মুফাসসিরগণ যা গ্রহণ করেছেন তা হলো, সমুদ্র প্রথমত পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। পানিতে যে আগুন রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে পানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তাছাড়া সমুদ্রের তলদেশে পেট্রোলের খনি বিদ্যমান থাকাও এ কথা প্রমাণ করে যে, কিয়ামতের পূর্বে সমুদ্রগুলো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে। পেট্রোল খনি বিদ্যমান থাকা এরই পূর্ব প্রস্তুতি।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন যে, তাফসীরকারকদের সমস্ত বক্তব্য একত্রিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো সমুদ্রগুলোকে একত্রিত করা হবে। সূর্যকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, যে কারণে সমুদ্র উত্তপ্ত হয়ে অগ্নিতে পরিণত হবে। আর তা দোজখীদের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। সমস্ত পানি শুকিয়ে যাবে। এক ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকবে না।

অনুবাদ :

٧. وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ قُرِنَتْ بِأَجْسَادِهَا .

৭. আর যখন আত্মাসমূহ পুনঃ সংযোজিত হবে তার দেহের সাথে মিলিত হবে।

٨. وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ الْجَارِيَةُ تُدْفَنُ حَيَّةً خَوْفَ الْعَارِ وَالْحَاجَةِ سُئِلَتْ تَبْكِيْتًا لِقَاتِلِهَا .

৮. আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে যাকে লজ্জা ও অভাবের ভয়ে জীবিত সমাধিস্থ করা হয়েছে জিজ্ঞেস করা হবে তার হত্যাকারীকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য

٩. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَقُرِئَ بِكَسْرِ التَّاءِ حِكَايَةً لِمَا تُخَاطَبُ بِهِ وَجَوَابُهَا أَنْ تَقُوْلَ قُتِلْتُ بِلَا ذَنْبٍ .

৯. কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? এক কেরাতে শব্দটি ت -এর মধ্যে যেরযোগে তার প্রতি সম্বোধনকে উদ্ধৃতি দান করার অর্থে পঠিত হয়েছে। আর এর উত্তর এই হবে যে, আমাকে বিনা অপরাধে হত্যা করা হয়েছে।

١٠. وَإِذَا الصُّحُفُ صُحُفُ الْأَعْمَالِ نُشِرَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ فُتِحَتْ وَبُسِطَتْ .

১০. আর যখন লিপিসমূহ কর্মলিপি উন্মোচিত হবে শব্দটি তাখফীফ ও তাশদীদ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, অর্থাৎ খোলা হবে ও প্রসারিত করে দেওয়া হবে।

١١. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ نُزِعَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا كَمَا يُنْزَعُ الْجِلْدُ عَنِ الشَّاةِ .

১১. আর যখন আকাশকে নিবারণ করা হবে স্বস্থান হতে হটিয়ে দেওয়া হবে, যেমন ছাগলের চর্ম খুলে ফেলা হয়।

١٢. وَإِذَا الْجَحِيْمُ النَّارُ سُعِّرَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ أُجِّجَتْ .

১২. আর যখন জাহান্নামকে তার অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করা হবে তাখফীফ ও তাশদীদ যোগে, অর্থাৎ লেলিহান বিশিষ্ট করা হবে।

١٣. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ قُرِّبَتْ لِأَهْلِهَا لِيَدْخُلُوْهَا وَجَوَابُ إِذَا أَوَّلَ السُّوْرَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا .

১৩. আর যখন জান্নাতকে নিকটে করা হবে তার অধিকারীদের প্রতি নিকটস্থ করা হবে, তারা তাতে প্রবেশ করার জন্য। সূরার শুরুতে উক্ত إذا ও তৎপ্রতি আতফকৃত বক্তব্যসমূহের জওয়াব হলো।

١٤. عَلِمَتْ نَفْسٌ أَيْ كُلُّ نَفْسٍ وَقْتَ هٰذِهِ الْمَذْكُوْرَاتِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَّا أَحْضَرَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ .

১৪. প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন জানতে পারবে অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনাবলি সংঘটনকাল তথা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে। সে যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ভালো ও মন্দ থেকে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَوْءُدَةُ শব্দের বিশ্লেষণ : اَلْمَوْءُدَةُ শব্দটি একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ। ইসমে মাফউল। وَأَدَ - يَئِدُ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْوَأْدُ অর্থ ثِقَلٌ বা ভারি হওয়া। আয়াতে مَوْءُدَةٌ তথা জীবন্তাবস্থায় কন্যা-সন্তানকে সমাধিস্থ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা যখন কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত দাফন করা হয়, তখন প্রথমে তার উপর মাটি নিক্ষেপ করা হয়। মাটি যখন তার শরীরের উপর ভারি হয়ে যায়, তখন সে মরে যায়। মাটির বোঝা ভেদ করে উঠতে পারে না। −[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : পিছনে إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ হতে উক্ত আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত তেরটি আয়াতে যে শর্ত আলোচনা করা হয়েছে, সে শর্তের জবাব হয়েছে عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ আয়াতটি :

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ .... الخ কসম আর عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ কসমের জবাব হয়েছে তবে প্রথম মতটিই বেশি শুদ্ধ বলে বুঝা যায়। –[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ আয়াতের তাফসীর : উক্ত আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. قُرِنَتِ الْأَرْوَاحُ بِالْأَجْسَادِ অর্থাৎ প্রাণগুলো দেহের সাথে মিলিত হবে।

২. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রাণগুলো তিন দলে বিভক্ত হবে। যেমন– অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ الخ .

৩. নারী-পুরুষের মধ্য হতে যে যেই পর্যায়ের, সে সেই পর্যায়ের লোকের সাথে মিলিত হবে। অতএব, প্রথম কাতারের ইবাদতকারীগণ তাদের মতো ব্যক্তিদের সাথে, মধ্যম ব্যক্তিগণ তাদের সম পর্যায়ের বক্তিদের সাথে এবং গুনাহগার গুনাহগারদের সাথে মিলিত হবে। মোদ্দাকথা, ভালো-খারাপ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়ে দল ভারি করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–يُقْرَنُ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ كُلِّ قَوْمٍ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ كَعَمَلِهِ অর্থাৎ প্রত্যোক ব্যক্তিকে তার দলের সাথে মিলানো হবে, যে দল তার কাজের অনুরূপ কাজ করেছে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, يُقْرَنُ الْفَاجِرُ مَعَ الْفَاجِرِ وَيُقْرَنُ الصَّالِحُ مَعَ الصَّالِحِ অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিকে পাপীর সাথে, পুণ্যাত্মাকে পুণ্যাত্মার সাথে মিলানো হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন–

ذٰلِكَ حِيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً السَّابِقُوْنَ زَوْجٌ وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ زَوْجٌ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ زَوْجٌ .

অর্থাৎ সেদিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে–অগ্রগামী দল, ডানপন্থি দল ও বামপন্থি দল। তিনি আরও বলেন– মু'মিনদেরকে হুর-এর সাথে জোড় লাগিয়ে দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে শয়তানদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। –[কাবীর, কুরতুবী]

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত দ্বারা সে দু'ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যারা উভয়েই একই কাজ করত, যার কারণে তারা উভয়ে হয় জান্নাতে নতুবা দোজখে চলে যাবে।

হযরত আতা (র.) ও মুকাতিল (র.) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মু'মিনদেরকে বেহেশতের হুরদের সঙ্গে একত্রিত করা হবে। আর কাফেরদেরকে শয়তানদের সাথে একত্রিত করা হবে।

হযরত আতা (র.) বলেন, আত্মাসমূহকে দেহের সাথে একত্রিত করা হবে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে একত্রিত করার যে কথাটি রয়েছে তার তাৎপর্য হলো মানুষকে, তার আমলের সাথে একত্রিত করা হবে। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ .... قُتِلَتْ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যে পিতা-মাতা তাদের কন্যাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করেছে, তারা আল্লাহর নিকট যারপর নেই ঘৃণ্য ও মারাত্মক অপরাধী। তাদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণার মাত্রা এতদূর তীব্র হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে এ কথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, এ নিষ্পাপ শিশুকে তোমরা কেন হত্যা করেছিলে; বরং তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং সে নিষ্পাপ শিশু কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমাকে কোন কারণে হত্যা করা হয়েছিল? তখন সে নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করবে। অত্যাচারী পিতা-মাতা তার উপর কি অমানুষিক ব্যবহার করেছে। তাকে কিভাবে জীবন্ত দাফন করেছে তা সে অকপটে বলে দিবে।

এটা ছাড়া এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে দুটি বড় বড় বিষয়ের সমাবেশ করা হয়েছে। তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়নি; বরং কথার ধরন হতে আপনা আপনিই তা প্রকাশিত হচ্ছে।

একটি এই যে, জাহেলিয়াত আরববাসীদেরকে নৈতিকতার দিক দিয়ে এতখানি অধঃপতনের নিম্নস্তরে পৌঁছে দিয়েছে যে, তারা নিজেদেরই হাতে নিজেদের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করেছে। এটা সত্ত্বেও এ লোকেরা নিজেদেরকে জাহেলিয়াতের উপরই অবিচল রাখতে বদ্ধপরিকর। নিজেদের জীবনকে তাঁরা সংশোধনের দিকে আদৌ প্রস্তুত নয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের অধঃপতিত ও পাপ, পঙ্কিল সমাজকে আন্তরিকতার সাথে সংশোধন করতে সচেষ্ট; কিন্তু তারা নিজেরা সে জন্য প্রস্তুত নয়; শুধু এই নয়, তারা সে জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি রীতিমতো খেপে উঠেছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, পরকাল যে অনিবার্য ও অপরিহার্য, এটাই তার একটি অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। যে কন্যাটিকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়েছে, তার ফরিয়াদ জানাবার ও জালিমদের এ নির্মম জুলুমের উপযুক্ত শাস্তি দানের একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু এ দুনিয়ায় তার কোনো ব্যবস্থা হওয়ার নয়। এখানে না কেউ তার ফরিয়াদ শুনবে না জালিমদের কোনো শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। জাহেলিয়াতের সমাজে এ কাজটিকে সম্পূর্ণ জায়েজ মনে করা হতো। পিতামাতা যেমন সে জন্য কোনো লজ্জাবোধ করত না, তেমনি পরিবারে ও সমগ্র সমাজে এজন্য তিরস্কার করার বা পাকড়াও করার কেউ ছিল না। তাহলে এ অমানুষিক জুলুমের কি কোনো বিচার হবে না? এমন কোনো স্থান হবে না যেখানে এ নিরপরাধ জীবন্ত প্রোথিত কন্যাটি তার প্রতি কৃত জুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করতে পারবে এবং আপারাধীদের শাস্তির দাবি জানাতে পারবে?

কন্যা-সন্তান জীবন্ত প্রোথিতকরণের ঐতিহাসিক তথ্য : প্রাক-ইসলাম বা জাহিলিয়াতের যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবরা তাদের কন্যা-সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করত। হুযূর ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ কয়েকটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এ নিষ্ঠুর কার্যটি নানা কারণে প্রচলিত ছিল। এর একটি কারণ ছিল অভাব-অনটন। এতে খাবার লোকের সংখ্যা হ্রাস করা লোকদের লক্ষ্য ছিল। কন্যা-সন্তানকে যুবতী হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা এবং পরে বিবাহ দেওয়ার ঝামেলা পোহানো তাদের জন্য কষ্টকর মনে হতো। তখন নারী জাতির মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। ইসলামই নারীকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ ছিল, তখনকার ব্যাপক সামাজিক অশান্তি। যে অবস্থায় যার পুত্র-সন্তান বেশি, তার সাহায্যকারীও তত বেশি। এ নীতি অনুযায়ী পুত্র-সন্তানদেরকে সাদরে লালন-পালন করা হতো; কিন্তু কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো। কেননা শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক কাজে কন্যাগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারত না, শুধু তাই নয়; বরং তাদের রক্ষণাবেক্ষণও তৎকালীন আরব সামাজে বড় একটা সমস্যা বলে বিবেচিত ছিল।

তৃতীয় কারণ ছিল এই যে, বিবদমান গোত্রগুলো যখন পরস্পরের উপর আক্রমণ চালাত, বিজয়ী গোত্র পরাজিতদের যে মেয়েদেরকেই ধরতে পারত, তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করত, নির্বিচারে ধর্ষণ করত, অথবা দাসী বানিয়ে রাখত, কিংবা বিক্রয় করত। এ সব কারণে তদানীন্তন আরব সমাজে কন্যা হত্যার একটা অমানবিক প্রথা চালু ছিল। আরবরা সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হলে প্রসূতির নিকটই একটা গর্ত খুড়ে রাখত, যেন কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখনই তাকে উক্ত গর্তে ফেলে চিরতরে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। কখনো এমন হতো যে, প্রসূতি বা পরিবারের লোকেরা বাধা দান করত। তখন পিতা বাধ্য হয়ে কিছুদিন এর লালন-পালন করত এবং পরে কোনো এক সময় একে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত প্রোথিত করে দিত। এ ব্যাপারে চরম অমানুষিকতা ও নির্মমতা দেখানো হতো, কেউ কেউ একে বাহাদুরির কাজ মনে করে খুব ঘটা করে নিজ কন্যাকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করত। -[খাযেন]

কোনো কোনো মুফাসসির আরও একটি কারণ উল্লেখ করেছেন, তা হলো- তারা বলত, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। অতএব, দুনিয়ার কন্যাদেরকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন্ত কবর দিত। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

জীবন্ত প্রোথিতাকে জিজ্ঞেস করার অর্থ : আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবন্ত প্রোথিতাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে। এটা এ জন্য যে, ১. কন্যার কাছ হতে জবানবন্দী আসুক যে, সে নিরপরাধ- তার কোনো দোষ ছিল না। তার উপর অযথা অত্যাচার করা হয়েছে। আর এটাই হত্যাকারী হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার দলিল হয়ে দাঁড়াবে।

২. অথবা, হত্যাকারীকে প্রশ্ন করা হবে যে, কেন এ নিষ্পাপ কন্যাকে হত্যা করা হয়েছে?

সন্তান হত্যার বিধান :

১. সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত বা হত্যা করা সম্পূর্ণ হারাম, কবীরা গুনাহ এবং মারাত্মক জুলুম।

২. এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা যাতে স্ত্রী গর্ভবতীই না হয়। যেমন বর্তমানকালের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিকে নবী করীম ﷺ গোপন-হত্যা বলে আখ্যায়িত করেন। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় 'আযল' অর্থাৎ বীর্য বাচ্চাদানে প্রবেশ না করার ব্যবস্থা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ হতে যে চুপ থাকা অথবা নিষেধ না করা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা অবশ্য কোনো বিশেষ স্থানের জন্য। ব্যাপারটি ব্যাপক নয়; কিন্তু তাও এভাবে হতে হবে যে, যাতে বংশ বিস্তারে কোনো প্রকার বাধাস্বরূপ না হয়ে দাঁড়ায়। -[মাযহারী]

৩. বর্তমানকালের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যে সকল ঔষধ দেওয়া হয় বা চিকিৎসা করা হয়, তাতে কোনো পদ্ধতি এমনও আছে যে, সামনে আর কোনো সন্তান হবে না। শরিয়তে এমন ব্যবস্থার অনুমতি নেই। -[মা'আরিফুল কোরআন]

হত্যাকারীর শাস্তি : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন- "যে মহিলা তার সন্তানকে হত্যা করবে, সে তার ঐ সন্তানকে স্তনের সাথে যুক্ত-লটকানো অবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠবে। ঐ সন্তানের রক্ত মহিলার শরীরে মাখানো অবস্থায় থাকবে। সন্তান তখন বলবে- ইয়া রব ইনি আমার মা, আমাকে হত্যা করেছিল। -[কুরতুবী]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, যাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছে এবং যে করেছে উভয়েই দোজখী, তবে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ : صُحُفٌ শব্দটি صَحِيْفَةٌ-এর বহুবচন, এখানে صُحُفٌ দ্বারা সেসব লিপিকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো ফেরেশতাগণ মানুষের কৃতকর্মের রেকর্ড করেছেন। এক কথায় মানুষের আমলনামা ভালো হোক বা মন্দ হোক। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দেওয়া হবে, তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠবে مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا অর্থাৎ এ লিপি (আমলনামা) টির কি হয়েছে- এটা তো ছোট বড় একটি কাজও বাদ দেয়নি; বরং সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন আরশের নিচে মানুষের আমলনামা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। মু'মিনের আমলনামা জান্নাতে তার হাতে গিয়ে পড়বে। আর কাফেরের আমলনামা জাহান্নামে তার হস্তগত হবে।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে বলেছেন صُحُفُ الْاَعْمَالِ فُتِحَتْ وَبُسِطَتْ অর্থাৎ আমলনামাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং বিছিয়ে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ : আরবিতে পশুর চামড়া খুলে ফেলাকে كَشْطٌ বলে। কোনো বস্তুর উপর হতে পর্দা বা আবরণ সরিয়ে ফেলাকে كَشْطٌ বলা হয়।

এখানে كُشِطَتِ السَّمَاءُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন-

কিয়ামতের দিন আকাশের সৌন্দর্য নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি সব জ্যোতিহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং এগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে।

অথবা, এখানে كَشْطٌ অর্থ হবে মিটে যাওয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কেননা আকাশের বিশাল ছাদ মুহূর্তের মধ্যে ভেঙ্গে খান খান হয়ে মিটে যাবে।

অথবা, আকাশের বর্তমান আকৃতি ও অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। আকাশের এ পরিবর্তনকে রূপকার্থে كَشْطٌ বলা হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেছেন- আরববাসীরা উটের চামড়া খসানোকে كَشْطٌ বলে থাকে। এখানে আকাশ খসানো অর্থ আকাশকে তার স্থান হতে টেনে নিয়ে যাওয়া, যেমন কোনো বস্তুর উপর হতে আবরণ টেনে খুলে ফেলা হয়।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, আকাশকে তার স্থান হতে এমনভাবে খসিয়ে ফেলা হবে যেমনভাবে ছাগলের শরীর হতে তার চামড়া খুলে ফেলা হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ : কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে। سُعِّرَتْ শব্দটি تَسْعِيْرٌ হতে নির্গত। এটা অতীতকালের صِيْغَه এখানে ভবিষ্যৎকালের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উত্তপ্ত করা হবে, প্রজ্বলিত করা হবে। দোজখের অগ্নিকে গরম করে কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "আগুনকে এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়েছে; তখন আগুন সাদা হয়ে গেছে। অতঃপর এক সহস্র বছর উত্তপ্ত করার পর আগুন লাল হয়ে গেছে। তারপর এক হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর আগুন কালো আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে তা ভীষণ কালো এবং অন্ধকার।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ : জান্নাতকে মু'মিনদের নিকটবর্তী করা হবে- যাতে তারা অনায়াসে তাতে প্রবেশ করতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে আছে وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ [আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে]।

তবে বেহেশতকে নিকটবর্তী করার অর্থ এই নয় যে, তা উপড়িয়ে জান্নাতীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে; বরং তাদেরকে জান্নাতের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে।

হাশরে দোজখের উত্তপ্ততা এবং বেহেশতের নৈকট্য দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : হাশরের ময়দানে যখন লোকদের মামলাসমূহের শুনানী হতে থাকবে, তখন তারা সকলে একদিকে জাহান্নামের দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন যেমন দেখতে পাবে, তেমনি অপরদিকে জান্নাতও সব নিয়ামত সহকারে তাদের চোখের সামনে উপস্থিত থাকবে। এর ফলে পাপী লোকেরা জানতে পারবে-তারা আজ কি সব নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়ে, কোন আজাবে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে নেক্কার লোকেরা কোন আজাব হতে বেঁচে কোনসব নিয়ামত লাভের অধিকারী হতে যাচ্ছে তাও তারা বুঝতে পারবে।

مَا اَحْضَرَتْ-এর অর্থ : اَحْضَرَتْ ক্রিয়াটি বাবে اِفْعَالٌ হতে 'উপস্থিত করানো' 'নিয়ে আসা' অর্থে ব্যবহৃত। প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার জীবনের সকল কৃতকর্ম জানতে পারবে। তবে প্রত্যেক আমলের বিশদ বিবরণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে জানা শর্ত নয়; বরং আমলনামা ছড়ানো-ছিটানোর সময় কৃতকর্ম উপস্থিত পাবে। সেদিন কৃতকর্মকে রূপদান করা হবে।

অথবা, مَا اَحْضَرَتْ صَحَائِفُ الْاَعْمَالِ অর্থাৎ আমলের বইগুলো উপস্থিত পাবে। -[ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে نَفْسٌ-কে নাকেরা নেওয়ার কারণ : نَفْسٌ শব্দকে অনির্দিষ্ট নেওয়া হয়েছে। যেন এখানে প্রত্যেক فَرْدٌ বা ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক نَفْسٌ-ই উক্ত ইলম অর্জন করবে- কেউ বাদ পড়বে না। অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির সামনেই তার কৃতকর্মের বালাম প্রকাশ করা হবে, কারো থেকে গোপন থাকবে না- একথা বুঝানোর জন্য নাকেরা নেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا -[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

১৫. فَلَآ اُقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ بِالْخُنَّسِ ۔

১৫. সুতরাং আমি কসম করছি ﻻ শব্দটি অতিরিক্ত সমস্ত নক্ষত্রের যারা পিছনের দিকে হাটতে থাকে

১৬. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ هِيَ النُّجُوْمُ الْخَمْسَةُ زُحَلُ وَالْمُشْتَرِيُّ وَالْمِرِّيْخُ وَالزُّهَرَةُ وَعَطَارِدُ تَخْنُسُ بِضَمِّ النُّوْنِ اَيْ تَرْجِعُ فِيْ مَجْرَاهَا وَرَاءَهَا بَيْنَا تَرَى النَّجْمَ فِيْ اٰخِرِ الْبُرْجِ اَذْكُرْ رَاجِعًا اِلٰى اَوَّلِهِ وَتَكْنِسُ بِكَسْرِ النُّوْنِ تَدْخُلُ فِيْ كِنَاسِهَا اَيْ تَغِيْبُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ تَغِيْبُ فِيْهَا ۔

১৬. যারা চলতেই থাকে এবং স্ব-স্ব স্থানে আত্মগোপন করে এ ধরনের পাঁচটি নক্ষত্র রয়েছে। তারা হচ্ছে যুহল, মুশতারী, মিররীখ, যুহরা ও আতারিদ। تَخْنُسُ -এর نُوْن -কে পেশ যোগে পড়তে হবে। অর্থাৎ পিছনের দিকে তাদের গতিপথে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ তাদের বুরূজ বা গতিপথে চলতে চলতে সর্বশেষ বুরূজে চলে যায় এবং পুনরায় ফিরে আসে تَكْنِسُ-এর نُوْن যের বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ তারা আত্মগোপনের স্থানে আত্মগোপন করে

১৭. وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ اَقْبَلَ بِظَلَامِهِ اَوْ اَدْبَرَ ۔

১৭. আর রাতের শপথ যখন তা গমনোদ্যত হয় স্বীয় অন্ধকার সহ আগমন করে অথবা পশ্চাৎ গমন করে

১৮. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ اِمْتَدَّ حَتّٰى يَصِيْرَ نَهَارًا بَيِّنًا ۔

১৮. আর ভোরের শপথ যখন তা আবির্ভূত হয় প্রসারিত হয়। অবশেষে উজ্জ্বল দিনে পরিণত হয়।

১৯. اِنَّهُ اَيِ الْقُرْاٰنُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ جِبْرِيْلُ اُضِيْفَ اِلَيْهِ لِنُزُوْلِهِ بِهِ ۔

১৯ অবশ্যই এটা অর্থাৎ কুরআন মাজীদ একজন সম্মানিত দূতের [রাসূলের] বাণী– যিনি আল্লাহর নিকট সম্মানিত আর তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। যেহেতু তিনি কুরআন নিয়ে অবতরণ করেন সেহেতু একে তাঁর দিকে নিসবত (সম্পর্কিত) করা হয়েছে।

২০. ذِيْ قُوَّةٍ اَيْ شَدِيْدِ الْقُوٰى عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ اَيِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَكِيْنٍ ذِيْ مَكَانَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِهِ عِنْدَ ۔

২০. শক্তিশালী অত্যন্ত শক্তিধর আরশের মালিকের নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানের অধিকারী মর্যাদা সম্পন্ন عِنْدَ শব্দটি مَكِيْنٍ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

২১. مُطَاعٍ ثَمَّ اَيْ تُطِيْعُهُ الْمَلٰئِكَةُ فِي السَّمٰوٰتِ اَمِيْنٍ عَلَى الْوَحْيِ ۔

২১. যে তথায় মান্য অর্থাৎ আকাশে ফেরেশতারা আনুগত্য করে থাকে। আস্থাভাজন বিশ্বস্ত ওহীর ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

فَلَآ اُقْسِمُ-এর ﻻ-এর বিশ্লেষণ : হযরত আবূ ওবায়দা এবং কতিপয় মুফাস্সিরের মতে ﻻ অতিরিক্ত। মূলে ছিল اُقْسِمُ সমরকন্দী বলেন, لَآ اُقْسِمُ -এর অর্থ যে اُقْسِمُ এতে সকল মুফাস্সির একমত। তবে ﻻ-এর তাফসীর করতে গিয়ে তাঁরা মতভেদ প্রকাশ করেছেন। অতএব, কারো মতে ﻻ অতিরিক্ত আর এরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করা আরবি ভাষায় প্রচলিত দেখা যায়। যেমন- مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ এখানে মূলে ছিল اَنْ تَسْجُدَ কারো মতে ﻻ দ্বারা পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের বক্তব্যের

নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। তখন মূলবাক্য এভাবে হবে لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتُمْ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ তোমরা যা বলাবলি করছ, আসলে মূলত ব্যাপারটি এমন নয়, আমি خُنَّسٌ-এর কসম করে বলছি– এ মতটি হলো ইমাম ফাররা এবং অন্যান্য নাহুবিদদের। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, এটা نَفْى (অস্বীকার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কসমের নফী নয়; বরং মুশরিকরা যেহেতু কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করত, তাদের সে উক্তিকে لَا হরফ দ্বারা বাতিল করত কিয়ামত যে সুনিশ্চিত এবং এ সম্পর্কে কুরআনের উক্তি যে দিবালোকের মতো সত্য এটা তাকীদসহ প্রমাণিত করার জন্য কয়েকটি বিশেষ বস্তুর দ্বারা কসম করা হয়েছে। শপথ ছাড়াই এটা সত্য এবং সুনিশ্চিত। তবে এরপরও যদি তোমরা শপথের প্রয়োজনীয়তা মনে কর, তাহলে শোন আমি কসম করে বলছি। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ : عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ আয়াতাংশটি مَكِيْن-এর حَالٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে। মূলত এটা صِفَتٌ বিশেষণ ছিল, কিন্তু مَكِيْن-এর পূর্বে আসার কারণে حَالٌ হয়েছে। তবে رَسُوْلٍ শব্দের نَعْت হওয়াও বৈধ।–[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ مَكِيْنٍ : مَكِيْن শব্দটি فَعِيْل-এর ওজনে مَكَانَةٌ হতে গৃহীত। مِيْم এখানে শব্দের মূল হিসাবে আছে। এখান থেকেই ব্যবহৃত হয় تَمَكَّنَ যেমন مَسْكَنَةٌ হতে تَمَسْكَنَ ব্যবহৃত হয়।

তবে مَكِيْن-এর মধ্যে م মাসদারে মীমীও হতে পারে, তখন মূল হবে كَوْنٌ আর مَكِيْنٌ মূলে ছিল مَكْوُنٌ - نَقْل এবং قَلْب-এর দ্বারা مَكِيْن হয়ে গেছে।

مَكِيْن শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহর কাছে ذِىْ مَكَانَةٍ وَشَرَفٍ তথা মর্যাদাবান এবং তাঁর নিকট উপস্থিত থাকেন। আল্লাহর নিকট বলতে সম্মানের নৈকট্য, শারীরিক নৈকট্য নয়। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : অবিশ্বাসী আরবরা পবিত্র কুরআনের পরলোক ও পুনরুত্থান সম্পর্কিত প্রত্যাদেশগুলো শুনে বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে। নচেৎ মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার সে পুনরুজ্জীবিত হবে এবং তাকে বেহেশত বা দোজখে গমন করে পাপ–পুণ্যের প্রতিফল ভোগ করতে হবে, এ সকল উদ্ভট কথা সে কখনো বলত না। সে আরো বলছে যে, এটা আল্লাহর কথা; কিন্তু এমন শক্তিশালী কে আছে যে আল্লাহর নিকট হতে এ সকল কথা জেনে আসে আবার তাকে হুবহু জানিয়ে দিবে? এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। মুহাম্মদের এ সকল কথা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার কেউ কেউ বলত, না জানি মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করেছে (না'উযুবিল্লাহ)। তা না হলে সে মাঝে মধ্যে এমন পণ্ডিতের মতো কথা বলে কি করে? সে তো আদৌ লেখাপড়া শিখেনি। মক্কার কাফেরদের এ সমস্ত কথা ও ধারণার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উদ্ধৃত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। –[মা'আলিম]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ...... وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ : আল্লাহ তা'আলা যে কথাটি বলার জন্য এখানে শপথ করেছেন। তা পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। এ শপথ উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুহাম্মদ ﷺ অন্ধকারের মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখেননি; বরং যখন তারকাসমূহ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, রাতের অবসান হয়েছিল এবং প্রভাত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, তখন উন্মুক্ত আকাশের দিগন্তে তিনি আল্লাহর এ মহান ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি যা কিছু বলছেন তা তাঁর চোখে দেখা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং পূর্ণ হুঁশ জ্ঞান সহকারে দিনের উজ্জ্বলতায় অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলছেন।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয (র.) বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াত কয়টিতে সূর্যকে সাতারু মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তা আলো প্রসারিত হওয়াকে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পানিতে যেরূপ মাছ লুকিয়ে চলাফেরা করে এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে পানি সম্প্রসারিত হয়ে থাকে সূর্য উদিত ও আলোকজ্জ্বল হওয়ার পূর্বেও ঠিক সেরূপ অবস্থা হয়ে থাকে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, সকালের দ্বারা প্রাতঃসমীরণকে বুঝানো হয়েছে–যা সাধারণত বসন্তকালে প্রবাহিত হয়।

যা হোক, উক্ত শপথগুলোর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়ের সাথে যার মর্মার্থ হচ্ছে– উক্ত তারকাগুলোর চলাফেরা, প্রত্যাবর্তন করা এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার উল্লেখের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের নিকট বারবার ওহী এসেছিল, একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তা অবশিষ্ট রয়েছে। অতঃপর তা অদৃশ্য [বিলুপ্ত] হয়ে গেছে।

নবী করীম ﷺ -এর আগমনের পূর্বে রাতের (অজ্ঞতার) অন্ধকার সমগ্র পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছিল, তখন পূর্ববর্তী ওহীর নিদর্শন ও প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মতো কোনো ব্যক্তিই আর জীবিত ছিল না। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর আগমন ও কুরআন মাজীদ নাজিল হওয়ার মধ্য দিয়ে সুবহে সাদিকের সূত্রপাত হলো। যা সমগ্র জগতকে দিবালোকের ন্যায় হেদায়েতের আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করেছিল। যেন অন্যান্য নবী রাসূলগণ তারকার সাথে তুল্য হলে নবী করীম ﷺ হবেন উজ্জ্বল রবী সাদৃশ্য।

কারো মতে নক্ষত্ররাজি চলমান হয়ে প্রত্যাবর্তন করা এবং অদৃশ হয়ে যাওয়াকে তুলনা করা হয়েছে, ফেরেশতাগণের গমনাগমন এবং উর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সাথে। আর রাতের অবসান ও উষার আগমনকে কুরআনের আলোর মাধ্যমে কুফরের অন্ধকার দূর হয়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

اَلْخُنَّسِ وَالْجَوَارِ الْكُنَّسِ-এর অর্থ : এখানে اَلْخُنَّسُ অর্থ তারকাপুঞ্জ। اَلْخُنَّسُ শব্দটি خَنَسٌ হতে সংগৃহীত হয়েছে। خَنَسٌ অর্থ পিছনের দিকে যাওয়া, উধাও হয়ে যাওয়া, অনুপস্থিত হওয়া, চেপ্টা নাক হওয়া, আয়াতে اَلْخُنَّسُ বলতে ঐ তারকারাজিকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো দিনে পিছনে থাকে, লোকচক্ষুর সামনে আসে না। রাতে প্রকাশিত হয়। তারকাগুলি হলো যুহল, মুশতারী, মিররীখ, যুহরা ও আতারিদ [সাধারণত ঐ তারকাগুলোকে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ও বুধ গ্রহ বলা হয়ে থাকে]। সিহাহ্ গ্রন্থকার বলেন– সমস্ত তারকারাজিকে اَلْخُنَّسُ বলা হয়। কেননা সকল তারকা দিনের বেলায় দূরে থাকে। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ সম্পর্কে হাজ্জাজ ইবনে মুনযির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমি জাবির ইবনে যায়েদ (র.)-কে اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, اَلظِّبَاءُ وَالْبَقَرَةُ" অর্থাৎ হরিণ এবং গাভী। তবে এখানে اَلْخُنَّسُ দ্বারা نُجُوْم বা তারকারাজি উদ্দেশ্য হতে পারে।

কারো মতে, اِنَّهَا الْمَلَائِكَةُ অর্থাৎ اَلْكُنَّسُ বলতে ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْكُنَّسُ শব্দটি اَلْكِنَاسُ হতে নির্গত হয়েছে, كِنَاسٌ অর্থ গাছের উপর হরিণের ঘর, যেখানে হরিণ আত্মগোপন করে থাকে। اَلْجَوَارِ শব্দটি جَارِيَةٌ-এর বহুবচন, جَرٰى يَجْرِىْ হতে নেওয়া হয়েছে। –[কুরতুবী]

মূলকথা এখানে আল্লাহ اَلْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ উল্লেখ করে বুঝাতে চান যে, আমি সে নক্ষত্রগুলোর শপথ করে বলছি, যেগুলো সম্মুখে চলতে চলতে হঠাৎ কোনো এক সময় পিছনে হাটতে শুরু করে। অতঃপর পিছনের দিকেই চলতে থাকে এবং কোনো কোনো সময় পিছনের দিকে চলতে চলতে স্ব-স্ব উদয় স্থলে আত্মগোপন করে। এ অবস্থা উল্লিখিত ৫টি নক্ষত্রের মধ্যে দেখা যায়। –[মা'আলিম]

عَسْعَسَ -এর অর্থ :

১. ইমাম ফাররা বলেন, সমস্ত মুফাস্সিরীন এ কথার উপর একমত যে, عَسْعَسَ অর্থ اَدْبَرَ অর্থাৎ শেষ হয়ে আসল, শেষ প্রান্তে পৌছল।

২. মাহদাবী বলেন, عَسْعَسَ অর্থ اَدْبَرَ بِظَلَامِهٖ অন্ধকার নিয়ে চলে গেল। অর্থাৎ রাত শেষ হয়ে আসা এবং কিছু কিছু অন্ধকার থেকে যাওয়া।

৩. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اَقْبَلَ بِظَلَامِهٖ অন্ধকার নিয়ে এগিয়ে আসল। –[কুরতুবী]

৪. জালালাইনের গ্রন্থকার বলেন, اَقْبَلَ بِظَلَامِهٖ اَوْ اَدْبَرَ অর্থাৎ অন্ধকার এগিয়ে আসল বা চলে গেল।

৫. ইমাম রাগেব বলেন, اَلْعَسْعَسَةُ وَالْعَسَاسُ رِقَّةُ الظَّلَامِ অর্থাৎ اَلْعَسْعَسَةُ وَالْعَسَاسُ উভয়টি কম অন্ধকারকে বলা হয় আর এটা রাতের প্রথম ও শেষভাগে হয়ে থাকে। –[রূহুল মা'আনী]

৬. হযর হাসান বসরী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো যখন সে অন্ধকার নিয়ে সম্মুখে আসে ও ফিরে যায়। –[নূরুল কোরআন]

تَنَفَّسَ দ্বারা উদ্দেশ্য : মূলত تَنَفَّسَ-এর অর্থ হলো, পেট হতে হাওয়া বের হওয়া এবং تَنَفَّسَ الصُّبْحُ অর্থ সকালবেলার আগমন। কেননা সকালবেলা হাওয়া নিয়ে আসে। রূপক অর্থে এখন এর নামই تَنَفَّسَ রাখা হয়েছে।

আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেন, تَنَفَّسَ অর্থ সকালবেলার আলো এত দীর্ঘায়িত হওয়া যে, দিন চলে আসে।

কারো মতে, تَنَفَّسَ অর্থ اِنْشَقَّ বা اِنْفَلَقَ অর্থাৎ কেটেছে। কেননা রাতের অন্ধকার কেটে বা ভেদ করেই সকাল হয়।

মূলত এখানে تَنَفَّسَ বলে সুবহে সাদিককে বুঝানো হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়ে আল্লাহর কসম করার কারণ : যে কথাটি বলার জন্য এ শপথ বা উক্তি করা হয়েছে তা পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। এ শপথ বা উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুহাম্মদ ﷺ অন্ধকারের মধ্যে বসে কোনো স্বপ্ন দেখেননি; বরং যখন তারকাসমূহ অদৃশ্য হয়ে পড়েছে; রাত শেষে প্রভাতের আলো ফুটে উঠেছিল তখন উন্মুক্ত আকাশের দিগন্তে তিনি এ মহান ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি যা কিছু বলছেন, তা তাঁর চোখে দেখা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং পূর্ণ হুঁশ-জ্ঞান সহকারে দিনের উজ্জ্বলতায় অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রকাশ মাত্র।

কোনো কোনো তাফসীরকারক মন্তব্য করেছেন–বাহ্যিক জগতে যেমন নক্ষত্র উদিত হয়, অস্ত যায়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের আকাশেও পয়গম্বরগণ আল্লাহর ওহী নিয়ে উদিত হয়েছেন, যথাকর্তব্য সম্পাদন করে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তাঁদের অন্তর্ধান ঘটেছে। পৃথিবী আবার মিথ্যা ও বাতিলের ঘনঘটায় ডুবেছে। অবশেষে সকল নক্ষত্রের শেষে সূর্যের উদয়ের মতো সকল পয়গাম্বরের সর্বশেষ আধ্যাত্মিক বিশ্বের রবি রাসূলে কারীম ﷺ-এর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর নবুয়তের উজ্জ্বল আলোয় বাতিলের অন্ধকার ডুবে গেছে। শপথের বিষয়বস্তুগুলো নবুয়তের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান পরিক্রমার সাথে পরোক্ষভাবে তুলনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো মনীষীর মতে, ফেরেশতাদের ঊর্ধ্বলোকে গমনাগমন এবং অন্তর্ধানকে নক্ষত্র তারকার উদয় এবং কুরআনের আগমনে কুফরের অবসানকে ভোরের আগমনে রাতের অবসানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

إِنَّهُ -এর সর্বনামের মারজি' : إِنَّهُ -এর মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে তা দ্বারা কুরআনে কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যদিও বাক্যে এর উল্লেখ নেই, কিন্তু শানে নুযূলের দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে 'সম্মানিত রাসূল' বলতে ওহীবাহক ফেরেশতা তথা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহ হতে এ কথা স্পষ্ট জানা যায়। কুরআনকে রাসূলের উক্তি বলার অর্থ এটা নয় যে, এটা সে ফেরেশতার নিজস্ব উক্তি। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এটা সে মহান সত্তার কালাম, যিনি তাকে বার্তাবাহক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সূরা আল হাক্কার ৪০ নং আয়াতে অনুরূপভাবে কুরআনকে মুহাম্মদ ﷺ-এর উক্তি বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, কুরআন নবী করীম ﷺ-এর নিজস্ব রচনা; বরং একে রাসূলে কারীম ﷺ-এর উক্তি বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ কালামকে তিনি আল্লাহর রাসূল হিসাবে পেশ করছেন, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ হিসাবে নয়। উভয় স্থানে কুরআনকে ফেরেশতা ও মুহাম্মদ ﷺ-এর উক্তি বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ কালামকে তিনি আল্লাহর রাসূল হিসেবে পেশ করেছেন, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে কুরআনকে ফেরেশতা ও মুহাম্মদ ﷺ-এর উক্তি বলা হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহর এ কালাম হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সম্মুখে বার্তাবাহক ফেরেশতার মুখে এবং জনগণের সম্মুখে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মুখে পঠিত ও ধ্বনিত হচ্ছিল।

হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ ও যাহহাক (র.)-এর মতে رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ-এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা পরবর্তী আয়াতগুলোতে যে গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে তা তার জন্যই প্রযোজ্য। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ-এর দ্বারা এখানে মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর গ্রহণ যোগ্য।

قُوَّةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : قُوَّةٍ অর্থ– শক্তিশালী। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি বিশেষ গুণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা شَدِيْدُ الْقُوٰى বলেছেন। তাঁর শক্তির একটি বর্ণনা দেওয়া যায় যে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা 'মাদায়েনে লূত' -এ পাঠিয়েছিলেন, সেখানে ৪টি শহর ছিল। প্রত্যেক শহরে চার লক্ষ যোদ্ধা ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে পূর্ণ মাদায়েনকে উল্টিয়ে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর নির্দেশ পালনে যে শক্তি দরকার তাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এ শক্তি সৃষ্টির প্রথম থেকে শুরু করে বিশ্ব-প্রলয় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কারো মতে, মুখস্থশক্তি, ভুলে যাওয়া হতে দূরে থাকা এবং এক কথার সাথে অন্য কথার মিশ্রণ হতে দূরে থাকার শক্তি তার মধ্যে প্রকটভাবে রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

কুরআনকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বাণী বলার কারণ : কুরআনুল কারীম আল্লাহর বাণী; কিন্তু উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ কুরআন হযরত জিবরাঈলের বাণী, এটা এ কারণে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) ঐশী বাণীর মাধ্যম এবং বাহক ছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী বহন করে এনেছিলেন।

–[যিলাল, রূহুল মা'আনী]

সকল ভাষায়-ই এ ধরনের ব্যবহার রয়েছে। যেমন কোনো এক মালিক তার রাজমিস্ত্রীকে বলে থাকে এটাতো আপনার দালান, বড় সুন্দর হয়েছে– এটা এ কারণেই বলা হয় যে, রাজমিস্ত্রীর মাধ্যমে দালানটি তৈরি হয়েছে। অথচ মালিক তো রাজমিস্ত্রী নয়।

مُطَاعٍ আয়াতাংশের অর্থ : مُطَاعٍ শব্দের অর্থ হলো যার কথা মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ আকাশে সমস্ত ফেরেশতা তাঁর কথা মতো চলে, তিনি তাদের নেতা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সমস্ত ফেরেশতাগণ যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর অনুগত তার প্রমাণ হলো, মি'রাজের রাত্রে তিনি বেহেশতের পাহারারত ফেরেশতাদেরকে বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য দরজা খুলে দাও, অতঃপর খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রবেশ করে যা দেখার দেখেছেন। তারপর দোজখের পাহারাদারকে বলেছেন–দোজখের অবস্থা দেখার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-কে দরজা খুলে দাও। তাঁর কথায় দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, ফেরেশতাদের এ আনুগত্য ছিল নবী করীম ﷺ-এর প্রতি। আর কারো মতে ফেরেশতাদের আনুগত্যের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য ফেরেশতাদের প্রতি পৌঁছে। –[নূরুল কোরআন]

ثَمَّ أَمِيْنٍ বাক্যে ثَمَّ -এর অর্থ : ثَمَّ অর্থ সেখানে, তথায়। আয়াতে ثَمَّ বলতে فِى السَّمٰوٰتِ বা আকাশে বুঝানো হয়েছে। কেননা, সাধারণত সকল ফেরেশতার আবাস বা অবস্থান হলো আকাশে, আর হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের-ই নেতা। অতএব, ثَمَّ বলে আকাশের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কারো মতে, ثَمَّ -এর ث -এর উপর পেশ দিয়ে। তখন ثُمَّ অর্থ وَاوْ হবে। অথবা, تَرْتِيْبٌ -এর জন্য হবে। –[রূহুল মা'আনী]

أَمِيْنٍ -এর অর্থ : أَمِيْنٍ শব্দের অর্থ হলো مُؤْتَمِنٌ তথা বিশ্বস্ত, নিরাপদ। এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বিশেষণ। কেননা তিনি ছিলেন ওহী বহনে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও নিরাপদ। তিনি আল্লাহর কালামের সাথে নিজের কোনো কথা শামিল করে দেওয়ার মতো কোনো অবিশ্বাসের কাজ করেন না; বরং তিনি বড়োই আমানতদার। আল্লাহর নিকট হতে যা কিছু নাজিল হয়, তিনি হুবহু তাই পৌঁছে দেন।

হযরত জিবরাঈল (আ.) শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ : ذِى قُوَّةٍ অর্থ– শক্তিশালী। এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি বিশেষ গুণ। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা তাকে شَدِيْدُ الْقُوٰى (অত্যন্ত শক্তিধর) বলে উল্লেখ করেছেন।

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা হতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর অত্যধিক শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত জিবরাঈল (আ.) একবার হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সুদ্দুম নামক এলাকাটিকে আকাশ পর্যন্ত উর্ধ্বে তুলে উল্টে ফেলে দিয়েছেন। এ স্থানে শিশু ও নারী ব্যতীত চার লাখ পুরুষ ছিল। যার ফলে তা চির দিনের জন্য কালো জলাধারে পরিণত হয়েছিল।

হযরত জিবরাঈল (আ.) ছামূদ জাতিকে এক বজ্র ধ্বনিতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।

তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে কথোপকথনে উদ্যত শয়তানকে ডানার এক ঝাপটায় সুদূর ফিলিস্তিন হতে ভারত রাজ্যের কোনো এক পর্বতশৃঙ্গে নিক্ষেপ করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, মুখস্থ শক্তি ভুলে যাওয়া হতে দূরে থাকা এবং এক কথার সাথে অন্য কথায় মিশ্রণ হতে দূরে থাকার শক্তি তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে রয়েছে।

কারো কারো মতে, আল্লাহর নির্দেশ পালনে যে শক্তির প্রয়োজন তাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ শক্তি বিদ্যমান থাকবে।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি দু'বার হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। তার বিরাট সত্তা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সমগ্র শূন্যলোকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

বুখারী, তিরমিযী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে এরূপ দেখেছেন যে, তার ছয়টি পাখা রয়েছে। এটা তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের পরিচায়ক।

কারো মতে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এ মহাশক্তি এবং তাঁর প্রবল পরাক্রম হওয়া বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝানো হয়েছে, তা মূলত আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এ কথাগুলো আসলে কুরআন মাজীদের মুতাশাবিহাত-এর অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ :

٢٢. وَمَا صَاحِبُكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ عَطْفٌ عَلَى اَنَّهُ إِلَى أخِرِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ بِمَجْنُوْنٍ كَمَا زَعَمْتُمْ.

২২. আর নয় তোমাদের সঙ্গী [অর্থাৎ] মুহাম্মদ ﷺ مُقْسَمٌ عَلَيْهِ এর শেষ (হওয়া) পর্যন্ত اَنَّهُ-এর উপর আতফ হয়েছে। পাগল যেমন তোমরা ধারণা করে বসেছ।

٢٣. وَلَقَدْ رَاٰهُ رَاٰى مُحَمَّدٌ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ الْبَيِّنِ وَهُوَ الْاَعْلٰى بِنَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ -

২৩ অবশ্যই তিনি দেখেছেন তাঁকে [অর্থাৎ] মুহাম্মদ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন, যে আকৃতিতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। খোলা আকাশ প্রান্তে সুস্পষ্ট [দিগন্তে] আর তা হলো পূর্বাকাশের উচ্চ দিগন্ত।

٢٤. وَمَا هُوَ اَىْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ مَا غَابَ مِنَ الْوَحْيِ وَخَبَرِ السَّمَاءِ بِظَنِيْنٍ بِمُتَّهَمٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالضَّادِ اَىْ بِبَخِيْلٍ فَيَنْقُصُ شَيْئًا مِنْهُ.

২৪ আর নন তিনি [অর্থাৎ] মুহাম্মদ ﷺ অদৃশ্যের ব্যাপারে [অর্থাৎ] ওহী ও আসমানের সংবাদের ব্যাপারে অভিযুক্ত তথা অপবাদযুক্ত অন্য কেরাতে (ظَاء-এর পরিবর্তে) ضَادْ-এর সাথে (بِضَنِيْنٍ) রয়েছে। অর্থাৎ কৃপণ– যাতে তিনি তা হতে কিছু মাত্র হ্রাস [ত্রুটি] করবেন।

٢٥. وَمَا هُوَ اَىِ الْقُرْاٰنُ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ مُسْتَرِقِ السَّمْعِ رَجِيْمٍ مَرْجُوْمٍ -

২৫. উপরন্তু নয় এটা অর্থাৎ আল-কুরআন কোনো শয়তানের বক্তব্য চুরি করে শ্রবণকারী [এর বক্তব্য] যে অভিশপ্ত বিতাড়িত।

٢٦. فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ فَاَىَّ طَرِيْقٍ تَسْلُكُوْنَ فِىْ اِنْكَارِكُمُ الْقُرْاٰنَ وَاِعْرَاضِكُمْ عَنْهُ -

২৬. অতএব তোমরা কোন দিকে চলছ? কুরআনকে অস্বীকার করে এবং তা হতে বিমুখ হয়ে কোন পথে চলছ?

٢٧. اِنْ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ عِظَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ -

২৭ এটা তো উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয় নসিহত [ব্যতীত কিছু নয়] বিশ্ববাসীর জন্য [অর্থাৎ] মানুষ ও জিন জাতির জন্য।

٢٨. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ بَدَلٌ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ بِاِعَادَةِ الْجَارِّ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ بِاتِّبَاعِ الْحَقِّ -

২৮. তার জন্য যে তোমাদের মধ্য হতে ইচ্ছা করে এটা اَلْعٰلَمِيْنَ হতে بَدَلٌ হয়েছে। এখানে হরফে জারকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সরল-সঠিক পথে চলতে সত্যের অনুসরণের মাধ্যমে।

٢٩. وَمَا تَشَاءُوْنَ الْاِسْتِقَامَةَ عَلَى الْحَقِّ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ الْخَلَائِقِ اِسْتِقَامَتَكُمْ عَلَيْهِ -

২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না সত্যের উপর অটল থাকতে তবে যদি সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের সত্যের উপর সুদৃঢ় [প্রতিষ্ঠিত] থাকার তবে থাকতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

الْمُبِينِ-এর মহল্লে ই'রাব : الْمُبِينِ-এর মহল্লে ই'রাব দু'টি হতে পারে।

ক. হযরত রাবী (র.) বলেন, الْمُبِينِ শব্দটি الْأُفُقِ-এর সিফাত বা বিশেষণ হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা মাজরূর অবস্থায় আছে।

খ. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এটা جِبْرِيْلُ (অর্থাৎ যাকে রাসূল ﷺ দেখেছেন তার)-এর বিশেষণ। এমতাবস্থায় الْمُبِينِ মানসূব-এর অবস্থায় হবে। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ক্ষমতা, আমানতদারি ও বিভিন্ন গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। আর অত্র আয়াতগুলোতে নবী করীম ﷺ-এর বিশ্বস্ততা ও কুরআন মাজীদের সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত হযরত জিবরাঈল (আ.), কুরআনে মাজীদ ও নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফের ও মুশরিকরা যেসব অভিযোগ আনয়ন করেছিল সেগুলোর খণ্ডন করাই ছিল এ আয়াতগুলো নাজিলের উদ্দেশ্য।

আয়াতের শানে নুযূল :

১. নবী করীম ﷺ-এর ইচ্ছা হলো যে, তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর প্রকৃত অবয়বে দেখবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে অনুমতি দিলেন। ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন স্বীয় অবয়বে আকাশ জুড়ে রাসূল ﷺ-এর সামনে প্রকাশিত হলেন তখন নবী করীম ﷺ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এমতাবস্থায় মুশরিকগণ বলতে লাগল- إِنَّهُ مَجْنُوْنٌ অর্থাৎ সে তো পাগল। তখন অবতীর্ণ হলো "وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ" তোমাদের সঙ্গীতো পাগল নয় তিনি তো হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখে ক্ষণিকের জন্য এমন হয়েছেন। -[কুরতুবী]

২. মক্কার কুরাইশ-কাফেরগণ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ভালোভাবে চিনার পরেও বলে বেড়াত যে, إِنَّهُ مَجْنُوْنٌ অর্থাৎ সে পাগল। যা বলছে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে অবতারিত বক্তব্য। আবার কারো কারো মতে, এটা তার দাওয়াতের পক্ষে বানানো বক্তব্য। আবার কেউ কেউ বলত, প্রত্যেক কবির সাথে একজন করে শয়তান থাকে, সে তার জন্য উদ্ভট কথা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে আসে। আবার বলত, প্রত্যেক জাদুকরের জন্য একটি করে শয়তান থাকে, সে তার জন্য দূরবর্তী অদৃশ্যের খবর নিয়ে আসে। আবার কোনো কোনো শয়তান এমন আছে যে, মানুষের উপর সওয়ার হয়ে তাদের ভাষায় সুন্দর সুন্দর কথা বানিয়ে বলে। এরপর মানুষ দাবি শুরু করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। আসল কারণকে ছেড়ে মিথ্যা বানোয়াট কথা শুরু করে।

এমতাবস্থায় কুরআন নাজিল হয়ে আসল ব্যাপার উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। বলে দেওয়া হলো যে, যত কথা-ই তোমরা বল না কেন এটা সে সত্তার পক্ষ হতে অবতারিত, যিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। যিনি এ দুনিয়ার সকল বস্তুকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। বিনা মডেলে [বিনা উদাহরণে] বিভিন্ন রকম সৃষ্টির উদ্ভব ঘটিয়েছেন।

কুরআন নাজিল হয়ে এমন দু'টি সত্তার পরিচয় করে দিয়েছে, যাদের একজন আল্লাহর নিকট হতে ওহী গ্রহণ করেছে, অপর একজন তা বহন করে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। তিনি তাদের মধ্য হতেই একজন, যাঁকে তারা চিনে, যিনি مَجْنُوْنٌ বা পাগল নন। তিনি যে সত্তার মাধ্যমে ওহী প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁকে বাস্তব চোখে অবলোকন করেছেন। -[যিলাল]

৩. আল্লাহর বাণী لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ নাজিল হওয়ার পর আবূ জাহল বলল- সরল পথে চলা না চলার জন্য তো আমাদেরকে এখতিয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেই দিয়েছেন, তোমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তখন আল্লাহর বাণী .... وَمَا تَشَاءُوْنَ নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ : মক্কার কাফিররা মহানবী ﷺ-এর উপর যেসব অপবাদ দিয়েছিল তন্মধ্যে একটি এই ছিল যে, তারা বলত মুহাম্মদ ﷺ পাগল। এ জন্যই সে এ সকল আবোল-তাবোলও উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। যখন হাজার হাজার খোদা মিলে পৃথিবীটাকে সামাল দিতে পারছে না তখন মুহাম্মদ ﷺ-এর এক খোদা কিভাবে এর শৃঙ্খলা বিধান করবে? তা ছাড়া মানুষ মৃত্যুর পর পচে-গলে যাওয়ার পর কিভাবে পুনরায় জীবিত হতে পারে? এ সব পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি?

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সব অপবাদের নিরসন কল্পে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মদ ﷺ কোনো কালেও পাগল নন। তিনি তোমাদের নিকট যা বলছেন, তা তাঁর নিজের কথা নয়; বরং জিবরাঈলের নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত আল্লাহর কালাম।

মু'মিনদের সঙ্গী না বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাফেরদের সঙ্গী বলার কারণ : [illegible] ﷺ -কে কাফেরদের সহচর বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন; বরং তিনি তাদেরই জাতির একজন। তাদের মধ্যে রাসূলের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাদের লোকালয়ের প্রতিটি শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ জানে যে, তিনি বুদ্ধিমান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি। এমন ব্যক্তিকে জেনে বুঝে 'পাগল' বলায় তাদের লজ্জা করা উচিত। 'সাহেব' বা সহচর শব্দ দ্বারা সম-আদর্শের অনুসারী বুঝানো হয়নি; বরং সহ-অবস্থানজনিত পরিচিতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
–[ফাতহুল কাদীর]

بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ -এর অর্থ : اَلْأُفُقِ الْمُبِيْنِ অর্থ– স্পষ্ট দিগন্ত, পূর্ব দিকের সূর্য উদয় হওয়ার স্থান। কেননা সূর্য উদয় হওয়ার সময় পূর্ব দিক مُبِيْن তথা আলোকিত হয়ে যায়। এ মতটি জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) গ্রহণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন– اَلْأُفُقِ الْمُبِيْنِ হলো اَقْطَارُ السَّمَاءِ وَنَوَاحِيْهَا অর্থাৎ আকাশের সকল প্রান্ত ও দিক। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে কোথায় দেখলেন? : ইমাম মাওয়ারদী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। ক. হযরত সুফিয়ান বলেন, তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে পূর্বাকাশে দেখতে পেলেন, খ. ইবনে শাজারা বর্ণনা করেন, পশ্চিমাকাশে এবং গ. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, মক্কার পূর্বাঞ্চলে দেখেছেন।

ইমাম ছা'লাবী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ একদা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, আমি তোমাকে তোমার আসল আকৃতিতে দেখতে চাই, যে আকৃতি নিয়ে তুমি আকাশে অবস্থান কর। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি অবশ্যই পারবেন না। তিনি উত্তর দিলেন, না, পারবো। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, তাহলে আমি কোথায় দেখা দিতে পারি? তিনি বললেন, 'আবতাহ' এলাকায়। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, সেখানে আমার স্থান সঙ্কুলান হবে না। তিনি বললেন, তাহলে 'মিনা'তে। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, সেখানেও সঙ্কুলান হবে না'। তিনি বললেন, তা হলে আরাফাতে আসুন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, সেখানে আসা যায়। উভয়ের মাঝে ওয়াদা-চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেল। নবী করীম ﷺ নির্দিষ্ট সময়ে বের হয়ে পড়লেন। হঠাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) আরাফাহ পাহাড়ের পার্শ্ব হতে খস-খস শব্দ করে সামনে এগিয়ে আসলেন, তাঁর শরীর পূর্ব আর পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। মাথা আকাশে আর পা দুটি জমিনে লেগে আছে। এটা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে হযরত জিবরাঈল (আ.) নিজের আকৃতি পাল্টিয়ে তাঁকে বুকের সাথে মিলিয়ে নিলেন এবং বললেন, ভয় করবেন না। আপনি যদি হযরত ইসরাফীল (আ.)-কে দেখতেন, তাহলে আপনার কি অবস্থা হতো? তাঁর মাথা আরশের নিচে এবং দুই পা সাত জমিনের নিচে, আর আরশ তাঁর ঘাড়ের উপরে। কোনো কোনো সময় তিনি আল্লাহর ভয়ে এত ছোট হয়ে যান যে, মনে হয় একটি চড়ুই পাখি। –[কুরতুবী]

ظَنِيْنٍ অর্থ : আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, بِظَنِيْنٍ اَىْ بِمُتَّهَمٍ অর্থাৎ অভিযুক্ত, সন্দেহযুক্ত। কারো মতে ضَنِيْنٍ অর্থ بَخِيْلٌ বা কৃপণ। এ অর্থে মূলবাক্যের বক্তব্য এভাবে হবে যে, اِنَّهُ لَا يَبْخَلُ بِالْوَحْىِ وَلَا يَقْصُرُ فِى التَّبْلِيْغِ অর্থাৎ তিনি ওহী পৌঁছাতে কোনো প্রকারের কৃপণতা বা ত্রুটি করেন না। আবার কারো মতে ضَنِيْنٍ অর্থ ضَعِيْفٌ দুর্বল।

এ মতানৈক্যের কারণ হলো, ক্বারীদের কেরাতে এখতেলাফ হওয়া। কেননা কেউ ظَنِيْنٍ (ظَاءْ) দিয়ে পড়েন। আবার কেউ ضَنِيْنٍ (ضَادْ) দিয়ে পড়েন। ظَاءْ দিয়ে পড়লে অভিযুক্ত অর্থ হবে, আর ضَنِيْنٍ অর্থ হবে بَخِيْلٌ কৃপণ।
–[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

মোটকথা, নবী করীম ﷺ কোনো কথা তোমাদের থেকে লুকিয়ে রাখেন না। অজ্ঞাত জগতের যে সকল তত্ত্ব ও তথ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি নাজিল করেন– তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত করেন, তা আল্লাহর নিজস্ব সত্তা, গুণ, ফেরেশতা, মৃত্যুর পর জীবন, কিয়ামত, পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নাম যে বিষয়েই হোক না কেন, তা তিনি যথাযথভাবে তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন, এতে তাঁর বিন্দু-বিসর্গ কার্পণ্য নেই। কোনোরূপ রাখাঢাক নেই।

গায়েব বিষয়ে কার্পণ্য কেন করেননি? : তৎকালীন আরব জাদুকররা যাদুর খেলা দেখাতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য জাদু বিদ্যার গোপন রহস্য অন্যকে জানাত না। আবার জ্যোতিষ-গণকদের অভ্যাস ছিল যে, তারা টাকা-পায়সা নিয়ে কোনো গায়েবি কথা বলত। সেকালের গণকদের নিকট শয়তান সত্য-মিথ্যা পৌঁছাত। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকৃতি ঐ সকল গণকদের মতো নয়; বরং সত্যধর্ম বিষয়ে যে সমস্ত গায়েবী ওহী তাঁর উপর অর্পিত হয়, তিনি তাই সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে প্রকাশ করেন। তিনি সত্য প্রচারে মোটেই কার্পণ্য করেন না। কারো নিকট হতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। শয়তান প্রভাবিত জাদুকরদের মতো কোনো ভেদ, রহস্য লুকিয়ে রাখাও তাঁর কোনো অভ্যাস নেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের আনীত অভিযোগকে খণ্ডন করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদ বিতাড়িত মারদুদ শয়তানের বক্তব্য নয়। এমন নয় যে, কোনো শয়তান আকাশ হতে কোনো তথ্য চুরি করে এনে মুহাম্মদ ﷺ-কে শুনিয়ে গেছে।

তোমরা যে ধারণা করে বসেছ যে, কোনো শয়তান এসে মুহাম্মদ ﷺ-কে এসব কথা বলে যায়– এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শয়তান মানুষকে শিরক, মূর্তিপূজা, নাস্তিকতা ও নীতিহীনতা হতে দূরে সরিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও তাওহীদের শিক্ষা দিবে, মানুষকে লাগামহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর সম্মুখে দায়িত্ব ও জবাবদিহি করার অনুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দিবে, মূর্খতামূলক রসম-রেওয়াজ, জুলুম-পীড়ন ও নৈতিক চরিত্রহীনতা, পবিত্র ও আদর্শবাদী জীবন-যাপন, সুবিচার, ন্যায়-নীতি, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া এবং উন্নতমানের চরিত্র নৈতিকতা অনুসরণের দিকে আহ্বান জানাবে ও সেদিকে পরিচালিত করবে। এটা কি করে তোমরা ভাবতে পারলে?

رَجِيْمٍ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : رَجِيْمٍ শব্দটি এখানে مَرْجُوْمٌ-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ অভিশপ্ত ও রহমত হতে বিতাড়িত যেমন– قَتِيْلٌ শব্দটি مَقْتُوْلٌ-এর অর্থে হয়ে থাকে।

হযরত আতা (র.) বলেছেন, এখানে শয়তান দ্বারা সে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আকৃতিতে এসে তাকে ফেতনায় ফেলার চেষ্টা করত। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে ওহীর প্রভাব হতে সম্পূর্ণ হেফাজত করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ : اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের বিভিন্ন মত দেখা যায়। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, اِلٰى اَيْنَ يَعْدِلُوْنَ عَنْ هٰذَا الْقَوْلِ وَعَنْ طَاعَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কথা এবং তাঁর আনুগত্য হতে বিমুখ হয়ে কোথায় যাবে?

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে অন্য আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ عَنْ كِتَابِىْ وَطَاعَتِىْ অর্থাৎ "আমার কিতাব এবং আমার আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে কোথায় যাবে"?

হযরত যুজাজ (র.) বলেন, فَاَىَّ طَرِيْقَةٍ تَسْلُكُوْنَ اَبْيَنُ مِنْ هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ الَّتِىْ بُيِّنَتْ لَكُمْ

অর্থাৎ 'আমি যে পথ তোমাদেরকে দেখিয়েছি সে পথ হতে কোন পরিষ্কার পথ তোমরা গ্রহণ করবে"? –[কুরতুবী]

হক থেকে মুখ ফিরিয়ে কোন জায়গায় যাবে? যেখানেই যাবে, সেখানেই আল্লাহ তোমাদের সামনে থাকবেন। –[যিলাল]

اِنْ هُوَ ও مَا هُوَ-এর মধ্যকার যমীরদ্বয়ের مَرْجِعٌ কি? : اِنْ هُوَ ও مَا هُوَ-এর মধ্যকার যমীরদ্বয়ের مَرْجِعٌ-এর ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে–

ক. তাদের মারজি' হলো কুরআনে কারীম। এটা জমহুরের মাযহাব।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত যমীরদ্বয়ের মারজি' হলো নবী করীম ﷺ।

قَوْلُهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ .... اَنْ يَّسْتَقِيْمَ : অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং তা হতে কারা উপকৃত হতে পারে, তা হতে উপকৃত হওয়ার শর্ত কি তার উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং ইরশাদ হয়েছে– কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্য নিছক উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানব-দানব সকলের জন্যই এটা নসিহত। আর এ উপদেশ হতে শুধু তারাই কল্যাণ হাসিল করতে পারে যারা হকের অনুসরণের মাধ্যমে সরল সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়। পক্ষান্তরে যারা সরল সঠিক পথ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, কুরআন তাদের কোনো উপকারেই আসে না উপরন্তু কুরআনের বিরুদ্ধাচরণের দরুন তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত হবে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, সরল সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য আগ্রহী হওয়া আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও তৌফিক দানের মাধ্যমেই শুধু তা লাভ করা সম্ভব। কাজেই আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তাঁর নিকট তার তৌফিক দানের জন্য আবেদন জানাতে হবে। শেষোক্ত আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই পথ প্রদর্শক, তবে মু'মিনদেরকে এটা পথ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়। কেউ কেউ কুরআন দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না বলে এর উপদেশ গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়, কেননা এটা কার্যকর হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কতক মানুষের ব্যাপারে কোনো হেকমত বা গূঢ় রহস্যের কারণে আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়াতেই তারা কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা উপকৃত হয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর বিধায় তারা উপকৃত হয়। –[বায়ানুল কুরআন]

মোটকথা, আল্লাহর এ কালাম যদিও মহান নসিহত বা উপদেশ সমগ্র মানবজাতির জন্য; কিন্তু এটা হতে উপকৃত হতে পারে কেবল সে ব্যক্তি যে নিজেই সত্য গ্রহণ ও অনুসরণ করতে প্রস্তুত। এর অবদানে নিজেকে ধন্য করার জন্য নিজেরই অনুসন্ধিৎসু ও সত্যপন্থি হওয়া সর্বপ্রথম প্রয়োজন– এটাই প্রথম শর্ত।

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ : সূরা আল-ইনফিত্বার

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম তার প্রথম আয়াতের শব্দ اِنْفَطَرَتْ হতে চয়ন করা হয়েছে। اِنْفَطَرَتْ শব্দটি اَلْاِنْفِطَارُ হতে নির্গত। اَلْاِنْفِطَارُ-এর অর্থ হলো ফেটে যাওয়া, দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়া। এ সূরায় আসমান বিদীর্ণ হওয়ার উল্লেখ থাকায় এ সূরাকে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৯ আয়াত ৮০ বাক্য এবং ১০৭টি অক্ষর রয়েছে।

–[নূরুল কোরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাল : এ সূরা এবং তার পূর্ববর্তী সূরা 'আত্ তাকভীর'-এর বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল রয়েছে। অতএব, উভয় সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও প্রায় কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তা নাজিল হয়েছে। তবে এটি সূরা আন-নাযি'আতের পর অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : আলোচ্য সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু হলো পরকাল। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, হাকিম ও ইবনে মারদুইয়া বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

"مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَأْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় কিয়ামতের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ দিন যখন উপস্থিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তার যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত হবে। অতঃপর মানুষের মধ্যে আত্মসম্বিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে মহান আল্লাহ তোমাকে জীবন দিয়েছেন, যাঁর ঐকান্তিক দয়া এবং অনুগ্রহে আজ তুমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে উত্তম দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী হয়েছ, তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধোঁকায় কেমন করে পড়লে যে, তিনি শুধু দয়া ও অনুগ্রহ-ই করেন, ইনসাফ ও সুবিচার করেন না। তিনি দয়া ও অনুগ্রহ করেন এটা ঠিক; তবে তার অর্থ এ নয় যে, তার সুবিচারকে তোমরা ভয় করবে না। এরপর মানুষকে কোনোরূপ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ اِنْشَقَّتْ ـ

২. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ اِنْقَضَّتْ وَتَسَاقَطَتْ ـ

৩. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ فُتِحَ بَعْضُهَا فِىْ بَعْضٍ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا وَاخْتَلَطَ الْعَذْبُ بِالْمِلْحِ ـ

৪. وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ قُلِبَ تُرَابُهَا وَبُعِثَ مَوْتَاهَا وَجَوَابُ اِذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا ـ

৫. عَلِمَتْ نَفْسٌ اَىْ كُلُّ نَفْسٍ وَقْتَ هٰذِهِ الْمَذْكُوْرَاتِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا قَدَّمَتْ مِنَ الْاَعْمَالِ وَمَآ اَخَّرَتْ مِنْهَا فَلَمْ تَعْمَلْهُ ـ

অনুবাদ :

১. আকাশ যখন ফেটে যাবে বিদীর্ণ হবে;

২. আর যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়ব খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে নিচে পতিত হবে;

৩. আর সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে একটি অপরটির স মিলে গিয়ে একটি সমুদ্রে পরিণত হবে। মিঠা ও লবণাক্ত পানি সংমিশ্রত হয়ে একাকার হয়ে যাবে।

৪. আর যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে এর মাটি উল্টিয় দেওয়া হবে এবং এর মধ্যকার মৃতদেরকে উত্থিত কর হবে। إِذَا ও এর সমুদয় মা'তূফের জবাব পরবর্তী বক্ত

৫. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে অর্থাৎ সকলেই জানতে পারবে, এ সকল ঘটনা সংঘটনকাল তথ কিয়ামতের দিন সে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে আমলসমূ মধ্য হতে আর যা পশ্চাতে রেখে এসেছে তা হত এবং যা সে আমল করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা আত-তাকভীরে কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং রাসূল ও কুরআনের প্রতি দৃ বিশ্বাসের কথা আলোচিত হয়েছে বর্তমান সূরার প্রথমে দুনিয়া প্রলয় হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ : আল্লাহ তা'আলা এখানে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- যখন আকাশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় বর্তমানে যে আকাশ রয়েছে তা ছিন্ন-ভিন্ন ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে

اِنْفَطَرَتْ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : اِنْفَطَرَتْ এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর صِيْغَه বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাবে اِنْفِعَالْ মাসদার اِنْفِطَارٌ মূলবর্ণ (ف ـ ط ـ ر) এর অর্থ– দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া।

কুরআন মাজীদে এ মর্মে আরো বহু আয়াত রয়েছে। যেমন– فَاِذَا - وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ - اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - انْشَقَّتِ السَّمَاءُ ইত্যাদি।

আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কারণ কি? : কেন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে? এর ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

ক. কারো কারো মতে, اِنْفَطَرَتْ لِنُزُوْلِ الْمَلٰئِكَةِ অর্থাৎ আকাশ হতে ফেরেশতা অবতরণ করার কারণে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন– اِنْفَطَرَتْ لِهَيْبَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে আসমান ফেটে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

আকাশ বিদীর্ণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য : 'আকাশ বিদীর্ণ' হওয়া কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন, কিন্তু 'আকাশ বিদীর্ণ' দ্বারা কি উদ্দেশ্য একথা নির্দিষ্ট করে বলা যেমন সুকঠিন, কিভাবে বিদীর্ণ হয়ে তা বলাও তেমন সুকঠিন।

...... দুনিয়ায় বর্তমানে যতকিছু ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আছে, সকল কিছুর পরিবর্তন এবং ধ্বংসের ধরন উপলব্ধি করা যায়। এ ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে বস্তুগুলো যে অদৃশ্য বিধানের মাধ্যমে চলছে তা উপলব্ধি করা সহজ কথা নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে, আকাশের তুলনায় মানুষ নগণ্য ক্ষুদ্র। আকাশ যখন আল্লাহর নির্দেশে সেদিন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে; তখন মানুষের অবস্থা কি হবে, তা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়।

اِنْتَثَرَتْ : অর্থ اِنْتَثَرَتْ এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর صِيْغَه বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাবে اِنْتِعَالْ মাসদার اَلْاِنْتِثَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ث ـ ر) এর অর্থ تَسَاقَطَتْ مُتَفَرِّقَةً অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে ঝরে পড়বে, ছিটকে পড়বে। আকাশ যেখানে বিদীর্ণ হয়ে যাবে সেখানে তারকারাজির অস্তিত্ব কোথায়? –[যিলাল, ফাতহুল কাদীর]

تَفْجِيْرُ الْبِحَارِ দ্বারা উদ্দেশ্য : সমুদ্রগুলো উথলে উঠবে। পূর্ববর্তী সূরা আত-তাকভীরে বলা হয়েছে যে, সমুদ্রে আগুন উৎক্ষিপ্ত করে দেওয়া হবে। পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, কিয়ামতের দিন এক ভয়াবহ ভূকম্পন সৃষ্টি হবে যা কেবল একটি এলাকায়ই সীমাবদ্ধ থাকবে না। গোটা পৃথিবী একই সঙ্গে কম্পিত হয়ে উঠবে। সমুদ্রসমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, এতে আগুন জ্বলে উঠবে। সমুদ্রে আগুন জ্বলার তাৎপর্য হচ্ছে– প্রথমে সেসব ব্যাপক ভূমিকম্পের দরুন সমুদ্রসমূহের তলদেশ ফেটে দীর্ণ–বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং ভূগর্ভের তরল পদার্থ যা সর্বদা উত্তপ্ত থাকার কারণে টগবগ করে ফুটছে ও আলোড়িত হচ্ছে–সমুদ্রের পানি তথায় প্রবেশ করবে এবং এর দুটি মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হবে। অক্সিজেন উৎক্ষেপক ও হাইড্রোজেন প্রজ্বালক। তখন এভাবে বিশেষিত হওয়া ও অগ্নি উদগীরক হওয়ার এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। আর এরই ফলে দুনিয়ার সমুদ্র ও মহাসমুদ্রসমূহে আগুন লেগে যাবে। –[যিলাল]

ইমাম শাওকানী (র.) বলেন, সকল সমুদ্রের পানি উথলে এক সাগরে রূপান্তরিত হবে, মিঠা পানির সাথে লবণাক্ত পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

"فُجِّرَتْ"-এর অর্থ : فُجِّرَتْ এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ, বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مَاضِيْ مَجْهُوْل বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْجِيْرُ মূলবর্ণ (ف ـ ج ـ ر) এর অর্থ– প্রবাহিত হওয়া, মিলিত হওয়া। এখানে সমুদ্রের লবণাক্ত ও মিঠা পানির প্রাকৃতিক বাঁধন ছুটে উভয়ে একাকার হওয়া, অথবা ভূগর্ভের উত্তপ্ত পানির সাথে সমুদ্রের পানি মিলিত হওয়া বুঝিয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ" : অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ কিয়ামতের সময় যে কবরসমূহকে উল্টিয়ে তাদের মধ্যকার লাশ বের করে পুনরুজ্জীবিত করবেন সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

১. হযরত জালালুদ্দিন মহল্লী (র.) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন– قُلِبَ تُرَابُهَا وَبُعِثَ مَوْتَاهَا অর্থাৎ কবরের মাটি খুঁড়ে ফেলা হবে এবং এর ভিতর হতে মৃতদেরকে বের করা হবে।

২. কারো মতে, এর অর্থ হলো ভূগর্ভে যত গুপ্তধন রয়েছে, কিয়ামতের সময় সবই বের করে দেওয়া হবে।

بُعْثِرَتْ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : সীগাহ, بُعْثِرَتْ এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর صِيْغَه বহছ اِثْبَاتْ فِعْلْ مَاضِيْ مَجْهُوْل বাবে بَعْثَرَ মাসদার اَلْبَعْثَرَةُ এটা মূলত ছিল بُعِثَ وَاُثِيْرَ যেমন بَسْمَلَ মূলে بِسْمِ اللّٰهِ ছিল, حَمْدَلَ মূলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ছিল এবং حَوْقَلَ মূলে ছিল لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এ ধরনের সংক্ষেপণ রীতি আরবে বহুল প্রচলিত ছিল। আর بُعْثِرَتْ-এর অর্থ হবে اَلنَّبْشُ وَالْاِخْرَاجُ অর্থাৎ খোলা ও বের করা।

আবূ হাইয়ান বলেছেন, উপরিউক্ত তাহকীক যা কোনো ভাষাবিদ করেছেন, তা মূলত সঠিক নয়। এখানে ر-কে অতিরিক্ত দেখানো কোনো নিয়মে পড়ে না। তবে এটা কারো নিজস্ব বিশ্লেষণ হতে পারে– যা অন্যান্যদের জন্য দলিল হতে পারে না; বরং بُعْثِرَ একটি একক শব্দ যৌগিক নয়। আর জমহুর এটাই গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষ তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কৃত আমলসমূহ জানতে পারবে।

আলোচ্য আয়াতে مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন :

ক. মানুষ যেসব ভালো বা মন্দ আমল করে অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে তা হলো- مَا قَدَّمَتْ আর যেসব কাজ করা হতে সে বিরত রয়েছে তা مَا اَخَّرَتْ হিসাবে গণ্য।

খ. মানুষ যা প্রথমে করেছে তা হলো مَا قَدَّمَتْ আর যা পরে করেছে তা হলো مَا اَخَّرَتْ অর্থাৎ মানুষের সমস্ত আমল তারিখ পরম্পরা অনুযায়ী তার সম্মুখে পেশ করা হবে।

গ. মানুষ তার জীবনে যেসব ভালো বা মন্দকাজ করেছে তা হলো مَا قَدَّمَتْ আর সেসব কাজের যে ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া তার মৃত্যুর পর মানবসমাজে প্রতিফলিত ও পরিলক্ষিত হয়েছে, তাকে مَا اَخَّرَتْ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ঘ. কেউ কেউ বলেছেন, مَا قَدَّمَتْ-এর দ্বারা সে আমলকে বুঝানো হয়েছে যা সে করেছে এবং مَا اَخَّرَتْ-এর দ্বারা সে আমলকে বুঝানো হয়েছে যা করার একান্ত ইচ্ছা (নিয়ত) তার ছিল কিন্তু বাস্তবে করতে পারেনি।

ঙ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এর তাফসীরে বর্ণিত আছে مَا قَدَّمَ مِنْ مَعْصِيَتِهٖ وَمَا اَخَّرَ مِنْ طَاعَتِهٖ অর্থাৎ মানুষ যেসব পাপকার্য করেছে এবং যে সমস্ত ইবাদত সে ছেড়ে দিয়েছে, তা বুঝানো হয়েছে।

চ. অথবা, مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهٖ مِنْ اَمْوَالِهٖ وَمَا اَخَّرَ لِوَرَثَتِهٖ অর্থাৎ মানুষ নিজে যে মাল ভোগ করেছে তা হলো مَا قَدَّمَتْ এবং যা তার ওয়ারিশদের জন্য রেখে গেছে তা হলো مَا اَخَّرَتْ -[নূরুল কুরআন, রুহুল মা'আনী]

মানুষ কখন তার কৃতকর্ম জানতে পারবে? : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্ম জানতে পারবে। কিন্তু কখন জানতে পারবে এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে।

ক. কেউ কেউ বলেছেন-عِنْدَ نَشْرِ الصُّحُفِ অর্থাৎ আমলনামা খোলার সময় মানুষ তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবে।

খ. কারো কারো মতে, عِنْدَ الْبَعْثِ অর্থাৎ পুনরুত্থানের সময় জানতে পারবে।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, যখন পাপী ও মু'মিনগণের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া হবে তখন জানতে পারবে। যেমন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ হে পাপীরা! তোমরা আজ মু'মিনগণ হতে পৃথক হয়ে যাও। আজ তাদের সাথে তোমাদের থাকার অধিকার নেই। -[রূহুল মা'আনী]

عَلِمَتْ نَفْسٌ الخ-এর দ্বারা কোনো দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আলোচ্য আয়াতে মানুষকে তার আমলের জবাবদিহিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। ১. এটা জেনে যাতে মানুষ আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থাকে। ২. যাতে মানুষ সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমলের দিকে ধাবিত হয়। কেননা, কিয়ামতের কঠিন দিনে শুধু এটাই তাকে সুখ-শান্তি ও মুক্তি দিতে পারে।

যা হোক যখন পূর্বোক্ত বিষয়গুলো যেমন আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, তারকা খসে পড়া ইত্যাদি প্রকাশ পাবে এবং মানুষের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্ম জানতে পারবে, তার সম্মুখে তার কৃতকর্ম হাজির করা হবে।

কেউ কেউ এর এ অর্থ করেছেন যে, যখন উক্ত বিষয়াবলি সংঘটিত হবে তখন কিয়ামত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য হিসাবের সম্মুখীন হবে এবং আমলনামা ডান অথবা বাম হাতে পাবে। আর তখনই প্রত্যেকে তার কৃতকর্ম পাঠ করতে শুরু করবে। বলা বাহুল্য যে, কৃতকর্মের ফল ভোগও তখন হতে পুরামাত্রায় শুরু হয়ে যাবে।

উক্ত বিষয়গুলো বিন্যাসের তাৎপর্য : সূরা আল-ইনফিতারের শুরুতে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত চারটি বিষয়কে যেভাবে বিন্যাস করা হয়েছে এর মধ্যে কিছু হিকমত এবং ফায়দা লুক্কায়িত রয়েছে। যা ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন- এ কয়েকটি আয়াত দ্বারা দুনিয়া বিধ্বস্ত এবং মানুষের উপর হতে শরিয়তের হুকুম রহিত হওয়া উদ্দেশ্য। আকাশ হলো ছাদ স্বরূপ। জমিন হলো ভিত্তি। যে ব্যক্তি ঘর ভাঙ্গতে চায়, সে প্রথমে ছাদ ভাঙ্গে, তারপর ছাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু ভাঙ্গে, তারপর ভিত্তি ভাঙ্গে, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া শেষ করার সময় প্রথমে ছাদ ভাঙ্গবেন। এ কারণে প্রথমে বললেন, اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ। তারপর আকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু তারকা ধ্বংস করবেন, যেমন বলেছেন, وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ। ছাদ ধ্বংস করার পর ভিত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্র ধ্বংস করবেন। যেমন বলেছেন, وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ শেষ পর্যন্ত ভিটি ধ্বংস করবেন। যেমন বলেছেন وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ এ আয়াত দ্বারা জমিনের পিঠকে পেট এবং পেটকে পিঠ করা অর্থাৎ উল্টিয়ে ফেলা উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

অনুবাদ :

٦. يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الْكَافِرُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ حَتّٰى عَصَيْتَهُ .

৬. হে মানুষ কাফের! তোমাকে কিসে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল যে জন্য তুমি তাঁর অবাধ্যাচারণ করেছ।

٧. اَلَّذِىْ خَلَقَكَ بَعْدَ اَنْ لَمْ تَكُنْ فَسَوّٰكَ جَعَلَكَ مُسْتَوِى الْخَلْقِ سَالِمَ الْاَعْضَاءِ فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ جَعَلَكَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ مُتَنَاسِبَ الْاَعْضَاءِ لَيْسَتْ يَدٌ اَوْ رِجْلٌ اَطْوَلَ مِنَ الْاُخْرٰى .

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যখন তোমার অস্তিত্ব ছিল না অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন যথাযথভাবে সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তোমাকে সুসম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। এমন নয় যে, হাত বা পা কোনোটি অপরটি অপেক্ষা দীর্ঘ।

٨. فِىْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا زَائِدَةٌ شَاۤءَ رَكَّبَكَ .

৮. তিনি যে আকৃতিতে ইচ্ছা করেছেন এখানে مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত তোমাকে গঠন করেছেন।

٩. كَلَّا رَدْعٌ عَنِ الْاِغْتِرَارِ بِكَرَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَلْ تُكَذِّبُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ بِالدِّيْنِ الْجَزَاءِ عَلَى الْاَعْمَالِ .

৯. না, কখনও নয় এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রতারিত হওয়া থেকে শাসানোর উদ্দেশ্যে। তোমরা তো অস্বীকার কর হে মক্কাবাসী কাফেরগণ! প্রতিফল দিবসকে আমলের প্রতিফল।

١٠. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ لِاَعْمَالِكُمْ .

১০. অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়কগণ রয়েছে ফেরেশতাদের মধ্য হতে, তোমাদের আমলসমূহ তত্ত্বাবধানের জন্য।

١١. كِرَامًا عَلَى اللّٰهِ كَاتِبِيْنَ لَهَا .

১১. সম্মানিত আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধকারীগণ তা।

١٢. يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ جَمِيْعَهُ .

১২. এরা জানে যা তোমরা আমল কর সব কিছুই।

তাহকীক ও তারকীব

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ বাক্যটি حَالْ হিসেবে নসবের অবস্থায় রয়েছে। ذُو الْحَالِ হলো تُكَذِّبُوْنَ ক্রিয়ার فَاعِلْ বা কর্তা।

جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ ও হতে পারে। কাফেরদের تَكْذِيْبِ-কে বাতিল করার জন্য উক্ত বাক্যটি নেওয়া হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতের তিনটি ই'রাব হতে পারে।

১. حَالْ হিসেবে মানসূব অবস্থায় আছে, তখন ذُو الْحَالِ হবে كَاتِبِيْنَ-এর মধ্যকার সর্বনামটি।

২. অথবা, كَاتِبِيْنَ-এর সিফাত হিসেবে মানসূব অবস্থায় আছে।

৩. অথবা, নতুন বাক্য হিসেবে মারফূ' অবস্থায় আছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনের আয়াতগুলোতে দুনিয়া ধ্বংসের কথা আলোচনার সাথে সাথে আখেরাতে কৃতকর্ম উপস্থিত পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর অনুগত হয়ে আখেরাতে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা মতান্তরে আবূ শোরাইক যার প্রকৃত নাম উসাইদ ইবনে কালাদাহ নামক ধর্মদ্রোহী কাফের একবার নবী করীম ﷺ-এর অন্তরে ব্যথা দিয়েছিল। এ অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে তৎক্ষণাৎ কোনো শাস্তি দেননি, তাকে উপলক্ষ করে উপরিউক্ত يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। –[খাযেন]

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ-এর বিশদ ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'আলা নাফরমান কাফের-মুশরিককে সম্বোধন করে বলেছেন, হে কাফের! তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে কে তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, যার ফলে তুমি তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে রয়েছ?

পরম দয়ালু আল্লাহর অসীম রহমত ও অনুগ্রহ পেয়ে তাঁর প্রতি পরম কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়ে থাকা এবং তাঁর নাফরমানি করার লজ্জায় সংকুচিত হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হে মানুষ! তুমি একটি অতি বড় বিভ্রান্তিতে পড়ে চরমভাবে আত্ম প্রতারিত হয়েছ। তোমরা মনে করে বসেছ যে, তোমার যা কিছু হয়েছে তা তোমার চেষ্টারই ফল। অথচ তোমার মনে কখনো তোমার অস্তিত্ব দানকারীর অনুগ্রহ মেনে নেওয়ার চিন্তা জাগল না। এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে– তুমি দুনিয়ায় যা চাও, তাই করতে পারছ, কোনো ভুল বা পাপের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ছ না, তোমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে না, তোমার উপর বজ্রপাত হচ্ছে না, এটা তোমার আল্লাহর ঐকান্তিক অনুগ্রহ ছাড়া আর কি? কিন্তু আল্লাহর এ অনুগ্রহকে তুমি তাঁর দুর্বলতা মনে করেছ এবং এ ধোঁকায় পড়েছ যে, তোমার আল্লাহর রাজ্যে সুবিচার বলতে কিছুই নেই।

اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاِنْسَانُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য– এ ব্যাপারে দু'টি মত দেখা যায়–

১. কাফের উদ্দেশ্য। কেননা পরে كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ বলা হয়েছে।
২. সমস্ত গুনাহগার এবং কাফের اِنْسَانُ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এ অর্থটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কেননা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ খাস হলে হুকুম খাস হওয়া জরুরি নয়। –[কাবীর]
৩. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, اِنْسَانٌ বলতে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীকে বুঝানো হয়েছে।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, اَلْاِنْسَانُ বলতে এখানে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা উদ্দেশ্য।
৫. হযরত ইকরামা (র.) বলেন, উবাই ইবনে খালফ উদ্দেশ্য।
৬. ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর দ্বারা সমস্ত গুনাহগার ও কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

কে এবং কিভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়? : শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়। শয়তান এসে বলে যে, তোমার প্রভু করুণাময় দয়ালু। দুনিয়াতে তোমাকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন তদ্রূপ আখেরাতেও করবেন। অতএব মন যা চায় করতে থাক। অথবা, এমন ধরনের কিছু বলে, যাতে আল্লাহর করুণাকে পেশ হয়ে থাকে। যেমন–কোনো মানুষকে শয়তান বলেছিল– تَكَثَّرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا : سَتَلْقَى فِىْ غَدٍ رَبًّا غَفُوْرًا অর্থাৎ গুনাহ যা করতে পার শক্তি অনুযায়ী বেশি বেশি করে নাও আগামী দিন তো করুণাময়-ক্ষমাশীল প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, মানুষকে তার উপর বিজয়ী শত্রু এসে ধোঁকা দেয়–তা হলো মূর্খতা। যেমন নবী করীম ﷺ উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, غَرَّهُ الْجَهْلُ অর্থাৎ তাকে মূর্খতা-ই ধোঁকায় নিমজ্জিত করে রেখেছে। –[রূহুল মা'আনী]

তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন যে, শয়তান বনী আদমকে বিভ্রান্ত করেছে। –[নূরুল কোরআন]

ইমাম কুরতুবী (র.) আরও লিখেন যে, কারো মতে মানুষকে عَفْوُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর ক্ষমাই ধোঁকায় ফেলেছে। কেননা তিনি প্রথম অবস্থায় তাকে শাস্তি দেননি। হযরত ইবরাহীম ইবনে আশয়াস বলেন– একদা ফুযাইল ইবনে ইয়াদকে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তোমাকে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান করেন, অতঃপর প্রশ্ন করেন : مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ তুমি তখন কি বলবে? তখন সে উত্তর করল– আমি বলব, হে আল্লাহ তোমার سَتَّارٌ নামক গুণ আমাকে ধোঁকায় রেখেছে। কেননা তিনি سَتَّارٌ كَرِيْمٌ তিনিই [দোষ গোপনকারী]। –[কুরতুবী]

অন্য শব্দ উল্লেখ না করে إِنْسَانٌ উল্লেখের কারণ : যে মাখলুকের মধ্যে إِنْسَانِيَّةٌ (মনুষ্যত্বের)-এর সাথে বিরল গুণ রয়েছে, যে গুণের মাধ্যমে মানুষ পশুত্ব থেকে আলাদা হয়ে সম্মানিত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে সে গুণে নাড়া দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করতে চান। কেননা إِنْسَانٌ (মানুষ) তো إِنْسَانِيَّةٌ (মনুষ্যত্বের)-এর কারণেই হয়েছে। إِنْسَانِيَّةٌ হারিয়ে গেলে إِنْسَانٌ থাকে না। إِنْسَانِيَّةٌ থেকে নিম্নে নেমে পশুত্বে চলে আসে। এ কারণেই বলা হয়েছে أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

একজন পরিপূর্ণ মানুষকে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন? : উল্লিখিত আয়াতটি মানব সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ। পূর্ণ সৃষ্টি রহস্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটি নাপাক পানির نُطْفَةٌ তথা সূক্ষ্ম কণা-এর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যে মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তাকে একটি পূর্ণ মানবাকৃতি উপহার দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন। نُطْفَةٌ থেকে রক্তের টুকরা, রক্তের টুকরাকে গোশতের টুকরা, গোশতের টুকরাকে হাড়ে রূপান্তরিত করেছেন। সে হাড়ের চতুষ্পার্শ্বে গোশতের আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে স্থাপন করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে বিকলাঙ্গ সৃষ্টি করতে পারতেন। তা না করে মানুষকে সু-সমন্বিতভাবে তৈরি করেছেন। কোথাও কোনোও খাপছাড়া অবস্থা প্রকাশ পায়নি। সকলের অবয়ব কাঠামো এক রকম হলেও পরিচিতিতে একে অপরের সাথে মিশে যায় না। সৃষ্টির এক অপূর্ব বৈচিত্র্য এখানে ফুটে উঠেছে।

হযরত ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের তালুতে থু থু রাখলেন, তারপর তাতে আঙ্গুল ধরে বললেন-"আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বনী আদম, তুমি আমাকে কোথায় অক্ষম মনে করছ, অথচ এমনি ধরনের বস্তু হতে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি?" -[ইবনে কাছীর]

মানুষের দেহে আল্লাহর আশ্চর্যজনক কুদরত : আল্লাহ তা'আলা মানবদেহে তাঁর অসীম কুদরতের লীলা লুকিয়ে রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ আর তোমাদের নিজেদের (দেহের) মধ্যেই আল্লাহর বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা কি তা দেখতে পাওনি? বস্তুত মানুষ একটু চিন্তা করলেই তা দেখতে ও বুঝতে পারে।

এ মর্মে সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) লিখেছেন যে, সুন্দর এবং ভারসাম্যপূর্ণ এ শরীরে দৈহিক, জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমাবেশ বিদ্যমান। শরীরের মধ্যে এগুলো সুসমমণ্ডিতভাবে অবস্থান করছে। মানব শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এককেটি যন্ত্রের কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা মানবদেহকে টিকিয়ে রাখার জন্য অসংখ্য যন্ত্র দেহের মধ্যে সংস্থাপন করে দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো হাত। মানুষের হাত একটি বিস্ময়কর যন্ত্র। দুনিয়াতে অদ্যাবধি এমন কোনো যন্ত্র তৈরি হয়নি; যা হাতের সমকক্ষ হতে পারে। হাতকে ইচ্ছেমতো খোলা যায়, বন্ধ করা যায়, দ্রুত কোনো বস্তু ধরা যায়, সাথে সাথে ছেড়ে দেওয়া যায় যেমন- বই খুলতে হাতের অবদান উল্লেখ করা যাক- সহজে বই খোলা যায়, নির্দিষ্ট পাতার উপর হাত রেখে যথাযথভাবে ধরে রাখা যায়। এক পাতা হতে অন্য পাতায় যাতে সহজে যাওয়া যায়, খোলা যায়, হাত দিয়ে কলম ধরা যায়, সহজে লেখা যায়। দুনিয়ার সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করতে হলে হাতকে ব্যবহার করতে হয়। ইত্যাদি বহু কাজই হাতের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারা যায়।

فَعَدَلَكَ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : فَعَدَلَكَ শব্দটি عَدْلٌ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো- ইনসাফ, ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্য ইত্যাদি। এখানে মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন- جَعَلَكَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ مُتَنَاسِبَ الْأَعْضَاءِ لَيْسَتْ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَطْوَلَ مِنَ الْأُخْرٰى অর্থাৎ আল্লাহ তোমার সৃষ্টিকে সুষম করেছেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুসামঞ্জস্য পূর্ণ করেছেন। এমনভাবে যে, একটি হাত বা পা অন্যটি হতে দীর্ঘ নয়।

২. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন- جَعَلَكَ مُعْتَدِلًا অর্থাৎ তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।

৩. হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, "عَدَلَ خَلْقَكَ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, হস্তদয় ও পদদ্বয় সৃষ্টিতে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।

৪. হযরত আতা (র.) বলেছেন, আল্লাহ তোমার শরীরকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অতি সুন্দর ও সম্মানিত করে সৃষ্টি করা সত্ত্বেও, মানুষ চরম অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে আল্লাহর সাথে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। শয়তানও কু-প্রবৃত্তির চক্রান্তে পড়ে স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেছে।

আলোচ্য আয়াত হতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ কেন আল্লাহকে অস্বীকার করে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে? তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরকাল পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার, অবিশ্বাস করার দরুনই তারা এ দুর্নীতি অবলম্বন করেছে।

كَلَّا ব্যবহারের কারণ : ধোঁকায় পড়া থেকে বিরত থাকার জন্য كَلَّا ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এরূপ ধোঁকায় পড়ার কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। তোমার সত্তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন যে, তুমি নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারনি, তোমার পিতা-মাতাও তোমাকে সৃষ্টি করেনি; বরং এক মহাজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহ-ই তোমাকে এ পরিপূর্ণ মানবাকৃতিতে রূপায়িত করেছেন। তোমাকে জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে ভিন্নতর সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমার মস্তক অনুগ্রহ ভারে আপনা-আপনি-ই আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত হয়ে পড়াই ছিল তোমার বিবেক ও জ্ঞান বুদ্ধির ঐকান্তিক দাবি। আল্লাহর দয়ার কারণে তাঁর বিদ্রোহী হওয়া যে, কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না, তার সত্যতার সাক্ষ্য দানের জন্য তোমার নিজের স্বভাব-প্রকৃতিই যথেষ্ট। তোমার এ ভুল ধারণারও চিরতরে অবসান হওয়া আবশ্যক যে, তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে, তোমাকে পাকড়াও করার কেউ নেই।

بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ আয়াতে بَلْ-এর অর্থ : بَلْ এমন একটি হরফ যা তার পূর্ববর্তী হুকুমকে নফী করে পরবর্তী হুকুমকে সাবেত বা স্থায়ী করে। আয়াতে কারীমায় بَلْ একটি উহ্য বাক্যের হুকুমকে নফী করেছে। মূল ইবারত এভাবে হবে যে–

بَعْدَ الرَّدْعِ وَاَنْتُمْ لَا تَرْتَدُّوْنَ عَنْ ذٰلِكَ بَلْ تَجَاوَزُوْنَهُ اِلٰى مَا هُوَ اَعْظَمُ مِنْهُ مِنَ التَّكْذِيْبِ بِالدِّيْنِ وَهُوَ الْجَزَاءُ اَوْ بِدِيْنِ الْاِسْلَامِ.

অর্থাৎ তোমাদেরকে ধমক দেওয়ার পরও তোমরা ফিরে আসনি; বরং ধমক দেওয়া বস্তুকে অতিক্রম করে আরো মারাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছ, আর তা হলো বিচার দিনের অস্বীকৃতি অথবা দীন ইসলামকে অস্বীকৃতি। –[ফাতহুল কাদীর]

فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ আয়াতে مَا-এর অর্থ : مَا شَاءَ رَكَّبَكَ আয়াতাংশের مَا-এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

১. কেউ কেউ বলেন, مَا এখানে اَلشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ আয়াতের রূপ এভাবে হবে যে,
فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَا شَاءَ اَنْ يُرَكِّبَكَ فِيْهَا رَكَّبَكَ .

হযরত আবূ সালেহ এবং মুকাতিল উক্ত বাক্যের অর্থ এভাবে করেছেন–

اِنْ شَاءَ رَكَّبَكَ فِىْ غَيْرِ صُوْرَةِ الْاِنْسَانِ مِنْ صُوْرَةِ كَلْبٍ اَوْ حِمَارٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ اَوْ قِرَدَةٍ .

অর্থাৎ তিনি [আল্লাহ] যদি তোমার আকৃতিকে মানুষের আকৃতি ছাড়া কুকুর অথবা গাধা অথাব শূকর অথবা বানরের আকৃতি করতে চাইতেন [অবশ্যই করতে পারতেন]। –[কাবীর]

২. مَا অতিরিক্ত, তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তখন অর্থ এভাবে হবে যে, فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ تَقْتَضِيْهَا مَشِيْئَتُهُ وَحِكْمَتُهُ مِنَ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা এবং হিকমত বিভিন্ন আকৃতি থেকে যে আকৃতি পছন্দ করতেন [তাই তিনি করতে পারেন]। –[কাবীর]

صُوَرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : صُوَرٌ [বিভিন্ন আকৃতি] বলতে কি বুঝানো হয়েছে। এ নিয়ে ওলামায়ে মুফাসসিরীনের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যেমন–

১. বিভিন্ন আকৃতি বলতে মাতাপিতা, অথবা পিতার দিক থেকে নিকটতম ব্যক্তিবর্গ অথবা মাতার দিক থেকে নিকটতম ব্যক্তিবর্গের সাদৃশ্য হওয়া বুঝিয়েছে। তখন অর্থ এ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার আকৃতি উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের আকৃতি সদৃশ্য করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اِذَا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِى الرَّحِمِ ، اَحْضَرَهَا اللّٰهُ كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اٰدَمَ .

২. ইমাম ফাররা এবং যুজাজ (র.) বলেন, বিভিন্ন আকৃতি বলতে লম্বা-খাটো, সুন্দর-কুশ্রী এবং পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ বুঝানো হয়েছে

৩. বিভিন্ন আকৃতি বলতে বিভিন্ন অবস্থার লোকও হতে পারে। যেমন–ধনী-গরিব, সুস্থ-অসুস্থ এবং অধিক ও কম বয়সী ইত্যাদি –[কাবীর]

৪. কারো মতে, ঐ ব্যক্তি হতে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত সকলের আকৃতি সম্মুখে রাখা হয়, তারপর আকৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী অবিকল দু'টি আকৃতি কখনো দেওয়া হয় না। –[নূরুল কোরআন]

মানুষের উপর সংরক্ষকের সংখ্যা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন, যারা তাদের সাথে সব সময় থাকতে পারে, তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে, তাদের সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব রাখতে পারে। তারা এ সকল কাজ কিভাবে করে তা আমাদের জানার বাইরে। এর ধরন জানার জন্য আমরা আদিষ্ট নই। আল্লাহ-ই জানেন যে, আমরা এটা বুঝার শক্তি রাখি না। এটা বুঝা না বুঝার মধ্যে আমাদের কোনো কল্যাণ নেই। -[যিলাল]

হযরত ওসমান (রা.) একদা নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের উপর কত ফেরেশতা থাকে? নবী করীম ﷺ বললেন, বিশজন ফেরেশতা।

কেউ কেউ বলেছেন, رَحِم তথা বাচ্চাদানীতে نُطْفَة তথা বীর্য যাওয়ার সময় হতেই চরশত ফেরেশতা দেখা-শুনার জন্য নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে যারা প্রত্যেকে কৃতকর্ম রেকর্ড করেন তাঁরা হলেন, দু'জন ফেরেশতা। ভালো কাজের রেকর্ডকারী [লেখক] ডান কাঁধে এবং অন্যান্য সকল কাজ রেকর্ডকারী [লেখক] বাম কাঁধে অবস্থান করছেন। ডান কাঁধের ফেরেশতা বাম কাঁধের ফেরেশতার উপর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে আছেন। বাম কাঁধের ফেরেশতা কোনো খারাপ কাজ রেকর্ড করতে পারেন না; যতক্ষণ না ছয় ঘণ্টা অতিক্রম হয়। এ ছয় ঘণ্টার ভিতরে যদি সে খারাপ কাজকে মিটানোর মতো কোনো কাজ না হয়, তাহলে রেকর্ড হয়ে যায়। ঐ ফেরেশতাগণ সকল কিছু রেকর্ড করেন, এমনকি রোগীর আহ-উহ্ পর্যন্ত রেকর্ড করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উলঙ্গ হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তোমাদের সাথে যে সমস্ত ফেরেশতা রয়েছেন, তাদের থেকে লজ্জা করবে। লেখক ফেরেশতাগণ তিন সময় ছাড়া তোমাদের নিকট থেকে সরেন না। এ তিন সময় হলো- পায়খানা, স্ত্রী সহবাস ও গোসল করার সময়; কিন্তু এ তিন সময় লিখা থেকে বিরত হন না। এ দু'ফেরেশতা বান্দার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত থাকেন। তারপর কবরের উপর দাঁড়িয়ে তাসবীহ্ তাহ্লীল ও তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকেন। যদি মু'মিন ব্যক্তি হয়ে থাকে তাহলে এর ছওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত লিখেন। আর যদি কাফের হয় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত উভয়ে অভিশাপ দিতে থাকেন। -[রূহুল মা'আনী]

কাফেরদের সাথে সংরক্ষক আছে কিনা? : কাফেরদের সাথে সংরক্ষক ফেরেশতা আছে কিনা। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সাথে حَفَظَة বা সংরক্ষক নেই। কেননা তাদের কার্যাবলি একমুখি- হিসেব করার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণে আল্লাহ বলেছেন- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ

২. কেউ কেউ বলেন, তাদের সাথে সংরক্ষক ফেরেশতা আছেন। যেমন বলা হয়েছে-

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ . وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ . كِرَامًا كَاتِبِيْنَ . يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ .

অন্যত্র আছে وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ وَرَاءَ ظَهْرِهٖ অন্য জায়গায় বলা হয়েছে وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِشِمَالِهٖ উক্ত কয়েকটি আয়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কাফেরদেরও كِتَابٌ (আমলনামা) হবে এবং তাদের জন্য حَفَظَة বা সংরক্ষণ আছে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কাফেরের ডান কাঁধের ফেরেশতা কি লিখবে, তার তো কোনো حَسَنَة [ছওয়াব] নেই? উক্ত প্রশ্নের জবাব এটা হবে যে, বাম কাঁধের ফেরেশতা তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুই লিখবে না এবং যা লিখবে তার উপর সাক্ষ্য দিবে। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) -[কুরতুবী]

ফেরেশতাগণ কিভাবে জানবে যে, বান্দা ভালো বা খারাপের ইচ্ছা করেছে? : কোনো বান্দা মনে মনে যদি কোনো ভালো বা খারাপ কাজের নিয়ত করে তাহলে ফেরেশতা কিভাবে জানবে এবং লিখবে? এ ব্যাপারে হযরত সুফিয়ান (র.) জিজ্ঞেসিত হলে উত্তরে বললেন- বান্দা যখন ভালো কাজের নিয়ত করে, তখন ফেরেশতাগণ মৃগনাভীর (মিশকের) সুগন্ধি পায়। আর যদি খারাপ কাজের নিয়ত করে, তখন তার নিকট হতে দুর্গন্ধ পায়। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ..... كَاتِبِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের সকল কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাথে ফেরেশতাগণকে নিয়োজিত রেখেছেন।

এ দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বহীন ও লাগাম ছাড়া বানিয়ে ছেড়ে দেননি। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যায্যদাবি পর্যবেক্ষক ও পরিদর্শক নিযুক্ত করেছেন। অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তারা মানুষের ভালো বা মন্দকাজ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। মানুষের কোনো কাজই তাদের অগোচরে থাকতে পারে না।

মানুষ অন্ধকারে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে, নির্জন অরণ্যে কিংবা এমন স্থানে যেখানে কেউই দেখতে পাবে না বলে সম্পূর্ণ নিশ্চিত–কোনো পাপের কাজ করলে তাও তাদের অজানা থাকে না।

উক্ত পর্যবেক্ষক ও পরিদর্শক ফেরেশতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা كِرَامًا كَاتِبِيْنَ বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান ফেরেশতা। কারো সাথে তাদের ব্যক্তিগত ভালোবাসা বা শত্রুতা নেই। কাজেই কাউকে অকারণে সুবিধা দান অথবা কারো প্রতি অযৌক্তিক কঠোরতা অবলম্বন করে তার নামে মিথ্যা কাজের রেকর্ড তৈরি করা তাদের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। তাঁরা অবিশ্বাসীও নয়, মূল কাজ প্রত্যক্ষভাবে না দেখে নিজের ইচ্ছে মতো কারো কারো নামে লিখে দেওয়াও তাঁদের কাজ নয়। তারা ঘুষখোর ও দুর্নীতি পরায়ণও নয়। কিছু গ্রহণ করে তার বিনিময়ে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে মিথ্যা রিপোর্ট প্রদান করবেন না।

আমল লিপিবদ্ধ করার হেকমত : আল্লাহ তা'আলা তো মানুষের সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কেই অবহিত রয়েছেন। তথাপি ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আমল লিপিবদ্ধ করার হেকমত বা রহস্য কি? মুফাস্সিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। ক. যেন তাদের সামনে আমলনামা রাখলে অস্বীকার করতে না পারে। খ. এ ছাড়া 'কার্যাবলি সংরক্ষণ' করার কথা বললে মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়বে।

قَوْلُهُ تَعَالَى 'يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ' : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা যা কিছু কর তা তারা জানেন। এ ফেরেশতাগণ প্রত্যেকটি মানুষের সব করমের কাজ সম্পর্কেই সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তারা প্রত্যেক স্থানে সর্বাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই লেগে আছেন। এমনভাবে লেগে আছে যে, তারা তা টেরও পায় না। কোনো পর্যবেক্ষক বা পরিদর্শক যে তার সব কাজ দেখছে ও রেকর্ড করছে, তা বাহ্যত বুঝতে পারা যায় না। এমনকি কোন লোক কোন মনোভাব নিয়ে কি কাজ করেছে তাও তারা জানতে পারেন। এ সব কারণে তাদের তৈরি করা রেকর্ড– আমলনামা পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল। কোনো একটি কাজও তা যতই ছোট ও সামান্যই হোক না কেন–অলিখিত থাকতে পারে না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– কিয়ামতের দিন পাপীরা যখন দেখতে পাবে যে, তাদের যে আমলনামা পেশ করা হয়েছে, তাতে ছোট বা বড় কোনো কাজই অলিখিত থাকেনি, তারা যা কিছুই করেছে সবই এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে ও তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, তখন তাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না।

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ-এর উপর একটি অভিযোগ ও তার উত্তর : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা [মানুষেরা] যাই করনা কেন লেখক ফেরেশতাগণ তা অবগত আছেন।

অপর দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মনে মনে আল্লাহর জিকির করার এমন সূক্ষ্মতম অবস্থা আছে যা লেখক ফেরেশতাও জানতে পারে না– অথচ প্রকাশ্য জিকির হতে এর ফজিলত সত্তর গুণ বেশি।

এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কোনো কলবী আমল বা মনের ধ্যান-ধারণা লেখক ফেরেশতাগণের নিকটও অজানা থেকে যায়। একমাত্র আল্লাহই তা অবগত হন। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, অনেক বিষয়ে মানুষ অবগত না হলেও ফেরেশতাগণ অবগত হয়ে থাকেন। আবার এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা ফেরেশতাগণও জানেন না, একমাত্র আল্লাহই তা অবগত আছেন কারণ বহু হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নেক কাজের দৃঢ় ইচ্ছা করতেই এর ছওয়াব আমলনামায় লেখা হয়। তবে মনের কোনো কোনো অবস্থা তারা বুঝতে পারে না। মনের অবস্থার সীমা নির্ধারক মানদণ্ড আল্লাহই নির্ধারণ করতে পারেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জিকিরের ঐ বিশেষ অবস্থায় নিজেই স্বীয় কুদরতে কামেলার দ্বারা ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধকরণ ব্যতিরেকেই 'ইল্লীঈন' নামক স্থানে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। যেমন আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব কার্যকলাপই কোনো ফেরেশতা ব্যতীত নিজের কুদরতের সাহায্যেই সমাধা করতে পারেন। নেক বান্দাদের আন্তরিক জিকির বা ধ্যান অত্যন্ত প্রেমিকজনের প্রদত্ত উপহারের মতো সসম্মানে নিজ কুদরতেই রেকর্ড করেন– কোনো মাধ্যম ব্যবহার হয় না; কিন্তু বান্দার যে সমস্ত গোপন আমলের সংবাদ আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেন, শুধু সে বিষয় তারা অবগত হয়ে আমলনামায় লেখেন।

এ ছাড়া অন্য অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যা জানে না, তা আল্লাহর ফেরেশতাগণ জানেন। আর ফেরেশতাগণ অনেক বিষয় জানেন না, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানেন।

অনুবাদ :

١٣. إِنَّ الْأَبْرَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْ اِيْمَانِهِمْ لَفِيْ نَعِيْمٍ جَنَّةٍ.

১৩. নিশ্চয় পুণ্যবানগণ ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী মু'মিনগণ পরম স্বাচ্ছন্দে থাকবে বেহেশতে।

١٤. وَإِنَّ الْفُجَّارَ الْكُفَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ نَارٍ مُحْرِقَةٍ.

১৪. আর পাপাচারীগণ কাফেরগণ জাহান্নামে অবস্থান করবে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে।

١٥. يَصْلَوْنَهَا يَدْخُلُوْنَهَا وَيُقَاسُوْنَ حَرَّهَا يَوْمَ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ.

১৫. তারা তথায় প্রবিষ্ট হবে ঢুকবে ও এর উত্তাপ উপলব্ধি করবে কর্মফল দিবসে প্রতিদান দানের দিনে।

١٦. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ بِمُخْرَجِيْنَ.

১৬. তারা এটা হতে অনুপস্থিত হবে না অন্তর্হিত হতে পারবে না।

١٧. وَمَآ أَدْرَاكَ أَعْلَمَكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ.

১৭. তুমি কি জান! তোমার কি জ্ঞান আছে? কর্মফল দিবস সম্বন্ধে।

١٨. ثُمَّ مَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ تَعْظِيْمٌ لِشَأْنِهِ.

১৮. আবার বলি, তুমি কি জান! কর্মফল দিবস সম্বন্ধে এটা দ্বারা কিয়ামতের গুরুত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

١٩. يَوْمَ بِالرَّفْعِ اَيْ هُوَ يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ط مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ لَا أَمْرَ لِغَيْرِهِ فِيْهِ اَيْ لَمْ يُمَكَّنْ اَحَدٌ مِنَ التَّوَسُّطِ فِيْهِ بِخِلَافِ الدُّنْيَا.

১৯. সেদিন পেশ যোগে অর্থাৎ هُوَ يَوْمٌ তা সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করার অধিকারী হবে না উপকার হতে। সেদিন সমুদয় কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য তাতে অপর কারো জন্য কোনো কর্তৃত্ব নেই। অর্থাৎ সেখানে কারো মধ্যস্থতা থাকবে না। যেমন দুনিয়ায় হয়ে থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَصْلَوْنَهَا : يَصْلَوْنَهَا আয়াতাংশের কয়েকটি মহল্লে ই'রাব হতে পারে–

ক. এটা جَحِيْم -এর সিফাত হিসাবে মহল্লে মাজরূর হয়েছে।

খ. অথবা, فُجَّارٌ-এর সর্বনামটি হতে حَالٌ হয়েছে।

গ. অথবা, নতুন করে বাক্য শুরু হয়েছে এবং প্রশ্নকারীর একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, جَحِيْم -এ তাদের কি অবস্থা? তখন বলা হয়েছে যে, ... يَصْلَوْنَهَا।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ আয়াতাংশের يَوْم-এর মহল্লে ই'রাব :

১. আল্লামা ইবনে কাছীর ও আবূ আমর يَوْمَ -কে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। তা পিছনের يَوْمُ الدِّيْنِ হতে بَدَلٌ হবে, অথবা উহ্য মুবতাদার খবর হিসাবে رَفْع হবে।

২. আবূ আমর থেকে অন্য একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। তখন তিনি يَوْمٌ-কে তানবীন দিয়ে পড়েছেন, اِضَافَةٌ করেননি।

৩. বাকি সকল ক্বারীগণ يَوْمَ-কে فَتْحَة দিয়ে পড়েছেন। তখন يَوْمَ শব্দটি أَعْنِى ক্রিয়া অথবা أُذْكُرْ ক্রিয়ার মাফউল হবে
৪. অথবা, مَبْنِىْ عَلَى الْفَتْحِ হবে, কেননা তা একটি বাক্যের দিকে إِضَافَةٌ হয়েছে। আর এটা কূফীদের অভিমত।
৫. ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, يَوْمَ শব্দটি رَفْعٌ-এর অবস্থায় আছে; কিন্তু لَا تَمْلِكُ ক্রিয়ার দিকে إِضَافَةٌ হওয়ার কারণে مَبْنِىْ عَلَى الْفَتْحِ হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনে সমস্ত কর্মকাণ্ডের সংরক্ষণ এবং লিখার কথা আলোচিত হয়েছে। এখন তার উপর ছওয়াব এবং শাস্তির আলোচনা শুরু হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]
আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দার আমল-লেখকদের প্রশংসা করেছেন, পাশাপাশি এখন আমলকারীদের অবস্থান-অবস্থিতির কথা আলোচনা শুরু করেছেন। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ ...... لَفِيْ جَحِيْمٍ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে অতি সংক্ষেপে মু'মিন ও কাফেরদের পরকালীন পরিণামের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, যারা দুনিয়ায় পুণ্যবান হিসাবে গণ্য হয়েছে; ঈমান আনয়ন করে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন, কুফরি করেনি; কিংবা ফিসক ও নিফাকে জড়িয়ে পড়েনি। তাদের আবাস হবে জান্নাত, তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করতে থাকবে। অসংখ্য নিয়ামত লাভের পর যে মহানিয়ামত তারা লাভ করবে, তা হলো আল্লাহর দীদার। তথায় তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না। অপরদিকে যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে, তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। চিরকাল তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। তথায় তারা না বাঁচবে, না মৃত্যুবরণ করবে। তাদের চামড়া একবার পুড়ে যাওয়ার পর পুনরায় নতুন চামড়া গজিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে। শত কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও তারা কখনো কোনো ক্রমেই জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে না।

اَلْفُجَّارُ ও اَلْأَبْرَارُ দ্বারা উদ্দেশ্য : أَبْرَارٌ শব্দটি بَارٌّ-এর বহুবচন। অর্থ- পুণ্যবান, সত্যবাদী, নেককার। কুরআনে মাজীদের পরিভাষায় সৎকর্মশীল একনিষ্ঠ মু'মিনগণকে أَبْرَارٌ বলে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, যারা আল্লাহর অনুগত এবং গুনাহ করে না তাদেরকেই أَبْرَارٌ বলে।

فُجَّارٌ শব্দটি فَاجِرٌ-এর বহুবচন। অর্থ- পাপী, বদকার, দুষ্কৃতিকারী, ব্যভিচারী ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় তাদেরকে فُجَّارٌ বলে।

আলোচ্য আয়াতে فُجَّارٌ দ্বারা পাপাচারী কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেছেন, ভালো কাজ করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে তাদেরকে أَبْرَارٌ বলে।

نَعِيْمٌ এবং جَحِيْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : نَعِيْمٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো- নিয়ামত, সুখ-সম্ভোগ ইত্যাদি এবং جَحِيْمٌ-এর অর্থ হলো- প্রজ্বলিত আগুন। এখানে এতদুভয়ের দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, এখানে نَعِيْمٌ দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে এবং جَحِيْمٌ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি তথা জাহান্নামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
খ. কেউ কেউ বলেছেন, نَعِيْمٌ হলো আল্লাহর কাজে ব্যস্ত থাকা, আর جَحِيْمٌ হলো গায়রুল্লাহর কাজে মশগুল থাকা।
গ. হযরত জা'ফর সাদিক (র.) বলেছেন, نَعِيْمٌ হলো মারেফাত এবং মুশাহাদা আর جَحِيْمٌ হলো কামভাব ও কু-প্রবৃত্তির অন্ধকার।
ঘ. কারো কারো মতে, نَعِيْمٌ হলো তাওয়াক্কুল বা ভরসা এবং جَحِيْمٌ হলো লোভ-লালসা।
ঙ. কেউ কেউ বলেছেন, نَعِيْمٌ হলো اَلْقَنَاعَةُ বা অল্পে তুষ্টি এবং جَحِيْمٌ হলো লোভ-লালসা বা طَمَعٌ।

جَحِيْم ও نَعِيْم এর- لَفِىْ جَحِيْم وَلَفِىْ نَعِيْم -কে নাকেরা নেওয়ার কারণ : আল্লাহর বাণী- لَفِىْ نَعِيْم -এর অন্তর্ভুক্ত نَعِيْم শব্দটিকে تَفْخِيْم (বড়ত্ব)-এর জন্য نكره বা অনির্দিষ্ট নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা نَعِيْم তথা জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে ও জান্নাতীদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে لَفِىْ جَحِيْم-এর মধ্যে جَحِيْم-কে تَهْوِيْل [ভয়ংকরকরণ]-এর জন্য نَكِرَةْ বা অনির্দিষ্ট নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জাহান্নাম অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান এবং তথায় জাহান্নামীদের জন্য কঠোর আজাব অপেক্ষা করছে। এর মাধ্যমে কাফেরদেরকে দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

يَوْمَ الدِّيْن -কে দ্বিরুক্ত করার কারণ : কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা বুঝানোর জন্য اَلدِّيْن -কে দ্বিরুক্ত করা হয়েছে। যেমন অন্যস্থানে করা হয়েছে "اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ...." -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ : আল্লাহর বাণী وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ-এর তাফসীরে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন- এক মুহূর্তের জন্যও তারা আজাব হতে মুক্তি পাবে না এবং শাস্তির মধ্যে কোনোরূপ শৈথিল্য করা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো لَا يُفَارِقُوْنَهَا اَبَدًا অর্থাৎ তারা কখনো জাহান্নাম হতে পৃথক হতে পারবে না।

কারো কারো মতে, لَا يَغِيْبُوْنَ عَنْهَا অর্থাৎ জাহান্নাম হতে তারা অনুপস্থিত থাকতে পারবে না বা পালিয়ে যেতে পারবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, তারা দোজখে প্রবেশের পূর্বেও পালিয়ে যেতে পারবে না; বরং কবরেও তারা দোজখের আগুনের তাপ অনুভব করবে। -[ফাতহুল কাদীর]

নবী করীম ﷺ বলেছেন, কাফেরকে কবরে তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে আমি জানিনা। তখন আসমান হতে এ ঘোষণা আসবে যে, সে মিথ্যা বলেছে। তাকে আগুনের বিছানা করে দাও, আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং দোজখের দিকে তার দরজা খুলে দাও। -[নূরুল কোরআন]

وَمَا اَدْرَاكَ الخ আয়াতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী وَمَا اَدْرَاكَ الخ -এর মধ্যে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে-এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

কারো মতে, এখানে وَمَا اَدْرَاكَ الخ-এর দ্বারা কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেউ বলেন শুধু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। একদল মুফাস্সিরের মতে এখানে সাধারণভাবে সকলকেই বুঝানো হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا আয়াতাংশের মর্মার্থ : সেদিন কেউ অপর কারো কোনোরূপ উপকার করতে সক্ষম হবে না। কেউই অন্যকে তার আমলের কর্মফল লাভ হতে রক্ষা করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তিই অপরকে আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না সে তার যত নিকটেরই হোক না কেন। বস্তুত সেদিন সকলেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের উপকার করার চিন্তাও করবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, সেদিন মানুষ নিকটাত্মীয় যেমন মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হতে পৃথক হয়ে যাবে, কেউই এগিয়ে আসবে না।

قَوْلُهٗ "وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ" : সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই হবে। সেদিন কর্তৃত্বের ব্যাপারে কেউ ঝগড়া করবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ আজকের ক্ষমতা কার? একমাত্র আল্লাহর। -[কুরতুবী]

সেদিন কোনো কাফের উপকার বা শান্তির কোনো বাণী শুনতে পাবে না এবং তাদের জন্য হবে আজাব আর আজাব।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর দ্বারা এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এ সত্য প্রকাশ পাবে যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো সাহায্যকারী নেই। এমনকি কেউ আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশও করতে পারবে না। সৃষ্টির প্রথম দিনের পূর্বেও যেমন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কেউ ছিল না, ঠিক তেমনিভাবে কিয়ামতের দিনও এটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারোই কোনো অস্তিত্ব নেই। হুকুম শুধু আল্লাহ তা'আলারই। -[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ : সূরা আল-মুত্বাফ্ফিফীন

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামটি প্রথম আয়াতের لِلْمُطَفِّفِيْنَ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।
কারো মতে ত্বাফিফ অর্থ কম করা, ওজনে কম দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অবিচার করা, আমানতে খেয়ানত করা প্রভৃতি। যেহেতু অত্র সূরাতে যে সকল লোক ওজনে কমবেশি করে মানুষকে প্রতারিত করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। তাই সূরার নাম মুত্বাফ্ফিফীন রাখা হয়েছে। এতে ৩৬টি আয়াত, ১৬৯টি বাক্য এবং ৭৩০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরেক দলের মতে এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এটা মদীনায় হিজরতের পথে অবতীর্ণ হয়েছে। এ অভিমতও পাওয়া যায় যে, ২৯ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কতেকের মতে ১৩ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১ – ১২ আয়াত মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে– কুরআনের কোনো আয়াতকে বিষয় ও ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করলেই সাহাবী ও তাবেঈনগণ বলতেন এটা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ– যদি একে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ না-ও হতো। যারা এ সূরাটি মাদানী বলে অভিমত রেখেছেন, তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। যেমন শানে নুযূলে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু সে বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতের বক্তব্য জানতে পেরে মদীনার লোকগণ পরিমাপে কারচুপি করার বদ অভ্যাসকে বর্জন করেন। এটা দ্বারা এ সূরা মদীনায়ই অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ হয় না। যে অভ্যাসটির কথা বলা হয়েছে তা যেমন মদীনার লোকদের মধ্যে ছিল অনুরূপ কমবেশি মক্কায় লোকদের মধ্যেও পাওয়া যেত। অতএব, সূরার বিষয়বস্তু প্রমাণ দেয় যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। কোনো কোনো তাফসীরকার একে মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় পরকাল। প্রথম ছয়টি আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত লোকদের মধ্যে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে অবস্থিত বে-ঈমানীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা অন্যদের নিকট হতে গ্রহণকালে পুরামাত্রায় মেপে ও ওজন করে গ্রহণ করত; কিন্তু অন্যদের দেওয়ার সময় ওজন ও পরিমাপে প্রত্যেককে কিছু কম অবশ্যই দিত। বর্তমান সূরায় প্রাথমিক ছয়টি আয়াতে এর-ই প্রতিবাদ, মন্দতা ও বীভৎসতা বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য প্রকার দোষ-ত্রুটির মধ্যে এটা ছিল একটি অত্যন্ত মন্দ দোষ। একে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও উপেক্ষা এর মূল কারণ। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং কড়া-ক্রান্তি হিসাব দিতে হবে। এ বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয় মনে দৃঢ়মূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো লোকের পক্ষেই বৈষয়িক কাজকর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। সততা ও বিশ্বস্ততাকে কেউ ভালো পলিসি' মনে করে ছোটখাট ব্যাপারে এটা পালন করলেও করতে পারে এটা বিচিত্র নয়; সে-ই যখন অন্য কোনো ক্ষেত্রে বেঈমানী ও দুর্নীতিকে ভালো পলিসি মনে করবে, তখন তার পক্ষে সততা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত মানুষের চরিত্রে স্থায়ী বিশস্ততা ও সততা কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় ও পরকালের প্রত্যয়ের ফলেই আসতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় সততা ও বিশ্বস্ততা কোনো পলিসি নয়, ঐকান্তিক মানবিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এর উপর স্থায়ী ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীতে এ নীতি সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং পরকালের ভালো ও মন্দের চিন্তাই এ ব্যাপারে তাকে প্রভাবিত করে মোটকথা, পরকাল বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে অতঃপর ৭ – ১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী লোকদের আমলনামা প্রথমেই অপরাধ প্রবণ লোকদের খাতায় লিখিত হচ্ছে এবং পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে।

এরপর ১৮– ২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের অতীব উত্তম পরিণতির কথা বলা হয়েছে। সে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

পরিশেষে সৎ ও ভালো লোকদের সুখ-শান্তি আলোচনা করা হয়েছে এবং কাফেরদের কটাক্ষ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা আল-মুত্বাফ্ফিফীন তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সংরক্ষিত পানীয় পান করাবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ اَوْ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ .

১. মন্দ পরিণাম বা ধ্বংস এটা শাস্তিমূলক শব্দ কিংবা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। মাপে কম দানকারীদের জন্য,

٢. الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى اَىْ مِنَ النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ الْكَيْلَ .

২. যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় عَلٰى অব্যয়টি مِنْ অর্থে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে পরিমাপ।

٣. وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَىْ كَالُوْا لَهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ اَىْ وَزَنُوْا لَهُمْ يُخْسِرُوْنَ يَنْقُصُوْنَ الْكَيْلَ اَوِ الْوَزْنَ .

৩. আর যখন তারা মেপে দেয় অর্থাৎ নিজেদের হতে অন্যকে মেপে দেয়, অথবা ওজন করে দেয় অন্যকে ওজন করে দেয়। তখন তারা কম দেয় পরিমাপ বা ওজনে কম দেয়।

٤. اَلَا اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ يَظُنُّ يَتَيَقَّنُ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ .

৪. তবে কি ভয়প্রদর্শনকল্পে প্রশ্নবোধকের অবতারণা তারা মনে করে না বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।

٥. لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ اَىْ فِيْهِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ .

৫. মহা দিবসে অর্থাৎ মহান দিবসে, আর তা হলো কিয়ামত দিবস।

٦. يَوْمَ بَدَلٌ مِنْ مَحَلِّ لِيَوْمٍ فَنَاصِبُهُ مَبْعُوْثُوْنَ يَقُوْمُ النَّاسُ مِنْ قُبُوْرِهِمْ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الْخَلَائِقِ لِاَجْلِ اَمْرِهِ وَحِسَابِهِ وَجَزَائِهِ .

৬. যেদিন يَوْمَ শব্দটি পূর্বোক্ত لِيَوْمٍ-এর مَحَلّ হতে بَدَلٌ সুতরাং مَبْعُوْثُوْنَ-এর নসবদানকারী। মানুষ দণ্ডায়মান হবে তাদের কবরসমূহ হতে জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের, তাঁর আদেশক্রমে হিসাব ও প্রতিদান -প্রতিফল গ্রহণের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ-এর মহল্লে ই'রাব : يَوْمَ শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়ার মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। সে উহ্য ক্রিয়ার উপরে দলিল হলো مَبْعُوْثُوْنَ মূলবাক্য এভাবে হবে যে, ... يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ অথবা, لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ-এর يَوْمَ থেকে بَدَلٌ হয়েছে এবং مَبْنِىٌّ হিসাবে فَتْحٌ হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, يَوْمَ শব্দটি মহল্লে মাজরূরে রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, ظَرْف হিসেবে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ فِىْ يَوْمِ আরবি বিধান মতে يَوْمَ যখন غَيْرُ مُتَمَكِّنٌ-এর দিকে اِضَافَةٌ হয়, তখন يَوْمَ-কে মানসূব পড়তে হয়। আর যখন اِسْم

-এর দিকে إِضَافَةٌ হয়, তখন মাজরূর পড়তে হয়। যেমন বলা হয়- اَقِمْ اِلٰى يَوْمِ يَخْرُجُ فُلَانٌ (يَوْمِ-কে নসব দিয়ে), অ'র قُمْ اِلٰى يَوْمِ خُرُوْجِ فُلَانٍ [يَوْمِ-কে যের দিয়ে]।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত স্থানে আগ-পর করতে হবে। মূলবাক্য এভাবে যে-

اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

কেউ কেউ বলেন, أَعْنِىْ ক্রিয়ার মাফউল হিসাবে মানসূব হয়েছে। অথবা, মুবতাদার খবর হয়ে رَفْع-এর অবস্থায় আছে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরায় কিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহর হক আদায়ের তাকিদ করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় আখেরাতের প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে বান্দার হকের তাকিদ করা হয়েছে। কেননা বান্দার হক আদায় না করা হলে তার শাস্তি অবধারিত।

অথবা, বিষয়টিকে এভাবেও দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরায় আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে পথ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের তাকিদ রয়েছে। আর আখেরাতের প্রতি ঈমান না থাকার কারণে মানুষ বান্দার হক আদায় করে না। পরিণামে পরকালের শাস্তি হয় অবধারিত।

আলোচ্য সূরায় এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, বিশেষত যারা ওজনে ফাঁকি দেয়, ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। তাদের শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে সূরার শুরুতে। -[নূরুল কোরআন]

শানে নুযূল : ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরতের পর দেখতে পেলেন যে, মদীনার লোকেরা পরিমাপ করে নেওয়ার সময় বেশি করে নেয় আবার অন্যকে দেওয়ার সময় পরিমাপে ও ওজনে কম দেয়। এটা মদীনাবাসীদের একটি আর্থসামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাধিতে জড়িত লোকদেরকে লক্ষ্য করে অত্র আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। এতে মানুষ নিজেদের সংশোধন করে নেয় এবং এ মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হতে ফিরে আসে। -[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

খ. অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মদীনায় আগমনের পর দেখলেন যে, সেখানে আবূ জুহায়নাহ নামক এক ব্যক্তির দু'টি পাল্লা ছিল একটি দ্বারা সে লোকদের থেকে মাল বেশি করে বুঝে নিত এবং অপরটি দ্বারা লোকদেরকে কম করে মেপে দিত। তার এ অসাধু আচরণকে লক্ষ্য করে এ আয়াতগুলো নাজিল হয়।

গ. তবে সঠিক অভিমত হলো, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা মুকাররামায় মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করে নাজিল হয়। কেননা পরকালে বিশ্বাস না করার কারণে মক্কার মুশরিকরা অন্যের নিকট হতে কোনো দ্রব্য গ্রহণ করার সময় বেশি করে মেপে নিত। আবার মানুষকে দেওয়ার সময় মাপে ও ওজনে কম দিত। মোটকথা, দুর্নীতি ও ঠকানো তাদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। তাদেরকে শোধরানোর জন্য অত্র আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ...... يُخْسِرُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত কয়টিতে 'মুত্বাফ্‌ফিফীন' তথা পরিমাপে ও ওজনে কম প্রদানকারীদের অশুভ পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে, যারা পরকালের শাস্তি ও হিসাব-নিকাশের কথা ভুলে গিয়ে পরিমাপে ও ওজনে কম দেয় তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস তথা জাহান্নামের কঠোর শাস্তি। কেননা তারা অন্যের নিকট হতে পরিমাপ ও ওজন করে নেওয়ার সময় বেশি করে নেয় এবং অন্যকে দেওয়ার সময় কম করে দেয়। বস্তুত পরকাল ও হিসাব-নিকাশের প্রতি অবিশ্বাসই তাদেরকে এহেন দুর্নীতি ও অনাচারে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় মাপে ও ওজনে কম করার তিরস্কার করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে বিন্দুমাত্র কমবেশি না করে ওজন বা পরিমাপ করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। সূরা-আল আনআম-এ বলা হয়েছে-"ইনসাফ সহকারে পুরোপুরি পরিমাপ কর, ওজন কর। আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেইনি।"

সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে- 'যখন পরিমাপ করবে, পুরামাত্রায় পরিমাপ কর, আর নির্ভুল দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর।" সূরা আর-রাহমান-এ তাগিদ করা হয়েছে- "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিক ও ইনসাফ সহকারে ওজন কর এবং পাল্লায় ত্রুটি রেখো না।" শুয়াইব জাতির উপর যে অপরাধের জন্য আজাব নাজিল হয়েছিল, তা এই ছিল যে, তাদের মধ্যে ওজনে মাপে কম করার রোগ সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত শুয়াইব (আ.) -এর বারংবার উপদেশ নসিহতেও তাঁর জাতি এ অপরাধ পরিত্যাগ করেনি।

وَيْلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : وَيْلٌ শব্দটি আরবি ভাষায় কারো ধ্বংস, অনিষ্ট ও মন্দ কামনার একটি বাগধারা বিশেষ। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যখন এ শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন পরিণতি মন্দ হওয়ার নিশ্চয়তার কোনো সন্দেহ থাকে না। এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 'ধ্বংস'। কেউ কেউ বলেছেন- জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম হচ্ছে 'ওয়াইল'। কুরআন মাজীদের কোনো কোনো আয়াতে যেমন- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় কতিপয় তাফসীরকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এটা দ্বারা জাহান্নামের অতিশয় নিকৃষ্ট একটি স্থানের কথা বলা হয়েছে। আমরা কথায় যেরূপ বলে থাকি- ধ্বংস হোক, নিপাত যাক, তেমনি আরবি ভাষারও অনিষ্টতা ও ধ্বংস কামনায় وَيْلٌ বলা হয়। আফসোস ও অনুশোচনার অর্থেও এটা বলা হয়। কেননা যাদের ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে জানা যায় তাদের সম্পর্কেই অনুশোচনা প্রকাশ করা হয়।

আল্লামা শাওকানী (র.) লিখেন, وَيْلٌ দ্বারা এখানে কঠিন শাস্তি, অথবা স্বয়ং আজাব অথবা কঠিন মন্দকে বুঝানো হয়েছে।
-[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمُطَفِّفِيْنَ-এর অর্থ : مُطَفِّفِيْنَ শব্দটি تَطْفِيْف শব্দ হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- হীন, তুচ্ছ, ছোট, অপূর্ণ, কম। আর আরবি পরিভাষায় বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দেওয়া এবং ক্রয়ের সময় ওজনে বেশি আনাকে বলা হয় تَطْفِيْف আলোচ্য শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর ইসমে ফায়েলের বহুবচন। সুতরাং এর অর্থ হবে- যারা হাতের সাফাই দেখিয়ে গ্রাহকগণকে কম দেয় এবং মেপে আনতে বেশি আনে, অথচ গ্রাহক অথবা বিক্রেতা এর কিছুই জানতে পারে না। মোটকথা, পরিমাপে কারচুপিকারীদেরকে আরবিতে মুত্বাফফিফীন বলা হয়।

'তাত্বফীফ' একটি সামাজিক ব্যাধি : ওজনে কারচুপি একটি সামাজিক অপরাধ। কেননা এর দ্বারা মানুষের অলক্ষ্যে তাদের সম্পদ চুরি করা হয় এবং বান্দার হক নষ্ট করা হয়। বান্দার হক নষ্ট করা হলে তা বান্দা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলারও ক্ষমা করেন না। এ কারণেই ইসলাম এ কাজটিকে জঘন্যতম পাপরূপে ঘোষণা দিয়েছে। কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই ওজনে কারচুপি না করা এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। যেমন সূরা আল-আন'আমে বলা হয়েছে-ন্যায়-নীতি সহকারে পুরোপুরিভাবে মাপ ও ওজন কর, আমি কোনো লোকের উপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপাইনি। (১৫২ আয়াত) সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- "যখন পরিমাপ করবে, পুরোমাত্রায় কর এবং নির্ভুল দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর।" সূরা আর-রাহমানের ৮৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না; ঠিক ঠিক ও ন্যায়নীতির সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় ত্রুটি রেখো না।" হাদীস শরীফেও ওজনে কারচুপির ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

হযরত নাফে' (র.) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বাজারে দোকানদারদের নিকট দিয়ে গমনকালে তাদেরকে বলতেন, ওগো! ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলবে ও ওজনে পুরোপুরি আদান-প্রদান করবে, কেননা পরিমাপে কারচুপিকারীগণ কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে এত দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবে যে, দেহের ঘাম তাদের মুখ পর্যন্ত উপনীত হবে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর যুগে ওজনে কারচুপি করার একটি সাধারণ প্রবণতা ছিল। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন মারাত্মক পাপাচার হতে বিরত থাকার জন্য বারবার তাকিদ করলেন; কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলেন। সুতরাং ইসলামও এ পাপাচারকে মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিরূপে গণ্য করে তা হতে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। ওজনে কম দেওয়া ও মাপে বেশি আনা, অল্প হোক বা বেশি, উভয়ই আল্লাহর ঘোষিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। অল্প হলে এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না, বেশি হলে হবে- এমন নয়। বরং কমবেশি সকল ধরনের কারচুপিই এর মধ্যে শামিল। আল্লাহর নিকট তওবা করে যথাস্থানে এ হক প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত এ পাপ ক্ষমা হওয়ার কোনো আশা নেই। এটা মারাত্মক কবীরা গুনাহের পর্যায়ভুক্ত। কেননা যে সমাজে এর প্রাদুর্ভাব থাকে, সে সমাজের নৈতিক অবক্ষয় যে কত চরমে পৌঁছে তা বলাই বাহুল্য। সে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং কোনো দিনই উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটি তেলাওয়াত করে মদীনাবাসীদেরকে বলেছেন-তোমরা জেনে রাখো, পাঁচটি পাপের কারণে পাঁচটি আজাব নাজিল হয়- ১. সামগ্রিকভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে শত্রুদেরকে তাদের উপর প্রবল করা হয়, ২. ঘুষ গ্রহণের ফলে দরিদ্রতা আসে, ৩. যে জাতি ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদের প্রতি মৃত্যুর আজাব আসবে, ৪. কোনো জাতি জাকাত বন্ধ করলে রহমতের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, ৫. পরিমাপে কারচুপি করলে শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। -[আযীযী]

"اِكْتَالُوْا"-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : "اِكْتَالُوْا" এটা جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٍ-এর সীগাহ। বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اِكْتِيَالٌ মূল অক্ষর হলো (ك ـ ى ـ ل) জিনসে اَجْوَفْ يَائِىْ।

اِكْتِيَالٌ শব্দটি যখন عَلٰى-এর দ্বারা মুতা'আদ্দী হয় তখন এটা অন্যের নিকট হতে ওজন করে নেওয়ার অর্থ প্রদান করে। এ জন্য মুফাস্‌সিরগণ এখানে عَلٰى-কে مِنْ-এর অর্থে করেছেন অর্থাৎ عَلَى النَّاسِ এখানে مِنَ النَّاسِ-এর অর্থে হয়েছে। আরবি ভাষায় اِكْتَلْتُ مِنْكَ এবং اِكْتَلْتُ عَلَيْكَ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মোটকথা, তারা যখন অন্যের নিকট হতে নিত তখন বেশি নিত, আর যখন অন্যদেরকে পরিমাপ করে দিত তখন কম করে দিত। -[কুরতুবী]

كَالُوْا এবং وَزَنُوْا-এর উপর ওয়াকফ করা প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী كَالُوْا ও وَزَنُوْا-এর মধ্যে ওয়াকফ করা হবে কিনা-এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. কোনো কোনো মুফাসসির كَالُوْا এবং وَزَنُوْا-এর মধ্যে ওয়াকফ করে পড়েছেন। কেননা উভয় هُمْ পূর্ববর্তী كَالُوْا ও وَزَنُوْا-এর মধ্যকার যমীরে মুসতাতির বা উহ্য যমীর হতে بَدَلٌ হয়েছে এবং তাকিদ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. ইমাম যুজাজ (র.) বলেছেন, كَالُوْا ও وَزَنُوْا-এর মধ্যে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই; বরং هُمْ-কে তাদের সাথে যুক্ত করে পড়তে হবে।

শেষোক্ত মতটিই এখানে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এমতাবস্থায় লামকে উহ্য মানা হবে। মূল ইবারত হবে اِذَا كَالُوْا لَهُمْ এবং وَزَنُوْا لَهُمْ যেমন نَصَحْتُكَ বাক্যটি نَصَحْتُ لَكَ-এর অর্থে হয়ে থাকে। -[কুরতুবী]

يَظُنُّ অর্থ কি এবং কেন নেওয়া হয়েছে? : يَظُنُّ শব্দটি ظَنٌّ হতে فِعْل مُضَارِع-এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ-এর সীগাহ এখানে ظَنٌّ অর্থ يَقِيْن বা দৃঢ় বিশ্বাস। মূলবক্তব্য এই হবে যে, اَلَا يُوْقِنُ اُولٰئِكَ وَلَوْ اَيْقَنُوْا مَا نَقَصُوْا فِى الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ অর্থাৎ তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না? যদি দৃঢ় বিশ্বাস করত তাহলে অবশ্যই মাপে কম দিত না।

কেউ কেউ বলেন, ظَنٌّ অর্থ تَرَدُّدٌ তথা ধারণা-সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা। মূলবক্তব্য এই হবে যে, اِنْ كَانُوْا لَا يَسْتَيْقِنُوْنَ بِالْبَعْثِ فَهَلَّا ظَنُّوْهُ حَتّٰى يَتَدَبَّرُوْا وَيَبْحَثُوْا عَنْهُ وَيَأْخُذُوْا بِالْاَحْوَطِ অর্থাৎ যদি তারা পুনরুত্থানকে দৃঢ় বিশ্বাস না-ই করে, (ধারণা তো করতে পারে) তবে তারা কেন ধারণা করে না? ধারণা করলে তো কিছু চিন্তাভাবনা করতে পারত এবং গবেষণা করে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারত। -[ফাতহুল কাদীর]

اُولٰئِكَ-এর উল্লেখের তাৎপর্য : এখানে اُولٰئِكَ দ্বারা পরিমাপ ও ওজনে কম প্রদানকারী তথা مُطَفِّفِيْنَ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশ্য তাদেরকে বুঝানোর জন্যই هُمْ-এর উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল। তথাপি এরপর اُولٰئِكَ-কে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, هُمْ শব্দটি تَخْصِيْص বুঝায় না পক্ষান্তরে اُولٰئِكَ-এর দ্বারা تَخْصِيْص বা নির্দিষ্টকরণ বুঝানো হয়ে থাকে।

يَوْمٌ عَظِيْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য এবং একে يَوْمٌ عَظِيْمٌ বলার কারণ : এখানে يَوْمٌ عَظِيْمٌ-এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। একে يَوْمٌ عَظِيْمٌ বা মহা দিবস বলার কারণ হচ্ছে- এ দিন সমস্ত মানুষ ও সমস্ত জীবের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর আদালতে একই সময় গ্রহণ করা হবে এবং শাস্তি ও পুরস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা করা হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, কিয়ামতের দিনকে মহা দিবস বা বড় দিন এ জন্য বলা হয়েছে যে, উক্ত দিনটি অনেক বড় হবে এবং পুনরুত্থান হিসাব-নিকাশ শাস্তি, বেহেশতবাসীর বেহেশতে প্রবেশ এবং দোজখবাসীর দোজখে প্রবেশ ইত্যাদির মতো বড় বড় কাজ এদিনে সংঘটিত হবে।

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা : একদিন হযরত ইবনে ওমর (রা.) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ তেলাওয়াত করতে করতে يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ পর্যন্ত পৌঁছে কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেলেন। সামনে আর পড়তে পারেননি। তারপর তিনি বললেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যেদিন সকল মানুষ প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে, সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, সেদিন ঘাম কারো টাখনু গিরা পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো বক্ষ পর্যন্ত, কারো দু'কান পর্যন্ত, এমনকি কেউ কেউ ব্যাঙের ন্যায় ঘামের ভিতর ডুবে যাবে। -[কুরতুবী]

হযরত মেকদাদ (রা.) বলেছেন, আমি নিজে হুযূর ﷺ-এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের অতি নিকটে চলে আসবে এমনকি তা এক মাইলের দূরত্বে থাকবে।

আহমদ এবং তাবরানী হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন- সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর চেয়ে কঠিন কোনো কষ্ট মানুষ ভোগ করে না। তবে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার চেয়ে মৃত্যু অনেক সহজ। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থায় মানুষের ঘাম হবে আর সে ঘাম মুখের লাগামে রূপান্তরিত হবে। মানুষের দেহ নিঃসৃত এ ঘামের মধ্যে যদি কেউ নৌকা চালাতে চায় তবে তা চলবে। -[নূরুল কোরআন]

পক্ষান্তরে আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ এ ভয়াবহ আজাবে নিপতিত হবেন না; বরং তারা তখন স্বর্ণ নির্মিত আসনে; মেঘের ছায়াতলে থাকবেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, মু'মিনদের জন্য সেদিনটি এক ঘণ্টার সমান হবে- اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -[নূরুল কোরআন]

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতে লোকদের দণ্ডায়মান হওয়া দ্বারা কি উদ্দেশ্য ? : আল্লাহর বাণী يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ -এর মধ্যে লোকদের দাঁড়ানো দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে-এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন

ক. সেদিন মানুষ প্রতিফল লাভের উদ্দেশ্যে বা হিসাব নিকাশের উদ্দেশ্যে অথবা ফয়সালার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে।

খ. কারো মতে, সেদিন মারাত্মক ঘর্মাক্ত অবস্থার (গরম ও ঘর্মের) কারণে দণ্ডায়মান হবে।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, বান্দার হক দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হবে।

ঘ. কারো কারো মতে, এটা দ্বারা রাসূলগণের দণ্ডায়মান হওয়া উদ্দেশ্য। বিচার ফয়সালার উদ্দেশ্যে তাঁরা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

٧. كَلَّا حَقًّا إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ أَيْ كُتُبَ أَعْمَالِ الْكُفَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ قِيْلَ هُوَ كِتَابٌ جَامِعٌ لِأَعْمَالِ الشَّيَاطِيْنِ وَالْكَفَرَةِ وَقِيْلَ هُوَ مَكَانٌ أَسْفَلَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَهُوَ مَحَلُّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ.

৭. কখনো নয় অবশ্যই পাপিষ্ঠদের কর্মলিপি অবশ্যই অর্থাৎ কাফেরদের কর্মলিপিসমূহ সিজ্জীনে কারো মতে তা হলো, শয়তান ও কাফেরদের কর্মলিপি সম্বলিত গ্রন্থ। আর কারো মতে তা সপ্তম জমিনের নিম্নে একটি স্থানের নাম। যা শয়তান ও তার সহযোগীদের অবস্থানক্ষেত্র।

٨. وَمَا أَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ مَا كِتَابُ سِجِّيْنٍ.

৮. সিজ্জীন সম্বন্ধে তুমি কি জান! সিজ্জীন গ্রন্থটি কি?

٩. كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ مَخْتُوْمٌ.

৯. এটা চিহ্নিত লিপি মোহরযুক্ত।

١٠. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

১০. সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের জন্য ।

١١. الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لِلْمُكَذِّبِيْنَ.

১১. যারা কর্মফল দিবসকে অসত্যারোপ করে প্রতিফল, এটা مُكَذِّبِيْنَ হতে بَدَلٌ কিংবা এর بَيَانٌ ।

١٢. وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مُتَجَاوِزِ الْحَدِّ أَثِيْمٍ صِيْغَةُ مُبَالَغَةٍ.

১২. আর একে অস্বীকার করে না, কেবলমাত্র প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী সীমা অতিক্রমকারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি أَثِيْمٍ শব্দটি مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ।

١٣. إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ أٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ الْحِكَايَاتُ الَّتِيْ سُطِرَتْ قَدِيْمًا جَمْعُ أُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ أَوْ إِسْطَارَةٍ بِالْكَسْرِ.

১৩. যখন তার নিকট পঠিত হয় আমার আয়াতসমূহ কুরআন তখন সে বলে, এটা পূর্ববর্তীদের রূপকথা পুরানো দিনের গল্প কাহিনী, أَسَاطِيْرُ শব্দটি পেশ যোগে أُسْطُوْرَةٌ অথবা যের যোগে إِسْطَارَةٌ -এর বহুবচন। .

١٤. كَلَّا رَدْعٌ وَ زَجْرٌ لِقَوْلِهِمْ ذٰلِكَ بَلْ سكته رَانَ غَلَبَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَغَشِيَهَا مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِيْ فَهُوَ كَالصَّدَاءِ.

১৪. না, কখনো এরূপ নয় তাদের এ কথার প্রতি অস্বীকার ও শাসানো, বরং তাদের অন্তরে জঙ ধরেছে প্রাধান্য বিস্তার করে আচ্ছন্ন করেছে তাদের কৃত কর্মসমূহ পাপসমূহ কাজেই এটা জঙতুল্য হয়েছে।

١٥. كَلَّا حَقًّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَحْجُوْبُوْنَ فَلَا يَرَوْنَهُ.

১৫. না অবশ্যই নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালক হতে সেদিন কিয়ামতের দিন অন্তরিত থাকবে সুতরাং তারা তাঁকে দেখবে না।

١٦. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ لَدَاخِلُوا النَّارِ الْمُحْرِقَةِ.

১৬. অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে জ্বলন্ত ও দাহনকারী আগুনে প্রবেশ করবে।

١٧. ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ هٰذَا اَىِ الْعَذَابُ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ.

১৭ অতঃপর বলা হবে তাদেরকে এটাই অর্থাৎ এ শাস্তিই যা তোমরা অস্বীকার করতে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ-এর মহল্লে ই'রাব : اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ-এর কয়েকটি মহল্লে ই'রাব হতে পারে।

১. মহল্লে মাজরুর অর্থাৎ পিছনের اَلْمُكَذِّبِيْنَ-এর সিফাত হিসাবে মাজরুর হয়েছে।

২. অথবা, اَلْمُكَذِّبِيْنَ হতে بَدَلْ হয়েছে।

৩. অথবা নতুন বাক্য হিসাবে مَرْفُوْعٌ-এর মহল্লে আছে।

৪. অথবা, ذَمٌّ হিসাবে, مَنْصُوْبٌ-এর মহল্লে আছে। -[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনে আল্লাহ তা'আলা মুত্বাফ্‌ফিফীন তথা মাপে কমবেশি করার প্রবণতা যাদের রয়েছে, তাদের ধ্বংসের কথা আলোচনা করেছেন। এখন তাদের পরিণামের সাথে সাথে আহকাম আলোচনা করেছেন। -[কাবীর]

পুনরুত্থান এবং হিসাব-নিকাশ থেকে যারা সম্পূর্ণ বে-খবর হয়ে মাপে কমবেশি করার মতো অন্যান্য ঘৃণ্যতম কাজে লিপ্ত, তাদের জন্য হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

প্রথম ধাপে আল্লাহ তা'আলা মুতাফ্‌ফিফীনদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যারা মাপে কমবেশি করে তাদের নাম রেখেছেন মুত্বাফফিফীন, এখানে তাদেরকেই ফুজ্জার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মাপে কমবেশি করে তারা ফুজ্জারদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা আছে কিনা বাস্তব জীবনে তাদের অবস্থান কোথায় এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হলে তাদের অবস্থা কি হবে তারই আলোচনা শুরু হয়েছে। -[যিলাল]

مَا يُكَذِّبُ بِهٖ ...... اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ ও আবূ জাহল সম্পর্কে উক্ত আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, তারা বলত যে, কুরআন তো অতীতের অলীক কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমনকি ওলীদ বলত তোমরা কুরআন না শুনে আমার নিকট একত্রিত হও, আমি তোমাদেরকে কুরআন অপেক্ষা উত্তম কাহিনী শুনাবো। [না'উযুবিল্লাহ]

كَلَّا-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : كَلَّا শব্দটি حَرْفُ رَدْعٍ; এর দ্বারা ধমকি, হুমকি, তিরস্কার ও প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বুঝানো হয়। পূর্ববর্তী বাক্যের ভাবকে অস্বীকার করে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে সাধারণত এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এখানে كَلَّا-এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কাফেররা কুরআন ও রাসূল ﷺ সম্পর্কে বহু অবাঞ্ছিত কথা বলে বেড়াত। তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের কথা মোটেই সঠিক নয়; বরং তাদের অন্তরে পাপের কারণে মরিচা পড়ে গেছে বিধায় তারা এরূপ বলে বেড়াচ্ছে।

কারো মতে, كَلَّا শব্দটি এখানে حَقًّا-এর অর্থে হয়েছে- حَقًّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ অর্থাৎ সত্যিই নিঃসন্দেহে কাফের ও ফাজিরদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে।

দুনিয়াতে এ ধরনের অপরাধ করার পর তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে এবং কোনোদিনই তাদেরকে আল্লাহর সামনে জাবাবদিহি করতে হবে না বলে তাদের মনে যে ধারণা হয়েছে তা আদৌ সত্য ও নির্ভুল নয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

سِجِّيْنٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতগুলোতে سِجِّيْنٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'বে আহবার (রা.) -এর নিকট 'পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে'– এ [illegible] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন– জাবাবে তিনি বললেন, পাপীদের আত্মা আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়; কিন্তু আকাশ তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর তাকে ভূপৃষ্ঠে নিয়ে আসা হলে ভূ-পৃষ্ঠও তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে; অতঃপর জমিনের সপ্তম স্তরের নিম্ন দেশে সিজ্জীনে একে রাখা হবে যেখানে ইবলীস ও তার সেনাবাহিনী অবস্থান করে। তারপর সিজ্জীন হতে এদের জন্য পাতলা একখানা চামড়া বা কাগুজে বস্তু বের করে তাতে আমল লেখা হয় এবং সুদৃঢ়ভাবে একটি পাত্রে মোহর করে শয়তানের সৈন্যদের নিম্নদেশে রাখা হয়। যাতে তারা বুঝতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এর বাহক জাহান্নামী হবে।

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, سِجِّيْنٌ অর্থ কয়েদখানা, কারাগার। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ হবে তাদের আমলনামা কয়েদখানায় আটক করা হয় বা অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে রাখা হয়।

কারো কারো মতে, سِجِّيْنٌ দ্বারা সপ্তম জমিনের সর্বশেষ স্তরে অবস্থিত একটি পাথরকে বুঝানো হয়েছে। সে পাথরটিকে উল্টিয়ে এর তলদেশে কাফেরদের আমলনামা রেখে দেওয়া হয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, সপ্তম জমিনের সর্বশেষ স্তরকে সিজ্জীন বলে, তথায় কাফেরদের আত্মা [মৃত্যুর পর] অবস্থান করে।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সপ্তম জমিনের সর্বশেষ স্তরের নিচে সিজ্জীন অবস্থিত, আর আকাশের উপর আরশের নিম্ন দেশে 'ইল্লিয়্যীন' অবস্থিত।

কারো কারো মতে, سِجِّيْنٌ এটা سِجْن হতে নির্গত। এর মূল অর্থ কয়েদখানা। কুরআনে কারীমে [এরপর] এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা হতে জানা যায় যে, যে খাতা বইতে দণ্ডযোগ্য লোকদের আমলনামা লিখিত হয় তাকেই সিজ্জীন বলা হয়েছে। –[খাযেন, কুরতুবী]

আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সিজ্জীন হলো দোজখের একটি স্তর যা জমিনের সপ্তম স্তরের নিম্নদেশে রয়েছে। যেভাবে মু'মিনদের রূহ ইল্লিয়্যীনে চলে যায়। ঠিক তেমনিভাবে কাফের ও পাপিষ্ঠদের রূহ সিজ্জীনে চলে যায়। –[নূরুল কোরআন]

كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ -এর অর্থ : আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, أَيْ مَكْتُوْبٌ كَالرَّقْمِ فِي الثَّوْبِ لَا يُنْسٰى وَلَا يُمْحٰى 'কাপড়ে নম্বর লাগানোর মতো লিখিত যা ভুলানো যায় না এবং মিটানো যায় না।' হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, ফুজ্জারদের [পাপীদের] একটি সংখ্যা রয়েছে, এ সংখ্যায় কেউ যেমন যোগ করতে পারবে না, তেমনি কমাতেও পারবে না। হযরত যাহ্হাক (র.) বলেন, مَرْقُوْمٌ হিমইয়ারী ভাষায় مَخْتُوْمٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ مَخْتُوْمٌ বা মোহর লাগানো অবস্থায়। মূলত اَلرَّقْمُ অর্থ اَلْكِتَابَةُ বা লিখা। –[কুরতুবী, কাবীর]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ -এর অর্থ : উক্ত আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. উক্ত আয়াতটি পিছনের يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তখন অর্থ হবে– যেদিন সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে, সেদিন পাপী, আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

২. পিছনের مَرْقُوْمٌ শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন তারা হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠ হবে। তারপর-ই বলা হয়েছে وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ সেদিন (কিয়ামতকে) অস্বীকারকারীর জন্য ধ্বংস নেমে আসবে। –[কাবীর]

مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ -এর অর্থ : আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, أَيْ فَاجِرٌ جَائِرٌ مُتَجَاوِزٌ فِي الْإِثْمِ مُنْهَمِكٌ فِيْ أَسْبَابِهِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ এর অর্থ– পাপী, দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী, পাপে সীমালঙ্ঘনকারী এবং পাপকার্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে লিপ্ত।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, হক থেকে বিচ্যুত, মানুষের সাথে ব্যবহারে সীমালঙ্ঘনকারী এবং নিজের নফসের সাথে গাদ্দারকে مُعْتَدٍ বলা হয়েছে। আর এমন ব্যক্তিই আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষায় اَثِيْمٍ মহাপাপী।

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেন, সীমালঙ্ঘন এবং পাপ মানুষকে কিয়ামত অস্বীকারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এমনকি কুরআনের সাথে তারা বেআদবি করতে থাকে এবং বলে, إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ অর্থাৎ কুরআন মাজীদ তো পুরানো যুগের কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

تُتْلٰى শব্দে বর্ণিত দু'টি কেরাত : জমহুর কারীগণ দু'টি تَاء দিয়ে পড়েছেন। আবূ হাইয়াহ, আবূ সিমাক, আশহাবুল উকাইলী এবং সুলামী প্রথম تَاء-এর স্থলে يَاء পড়েছেন। –[কুরতুবী]

أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ -এর অর্থ : أَسَاطِيْرُ শব্দটি أُسْطُوْرَةٌ বা إِسْطَارَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ– কিচ্ছা-কাহিনী। আর أَوَّلِيْنَ এটা أَوَّلٌ-এর বহুবচন, অর্থ– প্রথম, এখানে এর দ্বারা পূর্ববর্তীগণ উদ্দেশ্য। أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ অর্থ– أَحَادِيْثُهُمْ وَأَبَاطِيْلُهُمُ الَّتِيْ زَخْرَفُوْهَا অর্থাৎ এমন কতগুলি গল্প এবং বানানো কথা যা তারা সুন্দর করে সাজিয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

পূর্বেকার মিথ্যা কথার সমষ্টি, পূর্বেকার ইতিকথা, (তাদের বক্তব্য অনুযায়ী) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের সামনে উত্থাপন করেছেন। –[কাবীর]

رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কৃতকর্মের জাগতিক প্রতিফলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তারা যে আমার আয়াতসমূহকে পূর্বকালের রূপকাহিনী বলে থাকে এর কারণ হলো তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তঃকরণে মরিচা ধরেছে। ফলে তারা আসল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না এবং অন্তরের গভীরে আমার আয়াত প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। পাপাচার ও গুনাহের কারণে মানুষের অন্তঃকরণে জং ধরে যায়। যার কারণে দীনের দিকে মানুষের মন ধাবিত হয় না এবং নেককাজ করতে ইচ্ছা হয় না। এ কারণেই মহানবী ﷺ অন্তরের জং ও মরিচা পরিষ্কার করার তাকিদ দিয়েছেন। কেননা এর দরুন তার মন-মেজাজ ও চিন্তাধারা এমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়– কুফর ও সীমালঙ্ঘনের কাজকেই সে মনোমুগ্ধকর ও ভালো কাজ ভাবতে থাকে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'বান্দা যখন কোনো গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরে একটি রেখাপাত হয় এবং কঠিন দাগ পড়ে। তখন সে গুনাহের দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করলে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। পুনরায় গুনাহ করলে অন্তঃকরণে তা আরো অধিকতর গাঢ় ও কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এহেন প্রভাবকেই আল্লাহ তা'আলা رَانَ [জং মরিচা] বলে উল্লেখ করেছেন।' [তিরমিযী] কিছু সংখ্যক তাফসীরকার উপরিউক্ত رَانَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এটা দ্বারা উপর্যুপরি গুনাহ করার কারণে অন্তঃকরণ মরে যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

কতিপয় তাফসীরকারের মতে, গুনাহের কারণে অন্তঃকরণে কালো দাগ কাটার কথা বুঝানো হয়েছে। মানুষের অন্তরে যে মরিচা ও জং ধরে যায় তা এ কালো দাগের তুলনায় অনেক কঠিন। কেউ কেউ এ অভিমত রেখেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতে رَانَ শব্দ দ্বারা অন্তরের উপর একটি পর্দা ও আবরণ পড়ার কথা বুঝানো হয়েছে, যার ফলে এর গভীরে কোনো কিছু পৌঁছতে পারে না। আর এ অবস্থাকেই অন্তঃকরণ মরে গেছে বলে বুঝানো হয়।

সারকথা, সব কিছুর মূল হলো অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণকে মরিচামুক্ত রাখতে পারলেই তাতে সত্যের আলোক-রেখা পতিত হয় এবং এর আলোকে অন্তকরণ উদ্ভাসিত হলে সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। ফলে মানুষ আল্লাহর পথের পথিক হয়। এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন–মানুষের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা পবিত্র ও সজীব থাকলে মানুষের গোটা দেহটিই সুস্থ ও সজীব থাকে। আর এর মলিনতার কারণে গোটা দেহটিই খারাপ হয়। এরই নাম হলো অন্তঃকরণ বা কলব।

বস্তুত এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অন্তঃকরণের সজীবতা ও সুস্থতাই ঈমান ও নেক আমলের পূর্বশর্ত। ঈমানদার ও পুণ্যবান হওয়ার জন্য অন্তঃকরণকে মরিচামুক্ত ও সুস্থ রাখতে হবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'প্রত্যেকটি বস্তুর পরিষ্কারের যন্ত্র রয়েছে। অন্তঃকরণ পরিষ্কারে যন্ত্র হলো আল্লাহর জিকির।' মহানবী ﷺ-এর এ প্রতিশেধকের ব্যবহার দ্বারাই অন্তঃকরণকে সজীব ও সুস্থ রাখা যায়।

رَانَ -এর অর্থ : رَانَ শব্দটি وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْفْ বাবে فَتَحَ এটা رَيْنٌ হতে গৃহীত। অর্থ– মরিচা পড়া, জং ধরা। কেউ কেউ বলেন, رَانَ অর্থ গুনাহের উপর গুনাহ করা যার কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়।

রব হতে আড়াল থাকার অর্থ : উপরিউক্ত ১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, মহাবিচারের দিন কাফেরগণ তাদের প্রতিপালকের দর্শন হতে আড়ালে থাকবে। তাফসীরকারগণ এ আড়ালে থাকা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো, সেদিন তাদের আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ লাভ না করা। অন্যরা বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ সেদিন তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিপাত করবেন না এবং গুনাহ হতেও পবিত্র করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মত হলো, কাফেরগণ সেদিন আল্লাহর দর্শন হতে পর্দার আড়ালে থাকবে এটাই সঠিক ও বিশুদ্ধ কথা। –[খাযেন]

কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে কিনা? : কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে কিনা– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। জমহুরের মতে, শুধু মু'মিনগণই কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবেন। তাঁর দীদার লাভ করতে পারবেন। কেউ কেউ বলেছেন, মু'মিন ও মুনাফিকরা কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। কারো কারো মতে, মু'মিন, কাফির ও মুনাফিক সকলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে।

প্রথমোক্ত মতটিই এখানে গ্রহণযোগ্য। কেননা হাদীস হতে এটাই জানা যায়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ فِىْ لَيْلَةِ الْبَدْرِ অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রে তোমরা যেরূপ চন্দ্রকে দেখতে পাও, সেরূপ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। তা ছাড়া আল্লাহর দীদার সর্বাধিক বড় নিয়ামত যা কাফের ও মুনাফিকরা লাভ করতে পারে না।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, সেদিন মু'মিন নেককার বান্দাগণের মধ্যে এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে যে আড়াল রয়েছে তা সরিয়ে দেওয়া হবে। কাফেরদেরকে পর্দার পেছনে ফেলে দেওয়া হবে। কাফেররা সেদিন শুধু যে দীদারে এলাহী থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয়; বরং তারা কঠোর ও কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। –[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

١٨. كَلَّا حَقًّا إِنَّ كِتٰبَ الْأَبْرَارِ أَيْ كِتٰبَ أَعْمَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْ إِيْمَانِهِمْ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ قِيْلَ هُوَ كِتَابٌ جَامِعٌ لِأَعْمَالِ الْخَيْرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمُؤْمِنِي الثَّقَلَيْنِ وَقِيْلَ هُوَ مَكَانٌ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ .

১৮. অবশ্যই নিশ্চিতরূপে পুণ্যবানদের কর্মলিপি অর্থাৎ ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী মু'মিনগণের আমলনামা ইল্লিয়্যীনের মধ্যে আছে কারো মতে এটা ফেরেশতা ও পুণ্যবান মানব ও জিনের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার গ্রন্থ। আর কারো মতে তা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে একটি স্থান।

١٩. وَمَا أَدْرٰكَ أَعْلَمَكَ مَا عِلِّيُّوْنَ مَا كِتَابُ عِلِّيِّيْنَ .

১৯. তুমি কি জান! তোমার কি জানা আছে? ইল্লিয়্যীন সম্বন্ধে ইল্লিয়্যীন গ্রন্থটি কি?

٢٠. هُوَ كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ مَّخْتُوْمٌ .

২২. তা চিহ্নিত আমলনামা মোহরকৃত।

٢١. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ .

২১. সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণ এটা প্রত্যক্ষ করে ফেরেশতাগণের মধ্য হতে।

٢٢. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ جَنَّةٍ .

২২. পুণ্যবানগণ তো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে বেহেশতে।

٢٣. عَلَى الْأَرَائِكِ السُّرُرِ فِي الْحِجَالِ يَنْظُرُوْنَ مَا أُعْطُوْا مِنَ النَّعِيْمِ .

২৩. সুসজ্জিত আসনে বসে সুসজ্জিত গৃহে পাতানো শয্যায় বসে তারা অবলোকন করবে তাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজি।

٢٤. تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ بَهْجَةَ التَّنَعُّمِ وَحُسْنَهُ .

২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে সমৃদ্ধির আনন্দ ও সৌন্দর্য।

٢٥. يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ خَمْرٍ خَالِصَةٍ مِنَ الدَّنَسِ مَّخْتُوْمٍ عَلٰى إِنَائِهَا لَا يَفُكُّ خَتْمَهُ إِلَّا هُمْ .

২৫ তাদের পান করানো হবে বিশুদ্ধ পানীয় হতে ময়লামুক্ত ও বিশুদ্ধ পানীয় যা মোহরকৃত তার পাত্রের মধ্যে, তারা ব্যতীত কেউ তার মোহর খুলতে পারবে না।

٢٦. خِتَامُهُ مِسْكٌ ط أَيْ اٰخِرُ شُرْبِهِ يَفُوْحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ فَلْيَرْغَبُوْا بِالْمُبَادَرَةِ إِلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

২৬ এর সমাপ্তি কস্তুরীর অর্থাৎ এটা পানান্তে তা হতে কস্তুরীর সুগন্ধি সুরভিত হবে। আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীগণ প্রতিযোগিতা করুক সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি ছুটে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের এর প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত।

٢٧. وَمِزَاجُهُ أَيْ مَا يُمْزَجُ بِهِ مِنْ تَسْنِيْمٍ فُسِّرَ بِقَوْلِهِ .

২৭. আর এর মিশ্রণ হবে এর সঙ্গে যা মিশ্রিত করা হবে তাসনীমের এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়।

٢٨. عَيْنًا فَنَصَبَهُ بِاَمْدَحُ مُقَدَّرًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ اَىْ مِنْهَا اَوْ ضَمِنَ يَشْرَبُ مَعْنٰى يَلْتَذُّ .

২৮. এটা একটি প্রস্রবণ اَمْدَحُ উহ্য فِعْل-এর কারণে শব্দটি مَنْصُوْبُ হয়েছে যা হতে সান্নিধ্য লাভে ধন্যগণ পান করবে بِهَا শব্দটি مِنْهَا অর্থে ব্যবহৃত অথবা يَشْرَبُ শব্দটি يَلْتَذُّ অর্থের ধারক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : কুরআন মাজীদে সাধারণত যেখানে কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেখানে পাশাপাশি মু'মিনদের অবস্থা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। কেননা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি বস্তুকে পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় ও পরিষ্কার করে তুলে ধরা যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কাফেরদের আচরণ ও পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতগুলোতে মু'মিনগণের অবস্থা ও পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

عِلِّيِّيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : عِلِّيِّيْنَ শব্দটি عُلُوٌّ হতে নির্গত, عَلِىٌّ-এর বহুবচন। এটা দ্বারা মু'মিন লোকদের আত্মা ও আমলনামার অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত বারা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় যে, এটা হচ্ছে সপ্তম আসমানের আরশের নিম্নদেশের একটি স্থান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটা সবুজ যবরজদ পাথর নির্মিত একখানা ফলক, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে এবং তাতে নেক লোকের আমলনামা লিখিত আছে। এ ছাড়াও কতিপয় তাফসীরকার হতে এরূপ অভিমতও পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন দ্বারা মু'মিন লোকদের আমলনামার উচ্চ মর্যাদা এবং তাদের মহাসম্মানের কথা বুঝানো হয়েছে।

কতিপয়ের মতে, عِلِّيِّيْنَ হলো একটি গ্রন্থের নাম যা ফেরেশতাগণ লিখেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

ইমাম কারখী (র.) এবং হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, ইল্লিয়্যীন হলো আরশের ডান দিকের খুঁটি।

আতা (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, ইল্লিয়্যীন হলো জান্নাত।

যাহহাক (র.) -এর মতে, এটা হলো সিদরাতুল মুনতাহা। -[নূরুল কোরআন]

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ-এর অর্থ : يَشْهَدُ ক্রিয়াটির মূল হলো شُهُوْدٌ আর شُهُوْدٌ শব্দটি এখানে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে-

১. অবলোকন করা; ২. উপস্থিত হওয়া।

প্রথম অর্থ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে- ফেরেশতাগণ পুণ্যবানদের কর্ম বিবরণী অবলোকন বা পাহারা দিতে থাকবে।

দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে পুণ্যবানদের আত্মাসমূহ عِلِّيِّيْنَ-এ উপস্থিত হবে। কেননা عِلِّيِّيْنَ তাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে।

اَلْمُقَرَّبُوْنَ কারা : আয়াতে 'মুকাররাবূন' শব্দ দ্বারা কোনো বুজুর্গ ও আল্লাহর একান্ত প্রিয় লোকের কথা বুঝানো হয়নি; বরং আরশের নিকটবর্তী এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে, তাদের অবলোকনের কথাই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- হাদীসে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত কা'আব (রা.)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বললেন, মু'মিন ব্যক্তির নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতাগণও উপস্থিত হয় তখন সে ফেরেশতাদের এ শক্তি নেই যে, তারা মৃত্যুকে এক মুহূর্ত বিলম্ব কর বা এক মহূর্ত তাড়াতাড়ি কর, বরং নির্দিষ্ট সময়ে রূহ গ্রহণ করে রহমতের ফেরেশতাদের কাছে দিয়ে দেয়। তারা তাকে যা দেখানো দরকার তা দেখায়, তারপর তার রূহ নিয়ে আসমানের দিকে উঠে যায়। যাবার সময় সকল আসমানের مُقَرَّبُوْنَ তথা নিকটবর্তীদেরকে সপ্তাকাশ পর্যন্ত জানিয়ে যান। তারপর তারা তাকে তাদের সামনে রাখে, [তোমাদের দোয়ার অপেক্ষা করে না।] এবং দোয়া শুরু করে দেয় যে, হে আল্লাহ! এতো তোমার বান্দা, তার নাফ্স আমরা গ্রহণ করে নিয়ে এসেছি। অতঃপর ভালো যা বলার, তা ফেরেশতাগণ তার জন্য বলতে থাকে- দোয়া করতে থাকে; তারপর বলে আমরা চাই যে, তার আমলনামা আমাদের সামনে পেশ করার জন্য। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হতে আরশের নিচে তার আমলনামা পেশ করে খুলে দেওয়া হবে। সেখানে তার নাম সুদৃঢ় করে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় ফেরেশতাগণ অবলোকন (পাহারাদার হিসাবে দেখবেন) করবেন। এটাই হলো كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ -[রূহুল মা'আনী]

হযরত ওহাব এবং ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, مُقَرَّبُوْنَ বলে হযরত ইসরাফীল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। যখন মু'মিন ব্যক্তি ভালো কাজ করে তখন ফেরেশতাগণ আমলনামা নিয়ে উপরে উঠবে। সে আমলনামার এত আলো যে, আকাশ আলোকিত হয়ে যাবে, যেমন সূর্যের আলো জমিনকে আলোকিত করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি এর উপর সীল-মোহর মেরে দেন। -[ফাতহুল কাদীর]

اَلْاَرَائِكُ -এর অর্থ : اَلْاَرَائِكُ শব্দটি اَرِيْكَةٌ-এর বহুবচন। 'আসন' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শুধু খাট বা আসনকে মুক্ত اَرِيْكَةٌ বলা হয় না, বরং বাসর গৃহের সজ্জিত পালঙ্কের আসনকে اَرِيْكَةٌ বলা হয়।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اَلْاَرَائِكُ কি, আমরা এর উদ্দেশ্য এবং ধরন বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একদিন ইয়েমেন থেকে একজন লোক এসে বলল, اَرِيْكَةٌ হলো বাসর গৃহের খাট বা আসন। শুধু খাটকে اَرِيْكَةٌ বলা হয় না। –[ফাতহুল কাদীর]

يَنْظُرُوْنَ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : يَنْظُرُوْنَ এটা বাবে نَصَرَ হতে جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ-এর مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ-এর শব্দ। মাসদার نَظَرٌ মূল অক্ষর (ن - ظ - ر) জিনসে সহীহ। অর্থ– দেখা, নজর করা ইত্যাদি। এখানে يَنْظُرُوْنَ দ্বারা "কারা কি দেখবে" এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, "يَنْظُرُوْنَ مَا اُعْطُوْا مِنَ النَّعِيْمِ" অর্থাৎ মু'মিনগণকে যে নিয়ামতরাজি দেওয়া হবে তারা তার দৃশ্যাবলি অবলোকন করতে থাকবে।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, মু'মিনগণ সু-সজ্জিত আসনে বসে দোজখীদেরকে দেখতে থাকবে। কারো মতে, তাকানো দ্বারা ঘুম না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা শয্যার উপর শয়ন করবেন ঠিকই তবে ঘুমাবেন না। কেননা ارائك বলার কারণে এ ধারণা হতে পারে যে, খাট তাদের ঘুমানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত ধারণাকে নাকচ করার জন্যই বলা হয়েছে "يَنْظُرُوْنَ" কাজেই আলোচ্য আয়াত হতে প্রসঙ্গত প্রমাণিত হয়েছে যে, জান্নাতে জান্নাতীগণের নিদ্রা হবে না এবং নিদ্রার প্রয়োজনও হবে না। কারণ সেখানে কোনোরূপ ক্লান্তি, শ্রান্তি ও অলসতা থাকবে না।

হযরত ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, নেককারগণ তাঁদের জন্য তৈরি বিভিন্ন মর্যাদাবান বস্তুর প্রতি তাকাবেন। কারো মতে, মু'মিনগণ একে অপরের প্রতি তাকাবেন, দৃষ্টি বিনিময় করবেন ও কথাবার্তা বলবেন, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেন না। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে জান্নাতীদেরকে কিরূপ পানীয় দিবেন তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জান্নাতীগণকে এমন স্বচ্ছ ও খাঁটি পানীয় (মদ) পান করানো হবে যার পাত্রের মুখে মুখবন্ধ করে মোহর এটে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র তারা ছাড়া অন্য কেউই তার মুখ খুলতে পারবে না।

رَحِيْقٌ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : رَحِيْقٌ-এর অর্থ হলো– মদ। তবে এখানে কি ধরনের মদকে رَحِيْقٌ বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। প্রখ্যাত নাহুবিদ খালিল (র.) -এর মতে– اَلرَّحِيْقُ اَجْوَدُ الْخَمْرِ অর্থাৎ رَحِيْقٌ হলো উৎকৃষ্ট শরাব। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (র.) -এর মতে– اَلرَّحِيْقُ هُوَ الْخَمْرُ الْعَتِيْقَةُ وَالْبَيْضَاءُ الصَّافِيَةُ অর্থাৎ স্বচ্ছ, সাদা ও পুরানো মদকে রাহীকুন বলে।

ইমাম যুজাজ, আখফাশ, মুবাররাদ ও আবূ উবায়দাহ প্রমুখগণের মতে– اَلرَّحِيْقُ مِنَ الْخَمْرِ مَا لَا غَشَّ فِيْهِ অর্থাৎ রাহীক এমন মদকে বলে যার মধ্যে মাতলামী নেই, যা পান করলে নেশা হয় না।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন– خَمْرٌ خَالِصَةٌ مِنَ الدَّنَسِ অর্থাৎ ময়লা হতে মুক্ত বিশুদ্ধ মদকে রাহীক বলে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى نَضْرَةَ النَّعِيْمِ : অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণের চেহারাতেই তাদের সুখ, শান্তি ও আনন্দ ফুটে উঠবে। হযরত আতা (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীগণের চেহারার মাঝে এত নূর, সৌন্দর্য এবং সজীবতা দান করবেন– যা কোনো বর্ণনাকারী বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, জান্নাতবাসীগণের মুখমণ্ডলে থাকবে সজীবতা, আর অন্তরে থাকবে আনন্দ-উল্লাস। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى خِتَامُهُ مِسْكٌ : خِتَامٌ -অর্থ مَا يُخْتَمُ بِهٖ অর্থাৎ যা দ্বারা সমাপ্ত করা হয়। অবশ্য সীলমোহরকেও خِتَامٌ বলা হয়ে থাকে। কেননা এটা দ্বারা কোনো বস্তুর সমাপ্তি (পূর্ণতা) ঘোষণা করা হয়ে থাকে। আর مِسْكٌ অর্থ– কস্তুরী, মৃগনাভী।

মুফাস্সিরগণ এখানে خِتَامُهُ مِسْكٌ-এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন–

যেসব পাত্রে সে শরাব থাকবে তার মুখ মোম বা মাটি দ্বারা বন্ধ করার পরিবর্তে মিসকের পাত্র দ্বারা মুখবন্ধ করে দেওয়া হবে। এ দৃষ্টিতে আয়াতটির তাৎপর্য এই হবে যে, এটা এক অতি উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানের শরাব হবে। ঝর্ণাধারা প্রবহমান শরাব হতে তা উত্তম ও উৎকৃষ্ট মানের হবে এবং বেহেশতের সেবকগণ একে মিশকের মুখবন্ধ লাগানো পাত্রে রেখে জান্নাতীগণের সম্মুখে পেশ করবে।

অথবা, সে শরাব যখন পানকারীদের কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নামতে শুরু করবে তখন শেষকালে তারা মিশকের সুগন্ধী লাভ করবে। দুনিয়ার শরাব হতে এটা ভিন্নতর এক বিশেষ অনুভূতি সম্পন্ন। কেননা দুনিয়ার মদের বোতল খুলতেই বমি উদ্রেককারী বীভৎস এক গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে সমস্ত আঁতুড়ি ধরে নাড়া দেয়। পান করার সময়ও এ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। আর কণ্ঠনালী হতে যখন তা নিচে নামতে থাকে, তখন তার তীব্র ঝাঁঝ মগজে আঘাত হানে। বিস্বাদের এক দুঃসহ প্রতিক্রিয়া মদ্যপায়ীর মুখ ভঙ্গিতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, এটা পানান্তে মিশকের সুগন্ধি বের হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, এখানে خِتَام অর্থ– শেষ মজা, অর্থাৎ বেহেশতী সূরার শেষ মজা হলো অতি বিষ্ময়কর –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণের বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন, যা তারা পরকালে অর্জন করবে। আর অত্র আয়াতে এরূপ নিয়ামতরাজি লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে লোকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে যে, যারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চায় তাদের উচিত এরূপ নিয়ামতরাজি অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়ার মাধ্যমেই সে অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করা সম্ভব।

ذٰلِكَ দ্বারা কোন দিকে ইশারা করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী– وَفِىْ ذٰلِكَ-এর মধ্যে ذٰلِكَ দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে– এ ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এর দ্বারা পূর্ববর্তী رَحِيْق-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এরূপ শরাব পান করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

২. অথবা, এর দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত নিয়ামতের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যা পরকালে মু'মিনগণ লাভ করবেন। অর্থাৎ মু'মিনগণ পরকালে যেসব নিয়ামতের অধিকারী হবেন তা লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

فَلْيَتَنَافَسِ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : فَلْيَتَنَافَسِ-এর মধ্যে فَاءْ হরফে আতফ। এটা لِيَتَنَافَسْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ, বহছ اَمْر غَائِبْ مَعْرُوْف বাবে تَفَاعُلْ মূল অক্ষর (ن ـ ف ـ س) জিনসে صَحِيْح।

ইমাম বাগাবী (র.) -এর মতে, এটা اَلشَّيْئُ النَّفِيْسُ (উত্তম বস্তু) হতে গৃহীত। অর্থাৎ এমন মূল্যবান বস্তু যার প্রতি মানব অন্তর আগ্রহী হয় এবং সকলেই তা পেতে চায়। কেউ কেউ বলেছেন, تَنَافُسْ শব্দটি تَشَاجُرْ-এর অর্থে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো বস্তু লাভ করার জন্য ঝগড়া ও বিরোধে লিপ্ত হওয়া। এটা হতেই এখানে প্রতিযোগিতার অর্থ হয়েছে।

তাসনীম দ্বারা উদ্দেশ্য : 'তাসনীম'-এর মূল অর্থ হলো– উচ্চতা। অর্থাৎ এ পানীয় জান্নাতের প্রতিটি মনযিল ও কামরায় রাখা হবে। কতিপয় তাফসীরকারক বলেছেন, জান্নাতী লোকদের জন্য বিশেষ উন্নতমানের এক প্রকার শরাবের নাম হলো তাসনীম।

হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– এ শ্রেণির পানীয় আল্লাহর একান্ত প্রিয়জনদের জন্য নির্দিষ্ট। তাতে সুগন্ধি পানি মিশিয়ে সাধারণ জান্নাতী লোকগণকে পান করতে দেওয়া হবে।

কতিপয় তাফসীরকারক তাসনীমের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ জলীয় পদার্থটি বায়ুর সাথে ভাসমান ও চলমান থাকে। জান্নাতী লোকদের পানীয় পাত্রগুলোতে পরিমাণ অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই তা মিশ্রিত হবে।

আল্লামা বাগাবী (র.) ইউসুফ ইবনে মেহরানের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে তাসনীমের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এটি সে অজানা বিষয়ের অন্যতম, যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ –[নূরুল কোরআন]

মোটকথা, তাসনীম মনমাতানো এক প্রকার অতিশয় সুগন্ধি জলীয় পদার্থ, যা জান্নাতী লোকদের পানীতে মিশিয়ে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। আর আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দাদেরকে কোনো কিছুর সাথে না মিশিয়েই পান করতে দেওয়া হবে।

عَيْنًا শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ : عَيْنًا শব্দটি مَدْح হিসাবে মানসূব (مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَدْحِ) হয়েছে। মূলবাক্য এভাবে হবে اَمْدَحُ عَيْنًا ইমাম যুজাজ বলেন, حَال হিসাবে মানসূব হয়েছে।

ইমাম আখফাশ (র.) বলেন, يُسْقَوْنَ দ্বারা মানসূব হয়েছে। মূলে ছিল– يُسْقَوْنَ عَيْنًا।

ইমাম ফাররা (র.) বলেন, تَسْنِيْم কর্তৃক عَيْنًا মানসূব হয়েছে। কেননা تَسْنِيْم শব্দটি اَلسَّنَامُ মাসদার হতে مُشْتَقْ। –[ফাতহুল কাদীর]

يَشْرَبُ بِهَا-এর بَاءْ-এর অর্থ : কেউ কেউ বলেন, بِهَا-এর بَاءْ অতিরিক্ত। মূলবাক্য এভাবে হবে– يَشْرَبُهَا

কারো মতে, بَاءْ অর্থ مِنْ অর্থাৎ يَشْرَبُ مِنْهَا অথবা, يَشْرَبُ অর্থ يَرْوِىْ অর্থাৎ পরিতৃপ্তি লাভ করবে, তখন بَاءْ-এর ব্যবহার ঠিক-ই হবে। অর্থাৎ يَرْوِىْ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ

অথবা, بِهَا-এর مُتَعَلَّقْ উহ্য আছে। মূলবাক্য এভাবে হবে যে, يَشْرَبُ مُلْتَذًّا بِهَا –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٢٩. اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَاَبِىْ جَهْلٍ وَنَحْوِهِ كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَنَحْوِهِمَا يَضْحَكُوْنَ اِسْتِهْزَاءً بِهِمْ .

২৯. নিশ্চয় যারা অপরাধী যেমন, আবূ জাহল প্রমুখ। তারা তো যারা ঈমান আনয়ন করেছে যেমন আম্মার (রা.), বিলাল (রা.) প্রমুখ। তাদের প্রতি উপহাস করত তাদের প্রতি বিদ্রূপকরণার্থে।

٣٠. وَاِذَا مَرُّوْا اَىِ الْمُؤْمِنُوْنَ بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ اَىْ يُشِيْرُ الْمُجْرِمُوْنَ اِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجَفْنِ وَالْحَاجِبِ اِسْتِهْزَاءً .

৩০. আর যখন তারা অতিক্রম করত অর্থাৎ মু'মিনগণ তাদের পাশ দিয়ে, তখন তারা বাঁকা চোখে ইশারা করত। অর্থাৎ অপরাধী কাফেরগণ মু'মিনদের প্রতি চোখের পাতা ও ভ্রূ দ্বারা ইশারা করে বিদ্রূপ করত।

٣١. وَاِذَا انْقَلَبُوْآ رَجَعُوْا اِلَى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَكِهِيْنَ مُعْجَبِيْنَ بِذِكْرِهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৩১. আর যখন প্রত্যাবর্তন করত ফিরে আসত তাদের স্বজনের নিকট, তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে প্রত্যাবর্তন করত فَكِهِيْن শব্দটি অন্য কেরাতে فَكِهِيْن পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সবিস্ময়ে মু'মিনদের আলোচনা করে।

٣٢. وَاِذَا رَاَوْهُمْ رَاَوُا الْمُؤْمِنِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ لِاِيْمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ تَعَالٰى .

৩২. আর যখন তারা এদেরকে মু'মিনগণকে দেখত তখন তারা বলত, এরাই তো পথভ্রষ্ট মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করার কারণে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

٣٣. وَمَآ اُرْسِلُوْا اَىِ الْكُفَّارُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حٰفِظِيْنَ لَهُمْ اَوْ لِاَعْمَالِهِمْ حَتّٰى يَرُدُّوْهُمْ اِلٰى مَصَالِحِهِمْ .

৩৩. তাদেরকে তো প্রেরণ করা হয়নি অর্থাৎ কাফেরদেরকে তাদের উপর মু'মিনদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে মুসলমানগণ ও তাদের আমলের তত্ত্বাবধান করার জন্য, যে জন্য তারা মুসলমানদেরকে তাদের ধারণায় মঙ্গলের প্রতি ফিরিয়ে আনবে।

٣٤. فَالْيَوْمَ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ .

৩৪. অতএব, আজ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ কাফেরদের প্রতি উপহাস করবে

٣٥. عَلَى الْاَرَآئِكِ فِى الْجَنَّةِ يَنْظُرُوْنَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ اِلَى الْكُفَّارِ وَهُمْ يُعَذَّبُوْنَ فَيَضْحَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمَا ضَحِكَ الْكُفَّارُ مِنْهُمْ فِى الدُّنْيَا .

৩৫. সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হয়ে বেহেশতে তারা অবলোকন করবে তাদের অবস্থান হতে কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। তখন তারাও কাফেরদের প্রতি উপহাস করবে, যেমন দুনিয়াতে কাফেরগণ মু'মিনদের প্রতি উপহাস করেছিল।

٣٦. هَلْ ثُوِّبَ جُوْزِىَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

৩৬. প্রতিফল প্রদান করা হলো তো? শাস্তি পেল কাফেরদেরকে, যা তারা করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পিছনে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের শাস্তি এবং মু'মিনদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। এখন কাফের-কুরাইশদের কতিপয় লোকের কিছু কিছু খারাপ কাজের উদাহরণ পেশ করেছেন। যেগুলো তারা দুনিয়ার জীবনে মু'মিনদের সাথে তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে করেছিল।

আয়াতগুলোর শানে নুযূল :

১. বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সাথে একদল সাহাবী মক্কার কাফেরদের এক দলের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তারা মু'মিনদের দেখে উপহাস করেছিল। হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সাথীরা রাসূল ﷺ -এর দরবারে পৌঁছার পূর্বেই আয়াত নাজিল হয়ে গেল اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا -[রূহুল মা'আনী]

২. বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) কয়েকজন মু'মিনসহ আসছিলেন, তখন মুনাফিকগণ তাদেরকে নিয়ে উপহাস, হাসি এবং চোখ দিয়ে টিপা-টিপি করেছিল, তারপর তাদের সাথীদের কাছে গিয়ে বর্ণনা করল যে, আজকে কিছু টাক-মাথা দেখেছি, অতঃপর সকলে মিলে কিছুক্ষণ হাসি-ঠাট্টা করল। মু'মিনগণ রাসূলের দরবারে পৌঁছার পূর্বেই আয়াত কয়টি নাজিল হয়ে গেল।

প্রথম اَلَّذِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا-এর اَلَّذِيْنَ দ্বারা কোরাইশদের কিছু মুশরিককে বুঝানো হয়েছে। যেমন-আবূ জাহ্ল, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, উকবা ইবনে আবী মুয়ীত, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস, আস ইবনে হিশাম এবং নযর ইবনে হারিছ। এরা মু'মিনদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের উপহাস করত। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : উপরোল্লিখিত কাফেরগণ যাঁদের নিয়ে উপহাস করত, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাঁরাই দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ অর্থাৎ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ-এর মধ্যে উল্লিখিত اَلَّذِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য। কেননা তাঁরা ছিলেন সমাজে গরিব। যেমন- আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব, বিলাল প্রমুখ সাহাবীগণ। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ : আর যখন কাফির- মুশরিকরা মু'মিনগণের নিকট দিয়ে যেত তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার নিমিত্তে চোখের ভ্রূ ও পাতা দ্বারা মু'মিনদের প্রতি ইঙ্গিত করত।

কেউ কেউ বলেছেন, তারা একে অপরকে চোখের পাতা দিয়ে ইশারা করত।

কারো কারো মতে, মু'মিনগণকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা এরূপ করত।

মু'মিনগণকে দেখা মাত্রই তারা বলাবলি শুরু করত যে, এ লোকগুলোর প্রতি তাকাও, তারা দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। আর পরকালের ছওয়াব পাওয়ার আশায় তারা এক আশ্চর্যজনক জীবন-যাপন করছে, তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

কাফেররা মু'মিনগণের সাথে কিভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত : কাফেররা মু'মিনগণকে বিভিন্নভাবে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কোনো কোনো সময় তারা মু'মিনগণকে দেখামাত্র অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। কোনো কোনো সময় তারা মু'মিনগণের নিকট দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তাদের দিকে তাকিয়ে নিজেরা পরস্পরে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে চোখ টিপাটিপি করত। তারা পরস্পরে বলাবলি করত যে, এরা কতইনা নির্বোধ। পরকালের ছওয়াবের আশায় তারা দুনিয়ার সমস্ত সুখ-সম্ভোগকে ত্যাগ করে বসেছে আবার তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে বলত আজ এক মুসলমানের সঙ্গে খুবই বিদ্রূপ-কৌতুক করে এসেছি লোকটাকে একদম অপমান করে ছেড়েছি। এদের মতো বিভ্রান্ত ও পাগল আর হয় না। পরকালে কোথায় কি পাবে তার লোভে পড়ে দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাসকে বর্জন করে দিয়েছে। একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদের পক্ষেই এরূপ কাজ করা সম্ভব।

মু'মিনগণ পরকালে কিভাবে কাফেরদেরকে উপহাস করবে? : কাফেররা দুনিয়াতে মু'মিনগণকে যে উপহাস করেছে মু'মিনগণ পরকালে তাদের নিকট হতে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর তা এভাবে যে, মু'মিনগণ জান্নাতে তাদের জন্য সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থাকবেন। সেখান থেকে তারা দেখতে পাবেন যে [জাহান্নামে] দোজখীদেরকে আজাব দেওয়া হচ্ছে

এটা দেখে তাঁরা হাসি-তামাশা করবেন, যেরূপ দুনিয়াতে কাফেররা তাঁদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করেছিল। কাফেরদেরকে তারা জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমরা তোমাদের কর্মফল হাতেনাতে বুঝে পেয়েছ তো? অথচ তখন আমাদের কথায় তোমরা কর্ণপাত করনি; বরং উল্টো আমাদেরকেই উপহাস করেছিলে, পথভ্রষ্ট বলেছিলে। আজ আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

فَكِهِيْنَ-এর অর্থ : فَكِهِيْنَ শব্দটি فَكِهٌ-এর বহুবচন। অর্থ- আনন্দ ভোগ করা, স্বাদ নেওয়া, আয়াতে اِنْقَلَبُوْا ফে'লে যমীর হতে فَكِهِيْنَ হাল হয়েছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হলো- "তারা একথা চিন্তা করতে করতে ফিরত যে, আজ তো বড্ড মজা পেলাম। আমি আজ অমুক মুসলিমের প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপাত্মক শব্দ উচ্চারণ করে এবং অপমানকর কথা বলে বড় আনন্দ লাভ করেছি।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ" : উক্ত আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে-

১. رَاَوْا-এর فَاعِلْ কাফেরগণ আর هُمْ হলো মুসলিমগণ। তখন অর্থ হবে- কাফেরগণ যখন মুসলিমগণকে দেখবে তখন বলবে, এদের বুদ্ধি-শুদ্ধি আর কাণ্ড-জ্ঞান বলতে কিছুই নেই। এরা দুনিয়ার আনন্দ-ফুর্তি, স্বার্থ, সুখ ও স্বাদ-আস্বাদন হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং সব রকমের বিপদ মসিবতের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আছে। -[ফাতহুল কাদীর]
২. رَاَوْا-এর فَاعِلْ মু'মিনগণ, আর هُمْ হলো কাফেরগণ। অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন কাফেরদেরকে দেখবে তখন বলবে যে, এরা পরকালের অনন্ত জীবনের সুখ-সম্ভোগ ছেড়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরামে ডুবে রয়েছে। তবে প্রথম অর্থই উত্তম।

-[ফাতহুল কাদীর]

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ আয়াতের উদ্দেশ্য : এ আয়াতে মুসলিমদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানকারীদের জন্য খুবই শিক্ষাপ্রদ শাসনবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, মুসলিমরা যা কিছু বিশ্বাস করে ও যেসবের প্রতি ঈমান এনেছে- যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তা সবই ভুল ও ভিত্তিহীন, তবুও প্রশ্ন হলো যে, তাতে তোমাদের কি ক্ষতি হচ্ছে? তারা তো রাসূলের বিধানকে সত্য মনে করেছে এবং সে অনুযায়ী একটি বিশেষ নৈতিক আচরণ অবলম্বন করেছে। এমতাবস্থায় তোমাদের সাথে যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না, তোমরা কেন গায়ে পড়ে তাদের সাথে ঝগড়া করতে চাচ্ছ। যারা তোমাদের কোনোরূপ কষ্ট দেয় না- কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না, তোমরা কেন শুধু শুধু তাদের কষ্ট দাও? আল্লাহ তো তোমাদেরকে তাদের উপর ফৌজদারী ক্ষমতাসহ নিযুক্ত করেননি।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ : হযরত আবূ সালেহ (র.) বলেন, কাফেররা যখন দোজখে থাকবে তখন দোজখের দরজা উন্মুক্ত করে তাদেরকে বলা হবে যে, বের হয়ে যাও। দরজা খোলা দেখে তারা বের হওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। আর মু'মিনগণ জান্নাত থেকেই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে। কাফেররা যখন দোজখের দরজা পর্যন্ত আসবে, তখন হঠাৎ দোজখের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন মু'মিনগণ কাফেরদের অবস্থা দেখে হাসতে থাকবে। যেমন, কাফেররা দুনিয়াতে মুসলমানদেরকে দেখে হাসত।

হযরত কা'ব (র.) বলেছেন, জান্নাত ও দোজখের মধ্যে কিছু জানালা থাকবে। কোনো মু'মিন যখন তার দুনিয়ার জীবনের শত্রুকে দেখতে ইচ্ছা করবে, তখন সে জানালা দিয়ে দোজখের দিকে তাকাবে এবং কাফেরদের কঠিন আজাবে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। -[নূরুল কোরআন]

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ-এর অর্থ : এ বাক্যটি পিছনের يَضْحَكُوْنَ-এর ফায়েল হতে حَالٌ হয়েছে। অতএব, অর্থ হবে- মু'মিনগণ কাফেরদের নিয়ে হাসতে থাকবে, এমন অবস্থায় যে, তারা তাদেরকে এবং তাদের কঠিন শাস্তির অবস্থা অবলোকন করতে থাকবে। বলা হয়েছে যে, কাফেরদের জন্য বেহেশতের একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর বলা হবে যে, আস, আস। যখন তারা দরজা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এভাবে কয়েকবার করা হবে। শেষ পর্যন্ত তারা আর আসবে না। মু'মিনগণ তখন তাদের নিয়ে হাসবেন। কেননা দুনিয়াতে তারা মু'মিনদের নিয়ে হেসেছিল। এটা তাদের একটি প্রতিদান। -[রূহুল মা'আনী]

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ : সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব

সূরাটির নামকরণে কারণ : এ সূরার নাম প্রথম আয়াতে উল্লিখিত اِنْشَقَّتْ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ- বিদীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা দ্বারাই সূরার ভাষণটি শুরু করা হয়েছে। এতে ২৫টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য এবং ৭৩০ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ইসলামি যুগের প্রথম দিকের সূরা। যদিও অবতীর্ণের সঠিক সময় কখন ছিল, তা জানা যায় না, তবে সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, তখনো মক্কায় ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হয় নি; বরং কুরআনকে মিথ্যা জানা হতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিকে অস্বীকার করা হতো। সম্ভবত এ সময়ই কিয়ামতের অনিবার্যতা এবং হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের অবশ্যম্ভাবিতা অবহিত করানোর জন্য এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলকথা : কিয়ামত ও পরকালই এর মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথম পাঁচটি আয়াতে শুধু কিয়ামতের পরিস্থিতির কথাই বলা হয়নি; বরং এটা যে- নিঃসন্দেহে সত্য ও অবধারিত, তার যুক্তিও দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- সেদিন আকাশ ফেটে যাবে, জমিন সম্প্রসারিত করে সমতল প্রান্তর বানিয়ে দেওয়া হবে। মাটির গর্ভে যা কিছু লুক্কায়িত রয়েছে (মৃত মানুষের দেহাবশেষ এবং তাদের আমলের প্রমাণাদি) তা সবই বাহিরে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে কিছুই থাকবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, আকাশ ও জমিনের প্রতি এটাই হবে আল্লাহর নির্দেশ। আর উভয়ই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্ট, এ জন্য তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা বা অমান্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

অতঃপর ৬ – ১৯ পর্যন্ত থেকে আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এর চেতনা থাকুক আর নাই থাকুক- আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার দিকে তারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তীব্র গতিতে গমন করছে। অতঃপর সব মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এক ভাগের লোকদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে এবং কোনোরূপ কঠিন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোকদের আমলনামা তাদের পিছনের দিক হতে সামনে ফেলে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় যে কোনোভাবে তাদের মৃত্যু আসুক, তাই হবে তাদের মনের একমাত্র কামনা। কিন্তু মৃত্যু তো নেই, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যেহেতু দুনিয়াতে এক বড় ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। তারা মনে করে বসেছিল যে, জাওয়াবদিহির জন্য কখনই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে না। তাদের উক্ত রূপ পরিণাম হবে ঠিক এ কারণেই। কেননা আল্লাহ তো তাদের সব আমলই দেখছিলেন। তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়ার তো কোনোই কারণ নেই দুনিয়ার জীবন হতে পারকালের শাস্তি ও পুরস্কার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ও পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সন্দেহাতীত ব্যাপারে। সূর্যাস্তের পর রঙীন উষার উদয়, দিনের অবসানে রাত্রের আগমন, এতে মানুষ ও গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলোর নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরে আসা এবং চন্দ্রের প্রথম হাঁসুলির আকার হতে ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ লাভ যতটা নির্ভুল ও সন্দেহাতীত, এ ব্যাপারটিও ঠিক তেমনই নিশ্চিত।

যেসব কাফের কুরআন মাজীদ শুনে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো তাকেই মিথ্যা মনে করে সে কাফেরদেরকে শেষের আয়াতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনয়ন করে নেকআমল গ্রহণ করে তাদেরকে অপরিমিত সুফল দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ـ

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।

٢. وَاَذِنَتْ سَمِعَتْ وَاَطَاعَتْ فِى الْاِنْشِقَاقِ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اَىْ حُقَّ لَهَا اَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيْعَ ـ

২. আর শ্রবণ করবে ও মান্য করবে শুনবে ও ফেটে যাওয়ার আদেশ পালন করবে তার প্রতিপালকের আদেশ এবং এটাই তার করণীয় অর্থাৎ শ্রবণ করা ও মান্য করাই তার করণীয়।

٣. وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ زِيْدَ فِىْ سَعَتِهَا كَمَا يُمَدُّ الْاَدِيْمُ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَلَا جَبَلٌ ـ

৩. আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এর প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা হবে, যেমন, চামড়াকে টেনে দীর্ঘ করা হয়। আর তার উপর কোনো দালান-কোঠা ও পাহাড় থাকবে না।

٤. وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا مِنَ الْمَوْتٰى اِلٰى ظَاهِرِهَا وَتَخَلَّتْ عَنْهُ ـ

৪. আর সে নিক্ষেপ করবে, যা কিছু তার অভ্যন্তরে আছে মৃতগণকে এর উপরিভাগের প্রতি, আর সে শূন্যগর্ভ হবে এগুলো হতে।

٥. وَاَذِنَتْ سَمِعَتْ وَاَطَاعَتْ فِىْ ذٰلِكَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَ ذٰلِكَ كُلُّهُ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَوَابُ اِذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا مَحْذُوْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَابَعْدَهُ تَقْدِيْرُهُ لَقِىَ الْاِنْسَانُ عَمَلَهُ ـ

৫. আর শ্রবণ ও মান্য করবে এ আদেশ শ্রবণ করে প্রতিপালন করবে তাদের প্রতিপালকের আদেশ। আর এটাই তার করণীয় এ সব কিছুই কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। اِذَا এবং তৎপ্রতি যা কিছু আতফ করা হয়েছে, সমুদয়ের জওয়াব উহ্য রয়েছে। পরবর্তী বক্তব্য তার প্রতি নির্দেশ করছে। উহ্য বক্তব্যটি এরূপ لَقِىَ الْاِنْسَانُ عَمَلَهُ মানুষ তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

٦. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ جَاهِدٌ فِىْ عَمَلِكَ اِلٰى لِقَاءِ رَبِّكَ وَهُوَ الْمَوْتُ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ اَىْ مُلَاقٍ عَمَلَكَ الْمَذْكُوْرَ مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৬. হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি সাধনাকারী তোমার কাজে চেষ্টা সাধনাকারী তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ পর্যন্ত আর তা হলো মৃত্যু, কঠোর সাধনা, অনন্তর তুমি তার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমার উল্লিখিত ভালো-মন্দ আমলের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

فَمُلَاقِيْهِ-এর মহল্লে ই'রাব :

১. مُلَاقِيْهِ শব্দটি كَادِحٌ-এর উপর আতফ হতে পারে। অতএব, এটা মহল্লে رَفْع তে আছে।

২. উহ্য মুবতাদার খবর হতে পারে। অর্থাৎ فَأَنْتَ مُلَاقِيْهِ এখানেও رَفْع-এর অবস্থায় রয়েছে।

৩. কারো মতে, فَمُلَاقِيْهِ শব্দটি إِذَا -এর জবাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের সাথে বর্তমান সূরার যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরার মতো বর্তমান সূরাতেও প্রতিদান ও প্রতিফলের আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। অতএব, পূর্ববর্তী সূরার সাথে বর্তমান সূরা পূর্ণভাবে সম্পর্কিত।

পিছনের কয়েকটি সূরায় বৈষয়িক দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুর পরিবর্তন এবং ধ্বংসের কথা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান সূরাতে একই আলোচনা শুরু হয়েছে, তবে একটি সূক্ষ্ম এবং শিক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। তা হচ্ছে–আসমান-জমিন যে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অনুগত, তাঁরই সামনে বিনয়ী, এ সূরায় তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। –[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ : কিয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, সেদিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অত্র আয়াতে 'আকাশ বিদীর্ণ হওয়া' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। রাঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মেঘমালার মাধ্যমে আকাশ ফেটে যাবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ"

কারো কারো মতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার কারণে আকাশ ফেটে যাবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ.

আকাশ তার প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করার অর্থ কি? : মূল আয়াতে বলা হয়েছে– أَذِنَتْ لِرَبِّهَا-এর শাব্দিক অর্থ হলে 'সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে'। আরবি প্রচলনে "أَذِنَ لَهُ"-এর অর্থ সে হুকুম শুনল শুধু এতটুকু নয়; বরং এর তাৎপর্য হয়, সে হুকুম শুনে একজন অনুগত ব্যক্তির ন্যায় তা পালন করল এবং বিন্দুমাত্র অমান্য করল না।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ দু' প্রকার। একটি হলো تَكْوِيْنِيْ অর্থাৎ যা আদিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মানতে বাধ্য। দ্বিতীয় প্রকার হলো تَشْرِيْعِيْ অর্থাৎ যা মানার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় না। ইচ্ছা করলে সে তা মানতে পারে আবার মনে চাইলে অমান্যও করতে পারে। তবে মান্য করলে ছওয়াব লাভ করবে এবং অমান্য করলে আজাব দেওয়া হবে। এ দ্বিতীয় প্রকারের আদেশ মানুষ ও জিন জাতির জন্য নির্দিষ্ট। অন্যান্যদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কাজেই আসমান ও জমিনকে আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তা মেনে নিতে বাধ্য। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাদেরকে আল্লাহর আদেশ মান্য করতে হয়। সূরা সাজদায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–"তারপর আল্লাহ তা'আলা আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধোঁয়ায় ভর্তি। অতঃপর তিনি তাকে এবং জমিনকে বললেন, তোমরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমার অনুগত হয়ে যাও। তারা বলল আমরা (স্বেচ্ছায়) অনুগত হয়ে গেলাম।"

কাজেই এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, আসমান জমিন আল্লাহর সম্পূর্ণ বাধ্য ও অনুগত। এদের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেই আল্লাহর আনুগত্য করার প্রবণতা রয়েছে। এ জন্যই বলা হয়েছে– "حُقَّتْ" অর্থাৎ আর আল্লাহর কথা শ্রবণ করা ও তাঁর আনুগত্য করাই এর [আসমানের] যথার্থ কর্তব্য, এটাই তার দায়িত্ব। এটা হতে একবিন্দুও এদিক সেদিক করার ক্ষমতা তার নেই।

পৃথিবী বিস্তৃতিকরণের তাৎপর্য : উল্লিখিত ৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পর পৃথিবীকে সমতল করে বিস্তৃত করবেন। এর তাৎপর্য হলো যে, সমুদ্র ও নদী-নালা ভর্তি করে দেওয়া হবে। এটাই হবে হাশর ময়দান। এই বিশালকায় ময়দানেই পৃথিবীর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যত লোক সৃষ্টি হয়েছে তাদের জমায়েত করা হবে। সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে–"আল্লাহ তাকে এক ধূসর প্রান্তর বানিয়ে দিবেন, সেখানে তুমি কোনো বক্রতা ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন– নবী করীম ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে একখানা দস্তরখানের ন্যায় বিছিয়ে সম্প্রসারিত করা হবে। সেখানে মানুষের জন্য শুধুমাত্র পা রাখারই জায়গা হবে"

–[মুস্তাদরাক]

এ হাদীসের মর্ম হলো, পৃথিবীর সৃষ্টি হতে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে– তাদের সকলকেই এ প্রান্তরে আল্লাহর সম্মুখে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কেউই লুকিয়ে থাকতে পারবে না। সুতরাং অগণিত মানুষকে একস্থানে সমবেত করার জন্য সাগর, নদী-নালা, গর্ত, উঁচু-নীচু সবকিছু ভরে সমতল করা অপরিহার্য হয়। সুতরাং এ বিশাল বিস্তৃত ময়দানে মানুষের এত বেশি সমাগম হবে যে, পা রাখার স্থান ব্যতীত আর কোনো জায়গাই পাবে না।

হাকিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন জমিনকে এভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যেমন চর্মকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সমগ্র সৃষ্টিকে জমিনের উপর উঠানো হবে। –[নূরুল কোরআন]

জমিন কি উৎক্ষেপণ করবে? জমিন তার পেটের ভিতর যত মৃত এবং খনিজসম্পদ লুক্কায়িত আছে, সব কিছু কিয়ামতের দিন বের করে দিবে– কোনো কিছুই বাকি থাকবে না।

কারো মতে, জমিনের পিঠে যা আছে, তার কথা বলা হয়েছে। জমিনের ভিতরেরগুলোর কথা বলা হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, জমিনের পিঠে যত পাহাড় আছে, সকল পাহাড়ই কিয়ামতের দিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন; আমার কবর-ই প্রথম বিদীর্ণ করা হবে। অতঃপর আমাকে সুন্দর করে আমার কবরে বসানো হবে, এমতাবস্থায় জমিন আমাকে নিয়ে কাঁপতে থাকবে। আমি জমিনকে বলবো, তোমার কি হয়েছে? তখন সে উত্তর করবে–আমার রব আমাকে নির্দেশ করেছেন, যেন আমি আমার গর্ভস্থ সকল কিছু উৎক্ষেপণ করে দেই। পূর্বে যেমন খালি ছিলাম, তেমন যেন খালি হয়ে যাই। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জমিন স্বর্ণের পাতগুলো বাহিরে ফেলে দিবে এবং অন্যান্য সবকিছুই বাহিরে ফেলে দিবে। –[নূরুল কোরআন]

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ আয়াতটিকে দ্বিরুক্তি করার কারণ : উক্ত আয়াতকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আসলে تَكْرَارٌ নয়; বরং প্রথমবার আকাশের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার জমিনের ব্যাপারে বলা হয়েছে। বিষয় হলো দু'টি, উল্লেখও হয়েছে দু'বার। একে تَكْرَارٌ বলার যৌক্তিকতা নেই। –[কাবীর]

اِذَا ও তার مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا সমূহের জওয়াব কি? : اِذَا ও তার مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا সমূহের جَوَابٌ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, এখানে اِذَا ও তার مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا সমূহের جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো لَقِىَ الْاِنْسَانُ عَمَلَهُ অর্থাৎ মানুষ (সেদিন) তার আমল (-এর প্রতিফল) প্রত্যক্ষ করবে। দুনিয়াতো সে যা করেছে, তার প্রতিদান পাবে।

ইমাম আখফাশ (র.) বলেছেন, এর جَوَابٌ হলো فَمُلَاقِيْهِ অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার সাধনার ফল দেখতে পাবে। কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় اِذَا প্রথম اِذَا-এর খবর হয়েছে। তখন অর্থ দাঁড়াবে وَقْتُ اِنْشِقَاقِ السَّمَاءِ وَقْتَ مَدِّ الْاَرْضِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার সময়ই জমিন বিস্তৃত হওয়ার সময়।

কারো কারো মতে, এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। আর তাহলো بُعِثْتُمْ অর্থাৎ যখন উক্ত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হবে তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

কারো কারো মতে, فَاءٌ উহ্য থেকে يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ-এর جَوَابٌ হবে। মূলত বাক্যটি হবে فَيَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ অর্থাৎ যখন উক্ত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হবে, তখন হে মানুষ! তুমি তোমার সাধনার ফল লাভ করবে।

অথবা, يُقَالُ لَهُ কথাটি উহ্য থেকে يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ-এর جَوَابٌ হবে। যেমন– فَيُقَالُ لَهُ يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ অর্থাৎ তখন বলা হবে, হে মানুষ!

ইমাম ফাররা (র.) বলেছেন, প্রথম اِذَا-এর جَوَابٌ হলো اَذِنَتْ এবং দ্বিতীয় اِذَا-এর جَوَابٌ হলো اَلْقَتْ আর উভয় স্থানে وَاوٌ অতিরিক্ত হয়েছে।

ইমাম ইবনুল আসায়ী (র.) উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এরূপ স্থানে وَاوٌ অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রচলন আরবি ভাষায় নেই; বরং আরবিতে শুধু حَتّٰى اِذَا ও لَمَّا-এর পরে وَاوٌ অতিরিক্ত হওয়ার প্রচলন রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– حَتّٰى اِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا এখানে حَتّٰى اِذَا-এর জবাব فُتِحَتْ-এর পূর্বে وَاوٌ অতিরিক্ত হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ এখানে لَمَّا-এর জবাব تَلَّهُ-এর পূর্বে وَاوٌ অতিরিক্ত হয়েছে।

ইমাম মুবাররাদ (র.) ও কিসায়ী (র.)-এর মতে, তার جَوَابٌ হলো فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ মূলত বাক্যটি হবে- إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَحُكْمُهُ كَذَا অর্থাৎ যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হুকুম হবে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

حُقَّتْ-এর অর্থ : حُقَّتْ অর্থ- أَطَاعَتْ অর্থ মেনে নিয়েছে। আর আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেওয়াই হলো আসমান ও জমিনের প্রকৃত এবং একমাত্র কাজ। কেননা তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এটা হযরত যাহ্হাকের অভিমত।

কারো মতে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার নির্দেশ শ্রবণ করার দায়িত্ব সুদৃঢ় করে দিয়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

اَلْكَدْحُ-এর অর্থ : আরবি ভাষায় اَلْكَدْحُ অর্থ- اَلْعَمَلُ وَالْكَسْبُ অর্থাৎ কাজ করা এবং উপার্জন করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, كَدْحٌ অর্থ رُجُوعٌ বা প্রত্যাবর্তন। মূল আয়াতের অর্থ হবে-হে মানুষ إِنَّكَ رَاجِعٌ إِلَى رَبِّكَ رُجُوعًا لَا مُحَالَةَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে মানুষকে তার আমলের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, হে মানুষ! তুমি যে চেষ্টা-সাধনা, শ্রম ও তৎপরতা করছ, তুমি যতই মনে কর যে, তা সবই কেবলমাত্র এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং তা সবই বৈষয়িক স্বার্থের জন্য মাত্র; কিন্তু আসলেই সচেতনভাবে হোক অথবা অচেতনভাবে-যাচ্ছ তুমি তোমার আল্লাহ তা'আলার দিকেই এবং শেষ পর্যন্ত তোমাকে সে পর্যন্ত পৌছেই ক্ষান্ত হতে হবে। পৌছতে না চইলেও তুমি সে পর্যন্ত পৌছতে বাধ্য।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে মানুষকে মানবতার মতো মর্যাদাবান গুণ দান করে সে গুণ উল্লেখ করে সম্বোধন করেছেন। যাতে তাদের মধ্যে এ চেতনা জাগে যে, একমাত্র তাদেরকেই ইনসানিয়াত বা মানবতা দান করা হয়েছে। কাজেই তোমার উচিত তোমার রবকে চিনা এবং তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে সকলের চাইতে অগ্রগামী হওয়া। সুতরাং বলা হয়েছে যে, তুমি তো এ জমিনে তোমার চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রেখেছ, আর এ চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে তুমি ক্রমাগতভাবে তোমার মহান রব-আল্লাহর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছ। দিন যত যাচ্ছে ততই তুমি তার সাক্ষাতের নিকটবর্তী হচ্ছ। তার কাছে পৌছা ছাড়া তোমার কোনোরূপ গত্যন্তর নেই।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.)-এর তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মানুষ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মানবতার যে গুণে বিশেষিত করেছেন, সে গুণের মর্যাদা রক্ষার্থে এগিয়ে আসো। দুনিয়ার কষ্টকে পরকালের তুলনায় তুচ্ছ মনে করো। দুনিয়ার আরামের উপর আখেরাতের আরামকে অগ্রাধিকার দাও। তাহলেই তুমি পরকালের শান্তি লাভ করবে মহাসফলতা হাসিল করে ধন্য হবে।

কারো কারো মতে আয়াতটির মর্মার্থ হলো, হে মানুষ! এ দুনিয়া তো সাধনার জায়গা, এটা আরামের জায়গা নয়। আরামের জায়গা হলো আখেরাত। আর আখেরাতে সে-ই আরামে থাকবে যে দুনিয়াতে ইবাদত করে ও সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

অথবা, এর মর্মার্থ হলো, হে মানুষ! যতক্ষণ তুমি সাধনা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করবে না। -[যিলাল]

এখানে اَلْإِنْسَانُ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহর বাণী يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ-এর মধ্যে اَلْإِنْسَانُ-এর দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আল-ইনসান দ্বারা এখানে আসাদ ইবনে আব্দুল আসাদ উদ্দেশ্য।

কারো কারো মতে, এর দ্বারা উবাই ইবনে খালফকে বুঝানো হয়েছে।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, আল-ইনসান দ্বারা এখানে কাফের উদ্দেশ্য।

ইমাম শাওকানী (র.) বলেছেন, আল-ইনসান দ্বারা অত্র আয়াতে মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে কেননা সকল মানুষই আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তথায় তাকে কর্মফল দেওয়া হবে।

অনুবাদ :

٧. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ كِتَابَ عَمَلِهٖ بِيَمِيْنِهٖ وَهُوَ الْمُؤْمِنُ .

৭. অতঃপর যাকে প্রদত্ত হয়েছে তার কর্মলিপি তার আমলনামা তার দক্ষিণ হাতে আর সে হলো মু'মিন ব্যক্তি।

٨. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا هُوَ عَرْضُ عَمَلِهٖ عَلَيْهِ كَمَا فُسِّرَ فِىْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَفِيْهِ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ وَبَعْدَ الْعَرْضِ يُتَجَاوَزُ عَنْهُ .

৮. অচিরেই তার হিসাব-নিকাশ সহজে গ্রহণ করা হবে তাকে শুধুমাত্র তার আমলনামা দেখিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যেমন বুখারী, মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীসে অনুরূপ উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসে এটাও উল্লিখিত আছে যে, আমলনামার ব্যাপারে যে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়বে, তার ধ্বংস অনিবার্য। মু'মিনকে তার আমলনামা দেখিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

٩. وَيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ فِى الْجَنَّةِ مَسْرُوْرًا بِذٰلِكَ .

৯. আর সে তার স্বজনদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে বেহেশতে প্রফুল্লচিত্তে এর কারণে।

١٠. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ هُوَ الْكَافِرُ تُغَلُّ يُمْنَاهُ اِلٰى عُنُقِهٖ وَتُجْعَلُ يُسْرَاهُ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ فَيَاْخُذُ بِهَا كِتَابَهٗ .

১০. আর যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎ দিক হতে প্রদত্ত হবে সে হলো কাফের, যার ডান হাত ঘাড়ের উপর এবং বাম হাত তার পিঠের পিছনে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। আর সে তা দ্বারা কর্মলিপি গ্রহণ করবে।

١١. فَسَوْفَ يَدْعُوْا عِنْدَ رُؤْيَةِ مَا فِيْهِ ثُبُوْرًا يُنَادِىْ هَلَاكَهٗ بِقَوْلِهٖ يَا ثُبُوْرَاهُ .

১১. অচিরেই সে আহ্বান করবে তাতে যা রয়েছে তা দেখার সময় ধ্বংসকে হায় ধ্বংস! বলে তার ধ্বংসকে আহ্বান করবে।

١٢. وَيَصْلٰى سَعِيْرًا يَدْخُلُ النَّارَ الشَّدِيْدَةَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَتَشْدِيْدِ اللَّامِ .

১২. আর জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কঠিন উত্তপ্ত আগুনে প্রবিষ্ট হবে। يَصْلٰى শব্দটি অপর এক কেরাতে يَا -এর মধ্যে পেশ, صَادْ-এর মধ্যে যবর ও لَامْ -এর মধ্যে তাশদীদ যোগে পঠিত হয়েছে।

١٣. اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ عَشِيْرَتِهٖ فِى الدُّنْيَا مَسْرُوْرًا بَطَرًا بِاتِّبَاعِهٖ لِهَوَاهُ .

১৩. সে তো ছিল তার পরিজনগণের মধ্যে দুনিয়াতে তার স্বজনদের মধ্যে উৎফুল্লচিত্ত কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব করে গর্বিত ছিল।

١٤. اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهٗ لَّنْ يَّحُوْرَ يَرْجِعَ اِلٰى رَبِّهٖ

بَلٰى ۚ يَرْجِعُ اِلَيْهِ .

১৪. যেহেতু সে ভাবত যে, اَنْ অব্যয়টি ছাকীলা হতে খাফীফাকৃত, আর এর اِسْم উহ্য অর্থাৎ اَنَّهٗ সে কখনো প্রত্যাবর্তন করে আসবে না তার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসবে না।

١٥. اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا عَالِمًا بِرُجُوْعِهٖ اِلَيْهِ .

১৫. হ্যাঁ, অবশ্যই সে তাঁর নিকট ফিরে যাবে। নিশ্চয় তার প্রতিপালক এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর প্রতি তার প্রত্যাবর্তন বিষয়ে অবগত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالَى لَنْ يَحُوْرَ : لَنْ يَحُوْرَ সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِىْ تَاكِيْد بِلَنْ মাসদার حَوْر জিনসে اَجْوَفْ وَاوِىْ অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা। ইমাম শাওকানী (র.) বলেছেন- اَلْحَوْرُ فِى اللُّغَةِ الرُّجُوْعُ অর্থাৎ حَوْر-এর আভিধানিক অর্থ হলো اَلرُّجُوْعُ প্রত্যাবর্তন করা।

হযরত ইকরামা ও দাউদ ইবনে হিন্দ (র.) বলেছেন, حَوْر শব্দটি হাবশী। অর্থাৎ رُجُوْع প্রত্যাবর্তন করা।

ইমাম রাগেব (র.) বলেছেন, اَلْحَوْرُ اَلتَّرَدُّدُ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ حَوْر কোনো বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যাওয়াকে বলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সহজ ও কঠোর হিসাবের পর্যালোচনা : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিচারের দিন মু'মিনগণ আমলনামা দক্ষিণ হস্তে লাভ করবে। তাদের হিসাব-নিকাশ হবে খুব সহজ। অর্থাৎ তাদের হিসাব গ্রহণে কোনো প্রকার কঠোরতা ও কড়াকড়ি করা হবে না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, তুমি অমুক কাজ করলে কেন? অমুক কাজ করেছ কেন তার কৈফিয়ত দাও? তাদের ভালো কাজের সাথে খারাপ কাজসমূহও আমলনামায় লিখিত থাকবে। কিন্তু ভালো কাজের ওজন যেহেতু পাপ কাজের তুলনায় অনেক বেশি হবে, সেহেতু তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে- কোনোই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের নিকট আনন্দচিত্তে দৌড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কাফের ও পাপিষ্ঠ লোকগণ আমলনামা লোক লজ্জায় সম্মুখ হতে গ্রহণ করতে চাইবে না। কারণ তারা নিজেরাই উপলব্ধি করবে যে, তারা অপরাধী। সুতরাং বাম হাত পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলে তাদের আমলনামা পিছন দিক হতে বাম হাতে দেওয়া হবে। তাদের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে খুব কঠোরতা ও কড়াকড়ি অবলম্বন করা হবে। সূরা রা'দে (১৮নং আয়াতে) তাদের হিসাবের কড়াকড়ির কথাটি বুঝাবার জন্য سُوْءُ الْحِسَابِ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় নবী করীম ﷺ হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইরশাদ করেছেন- 'কিয়ামতের দিন যারই হিসাব নেওয়া হবে সে কঠিন বিপদে পড়বে। হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে, মু'মিন লোকদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে এবং হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন এটা হলো আমলনামা পেশ হওয়ার কথা। কিন্তু যাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বুঝবে যে, সে ধরা পড়ল। -[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- আমি নবী করীম ﷺ-কে একবার নামাজে এ প্রার্থনা করতে শুনলাম- হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজে গ্রহণ কর। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হিসাব সহজ হওয়ার তাৎপর্য কি? জবাবে তিনি বললেন, হিসাব হাল্কা ও সহজ হওয়ার অর্থ হলো বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হে আয়েশা, সেদিন যার নিকট হতে হিসাব বুঝিয়ে নেওয়া হবে, জানবে, সে ধ্বংস হলো; ধরা পড়ল।

সারকথা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ কারো নিকট হিসাব চাইলে তার আর কোনো রক্ষা থাকবে না। হিসাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো হবে না। পার্থিব জীবনের যাবতীয় কূটযুক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে অসহায় ও নিরুপায় হয়ে থাকতে হবে। কাফেরগণ আমলনামা পিছন দিক হতে বাম হাতে পেয়ে বুঝবে তার রক্ষা নেই। এখনই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তাদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হবে তা কল্পনাতীত। তখন সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে, যেন মৃত্যুর মাধ্যমে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তা তো আর হবে না। নির্ধারিত শাস্তি অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে। তাই আল্লাহ বলেন, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং পার্থিব জীবনে পরিবার-পরিজন নিয়ে খুবই সানন্দে জীবন কাটাত, তাবত এদের পুনরুত্থান, পরকাল ও হিসাব-নিকাশ কোনো কিছুরই সম্মুখীন হতে হবে না; আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে না। তাদের এ ধারণা কোনোক্রমেই সত্য নয়। অবশ্যই তাদের মাহাবিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহর দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এটাই হলো উপরিউক্ত আয়তসমূহের তাৎপর্য।

اِلٰى اَهْلِهٖ-এর অর্থ : মহান আল্লাহর বাণী وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ আয়াতে اَهْلِهٖ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য কয়েকটি হতে পারে। যেমন এর অর্থ হলো- اِلٰى اَهْلِهِ الَّذِيْنَ هُمْ فِى الْجَنَّةِ مِنْ عَشِيْرَتِهٖ অর্থাৎ তার বংশের মধ্য হতে যারা বেহেশতে প্রবেশ করেছে তাদের কাছে।

অথবা, তার আপনজনদের নিকট যাবে, যারা ছিল দুনিয়াতে আপনজন। যেমন–স্ত্রী-পুত্রের মধ্য হতে যারা আগেই জান্নাতে প্রবেশ করেছিল।

অথবা, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু তার জন্য বেহেশতে তৈরি করে রেখেছেন, যেমন–হুর, গেলমান তাদের নিকট যাবে.

অথবা, যত জন উত্তম প্রতিদান পেয়েছে সবার নিকট গমন করবে। –[ফাতহুল কাদীর]

কারো মতে, أَهْل দ্বারা জান্নাতী সহচর যেমন– হুর, গেলমান ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা, সকল জান্নাতীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ...... ثُبُورًا : ইরশাদ হচ্ছে– আর পিঠের পিছনের দিক হতে যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। অচিরেই সে নিজেই নিজের ধ্বংস কামনা করবে, এ ব্যক্তি হবে কাফের। তার ডান হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে। আর বাম হাত পশ্চাতের দিকে করে দেওয়া হবে। বাম হাত দ্বারাই সে আমলনামা গ্রহণ করবে। আমলনামায় যখন সে নিজের পাপরাশি অবলোকন করবে এবং সম্ভাব্য আজাব অনুভব করতে পারবে তখন নিজের ধ্বংস কামনা করে এরূপ আজাব হতে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে জ্ঞান করবে এবং বলবে, আমার যদি মৃত্যু হয়ে যেত তাহলে কতই না ভালো হতো।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে তাকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। অথচ এখানে বলা হয়েছে পিছনের দিক হতে আমলনামা দেওয়া হবে। উভয় আয়াতের সমন্বয় কিভাবে হবে? : সূরা আল-হাক্কাতে বলা হয়েছে যে, কাফেরের আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে। আর এখানে বলা হয়েছে পিছন দিক হতে দেওয়া হবে। সম্ভবত তা এভাবে হবে যে, সে লোকটি তো ডান হাতে আমলনামা পাওয়া হতে পূর্বেই নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। কেননা সে তার নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত ছিল এবং তার দরুন বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। তবে সমগ্র মানব সমাজের সামনে প্রকাশ্যভাবে আমলানামা গ্রহণে তার লজ্জা ও অপমানবোধ অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে সে তার নিজের হাত পিছনের দিকে রাখবে। কিন্তু এ উপায়েও সে তার নিজের সর্বপ্রকারের আমলের লিখিত রিপোর্ট নিজ হাতে গ্রহণ করা হতে রক্ষা পাবে না। সে হাত বাড়িয়ে সামনা-সামনি তা গ্রহণ করুক কিংবা পিছনের দিকে হাত লুকিয়ে রাখুক, উভয় অবস্থায়ই তার হাতে তা অবশ্যই রেখে দেওয়া হবে।

কাফেরের আমলনামা কিভাবে দেওয়া হবে? : পরকালে কাফেরের আমলনামা কিভাবে কোথায় দেওয়া হবে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তার বাম হাত খুলে পেছনের দিকে স্থাপন করা হবে এবং সে অবস্থায় (বাম হাতে) আমলনামা দেওয়া হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, তার চেহারা পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই সে দিক হতেই সে আমলনামা পাবে।

কারো কারো মতে সে ডান হাতে আমলনামা পেতে চাইবে কিন্তু তাকে ডান হাতে দেওয়া হবে না। তখন সে তার বাম হাত পিছনের দিকে নিয়ে যাবে আর সে অবস্থায়ই বাম হাতে তাকে আমলনামা দেওয়া হবে।

ইমাম কালবী (র.) বলেছেন, কাফেরের ডান হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে থাকবে এবং বাম হাত পিছনের দিকে থাকবে। কাজেই তার বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

يَصْلَىٰ-তে কয়েকটি কেরাত : يَصْلَىٰ শব্দে তিনটি কেরাত বর্ণিত আছে,

১. ইবনে আমের ও কিসাইর কেরাত হলো– يَصْلَىٰ -এর يَا -এর উপর পেশ, صَادْ-এর উপর যবর এবং لَامْ-এর উপর তাশদীদ-যবর, যেমন– আল্লাহর বাণী ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ। صَلُّوْا বাবে تَفْعِيْل হতে ব্যবহৃত]।

২. বাকি ক্বারীগণ يَا-এর উপর যবর, صَادْ-এর উপর জযম এবং লামের উপর এক যবর দিয়ে পড়েছেন। তখন উক্ত ক্রিয়াটি لَازِمْ হবে, মুতায়াদ্দী নয়। যেমন– কুরআন মাজীদে অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ এবং ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ

৩. হযরত আসেম, নাফে' ও ইবনে কাছীর থেকে বর্ণিত হয়েছে يَا-এর উপর পেশ, صاد-এর উপর জযম এবং লামের উপর এক যবর। যেমন, কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– تَصْلَىٰ نَارًا

মূলত نَزَلَ وَأَنْزَلَ-এর মতো صَلَىٰ وَأَصْلَىٰ দু'টি لُغَةٌ ব্যবহৃত হয়েছে। –[কুরতুবী]

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا-এর অর্থ : উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো– এসব কাফেরের দলেরা পার্থিব জীবনে আপনজনদের সাথে খুব আনন্দঘন পরিবেশ মগ্ন ছিল। নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে চলত। পরকালের কোনো চিন্তা ছাড়াই হীন-লালসা চরিতার্থ করতে সময় ব্যয় করছে। অতএব, তারা কিয়ামতের দিন বেশি চিন্তিত এবং শাস্তির যোগ্য হবে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে বেশ কষ্ট করছে। এ কারণে কিয়ামতের দিন তারাই শান্তির মধ্যে থাকবে।

ثُبُورًا-এর অর্থ : ثُبُورًا শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ হলো– ধ্বংস, মৃত্যু, অভিশাপ, বঞ্চিতকরণ ইত্যাদি। আয়াতে উদ্দেশ্য হলো– যখন কাফিরগণ আমলনামা হাতে পাবে, তখন يَا ثُبُوْرَهُ বলে আফসোস করতে থাকবে। অর্থাৎ মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে; কিন্তু তাদের আর মৃত্যু হবে না।

পৃথিবীতে কাফেরদের আনন্দের কারণ : কাফেরগণ দুনিয়ার জীবনে আমোদ-প্রমোদে বসবাস করেছিল। আনন্দঘন পরিবেশে মেতে উঠেছিল। কেননা, তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রকটভাবে কাজ করেছিল যে, কোনো প্রকারেই পুনরুত্থান সম্ভব নয়। আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি বলতে কিছুই হবে না। এ দুনিয়ার জীবনই শেষ জীবন। পরকাল বলতে কিছুই নেই। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا : অত্র আয়াতে بَلَى-এর মর্মার্থ : কাফির তো ধারণা করে বসেছিল যে, তাকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই তাকে তার রবের নিকট ফিরে আসতে হবে। আর ফিরে যে আসতেই হবে তা তার রব [আল্লাহ] খুব ভালোভাবেই অবহিত আছেন।

بَلَى দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী بَلَى দ্বারা অত্র আয়াতে কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে بَلَى দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّ بَلْ يَحُوْرُ وَيَرْجِعُ অর্থাৎ কাফির যা মনে করে নিয়েছে প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; বরং সে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে– ফিরে যেতে অবশ্যই বাধ্য।

অথবা, بَلَى -এর মর্মার্থ হলো إِنَّ اللّٰهَ يُبَدِّلُ سُرُوْرَهُ بِغَمِّهِ لَا يَنْقَطِعُ অর্থাৎ আল্লাহ তাকে আনন্দের পরিবর্তে এমন বিষাদ দান করবেন যে, যা কোনো দিন শেষ হবে না।

অথবা এর মর্মার্থ হলো, لَيُبْعَثَنَّ অর্থাৎ তাকে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করা হবে। –[কাবীর]

كَانَ بِهِ بَصِيرًا দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ হতে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, কাফেরকে যে, আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তা আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবহিত আছেন।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, সে কখন পুনরুত্থিত হবে আল্লাহ তা'আলা তা ভালোভাবে অবগত আছেন।

হযরত আ'তা (র.)-এর মতে, সে যে পাপী হবে তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

ইমাম কালবী (র.) বলেন, ঐ কাফেরের সৃষ্টি হতে, পুনরুত্থান পর্যন্ত সবই আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টি গোচরে রয়েছে।

অথবা, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন।

অনুবাদ :

١٦. فَلَا أُقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ بِالشَّفَقِ هُوَ الْحُمْرَةُ فِى الْأُفُقِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ -

১৬. আমি শপথ করে বলছি لا এখানে অতিরিক্ত পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা লালিমার সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশের কিনারায় রক্তিম আবরণকে شَفَق বলা হয়।

١٧. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا -

১৭. আর রাতের এবং তা যা কিছু সমবেত করে তার জন্তু-জানোয়ারের মধ্য হতে যারা দিনে বিচ্ছিন্ন ছিল, রাত তাদেরকে একত্রিত করে।

١٨. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ اِجْتَمَعَ وَتَمَّ نُوْرُهُ وَذٰلِكَ فِى اللَّيَالِى الْبِيْضِ -

১৮. আর চন্দ্রের যখন তা পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হয় অর্থাৎ পরিপূর্ণ হয় এবং তার আলোকরশ্মি পূর্ণভাবে বিকিরণ করে। আর এ অবস্থা হয় মাসের আধা-আধি কয়েকটি রাত্রিতে।

١٩. لَتَرْكَبُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَصْلُهُ تَرْكَبُوْنَنَّ حُذِفَتْ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِى الْأَمْثَالِ وَالْوَاوُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ حَالًا بَعْدَ حَالٍ وَهُوَ الْمَوْتُ ثُمَّ الْحَيَاةُ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ -

১৯. অবশ্যই তোমরা উপনীত হবে হে মানুষ, মূলত تَرْكَبُوْنَنَّ ছিল। কয়েকটি নূন একত্র হওয়াতে نُوْن رَفْع-কে উহ্য করা হয়েছে। তারপর দু'সাকিন একত্র হওয়াতে وَاوْ-কে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক স্তর হতে অন্য স্তরে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায়। আর তা হলো মৃত্যু। তারপর জীবন, তারপর কিয়ামাতের অবস্থাসমূহ।

٢٠. فَمَا لَهُمْ أَىِ الْكُفَّارِ لَا يُؤْمِنُوْنَ أَىْ أَىُّ مَانِعٍ لَهُمْ مِنَ الْإِيْمَانِ أَوْ أَىُّ حُجَّةٍ لَهُمْ فِىْ تَرْكِهِ مَعَ وُجُوْدِ بَرَاهِيْنِهِ -

২০. তাদের কি হলো অর্থাৎ কাফেরদের যে, তারা ঈমান আনে না অর্থাৎ কোন্ প্রতিবন্ধক তাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখছে অথবা ঈমানের অনেক প্রমাণ থাকার পরও বিরত থাকার কোন দলিল তাদের কাছে রয়েছে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

شَفَق-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) شَفَقْ-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– هُوَ الْحُمْرَةُ فِى الْأُفُقِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায়, তাকে شَفَقْ বলে।

এখানে شَفَقْ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও জমহুর মুফাস্সিরগণের মতে এটা দ্বারা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের রক্তিম মেঘমালার কথা বুঝানো হয়েছে।

হযরত ওয়াসিম (র.) বলেছেন, এটা দ্বারা সমগ্র দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা দ্বারা দিনের শেষাংশকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সূর্যাস্তের পর রক্তিম আভা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর যে সাদা আভা দেখা যায় এখানে شَفَقْ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। –[খাযেন]

উল্লিখিত বস্তুত্রয়ের শপথ করার কারণ : এ আয়াত কয়টিতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তুর শপথ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে পশ্চিম আকাশের রক্তিম আভা, রাত্রি ও রাত্রির আচ্ছাদিত বস্তুসমূহ, পূর্ণ চন্দ্র। এদের মাধ্যমে শপথ করার তাৎপর্য এই যে, দিবসের মধ্যে যত কিছু রয়েছে রাত্রিকালে যে সকল জীব এসে নিজ আস্তানায় বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং চন্দ্রের পূর্ণতা সবকিছুর

মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর কুদরতেই দিবসের শেষ হয়ে রাত্রির আগমন, রাত্রির কালো আঁধার শেষ হয়ে দিবসের পুনঃ আগমন ঘটে। তদ্রূপ চন্দ্রের পূর্ণতা লাভ এবং ক্রমান্বয়ে আবার তা নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া ও আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়ে থাকে। অতএব, এটা যেমন বাস্তব সত্য, তদ্রূপ মানব জীবনেরও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে চিরন্তন জীবন লাভ করা বাস্তব সত্য। মানুষ প্রথম পর্যায়ে পিতা-মাতার দেহে শুক্রকীট আকারে ছিল। সে শুক্রকীট মাতৃগর্ভে একটি পূর্ণ মানুষের আকৃতি ধারণ করে দুনিয়াতে আগমন করে। তারপর সে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল পার করে বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং সব শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পুনরায় তাকে জীবিত করা হবে এবং হিসাব-নিকাশের পর জান্নাত অথবা জাহান্নামে চলে যাবে–তথায় সে চিরদিন থাকবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى "طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ" : طَبَقٌ বলা হয় মূলত যা অন্য একটির মতো হয়। যেমন বলা হয় مَا هٰذَا بِطَبَقٍ كَذَا অর্থাৎ এটা ওটার মতো নয়। একই ধরনের দু'টি অবস্থাকে مُطَابَقَةٌ বলা হয়। এখানে طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ বলতে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে–কাঠিন্যতা এবং ভয়াবহতার দিক থেকে এক অবস্থা অন্য অবস্থার মতো।

অথবা, এখানে طَبَقٌ শব্দটি طَبَقَةٌ-এর বহুবচন হতে পারে। তখন এর অর্থ হবে– পর্যায় বা ধাপ। অর্থাৎ হে মানব, তোমরা কয়েকটি অবস্থায় পরপর উপনীত হবে, যেগুলো কাঠিন্যতার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের। একটি পর্যায় অন্য পর্যায় থেকে উচু, আর তা হলো মৃত্যু। তারপর কিয়ামতের বিভীষিকা এবং ভায়াবহ অবস্থা। হযরত আতা (র.) বলেন, এর অর্থ হলো দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন অবস্থা। –[নূরুল কোরআন]

لَتَرْكَبُنَّ-এর কেরাতসমূহ ও অর্থ : কারো মতে لَتَرْكَبُنَّ-এর بَاءٌ তে পেশ দিয়ে। তখন সকল মানুষকে সম্বোধন করা বুঝাবে। তখন অর্থ হবে– হে মানুষ, তোমরা একের পর এক ব্যাপারে, এক ধাপের পর অন্য ধাপে, এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় এবং এক পর্যায়ের পর অন্য পর্যায়ে উপনীত হবে। শেষ পর্যন্ত বেহেশতের উপযোগীকে বেহেশতে এবং দোজখের উপযোগীকে দোজখে প্রেরণের ব্যবস্থা হবে। এখানে মানুষের সৃষ্টির ধাপের দিকে তাকিয়ে অন্য একটি অর্থ এভাবেও করা যায় যে, মানুষ নুতফা থেকে ধাপে ধাপে 'মানুষ' আকার লাভ করে। তারপর মৃত্যুবরণ করে, তারপর বরযখে, তারপর হাশরে, সর্বশেষ হয় বেহেশতে, না হয় দোজখে স্থানান্তর হবে।

কেউ কেউ لَتَرْكَبَنَّ -بَاءٌ-এর উপর যবর এবং গায়েবের সীগাহ পড়েছেন। এখানে বালাগাতের নিয়মে اِلْتِفَاتٌ হয়েছে অর্থাৎ গায়েবের সর্বনামটি মুহাম্মদ ﷺ-এর দিকে ফিরেছে। আবার কারো মতে, قَمَرٌ-এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। কেননা চন্দ্র বিভিন্ন অবস্থায় রূপ পরিবর্তন করে।

কারো মতে, بَاءٌ-কে تَاءٌ আর بَاءٌ-কে যের দিয়ে। তখন نَفْس-কে খেতাব হবে। –[রূহুল মা'আনী, কাবীর]

فَمَا لَهُمْ-এর মধ্যকার প্রশ্নবোধকের অর্থ : فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতের মধ্যকার প্রশ্নবোধক تَعَجُّبٌ বা اِنْكَارٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শপথ করার মাধ্যমে তাঁর কুদরতে কামেলার নিদর্শনগুলোকে বলিষ্ঠতার সাথে তুলে ধরেছেন। যার মাধ্যমে পরকালের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। অতএব, কেন তারা ঈমান আনবে না, এর উপর আশ্চার্যবোধ করতে হয়। ঈমান না আনা তাদের নিকট থেকে হঠকারিতা বৈ আর কিছু হতে পারে না। –[কাবীর]

فَمَا لَهُمْ-এর فَاءٌ-এর অর্থ : এখানে فَاءٌ পূর্ববর্তী اِنْكَارٌ এবং পরবর্তী تَعَجُّبٌ-এর تَرْتِيْب তথা ধারাবাহিকতার জন্য নেওয়া হতে পারে। অর্থাৎ প্রথমে কিয়ামতের অবস্থা এবং দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, তাদের অবস্থা যখন কিয়ামতে এরূপই হবে তখন ঈমান নেওয়ার ব্যাপারে বাধা কোথায়?..... কেন ঈমান গ্রহণ করছে না?

অথবা, فَمَا-এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদার تَرْتِيْب বুঝানো হয়েছে। এটা সে সময় হবে যখন لَتَرْكَبُنَّ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হবে। অর্থ হবে– যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শান এবং অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে তাহলে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে কোন বস্তু বাধা হিসাবে কাজ করছে? অথবা, পিছনে আল্লাহর কুদরতের যে সমস্ত নিদর্শন আলোচিত হয়েছে তার সাথে تَرْتِيْب দিয়ে فَمَا বলা হয়েছে অর্থাৎ "যখন আল্লাহর শান এরূপই আছে যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও মহাজ্ঞানী তখন কোন বস্তু পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যে পরকাল আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে সংঘটিত বস্তুসমূহের একটি?" –[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

২১. وَمَا لَهُمْ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ط يَخْضَعُونَ بِأَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ لِإِعْجَازِهِ.

২১. আর তাদের কি হলো যে, যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদা করে না? (এরা সামান্য) মাথা নত করে না। এটা এক (জীবন্ত) মু'জিযা হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি ঈমান আনে না।

২২. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بِالْبَعْثِ وَغَيْرِهِ.

২২. বরং কাফেররা তো অস্বীকার করে পুনরুত্থান ও অন্যান্য বিষয়কে।

২৩. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ يَجْمَعُونَ فِي صُحُفِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ وَأَعْمَالِهِمِ السُّوْءِ.

২৩. আল্লাহ ভালো করেই জানেন যা তারা জমা করেছে তারা তাদের আমলনামায় কুফর, অস্বীকৃতি ও অন্যান্য যেসব পাপকার্য সংরক্ষণ করছে।

২৪. فَبَشِّرْهُمْ أَخْبِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مُؤْلِمٍ.

২৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে সু-সংবাদ দিন তাদেরকে সংবাদ দিন-যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির পীড়াদায়ক।

২৫. إِلَّا لٰكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ غَيْرُ مَقْطُوعٍ وَلَا مَنْقُوصٍ وَلَا يُمَنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ.

২৫. হ্যাঁ, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য বিনিময় রয়েছে অশেষ যা কখনও নিঃশেষ হবে না হ্রাস পাবে না এবং এর কারণে তাদেরকে খোঁটাও দেওয়া হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا قُرِئَ .... الخ আয়াতের শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ একবার আয়াতে কারীমা وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ পাঠ করলেন এবং সেজদা করলেন, তাঁর সাথে মু'মিনগণও সেজদা করলেন। এ দৃশ্য দেখে কাফের ও মুশরিকরা হাত তালি এবং শীষ দেওয়া শুরু করল। তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন যে, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকদের সামনে যখন কুরআন মাজীদ পাঠ করে শুনানো হয় তখন তারা এর সম্মানে সিজদাবনত হয় না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আর কাফের ও মুশরিকদের কি হলো যখন তাদের সামনে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তারা সেজদা করে না কেন? অত্র আয়াতে সেজদা না করার মর্মার্থ কি– এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, তারা কুরআনের সামনে মাথা নত করে না তথা কুরআন (জীবন্ত) মু'জিযা হওয়া সত্ত্বেও তারা এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো, তারা সেজদা করে না কেন? অর্থাৎ এর জাহেরী [বাহ্যিক] অর্থ উদ্দেশ্য।

ইমাম আবূ মুসলিম এর অর্থ করেছেন, তারা বিনয় এবং প্রশান্তি [তথা খুশু-খুযু]-এর সাথে আল্লাহর ইবাদত করে না। হযরত হাসান, আতা, কালবী এবং মুকাতিল প্রমুখগণের মতে এর অর্থ হলো مَا لَهُمْ لَا يُصَلُّونَ অর্থাৎ তাদের কি হয়েছে তারা নামাজ পড়ে না কেন?

আলোচ্য আয়াত (وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الخ)-এর মধ্যে সিজদা ওয়াজিব কিনা? : সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ অত্র আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করেছেন। ইমাম মালিক, মুসলিম ও নাসায়ী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নামাজে এ আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করেছেন এবং বলেছেন যে, স্বয়ং নবী করীম ﷺ এখানে সিজদা করেছেন।

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র.) হযরত আবূ রাফে' (রা.)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন, একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এশার নামাজে এ সূরা পাঠ করেছেন এবং সেজদা করেছেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন, আমি আবুল কাসেম তথা নবী করীম ﷺ -এর ইমামতিতে নামাজ পড়েছি। তিনি এখানে সেজদা করেছেন। কাজেই আমি মৃত্যু পর্যন্ত অবশ্যই এ সিজদা করতে থাকবো।

মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র.) প্রমুখগণের উদ্ধৃত অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে এ সূরায় এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ -এর মধ্যে সিজদা করেছি।

ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এখানে সেজদা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এখানে সেজদা করা সুন্নত। ইবনুল আরবী (র.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, আমি যখন ইমামতি করতাম তখন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতাম না। কেননা আমি এতে সেজদা দেওয়া জরুরি মনে করতাম এবং সাধারণ লোকেরা এখানে সিজদা দেওয়ার বিরোধিতা করত। কাজেই যখন আমি একাকী নামাজ পড়তাম শুধু তখনই তা তেলাওয়াত করতাম এবং সেজদাও দিতাম। কেননা কৌশলগত কারণে কোনো কোনো বিষয় সময় সময় এড়িয়ে যেতে হয়। যেমন– নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আয়েশা! যদি তোমার সম্প্রদায় নব মুসলিম না হতো তাহলে আমি কা'বা শরীফকে ভেঙ্গে পুনরায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তির উপর স্থাপন করে দিতাম।

তারা কেন অস্বীকার করত? : তারা [কাফেরগণ] কুরআনকে অস্বীকার করত। এ কারণে সেজদা করত না।

কারো মতে, তারা রাসূল-মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করত। তাই তাদের কাছে তাঁর উপস্থাপিত কোনো কিছুই ভালো লাগত না; বরং কোনো কিছু উত্থাপিত হলে অস্বীকারের সুরই বেজে উঠত।

يُوْعُوْنَ -এর অর্থ এবং তার উদ্দেশ্য : আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, يُوْعُوْنَ অর্থ يُضْمِرُوْنَ অর্থাৎ গোপন করে রাখে। আয়াতের অর্থ হবে– يُضْمِرُوْنَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْحَسَدِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْبَغْيِ অর্থাৎ তারা তাদের অন্তরে কুফরি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং অবাধ্যতার মধ্য হতে যা লুকিয়ে রাখে আল্লাহ তা'আলা তা ভালো করেই জানেন। মূলত اِيْعَاءٌ অর্থ কোনো বস্তুকে وِعَاءٌ বা পাত্রতে স্থাপন করা।

মুফরাদাতে রাগেব এ আছে– اَلْاِيْعَاءُ حِفْظُ الْاَمْتِعَةِ فِيْ وِعَاءٍ

পাত্রতে মালামাল সংরক্ষণ করাকে اِيْعَاءٌ বলা হয়। এ অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

কেউ কেউ اِيْعَاءٌ অর্থ جَمْعٌ অর্থাৎ 'সঞ্চয় করা' বলেছেন। যেমন, ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন– তারা তাদের আমলনামায় খারাপ কৃতকর্ম হতে যতকিছু সঞ্চয় করেছে, আল্লাহ সবকিছু জানেন।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাদের অস্বীকারের পিছনে অনেক বড় বড় কুমন্ত্রণা লুক্কায়িত আছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেগুলো আল্লাহ জানেন।

কেউ কেউ বলেন, তারা তাদের অন্তরে কুরআন সত্য হওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত দলিল গোপন করে রেখেছে, আল্লাহ তা ভালো করে-ই অবগত আছেন। –[রূহুল মা'আনী]

يُوْعُوْنَ শব্দে দু'টি কেরাত : জমহুর এখানে يُوْعُوْنَ [বাবে اِفْعَالٌ থেকে বহুবচন, পুংলিঙ্গ] পড়েছেন। আবূ রাজা وَعٰى থেকে يَعُوْنَ পড়েছেন।

بِشَارَةٌ ছাড়া অন্য শব্দ উল্লেখ না করার কারণ : بِشَارَةٌ (শুভ সংবাদ) মূলত খুশির সংবাদে হয়ে থাকে; কিন্তু عَذَابٌ اَلِيْمٌ ক কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি কোনো দিন শুভ সংবাদ বা খুশির খবর হতে পারে না। তথাপি আল্লাহ তা'আলা এখানে نَبَشِّرْهُمْ বলেছেন।...... কেননা এর দ্বারা তাদের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য।

অথবা, তারা সারা জীবন গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকার কারণে বুঝা যায় যে, গুনাহের কাজের প্রতি তাদের লিপ্সা রয়েছে। এটাই তাদের ইপ্সিত বস্তু। প্রাপ্য বস্তুর খবর দেওয়া একটি খুশির ব্যাপার। তাই খুশির শব্দ-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

কারো মতে নবী করীম ﷺ এ দুনিয়াতে রহমত স্বরূপ এসেছেন। খারাপ বা কঠোর শব্দ ব্যবহার করা তাঁর শানের খেলাফ। তাই শব্দের মধ্যে মাধুর্যতা এবং বিনয়তা প্রকাশের জন্য فَبَشِّرْهُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। دَاعِيْ দের ভাষা ভালো এবং মোলায়েম হওয়ার দিকেও এটা ইঙ্গিত বহন করে। –[রূহুল মা'আনী]

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তে اِلَّا -এর অর্থ : اِلَّا একটি হরফে ইস্তিছনা, এটা দ্বারা পূর্বের হুকুমকে নফী করে দেওয়া হয়। তবে আয়াতে اِلَّا দ্বারা اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ উদ্দেশ্য। তাই যেন বলা হয়েছে যে, لٰكِنَّ الَّذِيْنَ صَدَّقُوْا بِشَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ যারা 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'–এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে কোনো اِسْتِثْنَاءٌ -ই নেই; বরং اِلَّا অর্থ এখানে وَاوْ যেন আল্লাহ এভাবে বলেছেন– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ –[কুরতুবী]

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ : সূরা আল-বুরূজ

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের 'আল-বুরূজ' শব্দ অবলম্বনে। এতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য ও ৪৩৮টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : এ সূরাটি মহানবী ﷺ -এর মাক্কী জীবনের সূরাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষভাগে অবতীর্ণ হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর ক্রমাগতভাবে দীনের দাওয়াতের ফলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করছিল। ইসলামের এ ক্রমোন্নতি ছিল মক্কার কাফের সর্দারদের নিকট অসহনীয়। তারা দীনের দাওয়াত ও আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ই অবলম্বন করল। অসহায়-দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করা; ধূসর মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে হাত-পা বেঁধে রাখা, জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা দেহে দাগ কাটা, শূলীতে চড়ানো, মারপিট করা ইত্যাদি কোনো পন্থাই তারা হাতছাড়া করল না। এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য-সনাতন দীন ইসলাম হতে সে সকল লোককে ফিরিয়ে রাখা। এ সময়ই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ও কাফের উভয় দলের শিক্ষার জন্য এ ঐতিহাসিক তত্ত্বসমৃদ্ধ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : কাফেররা ঈমানদারদের উপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল, তার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং সে সঙ্গে মুসলমানদেরকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া যে, তারা যদি এ জুলুম-নির্যাতনের মুখেও নিজেদের ঈমান ও আদর্শের উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকতে পারে, তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দেওয়া হবে এবং আল্লাহ এ জালেমদের হতে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন–এটাই হলো এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য।

এ প্রসঙ্গে সূরাটির প্রথমে আসহাবে উখদূদের কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদার লোকদেরকে অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিল। এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, উখদূদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হয়ে গেছে মক্কার কাফের সর্দাররাও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয়ত, তখনকার সময় ঈমানদার লোকেরা যেভাবে অগ্নিগর্তে নিক্ষিপ্ত হতে ও প্রাণের-কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়েছিল; কিন্তু ঈমানের অমূল্য সম্পদ হারাতে কোনোক্রমেই প্রস্তুত হয়নি। অনুরূপভাবে বর্তমানে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হলো সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন অকাতরে বরদাশত করে নেওয়া আর ঈমানের মহা মূল্যবান ধন কোনো অবস্থাই ইস্তচ্যুত না করা।

তৃতীয়ত, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে কাফেররা ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ঈমানদার লোকেরাও তার উপর অবিচল থাকতে বদ্ধ পরিকর সে আল্লাহ সর্বজয়ী সর্বশক্তিমান। তিনিই জমিন ও আসমানের একচ্ছত্র মালিক। তিনি স্বীয় সত্তায় প্রশংসিত। তিনি উভয় সমাজের লোকদের অবস্থা দেখছেন। কাজেই কাফেররা তাদের কুফরির শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। শুধু এটাই শেষ নয়; বরং তা ছাড়াও তাদের এ জুলুমের শাস্তি স্বরূপ দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে ঈমানদার লোকেরা নেক আমল করে জান্নাতে যাবে। এটাই তাদের বিরাট ও চূড়ান্ত সাফল্য-এটাও নিঃসন্দেহে। এরপর কাফেরদেরকে সর্তক করা হয়েছে এ বলে যে; আল্লাহর পাকড়াও নিশ্চিত ও অত্যন্ত শক্ত। তোমাদের মনে জনশক্তির কারণে যদি কোনো অহমিকতা জেগে থাকে, তাহলে তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমাদের পূর্বে ফিরাউন ও নমরুদের জনশক্তি বিন্দুমাত্র কম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদের জনতার যে পরিণতি ঘটেছে তা দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। আল্লাহর অমোঘ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে আছে। এ গ্রাস হতে তোমরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। তোমরা যে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ ও অবিশ্বাস করার জন্য বদ্ধ পরিকর, সে কুরআনের প্রতিটি কথা অটল অপরিবর্তনীয়। তা এমন সুরক্ষিত যে, তার লেখা পরিবর্তন করার শক্তি কারো নেই।

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-বুরূজ মক্কায় অবতীর্ণ

اِثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ اٰيَةً : ২২ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ لِلْكَوَاكِبِ اِثْنَا عَشَرَ بُرْجًا تَقَدَّمَتْ فِى الْفُرْقَانِ.

১. শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের নক্ষত্ররাজির জন্য বারটি বুরূজ; যে সম্পর্কে সূরা আল-ফোরকানে আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে।

٢. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২. আর শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের কিয়ামত দিবসের।

٣. وَشَاهِدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَشْهُوْدٍ يَوْمِ عَرَفَةَ كَذَا فُسِّرَتِ الثَّلٰثَةُ فِى الْحَدِيْثِ فَالْاَوَّلُ مَوْعُوْدٌ بِهٖ وَالثَّانِىْ شَاهِدٌ بِالْعَمَلِ فِيْهِ وَالثَّالِثُ يَشْهَدُهُ النَّاسُ وَالْمَلَائِكَةُ وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ صَدْرُهُ اَىْ لَقَدْ.

৩. এবং শপথ দ্রষ্টার [উপস্থিতের] জুমার দিনে ও দৃষ্টের [উপস্থাপিতের] আরাফার দিনে। হাদীসে এ শব্দত্রয়ের এরূপ তাফসীরই উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং প্রথমটি দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য, যেহেতু তা প্রতিশ্রুত দিন, দ্বিতীয়টি দ্বারা জুমার দিন উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আমলের জন্য সাক্ষ্যদানকারী বা আমল প্রত্যক্ষকারী, আর তৃতীয়টি দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য, যেহেতু সেদিন মানুষ ও ফেরেশতাগণ সমবেত হয়। আর কসমের জবাবের প্রথমাংশ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لَقَدْ অবশ্যই।

٤. قُتِلَ لُعِنَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ الشَّقِّ فِى الْاَرْضِ.

৪. ধ্বংস হয়েছে অভিশপ্ত কুণ্ডের অধিপতিগণ জমিনে গর্ত

٥. النَّارِ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْهُ ذَاتِ الْوَقُوْدِ مَا تُوْقَدُ فِيْهِ.

৫. অগ্নির এটা পূর্বোক্ত اُخْدُوْد হতে بَدَلُ اشْتِمَالٍ য ইন্ধনপূর্ণ যা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।

٦. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا اَىْ حَوْلَهَا عَلٰى جَانِبِ الْاُخْدُوْدِ عَلَى الْكَرَاسِىِّ قُعُوْدٌ.

৬. যখন তারা তদুপরি এর পার্শ্বে কুণ্ডের কিনারায় আসনসমূহে উপবিষ্ট ছিল।

٧. وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ مِنْ تَعْذِيْبِهِمْ بِالْاِلْقَاءِ فِى النَّارِ اِنْ لَّمْ يَرْجِعُوْا عَنْ اِيْمَانِهِمْ شُهُوْدٌ حُضُوْرٌ رُوِىَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْجَى الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُلْقَيْنَ فِى النَّارِ بِقَبْضِ اَرْوَاحِهِمْ قَبْلَ وُقُوْعِهِمْ فِيْهَا وَخَرَجَتِ النَّارُ اِلٰى مَنْ ثَمَّ فَاَحْرَقَتْهُمْ.

৭ আর তারা যা করছিল ঈমান আনয়নকারীগণের সাথে আল্লাহর প্রতি, ঈমান হতে বিরত না হলে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার শাস্তি তা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষাৎদর্শী বা উপস্থিত। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত মু'মিনগণকে তাতে পতিত হওয়ার পূর্বেই রূহ কবজ করার মাধ্যমে মুক্তি দান করেছেন। আর আগুন তথায় উপবিষ্টজনের প্রতি লেলিহান শিখা বিস্তার করে তাদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْأُخْدُودُ : اَلْأُخْدُوْدُ শব্দের অর্থ হলো, اَلشَّقُّ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ জমিনে গর্ত করা। একবচন, বহুবচনে اَخَادِيْد এখান থেকেই خَدٌّ [চোয়াল] ব্যবহৃত হয়। কেননা, خَدٌّ (চোয়াল) দিয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে। আর مِخَدَّةٌ অর্থ– বালিশ। কেননা চোয়াল সেখানে রাখা হয়। –[কুরতুবী]

ঐ জালিমরা জমিনে গর্ত করেছিল। এ গর্তকে আগুন জ্বেলে পরিপূর্ণ করেছিল। তাদেরকে আগুনের আসহাব না বলে গর্তের আসহাব বলা হয়েছে। কেননা গর্তটি সম্পূর্ণ আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, মনে হয় যেন, গর্তটিই মু'মিনদেরকে পুড়েছিল, আর ঐ গর্তের মালিক ছিল সে জালিমগণ।

قُتِلَ الخ-এর মহল্লে ই'রাব : قُتِلَ ক্রিয়াটি কসমের জবাব হয়েছে। তবে এখানে لَقَدْ উহ্য রয়েছে। যেমন উহ্য রয়েছে আল্লাহর বাণী وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (ثُمَّ قَالَ) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا আয়াতে। অর্থাৎ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এরপর জবাবের মধ্যে لَقَدْ হওয়া দরকার ছিল; কিন্তু لَقَدْ না বলে শুধু قَدْ اَفْلَحَ বলা হয়েছে। এটা ইমাম ফাররার অভিমত।

কারো মতে, মূলত এখানে মূল ইবারতকে আগে পরে করতে হবে। যেমন মূলে ছিল– قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এ মতটি ইমাম আবূ হাতিম সিজিস্তানীর। –[কুরতুবী]

ঐ জালিমরা জমিনে গর্ত করেছিল। সে গর্তকে আগুন জ্বেলে পরিপূর্ণ করেছিল। তাদেরকে আগুনের আসহাব না বলে গর্তের আসহাব বলা হয়েছে। কেননা গর্তটি সম্পূর্ণ আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, মনে হয় যেন, গর্তটিই মু'মিনদেরকে পুড়েছিল, আর সে গর্তের মালিক ছিল ঐ জালিমগণ।

اَلنَّارُ শব্দের মহল্লে ই'রাব এবং অর্থ :

১. اَلنَّارُ শব্দটি اَلْاُخْدُوْدُ হতে بَدَلُ اشْتِمَالٍ হিসাবে মাজরূর হয়েছে; কিন্তু رَابِطٌ নেই বিধায় প্রশ্ন জাগে। তখন বলা হয় যে, رَابِطٌ হলো উহ্য فِيْهِ অথবা اَلنَّارُ তথা আগুন যে اُخْدُوْدٌ তথা গর্তে ছিল একথা সকলেরই জানা, তাই رَابِطٌ-এর প্রয়োজন নেই।

২. আবূ হাইওয়ান بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ হিসেব মাজরূর পড়েছেন। এভাবে যে, এখানে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اُخْدُوْدُ النَّارِ

৩. কেউ কেউ اَلنَّارُ-কে উহ্য ক্রিয়ার ফায়েল হিসাবে মারফূ' পড়েছেন। মূলবাক্য হবে قَتَلَتْهُمُ النَّارُ এমতাবস্থায় هُمْ দ্বারা মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং পিছনের اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ দ্বারাও মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। তখন قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ এর قُتِلَ শব্দটি لُعِنَ না হয়ে মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হবে। অথবা কাফের উদ্দেশ্য হয়ে قُتِلَ তার মূল অর্থেই ব্যবহৃত হবে। যেমন রাবী ইবনে আনাস, কালবী, আবুল আলিয়া আবূ ইসহাক বলেন– ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর একটি প্রবল বাতাস প্রেরণ করে তাদের রূহসমূহ গ্রহণ করেছেন। সে বাতাসে গর্ত হতে আগুন বের হয়ে কাফেরদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, যারা ঐ গর্তের আশে-পাশে ছিল।

৪. কেউ কেউ মুবতাদা মাহযূফের خَبَرٌ হিসাবে اَلنَّارُ-কে رَفْعٌ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ هُوَ النَّارُ তখন هُوَ সর্বনামটি اُخْدُوْدٌ-এর দিকে ফিরবে। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে ঈমানদার এবং কাফির উভয় পক্ষের প্রতিদান ও প্রতিফলসমূহের পর্যালোচনা হয়েছিল। এখন সূরা আল-বুরূজে কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে, আর কাফিরদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

আর এ সূরায় মু'মিনদেরকে কাফির-মুশরিকদের জুলুম অত্যাচারে ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং কাফিরদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ আয়াতে بُرُوجٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহর বাণী- وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ-এর মধ্যে بُرُوجٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে–এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

ক. কোনো কোনো মুফাস্সির এর অর্থ করেছেন, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী বারো বুরুজ। উক্ত বারোটি বুরুজ হলো হামল বা মেষরাশি, সাওর বা বৃশরাশি, জাওযা বা মিথুন রাশি, সারাতান বা কর্কট রাশি, আসাদ বা সিংহ রাশি, সুম্বলা বা কন্যা রাশি, মিযান বা তুলা রাশি, আক্বার বা বৃশ্চিক রাশি, কাউস বা ধনুক রাশি, জাদয়ী বা মকর রাশি, দলোভ বা কুম্ভ রাশি, হুত বা মীন রাশি, এ সমস্ত রাশিচক্র বা কক্ষের পরিবর্তন দ্বারাই শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ইত্যাদি ঋতুসমূহেরও পরিবর্তন ঘটে।

খ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.), কাতাদাহ (রা.), হাসান বসরী (র.), যাহহাক (র.) ও ইমাম সুদ্দী (র.)-এর মতে এর দ্বারা বড় বড় নক্ষত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে।

গ. ইমাম ইবনে খোযায়মাহ (র.) বলেন, এর দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথসমূহের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা হলো বারো। সূর্য এক একটি কক্ষপথে এক মাস পরিভ্রমণ করে। আর চন্দ্র তার প্রতিটিতে দু'দিন ও এক দিনের এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। আর উক্ত বারোটি বুরুজ হলো হামল, সাওর, জাওযা, সারাতান, আসাদ, সুম্বুলা, মীযান, আক্রাব, কাউস, জাভী, দালায় এবং হুত।

আকাশকে ذَاتِ الْبُرُوجِ বলা হয়েছে কেন? : আলোচ্য আয়াতে আকাশকে 'যাতুল বুরূজ' বা কক্ষ বিশিষ্ট বলা হয়েছে। এর একাধিক কারণ হতে পারে। কেননা এরা আকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অথবা, এ জন্য যে, চর্মচোখে দেখলে মনে হয় যেন আকাশ এদেরকে ধারণ করে আছে।

অথবা, بُرْجٌ-এর অর্থ হলো প্রকাশ্য বস্তু। আর যেহেতু আকাশে এরা প্রকাশ পায় সেহেতু এগুলোকে بُرُوجٌ এবং আকাশকে ذَاتِ الْبُرُوجِ বলা হয়েছে।

এখানে اَلسَّمَاءُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। কারো কারো মতে اَلسَّمَاءُ দ্বারা সকল আকাশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আরশ ছাড়া সকল ফালাককে اَلسَّمَاءُ বলা হয়েছে। কারো কারো মতে এর দ্বারা সর্ব উচ্চ ফালাক অর্থাৎ আরশ উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলেছেন এটা হলো 'অষ্টম ফালাক'। সর্বাধিক উজ্জ্বল হওয়ার কারণে একে فَلَكُ الْبُرُوجِ বলে।

কারো কারো মতে, এর দ্বারা দুনিয়ার সন্নিকটস্থ আকাশ اَلسَّمَاءُ الدُّنْيَا উদ্দেশ্য। কেননা বাহ্যত এটাই পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ অর্থাৎ দুনিয়ার আকাশকে আমি বাতিসমূহ দ্বারা সুশোভিত করেছি।

প্রতিশ্রুত দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ দ্বারা কিয়ামতের দিবসকে বুঝানো হয়েছে। তবে এটা কিয়ামতের দিবসের কোন সময় তাতে মতভেদ রয়েছে।

কারো মতে এটা নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশের সময়। কেউ বলেন, এটা আকাশ সংকুচিত করার দিন। যেমন ইরশাদ হয়েছে- يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ

কারো মতে, এটা সে সময় যখন মানুষ কবর হতে বের হয়ে আসবে। ইরশাদ হয়েছে- يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত সবকিছুই কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। -[রূহুল মা'আনী]

شَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ-এর অর্থ : উপরিউক্ত وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দ্রষ্টা ও দৃষ্টের নামে শপথ করা দ্বারা কি বুঝিয়েছেন, সে বিষয়ে তাফসীরকারকদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা মতে নবী করীম ﷺ বলেন, لِلْمَوْعُوْدِ অঙ্গীকারকৃত দিবস দ্বারা কিয়ামত এবং وَمَشْهُوْدٍ তথা দৃষ্টের দ্বারা আরাফাতের দিন ও وَشَاهِدٍ তথা দ্রষ্টা দ্বারা জুমার দিন বুঝানো হয়েছে। এ দিনগুলোতে এমন একটি মোক্কম সময় রয়েছে যে, কোনো বান্দা সে সময় আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করলে এবং অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাইলে, তিনি তা কবুল করে থাকেন। -[তিরমিযী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, দ্রষ্টা ও দৃষ্টের দ্বারা জুমার দিন ও আরাফাতের দিন বুঝানো হয়েছে।

এটা ছাড়া আরও কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন-

১. দ্রষ্টা দ্বারা জুমার দিন এবং দৃষ্টের দ্বারা কুরবানির দিন বুঝানো হয়েছে।

২. দ্রষ্টা দ্বারা তারবিয়াতের দিন এবং দৃষ্টের দ্বারা আরাফার দিন বুঝানো হয়েছে। কেননা এ দিনগুলোর ফজিলত ও মর্যাদা খুব বেশি। সমস্ত মানুষ ঐ সব স্থানে জমায়েত হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এদের নামে শপথ করেছেন।

৩. কেউ কেউ বলেন, দ্রষ্টা দ্বারা স্বয়ং আল্লাহর সত্তা এবং দৃষ্টের দ্বারা মহাবিচারের দিনের কথা বুঝানো হয়েছে।
৪. এটাও বলা হয় যে, দ্রষ্টা দ্বারা নবী-রাসূলগণ এবং দৃষ্টের দ্বারা তাঁদের অনুসারী উম্মতগণের কথা বুঝানো হয়েছে
৫. এটাও পাওয়া যায় যে, দ্রষ্টা দ্বারা ফেরেশতা এবং দৃষ্টের দ্বারা আদম ও তার সন্তানগণের কথা বলা হয়েছে।
৬. এটাও বলা হয় যে, দ্রষ্টা হচ্ছে– আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণ এবং দৃষ্টের দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সাবেক নবীগণ ও তাদের উম্মতগণ।
৭. এটাও বলা হয় যে, দ্রষ্টা হচ্ছেন সাবেক নবী ও রাসূলগণ এবং দৃষ্ট হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ কেননা আমাদের নবীর সর্বশেষে আগমনবার্তা তাঁরা নিজ নিজ উম্মতগণকে শুনিয়েছেন। –[খাযেন, ইবনে কাছীর]
৮. ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা.) বলেন, شَاهِدٌ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে,

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ـ

আর شُهُوْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামতের দিন। কেননা কুরআনে রয়েছে وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ –[নূরুল কোরআন]

সূরার শুরুতে শপথের তাৎপর্য : এসব জালিম, নিষ্ঠুর ও পাপাচারীগণ আল্লাহর অভিশাপে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, সে কথাটির গুরুত্ব প্রকাশের জন্য আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে শপথ করেছেন। প্রথম শপথ আকাশের বুরূজের নামে করে বুঝিয়েছেন যে, মানুষের উর্ধ্বমণ্ডলে এ সব বুরূজের নির্মাতা, কর্তা ও পরিচালক হলেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং সে মহাশক্তিধরের পাকড়াও হতে এ জালিম আল্লাহদ্রোহীগণ কিরূপে বাঁচতে পারবে।

দ্বিতীয় শপথ করা হয়েছে কিয়ামতের দিন যার আবশ্যকতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে মহাপ্রলয় যে সত্তার দ্বারা সংঘটিত হবে, তার শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার কোনোই পথ নেই।

তৃতীয় শপথ করা হয়েছে দ্রষ্টা বা দৃষ্টের, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঈমানদার লোকদের ফরিয়াদ শ্রবণ করবেন এবং এসব জালিমকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করবেন। আর ঈমানদারগণ তখন এদের অবস্থা অবলোকন করে আনন্দ অনুভব করবেন।

আসহাবুল উখদূদ : আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে আসহাবুল উখদূদ (গর্তের কর্তাদের) প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। বলেছেন– গর্তের কর্তারা ধ্বংস হয়েছে। এ গর্তের কর্তা হলো সেসব আল্লাহদ্রোহী জালিম ও পাপিষ্ঠ শাসক ও রাজা-বাদশা এবং তাদের অনুসারীবৃন্দ, যারা ঈমানদার লোকগণকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অজুহাতে বড় বড় গর্তের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে নিক্ষেপ করেছিল। আর তারা গর্তের তীরে দণ্ডায়মান থেকে আনন্দচিত্তে অবলোকন করছিল। আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণের প্রতি এমন নির্মম অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল অবশ্যই; কিন্তু তা কোন যুগে ও কাদের দ্বারা হয়েছে, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকবৃন্দের নিকট হতে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এখানে অধিকতর বিশুদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করছি।

আসহাবে উখদূদ-এর ঘটনা : আসহাবে اُخْدُوْدٌ সম্পর্কে চারটি ঘটনা পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ–

১. তাফসীরকারকগণ উপরিউক্ত আসহাবুল উখদূদ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ লিখেন–হযরত সোহায়েব রূমী (রা.) -এর বর্ণনা, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, পূর্ব জমানার এক বাদশা ছিল জালিম ও আল্লাহদ্রোহী। তার এক জাদুকর ছিল। জাদুকর একদিন বাদশাকে বলল, জাহাপনা! আমি অতিশয় বৃদ্ধ হয়েছি, আমার মৃত্যু আসন্ন। আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি আপনার মন্ত্রীদের কোনো একটি প্রখর মেধাসম্পন্ন ছেলেকে আমার নিকট প্রেরণ করুন। আমি তাকে আমার মনের মতো জাদুবিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তুলবো। বাদশা এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়ে একটি ছেলেকে তার নিকট জাদু শিক্ষা করতে দিল। ছেলেটি নিয়মিতভাবে জাদু শিক্ষা করতে যেত। পথে ছিল এক খ্রিস্টান আলিমের আস্তানা। সে গমনপথে সেখানেও আসা-যাওয়া করত। বালকটি পাদ্রী সাহেবের চরিত্র মাধুর্য ও শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর দীন গ্রহণ করে ঈমানদার হলো। এদিকে জাদুবিদ্যা শিক্ষাও চলতে লাগল। বালক পথে যাওয়ার সময় সম্মুখে বিরাটকায় একটি হিংস্র জন্তুকে দেখতে পেল। জন্তুটি মানুষের পথ অবরোধ করার ফলে মানুষের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা সৃষ্টি হলো। বালকটি এ সময় মনে মনে চিন্তা করল, পাদ্রী অবলম্বিত ধর্ম সত্য না জাদুর শিক্ষা সত্য, তা পরীক্ষা করার এটা একটি মোক্ষম সময়। অতএব, সে একটি পাথর খণ্ড হাতে নিয়ে বলল, হে আল্লাহ! জাদুবিদ্যার তুলনায় পাদ্রীর ধর্ম যদি সত্য ও খাঁটি হয়, তবে আমার এ ক্ষুদ্র পাথর আঘাতে জন্তুটি নিহত করুন। অতঃপর বালকটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করলে জন্তুটি মারা গেল। এতে জনমনে তার প্রতি খুব আস্থা সৃষ্টি হলো এবং সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলল। এদিকে দীনের প্রতি বালকের ঈমান দৃঢ় হওয়ায় এবং পাদ্রীর সাহচর্যের ফলে সে কারামতি প্রদর্শনের শক্তি লাভ করল। লোকজন তার নিকট বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি নিরাময় করার উদ্দেশ্যে আসতে লাগল। এদিকে বালক পাদ্রীর নিকট জন্তুটি হত্যা করার ঘটনাটি বিবৃত করলে পাদ্রী বলল, তুমি আমার চেয়েও অনেক বেশি ফজিলত লাভ করে ফেলেছ। আমার ভয় হচ্ছে তুমি মহাপরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হও নাকি? এরূপ অবস্থায় পড়লে আমার কথা কারো নিকট বলবে না। এদিকে তার দোয়ায় বহু লোক নিরাময় হতে লাগল।

ঘটনাক্রমে বাদশার সভাসদের একজন উপদেষ্টা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সে এ বালকের সুনাম ও খ্যাতি শুনে তার নিকট এসে অনেক উপঢৌকন দিয়ে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করার জন্য আবেদন জানাল। বালক বলল, আমার দৃষ্টি দানের কোনো ক্ষমতা নেই। নিরাময় করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আপনি যদি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত-বন্দেগি না করেন, তবে আমি আপনার দৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য দোয়া করতে পারি। লোকটি বালকের কথায় ঈমান আনলে বালক তার জন্য দোয়া করল। ফলে তৎক্ষণাৎই সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

দ্বিতীয় দিন সে বাদশার দরবারে গিয়ে বসল, বাদশা তার নিকট দৃষ্টিশক্তি লাভের কথা জিজ্ঞাসা করল জবাবে লোকটি বলল, আমার প্রতিপালক আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বাদশা বলল, তোমার 'রব' তো আমি। আমি ছাড়া আর কে আছে? লোকটি বলল– না, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বাদশা পরিশেষে সন্ধান পেল– যে বালকটিকে সে জাদুবিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিল। সে বালকেরই এসব কর্মকাণ্ড। বালককে দরবারে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর সে যখন বাদশাকে 'রব' মানতে সম্মত হলো না, তখন তাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হলে তখন সে প্রার্থনা করল– আল্লাহ আপনি আমাকে সহায়তা করুন। তখন পাহাড় কম্পনে অন্যান্য সমস্ত লোক চূড়া হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করল; কিন্তু বালকের কিছুই হলো না। এতে বালকের যশঃখ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেল। অতঃপর বাদশা তাকে নদীতে ডুবিয়ে মারার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হলো তখন সে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে নদীতে তুফান সৃষ্টি হয়ে সকলে ডুবে মরল; কিন্তু বালকের কিছুই হলো না।

এদিকে ঐ বালকের নিকটই তার শিক্ষক পাদ্রীর সংবাদ জানতে পেরে তাকে দরবারে ডেকে আনা হলো। পাদ্রীকে তার ধর্মমত পরিত্যাগ করে বাদশাকে একমাত্র রব স্বীকার করার কথা বলা হলো কিন্তু পাদ্রী এতে সম্মত না হলে তাকে হত্যা করা হলো। অতঃপর বালককেও অনুরূপভাবে ভীতি প্রদর্শন করে ঈসায়ী ধর্মমত পরিহার করার কথা বলা হলো। তখন বালক বলল– হে বাদশা! এভাবে তুমি আমাকে মারতে পারবে না; বরং আমাকে মারতে হলে আমার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। বাদশাহ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলে বালক বলল– তুমি শহরের সমস্ত লোককে এক উঁচু জায়গায় সমবেত করবে। অতঃপর আমাকে শূলদণ্ডে চড়িয়ে 'বিসমিল্লাহে রাব্বিল গোলাম' বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলেই আমার মৃত্যু হবে। বাদশাহ তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। উপস্থিত লোকজন বালকের এমনি মৃত্যু দেখতে পেয়ে সকলে সমস্বরে বলে উঠল–'আমরা এ বালকের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।'

বাদশা যে বিষয়টির ভয় করছিল, সেটাই সর্বশেষে দেখা দিল। সমস্ত প্রজাবৃন্দকে ঈমানদার হতে দেখে বাদশা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। অতঃপর সে শহরের প্রতিটি মহল্লায় ও গলিতে বিরাট বিরাট গর্ত খননের নির্দেশ দিল। অতঃপর এতে আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে লোকদেরকে বলল, তোমরা গোলামের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান বর্জন করে আমাকে রব বলে স্বীকার করো। নতুবা তোমাদেরকে এ অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মারা হবে; কিন্তু প্রজাবৃন্দ স্বধর্ম পরিত্যাগ না করে হাসিমুখে দলে দলে অনুকুণ্ডে জীবন বিসর্জন দিতে লাগল। আর বাদশা ও তার অনুসারী মোসাহেবগণ এহেন বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হলো এবং উপহাস করতে লাগল। একটি মহিলাকে অগ্নিতে নিক্ষেপের জন্য আনয়ন করা হলো। তাঁর কোলে ছিল অবুঝ শিশু। মহিলা সন্তানের বাৎসল্যে প্রায় ঈমানকে বর্জন করার উপক্রম হলো, তখন ঐ অবুঝ শিশু বলে উঠল–হে মাতা! ধৈর্য অবলম্বন করুন। নির্ভয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ুন। কেননা, নিঃসন্দেহে আপনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ জালিম গোষ্ঠী বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. আসহাবুল উখদূদ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো নাজরানের ঘটনা। ইবনে হিশাম, তাবারী, ইবনে খালদূন ও মাজমাউল বুলদান প্রণেতা প্রমুখ বড় বড় ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এর সারকথা হলো এই যে, হেমিয়ারের [ইয়েমেন] বাদশা তুবান আসাদ আবূ কারেব একবার ইয়াসরাব [বর্তমান মদীনায়] গমন করে সেখানে ইহুদি সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করল এবং তথাকার বনী কুজার দু'জন ইহুদি আলিমকে সঙ্গে নিয়ে ইয়েমেনে যাত্রা করল। তার মৃত্যুর পর যুনাওয়াস তার উত্তরাধিকারী হয়ে দক্ষিণ আরবের ইসায়ী কেন্দ্রভূমি নাজরানের উপর আক্রমণ চালাল। সেখান হতে খ্রিস্টান ধর্মকে চিরতরে উৎখাত করে তথায় ইহুদি ধর্ম প্রতিষ্ঠাই ছিল এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। ইবনে হিশাম বলেন, এরা মূলে ইহুদি ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর সে নাজরানে উপস্থিত হয়ে তথাকার জনগণকে ইহুদি ধর্মমত গ্রহণের আহ্বান জানাল, কিন্তু তারা স্বধর্ম পরিত্যাগ করতে সম্মত হলো না। ফলে সে বহু লোককে আগুন ভর্তি গর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করল এবং অনেককে তরবারি দ্বারা হত্যা করল। এ হত্যাকাণ্ডে ঐতিহাসিকদের মতে সর্বমোট বিশ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ড চলাকালে নাজরান হতে দওসযূ সালবান নামে এক লোক পালিয়ে রোম সম্রাটের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হলো এবং এ অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগ করলে রোম সম্রাট কাইজার আবিসিনিয়ার বাদশাকে নাজরান আক্রমণ করার আহ্বান জানাল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ সত্তর হাজার নৌসেনাসহ নাজরান আক্রমণ করে তা দখল করে নিল এ যুদ্ধে যুনাওয়াস নিহত হলো, ইহুদি সরকারের পতন হলো এবং ইয়েমেন খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত হলো।

৩. হযরত আলী (রা.) হতে অপর একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন– পারস্যের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজ সহোদরার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো এবং উভয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক সংস্থাপিত হলো। চারিদিকে যখন এটা রটনা হলো, তখন বাদশাহ জনতার মধ্যে প্রচার করে দিল যে, আল্লাহ ভগ্নির সাথে বিবাহকে বৈধ করে দিয়েছেন। কিন্তু জনসাধারণ এটা মেনে নিতে রাজি হলো না। তখন বাদশা নানাভাবে অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিয়ে জনগণকে এটা মেনে নিতে বাধ্য করল। এমনকি যারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল, তাকে সে আগুনে ভর্তি গর্তে নিক্ষেপ করতে লাগল। হযরত আলী (রা.) বলেন, এ সময় হতে অগ্নিপূজকদের ধর্মে রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। –[ইবনে জারীর]

৪. এ ঘটনাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সম্ভবত ইসরাঈলী কিংবদন্তী হতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে– বেবিলনবাসীরা বনী ইসরাঈলীদেরকে হযরত মূসা (আ.) -এর প্রচারিত ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এমনকি তারা এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অমান্যকারীকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করল।

جَوَابُ قَسَمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الخ : ইমাম ফাররা বলেন– وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الخ এ কসমের জবাব হলো قُتِلَ اَصْحَابُ ...... الخ এ অর্থে যে, এখানে لقد উহ্য রয়েছে।

একদল ইমামের মতে– কসমের জবাব হলো اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ তবে এ জবাবটি তেমন সুন্দর নয়। কেননা, কসম ও জবাবে কসমের মাঝে অনেক দূরত্ব হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন– اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا হলো কসমের জবাব।

কেউ কেউ বলেন– কসমের জাবাব উহ্য রয়েছে। মূলবাক্য এভাবে হবে যে, وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ لَتُبْعَثُنَّ ইবনুল আম্বারী উক্ত মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। –[কুরতুবী]

اَلْوَقُوْدُ শব্দের কেরাতসমূহ : اَلْوَقُوْدُ শব্দকে জমহুর ক্বারীগণ وَاوْ-এর উপর যবর দিয়ে পড়েন। তখন এর অর্থ হবে اَلْحَطَبُ বা লাকড়ি।

হযরত কাতাদাহ, আবূ রাজা, নসর ইবনে আসেম প্রমুখ ক্বারীগণ وَاوْ-এর উপর পেশ দিয়ে পড়েন। তখন তা মাসদার হবে। অর্থাৎ ذَاتُ الْاِتِّقَادِ وَالْاِلْتِهَابِ –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ-এর অর্থ : এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যেমন–

১. قُتِلَ দ্বারা এখানে বদদোয়া বা লানত করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আসহাবুল উখদূদ–কাফের ও জালিমগণ আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরে পড়েছে। তাদের উপর আল্লাহর লানত পড়েছে।

২. অথবা, এখানে ঐ জালিমদের পক্ষ হতে মু'মিনদের হত্যার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। اِنَّهُمْ قُتِلُوْا بِالنَّارِ فَصَبَرُوْا অর্থাৎ মু'মিনগণকে আগুন দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, সে সময় তারা ধৈর্যধারণ করেছেন।

৩. অথবা, এখানে ঐ জালিমদের ব্যাপারেই খবর দেওয়া হয়েছে। কেননা বর্ণিত আছে যে, বেহেশতীদের রূহকে আগুনে পোড়ার পূর্বেই আল্লাহ কবজ করে নিয়েছেন। তারপর আগুন গর্ত থেকে উঠে ঐ জালিমদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

৪. অথবা, জালিমরা ধ্বংস হয়েছে, আর মু'মিনগণ নাজাত পেয়েছে। –[কুরতুবী]

قُتِلَ শব্দের দু'টি কেরাত : জমহুর قُتِلَ শব্দ ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ থেকে তাশদীদবিহীন পড়েছেন।

আর কেউ কেউ قُتِّلَ অর্থাৎ تَاءْ-এর উপর তাশদীদ দিয়ে ثُلَاثِىْ مَزِيْد فِيْه থেকে পড়েছেন। –[কাবীর]

اَلْعَامِلُ فِىْ قَوْلِهِ "اِذْ" مِنْ "اِذْهُمْ عَلَيْهَا" : اِذْهُمْ عَلَيْهَا-এর মধ্য হতে اِذْ-এর عَامِلْ : اِذْ-এর আমেল হলো قُتِلَ ক্রিয়াটি। তখন অর্থ হবে– اَىْ لُعِنُوْا فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ قُعُوْدٌ عِنْدَ الْاُخْدُوْدِ يُعَذِّبُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ গর্তের নিকট বসে যখন তারা মু'মিনদের শাস্তি দিচ্ছিল, তখন তারা আল্লাহর পক্ষ হতে অভিশপ্ত হয়েছে।

شُهُوْدٌ -এর অর্থ কি? এখানে একে উল্লেখের কারণ কি? : شُهُوْدٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ এর মাসদার; এর দু'টি অর্থ হতে পারে

এক : شُهُوْدٌ অর্থাৎ حُضُوْرٌ তথা উপস্থিত হওয়া। গর্ত খননকারী কাফেররা মু'মিনদেরকে অগ্নিপূর্ণ গর্তে নিক্ষেপ করার পর তামাশা দেখার জন্য গর্তের তীরে উপস্থিত হয়েছিল।

দুই : অথবা شُهُوْدٌ-এর অর্থ এখানে সাক্ষ্য প্রদান করা যা দ্বারা কোনো বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। এখানে شُهُوْدٌ উল্লেখের কারণ প্রথম অবস্থায় এখানে شُهُوْدٌ এর উল্লেখ নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে হতে পারে।

১. এর দ্বারা মূলতঃ এখানে মু'মিনগণের প্রশংসা করাই উদ্দেশ্য। কেননা কাফিররা ভেবেছিল যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ নিলে মুমিনরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। তখন উপস্থিত জনতা মু'মিনদেরকে ঈমান পরিত্যাগ করতে বলবে এবং তারা ঈমান ত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের সে আশার গুঁড়ে বালি পড়েছে। মু'মিনগণ অগ্নি গর্তে পড়ে জীবন দিয়েছেন, তথাপি ঈমান পরিত্যাগ করেননি।

   অথবা, তাদের নিকট সাহায্যও প্রার্থনা করেননি। সুতরাং এক মহিলাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য আনয়ন করা হয়েছিল, মহিলার কোলে ছিল একটি শিশু। মহিলাটি শিশুর মায়ায় ঈমান বর্জন করার মনস্থ করেছিল। কিন্তু শিশুটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, হে মাতা! আপনি ধৈর্য ধরুন এবং নির্ভয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। কেননা আপনি অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। আর তারা অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠ।

২. অথবা এটা দ্বারা তাদের অন্তর পাষাণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কি পরিমাণ পাষাণ অন্তরের অধিকারী হলে স্বজাতির কতিপয় মানুষকে সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে তামাশা দেখতে পারে তা ভাবলেও শরীর শিহরিয়ে উঠে।

৩. অথবা, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহীতা ও মিথ্যার চরম স্তরে তারা পৌঁছে গিয়েছিল। তাদেরকে মধ্যে মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে পশুত্বের প্রভাব বিস্তার করে বসেছিল। তা না হলে তারা জ্যান্ত মানুষকে আগুনে পোড়ানোর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারত না– কৌতুক ভরে তা উপভোগ করা তো দূরের কথা।

দ্বিতীয় অবস্থায় شُهُوْدٌ-এর উল্লেখের কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. কেয়ামতের দিন তাদের এ অপকর্মের সাক্ষ্য স্বয়ং তারাই প্রদান করবে। অর্থাৎ যখন তারা কিয়ামতের কঠোর আজাব দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে তখন তারা এ অপকর্ম করার কথা অস্বীকার করবে। আর তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তাদের সমস্ত অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরবে। ইরশাদ হচ্ছে–

   يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ .

২. অর্থাৎ এর মর্মার্থ হলো তারা নিজেরাই যে শুধু এ অপকর্ম করে তাই নয়; বরং অন্যরা যদি তা করে তাহলে তারা সেখানে সাক্ষ্যদাতা হয়। আর এতে তারা মোটেও দ্বিধাবোধ করে না।

৩. অথবা, এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তারা বহু সাক্ষ্যদাতা নিযুক্ত করে রেখেছিল। যাতে পরস্পরের দায়িত্ব সম্পর্কে বাদশার নিকট রিপোর্ট পেশ করতে পারে। সুতরাং যার উপর শাস্তি প্রদানের সে পরিমাণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। সে তা পালন করেছে কিনা এ ব্যাপারে তারা বাদশার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

অনুবাদ :

٨. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهِ الْحَمِيْدِ الْمَحْمُوْدِ .

৮. তারা এদেরকে শুধু এ জন্য নির্যাতন করেছিল যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, যিনি পরাক্রমশালী স্বীয় রাজত্বে এবং প্রশংসনীয় প্রশংসিত।

٩. اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ اَىْ مَا اَنْكَرَ الْكُفَّارُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَّا اِيْمَانَهُمْ .

৯. যাঁরই জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা। অর্থাৎ কাফেরগণ মু'মিনগণের ঈমানের কারণেই শক্রতা করেছে।

١٠. اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِالْاِحْرَاقِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ بِكُفْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ اَىْ عَذَابُ اِحْرَاقِهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْاٰخِرَةِ وَقِيْلَ فِى الدُّنْيَا بِاَنْ خَرَجَتِ النَّارُ فَاَحْرَقَتْهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ .

১০. নিশ্চয় যারা মু'মিন নর-নারীদেরকে বিপদাপন্ন করেছে আগুনে পোড়ানোর মাধ্যমে অতঃপর তারা তওবাও করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি তাদের কুফরির কারণে এবং তাদের জন্য রয়েছে দহন যন্ত্রণা মুসলমানদেরকে আগুনে পোড়ানোর প্রতিশোধ হিসাবে আখেরাতে, মতান্তরে দুনিয়ায়–যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, আগুন লেলিহান শিখা বিস্তার করে তাদেরকে দাহন করেছে।

١١. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ .

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য সেই জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবহমান–এটাই পরম সাফল্য।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَا نَقَمُوْا الخ আয়াতের মহল্লে ইরাব :

১. এ আয়াতটি পিছনের اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-এর উপর عَطْفٌ হয়েছে। যদিও اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ-এর আতফ اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-এর উপর সহীহ হয় না; কিন্তু اِذْ هُمْ عَلَيْهَا তথা পিছনের اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ টি اِذْ দিয়ে শুরু করার কারণে عَطْف সহীহ হয়েছে। কেননা এ اذ-কে اِذِ الْمَاضَوِيَّةُ বলা হয়। অর্থাৎ এ اِذْ এসে বাক্যকে مَاضِىْ-এর অর্থে করে দিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ-কে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ-এর উপরই عَطْف করা হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেছেন, আসলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ টি اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ ছিল। অর্থাৎ বাক্যটি এভাবে ছিল وَهُمْ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ-এমতাবস্থায় اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-কে اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-এর উপরই আতফ করা হয়। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের আয়াতের সাথে যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল উখদূদ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সূরার প্রথম দিকে যে বর্ণনা এবং ভাষণ রেখেছেন, এর সাথে সঙ্গতি রেখে ঈমানদারদের প্রতি নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের কারণ বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন–

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ ....

আসহাবে উখদূদ মু'মিনগণকে কেন আজাব দিয়েছিল? : আলোচ্য সূরাটির প্রথমাংশে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে উখদূদ কর্তৃক মু'মিনদের উপর নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বক্ষ্যমাণ আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, আসহাবে উখদূদ যে মু'মিনদের উপর নির্যাতন করেছিল, মূলত তাদের কোনো অপরাধই ছিল না। উক্ত কাফেরদের দৃষ্টিতে সে মু'মিনগণের একটি মাত্র অপরাধ ছিল– আর তা হলো এই যে, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজাধিরাজ–সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক। অথচ এটা তো কোনো অপরাধ হতে পারে না। নিছক মানবাধিকারের দৃষ্টিতে দেখতে গেলেও এটাকে অন্যায় বলা যায় না। কেননা এটাতো তাদের স্বীকৃত মৌলিক মানবিক অধিকার যে, মানুষ তার স্রষ্টার ইবাদত করবে, তাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করে নিবে, তার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে। এ অধিকারকে যারা হরণ করবে তারা অবশ্যই অত্যাচারী হিসাবে গণ্য হবে। দুনিয়া পরীক্ষাক্ষেত্র হওয়ার কারণে যদিও তারা এরূপ অন্যায় কাজ করে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তথাপি পরকালে তাদেরকে অবশ্যই এটার আজাব ভোগ করতে হবে। কোনো মতেই তারা আল্লাহর আজাব ও গজব হতে রেহাই পাবে না। যদি তারা ঈমান আনয়ন করে কৃতপাপ হতে তওবা না করে, তাহলে পরকালে চিরদিনের জন্য তারা জাহান্নামী হবে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনয়ন করে সৎকর্ম অবলম্বন করবে তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে জান্নাতের চিরশান্তি। এটা অপেক্ষা মহাসফলতা আর কি হতে পারে?

এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তা'আলা মক্কার জালিম মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারাও যদি আসহাবে উখদূদ-এর ন্যায় মু'মিনগণের উপর অহেতুক নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে আসহাবে উখদূদের যে ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে তাদেরকেও সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। মক্কার মুশরিকরা যদি এ অপকর্ম হতে তওবা করে ঈমান না আনে তাহলে তাদের জন্যও রয়েছে, দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও দুর্গতি এবং পরকালের কঠিন শাস্তি।

এখানে আল্লাহর উক্ত চারটি গুণের উল্লেখের তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিনগণের সাথে আসহাবে উখদূদের শত্রুতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন– وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ অর্থাৎ মু'মিনগণের সাথে তারা শুধু এ জন্যই শত্রুতা পোষণ করত যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, যিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রশংসিত, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মালিক এবং সে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টাও বটে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার উক্ত চারটি গুণ উল্লেখ করার তাৎপর্য মুফাস্‌সিরগণ নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. اَلْعَزِيْزُ [মহাপরাক্রমশালী] : অর্থাৎ এমন সত্তা যিনি কিছু করতে চাইলে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং তার অনুমোদন ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না। এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ মহাশক্তিশালী তাঁর আজাব হতে কাফেরদেরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

২. اَلْحَمِيْدُ [প্রশংসিত] : মু'মিনগণ, ফেরেশতাগণ এমনকি সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যত কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও তাহমীদ করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ সকল বস্তুই আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে। কাজেই কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করলে তথা তার প্রশংসা না করলেও তাতে আল্লাহর কোনোরূপ ক্ষতি নেই।

৩. اَلَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্বের মালিক যেহেতু এ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু এদের মালিকও তিনিই। আবার তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন এদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। মোটকথা, আসমান ও জমিনে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনিই, তাঁর এ মালিকানায় কেউ শরিক বা অংশীদার নেই। তার আজাব হতে কাফের ও মুশরিকদেরকে কেউ রেহাই দিতে পারবে না। তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে যেমন কেউ বাধা দেওয়ার নেই, তেমনটি কাউকে পুরস্কৃত করলেও কারো কিছু বলার নেই।

৪. وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ আর আল্লাহ তা'আলা সর্বদ্রষ্টা, মানুষ এমনকি কোনো জীব জন্তুর বা কোনো পদার্থের কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও নাড়া-চাড়াও তার দৃষ্টিকে এড়াতে পারে না। আসহাবে উখদূদ মু'মিনদেরকে যে আজাব দিয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। আর মু'মিনরা চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সেভাবে ঈমানের উপর অটল ও অবিচল রয়েছে তাও আল্লাহর অজানা নয়। কাজেই কাফের ও মুশরিকদেরকে শায়েস্তা করতে যেমন আল্লাহ তা'আলা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না তেমনটি মু'মিনদেরকে পুরস্কৃত করতেও তিনি কিছুমাত্র কৃপণতা করবেন না।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা উক্ত চারটি গুণের মাধ্যমে এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী তিনি ইচ্ছা করলে কাফেরদেরকে রুখে দিতে পারতেন– তাদের আজাব হতে মু'মিনদেরকে রেহাই দিতে পারতেন, ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাৎ কাফেরদেরকে ধ্বংস করেও দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কেননা তিনি দুনিয়াকে তাদের জন্য পরীক্ষা ক্ষেত্র বানিয়েছেন। এখানে তাদরকে ভালো-মন্দ এবং পাপ-পুণ্যের যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

نَقَمُوْا শব্দের দুটি কেরাত : نَقَمُوْا শব্দটি দু'টি কেরাতে বর্ণিত হয়েছে। জমহুর ক্বারীগণ নূনের উপর যবর দিয়ে পড়েছেন। আর আবূ হায়াত নূনের নিচে যের দিয়ে পড়েছেন। কিন্তু فَصِيْح বা বিশুদ্ধ হলো যবর দিয়ে পড়া। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

তিনটি গুণ উল্লেখ করার পর شَهِيْد উল্লেখ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় কয়েকটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম عَزِيْز ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, ঐ জালিমেরা মু'মিনদের উপর যে বর্বরোচিত নির্যাতন করেছিল– তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদেরকে বারণ করতে পারতেন। তাদের আগুন নিভিয়ে দিতে পারতেন, তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। তারপর اَلْحَمِيْدُ ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, তাঁর নিকট দুনিয়ার জীবনের চেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের (অনন্ত জীবনের) ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। আপাত দৃষ্টিতে যদিও প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ কাজের উত্তম বিনিময় দিতে চেয়েছেন, আর কাফের-জালিমদেরকে পরম শাস্তি দিতে চেয়েছেন। আল্লাহর বিধান এই নয় যে, তিনি তাড়াতাড়ি করে কিছু করে ফেলবেন; বরং তিনি তাদের কার্যাবলি অবলোকন করে রেকর্ড করেছেন। এ কারণেই পরে এসে شَهِيْد [দ্রষ্টা] ব্যবহার করেছেন। যেন, এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি এ ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিবেন না, দেখে দেখে রেকর্ড করেছেন। شَهِيْد দ্বারা মু'মিনদের জন্য ওয়াদা এবং কাফিরদের জন্য হুমকি বুঝায়। –[কাবীর]

اَلَّذِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلَّذِيْنَ দ্বারা আসহাবুল উখদূদ তথা গর্তের মালিক জালিমগণ উদ্দেশ্য হতে পারে। অথবা যারাই এ কাজ করে তারা সবাই اَلَّذِيْنَ-এর ভিতরে শামিল, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যতজন এমন ধরনের কাজ করবে সবাই এ اَلَّذِيْنَ -এর অন্তর্ভুক্ত। –[কাবীর]

আয়াতে فَتَنُوْا -এর অর্থ : فَتَنُوْا-এর মূল অর্থ পরীক্ষা। কেননা ঐ জালিমগণ মু'মিনদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিল, আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, اَلْفِتْنَةُ হলো, আগুন দ্বারা পুড়ে ফেলা, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ اَيْ حَرَّقُوْهُمْ بِالنَّارِ অর্থাৎ তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলেছে। –[ফাতহুল কাদীর]

ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا-এর প্রামাণ্য বিষয় : ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا আয়াতাংশ এ কথা প্রমাণ করে যে, যদি সে জালিমগণ তওবা করে ফিরে আসত, তাহলে এ وَعِيْد [ভীতি প্রদর্শন] হতে তারা রেহাই পেত। আর এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূল করেন। ইচ্ছা করে হত্যা করলেও তা মাফ হয়ে যাবে বলে এ আয়াত প্রমাণ করে। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বিরোধিতা করেছেন। –[কাবীর]

'দু আজাব' দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে কারীমায় দু'বার আজাব উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমবার বলা হয়েছে عَذَابُ جَهَنَّمَ সাথে সাথেই বলা হয়েছে وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ উভয় আজাবই হবে পরকালে, তবে عَذَابُ جَهَنَّمَ হবে তাদের কুফরির কারণে, আর عَذَابُ الْحَرِيْقِ হবে কুফরির উপর অতিরিক্ত শাস্তি। কেননা তারা মু'মিনদেরকে দুনিয়ায় اِحْرَاقٌ করেছে তথা জ্বালিয়ে দিয়েছে। এটাও হতে পারে যে, প্রথম عَذَابٌ হবে عَذَابُ بَرْدٍ বা ঠাণ্ডার শাস্তি। যাকে زَمْهَرِيْر বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আজাব হবে عَذَابُ اِحْرَاقٍ জ্বালানোর শাস্তি।

এটাও হতে পারে যে, উভয় আজাব জ্বালানোর মাধ্যমেই দেওয়া হবে। তবে প্রথম শাস্তির তুলনায় দ্বিতীয় শাস্তি হবে কঠিন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

আল্লামা রাযী (র.) বলেন, عَذَابُ جَهَنَّمَ দ্বারা পরকালের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। আর عَذَابُ الْحَرِيْقِ দ্বারা দুনিয়ার আগুন দ্বারা পোড়ানোর দিকে ইঙ্গিত হতে পারে। কেননা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, তাদেরকে গর্তের আগুন উপরে উঠে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। –[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

١٢. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ بِالْكُفَّارِ لَشَدِيْدٌ بِحَسْبِ اِرَادَتِهِ.

১২. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও কাফেরদেরকে সুকঠিন তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক।

١٣. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ الْخَلْقَ وَيُعِيْدُ فَلَا يُعْجِزُهُ مَا يُرِيْدُ.

১৩. নিশ্চয় তিনি অস্তিত্বদান করেন সৃষ্টিকে ও পুনরাবর্তন ঘটান তিনি তাঁর ইচ্ছায় কখনও অপারগ হন না।

١٤. وَهُوَ الْغَفُوْرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ الْوَدُوْدُ الْمُتَوَدِّدُ اِلَى اَوْلِيَائِهِ بِالْكَرَامَةِ.

১৪. তিনিই ক্ষমাশীল পাপী মু'মিনদের প্রতি, প্রেমময় কারামতের মাধ্যমে স্বীয় ওলীগণের প্রতি প্রেম প্রকাশকারী।

١٥. ذُو الْعَرْشِ خَالِقُهُ وَمَالِكُهُ الْمَجِيْدُ بِالرَّفْعِ الْمُسْتَحِقُّ لِكَمَالِ صِفَاتِ الْعُلُوِّ.

১৫. আরশের অধিপতি এর স্রষ্টা ও অধিকর্তা। সম্মানিত শব্দটি রফা'যোগে পঠিতব্য, সমুচ্চ গুণাবলির পূর্ণত্বের যোগ্য।

١٦. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ.

১৬. যা ইচ্ছা তাই সম্পাদনকারী কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না।

١٧. هَلْ اَتٰكَ يَا مُحَمَّدُ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ.

১৭. তোমার নিকট কি পৌঁছেছে? হে মুহাম্মদ! সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত।

١٨. فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ بَدَلٌ مِنَ الْجُنُوْدِ وَاسْتَغْنٰى بِذِكْرِ فِرْعَوْنَ عَنْ اَتْبَاعِهِ وَحَدِيْثُهُمْ اَنَّهُمْ اُهْلِكُوْا بِكُفْرِهِمْ وَهٰذَا تَنْبِيْهٌ لِمَنْ كَفَرَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْاٰنِ لِيَتَّعِظُوْا.

১৮. ফিরআউন ও সামূদের এটা جُنُوْد হতে بَدَل আর ফিরআউনের উল্লেখের পর তার অনুসারীদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ছিল। আর সে বৃত্তান্ত হচ্ছে– তারা তাদের কুফরির কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের সাথে অবাধ্যাচারণকারীদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

١٩. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ بِمَا ذُكِرَ.

১৯. তথাপি কাফেরগণ মিথ্যারোপ করায় লিপ্ত উল্লিখিত ঘটনাবলি।

٢٠. وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ لَا عَاصِمَ لَهُمْ مِنْهُ.

২০. আর আল্লাহ তা'আলা তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টনকারী। তাদেরকে কেউই তা হতে রক্ষাকারী নেই

٢١. بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ عَظِيْمٌ.

২১. বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন সুমহান।

٢٢. فِيْ لَوْحٍ هُوَ فِي الْهَوَاءِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَحْفُوْظٍ بِالْجَرِّ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَمِنْ تَغْيِيْرِ شَيْءٍ مِنْهُ وَطُوْلُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَعَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَهُوَ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

২২. ফলকে লিপিবদ্ধ আর তা সপ্তমাকাশের উর্ধ্বে শূন্যে অবস্থিত যা সংরক্ষিত শব্দটি যেরযোগে পঠিত শয়তান এবং কোনোরূপ বিকৃতি হতে সংরক্ষিত। এর দৈর্ঘ্য আকাশ ও পৃথিবীর সমপরিমাণ এবং এর প্রস্থ উদয়াচল ও অস্তাচলের সমপরিমাণ। আর এটা শুভ্র মুক্তা দ্বারা নির্মিত। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَجِيْد-এর মহল্লে ই'রাব : اَلْمَجِيْد শব্দে দু'টি إِعْرَابْ প্রদান করা যায়–

১. মারফূ' হিসাবে শেষাক্ষরে পেশ হবে। এমতাবস্থায় اَلْمَجِيْد শব্দটি আল্লাহর সিফাত বা গুণ হবে। এ কেরাতটিকে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীন এবং ক্বারীগণ গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা– مَجْد সিফাতটি আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য।

২. مَجْرُوْر হিসাবে শেষাক্ষরে যের হবে। এমতাবস্থায় اَلْمَجِيْد শব্দটি আল্লাহর সিফাত না হয়ে عَرْش-এর সিফাত হবে। কেননা আল্লাহর সিফাত ছাড়াও যে, اَلْمَجِيْد ব্যবহৃত হয়ে থাকে এর প্রমাণ কুরআন মাজীদের দেখা যায়। যেমন– بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ এ আয়াতে কুরআনের সিফাত مَجِيْد ব্যবহৃত হয়েছে। –[কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের আয়াতের সাথে বর্তমান আয়াতের যোগসূত্র : পিছনে যারা মু'মিনদের উপর অকথ্য অমানবিক অত্যাচার করেছিল তাদেরকে হুমকি, আর মু'মিনদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ঐ হুমকিকে তরান্বিত করে তাকিদ দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে .... "اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ : উপরিউক্ত ভাষণে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব কথার জের টেনে স্বীয় পরিচয় তুলে ধরেছেন। বলেছেন– যারা ঈমানদার লোকদের প্রতি শুধু ঈমানদার হওয়ার কারণে জুলুম-অত্যাচার করার পর তওবা করে না, ঈমান আনে না; তাদেরকে আল্লাহ কোনোক্রমেই ছাড়বেন না। আল্লাহ অবশ্যই এদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন। আল্লাহ কাউকে ধরলে সে ধরা সহজ হয় না। তাঁর পাকড়াও খুবই কঠিন ও শক্ত। তাঁর পাকড়াও হতে ছুটে পালাবার সাধ্য কারও নেই। কাকে কিরূপে পাকড়াও করতে হবে, কে তার শাস্তির যোগ্য, কে যোগ্য নয়– তা তিনি ভালোরূপেই পরিজ্ঞাত। কেননা তিনি মানুষসহ প্রতিটি সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আবার তিনিই মৃত্যুর পর পুনরায় তাদেরকে জীবিত করবেন। অতএব, তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টির অগোচরে কিছুই নেই। মহাক্ষমাশীল বলে মানুষের মধ্যে তিনি এ আশার সঞ্চার করেছেন যে, ভুলেও শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কেউ অন্যায় করার পর তাঁর দুয়ারে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তিনি কাউকেও ফিরিয়ে দেন না। তিনি ক্ষমাশীল ও উদার সত্তা। ক্ষমা চাইলে অবশ্যই ক্ষমা লাভ করবে। প্রেমময় বলে এ কথা বুঝাতে চান যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে খুব ভালোবাসেন। অকারণে ও বিনা অপরাধে কাউকেও শাস্তি দিবেন না। যারা শত সুযোগ পেয়েও তাঁর নাফরমানি হতে বিরত থাকবে না, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। তারা ভালোবাসা পাওয়ার পাত্রে পরিণত হতে পারেনি। আরশের মহান অধিপতি বলে একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সৃষ্টিলোকে তাঁরই একচ্ছত্র ক্ষমতা বিরাজমান। তাঁর ক্ষমতাবলয়ের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই। অতএব, কেউ তাঁর অবাধ্যতা করে রক্ষা পাবে কি করে? এটা একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার।

তিনি যা সংকল্প করেন, তাই সম্পন্ন করেন। এ কথা দ্বারা এটাই বুঝাতে চান যে, আল্লাহর ইচ্ছায় বাধাদানকারী কেউ নেই। তিনি যা চাবেন তাই করবেন।

অতএব, মানুষের উচিত আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির মাঝে নিজেদের ইচ্ছাকে বিলীন করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পিত হওয়া। তাঁর প্রতি ঈমানদার ও আস্থাশীল হওয়া। এটাই হচ্ছে উপরিউক্ত ভাষণের তাৎপর্য।

يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য : يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ-এর উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে গিয়ে জমহুর মুফাস্‌সিরীন বলেন– يَخْلُقُ الْخَلْقَ اَوَّلًا فِى الدُّنْيَا وَيُعِيْدُهُمْ اَحْيَاءً بَعْدَ الْمَوْتِ অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় প্রথমে সকল সৃষ্টি-জীবকে সৃষ্টি করেছেন এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন।

কেউ কেউ বলেছেন, يُبْدِئُ لِلْكُفَّارِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ يُعِيْدُهُ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ দুনিয়ায় কাফেরদের জন্য আগুনের শাস্তি নির্ধারণ করেন, তারপর ঐ শাস্তিকে তাদের জন্য পরকালে পুনরায় নির্ধারণ করবেন। এ মতটিকে ইবনে জারীর পছন্দ করেছেন। তবে প্রথম মতটিই উত্তম। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

اَلْوَدُوْدُ-এর অর্থ : اَلْوَدُوْدُ শব্দটি সিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ, وُدٌّ ধাতু হতে নির্গত, অর্থ– প্রেমময়, খুব স্নেহশীল, আয়াতে কারীমায় اَلْوَدُوْدُ-এর অর্থ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়।

১. জমহুর মুফাসসিরীন বলেন, اَلْوَدُوْدُ هُوَ الْمُحِبُّ অর্থাৎ প্রেমময়।

২. কালবী বলেন, هُوَ الْمُتَوَدِّدُ اِلٰى اَوْلِيَائِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْجَزَاءِ অর্থাৎ তিনি [আল্লাহ] তাঁর ওলীদেরকে ক্ষমা এবং প্রতিদান দেওয়ার নিমিত্তে ভালোবাসা সৃষ্টির প্রত্যাশী।

৩. আযহারী বলেন, আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর সাথে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি করে বলে তাঁকে وَدُوْدٌ বলা হয় কেননা তারাই তাঁর সমস্ত পরিপূর্ণ সিফাত ও কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত।

৪. কারো মতে اَلْوَدُوْدُ অর্থ কোনো কোনো সময় اَلْمَهِيْمُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অনুগত প্রাণীকে বলে بَعِيْرٌ وَدُوْدٌ -[কবীর]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার দয়ামায়ার দিকে লক্ষ্য কর; যাঁরা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে হত্যা করেছে তাদেরকেও তিনি অত্র আয়াতের মাধ্যমে তওবা করার আহ্বান জানিয়েছেন। -[নূরুল কোরআন]

ذُو الْعَرْشِ দ্বারা উদ্দেশ্য : ذُو الْعَرْشِ অর্থ আরশের মালিক। কারো মতে যুল-আরশ বলতে ذُو الْمُلْكِ তথা রাজ্যের মালিক-রাজা বা اَلسُّلْطَانُ তথা বাদশাহ-সম্রাট বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয় فُلَانٌ عَلٰى سَرِيْرِ مُلْكِهِ অর্থাৎ অমুক নিজ রাজ্যের সিংহাসনের উপর আছে, যদিও সরাসরি সিংহাসনে বসা নেই। আরো বলা হয় ثُلَّ عَرْشُ فُلَانٍ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির বাদশাহী চলে গেছে।

অথবা, عَرْشٌ দ্বারা سَرِيْرٌ বা সিংহাসনও বুঝাতে পারে। এ অর্থে যে, আল্লাহ নিজের জন্য আকাশে একটি عَرْشٌ বা سَرِيْرٌ অর্থাৎ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার সম্মান ও প্রতিপত্তির বহর সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। কারো পক্ষে এর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। -[কাবীর]

'আরশ অধিপতি' বলে মানুষের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যে, নিখিল বিশ্ব-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি, তাই তার সাথে যার বিদ্রোহাত্মক আচরণ গ্রহণ করবে তারা তাঁর পাকড়াও হতে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না।

কেউ কেউ বলেছেন, ذُوالْعَرْشِ অর্থ خَالِقُ الْعَرْشِ অর্থাৎ আরশ সৃষ্টিকারী। -[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمَجِيْدُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَجِيْدُ শব্দের অর্থ হলো 'মহান শ্রেষ্ঠতর'। এ গুণ দ্বারা মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর এ মহান সত্তার বিরোধিতা করে, তাঁর অবাধ্য হয়ে এবং তাঁর সাথে বেয়াদবি করে মানুষ নিজ হীনমন্যতা ও নীচতা ছাড়া আর কিছুই প্রদর্শন করে না। অথচ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা এবং কুদরতের কোনো সীমা নেই. তিনি মহাপরাক্রমশালী।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ-এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী সব কাজ সম্পাদনকারী, যা তিনি করতে চান তা তিনি করে ফেলেন, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিলোকে আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করা, আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের পথে বাধাদানকারী ও তাঁর পরিপন্থি হয়ে দাঁড়াবার শক্তি কারো নেই।

ফেরআউন ও ছামূদের উল্লেখ করার হেতু কি? : ইমাম রাযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে আদ ও ছামূদ জাতির কথা উল্লেখ করার কারণ হলো তারা আরবদের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। আল্লাহদ্রোহীতার ব্যাপারে এ দু জাতি ছিল অতি অগ্রগামী। আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তার কওমের নিকট হযরত মূসা (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ.) বহুভাবে বুঝানোর পরও তারা ঈমান গ্রহণ করেনি; বরং ফিরআউন ও তার লোকেরা উল্টো হযরত মূসা (আ.) ও নিরীহ বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন শুরু করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অপরদিকে ছামূদ জাতির নিকট আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন। তাদের অনুরোধে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি উটনী মু'জিযা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সালেহ (আ.)-এর নির্দেশ অমান্য করে উক্ত উটনীকে হত্যা করেছিল। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে আজাব নাজিল হলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। যা হোক এর দ্বারা একদিকে মক্কার কুরাইশদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ الخ-এর মর্মার্থ : আল্লাহর বাণী "وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ"-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

ক. ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো "وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِاَعْمَالِهِمْ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত রয়েছেন।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-কোনো ব্যক্তিকে পিছন হতে পরিবেষ্টন করে ফেললে তার আর পালিয়ে যাবার উপায় থাকে না। তেমনটি তারাও আল্লাহর পাকড়াও হতে পালিয়ে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না।

মোটকথা, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, কাফের ও মুশরিকরা আমার মুষ্টির মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। আমি তাদেরকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। ইচ্ছা করলে তাদের পাপাচারের কারণে এক মুহূর্তেই আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু আমি তাদেরকে সংশোধন করে নেওয়ার জন্য সুযোগ দিয়ে যাচ্ছি। যদি তারা উক্ত সুযোগ গ্রহণ করে ঈমান আনয়ন না করে এবং বিরোধিতা হতে সরে না আসে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। কাজেই হে রাসূল! তাদের ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

গ. অথবা اِحَاطَةٌ দ্বারা এখানে তাদের ধ্বংসের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অলক্ষ্যে অচিরেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। এমনভাবে ধ্বংস করবেন যে, তারা তা পূর্ব হতে বুঝেই উঠতে পারবে না। কুরআনে মাজীদের অপর কয়েকটি আয়াতে শব্দটি ধ্বংসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

ক. وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ. গ. وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ قَدْ اَحَاطَ بِالنَّاسِ. খ. وَالْاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا.

মোটকথা, তারা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন রয়েছে, যদিও তারা তা বুঝে উঠতে পারছে না।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ আয়াত উল্লেখের কারণ : এ আয়াতটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি সান্ত্বনা দানের আয়াতগুলোর মধ্যে উক্ত আয়াতটির স্থান প্রথম কাতারেই রয়েছে। কেননা এ কুরআন মহাসম্মানিত, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। অতএব, যখন সে কুরআনে একটি সম্প্রদায়ের সফলতা এবং অন্য সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ের খবর রয়েছে তা কোনো প্রকারেই পরিবর্তন হতে পারে না। অবশ্যম্ভাবীভাবে একে মেনে নিতে হবে।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা যে নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী–মহাসম্মানিত এতে কোনো সন্দেহ নেই। যা কিছু বলা হয়েছে সকল কিছু অবশ্যই সংঘটিত হবে। –[কাবীর]

مَجِيْدٌ শব্দে বর্ণিত দু'টি কেরাত : অধিকাংশ ক্বারীগণ مَجِيْدٌ শব্দেকে قُرْاٰنٌ শব্দের সিফাত হিসাবে মারফূ' পড়েছেন। কেউ কেউ مَجِيْدٌ শব্দকে مُضَافٌ اِلَيْهِ হিসাবে মাজরূর পড়েছেন। মূলবাক্য এভাবে হবে যে, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ رَبٍّ مَجِيْدٍ অর্থাৎ "মহা সম্মানিত রবের কুরআন।' এমতাবস্থায় مَجِيْدٍ শব্দটি উহ্য মাওসূফের সিফাত হবে। –[কাবীর]

এ আয়াতগুলোতে একটি আহ্বান : আল্লাহ তা'আলা ভাষণের শেষে মক্কার জালিম, কাফের এবং প্রত্যেক যুগের আল্লাহদ্রোহীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা মিসরের স্বৈরাচারী ও আল্লাহদ্রোহী শাসক ফিরআউন এবং তার সেনাবাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনে থাকবে। শুনে থাকবে শক্তিশালী ছামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মর্মান্তিক কাহিনী। তারা রাজক্ষমতা, অর্থবল ও জনবলে দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছিল। আমি তাদেরকে নবী ও কিতাব পাঠিয়ে সত্য পথে আনার চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা নবীর কথায় কর্ণপাত করেনি, কিতাবের কোনো মূল্য দেয়নি; বরং গায়ের জোরে সবকিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অসহায় ও দুর্বল ঈমানদারদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার চালিয়েছে। ফলে আমি ফিরআউন ও তার বাহিনীকে নীল নদীতে ডুবিয়ে মেরেছি এবং ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি আসমানি গজব দ্বারা। সুতরাং তোমাদের এসব ঐতিহাসিক সত্য হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। নতুবা তোমাদের পরিণতিও অনুরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। তোমরা ক্ষমতা, শক্তি, জনবল ও অর্থবলের যতই অহমিকা প্রদর্শন কর না কেন, তোমরা কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতার বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করছ। আবেষ্টনীর সে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ব্যূহ ভেদ করা তোমাদের ক্ষমতার অতীত। অথচ তোমাদের ঈমান না থাকার দরুন তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারছ না। সুতরাং আমার কুরআন ও নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমাদের ঈমানদার হওয়া উচিত।

এ কুরআন এক মহাসম্মানিত গ্রন্থ। একে তোমরা যতই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অবলোকন কর এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, উপহাস-বিদ্রূপ কর না কেন, ধ্বংস করতে পারবে না। এর লেখক অমোঘ, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অটল, অবিচল ও চির সক্ষম। এটা আল্লাহর এমন এক সুরক্ষিত ফলকে খোদিত, যাতে কোনোরূপ পরিবর্তন ও রদবদল ঘটতে পারে না। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ একসাথে হয়েও এর বিরোধিতা করলে এর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। বস্তুত এ মহাসত্যের প্রতি তোমাদের ঈমান ও আস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। নতুবা তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। এটাই হচ্ছে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য।

مَحْفُوْظٌ কথাটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহর বাণী فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ-এর মধ্যস্থিত مَحْفُوْظٌ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো "مَحْفُوْظٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ تَغْيِيْرِ شَيْءٍ مِنْهُ" অর্থাৎ কুরআন মাজীদ শয়তানের প্রভাব হতে মুক্ত এবং কোনোরূপ পরিবর্তন হতে সংরক্ষিত।

খ. ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এখানে مَحْفُوْظٌ-এর অর্থ হলো ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কোনো জীব এটা সম্পর্কে অবহিত নয়

গ. কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো শয়তানের প্রভাব হতে একে হেফাজত করা হয়েছে। শয়তান ঐ স্থানে পৌঁছতে পারে না

ঘ. কারো কারো মতে, এখানে مَحْفُوْظٌ-এর অর্থ হলো পবিত্রতা অর্জন ছাড়া (অপবিত্র অবস্থায়) কেউ এটা স্পর্শ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ" অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য এটা স্পর্শ করা জায়েজ নেই।

ঙ. অথবা, এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআনে মাজীদ বিকৃত হওয়া হতে সংরক্ষিত। [আল্লাহই ভালো জানেন।]

فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ-এর মধ্যে لَوْحٍ-এর অর্থ কি? : আল্লাহর বাণী فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ-এর মধ্যে لَوْحٍ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।

ক. ইমাম কুরতুবী (র.)-এর মতে لَوْحٌ এমন এক বস্তুকে বলে যা ফেরেশতাদের জন্য উন্মোচিত হয় এবং তারা তা তেলাওয়াত করে।

খ. কারো মতে لَوْحٌ হচ্ছে এমন বস্তু যাতে সমস্ত সৃষ্ট জীবের বিবরণ, তাদের হায়াত, রিজিক, কার্যকলাপ ও পরিণতি সব কিছুরই বর্ণনা রয়েছে। এর অপর নাম হলো أُمُّ الْكِتَابِ (আদি গ্রন্থ)।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, لَوْحٌ শব্দটির প্রথম অক্ষর যবর বিশিষ্ট। এর অর্থ হলো ফলক।

ঘ. কারো কারো মতে, لَوْحٌ শব্দটির প্রথম অক্ষর পেশ বিশিষ্ট। এর অর্থ হলো আসমান ও জমিন?

ঙ. হযরত যাহহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অত্র আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, لَوْحٌ হলো লাল কঠিন পাথর যার উপরের দিক আরশের সাথে বাঁধা এবং নিচের দিক একজন সম্মানিত ফেরেশতার কোলে রাখা তাকে مَا طَرِيُوْنَ [মাতেরিউন] বলে।

আল্লাহর কিতাব ও কলম আলোর তৈরি। আল্লাহ তা'আলা এদের প্রতি প্রত্যহ ষাটবার দৃষ্টি দেন। প্রতিটি দৃষ্টিতে তিনি কোনো না কোনো কর্ম সম্পাদন করেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনিই একমাত্র সত্য মাবুদ। তিনিই ধনীকে দরিদ্র এবং দরিদ্রকে ধনী করেন। জীবন ও মৃত্যু সবই তাঁর হাতে।

চ. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَوْحٌ হলো শুভ্র মুক্তার দ্বারা নির্মিত।

لَوْحٌ কোথায় অবস্থিত? : لَوْحٌ কোথায় অবস্থিত এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এটা সপ্তম আকাশের উপর শূন্যে।

খ. হযরত মোকাতেল (র.) বলেন, لَوْحٌ আল্লাহ তা'আলার আরশের ডান দিকে অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন তিনশত ষাট বার এর দিকে কুদরতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

গ. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রহ.) বলেন, لَوْحٌ مَحْفُوْظٌ হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর সম্মুখে রয়েছে।

হযরত ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ لَوْحٌ হলো সাদা ধবধবে মুক্তা দ্বারা তৈরি। এর দৈর্ঘ্য আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। এর দু'পার্শ্ব মুক্তা এবং ইয়াকূত পাথরের তৈরি, তার কলম নূর দ্বারা তৈরি। -[নূরুল কোরআন]

'লাওহে' প্রথম লিখা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লাওহে মাহ্‌ফূযে প্রথমে লিখা হয়েছিল।

إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، مُحَمَّدٌ رَسُوْلِيْ، مَنْ إِسْتَسْلَمَ لِقَضَائِيْ وَصَبَرَ عَلٰى بَلَائِيْ وَشَكَرَ نَعْمَائِيْ، كَتَبْتُهُ صِدِّيْقًا وَبَعَثْتُهُ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَضَائِيْ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلٰى بَلَائِيْ وَلَمْ يَشْكُرْ نَعْمَائِيْ فَلْيَتَّخِذْ إِلٰهًا سِوَائِيْ .

অর্থাৎ "আমিই আল্লাহ! আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ আমার প্রেরিত পুরুষ। যে আমার ফয়সালা মেনে নেয়, আমার পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে, আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাকে আমি 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী) হিসাবে লিখবো এবং সত্যবাদীদের সাথে প্রেরণ করবো, আর যে আমার ফয়সালা মানে না, আমার পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে না এবং আমার নিয়ামতের শুকরিয়া করে না, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্যকে ইলাহ গ্রহণ করে।" -[কুরতুবী]

سُوْرَةُ الطَّارِقِ : সূরা আত্-ত্বারিক্ব

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াতে اَلطَّارِقُ শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে একে سُوْرَةُ الطَّارِقِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি বাক্য এবং ২৩৯টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : সূরাটির ভাষণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, এটা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাসমূহের একটি। অবতীর্ণের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তবে মক্কার কাফেরগণ যখন কুরআনের দাওয়াত এবং এর উপস্থাপিত বিধান সম্পর্কে নানারূপ ষড়যন্ত্র এবং এর বিষয় নিয়ে কৌতুক করত, তখনই এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য দু'টি। একটি হচ্ছে– মৃত্যুর পর অবশ্যই মানুষকে আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। আর দ্বিতীয়, কুরআন একটি চূড়ান্ত বাণী। কাফেরদের কোনো অপকৌশল কোনো ষড়যন্ত্রই এর ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।

সর্বপ্রথম আকাশ মণ্ডলে বিস্তীর্ণ নক্ষত্ররাজিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বলোকের কোনো বস্তুই এক মহান সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নিজ স্থানে স্থির ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে না। পরে মানুষের নিজ সত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির মূল সূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, একবিন্দু শুক্রকীট দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে এক জীবন্ত, চলন্ত ও পূর্ণাঙ্গ সত্তায় পরিণত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা এভাবে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন– মৃত্যুর পর তিনি যে, তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে এই উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ার জীবনে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য অজ্ঞানতার অন্তরালে লুকিয়ে রয়ে গেছে পরবর্তী জীবনে তাই যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। এ সময় মানুষ তার কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হবে। এ ফল ভোগ করা হতে না সে নিজের বলে আত্মরক্ষা করতে পারবে আর না অন্য কেউ তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আকাশ হতে বৃষ্টিপাত এবং জমিনে গাছপালা ও শস্যের উৎপাদন যেমন কোনো অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়; বরং এক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বিরাট কাজ, কুরআনের যেসব সত্য ও তথ্য বিবৃত হয়েছে তাও ঠিক তেমনি কোনো হাসি-তামাশার ব্যাপার নয়। এটা অতীব পাকা-পোক্ত এবং অবিচল ও অটল বাণী। কাফিররা নানা অপকৌশল দ্বারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে বলে মনে করছে, তা তাদের মারাত্মক ভুল বৈ আর কিছুই নয়। তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলাও তার এক নিজস্ব পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তার এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় কাফিরের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

অতঃপর একটি বাক্যাংশে নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। আর সান্ত্বনা বাণীর অন্তরালে কাফেরদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আপনি একটু ধৈর্যধারণ করুন। কাফেরদেরকে কিছু দিন তাদের ইচ্ছা মাফিক চলতে দিন। অপেক্ষা করুন বেশি দিন লাগবে না। তারা যেখানেই কুরআনকে আঘাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, সেখানেই কুরআন বিজয়ী হবে। আর তারা নিজেরাই তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আত্-ত্বারিক্ব মক্কায় অবতীর্ণ

سَبْعَ عَشَرَةَ اٰيَةً : ১৭ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ اَصْلُهُ كُلُّ اٰتٍ لَيْلًا وَمِنْهُ النُّجُوْمُ لِطُلُوْعِهَا لَيْلًا .

১. শপথ আকাশের ও রাতে আগমনকারীর মূলত প্রত্যেক রাতে আগমনকারী বস্তুকেই طَارِقٌ বলা হয়। সে হিসাবে রাতে উদিত হয় বিধায় নক্ষত্ররাজিকে طَارِقٌ বলা হয়।

٢. وَمَآ اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ مَا الطَّارِقُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ فِىْ مَحَلِّ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ لِاَدْرٰى وَمَا بَعْدَ مَا الْاُوْلٰى خَبَرُهَا وَفِيْهِ تَعْظِيْمٌ لِشَاْنِ الطَّارِقِ الْمُفَسَّرِ بِمَا بَعْدَهُ .

২. তোমার কি উপলব্ধি আছে কি জান রাতে আগমনকারী কি? এটা خَبَرْ ও مُبْتَدَأٌ মিলে اَدْرٰى-এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل-এর স্থলে অবস্থিত। আর প্রথমোক্ত مَا-এর পরবর্তী শব্দটি اَدْرٰكَ উক্ত مَا-এর خَبَرْ; এ বাক্য طَارِقٌ-এর মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। যার ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াত দ্বারা করা হয়েছে যে,

٣. هُوَ النَّجْمُ اَىِ الثُّرَيَّا اَوْ كُلُّ نَجْمٍ الثَّاقِبُ الْمُضِئُ لِثَقْبِهِ الظَّلَامَ بِضَوْئِهِ وَجَوَابُ الْقَسَمِ .

৩. এটা নক্ষত্র সুরাইয়া অথবা সকল নক্ষত্র যা সমুজ্জ্বল আলোকময়, যা স্বীয় আলো দ্বারা অন্ধকার ভেদ করে থাকে। আর কসমের জবাব হলো এই যে,

٤. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ بِتَخْفِيْفِ مَا فَهِىَ مَزِيْدَةٌ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّهُ وَاللَّامُ فَارِقَةٌ وَبِتَشْدِيْدِهَا فَاِنْ نَافِيَةٌ وَلَمَّا بِمَعْنٰى اِلَّا وَالْحَافِظُ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ يَحْفَظُ عَمَلَهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ .

৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। مَا অব্যয়টি তাখফীফ সহকারে পঠিত হলে তা অতিরিক্তরূপে গণ্য হবে। আর اِنْ টি ছাকীলা হতে মুখাফফাফা, তার اِسْم উহ্য অর্থাৎ اِنَّهُ এবং لَامْ টি মুখাফফা ও নাফিয়ার মধ্যে ব্যবধানকারী, আর যদি مَا অব্যয়টিকে তাশদীদযোগে পাঠ করা হয়, তবে اِنْ অব্যয়টি نَافِيَةٌ বা নেতিবাকচক এবং لَمَّا অব্যয়টি اِلَّا অর্থে ব্যবহৃত। আর তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা সংরক্ষণকারী ফেরেশতা উদ্দেশ্য, যারা তার ভালো ও মন্দ উভয় কাজের সংরক্ষণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্তমান সূরার সাথে পূর্বের সূরার যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে মু'মিনদের জন্য ওয়াদা আর কাফেরদের জন্য ধমক সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান সূরা তাদেরকে আজাব প্রদানের দলিল স্বরূপ তাদের কৃতকর্মসমূহকে সংরক্ষণ করার কথা আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া পুনরুত্থানের সম্ভাবনা এবং সংঘটন, এর উপর দলিল স্বরূপ কুরআনের সত্যতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকেও ছিল। -[কামালাইন]

সূরাটির শানে নুযূল : মাহানবী ﷺ কোনো এক সময় আবূ তালিবের বাড়ি গেলেন। সে তাকে রুটি ও দুগ্ধ আহার করতে দিল, নবী করীম ﷺ তা আহার করা অবস্থায় হঠাৎ একটি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ উজ্জ্বল করে তুলল। এটা লক্ষ্য করে আবূ তালিব খুব কম্পিত হলো এবং মনে মনে ভয় পেল। তখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, এটা কি? নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, এটা শয়তানের উপর নিক্ষিপ্ত তারকা এবং আল্লাহর অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও একত্ববাদের একটি নিদর্শন। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসহ গোটা সূরাটিই অবতীর্ণ করেন। -[খাযেন, কুরতুবী]

اَلطَّارِقُ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য? : اَلطَّارِقُ-এর শাব্দিক অর্থ হলো রাত্রে আগমনকারী বা আত্মপ্রকাশকারী। اَلطَّارِقُ দ্বারা আলোচ্য আয়াতে কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. ইমাম ফাররা (র.) বলেছেন, اَلطَّارِقُ হলো গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি-যা রাতে উদিত হয়। আর রাতে যে আগমন করে তাকেই طَارِقٌ বলে।

খ. জমহুর মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, اَلطَّارِقُ দ্বারা এখানে তারকারাজিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এরা রাতে উদিত হয় এবং দিনে লুকিয়ে থাকে।

গ. কারো কারো মতে রাতে আগমনকারী ও আত্মপ্রকাশকারী সকল বস্তুকেই এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আবার যারা বলে থাকেন যে, طارق-এর দ্বারা এখানে তারকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এর দ্বারা আমভাবে সমস্ত তারকাই উদ্দেশ্য-না বিশেষ কোনো তারকার কথা খাসভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং (ক) কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আমভাবে সকল তারকাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (খ) কারো কারো মতে এর দ্বারা ثُرَيَّا (সুরাইয়্যা) তারকাকে বুঝানো হয়েছে। (গ) একদল মুফাস্‌সিরের মতে এটা দ্বারা زُحَلْ (শনিগ্রহ)-কে বুঝানো হয়েছে। (ঘ) কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা ঐ সকল তারকাকে বুঝানো হয়েছে যাদের দ্বারা শয়তানকে তাড়ানো হয়ে থাকে। ঙ. কেউ কেউ বলেছেন, اَلطَّارِقُ দ্বারা ভোরের তারকাকে বুঝানো হয়েছে। সিহাহ সিত্তায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। (চ) কারো কারো মতে, اَلطَّارِقُ দ্বারা এখানে গ্রহের শ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

ثَاقِبٌ-এর মর্মার্থ : ثَاقِبٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে ইসমে ফায়েল وَاحِدُ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো- উজ্জ্বল, দীপ্তিমান। এখানে উজ্জ্বল তারকাকে বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ثَقْبٌ-এর অর্থ হলো ভেদ করা, ছিন্ন বা ছিদ্র করা। তারকারাজি রাতের অন্ধকারকে ভেদ করে আলো ছড়িয়ে দেয় বিধায় তাদেরকে اَلثَّاقِبُ বলা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, প্রতিটি উজ্জ্বল বস্তুকেই ثَاقِبٌ বলা হয়। -[কুরতুবী]

কারো কারো মতে, এর দ্বারা 'যাহল' নামক তারকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, এ তারকাটি সর্বোচ্চ তথা সপ্তম আসমানে অবস্থান করে। -[নূরুল কোরআন]

حَافِظٌ শব্দের গুরুত্ব : প্রত্যেক মানুষের জন্যই একজন حَافِظٌ বা তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন। এ কথার তাৎপর্য ও মর্ম-বিশ্লেষণে তাফসীরকারকদের পক্ষ হতে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। ১. حَافِظٌ দ্বারা স্বয়ং প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। তিনি মানুষের কৃত নেক ও বদ আমলসমূহ সংরক্ষণ করেন। ২. এটা দ্বারা ফেরেশতাদের হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতের অনুসারী। ৩. এটা দ্বারা জনৈক সংরক্ষণকারীর কথা বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত। সে তাঁর কথা ও কাজ সংরক্ষণ করেন। এর কতক বিলীন করেন এবং কতক আরশে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর এটা তাঁর নিকট আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৪. এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাকদীর নির্ধারিত দুর্ঘটনা ব্যতীত অন্যান্য দুর্ঘটনা, ধ্বংস, বিপদ-আপদ ইত্যাদি হতে রক্ষার কথা বুঝানো হয়েছে।

কসমের জবাব : সূরার প্রথমে আল্লাহ যে কসম করেছেন এর জবাবের ব্যাপারে দু'টি মতামত পাওয়া যায়-

১. কসমের জবাব হলো- اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

২. কারো মতে জাবাব হলো- اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ

অনুবাদ :

٥. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ نَظَرَ اِعْتِبَارٍ مِمَّ خُلِقَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ جَوَابُهُ .

৫. সুতরাং মানুষ লক্ষ্য করুক উপদেশ গ্রহণমূলক লক্ষ্য করা যে, তাকে কি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ কোন বস্তু হতে? পরবর্তী আয়াতে এরই জবাব দেওয়া হচ্ছে।

٦. خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ذِيْ انْدِفَاقٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ فِيْ رَحِمِهَا .

৬. তাকে সবেগে স্খলিত পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যা পুরুষ হতে স্খলিত হয়ে নারীর জরায়ুতে প্রবিষ্ট হয়।

٧. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ لِلرَّجُلِ وَالتَّرَائِبِ لِلْمَرْاَةِ وَهِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ .

৭. যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড পুরুষের ও পাঞ্জরাস্থির মধ্য হতে মহিলার, তা হলো বক্ষদেশের হাড়।

٨. اِنَّهُ تَعَالٰى عَلٰى رَجْعِهِ بَعْثِ الْاِنْسَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَقَادِرٌ فَاِذَا اعْتَبَرَ اَصْلَهُ عَلِمَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى ذٰلِكَ قَادِرٌ عَلٰى بَعْثِهِ .

৮. নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তা'আলা এর প্রত্যানয়নে মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুত্থানে ক্ষমতাবান প্রথম সৃষ্টিকরণে তিনি ক্ষমতাবান প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তিনি পুনরুত্থানেও ক্ষমতাবান।

٩. يَوْمَ تُبْلَى تُخْتَبَرُ وَتُكْشَفُ السَّرَائِرُ ضَمَائِرُ الْقُلُوْبِ فِى الْعَقَائِدِ وَالنِّيَّاتِ .

৯. যেদিন পরীক্ষা করা হবে যাঁচাই-বাছাই ও উন্মোচিত করা হবে গোপন বিষয়াদি নিয়ত ও আকীদা-বিশ্বাসরূপে যা কিছু অন্তরে লুক্কায়িত ছিল।

١٠. فَمَا لَهُ لِمُنْكِرِ الْبَعْثِ مِنْ قُوَّةٍ يَمْتَنِعُ بِهَا عَنِ الْعَذَابِ وَلَا نَاصِرٍ يَدْفَعُهُ عَنْهُ .

১০. অনন্তর সেদিন তার জন্য থাকবে না পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর জন্য কোনো সামর্থ্য। যা দ্বারা শাস্তি প্রতিরোধ করবে, আর না কোনো সাহায্যকারী যে তার উপর হতে উক্ত শাস্তিকে প্রতিহত করবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ-এর আমিল : عَلٰى رَجْعِهِ-এর অর্থ যারা عَلٰى بَعْثِ الْاِنْسَانِ করে থাকেন, তাদের নিকট يَوْمَ-এর আমিল হলো لَقَادِرٌ শব্দটি। رَجْعِهِ এতে কোনো عَمَلْ করবে না। কেননা তখন خَبَرْ اِنَّ-এর দ্বারা مَوْصُوْل এবং صِلَةٌ এর মাঝে দূরত্ব হয়ে যায়

আর অন্যান্যদের মতে এখানে একটি عَامِلْ উহ্য রয়েছে।

কারো কারো মতে এখানে عَامِلْ হলো رَجْعِهِ -[কুরতুবী, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনে সকল মানুষের কৃতকর্ম হেফাজত বা সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। পুনরুত্থান হবে তার ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার প্রথম অবস্থা এবং সৃষ্টির সাধারণ নিয়মের প্রতি চিন্তা করার জন্য বলেছেন, যেন তার সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি-ই পুনরায় তাকে উঠাতে পারবেন এবং প্রতিদান তিনি-ই দিবেন। অতএব, পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসের জন্য আমল করা দরকার।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ-এর শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইকরামা (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আবূ আসাদ নামক আরবের বিখ্যাত মল্লবীর একটি কাঁচা চর্মের উপর দাঁড়িয়ে বলত, হে লোকেরা! যারা মুহাম্মদকে কষ্ট দেবে তাদেরকে এত এত পুরস্কার প্রদান করা হবে। আর সে এটাও বলত যে, মুহাম্মদ বলেন, দোজখের কর্মকর্তা ফেরেশতা হবে

উনিশ, তাদের দশ জনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট, আর বাকি নয় জনের মোকাবিলা করবে তোমরা সকলে। তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের সৃষ্টির মূল হলো এক ঘৃণ্য শুক্রবিন্দু, কাজেই তার গর্ব করার কোনো কিছু নেই। −[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ : আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বলোকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের পর মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁর সত্তা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য। মানুষের চিন্তা করা উচিত; তাকে কিরূপে কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। পিতার দেহ হতে নির্গত শতকোটি শুক্রকীটের মধ্য হতে একটি শুক্রকীট এবং মায়ের গর্ভ হতে নির্গত অসংখ্য ডিম্বের মধ্য হতে একটি ডিম্ব নির্বাচিত করে কোনো বিশেষ মুহূর্তে উভয়কে মিলিত ও সংযুক্ত করে দেয় কে? কে এভাবে এক বিশেষ ব্যক্তিকে গর্ভাধারে স্থান করে দেয়? কে সে শক্তি যে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর হতে মায়ের গর্ভে তাকে ক্রমশ বিকাশ, ক্রমবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ দান করে তাকে একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়− যার পর সে এক জীবন্ত শিশুর আকারে ভূমিষ্ঠ হয়। মায়ের গর্ভেই তার দেহের সংগঠন সংস্থাকে বানিয়ে দেয়? তার দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্যকে সংস্থাপন করে? জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার ক্রমাগত ও অব্যাহত রক্ষণাবেক্ষণ করে কে? এ সময়ে তাকে রোগ-শোক হতে বাঁচিয়ে রাখে কে? তার জন্য জীবনের এতসব উপায়-উপকরণ কে সংগ্রহ করে দেয়? নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে অবশ্যই বলতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই এসব কিছু করেছেন। সুতরাং যিনি এসব কিছু করেছেন তিনি অবশ্যই মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম।

قَوْلُهُ تَعَالَى خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَّخْرُجُ الخ : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সবেগে স্খলিত এমন এক ফোঁটা নাপাক পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন−যা পুরুষের পিঠ ও নারীর বক্ষদেশ হতে নির্গত হয়ে নারীর গর্ভাধারে প্রবিষ্ট হয়েছে। صُلْب হলো মেরুদণ্ড এবং تَرَائِب হলো বুকের অস্থি−অন্য কথায় পাঁজরের হাঁড়। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রজনন শুক্র যেহেতু মানুষের এ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাঁড়ের মধ্যবর্তী দেহ সত্তা হতে নিঃসৃত হয়, এ জন্য বলা হয়েছে মানুষকে সে পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে− যা পিঠ ও বুকের মাঝ হতে বের হয়। হাত ও পা কেটে ফেললে অবশিষ্ট দেহ হতেও এ শুক্রকীট উৎপন্ন হয়। কাজেই এটা মানুষের সমগ্র দেহ হতে নিঃসৃত হয় এ কথা বলা ঠিক নয়। মূলত দেহের প্রধান অঙ্গসমূহই এর উৎস-উৎপাদন কেন্দ্র। আর তা সবই ব্যক্তির দেহে অবস্থিত। মগজের কথা এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কেননা মেরুদণ্ড মগজেরই অংশ। এর মাধ্যমেই দেহের সাথে মগজের সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়।

দেহের বিভিন্ন অংশের কাজ যদিও ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়; তবুও কোনো অংশ বা অঙ্গই সম্পূর্ণ নিজস্ব ও বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। দেহের সকল অঙ্গের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়ই নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। শুক্রকীট অণ্ডকোষে উৎপন্ন হয় তাতে সন্দেহ নেই এবং তা হতে এর নিষ্কাসন এক বিশেষ পথেই হয়ে থাকে। কিন্তু পাকস্থলী, কলিজা, ফুসফুস, অন্তর, মগজ, গুর্দা, বৃক্ক প্রভৃতি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন না করলে শুক্রকীট উৎপাদন ও নিষ্কাসনের এ ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় প্রস্রাবের উৎপাত হয় গুর্দায় বা বৃক্কে। অপর একটি টিউবের সাহায্যে এটা মূত্রথলিতে পৌঁছে প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়ার পথে বের হয়ে যায়; কিন্তু এটা সমগ্র দেহে আবর্তিত করে বৃক্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রয়োজন যেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ তা যথাযথ কাজ না করলে বৃক্ক এককভাবে রক্ত হতে এদের আলাদা করে মুত্রথলিতে পৌঁছাতে পারে না, যার সমষ্টি প্রস্রাব। এ কারণে কুরআন মাজীদে এ কথা বলা হয়নি যে, শুক্র কীট মেরুদণ্ড ও বুকের অস্থিসমূহ হতে বের হয়; বরং বলা হয়েছে এ উভয়ের মাঝখানে দেহের যে অংশ রয়েছে; তা হতেই শুক্রকীট নিঃসৃত হয়। এটা হতে শুক্রকীটের উৎপাদন এবং এর নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ কর্মপদ্ধতির (যা দেহের কতিপয় বিশেষ অংশ সম্পন্ন করে থাকে) অবস্থিতি অস্বীকৃতি হয় না; বরং এটা হতে বুঝা যায় যে, এ কর্মপদ্ধতি কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্য নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নয়। আল্লাহ তা'আলা মানবদেহের মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মাঝে যে গোটা দেহ ব্যবস্থা সংস্থাপন করেছেন। তার সামগ্রিক কার্যক্রমের ফলেই এটা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, সমগ্র দেহ এ কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা হাত ও পা কেটে ফেললেও এ ব্যবস্থা কাজ করতে থাকে। অবশ্য মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মাঝে যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, তার একটিও যদি না থাকে তাহলে এ ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে না। কাজেই বুঝা গেল যে, কুরআনের ঘোষণা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত।

دَافِق-এর অর্থ : মূলত دَافِقٌ শব্দটি ইসমে ফায়েলের কিন্তু অর্থ− ইসমে মাফঊলের। مَدْفُوْقٌ অর্থ− প্রবাহিত। যেমন− عِيْشَةٍ رَاضِيَة-এর মধ্যে رَاضِيَةٌ ইসমে ফায়েলের শব্দ হওয়া সত্ত্বেও مَرْضِيَّةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম ফাররা বলেন, আরবরা তাদের ভাষায় অনেক فَاعِلْ-কে مَفْعُوْلْ অর্থে ব্যবহার করে। যেমন−سِرٌّ كَاتِمٌ অর্থাৎ سِرٌّ مَكْتُوْمٌ এবং لَيْلٌ نَائِمٌ অর্থ لَيْلٌ مَنَامٌ −[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

مَاءٌ শব্দকে একবচন নেওয়ার কারণ : মানবসৃষ্টির মূলে নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য যথাসময়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রযোজ্য একজনের বীর্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টি হয় না; কিন্তু কুরআন মাজীদে مَاءٌ শব্দকে একবচন উল্লেখ করায় এ সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। বলার দরকার ছিল خُلِقَ مِنْ مَّائَيْنِ।

মুফাসসিরীনে কেরাম এ প্রশ্নের জবাবে বলেন– আল্লাহ তা'আলা مَاءٌ বলতে নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্যকে বুঝিয়েছেন; কিন্তু গর্ভাশয়ে যাওয়ার সময় উভয় বীর্য এক হয়ে সম্মিলিতভাবে যাওয়ার কারণে একবচন ব্যবহার করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

অথবা, এখানে مَاءٌ বলতে বীর্যের শ্রেণি (جِنْس) -কে বুঝানো হয়েছে। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে বীর্য পুরুষ ও মহিলার-ই হয়ে থাকে।

اَلصُّلْبُ-এর অর্থ : اَلصُّلْبُ অর্থ হলো عَظْمٌ فِى الظَّهْرِ مِنَ الْكَاهِلِ اِلٰى اَسْفَلِ الظَّهْرِ ঘাড়ের মধ্য হতে কোমর পর্যন্ত পিঠের মধ্যখানের হাড়কে صُلْب বলা হয়। صُلْب শব্দটি ৪টি রূপে ব্যবহৃত হয় :

ক. صُلْبٌ 'সাদ' এর উপর পেশ এবং লাম সাকিন,

খ. صُلُبٌ 'সাদ'এবং লাম উভয়ের উপর পেশ,

গ. صَلَبٌ 'সোয়াদ'-এর উপর যবর দিয়ে এবং

ঘ. صَالِبٌ - قَالِبٌ এর ওযনে। –[কুরতুবী]

اَلتَّرَائِبُ-এর অর্থ : اَلتَّرَائِبُ শব্দটি বহুবচন, একবচনে تَرِيْبَةٌ আর تَرِيْبَةٌ বলা হয় বক্ষের ঐ স্থানকে যে স্থানে অলঙ্কার থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এই অর্থই বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, দুই দুধের মধ্যখানকে تَرِيْبَةٌ বলা হয়।

হযরত ইকরামা এবং যাহহাক বলেন, تَرَائِبُ الْمَرْأَةِ হলো তার দুই হাত, দুই পা এবং দুই চোখ।

হযরত মুজাহিদ বলেন, تَرِيْبَةٌ হলো দুই কাঁধ এবং বক্ষের মধ্য স্থানের অংশ।

ইমাম যুযযাজ বর্ণনা করেন, বক্ষের ডানদিকের ৪টি এবং বাম দিকের ৪টি হাড়কে تَرَائِبُ বলা হয়।

হযরত মা'মার ইবনে হাবীবা আল-মাদানীর মতে– تَرَائِبُ হলো হৃদয় নিংড়ানো রস, যার দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয়। তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, কাবীর]

নারী-পুরুষ উভয়ের থেকে বীর্য গ্রহণের কারণ : আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়ের থেকেই বীর্য (শুক্র) গ্রহণ করে গর্ভাশয়ে স্থাপন পূর্বক মানুষের দেহ সৃষ্টি করে থাকেন। পুরুষের বীর্য صُلْب থেকে আসে, এটা দিয়ে সন্তানের হাড় এবং রগ তৈরি হয়। আর মহিলার বীর্য تَرَائِبُ থেকে আসে, এর দ্বারা সন্তানের গোশত এবং রক্ত তৈরি হয়। –[কুরতুবী]

اِنَّهٗ শব্দের সর্বনামের [যমীরের] প্রত্যাবর্তনস্থল : اِنَّهٗ-এর সর্বনামটি خَالِقٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তবে خَالِقٌ শব্দটি পূর্বে উল্লেখ হয়নি। উল্লেখ ছাড়া সর্বনামকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা কতটুকু বৈধ হয়েছে। –এই প্রশ্নের জবাব দু'টি হতে পারে :

১. পিছনে خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ বলা হয়েছে। কোনো বস্তু এমনিতেই সৃষ্টি হয় না; বরং خَالِقٌ-এর প্রয়োজন হয়। অতএব, অর্থ এই দাঁড়াবে যে, اِنَّ ذٰلِكَ الَّذِىْ خَلَقَ قَادِرٌ عَلٰى رَجْعِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একে পুনারায় উঠানোর উপর শক্তি রাখেন।

২. যদিও সরাসরি শব্দ উল্লেখ হয়নি, কিন্তু مَرْجِعٌ যে আল্লাহ –(খালেক) হবেন এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানের মতো বড় কাজ আল্লাহর দ্বারাই সংঘটিত হবে, আর কারো দ্বারা নয়।

উভয় অবস্থাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ-ই হবেন مَرْجِعٌ অতএব, উল্লেখ না করলেও উল্লেখের মতো-ই হয়েছে। –[কাবীর]

رَجْعِهٖ-এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল এবং عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ-এর অর্থ :

১. কারো মতে, رَجْعِهٖ-এর সর্বনামটি اَلْاِنْسَانُ-এর দিকে ফিরেছে, তখন অর্থ হবে যিনি প্রথমে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মৃত্যুর পর তাকে জীবন্ত করার ব্যাপারে শক্তি রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ এবং وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ।

২. কারো মতে الْإِنْسَانُ নয়; বরং الْمَاءُ তখন অর্থ হবে তিনি আল্লাহ ঐ পানি (শুক্র)-কে যথাস্থানে বারবার স্থাপন করতে পারেন
হযরত যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে 'যেমন ছিল তেমন' (পানি) করে দিতে পারেন। এই শক্তি তাঁর রয়েছে
তিনি আরো বলেন, আল্লাহ মানুষকে বৃদ্ধ হতে যুবক, যুবক হতে বৃদ্ধ করতে পারেন। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়–
বৃদ্ধ হতে যুবকে, যুবক হতে কিশোর এবং কিশোর হতে বীর্যে রূপান্তির করতে পারেন।

হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, তিনি আল্লাহ ঐ পানিকে (শুক্র) বন্ধ করে দিতে পারেন, যেন এটা বের না হয়। তবে প্রথম মতটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। –[কাবীর, কুরতুবী]

اِبْتِلَاءُ السَّرَائِرِ-এর অর্থ : উল্লিখিত ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, সেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। سَرَائِر শব্দটি سِرٌّ শব্দের বহুবচন, অর্থ– গোপন তথ্য। গোপন তথ্য দ্বারা এখানে মানুষের পার্থিব জীবনের আমলের কথা বুঝানো হয়েছে। এর তথ্য তাদের হতে গোপন করা হয়েছে। শুধু ফলিত রূপটিই তাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান। সুতরাং তথ্য সম্পর্কে মহাবিচারের দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। কাজেই সে তথ্যটি হলো কাজের পিছনে যে উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা– এক কথায় যে নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে, সে নিয়তের বিচার-বিশ্লেষণ হবে। কেননা নিয়তটি সর্বদা গোপনই থাকে। মানুষ তা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। মানুষের সম্মুখে কেবল সদিচ্ছা ও কল্যাণমূলক দিকটিই তুলে ধরা হয়। তাই মহাবিচারের দিন এরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। আর দ্বিতীয় তথ্য হলো মানুষের কাজের প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত পৌঁছে। এর প্রতিক্রিয়ার সীমানাটি কতদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং তা দ্বারা সৃষ্টিকুলের কতখানি কল্যাণ-অকল্যাণ হয় তাও অনেক সময় মানুষের নিকট হতে গোপন থাকে। যেমন কোনো লোক একটি বীজ দুনিয়ার বুকে বপন করে গেল। তাতে কি ফসল ফলল, ফসল কতদিন ছিল, কারা তা ভোগ করে লাভবান হলো, কারা এর যথার্থ ব্যবহার করল, কারা করল না, এর সবকিছু তার নিকট গোপন থাকে। মহাবিচারের দিনই এর সঠিক বিচার, হিসাব-নিকাশ ও পরিসংখ্যান হবে। মোটকথা, গোপন তথ্য দ্বারা মানুষের আমল, আমলের নিয়ত ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেই বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে বলে বুঝানো হয়েছে।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ আয়াতে سَرَائِرُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আয়াত يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ-এর মধ্যে اَلسَّرَائِرُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

১. জমহুর মুফাস্সিরগণের মতে, এখানে اَلسَّرَائِرُ-এর দ্বারা পার্থিব জীবনের আমলকে বুঝানো হয়েছে।

২. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, এটা দ্বারা মানুষের অন্তরে লুক্কায়িত আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়তকে বুঝানো হয়েছে।

৩. নবী করীম ﷺ হতে একটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকে চারটি বস্তুর উপর আসীন বানিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে– নামাজ, রোজা, যাকাত ও গোসল। আর এটাই سَرَائِرُ যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পরীক্ষা করবেন।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি বস্তু যথাযথ সংরক্ষণ করবে সে বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহর বন্ধু হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এদের সংরক্ষণ করে না, সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর শত্রু হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে– নামাজ, রোজা ও সহবাসের পরের গোসল।

৫. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, অজু অন্তরে লুক্কায়িত গোপন তথ্যাদি, মহিলার যৌনাঙ্গ, হায়েজ, গর্ভধারণ এগুলোও سَرَائِرُ -এর অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এ সকল ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন।

৬. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, তিনটি গোপন বিষয় হলো নামাজ, রোজা ও সহবাসের পর গোসল করা। আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে নামাজের আমানতদার বানিয়েছেন, যদি সে চায় বলতে পারে–নামাজ আদায় করেছি, অথচ সে নামাজ আদায় করেনি। তিনি আদম সন্তানকে রোজার আমানতদার বানিয়েছেন, ইচ্ছা করলে সে বলতে পারে– আমি রোজা রেখেছি, অথচ সে রোজা রাখেনি। তদ্রূপ তিনি আদম সন্তানকে সহবাসের পর গোসল করার ব্যাপারে আমানতদার বানিয়েছেন, ইচ্ছা করলে সে বলতে পারে আমি গোসল করেছি, অথচ সে গোসল করেনি। আর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার প্রকৃত অবস্থা অবশ্যই ফাঁস করে দিবেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

অনুবাদ :

١١. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الْمَطَرِ لِعَوْدِهٖ كُلَّ حِيْنٍ .

১১. শপথ আকাশের যা বারিবর্ষণকারী বৃষ্টি পুনঃপুন আগমন করে বিধায় তাকে رَجْع [পুনঃপুন আগমনকারী] শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

١٢. وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ الشَّقِّ عَنِ النَّبَاتِ .

১২. আর শপথ জমিনের, যা বিদীর্ণ হয় উদ্ভিদরাজি উদ্গত হওয়ার মাধ্যমে।

١٣. اِنَّهٗ اَيِ الْقُرْاٰنُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ .

১৩. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআন মীমাংসাকারী বাণী যা হক ও বাতিলের মধ্যে মীমাংসা করে।

١٤. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ بِاللَّعِبِ وَالْبَاطِلِ .

১৪. আর এটা নিরর্থক নয়। খেলাধুলা ও অপ্রয়োজনীয়।

١٥. اِنَّهُمْ اَيِ الْكُفَّارُ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا يَعْمَلُوْنَ الْمَكَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ .

১৫. নিশ্চয় তারা কাফের মুশরিকগণ জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

١٦. وَاَكِيْدُ كَيْدًا اَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ .

১৬. আর আমি ভীষণ কৌশল অবলম্বন করি তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করি, যা তারা টের পায় না।

١٧. فَمَهِّلِ يَا مُحَمَّدُ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ تَاكِيْدٌ حَسَّنَهٗ مُخَالَفَةُ اللَّفْظِ اَيْ اَنْظِرْهُمْ رُوَيْدًا قَلِيْلًا وَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَعْنَى الْعَامِلِ مُصَغَّرُ رُوْدٍ اَوْ اِرْوَادٍ عَلَى التَّرْخِيْمِ وَقَدْ اَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَنُسِخَ الْاِمْهَالُ بِاٰيَةِ السَّيْفِ اَيْ بِالْاَمْرِ بِالْجِهَادِ وَالْقِتَالِ .

১৭. অতএব, অবকাশ দান কর হে মুহাম্মদ! কাফেরদের, তাদেরকে অবকাশ দাও এটা তাকিদ স্বরূপ পুনরুক্ত, শব্দের বিভিন্নতা দ্বারা এর সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছে, অর্থাৎ তাদেরকে সময় দাও স্বল্প কালের জন্য সামান্য এটা আমিলের অর্থের তাকিদের জন্য مَصْدَرْ শব্দটি تَرْخِيْم যাতে تَصْغِيْر এর-اِرْوَادٌ - رُوْدٌ কর হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধের দিন কাফেরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আর জিহাদের আদেশ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত আদেশ দ্বারা অবকাশ দানের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

তাহকীক ও তারকীব

رُوَيْدًا-এর অর্থ এবং মহল্লে ই'রাব : رُوَيْدًا অর্থ قَرِيْبًا অর্থাৎ নিকটতম সময়। হযরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদাহ (র.) বলেন, رُوَيْدًا অর্থ قَلِيْلًا বা কম সময় অর্থ কিছু কাল, বাবে نَصَرَ এটা رُوْدٌ শব্দের تَصْغِيْر হয়েছে। এটা চারভাবে ব্যবহৃত হয়–

১. اِسْم হিসাবে, যেমন رُوَيْدَ عَمْرًا অর্থাৎ আমরকে কিছুকাল অবকাশ দাও।

২. صِفَة হিসাবে, যেমন سَارُوْا سَيْرًا رُوَيْدًا অর্থাৎ তারা অল্প অল্প করে ভ্রমণ করেছে।

৩. حَال হিসাবে, যেমন سَارَ الْقَوْمُ رُوَيْدًا অর্থাৎ লোকেরা ধীরগতিতে ভ্রমণ করেছে।

৪. মাসদার হিসাবে, যেমন (بِالْإِضَافَةِ) رُوَيْدَ عَمْرٍو এর অনুরূপ কুরআন মাজীদে দেখা যায়, فَضَرْبَ الرِّقَابِ
কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আয়াতে মাসদারের সিফাত হিসাবে رُوَيْدًا ব্যবহৃত হয়েছে। মূলবাক্য ছিল أَمْهِلْهُمْ إِمْهَالًا رُوَيْدًا
অথবা 'হাল' হয়েছে, তখন অর্থ হবে أَمْهِلْهُمْ غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ لَهُمُ الْعَذَابَ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা পিছনের আয়াতগুলোতে যথাযথ দলিল পেশ করে তাওহীদ তথা একত্ববাদকে দৃঢ় করেছেন। সাথে সাথে পুনরুত্থানকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এখন আবার কসম করে কুরআনের সত্যতা এবং কাফিরদের ব্যর্থতা বর্ণনা করছেন।

السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ আয়াতে الرَّجْعِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে আকাশকে ذَاتِ الرَّجْعِ বলেছেন। الرَّجْعِ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– প্রত্যাবর্তন করা। কিন্তু আরবি ভাষায় رَجْع শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ হলো– বৃষ্টিপাত।
জমহুর মুফাস্সিরগণের মতে অত্র আয়াতেও رَجْع শব্দটি বৃষ্টিপাতের অর্থে হয়েছে। বৃষ্টিপাতকে رَجْع বলার কয়েকটি কারণ হতে পারে।

এক : বৃষ্টি একবার বর্ষিত হয়ে ক্ষান্ত হয় না; বরং বর্ষা ঋতুতে বারবার এবং অন্যান্য ঋতুতে একাধিকবার বর্ষিত হয়ে থাকে। সব ঋতুতেই মাঝে মধ্যে কিছুনা কিছু বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

দুই : দুনিয়ার সমুদ্রসমূহ হতে পানি বাষ্পরূপে উত্থিত হয় এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকেই ফিরে আসে।

তিন : আরবগণ বৃষ্টিপাতকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করত, তাই তারা বৃষ্টিপাতকে বারংবার কামনা করত। এ জন্যই বৃষ্টপাতের নাম হয়েছে الرَّجْع ।

চার : কেউ কেউ বলেছেন, দীর্ঘ দিন বৃষ্টিপাত না হলে জামিন শুষ্ক হয়ে যায় এবং এর নীরব ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বৃষ্টিপাত হওয়ার পর আবার এটা সতেজ হয় এবং যেন নবজীবন ফিরে পায়। এ জন্যই বৃষ্টিপাতকে الرَّجْع নামকরণ করা হয়েছে।

রাঈসুল মাফাস্সিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (র.) সহ অধিকাংশ তাফসীরবিদগণই উপরিউক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

الرَّجْع-এর ব্যাখ্যায় অপরাপর মুফাস্সিরগণের আরো কয়েকটি মতামত নিম্নে দেওয়া হলো। ১. কারো কারো মতে الرَّجْع-এর দ্বারা এখানে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা জমিনের বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে বারংবার আকাশে ফিরে যায়। ২. কেউ কেউ বলেছেন, الرَّجْع শব্দটি এখানে النَّفْع বা কল্যাণের অর্থে হয়েছে। অত্র আয়াতে আকাশকে কল্যাণকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩. হযরত ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতে الرَّجْع-এর দ্বারা এখানে আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এরা বার বার অস্ত যায় এবং পুনরায় উদিত হয়ে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে জমহুর মুফাসসিরগণের মাযহাবই অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং আরবি ব্যবহার পদ্ধতির অধিকতর নিকটবর্তী।

الصَّدْعِ -এর অর্থ : صَدْع অর্থ– পৃথক করা, ফেটে যাওয়া, প্রকাশ হওয়া, দু' খণ্ড হয়ে যাওয়া। বহুবচনে صُدُوْعٌ বাবে فَتَحَ
যেহেতু উদ্ভিদ জমিনকে চিড়ে বের হয়, সেহেতু জমিনকে ذَاتِ الصَّدْعِ বলা হয়েছে। মনে হয় যেন এভাবে বলা হয়েছে যে, وَالْأَرْضِ ذَاتِ النَّبَاتِ [জমিনের কসম, যা উদ্ভিদের মালিক বা উদ্ভিদ নির্গমনকারী] কেননা উদ্ভিদ জমিনকে বিদীর্ণ করে।
হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, وَالْأَرْضِ ذَاتِ الطُّرُقِ الَّتِي تَصْدَعُهَا الْمُشَاةُ [ঐ জমিনের শপথ, যে জমিনে অনেক রাস্তা রয়েছে, যেগুলো বিচরণকারীগণ প্রকাশ করেছে] এখানে 'প্রকাশিত রাস্তা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কারো মতে, الصَّدْعِ দ্বারা الْحَرْثِ (চাষ) বুঝানো হয়েছে। কেননা চাষ দ্বারা জমিনকে পৃথক করা হয়।

কারো মতে, الْأَمْوَاتُ-কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ ذَاتِ الْأَمْوَاتِ হাশরের দিন জমিন ফেটে মুর্দাগণ জীবিত হয়ে বের হবে, এ কারণে صَدْع বলা হয়েছে। –[কুরতুবী]

দুনিয়ায় পদার্পণ এবং পরকাল এ দু'টি বাস্তব সত্যকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা জীব সৃষ্টিকে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে জমিনের উদ্ভিদ সৃষ্টির রহস্যও তুলে ধরেছেন। এতে বুঝা যায় যে, السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ كَالْأَبِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

أَبٌ وَأُمٌّ অর্থাৎ ধারণকারী আকাশ পিতৃতুল্য এবং উদ্ভিদ উদগমনশীল পৃথিবী মাতৃতুল্য। মাতাপিতা ছাড়া যেমন বংশ বৃদ্ধির চিন্তা করা যায় না, তেমনি আকাশ ও জমিন ছাড়া উদ্ভিদের চিন্তা করা যায় না। উভয়টি আমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত বৈ আর কিছু নয় কেননা দুনিয়ার প্রত্যেকটি নিয়ামত আকাশে বারবার বৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী। –[কাবীর]

إِنَّهُ-এর যমীরের মারজি : إِنَّهُ-এর মারজি'র ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

ক. পিছনে উল্লিখিত আল্লাহর সকল وَعْدُ ও وَعِيْدُ-এর দিকে, যমীর ফিরেছে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে তোমাদেরকে জীবন্ত করার যে কথা আমি তোমাদের সম্মুখে ব্যক্ত করেছি তা لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَحَقٌّ অর্থাৎ চূড়ান্ত এবং সত্য কথা।

খ. অথবা, اَلْقُرْاٰنُ-এর দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ হবে– কুরআন হক ও বাতিলের মাঝে প্রভেদকারী। যেমন, অন্য স্থানে কুরআনকে বলা হয়েছে فُرْقَانٌ।

এ দু'টি মতের মধ্যে প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য। কেননা عَوْدُ الضَّمِيْرِ اِلَى الْمَذْكُوْرِ اَوْلٰى অর্থাৎ উল্লিখিত বস্তুর দিকে যমীর ফিরানো অধিক উত্তম। –[কাবীর, কুরতুবী]

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হওয়া এবং জমিন দীর্ণ হয়ে নিজের বুকের উপর উদ্ভিদ উৎপাদন কোনো ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার নয়, এটা যেমন একটি বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য, অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদ যা কিছু ঘোষণা করে, যেসব আগাম খবর দেয়, মানুষের পুনঃ জীবিত হয়ে আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়ার যে মহাবাণী শুনায় তাও কোনো হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এটা এক অকাট্য ও অমোঘ বাণী। এক গুরুত্বপূর্ণ মহাসত্য। এক অবিচল দৃঢ় ঘোষণা। এটা অবশ্যই পূরণ হতে হবে এবং তা হবেই।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনতিবিলম্বে একটি ফিতনা দেখা দিবে। তখন আমি বললাম, এটা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? তিনি উত্তর দিলেন, একমাত্র কিতাবুল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। যাতে তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের খবর রয়েছে এবং তোমাদের জন্য আহকাম বর্ণিত হয়েছে। এটা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী, হাসি-তামাশার বিষয় নয়। যে ব্যক্তি একে বর্জন করবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এটা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা যদি কেউ হেদায়েত চায় আল্লাহ তাকে গোমরাহ্ করে দিবেন। এটা আল্লাহর মজবুত রশি, সরল সঠিক পুণ্য পন্থা। –[রুহুল মা'আনী]

কেন এবং কিভাবে তারা ষড়যন্ত্র করেছে? : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং ইসলামি আদর্শ তথা একত্ববাদ যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য মক্কার কাফির ও মুশরিকরা নিম্নোক্ত কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছিল।

১. নবী করীম ﷺ-কে তারা জাদুকর ও আল-কুরআনকে জাদু-মন্ত্র বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল।

২. নবী করীম ﷺ-কে কবি এবং আল-কুরআনকে একটি নিছক কব্যগ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করেছিল।

৩. আবার কখনো কখনো তারা বলত মুহাম্মদ ﷺ-কে জিনে পেয়েছে। আল কুরআন জিনে পাওয়া এক ব্যক্তির প্রলাপ মাত্র

৪. পরকালের সত্যতার ব্যাপারে তারা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করত, যা প্রকৃত প্রস্তাবে নবী করীম ﷺ ও কুরআনে মাজীদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টির নামান্তর ছিল।

৫. পরিশেষে তারা নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। যাতে তাঁর প্রচারিত এ দীন, দুনিয়া হতে চিরতরে নির্মূল হয়ে যায়।

ষড়যন্ত্রের কারণ : নবী করীম ﷺ ও আল-কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের অনুরূপ প্রাণান্তকর অপপ্রচার ও অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল আল-কুরআনের আদর্শ ও নবী করীম ﷺ-এর নেতৃত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ রূপে দুনিয়া হতে মুছে যাবে এবং তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন হয়ে পড়বে। আর এটা তাদের জন্য অসহনীয়। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা যত বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করুক না কেন এবং যত ধরনের ষড়যন্ত্রই লিপ্ত হোক না কেন তাতে আপনার পেরেশান হওয়ার কোনোই কারণ নেই। আমিই তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিব

وَاَكِيْدُ كَيْدًا সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমত : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ ও কুরআনে মাজীদের ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আর আমিও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি। এখানে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার ষড়যন্ত্র করার তাৎপর্য কি? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করবেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ষড়যন্ত্র নয়। তবে শাব্দিক মিল রক্ষার্থে একে ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অপরাপর আয়াতসমূহেও অনুরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন– جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا . يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَاللّٰهُ خَادِعُهُمْ ও نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ ইত্যাদি।

২. অথবা, এখানে اَكِيْدُ كَيْدًا-এর দ্বারা তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি প্রদান করবেন।

৩. অথবা, এর মর্মার্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমত অপকর্ম করে যাওয়ার জন্য সুযোগ প্রদান করেন। অতঃপর তারা যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হবে তখন তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিবেন। এটা প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্র না হলেও বাহ্যত ও আকৃতিগতভাবে ষড়যন্ত্রের ন্যায় হওয়ার কারণে একে ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে।

অথবা, এখানে বাহ্যত كَيْد [ষড়যন্ত্র]-এর নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হলে ও প্রকৃতপক্ষে নবী করীম ﷺ ও সাহাবীদের দিকেই নিসবত করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা যেন বলতে চেয়েছেন যে, তারা তো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে আমিও তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, আমার রাসূল ﷺ ও মু'মিনগণের মাধ্যমে।

সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী 'আল-কুরআন : 'কুরআন সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী কালাম।' আল্লাহ তা'আলার এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে– মানুষ যুগ যুগান্তর ধরে শয়তানের প্রবঞ্চনায় এবং নফসের গোলামী করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেসব মনগড়া নীতি-আদর্শ সৃষ্টি করেছে, কুরআন তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে দেয় যে, এটা বাতিল, আল্লাহর রচিত বিধান নয়। আল্লাহর বিধানের পরিপন্থি নীতি-আদর্শ ও চিন্তাধারাই হচ্ছে বাতিল ও মানুষের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়। আর এর প্রতিকূলে কুরআন যে নীতি-আদর্শ ও মতবাদ পেশ করেছে, এটাই হক, এটাই সত্য, এটাই মানুষের জন্য গ্রহণীয় ব্যক্তি জীবনে কোন কোন কাজ অবৈধ, সমাজ জীবনে কোন কোন রীতি-নীতি মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা কল্যাণকর, অর্থনীতিতে কোন্ কোন্ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর বা কল্যাণকর, এর প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্গুলে নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছে–দেখিয়ে দিয়েছে মানুষের জীবনে বৃহত্তর অঙ্গনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, কোন কোন মতাদর্শ ও নীতিমালা ক্ষতিকর বা কল্যাণকর। কোন আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং এসব ক্ষেত্রে কোন কোন নীতি ও আদর্শকে বর্জনীয়–আল-কুরআনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে এ বিষয়সমূহই একজন বিচক্ষণ সাহসী লোকের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়। আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে এ মূল তত্ত্বকেই তুলে ধরেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ الخ : কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করার বা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা কৌশলগতভাবে তাদেরকে সামান্য কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। এরপরই তাদের শাস্তি হবে, যা রয়েছে অবধারিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ কাফেরদেরকে পাকড়াও করা হবে। এ সতর্কবাণীরই বাস্তবায়ন হয়েছে দ্বিতীয় হিজরির মাহে রমজানে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْأَعْلَى : সূরা আল-আ'লা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত الْأَعْلَى শব্দটি সূরার নামকরণে নির্বাচন করা হয়েছে। আল-আ'লা অর্থ– সুমহান, সুউচ্চ। অর্থাৎ এ গুণটি দ্বারা আল্লাহর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। এ সূরাটির অপর নাম হলো 'সূরাতুস-সাব্বাহা'। এতে ১৯টি আয়াত, ৭২টি বাক্য এবং ২৮৪ টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : এতে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এর ৬ নং আয়াতে রাসূল ﷺ-কে বলা হয়েছে। আমি তোমাকে পড়িয়ে দিবো; অতঃপর তুমি আর ভুলে যাবে না। এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি একেবারে প্রাথমিক কালের ও সে সময়ে অবতীর্ণ যখন নবী করীম ﷺ ওহী গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। ওহী নাজিল হওয়ার সময়ে তাঁর মনে আশঙ্কা জাগত যে, তিনি এর শব্দ ও ভাষা ভুলে যেতে পারেন। এ আয়াতের সাথে সূরা ত্বাহার ১১৪ নং আয়াত এবং সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ১৬-১৯ নং আয়াত মিলালে দেখা যায় এদের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। সর্বপ্রথম এ সূরার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-কে এই বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, স্মরণ রাখতে পারার ব্যাপার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। অতঃপর দীর্ঘদিন পর যখন সূরা ক্বিয়ামাহ নাজিল হয়। তখন নবী করীম ﷺ অস্থিরভাবে ওহীর শব্দ সমূহ বারবার পড়ে আয়ত্ত ও মুখস্থ করতে লাগলেন, তখন তাকে বলা হলো 'হে নবী'! এ ওহীকে তাড়াহুড়ি মুখস্থ করার জন্য নিজের মুখ দ্রুত চালু করবেন না। এটা মুখস্থ করে দেওয়া ও পড়ে দেওয়া তো আমার কাজ-আমার দায়িত্ব। কাজেই যখন এটা পাঠ করা হয় তখন আপনি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন। তা ছাড়া এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়াও আমারই দায়িত্ব।

শেষবারে সূরা ত্বাহা নাজিল হওয়ার সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী করীম ﷺ-এর আশঙ্কা জাগল যে, এ ১১৩টি আয়াত-যা একই সঙ্গে ক্রমাগত নাজিল হলো। এটা হতে কোনো একটি অংশও যেন আমার স্মৃতি বহির্ভূত হয়ে না যায়। এ জন্য তিনি তা মুখস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ উপলক্ষে নবী করীম ﷺ-কে বলা হলো : 'কুরআন পড়ায় খুব তাড়াহুড়া করবেন না, যতক্ষণ না এ ওহী আপনার নিকট পুরা মাত্রায় পৌঁছে যায়। অতঃপর আর কোনো সময় ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই এবং আর কোনো কথা বলার কখনও প্রয়োজন হয়নি। কুরআন মাজীদের অন্য কোথাও এ ব্যাপারে আর কোনো উল্লেখ নেই।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– তাওহীদ। এর সাথে নবী করীম ﷺ-কে উপদেশ দান, পাপিষ্ঠ ও বেঈমান লোকদের অশুভ পরিণতি এবং ঈমানদার ও পবিত্র লোকদের পরকালীন সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে ১ – ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নামে তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানিয়ে মূলত তাওহীদের কথা বলেছেন। কেননা, মহান আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্যই তাঁর সম্পর্কে কল্পিত রূপ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং আল্লাহর সত্তা, গুণ, ক্ষমতা ও একত্ববাদ কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় এবং দোষত্রুটি প্রকাশ পায় এমন নাম বর্জন করে তাঁর সুমহান নামসমূহের দ্বারা তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি কৌশলের কথা বলেছেন–সে মহান আল্লাহর গুণগান কর, যিনি সৃষ্টিলোককে সঠিক ও সুচারুভাবে সৃষ্টি করেছেন। এদের জন্য তাকদীর নির্ধারণ করে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আইন ও বিধান দিয়ে পথের দিশা দিয়েছেন। তিনিই জীবকুলের জন্য চারণভূমিতে সবুজের মহাসমারোহ সৃষ্টি করেন আবার একে আবর্জনায় পরিণত করেন। তাঁর নির্দেশেই ঘটে বসন্তের আগমন ও শীতের সমাগম। তিনিই মহান ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬ – ৮ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে ওহী স্মরণ থাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আপনি ওহী হৃদয়ঙ্গম করুণ এবং মন হতে এটা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা ভাববেন না। আপনার স্মৃতিপটে একে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আপনি যে উচ্চৈঃস্বরে ও নিঃশব্দে কুরআন পাঠ করেন এ সম্পর্কে আমি অবগত। আপনার জন্য এটা স্মরণ রাখাকে আমি খুব সহজতর করে দিবো। আপনার কোনোই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে ৯ – ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনি মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের কথা প্রচার করতে থাকুন এবং তাদেরকে নসিহত করার ধারা অব্যাহত রাখুন। আপনার দাওয়াত ও নসিহত তারাই গ্রহণ করবে যারা অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু যারা হতভাগ্য ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা আপনার দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করবে না এবং ঈমানও আনবে না। তারা মহাঅগ্নিকুণ্ড জাহান্নামেই প্রবেশ করবে। তাতে তারা জ্যান্ত মরা অবস্থায় অবস্থান করবে।

চতুর্থ পর্যায়ে ১৪– ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করে আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্র-আমলে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং জিকির ও নামাজ আদায় করবে পরকালে তারাই হবে সফলকাম। তারাই সফল জীবন লাভ করে মহাসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করবে; কিন্তু অনেক লোকই পরকালীন সে মহাসুখ-শান্তি ও স্থায়ী আনন্দের কথা চিন্তা-ভাবনা করে না। পার্থিব জগতের ক্ষণকালীন আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় নিমগ্ন থেকে একেই তারা পরকালের উপর প্রাধান্য দেয় অথচ পরকালের আনন্দ ও সুখ-শান্তিই সর্বোত্তম, অনন্ত ও চিরন্তন।

সব শেষে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কথা নতুন কিছু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব হতে মানুষের কাছে এটা পৌঁছিয়ে আসছে; এমনকি হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত গ্রন্থাবলিতেও এসব আলোচনা বিদ্যমান। আমি নতুন কিছুই বলিনি। অতএব তোমরা পার্থিব জীবনের ধাঁধায় পতিত হয়ে অনন্ত সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করো না।

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-আ'লা মক্কায় অবতীর্ণ
تِسْعَ عَشْرَةَ اٰيَةً : ১৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اَىْ نَزِّهْ رَبَّكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ وَلَفْظُ اِسْمِ زَائِدٌ الْاَعْلَى صِفَةٌ لِرَبِّكَ.

১. তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের মহিমা ঘোষণা কর অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের জন্য যা শোভনীয় নয়, তা হতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর। আর اِسْم শব্দটি এখানে অতিরিক্ত যিনি সুমহান এটা رَبِّكَ-এর صِفَتٌ।

٢. الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى مَخْلُوْقَهٗ جَعَلَهٗ مُتَنَاسِبَ الْاَجْزَاءِ غَيْرَ مُتَفَاوِتٍ.

২. যিনি সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যাস্ত করেন তাঁর সৃষ্টিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেন, অসামঞ্জস্য রাখেন না।

٣. وَالَّذِىْ قَدَّرَ مَا شَاءَ فَهَدٰى اِلٰى مَا قَدَّرَهٗ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ.

৩ আর পরিমিত বিকাশ সাধন করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং পথ নির্দেশ করেন তৎকর্তৃক নির্ধারিত ভালো ও মন্দের প্রতি।

٤. وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى اَنْبَتَ الْعُشْبَ.

৪. আর যিনি তৃণলতা উৎপন্ন করেন ঘাস উৎপন্ন করেন।

٥. فَجَعَلَهٗ بَعْدَ الْخُضْرَةِ غُثَاءً جَافًّا هَشِيْمًا اَحْوٰى اِسْوَدَّ يَابِسًا.

৫. অতঃপর একে পরিণত করেন সবুজ-শ্যামল হওয়ার পর শুষ্ক খড়কুটা শুকনো ঘাস কৃষ্ণবর্ণ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে এমন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِىْ خَلَقَ-এর মহল্লে ই'রাব : اَلَّذِىْ خَلَقَ আয়াতাংশ মাজরূর অবস্থায় আছে। কেননা এটা পিছনের رَبِّ-এর সিফাত হয়েছে। আবার কারো মতে নতুন বাক্য হিসাবে মারফূ' অবস্থায় আছে। তখন এ বাক্যটি একটি প্রশ্নের জবাব হবে। প্রশ্নটি হলো যে রবের তাসবীহ বর্ণনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে রব কে? তখন জবাব দেওয়া হলো যে, اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

غُثَاءً-এর মহল্লে ই'রাব : غُثَاءً শব্দটির দু'টি অবস্থা হতে পারে। একটি হলো-তা جَعَلَ ক্রিয়ার দ্বিতীয় মাফউল। অপরটি হলো এটা حَالٌ হয়েছে। উভয় অবস্থাতেই غثاء শব্দটি মানসূব অবস্থায় রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে প্রতিদান ও প্রতিফলের বর্ণনা ছিল। বর্তমান সূরায় (সূরাতুল আ'লা-আ'লা অর্থ সর্বোচ্চ) সর্বোচ্চ সফলতাকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সাথে সাথে সফলতা অর্জনের জন্য কিছু কাজের কথাও

বলা হয়েছে। যেমন তাসবীহ, আল্লাহর পরিচয়, তাঁর সত্তা ও গুণাবলি, তাযকিয়া, যিক্‌র ও নামাজ। এ ছাড়া পরকালের উদ্দেশ্যের সাথে সাথে দুনিয়া যে ধ্বংস হয়ে যাবে তার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى : বক্ষ্যমাণ আয়াতটির শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে- 'তোমরা মহান স্রষ্টা আল্লাহর নামে পবিত্রতা বর্ণনা কর।' এটা হতে কয়েকটি কথা বুঝা যায় এবং সেসব কয়টিই এখানে প্রযোজ্য।

এক. আল্লাহ তা'আলাকে এমন সব নামে স্মরণ করো যা তাঁর জন্য উপযুক্ত ও শোভনীয়। মহান স্রষ্টার জন্য এমন নাম গ্রহণ করা মোটেই উচিত নয়, যা অর্থ ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। কিংবা যেসব নামে বেয়াদবি, ত্রুটি বা শিরকের কোনো ভাব রয়েছে। কাজেই আল্লাহর জন্য কেবল সেসব নাম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় যা তিনি স্বয়ং কুরআন মাজীদে ব্যবহার করেছেন, অথবা অন্য ভাষায় যা এর সঠিক অনুবাদ হবে।

দুই. আল্লাহর জন্য সৃষ্টিকুলের নাম অথবা সৃষ্টিকুলের জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করা যেতে পারে না। সেসব গুণবাচক নাম একমাত্র আল্লাহর জন্য নয় মানুষের জন্যও ব্যবহার বৈধ হয়। যেমন- রাউফ, কারীম, রাহীম, সামী', বাসীর প্রভৃতি, এ ক্ষেত্রে এসব নাম মানুষের জন্য সে দৃষ্টিতে ব্যবহার করা যাবে না, যে দৃষ্টিতে তা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তিন. আল্লাহর নাম মর্যাদা ও সম্মানের সাথে উচ্চারণ করা উচিত। এমন স্থানে এটা উচ্চারণ করা উচিত নয় যেখানে তা অসম্মানিত হবে। যেমন মলমূত্র ত্যাগ কালে, গুনাহের কাজে, হাসি-ঠাট্টা বশত ইত্যাদি অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট কেউ কিছু চাইলে এবং তিনি তা দিতে না পারলে সর্ব সাধারণের ন্যায় "আল্লাহ দিবেন" এই বলে ফকিরকে বিদায় করতেন না। বরং অপারগতা প্রকাশ করে তাকে বিদায় করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, ফকিরকে খালি হাতে বিদায় করলে অবশ্যই সে বিরক্ত হয়। আর এমতাবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অনুচিত।

হযরত উবাই ইবনে আমের জুহানী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ আলোচ্য আয়াত سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এর ভিত্তিতে নামাজের সেজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়ার হুকুম দিয়েছেন এবং সূরা ওয়াকে'আহ-এর শেষ আয়াত فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ-এর ভিত্তিতে নামাজের রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

اِسْمِ শব্দটি অতিরিক্ত বলার কারণ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতে اِسْمِ শব্দকে কোনো কোনো মুফাসসির অতিরিক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা এখানে রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। নাম তো কয়েকটি হরফ (অক্ষর) দ্বারা তৈরি হরফ দিয়ে তৈরি একটি শব্দের পবিত্রতা বর্ণনা করার মধ্যে কোনো উপকারিতা নিহিত নেই। যদি শুধু হরফ দিয়ে তৈরি ইসমের পবিত্রতা উদ্দেশ্য হতো তাহলে رَبِّ শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো না, তখন سَبِّحِ اسْمَهُ বললেই চলত। -[কাবীর]

আয়াতে اِسْمِ শব্দটি উল্লেখ করার কারণ :

১. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে اِسْمِ শব্দটি এখানে تَعْظِيْمِ -এর উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। মূলে শব্দটি অতিরিক্ত।

২. হযরত ইবনে জারীর (র.) বলেন, শব্দটি অতিরিক্ত নয়; বরং উক্ত শব্দটি এখানে উদ্দেশ্য। তাঁর মতে অর্থ হলো- نَزِّهِ اسْمَ رَبِّكَ اَنْ يُسَمّٰى بِهٖ اَحَدٌ سِوَاهُ আল্লাহর নামে কেউ যেন নাম না রাখে সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন কাফেরগণ মূর্তিকে اَللَّاتَ বলত। মুসায়লামাকে رَحْمَانُ الْيَمَامَةِ বলা হতো।

৩. অথবা, এ কথার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য اِسْمِ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নামের এমন ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকা ফরজ, যে ব্যাখ্যার কোনো প্রমাণ মিলে না। যেমন- يَدُ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যায় এ কথা বলা যে, আল্লাহর হাত-ই নেই।

৪. অথবা, আল্লাহর اِسْمِ-এর সম্মান সর্বাবস্থায় করতে হবে তা বুঝানোর জন্য اِسْمِ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি নামাজেও ঐ নাম ব্যবহার করতে হবে। যেমন- اَللّٰهُ اَكْبَرُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় سَبِّحْ অর্থ صَلِّ হবে।

৫. হযরত আবূ মুসলিম (র.) বলেন, اِسْمِ শব্দ দ্বারা এখানে صِفَةٌ উদ্দেশ্য। তখন অর্থ হবে-তোমার রবের সকল গুণবাচক বিশেষ্যের দ্বারা তাসবীহ কর, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا -[কাবীর]

اَلْاَعْلٰى-এর অর্থ : اَعْلٰى অর্থ– আল্লাহ তা'আলা সুউচ্চ, মহান, বাবে نَصَرَ-এর ইসমে তাফযীলের শব্দ। মূলবর্ণ (ع . ل . و) আল্লাহ মহান বা সু-উচ্চ। এর অর্থ হলো– বর্ণনাকারীদের সকল বর্ণনার উর্ধ্বে তিনি। আমাদের ধারণার অনেক উর্ধ্বে হলো তাঁর গৌরব-মর্যাদা, আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার উর্ধ্বে হলো তাঁর নিয়ামতের অবদান। আমাদের ইবাদত ও কার্যাবলির অনেক উর্ধ্বে হলো তাঁর পাওনা।

অথবা, তিনি সকল প্রকার ক্রটি হতে اَعْلٰى বা উর্ধ্বে। –[কাবীর]

ভারসাম্য রক্ষা করার তাৎপর্য : উল্লিখিত ২নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মূলত স্বীয় মহান ক্ষমতা ও কৌশলের নিপুণতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বলা হয়েছে– সে মহান প্রভুর গুণগান কর, যিনি বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভারসাম্য রক্ষা করে সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। এখানে سَوّٰى-এর অর্থ হলো সঠিক ও নির্ভুলভাবে করা। অর্থাৎ সৃষ্টিলোকের কোথাও কোনো ভারসাম্যহীনতা অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্যতা রাখা হয়নি। যে বস্তুটির আকৃতি-প্রকৃতি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যেরূপ হওয়া উচিত তিনি তা সেরূপ করেছেন। মহাশূন্যে সৃষ্টবস্তু যেটা যেভাবে, যে নিয়মে ও যে আকৃতিতে হওয়া উচিত ছিল, ঠিক তদ্রূপই তা সৃষ্টি করেছেন। জীব-জগত ও উদ্ভিদ জগতের প্রতিটি বস্তুর যে আকৃতি-প্রকৃতি তথা কোমলতা বা কাঠিন্য ইত্যাদি সবকিছু প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করা হয়েছে। যে মাছিটির যেরূপ হওয়া উচিত, যে অহিংস্র প্রাণীটির যে আকৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়, যে হিংস্র প্রাণীটির যেরূপ হওয়া প্রয়োজন, তাকে সেরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনিভাবে মানুষকেও এর প্রয়োজন, উপযোগিতা ও যথার্থতার দিকে লক্ষ্য রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার চক্ষু, নাসিকা ও মুখ কাছাকাছি ও সম্মুখে থাকা উচিত ছিল বলে তা করা হয়েছে। হস্তযুগল যেভাবে লম্বা ও প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল তাই করা হয়েছে। তাকে একটি হস্ত দুইটি পা দেওয়া হয়নি। তার নাসিকাটিকে মাথার পশ্চাতে স্থাপন করা হয়নি। কর্ণরূপী শ্রবণ যন্ত্রটিকে পশ্চাত দিকে লাগানো হয়নি। নারীর বক্ষ যুগলকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করা হয়নি। মোটকথা সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকটি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তা'আলা সুচারু ও সুন্দর পন্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। এটাই হচ্ছে اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ক্ষুদ্র আয়াতাংশের তাৎপর্য।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى قَدَّرَ فَهَدٰى : আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিসকে কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; বরং যে জিনিসই যে উদ্দেশ্যে এবং যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে কাজ সম্পাদন এবং সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সঠিক পন্থা ও পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র স্রষ্টাই নন, তিনি সে সঙ্গে বিধানদাতা ও পথপ্রদর্শকও বটে। যে জিনিস যে হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন, তার উপযোগী কর্মপদ্ধতি বলে দেওয়া এবং তার জন্য শোভনীয় পন্থায় তাকে পথ প্রদর্শন করার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। এ কারণে পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য এক ধরনের বিধান ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা অনুসরণকারীর এগুলো নিত্যচলমান ও নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা নিয়োজিত। পানি, বাতাস, আলো, প্রস্তর ও খনিসমূহের জন্য ভিন্ন এক ধরনের বিধান ও হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, তদনুযায়ী এগুলো ঠিক সে সে কাজ সম্পাদন করেছে যে উদ্দেশ্যে এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। উদ্ভিদ জগতের জন্য এক স্বতন্ত্র ধরনের বিধান দেওয়া হয়েছে। সে বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তা মাটির নিচে শিকড় গাড়ছে, এর বুকের উপর অঙ্কুরিত হচ্ছে, কাণ্ড বের করছে ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব, ফল ও ফুল উৎপাদন করছে এবং এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যই যে কাজ পূর্ব হতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাই সুসম্পন্ন করছে। স্থলভাগ, জলভাগ ও বায়ু স্তরের জীব-জন্তুর অসংখ্য প্রকার এবং এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ধরনের দিক-নির্দেশনা দান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তুকে এমন এক অনুভূতি কেন্দ্রিক স্বভাব জাত জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা মানুষ নিজের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা তো দূরের কথা, আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির দ্বারাও লাভ করতে পারে না– এ কথা আল্লাহকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিও মেনে নিতে বাধ্য।

মানুষের ব্যাপারটি আরও বিস্ময়কর তাকে দু ধরনের স্বতন্ত্র ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের হেদায়েত দান করা হয়েছে। এটা মানুষের দু'টি স্বতন্ত্র ধরনের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানুষের একটি দিক পাশবিক এবং তার এ পাশবিক জীবনের জন্য তাকে এক ধরনের বিধান দেওয়া হয়েছে। এরাই বলে প্রতিটি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই মায়ের স্তন চুষে দুধ সেবন করতে শুরু করে। মানুষের চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, হৃদপিণ্ড, মন-মগজ, ফুসফুস, গুর্দা, কলিজা, পাকস্থলি, অন্ত্র, স্নায়ু, রগ ও ধমনী সবকিছুই নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী নিজের কাজ করতে থাকে। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজে মানুষের চেতনা-অনুভূতি বা ইচ্ছার কোনো প্রভাবই

নেই। মানুষের দেহে মনে বাল্যকাল, পূর্ণবয়স্কতা, যৌবন, মধ্যবয়স ও বার্ধক্যকালীন সব পরিবর্তন এ স্বাভাবিক পন্থা অনুযায়ীই সাধিত হয়ে থাকে। এটা ইচ্ছা, চেতনা বা অনুভূতির উপর বিন্দুমাত্র নির্ভরশীল নয়। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনামূলক জীবনের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের এক দিকনির্দেশ।

আরো এক জীবন-বিধান দেওয়া হয়েছে। এটা অচেতন জীবনের জন্য প্রদত্ত স্বভাবজাত বিধান হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রকৃতির বিধান। কেননা, মানুষের জীবনের এ বিভাগে মানুষকে এক প্রকারের স্বাধীনতা ইচ্ছা প্রয়োগের স্বাধীন অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ বিভাগের জীবনের জন্য অবচেতন ও স্বাধীনতাহীন জীবন বিভাগের জন্য প্রদত্ত হেদায়েত কিছুতেই শোভন, যথেষ্ট ও উপযোগী হতে পারে না। মানুষ এ দ্বিতীয় প্রকারের হেদায়েতকে অস্বীকার ও অমান্য করার জন্য যত টাল বাহানা ও যুক্তি প্রদর্শন করুক না কেন, এর যৌক্তিকতা, অপরিহার্যতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত যে মহান স্রষ্টা বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের গঠন প্রকৃতি স্বরূপ ও জন্মগত মর্যাদা অনুপাতে পথ প্রদর্শনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা করেছেন, সে আল্লাহ মানুষকে নিজ ইচ্ছামতো ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগসুবিধা তো দিয়েছেন, কিন্তু তার এ অধিকার ব্যবহারের সঠিক পন্থা কোনটি, ভুল কোনটি তা বলে দেওয়ার কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, তা মেনে নেওয়া কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্মত হতে পারে না। যারা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতকে মেনে চলবে তারাই হবে সফলকাম।

اَلْمَرْعٰى-এর অর্থ : اَلْمَرْعٰى শব্দটি رَعْيٌ হতে ইসমে যরফের শব্দ হতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে চারণ ক্ষেত্র, চতুষ্পদ জন্তুর চারণ ভূমি।

অথবা, مِيْم অক্ষরটি مَصْدَرْ-এর জন্য হয়ে শব্দটি مَصْدَرْ-এর অর্থবোধকও হতে পারে। অর্থাৎ বিচরণ করা। কিন্তু পূর্বাপর কথা হতে মনে হয়, এখানে কেবল পশুচারণই এর অর্থ নয়; বরং মাটির উপর যত উদ্ভিদই উদ্গত হয় তা সবই এখানে বুঝাচ্ছে। কাজেই বলা হয়েছে– وَالْمَرْعٰى مَا تُخْرِجُهُ الْاَرْضُ مِنَ النَّبَاتِ وَمِنَ الثِّمَارِ وَالزُّرُوْعِ وَالْحَشِيْشِ অর্থাৎ উদ্ভিত ফল-ফলাদি, শস্যদানা ও ঘাস-পাতা ইত্যাদি যা জমিন উৎপাদন করে, তাকে مَرْعٰى বলে।

غُثَاءً-এর অর্থ : আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) غُثَاءً-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, جَافًّا هَشِيْمًا অর্থাৎ শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ ঘাস। কারো কারো মতে غُثَاءً হলো সে সকল শুষ্ক উদ্ভিদ যা নদীর পাশে আবর্জনার মতো পড়ে থাকে, পানির উপর ভাসে এবং বাতাসে উড়ে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের বস্তুর সমষ্টিকে غُثَاءً বলা হয়। যারা বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে এসে একসাথ হয়ে থাকে, তাকে غُثَاء বা اَخْلَاطٌ বলে।

কেউ কেউ غُثَّاءً শব্দটিকে তাশদীদ যোগে পড়েছেন। এমতাবস্থায় এটা একবচন হবে এবং এর বহুবচন হলো اَغْثَاءً।

اَحْوٰى-এর অর্থ : মুহাক্কিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, اَحْوٰى শব্দটি حُوَّةٌ হতে নির্গত হয়েছে। আর حُوَّةٌ বলে কালো বর্ণকে। কেউ কেউ বলেছেন, যার মধ্যে কালো রঙের আধিক্য রয়েছে তাকে حُوَّةٌ বলে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাদামী রঙকে বলে। এখানে এতদুভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। কেননা উদ্ভিদ শুকিয়ে গেলে কালো ও বাদামী দুই রঙই ধারণ করে থাকে। কেউ কেউ غُثَاء-এর অর্থ গাড় সবুজ রং বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথমোক্ত অর্থই অধিক গ্রহণযোগ্য।

৬. سَنُقْرِئُكَ الْقُرْاٰنَ فَلَا تَنْسٰى مَا تَقْرَؤُهُ ـ

৭. اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ط اَنْ تَنْسَاهُ بِنَسْخِ تِلَاوَتِهٖ وَحُكْمِهٖ وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ مَعَ قِرَاءَةِ جِبْرِيْلَ خَوْفَ النِّسْيَانِ فَكَاَنَّهٗ قِيْلَ لَهٗ لَا تَعْجَلْ بِهَا اَنَّكَ لَا تَنْسٰى فَلَا تُتْعِبْ نَفْسَكَ بِالْجَهْرِ بِهَا اِنَّهٗ تَعَالٰى يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَا يَخْفٰى مِنْهُمَا ـ

৮. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى لِلشَّرِيْعَةِ السَّهْلَةِ وَهِيَ الْاِسْلَامُ ـ

৯. فَذَكِّرْ عِظْ بِالْقُرْاٰنِ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى مَنْ تُذَكِّرُهُ الْمَذْكُوْرَ فِيْ ـ

১০. سَيَذَّكَّرُ بِهَا مَنْ يَّخْشٰى يَخَافُ اللّٰهَ تَعَالٰى كَاٰيَةِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ـ

১১. وَيَتَجَنَّبُهَا اَيِ الذِّكْرٰى يَتْرُكُهَا جَانِبًا لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا الْاَشْقٰى بِمَعْنَى الشَّقِيْ اَيِ الْكَافِرُ ـ

১২. الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى هِيَ نَارُ الْاٰخِرَةِ وَالصُّغْرٰى نَارُ الدُّنْيَا ـ

১৩. ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا فَيَسْتَرِيْحَ وَلَا يَحْيٰى حَيَاةً هَنِيْئَةً ـ

অনুবাদ :

৬. নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাবো কুরআন ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না পঠিত বস্তুকে।

৭. আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত যার তেলাওয়াত ও হুকুম নাস্খ করার মাধ্যমে আল্লাহ ভুলাতে চাইবেন, তুমি তাই কেবল ভুলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পাঠ করার সাথে সাথে জোরে জোরে পাঠ করতেন। সুতরাং তাঁকে অভয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা আত্মস্থ করার জন্য এতখানি বিচলিত হইও না। নিশ্চয় তুমি এটা ভুলে যাবে না। কাজেই জোরে জোরে পাঠ করে কষ্ট স্বীকার করো না। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তা'আলা জানেন যা প্রকাশ্য কথাবার্তা ও কাজকর্ম এবং যা অপ্রকাশ্য এতদুভয়ে মধ্য হতে।

৮. আর আমি তোমার জন্য সুগম করে দিবো পথ সহজ জীবনাদর্শ, ইসলাম।

৯. উপদেশ দান কর কুরআনের মাধ্যমে নসিহত কর যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় তার যাকে তুমি উপদেশ দান করবে। এর বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে উক্ত হয়েছে।

১০. সে-ই উপদেশ গ্রহণ করবে এ দ্বারা যে শঙ্কা পোষণ করে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। অন্য আয়াত فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ উল্লিখিত হয়েছে।

১১. আর একে অবজ্ঞা করবে অর্থাৎ উপদেশকে– একে একদিকে ফেলে রাখবে তার প্রতি তাকাবে না। যে নিতান্ত হতভাগ্য اَشْقٰى শব্দটি شَقِيْ অর্থে, অর্থাৎ কাফেরগণ।

১২. যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে তা হলো আখেরাতের আগুন, আর দুনিয়ার আগুন হলো সাধারণ আগুন।

১৩. অতঃপর তথায় সে মৃত্যুবরণ করবে না যে, তা দ্বারা নিষ্কৃতি পাবে। এবং জীবিতও থাকবে না শান্তিপূর্ণ জীবিত থাকা।

তাহকীক ও তারকীব

فَلَا تَنْسٰى-এর বিশ্লেষণ : لَا تَنْسٰى শব্দটি একবচন, মসদার اَلنِّسْيَانُ বাবে سَمِعَ কারো মতে لَا টি নফীর জন্য। কারো মতে لَا নাহীর জন্য। নাহী হলে لَا تَنْسَ হওয়া দরকার ছিল। শেষে আলিফে মাকসূরা বাক্যের শেষে মিলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কুরআনে কারীমের অন্যত্র فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا তে ব্যবহৃত হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াত নাজিলের কারণ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,- মহানবী ﷺ -এর অবস্থা এই ছিল যে, যখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আসতেন এবং তা তাঁকে পাঠ করে শুনাতেন। পাঠক্রম শেষ হওয়ার পূর্বেই ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এটা আবৃত্তি করা শুরু করে দিতেন। একে উপলক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত .... سَنُقْرِئُكَ আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[লোবাব, খাযেন, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى : হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (র.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ কুরআনের শব্দসমূহ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় তা বারবার আবৃত্তি করতেন। হযরত মুজাহিদ ও ইমাম কালবী (র.) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী শুনিয়ে শেষ করতে পারতেন না, এর মধ্যেই নবী করীম ﷺ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় এর প্রথমাংশ আবৃত্তি শুরু করতেন। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে নিশ্চয়তা দিলেন এবং বললেন ওহী নাজিল হওয়ার সময় আপনি চুপচাপ শুনে থাকুন। আমি আপনাকে তা পড়ে দেবো এবং চিরকালের জন্য এটা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে এর কোনো একটি শব্দও আপনার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকা চাই। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে ওহী গ্রহণ করার যে নিয়ম ও পদ্ধতি বুঝিয়ে দেন- সে সম্পর্কে তৃতীয়বারের কথা এখানে বলা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দু'বারের কথা সূরা ত্বাহা-এর ১৪ নং আয়াত এবং সূরা কিয়ামাহ-এর ১৪-১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি হতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদ নবী করীম ﷺ -এর উপর যেমন একটি মু'জিযারূপে নাজিল হয়েছিল, ঠিক অনুরূপ মু'জিযা স্বরূপই এর প্রতিটি শব্দ রাসূলে কারীম ﷺ-এর স্মৃতিপটে সুদৃঢ় ও স্থায়ীভাবে মুদ্রিত ও স্থায়ী করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এর কোনো একটি শব্দও তিনিও ভুলে যাবেন না। অথবা এর কোনো একটি শব্দের স্থলে এর সমার্থবোধক অপর কোনো শব্দ তার মুখে বসিয়ে যাবে এরও একবিন্দু আশঙ্কা রইল না।

اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। একদল তাফসীরকারের মতে এর অর্থ হলো, যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ভুলিয়ে দিতে চাইবেন, যার তেলাওয়াত মানসূখ করা হয়েছে এটা আপনার স্মৃতি হতে চিরতরে মুছে ফেলবেন। আর একদল মুফাসসিরীনের মতে এর অর্থ হলো- আপনি যদি কুরআনের কোনো কিছু ভুলে যান, তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে পুনরায় আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেমন- হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস হতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেউ কেউ এরূপ অভিমতও রেখেছেন যে, উক্ত আয়াতাংশের মর্ম হলো কুরআনে কারীমের প্রতিটি শব্দসহ পূর্ণরূপে স্মরণশক্তিতে সুরক্ষিত থাকা তাঁর নিজের শক্তির কৃতিত্ব নয়। আসলে এটা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর তৌফিকেরই অবদান নতুবা আল্লাহর ইচ্ছা হলে সব কিছু তিনি ভুলিয়ে দিতে পারেন। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে ওহী দ্বারা যা কিছু দিয়েছি তা সবই নিয়ে যেতে পারি।' কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হলো- আপনি মানুষ, ফেরেশতা নন এ কথা বুঝাবার জন্য সাময়িকভাবে আল্লাহর ইচ্ছে হলে দু' একটি আয়াত ভুলিয়ে দিতে পারেন। এটা স্বতন্ত্র করে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে এ কথার যে, আপনি স্থায়ীভাবে কুরআন কখনো ভুলবেন না।
-[খাযেন]

اَلْجَهْرَ-এর অর্থ : اَلْجَهْرَ শব্দের অর্থ مَا ظَهَرَ অর্থাৎ যা প্রকাশিত। আয়াতে اَلْجَهْرَ শব্দের অর্থ নিরূপণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন– কারো মতে هُوَ إِعْلَانُ الصَّدَقَةِ অর্থাৎ সদকা বা দানের ঘোষণা, কারো মতে রাসূল যা কুরআন হতে মুখস্থ করেছেন, কারো মতে হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর নাজিলকৃত ওহীকে তাঁর সাথে উচ্চারণ করে পড়া-ই হলো جَهْر যেন হযরত জিবরাঈল (আ.) চলে গেলে তিনি তা ভুলে না যান। কারো মতে جَهْر বলতে সকল প্রকার প্রকাশ্য কথা, কাজ বা বস্তুকে বুঝায়। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

وَمَا يَخْفٰى-এর মর্মার্থ : مَا يَخْفٰى বলতে সকল গোপন কিছুকে বুঝায়। তা কথার মধ্য থেকে অথবা কাজের মধ্য হতে অথবা বস্তুর মধ্য হতেও হতে পারে। অথবা যা কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষ হতে نَسْخ বা রহিত করে দেওয়া হয়েছে অথবা إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ অর্থাৎ সদকা বা দানের গোপনীয়তা বা গোপন দান। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى : অত্র আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন; হে নবী! আমি দীনের তাবলীগের ব্যাপারে আপনাকে কোনোরূপ অসুবিধায় ফেলিনি। বধিরকে শোনানো ও অন্ধকে পথ দেখানোর দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। আপনাকে এ জন্য একটি সহজতর পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, তা হচ্ছে– আপনি নসিহত করতে থাকুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অনুভব করতে থাকবেন যে, কেউ না কেউ তা হতে উপকৃত হচ্ছে, কল্যাণ লাভ করছে। বস্তুত পক্ষে কে এটা হতে উপকৃত হতে প্রস্তুত, আর কে নয়। তা তো সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে জানতে ও বুঝতে পারা যাবে। কাজেই প্রচারের কাজ অবশ্যই অব্যাহত থাকতে হবে। এতে আপনার লক্ষ্য থাকবে শুধু এতটুকু যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে যারা এ উপদেশ শুনে সত্য ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করবে; আপনি সে লোকদের সন্ধান করবেন। এ লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে আপনার কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি লাভের উপযুক্ত এবং অধিকারী। এ লোকের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতিই আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোকদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনি জানতে ও বুঝতে পারবেন যে, তারা নসিহত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, তাদের জন্য আপনার ব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ কথাটাই সূরা আবাসায় ভিন্ন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ না করার আচরণ করে, তার দিকে তো তুমি খুব লক্ষ্য দিচ্ছ, অথচ তারা যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে সে জন্য তোমার দায়িত্ব কি? পক্ষান্তরে যে লোক নিজ হতে তোমার দিকে দৌড়ে আসে এবং সে ভয়ও করে, তার প্রতি আপনি অমনোযোগিতা দেখান। কখন-ই নয়। এটা তো এক নসিহত মাত্র যার মন চাইবে সে তা কবুল করবে।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : মুফাস্‌সিরগণ এর নিম্নোক্ত কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। (ক) আমি আপনাকে সহজ শরিয়তের সুযোগ দান করবো। (খ) আমি আপনাকে ইসলামের সুবিধা দান করবো। (গ) আমি আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিবো। (ঘ) কুরআন সংরক্ষণকে আমি আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি।

نُيَسِّرُكَ ক্রিয়াকে উত্তম পুরুষ নেওয়ার রহস্য : نُيَسِّرُكَ ক্রিয়াকে উত্তম পুরুষ হিসেবে ব্যবহার করার কারণ বা রহস্য অত্যন্ত স্পষ্ট। উক্ত ক্রিয়ার ফায়েল হলেন আল্লাহ তা'আলা। ঐ ক্রিয়া দ্বারা তাঁর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি দানের ঘোষণা রয়েছে, তা হলো 'সকল কিছু সহজতর করে দেওয়া।' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, 'দাতা যেমন মহান, দানটিও হবে তেমন বড়। এ দান তাঁর পক্ষ হতে আর কারো জন্য হয়নি। শুধু রাসূলের জন্যই হয়েছে। কিভাবে হবে না? তিনি তো ছিলেন অনাথ এক এতিম শিশু, বর্বর সমাজে ছিল তাঁর বসবাস। তারপর আল্লাহ তাঁকে-তাঁর কাজ ও কথায় সারা বিশ্বের নেতা এবং সৃষ্টজীবের পথ প্রদর্শকরূপে সুনির্ধারিত করেছিলেন। সকল কাজে আল্লাহই ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। এ কারণেই বলেছেন نُيَسِّرُكَ অর্থাৎ আমি-ই তোমাকে সহজ করে দিবো। –[কাবীর]

إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى আয়াতে শর্ত লাগানোর কারণ : إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى আয়াত দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে তাঁর দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ করলে বুঝা যায় যে, দায়িত্ব পালন করলে তাঁর লাভ হতেও পারে নাও হতে পারে। অথচ এমন নয় যে, নবী করীম ﷺ-এর উপদেশ তাঁর নিজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। অতএব, আয়াতের মধ্যকার শর্তের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের কয়েকটি মতামত উল্লেখযোগ্য।

২. এখানে তাম্বীহ বা সতর্ক করা উদ্দেশ্য। যেমন– আমাদের সমাজেও প্রচলিত যে, যদি তুমি পুরুষ হয়ে থাক তবে এ কাজটি করবে। এর অর্থ হচ্ছে– তুমি অবশ্যই এ কাজটি করবে, পরিত্যাগ করবে না। আয়াতের মর্মার্থও এরূপ যে, উপদেশ লাভজনক হলে উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ আপনার উপদেশ অবশ্যই লাভজনক হবে, তাই বর্ণনা করতে থাকুন।

খ. 'বর্বর সমাজকে নবী করীম ﷺ অনেক দাওয়াতই দিয়েছেন।' যত-ই তাঁর দাওয়াত বেশি হতো, হঠকারিতাও তত বেশিরূপ আকার ধারণ করত। এতে তাঁর আফসোস বেড়ে যেত। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমবার সর্বত্র দাওয়াত দান আপনার উপর ফরজ ছিল, তা আপনি পালন করেছেন, এখন জোর করে নসিহত শুনানোর প্রয়োজন নেই لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ। বারবার দাওয়াত দিতে যদি চান, ঐ দাওয়াতে যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার লাভ হবে, তাহলে দিতে থাকুন। এ অর্থ বুঝানোর জন্য আয়াতে শর্ত ব্যবহার করা হয়েছে। -[কাবীর]

গ. অথবা, إِنْ অর্থ مَا - إِنْ শর্তের জন্য নয়। তখন মূলবাক্য হবে- فَذَكِّرْ مَا نَفَعَتِ الذِّكْرٰى -

ঘ. কারো মতে إِنْ অর্থ إِذَا তখন অর্থ দাঁড়াবে 'যখন উপদেশে লাভ হবে বুঝবেন তখন উপদেশ দিতে থাকুন।'

ঙ. কারো মতে إِنْ অর্থ قَدْ তখন অর্থ হবে "উপদেশ দিতে থাকুন, উপদেশ অবশ্যই লাভজনক হবে।" -[কুরতুবী]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى-এর শানে নুযূল : উক্ত আয়াতটি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা ইবনে উম্মে মাকতূম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারো মতে হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[কাবীর, কুরতুবী]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى-এর মর্মার্থ : আয়াতটির মর্মার্থ হলো- যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয় ও খারাপ পরিণতির শঙ্কাবোধ হবে, কেবল সে-ই চিন্তা করবে, আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম না তো? যে লোক তাকে হেদায়েত ও গোমরাহীর পার্থক্য বুঝাবে এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভের পথ দেখাবে, তার নসিহত কেবল এ ব্যক্তিই পূর্ণ মনযোগ সহকারে শুনতে প্রস্তুত হবে।

اَلْاَشْقٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : অত্র আয়াতে اَلْاَشْقٰى দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) বলেছেন, اَلْاَشْقٰى-এর দ্বারা এখানে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এটাই জমহুর মুফাসসিরগণের অভিমত।

২. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে اَشْقٰى-এর দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে উতবাহ ইবনে রাবীয়াহকে বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা, এর نُزُوْل খাস হলেও حُكْم আম। অর্থাৎ সকল কাফিরই এর হুকুমভুক্ত।

মহা অগ্নি দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلنَّارَ الْكُبْرٰى দ্বারা অত্র আয়াতে কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের দ্বিমত রয়েছে। ১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন- هِيَ نَارُ الْاٰخِرَةِ وَالصُّغْرٰى نَارُ الدُّنْيَا অর্থাৎ এটা পরকালের অগ্নি আর দুনিয়ার আগুন তার তুলনায় অতি সাধারণ। এটাই জমহুরের মাযহাব। ২. কেউ কেউ বলেছেন, জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের আগুনকে বলে اَلنَّارَ الْكُبْرٰى মহা অগ্নি বা অতি কঠিন অগ্নি।

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى-এর অর্থ : আয়াতটির অর্থ কত গিয়ে মুফাসসিরগণ বলেন, অর্থাৎ সেখানে তার মৃত্যু হবে না। ফলে আজাব হতেও নিষ্কৃতি পাবে না। ঠিক তেমনি বাঁচবার মতো বাঁচবেও না। জীবনের কোনো স্বাদ-ই সে পাবে না। যেসব লোক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নসিহত আদৌ কবুল করবে না, মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত কুফর, শিরক বা নাস্তিকতার উপর অবিচল হয়ে থাকবে, পূর্বোক্ত আজাব কেবল সে লোকদেরই দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক অন্তরে ঈমানদার হবে; কিন্তু নিজেদের খারাপ আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা যখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ সম্পন্ন করে নিবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দান করবেন। অতঃপর তাদের পক্ষে শাফায়াত কবুল করা এবং তাদের দগ্ধীভূত লাশ জান্নাতের খালের কিনারে এনে ফেলা হবে। জান্নাতী লোকদেরকে এর উপর পানি নিক্ষেপ করতে বলা হবে। এ পানির স্পর্শ পেয়ে তারা ঠিক তেমনিভাবে জীবন্ত হয়ে উঠবে, যেমন মরা গাছপালা পানির স্পর্শ পেয়ে নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠে। -[কুরতুবী]

অনুবাদ :

١٤. قَدْ اَفْلَحَ فَازَ مَنْ تَزَكّٰى تَطَهَّرَ بِالْاِيْمَانِ .

১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে কৃতকার্য হবে যে পরিশুদ্ধ হয়েছে ঈমান আনয়নের মাধ্যমে পবিত্র হয়েছে।

١٥. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ مُكَبِّرًا فَصَلّٰى الصَّلَوٰتِ الْخَمْسَ وَ ذٰلِكَ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَكُفَّارُ مَكَّةَ مُعْرِضُوْنَ عَنْهَا .

১৫. আর তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে তাকবীর পাঠ করার মাধ্যমে এবং সালাত আদায় করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এগুলো আখেরাতের বিষয়াবলি। অথচ কাফেরগণ এগুলো হতে বিমুখ থাকে।

١٦. بَلْ تُؤْثِرُوْنَ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَوْقَانِيَّةِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ .

১৬. কিন্তু তোমরা অগ্রাধিকার দান কর শব্দটি يَ ও تَ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর।

١٧. وَالْاٰخِرَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْجَنَّةِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى .

১৭. অথচ আখেরাতই যা বেহেশত সম্বলিত উত্তম ও স্থায়ী।

١٨. اِنَّ هٰذَا اَىْ فَلَاحُ مَنْ تَزَكّٰى وَكَوْنُ الْاٰخِرَةِ خَيْرًا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى الْمُنَزَّلَةِ قَبْلَ الْقُرْاٰنِ .

১৮. নিশ্চয় এ বিষয় অর্থাৎ পরিশুদ্ধ ব্যক্তির সাফল্য ও আখেরাত উত্তম হওয়া পূর্ববর্তী গ্রন্থে উল্লেখিত আছে কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থে।

١٩. صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَهِىَ عَشْرُ صُحُفٍ لِاِبْرَاهِيْمَ وَالتَّوْرَاةُ لِمُوْسٰى .

১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে আর তা হলো ইবরাহীম (আ.) -এর দশটি সহীফা ও মূসা (আ.) -এর তাওরাত গ্রন্থ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : যারা চিন্তা-গবেষণা করে না, আল্লাহর নির্দশন ও প্রমাণাদির মধ্যে যারা নিজেদের জ্ঞান খরচ করে না, তারা وَعِيْد বা ধমকের যোগ্য বলে পিছনে আলোচিত হয়েছে। এখন যারা অংশীবাদিতার পঙ্কিলতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত এবং পবিত্র রাখতে বদ্ধপরিকর তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে। –[কাবীর]

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى-এর মধ্যস্থিত পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করেছে সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। এখানে পবিত্রতা অর্জন দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ হতে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান আনয়নের মাধ্যমে শিরক ও কুফর হতে পবিত্রতা অর্জন করা। এটাই জমহুরের মাযহাব। খ. কেউ কউ বলেছেন, এর দ্বারা পাপকার্য পরিহার করে নেক কাজের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। গ. কারো কারো মতে, এর দ্বারা সদকা প্রদানের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আছে, "خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ" হে নবী! আপনি তাদের সম্পদ হতে সদকা (যাকাত) আদায় করুন যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন। ঘ. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা বিশেষত সদকায়ে ফিতরের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে।

মোটকথা, ঈমান আনয়ন ও সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে কুফর, শিরক ও পাপাচার বর্জন করত যাবতীয় পবিত্রতা অর্জনের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এর ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের অভিমত : ঈমান আনয়নের পর সে আল্লাহর স্মরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং নিয়মিত নামাজ পড়েও সে প্রমাণ করেছে যে, যে আল্লাহকে সে নিজের মা'বূদরূপে গ্রহণ করেছে, তাঁর নাম সে মুখে ও অন্তরে স্মরণ করে কার্যত তাঁর আনুগত্য ও আদেশ পালন করতেও সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আর সব সময় তাকে স্মরণ রাখার জন্য ও স্মরণ থাকার জন্য সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। আলোচ্য আয়াতে পর পর দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা এবং তারপর নামাজ পড়ার কথা।

মুফাস্সিরগণ বিভিন্নভাবে আয়াতটির ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন :

ক. রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– বান্দা পুনরুত্থান দিবস ও আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা স্মরণ করে আল্লাহরই জন্য নামাজ আদায় করে।

খ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), ইকরামাহ, আবুল আলিয়াহ ও ইবনে সিরীন (র.) প্রমুখগণের মতে, এর অর্থ হলো এর দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ঈদের জামাতে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করে অতঃপর আল্লাহর নাম স্মরণ করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়।

গ. কারো মতে, এখানে খাঁটি মু'মিনগণের নামাজের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, খাঁটি মু'মিন আল্লাহ কেন স্মরণ করে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই নামাজ আদায় করে থাকে। পক্ষান্তরে যে মুনাফিক সে শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করে।

ঘ. হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, এর মর্মার্থ হলো, সে নিজের মাল হতে সদকা করে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ে।

ঙ. কারো কারো মতে এর অর্থ হলো, সে ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করে এবং ঈদগাহে জামাতে নামাজ পড়ে।

চ. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) বলেছেন, সে আল্লাহর নামে তাকবীর দিয়ে তথা আল্লাহু আকবার বলে নামাজে শরিক হয়।

ছ. আল্লাহর নাম স্মরণ অর্থ হলো, অন্তরে আল্লাহর নাম স্মরণ করা এবং মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা : এ উভয় পন্থায় আল্লাহর নাম স্মরণ করাকেই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর জিকির বলে। -[কবীর]

উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াকুব কারখী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন-

১. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى দ্বারা তওবা এবং আত্মসংশোধনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ দ্বারা মৌখিক, আন্তরিক, রূহানী, বাতেনী জিকির অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত রয়েছে।

৩. আর فَصَلّٰى দ্বারা দরবারে এলাহীতে দুর্লভ উপস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা নামাজ হলো মু'মিনের মি'রাজ। আর নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার নয়ন-মনের তৃপ্তি হলো নামাজ। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا : ইরশাদ হচ্ছে যে, তোমরা বৈষয়িক সুখ-শান্তি, আনন্দ-ফূর্তি, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-সম্ভোগের চিন্তায়ই মশগুল হয়ে থাকছ এবং এরই জন্য তোমরা তোমাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও তৎপরতা নিযুক্ত রেখেছ। এখানে যা কিছু লাভ হয়। তোমরা মনে কর, এটাই হলো আসল পাওনা এবং এখানে যে জিনিস হতে তোমরা বঞ্চিত থেকে যাও, তোমরা মনে কর তাই হলো আসল ক্ষতি।

দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে : এক. আখেরাতকে মোটেই বিশ্বাস না করা, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা। এরা হলো কাফের। তারা পরকালকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দুনিয়ার শান্তি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

দুই. এর অপর অর্থ হলো আখিরাতকে বিশ্বাস করা, কিন্তু এটাও পারলৌকিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ইহকালীন স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। এরা হলো ফাসিক মু'মিন।

দুনিয়া থেকে পরকাল উত্তম হওয়ার কারণ : পরকাল বা আখেরাত কয়েকটি কারণে উত্তম-

ক. আখেরাতে মানুষের দৈহিক এবং মানসিক প্রশান্তি ও সফলতা মিলবে, দুনিয়াতে তা অনুপস্থিত।

খ. দুনিয়ার আনন্দ ও স্বাদ কষ্টসাধ্য, দুঃখ-ঘেরা; কিন্তু আখেরাতের আনন্দ তার বিপরীত।

গ. দুনিয়া ধ্বংস হবে, আখেরাত ধ্বংস হবে না। -[কাবীর]

إِنَّ هٰذَا-এর মুশারুন ইলাইহ : هٰذَا দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। কারো মতে পূর্ণ সূরাটির প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কেননা সূরাটিতে تَوْحِيْد (একত্ববাদ), نُبُوَّةٌ (নবুয়ত), وَعِيْد [ধমক] ও কাফেরদের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পুরস্কারের وَعْد বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

কারো মতে هٰذَا দ্বারা قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ অনর্থক কাজ ও পঙ্কিলতা থেকে নফসকে মুক্ত রাখার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। -[কাবীর]

الصُّحُفِ-এর দু'টি কেরাত : অধিকাংশ কারীগণ . حَا এর উপর পেশ দিয়ে পড়েছেন; কিন্তু আ'মাশ, হারূন, আবূ আমর . حَ কে সাকিন করে পড়েছেন।

إِبْرَاهِيْمَ-এর দুটি কেরাত : অধিকাংশ ক্বারীগণ . رَا-এর পরে اَلِفْ এবং . هَا-এর পরে . يَا যুক্ত করে পড়েন।

আবূ রাজা উক্ত اَلِفْ এবং . يَا-কে উহ্য করে إِبْرَهِم পড়েছেন। তবে . هَا-কে فَتْح দিয়ে পড়েছেন।

আবূ মূসা এবং ইবনে যুবাইর দু' আলিফ দিয়ে إِبْرَاهَام পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

গ্রন্থরাজির সংখ্যা : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ -কে প্রশ্ন করেছেন যে, আল্লাহ কতটি গ্রন্থ নাজিল করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, একশত চারটি। তন্মধ্যে দশটি হযরত আদম (আ.) -এর নিকট, হযরত শীস (আ.)-এর নিকট পঞ্চাশটি, হযরত ইদরীস (আ.)-এর নিকট ত্রিশটি, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর নিকট দশটি, আর তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কুরআন। -[কাবীর, রুহুল মা'আনী]

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ : সূরা আল-গাশিয়াহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের اَلْغَاشِيَةُ শব্দকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ২৬টি আয়াত, ২৯০টি বাক্য এবং ৩৮১টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রমাণ করে যে, এটাও মক্কার প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এটা নাজিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম ﷺ দীন প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আর মক্কার লোকেরা শুনে শুনে উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করেছিল। এর প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব প্রবল হচ্ছিল।

সূরার বিষয়বস্তু ও মূলকথা : সূরাটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো– তাওহীদ ও পরকাল। সর্বপ্রথম মানুষকে শঙ্কিত করার উদ্দেশ্য সহসা তাদের সম্মুখে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা কি খবর রাখ সে সময়ের যখন সমগ্র জগত আচ্ছন্নকারী এক মহাবিপদ এসে পড়বে? পরে এর বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তখন সমস্ত মানুষ দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্নতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। একটি দল জাহান্নামে যাবে। তাদেরকে নানাবিধ আজাব ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে অপর দল লোক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে নানা রকম নিয়ামত দেওয়া হবে। চিরদিন তারা তথায় থাকবে।

কথার মোড় পাল্টিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কুরআনের তাওহীদ শিক্ষা ও পরকাল সংক্রান্ত সংবাদ শুনে যারা নাক ছিটকায়, বিরক্তি প্রকাশ করে তারা কি তাদের সম্মুখে প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনাবলি লক্ষ্য করে দেখে না? তারা কি একটু ভেবে দেখে না যে, কে মরুভূমির উপযোগী করে উষ্ট্রীকে সৃষ্টি করেছেন? উর্ধ্বলোকে এ আকাশ কিভাবে চতুর্দিক আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টন করে আছে? সম্মুখে ঐ পাহাড় কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? নিম্নের ধরণীতল কি করে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে? এ সব কোনো মহাশক্তিমান, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর ও সুবিজ্ঞ সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা ছাড়া সম্ভবপর হয়েছে কি? এক সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অসীম ক্ষমতা বলে এ সব তৈরি করেছেন। এ ব্যাপারে অপর কেউই তাঁর শরিক নেই। এটা হতে প্রমাণিত হয় তিনি পুনরুত্থানে সক্ষম। অতঃপর কাফেরদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এ লোকেরা এহেন যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্মত কথা যদি না-ই মানে, তো না মানুক। আপনাকে এদের উপর জবরদস্তিকারী, বানিয়ে পাঠানো হয়নি। কাজেই জোর করে তাদের দ্বারা কোনো কথা স্বীকার করানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনার কাজ হলো শুধু উপদেশ দিয়ে যাওয়া। কাজেই আপনি তাই করতে থাকুন। শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আমি তাদের নিকট হতে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গ্রহণ করবো এবং কাফের ও পাপিষ্ঠদেরকে কঠোর শাস্তি দিবো। অতএব, আপনি তাদের ব্যাপারে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজের মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করবেন না; বরং আপনি নিশ্চিত মনে আপনার দায়িত্ব পালন করে যান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. هَلْ قَدْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهَا تَغْشَى الْخَلَائِقَ بِأَهْوَالِهَا

১. তোমার নিকট এসেছে কিয়ামতের সংবাদ এখানে هَلْ অব্যয়টি قَدْ অর্থে ব্যবহৃত। اَلْغَاشِيَة দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য, যেহেতু তা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে তার ভয়াবহতা দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নিবে।

٢. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَبَّرَ بِهَا عَنِ الذَّوَاتِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ خَاشِعَةٌ ذَلِيْلَةٌ.

২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উভয় ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল বলতে এর অধিকারী উদ্দেশ্য। স্বভয়ে অবনত হবে অপদস্থ ও অপমানিত।

٣. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ذَاتَ نَصَبٍ وَتَعَبٍ بِالسَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ.

৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে ভারি হাতকড়া ও পায়ে শিকল বহন করে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে।

٤. تَصْلٰى بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا نَارًا حَامِيَةً.

৪. সে প্রবেশ করবে শব্দটি ت-এর মধ্যে যবর ও পেশ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। উত্তপ্ত আগুনে

٥. تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ شَدِيْدَةِ الْحَرَارَةِ.

৫. তাদেরকে অতিশয় গরম প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে ভীষণ গরম।

٦. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الشَّوْكِ لَا تَرْعَاهُ دَابَّةٌ لِخُبْثِهِ.

৬. তাদের জন্য যারী' নামক কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত কোনো খাদ্য থাকবে না এটা এক প্রকার কণ্টকময় গুল্ম, এর বিষাক্ততার কারণে চতুষ্পদ জন্তুও তা ভক্ষণ করে না

٧. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ.

৭. যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধা হতেও তুষ্ট করবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حَامِيَةٌ : حَامِيَةٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর ইসমে ফায়েলের স্ত্রীবাচক শব্দ। মূলবর্ণ (ح . م . ى) অর্থ- شَدِيْدُ الْحَرِّ তথা প্রখর গরম। আয়াতে জাহান্নামের অগ্নির প্রচণ্ড তাপ এবং মারাত্মক প্রখরতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا يُسْمِنُ الخ-এর শানে নুযূল : যখন কাফেরগণ. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ আয়াতটি শুনতে পেল তখন ঠাট্টা করে বলাবলি করছিল যে, তাদের উষ্ট্রসমূহ উক্ত বৃক্ষকে খেয়ে মোটাতাজা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করে বলে দিলেন যে, এটা এমন এক প্রকার খাদ্য যা দেহবর্ধকও নয় আবার ক্ষুধা নিবারকও নয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর বর্তমান সূরাতে পরকালের জন্য তৈরি না হলে শাস্তির কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার উপর প্রমাণ্য দলিল এবং এর অস্বীকারকারীদের পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ যে দুঃখ পেয়েছেন তার উপর সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ : এখানে কিয়ামতের সংবাদের কথা বলা হয়েছে। এটা এমন কঠিন বিপদ যা সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টিত করে ফেলবে। মনে রাখতে হবে যে, এখানে সামগ্রিকভাবে সমগ্র পরকালের কথাই বলা হয়েছে। বর্তমান জগৎ ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় হতে সমস্ত মানুষের হাশরের ময়দানে পুনরুত্থান লাভ করা ও আল্লাহর আদালত হতে শাস্তি বা পুরস্কার পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত পর্যায় ও স্তরই এর অন্তর্ভুক্ত।

কারো মতে, اَلْغَاشِيَةُ দ্বারা এখানে জাহান্নামীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা জাহান্নামকে ঢেকে ফেলবে।

আবার কতিপয় মুফাস্সির-এর মতে اَلْغَاشِيَةُ দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু এটা জাহান্নামীদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে, সেহেতু একে اَلْغَاشِيَةُ বলা হয়েছে।

কিয়ামতকে غَاشِيَة বলা হয়েছে কেন? : اَلْغَاشِيَةُ এর অর্থ হলো– আচ্ছাদনকারী। কিয়ামতকে কেন আচ্ছাদনকারী (আল-গাশিয়াহ) বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, যেহেতু কিয়ামত তার বিভীষিকা দ্বারা মাখলুককে পরিবেষ্টন করে ফেলবে, সেহেতু একে আল-গাশিয়া বলা হয়েছে।

খ. কারো কারো মতে, এর ভয়াবহতা সকলকেই আঘাত করবে কাউকেই রেহাই দিবে না। এ জন্য একে আল-গাশিয়াহ বলা হয়েছে।

গ. কারো কারো মতে, এটা আকস্মিকভাবে এসে পড়বে বলে একে আল-গাশিয়াহ বলা হয়েছে। [আল্লাহই ভালো জানেন।]

هَلْ أَتَاكَ আয়াতে প্রশ্নবোধকের অর্থ : ইমাম কুতরুব বলেন, هَلْ প্রশ্নবোধক দ্বারা قَدْ বুঝানো হয়েছে। তখন هَلْ أَتَاكَ অর্থ হবে– নিশ্চয় আপনার কাছে কিয়ামতের বার্তা পৌছেছে। যেমন هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ-এর মধ্যকার هَلْ অর্থ قَدْ -

কারো মতে, إِسْتِفْهَامْ টি নফীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তখন অর্থ হবে هٰذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِلْمِكَ وَلَا مِنْ عِلْمِ قَوْمِكَ অর্থাৎ এটা তো আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়ের লোকের জানার মধ্য হতে নয়। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– لَمْ يَكُنْ أَتَاهُ قَبْلَ ذٰلِكَ عَلَى هٰذَا التَّفْصِيْلِ الْمَذْكُوْرِ هَاهُنَا অর্থাৎ মূলত ইতঃপূর্বে এমন বিশদ বিবরণ সম্বলিত কিয়ামতের আলোচনা তাঁর নিকট নাজিল হয়নি। –[কুরতুবী]

কারো মতে, ইতঃপূর্বে তাঁকে জানানো হয়েছে। জানা বস্তুর উপর প্রশ্ন করার নিয়ম আমাদের সমাজেও প্রচলিত আছে। যেমন, কোনো ছাত্রকে কিছু শিখিয়ে পরে প্রশ্ন করা যে, এ ব্যাপারে কি তুমি কিছু জেনেছ বা শিখেছ? রাসূলের ব্যাপারেও একইরূপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিয়ামত ও এর ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা দিয়েছেন। যে ধারণা ইতিপূর্বে তাঁর ছিল না, না লোকদের ছিল। আকল দিয়ে কিয়ামতের অবস্থা জানা মোটেও সম্ভব নয়। অতএব, আল্লাহ যখন তাঁকে জানিয়েছেন তখন প্রশ্ন করতে দোষ কোথায়? –[কাবীর]

وُجُوْهٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : وُجُوْهٌ দ্বারা শুধু চেহারা উদ্দেশ্য নয়; বরং أَصْحَابُ الْوُجُوْهِ তথা চেহারার মালিকগণ উদ্দেশ্য। কেননা মানব দেহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশমান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো তার মুখমণ্ডল। এর দ্বারাই ব্যক্তির পরিচিতি লাভ সম্ভব। মানুষের উপর ভালো কিংবা মন্দ যে অবস্থাই আসুক না কেন, তার মুখমণ্ডলেই এর প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। এর দ্বারাই তার প্রকাশ সম্ভব। এ কারণে 'কতিপয় ব্যক্তি' না বলে 'কতক চেহারা' বা মুখমণ্ডল বলা হয়েছে। –[কুরতুবী]

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ-এর তাৎপর্য : عَامِلَةٌ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের ইসমে ফায়েল, অর্থ– কর্মী। نَاصِبَةٌ ও স্ত্রীলিঙ্গের ইসমে ফায়েল অর্থ– কঠোর প্রচেষ্টাকারী। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো– কঠোর পরিশ্রমী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– এ আয়াতে সেসব লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা দুনিয়াতে ইসলামের পরিপন্থি পন্থায় কঠিন ও পরিশ্রমশীল ইবাদত-বন্দেগি করে। অর্থাৎ দেব-দেবী ও প্রতিমার ইবাদত-বন্দেগিতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। এরা হলো কাফের ও আহলে কিতাব, যারা গীর্জা ও মন্দিরে পূজা-আর্চনায় ক্লেশ ও পরিশ্রম অবলম্বন করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দুঃখ-কষ্ট জনিত ভ্রান্ত প্রচেষ্টা কবুল করবেন না; বরং কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন عَامِلَةٌ দ্বারা দুনিয়ার জীবনে পাপকাজ করা এবং نَاصِبَةٌ দ্বারা আখেরাতে জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বুঝানো হয়েছে। কতিপয় তাফসীরকার এরূপ ব্যাখ্যাও করেন যে, কাফেরগণকে জাহান্নামের দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজে লিপ্ত হতে হবে। কেননা পার্থিব জীবনে তারা আল্লাহর জন্য আমল করেনি। সুতরাং জাহান্নামেই তাদের দ্বারা দুঃখ-কষ্টের কাজ করানো হবে। –[খাযেন]

ইমাম সুদ্দী এবং ইকরামা (র.) বলেছেন, তারা দুনিয়াতে পাপাচারের বোঝা বহন করছে, আর পরকালে দোজখের শাস্তি বহন করবে। –[নূরুল কোরআন]

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ-এ বর্ণিত দু'টি কেরাত : অধিকাংশ ক্বারীগণ উভয় শব্দকে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। এ হিসাবে যে, উভয় শব্দ পূর্ববর্তী مُبْتَدَأ-এর خَبَر হয়েছে অথবা উভয় শব্দ একটি উহ্য مُبْتَدَأ-এর খবর।

ইবনে মুহাইসেন, ঈসা এবং ইবনে কাছীরের একটি বর্ণনায় উভয় শব্দ مَنْصُوْب হবে। এ হিসাবে যে, حَالٌ অথবা ذَمٌّ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

تَصْلٰى-এর কয়েকটি কেরাত : অধিকাংশ ক্বারীগণ تَصْلٰى-এর تَ-কে فَتْح দিয়ে مَعْرُوْف হিসেবে পড়েছেন।
আবূ আমর, ইয়াকূব এবং আবূ বকর. تَ-কে ضَمَّة দিয়ে مَجْهُوْل পড়েছেন।
আবূ রাজা. تَ-কে ضَمَّة এবং صَاد-কে فَتْح ও لَام-কে তাশদীদ দিয়ে পড়েছেন।
সকল কেরাতেই هِيَ সর্বনামটি وُجُوْه-এর দিকে ফিরবে। -[ফাতহুল কাদীর]

اٰنِيَةٍ-এর অর্থ : اٰنِيَةٍ ঐ বস্তুকে বলা হয় যার গরম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর বেশি আর গরম হতে পারে না। إِنًى হতে গৃহীত। إِنًى. অর্থ تَأْخِيْر হাদীসে আছে কোনো এক ব্যক্তি জুমার নামাজে বিলম্ব করে এসেছে; কিন্তু মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে চলে এসেছে তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন اٰنَيْتَ اٰذَيْتَ অর্থাৎ বিলম্ব করে আসলে আর অন্যকে কষ্ট দিলে। মুফাসসিরগণ বলেন- ঐ গরম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যদি এক ফোঁটা সে গরম হতে দুনিয়ার পাহাড়সমূহে পতিত হতো তাহলে পাহাড় গলে যেত। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

ইবনে আবী হাতেম সুদ্দী (র.)-এর কথা, উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতের اٰنِيَةٍ শব্দটির অর্থ হলো- তাপমাত্রার সর্বশেষ পর্যায়, যারপর আর কোনো তাপ থাকে না। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ : অত্র আয়াত হতে বোধগম্য হয় যে, জাহান্নামীদেরকে শুধু দারী' নামক খাদ্য দেওয়া হবে। কিন্তু অন্য এক আয়াতে আছে যে, তাদেরকে যাক্কুম খেতে দেওয়া হবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, জাহান্নামীদেরকে গিসলীন ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য দেওয়া হবে না। উক্ত আয়াতগুলোতে বাহ্যত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা ক. জাহান্নামের অনেক শ্রেণি ও স্তর হবে। বিভিন্ন ধরনের পাপী ও অপরাধীকে তাদের পাপ ও অপরাধ অনুপাতে এক একটি শ্রেণিতে রাখা হবে এবং বিভিন্ন ধরনের আজাব ও খাদ্য তাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। খ. অথবা, প্রথমত তাদেরকে যাক্কুম খেতে দেওয়া হবে। এটা খেতে অস্বীকার করলে গিসলীন দেওয়া হবে তা খেতে না চাইলে তারা কাঁটাযুক্ত ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

ضَرِيْع-এর অর্থে মুফাসসিরগণের মতামত : মুফাসসিরগণ ضَرِيْع-এর বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন-
ক. জমহুর মুফাসসিরগণ বলেছেন, ضَرِيْع হলো এক প্রকার কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ যা জাহান্নামীদের আহার্য হবে।
খ. নাহুবিদ ইমাম খলীল বলেছেন, ضَرِيْع ঐ চামড়াকে বলে যা হাড়ের উপর এবং গোশতের নিচে হয়।
গ. হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে, ضَرِيْع হলো খসখসে তিক্ত বস্তু।
ঘ. হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এটা এমন একটি বস্তু যা সদৃশ, খুব তিক্ত এবং মারাত্মক দুর্গন্ধযুক্ত।
ঙ. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, এটা এক ধরনের কাঁটাযুক্ত ঘাস যা এত বিস্বাদ যে চতুষ্পদ জন্তুও তা খায় না।
চ. ইবনে আবী যায়েদ বলেছেন, দুনিয়াতে যে কাঁটা বিশিষ্ট শুষ্ক ঝাড়ে পাতা থাকে না তাকে ضَرِيْع বলে, আর পরকালে ضَرِيْع হবে অগ্নি দ্বারা তৈরি। -[নূরুল কোরআন]

অগ্নিতে [জাহান্নামে] কিভাবে ঘাস জন্মিবে? : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামীদের জন্য দারী' নামক উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে দেওয়া হবে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাহান্নামে তো আগুন আর আগুন হবে তথায় উদ্ভিদ গজাবে কিভাবে? মুফাসসিরগণ এর উত্তরে বলেছেন-
ক. এটা আল্লাহর কুদরত আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আগুনের মধ্যেও ঘাসের উৎপাদন করতে পারেন। এটা তার জন্য মোটেই অসম্ভব নয়।
খ. অথবা এর উৎপাদন হবে জাহান্নামের বাইরে, আর বাইর হতে জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে একে সরবরাহ করা হবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ : আল্লাহ তা'আলা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, জাহান্নামীদেরকে খাদ্য হিসাবে ضَرِيْع দেওয়া হবে, আর এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ খাদ্যও তাদের আরামের জন্য দেওয়া হবে না; বরং এটা যে তাদেরকে হৃষ্টপুষ্ট করা এবং তাদের ক্ষুধা নিবারণ করা তো দূরের কথা উল্টো তাদের জন্য আজাব হয়ে দাঁড়াবে।
পূর্বোক্ত আয়াত لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ নাজিল হওয়ার পর মক্কার কাফেররা বলাবলি করতে লাগল যে, তাদের উট ইত্যাদি পূর্বোক্ত বৃক্ষ খেয়ে মোটাতাজা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন যে, এটা এমন খাদ্য যা পুষ্টিকরও নয় এবং ক্ষুধাও নিবৃত্তি করে না। কাজেই তোমাদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই; বরং এর ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তোমরা নিজেদের আজাবকে কেবল বৃদ্ধি করবে।

অনুবাদ :

٨. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ حَسَنَةٌ ـ

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন আনন্দোজ্জ্বল হবে প্রস্ফুটিত ও উৎফুল্ল।

٩. لِسَعْيِهَا فِى الدُّنْيَا بِالطَّاعَةِ رَاضِيَةٌ فِى الْاٰخِرَةِ لَمَّا رَاَتْ ثَوَابَهٗ ـ

৯. তার কর্ম সাফল্যে পার্থিব জীবনের আনুগত্যের কারণে পরিতৃপ্ত হবে আখেরাতে এর ছওয়াব প্রত্যক্ষ করে।

١٠. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ حِسًّا وَّمَعْنًى ـ

১০. সুমহান জান্নাতে যা অনুভূতি ও অর্থগত দিক হতে সুমহান হবে।

١١. لَّا يَسْمَعُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيْهَا لَاغِيَةً اَىْ نَفْسٌ ذَاتَ لَغْوٍ اَىْ هِذْيَانٍ مِنَ الْكَلَامِ ـ

১১. তারা শ্রবণ করবে না শব্দটি تَا، ও يَا، যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তথায় কোনো অসার বাক্য অহেতুক বস্তু অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা।

١٢. فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ بِالْمَاءِ بِمَعْنٰى عُيُوْنٍ ـ

১২. সেথায় থাকবে বহমান প্রস্রবণ যাতে পানি প্রবহমান থাকবে, عَيْنٌ দ্বারা عُيُوْنٌ বহু সংখ্যক প্রস্রবণ উদ্দেশ্য।

١٣. فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ذَاتًا وَّقَدْرًا وَّمَحَلًّا ـ

১৩. তথায় থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা যা স্বীয় সত্তা, মর্যাদা ও অবস্থানগত দিক হতে সুউচ্চ হবে।

١٤. وَّاَكْوَابٌ اَقْدَاحٌ لَا عُرٰى لَهَا مَّوْضُوْعَةٌ عَلٰى حَافَاتِ الْعُيُوْنِ مُعَدَّةٌ لِشُرْبِهِمْ ـ

১৪. আর পান পাত্রসমূহ এমন পেয়ালা যাতে ধরার হাতল নেই। প্রস্তুত অবস্থায় প্রস্রবণ তীরে পান করার জন্য প্রস্তুত অবস্থায়।

١٥. وَّنَمَارِقُ وَسَائِدُ مَصْفُوْفَةٌ بَعْضُهَا بِجَنْبِ بَعْضٍ يُسْتَنَدُ اِلَيْهَا ـ

১৫. আর উপাধানসমূহ বালিশ। সারিবদ্ধভাবে সাজানো গদিতে হেলান দেওয়ার জন্য সারি সারি সাজানো।

١٦. وَّزَرَابِىُّ بُسُطٌ طَنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ مَبْثُوْثَةٌ مَبْسُوْطَةٌ ـ

১৬. আর গালিচাসমূহ রুইযুক্ত রেশমী গালিচা। বিছানো অবস্থায় পাতানো অবস্থায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখন মু'মিনদের অবস্থা এবং পুরস্কার ঘোষণা করছেন। সর্ব প্রথমে মু'মিনদের গুণ তারপর মু'মিনদের আবাসস্থলের গুণ বর্ণনা করেছেন। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا الخ : মু'মিনগণের চেহারা কিয়ামতের দিন হাস্যোজ্জ্বল হবে। দুনিয়ার জীবনে তারা যে চেষ্টা-সাধনা করেছে পরকালে তার উত্তম প্রতিফল পেয়ে তারা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হবে। দুনিয়ার জীবনে ঈমান, কল্যাণ নীতি ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করে তারা নাফস এবং তার কামনা-বাসনার যে কুরবানি দিয়েছে, কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট-যাতনা ভোগ করেছে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে যে দুর্ভোগ পোহায়েছে, পাপ ও নাফরমানি হতে বাঁচবার চেষ্টায় যেসব ক্ষতি স্বীকার করেছে এবং যেসব স্বার্থ ও সুযোগ, স্বাদ ও সম্ভোগ হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে, তা সবই যে প্রকৃতপক্ষে বড় লাভজনক কারবার ছিল, পরকালের জীবনে তা দেখতে পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হবে। তাদের মন পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবে। তাদের সুখ শান্তির অন্ত থাকবে না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে "تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ" অর্থাৎ জান্নাতীদের চেহারায় নিয়ামতের ঔজ্জ্বল্য পরিস্ফুট হবে।

عَالِيَةٍ-এর মর্মার্থ : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন عَالِيَةٍ حِسًّا وَمَعْنًى অর্থাৎ জান্নাত দেখতে ও [আকারে] সুউচ্চ হবে এবং এটা মানেও উচ্চ (তথা অত্যন্ত দামী) হবে। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ অর্থাৎ জান্নাত আসমান ও জমিনের মতো প্রশস্ত হবে। অপরদিকে মর্যাদা ও প্রতিফলের দিক দিয়ে এটা সুমহান হবে।

لَاغِيَةً দ্বারা এখানে কি উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে لَاغِيَةً দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

ক. ইমাম ফাররা ও আখফাশ (র.)-এর মতে لَغْو দ্বারা অনর্থক কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতীগণ অনর্থক কোনো কথা শুনবে না।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, لَغْو দ্বারা এখানে মিথ্যা অপবাদ, কুফরি ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

গ. কারো কারো মতে, لَغْو দ্বারা মিথ্যা শপথকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, لَغْو দ্বারা এখানে شَتْم [গালি] উদ্দেশ্য।

প্রকৃতপক্ষে لَغْو দ্বারা উপরোক্ত সবকিছুই উদ্দেশ্য হতে পারে। জান্নাতীগণ সর্ব প্রকার অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ও শ্রবণ করা হতে মুক্ত থাকবেন। -[কবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ : জান্নাতীগণের জন্য জান্নাতে উচ্চ শয্যা [বা আসন] হবে। এখানে উচ্চাসন বা উচ্চ শয্যা বলতে কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, উক্ত আসনগুলো আকারে ও মর্যাদায় উচ্চ হবে এবং এদের উচ্চ স্থানে রাখা হবে। অর্থাৎ উচ্চ স্থানে স্থাপিত সে আসন ও শয্যাসমূহ দেখতে (আকারে) যেমন বড় হবে তেমনটি দামেও হবে অত্যন্ত মূল্যবান।

খ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, শয্যাগুলোর তক্তা স্বর্ণের হবে, এতে যবরজদ ও মুক্তা ছড়ানো হবে এবং ঊর্ধ্বে [আকাশে] উত্তোলিত হবে।

গ. হযরত খারেজা ইবনে মুসআব (রা.) বলেছেন, উক্ত শয্যাগুলোকে একটির উপর অন্যটি রেখে অনেক উঁচু করা হবে। জান্নাতী এসে যখন এতে উপবেশন করবে তখন তাকে নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় যেখানে সেখানে নিয়ে যাবে।

ঘ. কারো কারো মতে শয্যাকে শূন্যে স্থাপন করা হবে। যাতে জান্নাতীগণ শূন্যে থেকে সমস্ত নিয়ামত স্বচক্ষে দেখতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ : اَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো- গ্লাস যার হাতল নেই।

مَوْضُوْعَةٌ এটা ইসমে মাফঊল وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর শব্দ। বাবে ضَرَبَ অর্থাৎ রাখা। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন "مَوْضُوْعَاتٌ عَلٰى حَافَاتِ الْعُيُوْنِ مُعَدَّةٌ لِشُرْبِهِمْ" অর্থাৎ ঝরনার ধারে জান্নাতীদের পান করার জন্য এদেরকে প্রস্তুত রাখা হবে।

খ. অথবা, এগুলো তাদের সম্মুখে সৌন্দর্যের জন্য রাখা হবে। কেননা তা স্বর্ণ, রৌপ্য ও মনি-মুক্তার তৈরিকৃত হবে।

গ. অথবা, সে পানপাত্রগুলো ঝরনার পাশে রাখা হবে। যখনই তারা পানি পান করতে চাইবে তখনই ভরা অবস্থায় পাবে।

نَمَارِقُ-এর অর্থ : نَمَارِقُ শব্দটি نُمْرُقَةٌ [নূনের উপর পেশ]-এর বহুবচন, কারও মতে نُمْرُقٌ-এর বহুবচন। ইমাম ফাররা নূনের নিচে যের দিয়েও এক রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন-অর্থ বালিশ। কেউ কেউ 'ছোট বালিশও' অর্থ করেছেন।

مَصْفُوْفَةٌ-এর অর্থ : مَصْفُوْفَةٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে ইসমে মাফঊলের স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ। মূল হলো صَفٌّ বা সারি مَصْفُوْفَةٌ অর্থ- সারিবদ্ধকৃত। অর্থাৎ উক্ত বালিশগুলো একটির পাশে অন্যটি সারিবদ্ধকৃত। যেখানেই জান্নাতবাসী বসতে চায় সেখানেই একটিতে বসবে আর অন্যগুলোতে হেলান দিবে।

زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ-এর অর্থ : زَرَابِيُّ শব্দটি زَرْبِيٌّ অথবা زُرْبِيَّةٌ [زَا-এর নিচে যের অথবা উপরে পেশ]-এর বহুবচন এর অর্থ- গিলাফ, গালিচা- যার উপরে পাতলা কাপড় রয়েছে। زَرَابِيُّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়েও ইমামদের মতামতসমূহ নিম্নরূপ-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা হলো- কারুকার্য বিশিষ্ট বিছানা।

২. আল্লামা যমাখশারী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- উত্তম বিছানা।

৩. ইমাম রাগেব (র.) বলেন, এটা হলো সাধারণ কাপড়।

অনুবাদ :

١٧. اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ نَظَرَ اِعْتِبَارٍ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ .

১৭. তারা কি দৃষ্টিপাত করে না, অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরগণ, উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে দেখা উষ্ট্রের প্রতি, কিরূপে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

١٨. وَاِلَى السَّمَاۤءِ كَيْفَ رُفِعَتْ .

১৮. আর আকাশের দিকে, কিরূপে তাকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

١٩. وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ .

১৯. আর পর্বতমালার প্রতি, কিরূপে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?

٢٠. وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اَىْ بُسِطَتْ فَيَسْتَدِلُّوْنَ بِهَا عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ وُحْدَانِيَّتِهٖ وَصُدِّرَتْ بِالْاِبِلِ لِاَنَّهُمْ اَشَدُّ مُلَابَسَةً لَهَا مِنْ غَيْرِهَا وَقَوْلُهٗ سُطِحَتْ ظَاهِرٌ فِىْ اَنَّ الْاَرْضَ سَطْحٌ وَعَلَيْهِ عُلَمَاۤءُ الشَّرْعِ لَا كُرَةٌ كَمَا قَالَهٗ اَهْلُ الْهَيْئَةِ وَاِنْ لَمْ يَنْقُضْ رُكْنًا مِنْ اَرْكَانِ الشَّرْعِ .

২০. আর ভূতলের দিকে কিরূপে তাকে সমতল করা হয়েছে? সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সারকথা, এ সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর কুদরত ও একত্বের প্রতি ঈমান আনাই বাঞ্ছনীয় ছিল। সর্বপ্রথম উষ্ট্রের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে, যেহেতু এটা তাদের সাথে অন্যগুলোর তুলনায় অধিক সম্পৃক্ত। سُطِحَتْ শব্দ দ্বারা বাহ্যত এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী সমতল। শরিয়তের আলিমগণের মতও এটাই, ভূতত্ত্ববিদদের মতানুরূপ গোলাকার নয়। যদিও তাদের সে দৃষ্টিভঙ্গি শরিয়তের কোনো আহকামের জন্য বিপত্তিকর নয়।

٢١. فَذَكِّرْ قف هُمْ نِعَمَ اللّٰهِ وَ دَلَاۤئِلَ تَوْحِيْدِهٖ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ .

২১. অতএব তুমি উপদেশ দান কর তাদেরকে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও একত্বের প্রমাণাদি স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তুমি তো উপদেশদাতা মাত্র।

٢٢. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ وَفِىْ قِرَاۤءَةٍ بِالصَّادِ بَدَلَ السِّيْنِ اَىْ بِمُسَلَّطٍ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ .

২২. তুমি তাদের উপর নিযুক্ত কর্ম নিয়ন্ত্রক নও অপর এক কেরাতে শব্দটি سِيْن-এর স্থলে صَادْ দিয়ে পঠিত হয়েছে। আর এ বিধান জিহাদের আদেশ সম্বলিত বিধানের পূর্ববর্তী বিধান।

٢٣. اِلَّا لٰكِنْ مَنْ تَوَلّٰى اَعْرَضَ عَنِ الْاِيْمَانِ وَكَفَرَ بِالْقُرْاٰنِ .

২৩. কিন্তু যে ব্যক্তি বিমুখ হবে ঈমান আনয়ন হতে বিরত হবে ও অবাধ্যাচারণ করবে কুরআনের সাথে।

٢٤. فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ وَالْاَصْغَرُ عَذَابُ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ .

২৪. আল্লাহ তাকে মহাশাস্তি দিবেন আখেরাতের শাস্তি। আর সাধারণ শাস্তি হলো দুনিয়ার শাস্তি, যেমন হত্যা ও বন্দীত্ব।

٢٥. اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْ رُجُوْعَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ .

২৫. নিশ্চয় আমার দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তন মৃত্যুর পর ফিরে আসা।

٢٦. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ جَزَاۤءَهُمْ لَا نَتْرُكُهٗ اَبَدًا .

২৬. অনন্তর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে তাদের প্রতিফল দান, যা আমি কখনও ত্যাগ করবো না।

তাহকীক ও তারকীব

نُصِبَتْ وَسُطِحَتْ-এর বিশ্লেষণ : نُصِبَتْ শব্দটি একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ, নাম পুরুষ, মাযী মাজহুল। বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلنَّصْبُ। অর্থ- গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সংস্থাপন করা হয়েছে।

سُطِحَتْ শব্দটি وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ-এর সীগাহ, বহছ مَاضِى مَجْهُول বাবে فَتَحَ মাসদার اَلسَّطْحُ। অর্থ-সমান করা হয়েছে, বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ الخ-এর তারকীব : اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ الخ বাক্যটি মূলত ছিল اَعَمُوْا اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ এখানে। মুবতাদা اَعَمُوْا ফে'ল, উহ্য যমীর هُمْ ফায়েল। ফে'ল-ফায়েল মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّه হয়ে مَعْطُوْف عَلَيْه - فَا হরফে আতফ, يَنْظُرُوْنَ لَا ফে'ল, যমীর هُمْ ফায়েল, اِلَى হরফে জার, الْاِبِلِ মুবদাল মিনহু, كَيْفَ خُلِقَتْ এটা بَدَلْ, বদল ও মুবদাল মিনহু মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে مُتَعَلِّقْ হয়েছে لَا يَنْظُرُوْنَ-এর সাথে। لَا يَنْظُرُوْنَ ফে'ল তার فَاعِلْ ও مُتَعَلِّقْ-এর সাথে মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে مَعْطُوْف - مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف মিলে خَبَرْ; মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়েছে।

كَيْفَ خُلِقَتْ-এর মহল্লে ই'রাব : كَيْفَ পদটি হাল এবং خُلِقَتْ ক্রিয়ার দ্বারা মানসূব হয়েছে। لِلْاِسْتِفْهَامِ صَدَارَةٌ প্রশ্নবোধক শব্দ বাক্যের প্রথমে আসে বলে خُلِقَتْ-এর পূর্বে এসেছে। كَيْفَ خُلِقَتْ পূর্ণ বাক্যটি الْاِبِلِ-এর সিফাত হয়েছে। এ কারণে পূর্ণ বাক্যটি মাজরূরের অবস্থায় রয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, পার্শ্ব টীকা জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং পরকালে মু'মিনগণ পুরস্কৃত হবেন আর কাফিরেদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে পুনরায় কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তারা কোনো মতেই পরিত্রাণ পাবে না।

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত ও তার অশেষ নিয়ামতের বর্ণনা সম্বলিত কুরআনে মাজীদের আয়াতসমূহ নাজিল করলেন তখন মক্কার কাফেররা তা অস্বীকার করল এবং অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিল। তখন আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতগুলো নাজিল করে তাদের পাশে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অগণিত কুদরতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যা হতে প্রমাণিত হয় যে, যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তিনি জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত সৃষ্টি করতেও সক্ষম।

বিশেষভাবে উষ্ট্রকে উল্লেখ করার কারণ : উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য প্রাণী ব্যতীত শুধু উষ্ট্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করার কারণ হচ্ছে- আরববাসীদের নিকট উষ্ট্র একটি মূল্যবান সম্পদ এবং জীবকুলের মধ্যে বিরাট ও অদ্ভুত প্রাণী। অথচ মানুষের পক্ষে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বেশি উপকারী। দৈহিক দিক দিয়ে হাতির তুলনায় ছোট হলেও অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বড়; কিন্তু হাতির কথা উল্লেখ না করে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাতির তুলনায় এর দ্বারা মানুষ লাভবান বেশি হয়। যেমন উষ্ট্রের গোশত ভক্ষণ করা যায়, দুগ্ধ পান করা যায়, সওয়ারিরূপে ব্যবহার করা যায়, সর্বদা মালিকের অনুগত থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে পারে। স্থলভাগের যে কোনো ঘাস বা উদ্ভিদ সে আহার করে। মানুষ তাকে ভারবাহীরূপে ব্যবহার করতে গিয়ে বহু দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। আরবে একে মরুর জাহাজ বলা হয়। দীর্ঘদিন পানি পান না করে থাকাও এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতগুলো গুণ-বৈশিষ্ট্য একসাথে একটি পশুর মধ্যে পাওয়া খুবই দুর্লভ এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা আরবদের সম্মুখে উষ্ট্রের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেছেন।

নি বলেছেন– হে আরববাসী ও দুনিয়ার মানুষ! আমি কিয়ামতকে সংঘটিত করে পরলোক সৃষ্টি করতে পারবো না এবং মাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ শেষে পাপীগণকে জাহান্নামে ও নেককারগণকে জান্নাতে স্থান দিতে পারবো । এটা তোমরা কি করে বুঝলে? তোমরা তোমাদের কাছের উষ্ট্রের দিকে তাকাও না, আমি কত সুন্দর, অদ্ভুত ও উপকারীরূপে দরকে সৃষ্টি করেছি।

], আকাশ, পাহাড় এবং জমিনকে বিশেষভাবে উল্লেখের মধ্যে হিকমত : উষ্ট্র, আকাশ, পাহাড় এবং জমিনের মধ্যে দুই ক হতে আমরা সামঞ্জস্য নির্ণয় করতে পারি–

পবিত্র কুরআন আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা অধিক পর্যটনে অভ্যস্ত ছিল। কেননা তাদের দেশ ছিল কৃষিশূন্য। তাদের সফর বেশির ভাগ উষ্ট্রীর উপর ছিল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তারা একাকী চলাকে অগ্রাধিকার দিত। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ যখন একাকী হয়ে যায়, তখন নিশ্চয় কোনো ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকে। কেননা এমন কিছু নেই যে, তার সাথে কথা বলে, চোখ আর কানকে তৃপ্ত রাখে। অতএব, চিন্তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। চিন্তা যখন করতেই হয়, তখন প্রথম চিন্তার চক্ষু গিয়ে পড়ে তার উষ্ট্রের উপর, যে উষ্ট্রে সে সওয়ার হয়েছে। তখন তার সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য ভেসে উঠে, যখন উপরের দিকে তাকায়–আকাশ ছাড়া কিছুই দেখে না। ডানে-বামে পাহাড় ছাড়া কিছু নেই। নিচে জমিন ছাড়া কিছু দেখা যায় না। অতএব, আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে হয় বলে দেওয়া হয় যে, একাকী অবস্থায় যেমন উক্ত বস্তুগুলো ছাড়া কিছুই দেখছ না, সুতরাং ঐগুলো সম্পর্কেই একটু চিন্তা কর, আমাকে এবং আমার সকল কথাকে সঠিক পাবে।

দুনিয়ার সকল বস্তুই সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ দেয়। এ সকল বস্তু দুই প্রকার–

কিছু বস্তু এমন আছে যে, সেগুলোতে হিকমত তো আছেই, মানবিক আকর্ষণও বিদ্যমান, যেমন– সুন্দর চেহারার মানুষ, সুন্দর বাগান, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে আল্লাহর তথা সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির উপর প্রমাণ নেওয়া যায়; কিন্তু তা মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সাথে জড়িত, মানুষের নফস তা পেতে চায় বলে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দেননি। কেননা এগুলোর প্রতি তাকালে মন স্থির থাকে না। সৃষ্টির হিকমত তালাশের চেয়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব প্রাধান্য পেয়ে বসে। সুচিন্তার স্থলে কুচিন্তা ঢুকে যায়। হিকমতের স্থলে মহব্বত গড়ে উঠে।

আবার কিছু বস্তু এমন আছে, যেগুলোতে শুধু হিকমতই রয়েছে, মানবিক আকর্ষণ অনুপস্থিত। যেমন–ঐ সমস্ত জন্তু-জানোয়ার যাদের অবয়বে কোনো সৌন্দর্য নেই, কুচিন্তার প্রভাব নেই। আকর্ষণ করতে পারে না; কিন্তু তার গড়ন হিকমতে ভরা, চিন্তা-গবেষণার খোরাক জোগায়, যেমন উষ্ট্রী, আকাশ, জমিন ও পাহাড় ইত্যাদি। যেহেতু এ প্রকার বস্তুতে গবেষণার ভাগ ষোল আনা, কামভাব বা আকর্ষণের লেশমাত্র নেই, তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমনি ধরনের বস্তুতে গবেষণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –[কাবীর, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

اِبِلٌ-এর অর্থ : ইমাম মাওয়ারদী বলেন, اِبِلٌ-এর দু'টি তাফসীর পাওয়া যায়। ক. প্রসিদ্ধ অর্থ চতুষ্পদ জন্তু উষ্ট্রী। খ. মেঘ। আয়াতে মেঘ-ই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মেঘ যে আল্লাহর কত বড় সৃষ্টি এবং কত হিকমতের দলিল তা সহজেই অনুমেয়, থে সাথে তা দ্বারা যে মানবকুলের উপকার সাধিত হয় তাও স্বতঃসিদ্ধ। আর যদি উষ্ট্রীই হয় তাহলে তাও মানবকুলের জন্য শি ফলদায়ক, কেননা তাতে ৪টি উপকার নিহিত। দুধ, খাদ্য, যাত্রীবাহী, মালবাহী। اِبِلٌ শব্দের শাব্দিক একবচন নেই, শব্দটি লিঙ্গ। اِبِلٌ উষ্ট্রী জাতিকে বুঝায়। –[কুরতুবী]

টকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করার কারণ কি? : উপরিউক্ত চতুষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাগ্রে উটের উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ দু'টি রণ উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন– لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ مُلَابَسَةً لَهَا مِنْ غَيْرِهَا অর্থাৎ অপরাপর জন্তু-জানোয়ারের তুলনায় উটের সাথে আরববাসীদের সম্পর্ক বেশি– এর জন্য তাকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরববাসীদের নিকট উট একটি মূল্যবান সম্পদ এবং জীবকুলের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণী। এটা মানুষের পক্ষে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অধিক উপকারী। উষ্ট্রের গোশত ভক্ষণ করা যায়, দুগ্ধ পান করা যায়, সওয়ারিরূপে ব্যবহার করা যায় এবং এটা মালিকের অনুগত থাকে। আরবে এটাকে মরু জাহাজ বলা হয়। দীর্ঘদিন পানি পান না করে থাকতে পারাও তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতগুলো গুণ একটি পশুর মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায় না। এ কারণেই সর্বপ্রথম উটের দিকে আরববাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জমিনের আকারের ব্যাপারে ভূ-তত্ত্ববিদ ও আয়াতে কুরআনীর বক্তব্য কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায়? : ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে জমিন গোলাকার। অথচ শরিয়তের আলিমগণের মতে এটা সমতল। কুরআনে কারীমের বাহ্যিক [প্রকাশ্য] অর্থ হতেও এটা সমতল হওয়াই প্রতীয়মান হয়। এ উভয় মতবাদের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়? মুফাসসিরগণের কয়েকটি জবাব দিয়েছেন।

ক. অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের মোকাবিলায় সসীম জ্ঞানের অধিকারী ভূ-বিজ্ঞানীদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. যদিও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী গোলাকার তথাপি বিশালকায় হওয়ার কারণে সাধারণের দৃষ্টিতে সমতল বলেই মনে হয়। আর কুরআনে মাজীদের বক্তব্য, দৃষ্টিতে সমতল বলেই এভাবে পেশ করা হয়েছে। যাতে সাধারণের দৃষ্টিকোণ বুঝতে সুবিধা হয়।

গ. অথবা, এটা বস্তুতই সমতল। অন্যথায় কোনো অবস্থাতেই মানুষ ও জীব-জন্তু এতে বসবাস করতে পারত না।

ঘ. অথবা, যদিও আহলে হাইয়াত (ভূবিজ্ঞানীগণ) বলে থাকেন যে, পৃথিবী গোলাকার তথাপি তাদের একদলের মতে ঝড়, বন্যা ইত্যাদির কারণে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে সমতল হয়ে গেছে।

ঙ. একদল বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবী কমলালেবুর মতো গোল। আর কমলালেবুর উপরের অংশ চেপ্টা ও সমতল হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের বক্তব্যের সাথে তাঁদের বক্তব্যের বিরোধ নেই।

চ. সমতল হলে যেরূপ জীবন-যাপন সহজ গোলাকার হয়েও তদ্রূপ জীবন ধারণ সহজ হওয়ার কারণে একে সমতল বলা হয়েছে।

اَلْمُسَيْطِرُ-এর অর্থ : مُسَيْطِر শব্দটি صِيْغَةُ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِل মূলবর্ণ (س . ط . ر) অর্থ- مُسَيْطِر জবরদস্তিকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, দারোগা। মূলত سَطْرٌ অর্থ লাইন, যাকে অতিক্রম করা যায় না। বই مُسَطَّرٌ হয়ে থাকে, অর্থাৎ লেখক হয় مُسَيْطِرٌ হিশাম প্রমুখ শব্দটিকে সাদের স্থলে সীন (س) যোগ করে পাঠ করেন। ইমাম হামযা এখানে এশমাম করে পাঠ করেন। অবশিষ্ট ক্বারীগণ صَادْ যোগে পড়েছেন।

উক্ত আয়াতের হুকুম : لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ আয়াতটি কারো মতে اٰيَةُ السَّيْفِ বা কতলের আয়াত তথা জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু কোনো কোনো মুফাসসির বলেন– আয়াতটি রহিত নয়। কেননা এটা اٰيَةُ السَّيْفِ-এর বিপরীত নয়। দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে জবরদস্তি করা যাবে না বলে উক্ত আয়াতটি প্রমাণ। আর এটা এখনও বলবৎ রয়েছে। দাওয়াত গ্রহণ করা মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

اَلْعَذَابَ الْاَكْبَرَ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, اَلْعَذَابَ الْاَكْبَرَ-এর দ্বারা পরকালের আজাবকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, দুনিয়ার আজাব তথা বন্দীকরণ ও হত্যা হতে এটা বহু গুণে বড়।

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى الخ-এর মধ্যস্থিত ইসতিছনা : আল্লাহর বাণী اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى-এর মধ্যে কোন প্রকারের اِسْتِثْنَاء হয়েছে, এ ব্যাপারে দু'টি মতামত পাওয়া যায়।

১. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ হবে। তাঁদের মতে মূলবাক্য নিম্নরূপ হবে–

لَسْتَ بِمَسْئُوْلٍ عَلَيْهِمْ لٰكِنَّ مَنْ تَوَلّٰى مِنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ الَّذِىْ هُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে তাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনয়ন হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর আজাব তথা জাহান্নামের আজাব দিবেন।

২. কারো কারো মতে, এখানে اِسْتِثْنَاء مُتَّصِلٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় মূল ইবারত নিম্নোক্ত তিন ধরনের হতে পারে–

ক. فَذَكِّرْهُمْ اِلَّا مَنْ قَطَعَ طَمَعَاتٍ مِنْ اِيْمَانِهٖ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে নসিহত করুন। তবে তাকে নয় ঈমানের প্রতি যার কোনো আগ্রহই নেই।

খ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى অর্থাৎ আপনি তাদের উপর জোর প্রয়োগকারী নন, তবে যে হঠধর্মী করবে তার উপর জোর প্রয়োগ করা যাবে।

গ. فَذَكِّرْ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى فَاسْتَحَقَّ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ অর্থাৎ আপনি নসিহত করুন। তবে যে ঈমান হতে বিমুখ হয়ে যাবে, সে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হবে।

سُوْرَةُ الْفَجْرِ : সূরা আল-ফাজর

সূরাটির নামকরণের কারণ :আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দটিই এর নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৩০টি আয়াত, ১৩৯টি বাক্য এবং ৫৯৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এর বিষয়বস্তু ও আলোচিত কথা হতে বুঝা যায় যে, মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর জুলুম-অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাজিল হয়। এ কারণে সূরাটিতে মক্কার লোকদেরকে 'আদ, ছামূদ ও ফেরআউনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরার শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের ও আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও তাফসীরকারদের মতে এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল। আরবের অধিবাসীরা একসময় বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের জন্য সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হতেন, তবে ইহলোকেই তো তার জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি যখন ইহলোকে কিছু করছেন না, তখন পরলোকেও কিছু করবেন না। পুনরুজ্জীবন, হাশর-নশর, শাস্তি ও পুরস্কার এক ভিত্তিহীন উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অবিশ্বাসীদের এ সকল উক্তির জবাবেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা নাজিল করেন।

সূরার আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরায় পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, মক্কাবাসীরা এটা বিশ্বাস করত না। এ উদ্দেশ্যে সূরাটিতে ক্রমাগত ও পর পর যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সে পুরস্কার অনুযায়ী যুক্তিসমূহ বিবেচনার দাবি রাখে।

সূরাটির শুরুতেই ফজর, দশ রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের শপথ করা হয়েছে এবং শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা যে কথাকে মান্য করছ না, এর সত্যতার সাক্ষী এবং প্রমাণ হিসাবে এ জিনিসগুলো কি যথেষ্ট নয়?

এর পর মানুষের ইতিহাস হতে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। ইতিহাস খ্যাত 'আদ, ছামূদ ও ফেরআউনের মর্মান্তিক পরিণতি পেশ করে বলা হয়েছে যে, এরা যখন সীমালঙ্ঘন করল এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করল, তখনই আল্লাহর আজাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিত হলো। এটা হতে বোধগম্য হয় যে, এক মহাবিজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ কুশলী শাসক এর উপর রাজত্ব করছেন। বুদ্ধি-বিবেক ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে যাকে তিনি এ জগতে ক্ষমতা চালানোর এখতিয়ার দিয়েছেন। তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার নিকট হতে যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা এবং এর ভিত্তিতে তাকে শস্তি বা ভালো প্রতিফল দান করা তাঁরই এক অপরিবর্তনীয় নীতি।

এরপর মানব সমাজের নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরবে তো তখন নৈতিক অবস্থার ছিল চরম দুর্দিন। এ অবস্থার দু'টি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। একটি হলো লোকদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এর দরুনই তারা নৈতিকভাবে ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে নিছক বৈষয়িক প্রতিপত্তিকেই মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল। ধন-সম্পদ দান করে অথবা এটা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ যে শুধু মানুষকে পরীক্ষা করতে চান তা তারা সম্পূর্ণ ভুলেই বসেছিল।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে– পিতার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এতিম সন্তান চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। গরিবের পৃষ্ঠপোষক কোথাও কেউ নেই। সুযোগ পেলেই তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়, অর্থ লোভ এক অতৃপ্ত পিপাসার মতো মানুষকে পেয়ে বসেছে। যত সম্পদই করায়ত্ত হোক না কেন, মানুষের ধনক্ষুধা কোনো ক্রমেই চরিতার্থ হয় না। এটাই হলো মানব সামাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা। এটা দ্বারা মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসার জন্ম দেওয়া হয়েছে যে, এরপরও তাদেরকে শুভ প্রতিফল ও শাস্তির সম্মুখীন না করে ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? এটা কি কোনো বিবেক সমর্থন করতে পারে? সুতরাং এর নিরিখেই সূরার শেষ পর্যায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিসাব-নিকাশ অবশ্যই হবে। হবে সেদিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলার আদালত কায়েম হবে। এ হিসাব-নিকাশ অমান্যকারীরা সেদিন সে কথাটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে, যা আজ শত বুঝানোর পরও বুঝতে পারছে না। সেদিন তারা শত অনুতপ্তও হবে, কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হবে না।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা আসমানি কিতাব ও নবী-রাসূলগণের উপস্থাপিত চরম সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাদের প্রতি রাজি হবেন। আর তারাও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের জামাতে শামিল হওয়ার এবং জান্নাতে দাখিল হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানানো হবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْفَجْرِ فِي اللَّيَالِي الْعَشَرَةِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ غُفِرَلَهُ وَمَنْ قَرَأَهَا فِيْ سَائِرِ الْأَيَّامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাতে যে ব্যক্তি সূরা ফজর তেলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর সর্বদা যে, এটা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য নূর হবে।
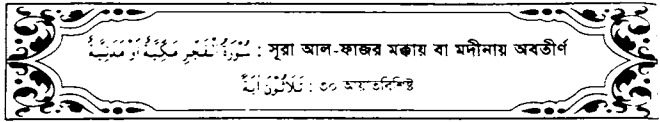
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. وَالْفَجْرِ اَىْ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ.

১. শপথ উষার অর্থাৎ প্রত্যেক দিনের উষা।

২. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اَىْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ.

২. আর দশ রজনীর অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত

৩. وَّالشَّفْعِ الزَّوْجِ وَالْوَتْرِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ الْفَرْدِ.

৩. আর শপথ জোড়ের জোড়া ও বিজোড়ের وَتْر শব্দটির وَاوْ বর্ণে যবর ও যের উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যা।

৪. وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اَىْ مُقْبِلًا وَّمُدْبِرًا.

৪. আর শপথ রজনীর যখন তা গত হতে থাকে অর্থাৎ আসতে ও যেতে থাকে।

৫. هَلْ فِىْ ذٰلِكَ الْقَسَمِ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ عَقْلٍ وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ اَىْ لَتُعَذَّبُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ.

৫. নিশ্চয় এর মধ্যে এই শপথের মধ্যে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শপথ রয়েছে حِجْر শব্দের অর্থ عَقْل বা বোধশক্তি, আর শপথের জবাব উহ্য অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, হে মক্কাবাসী কাফেরগণ!

তাহকীক ও তারকীব

حِجْر-এর বিশ্লেষণ : حِجْر অর্থ- জ্ঞান, বুদ্ধি। শব্দটি একবচন, বহুবচনে حُجُوْرٌ [হুজুর] ও اَحْجَارٌ আর ذِى الْحِجْرِ অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এর অপর অর্থ- বিরত থাকা। তাহলে ذِى الْحِجْرِ এর অর্থ দাঁড়ায়- প্রতিরোধকারী। যেহেতু প্রকৃত জ্ঞানীগণই নিজের পাশবিক প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করে নিজেকে আল্লাহর প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করতে পারেন। -(খাযেন)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্তমান এবং পূর্বের সূরার মধ্যে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা আল-গাশিয়াহতে পুণ্যবান ও পাপীদের প্রতিদান ও প্রতিফলের কথা বিবৃত হয়েছে। বর্তমান সূরাতে এমন সব কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর প্রতিফল শুধু শাস্তি। আর বর্তমান সূরাতে অবিশ্বাসী-কাফের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথাও আলোচিত হয়েছে। -[কামালাইন]

সূরা আল-গাশিয়াহতে وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ এবং وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ আয়াতদ্বয়ে কাফের এবং মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বর্তমান সূরাতেও এ দু'টি দলের আলোচনা রয়েছে। সূরার প্রথমে কাফেরদের আলোচনা- তারপর يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ থেকে মু'মিনদের আলোচনা শুরু হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ : আল্লাহ তা'আলা এখানে চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। আর এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ও অকাট্য। শেষে প্রশ্ন করা হয়েছে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এ জিনিসে কোনো কসম আছে কি? অর্থাৎ তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য এ সব প্রমাণ পেশ করার পর বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অপর কোনো কসমের (সাক্ষীর) প্রয়োজন থাকতে পারে কি?

মূলত পরকালীন শাস্তি ও ভালো প্রতিফলই ছিল আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয়। মক্কার কাফেররা এটি অস্বীকার ও অমান্য করে আসছিল এবং নবী করীম ﷺ তাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী বানাবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত প্রচার ও তাবলীগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে ফজর, দশ রাত্র, জোড়-বেজোড়া ও বিদায়ী রাত্রির শপথ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ কথাটি মেনে নেওয়ার জন্য এ চারটি বস্তুর শপথ কি যথেষ্ট নয়?

اَلْفَجْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য : একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, আল্লাহ اَلْفَجْرِ-এর শপথ করেছেন; কিন্তু اَلْفَجْرِ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে–এ ব্যাপারে বিভিন্ন তাফসীরকারের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, فَجْر স্বাভাবিক পরিচিত প্রভাতকে বলা হয়, যা সুবহে সাদেক এবং কাযেব-এর পরিচায়ক। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শপথ করেছেন। এতে রাতের সমাপ্তি এবং আলো প্রকাশের ভূমিকা বিদ্যমান। রিজিক অন্বেষণে মানব গোষ্ঠী এবং সকল প্রকার জন্তু-জানোয়ার ও পাখি চারিদিকে বের হয়ে পড়ে। এ মুহূর্তের গুরুত্ব চিন্তাশীল গবেষকদের জন্য অত্যধিক।

২. অথবা, اَلْفَجْرِ বলে রূপকভাবে صَلٰوةُ الْفَجْرِ বুঝানো হয়েছে। صَلٰوةُ الْفَجْرِ দ্বারা শপথ করার কারণ হলো– উক্ত নামাজ দিনের ভূমিকায় এবং ঐ সময় রাত এবং দিনের ফেরেশতা একসাথ হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا অর্থাৎ রাত এবং দিনের ফেরেশতা ফজরের নামাজে কেরাত শুনতে উপস্থিত হয়।

৩. অথবা, একটি নির্দিষ্ট দিনের ফজর উদ্দেশ্য। যেমন– কারো মতে فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ অর্থাৎ ১০ই যিলহজের ফজর। আর এটা এ কারণে যে, হজ এবং হজের আহকামগুলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যাবলির একাংশ।

* কারো মতে, فَجْرُ ذِى الْحِجَّةِ অর্থাৎ যিল হজের ফজর।
* কারো মতে, فَجْرُ الْمُحَرَّمِ অর্থাৎ মহররম মাসের ফজর। এর দ্বারা শপথ করার কারণ হলো–এ মাসটি প্রত্যেক বছরের প্রথম মাস।

৪. অথবা, اَلْفَجْرِ দ্বারা ঐ সমস্ত ঝরনা উদ্দেশ্য যেগুলো থেকে পানি প্রবাহিত হয়। যে পানির অপর নাম জীবন।
–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : لَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা জিলহজের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। এ মতই পোষণ করতেন। হযরত কাতাদা, মুজাহেদ যাহ্যাক, সুদ্দী ও কালবী (র.) এ দশ রাতের ফজিলত সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর হাদীস রয়েছে।

২. ইমাম যাহ্হাক (র.) বলেছেন, এ দশ রাত হলো, রমজানের প্রথম দশ রাত।

৩. আবূ জুরিয়ান (র.) বলেছেন, এর দ্বারা রমজানের শেষ দশ রাত উদ্দেশ্য। কেননা রমজানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদর রয়েছে।

৪. আইশাম ইবনে রোবাব বলেছেন এর দ্বারা মহররমের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। কেননা তার দশ দিন হলো আশুরা।
–[নূরুল কোরআন]

জোড়-বেজোড়ের তাৎপর্য : জোড়-এর দ্বারা জিলহজের দশ তারিখ এবং বেজোড় দ্বারা নবম তারিখ বুঝানো হয়েছে। এ মন্তব্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে আছে যে, জোড় দ্বারা ফজরের নামাজ এবং বেজোড় দ্বারা মাগরিবের নামাজ বুঝানো হয়েছে। উদ্ধৃত আয়াতসমূহে যে চারটি বিষয়ে শপথ করা হয়েছে তন্মধ্যে জোড়-বেজোড় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলো সময় বিশেষের উপর ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং জোড়-বেজোড় শব্দ দু'টিও সময়বাচক হলে বেশি উপযোগী হয়। অতএব এর অর্থ নামাজ না হয়ে জিলহজের নবম ও দশম তারিখ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন তাফসীরকার এ জোড়-বেজোড়-এর ব্যাখ্যায় ৩৬টি মত উল্লেখ করেছেন। যেমন–১. জোড় বলতে সৃষ্ট বস্তু (যা জোড়া জোড়া); বেজোড় বলতে আল্লাহর একত্ব, ২. জোড় বলতে ইহকালে দিবা ও রাত্রের সমষ্টি দিন, আর বেজোড় বলতে হাশরের বিচারের দিন, ৩. জোড় বলতে আট বেহেশত, আর বেজোড় বলতে সাত দোজখ, ৪. জোড় বলতে সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলি, যেমন– ভালো-মন্দ, সবল-দুর্বল, ধনী-দরিদ্র, জীবন-মৃত্যু, বিদ্বান-মূর্খ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি গুণই বিপরীত গুণের সাথে জোড়া গাঁথা। আর বেজোড় বলতে আল্লাহ তা'আলার একক গুণাবলির কথা বুঝানো হয়েছে। ৫. হযরত আতা (র.) বলেন, اَلْوَتْرِ দ্বারা ঈদুল আযহার রাত এবং شَفْعٌ দ্বারা আরাফার দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ৬. ইবনে যোবায়ের (রা.) -এর মতে فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ আয়াতের মধ্যে যে, দু'দিনের উল্লেখ রয়েছে شَفْعٌ হলো সে দু'দিন, এরপর وَمَنْ تَاَخَّرَ বলে যে, এক দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা হলো اَلْوَتْرِ। –[নূরুল কোরআন, খাযেন]

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য : অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে– وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট রাত উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ রাত উদ্দেশ্য। কেননা অন্য আয়াতে আছে وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ – وَالَّيْلِ اِذَا اَسْفَرَ যেহেতু আল্লাহর নিয়ামত রাত ও দিনের পরিক্রমার মাধ্যমে আসে। আর রাত ও দিনের মার্যাদা সৃষ্টজীবের নিকট অত্যন্ত বেশি। এ কারণেই এটা দ্বারা শপথ করা সহীহ হয়েছে।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, উক্ত لَيْل দ্বারা মুযদালিফার রাত উদ্দেশ্য। কেননা ঐ রাতের প্রথম ভাগে আরাফাহ হতে মুযদালিফা আসা হয়, এ কারণে اِذَا يَسْرِ বলা হয়েছে। –[কাবীর]

অনুবাদ :

٦. أَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ .

৬. তুমি কি দেখনি? জান না হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক কি আচরণ করেছেন 'আদ সম্প্রদায়ের সাথে?

٧. إِرَمَ هِيَ عَادُ الْأُولٰى فَإِرَمَ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ وَمُنِعَ الصَّرْفَ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيْثِ ذَاتِ الْعِمَادِ أَيِ الطُّوْلِ كَانَ طُوْلُ الطَّوِيْلِ مِنْهُمْ أَرْبَعَ مِائَةِ ذِرَاعٍ .

৭. ইরাম গোত্রের প্রতি এটা প্রথম 'আদ সম্প্রদায়। সুতরাং إِرَمَ শব্দটি عَطْف بَيَانٌ অথবা بَدَلٌ শব্দটি عَلَمِيَّتْ ও تَانِيْث-এর কারণে غَيْر مُنْصَرِفْ যারা ছিল স্তম্ভাকৃতির অর্থাৎ দীর্ঘকায়, তাদের মধ্যে দীর্ঘতম ব্যক্তির দৈর্ঘ্য ছিল চারশত গজ।

٨. الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ فِيْ بَطْشِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ .

৮. যার সমতুল্য কোনো দেশে সৃষ্টি হয়নি। তাদের শক্তি-সামর্থ্য বিচারে।

٩. وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا قَطَعُوا الصَّخْرَ جَمْعُ صَخْرَةٍ وَاتَّخَذُوْهَا بُيُوْتًا بِالْوَادِ وَادِي الْقُرٰى .

৯. আর সামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা কর্তন করেছে কেটেছে প্রস্তররাজি صَخْر শব্দটি صَخْرَةٌ -এর বহুবচন, তা দ্বারা তারা গৃহনির্মাণ করেছে। উপত্যকায় ওয়াদিউল কোরা নামক উপত্যকায়।

١٠. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ كَانَ يَتِدُ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ يَشُدُّ إِلَيْهَا يَدَيْ وَ رِجْلَيْ مَنْ يُعَذِّبُهُ .

১০. আর কীলকের অধিকারী ফিরআউনের প্রতি যে প্রতিপক্ষকে শাস্তি দানের সময় উভয় হাত ও উভয় পায়ে চারটি পেরেক বিদ্ধ করে নিত।

١١. الَّذِيْنَ طَغَوْا تَجَبَّرُوْا فِي الْبِلَادِ .

১১. যারা জুলুম-অত্যাচার চালু করে রেখেছিল ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল দেশসমূহে।

١٢. فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ الْقَتْلَ وَغَيْرَهُ .

১২. তারা তথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল হত্যা ইত্যাদি।

١٣. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ نَوْعَ عَذَابٍ .

১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর বিশেষ ধরনের শাস্তির কশাঘাত হানলেন,

١٤. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ يَرْصُدُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ فَلَا يَفُوْتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَيْهَا .

১৪. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন বান্দার আমলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, ফলে কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আর তিনি তাদেরকে এজন্য প্রতিদান-প্রতিফল দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী الَّذِيْنَ طَغَوْا-এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে :

ক. الَّذِيْنَ طَغَوْا এটা مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা উহ্য মুবতাদার খবর হবে। মূলত বাক্যটি হবে- هُمُ الَّذِيْنَ طَغَوْا ।

খ. অথবা, এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা ذَمَّ হবে।

গ. অথবা, এটা مَحَلًّا مَجْرُوْر হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা فِرْعَوْنَ .... ثَمُوْدَ .... عَاد " হতে صِفَةٌ হয়েছে। কাজেই مَوْصُوْف মাজরূর হওয়াতে صِفَةٌ ও مَجْرُوْر হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বস্তুর শপথ করে বলেছেন যে, মক্কার কাফিরদের জন্য আজাব অবধারিত। এখানে এমন কতিপয় জাতির উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের মক্কার কাফিরদের ন্যায় কুফর ও শিরকের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার দরুণ ইতিপূর্বে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ-এর অর্থ : اَلَمْ تَرَ-এর শাব্দিক অর্থ হলো-তুমি কি দেখনি? কিন্তু আয়াতে দেখার অর্থ হবে না, বরং এর অর্থ হবে اَلَمْ تَعْلَمْ অর্থাৎ তুমি কি জান না? কেননা, পরবর্তী আলোচনা যে সম্প্রদায়সমূহের ব্যাপারে হচ্ছে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেননি; বরং ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন। –[কাবীর]

اَلَمْ تَعْلَمْ না বলে اَلَمْ تَرَ বলার কারণ : মূলত এখানে اَلَمْ تَعْلَمْ-এর স্থলে اَلَمْ تَرَ বলা হয়েছে। কেননা 'আদ, ছামূদ এবং ফিরআউনের সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট خَبَر مُتَوَاتِرْ তথা ধারাবাহিক খবরের মাধ্যমে এসেছে। এ ছাড়া আদ এবং ছামূদ সম্প্রদায় আরব ভূমিতেই ছিল। আর ফিরাউনের রাষ্ট্র আরব ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। خَبَرُ التَّوَاتُرِ বা ধারাবাহিক খবর عِلْم ضَرُوْرِيْ তথা অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের ফায়দা দেয়। আর عِلْم ضَرُوْرِيْ বা অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানশক্তি এবং সন্দেহমুক্ত হিসাবে رُؤْيَةٌ বা দেখার সমকক্ষ। এ কারণেই اَلَمْ تَعْلَمْ না বলে اَلَمْ تَرَ বলা হয়েছে। –[কাবীর]

আদ জাতির ঘটনা : 'আদ সম্প্রদায়, 'আদ এবং এরাম উভয় নামেই পরিচিত ছিল। কারণ এ সম্প্রদায়ের এক উর্ধ্বতন পুরুষের নাম ছিল 'আদ। আর 'আদের পিতামহ ছিল এরাম। কুরআনে এদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিকদের মতে এ জাতি হযরত ঈসা (আ.)-এর দুই হাজার বৎসর পূর্বে আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করত। 'আদ জাতি প্রাচীন আরবের একটি গোত্র অথবা হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র শাম-এর বংশধর। প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়কে 'আদে এরামও বলা হতো। কারণ শামের পুত্র এরামের নামানুসারে তারা এ নামে পরিচিত হয়েছিল। তৎকালীন পৃথিবীতে তাদের মতো উন্নত ও শক্তিশালী আর কোনো জাতি ছিল না। এরা অবয়বের দিক দিয়ে অত্যন্ত বৃহদাকার এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ গজের মতো লম্বা ছিল। কথিত আছে যে, তাদের একজন একবারেই একটি উটের মাংস ভক্ষণ করত। এরা ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। উঁচুস্তম্ভের উপর ছাদ বিশিষ্ট ইমারত তারাই পৃথিবীতে প্রথম নির্মাণ করেছিল। কারো মতে, কুরআনে 'যাতুল ইমাদ' বলে এ জন্যই তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে।

পথভ্রষ্ট 'আদ জাতিকে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত হূদ (আ.)-কে তাদের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। হযরত হূদ (আ.) তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান করলেন। ইহ এবং পরকালে আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করলেন; কিন্তু দুর্বৃত্ত 'আদ জাতি নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং নিজেদের শক্তি ও সম্পদের গর্বে হযরত হূদ (আ.)-কে আজাব এনে দেখাতে বলল। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাদের উপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ রাখলেন। ফলে দেশময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

তৎকালীন আরবের মধ্যে একটা প্রথা ছিল যে, কোনো বিপদ-আপদ দেখা দিলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মক্কায় আল্লাহর ঘরের নিকট হাজির হয়ে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করত অথবা কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে এক দল লোক পাঠাত, তারা প্রতিনিধি হিসেবে কা'বা ঘরের কাছে সমবেত হয়ে সকলের জন্য প্রার্থনা করত। ফলে সকলেই বিপদমুক্ত হতো।

আদ জাতির লোকগণও অনাবৃষ্টিজনিত বিপদ মুক্তির জন্য তাদের প্রাচীন রেওয়াজ মতো ফায়ীল ইবনে আনয-এর নেতৃত্বে সত্তর জন লোকের একটি কাফেলা মক্কার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার জন্য পাঠাল। তারা কা'বা ঘরের নিকটে উপস্থিত হয়ে কা'বা ঘরের সেবক

মুয়াবিয়া ইবনে বকরের বাড়িতে অতিথি হলো এবং পরদিন কা'বার কাছে গমন করে কাকুতি-মিনতি করে বৃষ্টি প্রার্থনা করল তখনই আকাশে তিন খণ্ড মেঘ দেখা দিল; সাদা, কালো ও লাল তিন রঙের তিন খণ্ড। আর অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল, ক্বাইল এদের মধ্যে যে খণ্ড চাও গ্রহণ করতে পার। আনন্দে আটখানা হয়ে ক্বাইল বেশি পানির আশায় কালো মেঘ খণ্ডকে পছন্দ করল মেঘ খণ্ডটি ইয়ামেনের আহকাফ এলাকায় 'আদ জাতির বসতির উপর গিয়ে থামল। এটা ছিল গজবের মেঘ। সর্ব প্রথম মেহদ নাম্নী এক মহিলা আগুনের লেলিহান শিখা দেখে চিৎকার দিয়ে বলল- হে লোকেরা! তোমরা হুদের প্রতি ঈমান আনো, নতুবা তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আগুন সংকেতের পর-পরই তাদের উপরে প্রবল ঘূর্ণিঝড় শুরু হলো। অনবরত সাত রাত আট দিনের ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে 'আদ জাতির বেঈমান লোকেরা এবং তাদের লোকালয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো; কিন্তু আল্লাহর অসীম দয়ায় হযরত হুদ (আ.) তাঁর মু'মিন সঙ্গীগণসহ সুস্থ ও অক্ষত থাকলেন, তাঁদের কোনো ক্ষতি হলো না। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা জালিম ও পাপাচারী জাতিকে ধ্বংস করে থাকেন।

ছামূদ জাতির ঘটনা : ছামূদ জাতি ছিল আরবের প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে অন্যতম। 'আদ জাতির পরই ছিল তাদের স্থান এরা ছিল হযরত নূহ (আ.) -এর অধঃস্তন পুরুষ ছামূদের বংশধর। ছামূদ-এর নামেই উক্ত জাতির নামকরণ করা হয়েছে। উত্তর পশ্চিম আরবের আল-হাজার নামক স্থানে ছিল তাদের বসতি। তথায় এখনও তাদের ধ্বংস স্তূপের নিদর্শনাবলি বিদ্যমান রয়েছে পাহাড় খোদাই করে তারা তাদের গৃহনির্মাণ করেছে। উক্ত নিদর্শনাবলি হতে অনুমান করা যায় যে, এক কালে এটা লক্ষ-লক্ষ লোকের কোলাহলে মুখরিত ছিল।

তারাও এক আল্লাহর ইবাদত ভুলে শিরক, মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদেরকে হেদায়েত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরই ভাই হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী করে পাঠালেন। সালেহ (আ.) তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। মূর্তি-পূজা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। বহুদিন দাওয়াত দেওয়ার পর অধিকাংশ দরিদ্র লোকই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা কোনোমতেই ঈমান আনল না। তাঁরা হযরত সালেহ (আ.) -এর নিকট মু'জিযা তলব করল তারা হযরত সালেহ (আ.)-কে একটি পাথর দেখিয়ে বলল, এটা হতে একটি উষ্ট্রী বের করতে পারলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। হযরত সালেহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানানোর পর উক্ত প্রস্তর খণ্ড হতে আল্লাহর হুকুমে একটি উষ্ট্রী বের হয়ে আসল। হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, কোনো অবস্থাতেই যেন তারা উক্ত উষ্ট্রীর সাথে দুর্ব্যবহার না করে। কেননা এর সাথে খারাপ আচরণ করলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ মু'জিযা দেখে এক দিনেই চার হাজার লোক ঈমান আনল। কিন্তু পরবর্তীতে কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের প্ররোচনায় তারা মুরতাদ হয়ে গেল।

কাফেররা উক্ত উটনীকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। এক ব্যক্তিকে এ কাজ সমাধা করার জন্য তারা নিযুক্ত করল। লোকটি অত্যন্ত শোচনীয় ও নির্মমভাবে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল। আল্লাহ তা'আলা তাদেকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহর আদেশে হযরত সালেহ (আ.) তার অনুসারীদেরকে তিন দিনের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। মু'মিনগণ মক্কায় এসে বসতি স্থাপন করলেন। ওদিকে ছামূদ জাতিকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিলেন। তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এক শুক্রবারে তাদের সকলের চেহারা হলুদ বর্ণ, দ্বিতীয় শুক্রবারে লাল বর্ণ এবং তৃতীয় শুক্রবারে কালো বর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ.) এক বিকট ধ্বনি দিলেন-যাতে তারা সাকলেই হৃৎপিণ্ড ফেটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আজো তাদের বিরান আবাসে ধ্বংসস্তূপের নিদর্শন বিদ্যমান ।

فِرْعَوْن-এর ঘটনা : প্রাচীনকালে মিশরের রাষ্ট্র প্রধান বা রাজাকে বলা হতো ফেরআউন। ফেরআউন (فِرْعَوْن) শব্দের অর্থ হলো- দেবতার সন্তান। হযরত মূসা (আ.) -এর সময়কার মিশরের ফেরআউনের নাম ছিল ওলীদ ইবনে মাসআব ইবনে রাইয়ান। রাইয়ান হিসাবেই সে পরিচিত ছিল। সে নিজেকে 'রাব্বুল আ'লা' বা পরমেশ্বর বলে দাবি করত। মিশরে সে ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষত সে ও তার সঙ্গী-সাথীরা বনূ ইসরাঈলের উপর সীমাহীন নির্যাতন করত।

আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার দল-বলকে হেদায়েত করার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.) -এর জন্মের কিছু দিন পূর্বে ফেরাউন স্বপ্নযোগে দেখতে পেল যে, বনূ ইসরাঈল হতে একটি আগুনের শিখা উত্থিত হয়ে তার রাজ সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসল এবং একে ভস্ম করে দিল। তিনি জ্যোতিষীদেরকে ডেকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, অচিরেই বনূ ইসরাঈলে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে আপনার সিংহাসন ধ্বংস হবে। আপনার রাজত্বের

অবসান ঘটবে। এটা শুনে ফেরাউন বনূ ইসরাঈলীদের গর্ভধারণ নিষিদ্ধ করে দেয় এবং সমস্ত নবজাতককে হত্যার নির্দেশ দেয়। হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করার পরপরই তাঁর মাতা তাঁকে একটি বাক্সে ভরে নীল নদীতে ফেলে দেন। বাক্সটি ফেরাউন পত্নী আসিয়ার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি একে উঠিয়ে নিয়ে হযরত মূসা (আ.) -এর লাল-পালনের দায়িত্ব নেন। ফেরআউনের ঘরেই হযরত মূসা (আ.) লালিত-পালিত হয়ে বয়স প্রাপ্ত হন।

একবার এক জালিম কুর্দীকে হত্যার কারণে ফেরআউন ও তার পরিষদ হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। হযরত মূসা (আ.) মিশর হতে পালিয়ে মাদায়েন চলে যান। তথায় হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর এক কন্যাকে বিবাহ করেন। দীর্ঘ আট বছর পর তিনি সস্ত্রীক মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি তূর পাহাড়ে আল্লাহর পক্ষ হতে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দু'টি বিশেষ মুজিযা, লাঠি ও يَدِ بَيْضَاء [শুভ্র হাত] দান করেন এবং ফেরাউনকে হেদায়েত করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি ফিরআউনকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং নবুয়ত প্রমাণের জন্য মু'জিজা প্রদর্শন করেন। ফেরাউন ও তার দলের লোকেরা মু'জিযাকে জাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে। নির্দিষ্ট দিনে ফেরাউনের ভাড়াটে জাদুকরদের সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা হয়। জাদুকররা পরাস্ত হয়ে ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু ফেরআউন ও তার দলের লোকেরা ঈমান আনয়নে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর পর পর অনেকগুলো আজাব নাজিল করেন। যেমন– ক. দুর্ভিক্ষ, খ. পঙ্গপাল, গ. উকুন, ঘ. ব্যাঙ, ঙ. রক্ত ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের আজাব দেওয়া হয়। আজাব আসার পর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট দোয়ার জন্য ধরনা দেয় এবং ঈমান আনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু আজাব চলে যাওয়ার পর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চরম শাস্তি দেওয়ার মনস্থ করলেন। হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, গভীর রাতে তিনি যেন তাঁর অনুসারীগণসহ মিশর ত্যাগ করে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ.) যখন তার অনুগামীগণসহ মিশর ত্যাগ করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন ফেরআউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদেরকে পিছন হতে ধাওয়া করল। নীল নদের তীরে এসে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় হাতের লাঠি নদীতে ফেলে দিলেন। পানির মধ্যে বারোটি রাস্তা হয়ে গেল। বনূ ইসরাঈলের বারোটি গোত্র উক্ত বারোটি রাস্তা দিয়ে পর হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যরা যখন অলৌকিক পথে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের অনুসরণ করে মাঝ নদীতে গিয়ে উপস্থিত হলো তখন চারিদিক হতে অথৈ পানি এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। অবশ্য সে মুহূর্তে ফেরাউন ঈমান এনেছিল, তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি।

'এরাম' কি? : কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এরাম বলতে 'আদ সম্প্রদায়ের ঐ অংশকে বুঝায় যাদের পূর্ব পুরুষ এরাম নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। 'আদ সম্প্রদায় এরামের বংশধর বলে তাদেরকে কাওমে এরামও বলা হতো। এরাম হযরত নূহ (আ.)-এর পৌত্র এবং সামের পুত্র ছিল। এরামের পুত্রের নাম ছিল আবের, আর আবেরের পুত্র ছিল ছামূদ। ছামূদের নামানুসার এ সম্প্রদায়কে কাওমে ছামূদ বলা হতো। এরামের অপর পুত্র আওস -এর সন্তান ছিল 'আদ। 'আদের বংশধরদেরকে বলা হতো কওমে 'আদ। কাওমে 'আদ ও কাওমে ছামূদ উভয় গোত্রই আছে এরাম-এর অন্তর্ভুক্ত। 'আদ সম্প্রদায়ের আবার দু'টি অংশ রয়েছে– প্রাচীন 'আদ ও নবীন 'আদ। কুরআনে 'আদ-এর নাম উচ্চারণের পর 'এরাম'-এর উল্লেখ দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়ই এস্থলে আলোচনার লক্ষ্যস্থল। কারণ এরাম ও প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়ের মধ্যকার ব্যবধান নবীন 'আদ সম্প্রদায়ের তুলনায় সামান্য হওয়াতেই প্রাচীন 'আদকেই 'আদে এরাম নামে অভিহিত করা হতো। –[রূহুল মা'আনী, বয়ান, খাযেন, হোসাইনী]

ذَاتِ الْعِمَادِ-এর অর্থ : এরাম জাতির পরিচিতি দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ذَاتِ الْعِمَادِ তথা খুঁটি বিশিষ্ট বলেছেন, এর কারণ নিম্নরূপ–

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তাদের দৈহিক কাঠামে খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ এবং মজবুত ছিল, তাই ذَاتِ الْعِمَادِ বলা হয়েছে।

২. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা আকাশ চুম্বি ইমারতের অধিকারী ছিল। অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং মজবুত খুঁটির উপর তা স্থাপন করা হতো। –[নূরুল কোরআন]

ذُو الْأَوْتَادِ-এর অর্থ কি? এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : ذُو অর্থ– ওয়ালা, অধিকারী ইত্যাদি। আর أَوْتَادْ শব্দটি وَتَدٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ খুঁটি বা লোহার পেরেক, লৌহ শলাকা। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ফেরআউনের পরিচয় স্বরূপ 'যুল আওতাদ' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। এর সহজ অর্থ দাঁড়ায় লৌহ শলাকাধারী। এখানে ফেরআউনকে কেন লৌহ শলাকাধারী বলা হয়েছে–মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন।

ক. ফেরাউনের সৈন্যদেরকে এখানে লৌহ শলাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লৌহ শলাকার দ্বারা তাঁবু যেমন সুদৃঢ় থাকে ফেরাউন তার সৈন্যদের দ্বারা ঠিক তদ্রূপ নিজ সাম্রাজ্যকে মজবুত রেখেছিল।

খ. এর দ্বারা ফেরাউনের সেনাবাহিনীর বিপুলতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, তার সেনাবাহিনী যেখানেই অবস্থান করত তথায় চতুর্দিকে তাঁবুর লৌহ শলাকাগুলি দৃষ্টিগোচর হতো।

গ. অথবা ফেরাউন যাদেরকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করত তাদেরকে লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করে শাস্তি দিত। এ কারণে তাকে "লৌহ শলাকাধারী" বলা হয়েছে।

ঘ. অথবা, মিশরের পিরামিডকে লৌহ পেরেকের সাথে তুলনা করেও এটা বলা হতে পারে-যা হাজার হাজার বছর ধরে মিশরীয় ফেরাউন শাসকদের সৌর্যবীর্যের স্বাক্ষর বহন করে।

ফেরাউন যেসব মহিলাকে পেরেক দ্বারা শাস্তি প্রদান করেছিল : ফেরআউনের শাসনামলে এক মহিলা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। সে ছিল ফেরাউনের কোষাধ্যক্ষ হেযকীল-এর স্ত্রী। বল্যবাহুল্য, হেযকীলও গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন এবং প্রায় একশত বছর তাঁর ঈমানদার হওয়ার ঘটনা গোপন করে রেখেছিলেন। হেযকীলের পত্নী ফেরাউনের কন্যার মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। একদা চুল আঁচড়ানোর সময় তাঁর হাত হতে চিরুণি মাটিতে পড়ে যায়। আর নিজ অভ্যাস বশত বলে ফেলেন 'কাফের ধ্বংস হোক'। এতদশ্রবণে ফেরআউনের তনয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করল– তুমি কি আমার বাবাকে প্রভু বলে মান না? জবাবে হেযকীল স্ত্রী বলল, না। আমার প্রভু, তোমার বাবার প্রভু এবং আসমান ও জমিনের প্রভু সে তো এক আল্লাহ। তাঁর কোনো শরিক-সমকক্ষ নেই। ফেরাউনের কন্যা এ ঘটনা সবিস্তারে ফেরাউনের কাছে বলল। ফেরআউন লোক পাঠিয়ে ঘটনার সত্যতা পরীক্ষা করল। অতঃপর হেযকীলের স্ত্রীকে গ্রেফতার করে এনে একমাত্র ফেরাউনকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করতে আদেশ করল এবং আল্লাহকে অস্বীকার করতে বলল।

এ আদেশে সে অসম্মতি জানালে ফেরাউন তাঁর হস্তপদে চারটি লোহার প্রেরেক বিদ্ধ করে আটক করে রাখল এবং সাপ ও বিচ্ছু দংশনের জন্য অগণিত সাপ-বিচ্ছু তাঁর উপরে ছেড়ে দিল। আর বলল, যদি আল্লাহকে অস্বীকার না কর, তবে এভাবে দু' মাস যাবৎ শাস্তি দিতে থাকবো। হেযকীল পত্নী বলল, তুমি আমাকে সত্তর মাস শাস্তি দিলেও আমি আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারবো না। এতে ফেরাউন আরও চটে গিয়ে হেযকীলের দুই কন্যাকে ধরে আনল। মায়ের চোখের সম্মুখে বড় মেয়েটির হৃদপিণ্ড কেটে ফেলল এবং বলল, যদি আল্লাহকে অস্বীকার না কর তাহলে ছোট শিশুটিকেও হত্যা করবো। এতেও সে নিজ ঈমানে অবিচল থাকল। যখন ছোট শিশুকে হত্যা করার মানসে তার বুকের উপর পা রাখল এবং জবাই করার মনস্থ করল তখন স্নেহশীলা মা অস্থির হয়ে পড়লেন। এমন সময় অলৌকিকভাবে শিশু কথা বলে উঠল। শিশুটি বলল, জননী! জান্নাত আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, ধৈর্যধারণ করুন, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী শীঘ্রই পাবেন। পৃথিবীতে যে চারজন দুধের শিশু (দোলনায়) কথা বলেছিল এ শিশুটি তাদের অন্যতম। তবু পাপিষ্ঠ ফেরআউন শিশুটিকে হত্যা করল। হেযকীল পত্নীও জান্নাতবাসিনী হলেন। অতঃপর ফেরআউন হেযকীলের সন্ধানে লোক পাঠাল। হেযকীল কোথায় আছে কেউ বলতে পারল না। অবশেষে এক ব্যক্তি কোনো এক পাহাড়ে তাঁকে দেখছে বলে জানালে ফেরআউন দুই ব্যক্তিকে তথায় পাঠাল। অনুচরদ্বয় হেযকীলকে তন্ময়ভাবে নামাজে রত দেখল। আর দেখল, তাঁর পিছনে হিংস্র-জীবকুল তিন সারিতে নামাজে রত রয়েছে। নামাজ শেষে হেযকীল প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, একশত বছর যাবৎ তোমার উপর ঈমান এনেছি, আর তা গোপন রেখেছি। আজ বোধ হয় আর গোপন থাকবে না। এ দুই ব্যক্তির মধ্যে যে আমার বিষয়ে গোপন রাখবে তাকে তুমি দয়া কর, আর যে প্রকাশ করবে তাকে শাস্তি দাও। অনুচরদের একজন এ সকল ঘটনা দর্শনে অভিভূত হলো ও ইসলাম গ্রহণ করল এবং সে হেযকীলের বিষয়টি গোপন করতে চাইল। অপর ব্যক্তি ফেরআউনের দরবারে গিয়ে সকল ঘটনা ফাঁস করল। ফেরআউন প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ঘটনার সাক্ষ্য হিসাবে জিজ্ঞাসাবাদ করল। প্রথম ব্যক্তি অস্বীকার করল। ক্রুদ্ধ ফেরাউন ঘটনা বর্ণনাকারী ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী মনে করে শূলে চড়াল এবং হত্যা করল, আর প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে বখশিশ প্রদান করল। শূলে চড়ানোকে কেন্দ্র করেও ফেরআউনকে 'যুল আওতাদ' বলা হতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বর্ণনা করেন যে, ফেরাউন বনী ইসরাঈলের আমালিকা গোত্রের এক মহিলার পাণি গ্রহণ করে। তাঁর নাম ছিল আসিয়া বিনতে মুযাহিম। আসিয়া গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন। ফেরাউন হেযকীলের স্ত্রীর সাথে যা কিছু আচরণ করেছে তা প্রত্যক্ষ করে আসিয়া মর্মাহত হলেন। নিজে ঈমানদার বিধায় হেযকীল পত্নীর জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। এ সময় আসিয়ার কক্ষে ফেরাউন প্রবেশ করে তাঁর কাছাকাছি বসলে আসিয়া বললেন–হে ফেরআউন! তুমি তো নরাধম নিষ্ঠুর। এ

নির্দয়ভাবে হেযকীল পত্নী ও সন্তানদেরকে হত্যা করলে? তখন ফেরআউন ভাবল আসিয়ার মাথা খারাপ হয়েছে। সে আসিয়ার বাবা ও মাকে খবর দিয়ে আনল। হযরত আসিয়ার মা ও বাবা তাঁকে বুঝাল যে, পাগলামি ভালো নয়। তুমি তো আমালিকা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মেয়ে, আর তোমার স্বামী আমালিকাদের প্রভু। হযরত আসিয়া বললেন– আমি এ অপচিন্তা হতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার, ফেরাউনের এবং আসমান ও জমিনের প্রভু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কোনো শরিক নেই। অতঃপর ফেরাউন হযরত আসিয়ার উপরে নির্মম অত্যাচার করল। তাঁর হাতে ও পায়ে লোহার শলাকা বিদ্ধ করে ফেলে রাখাল। হযরত আসিয়া আল্লাহর দরবারে ফেরাউনের হাত হতে মুক্তি প্রার্থনা করল– رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ –[সূরা তাহরীম]

অতঃপর ফেরআউনের চরম অত্যাচারের মধ্যে হযরত আসিয়া জান্নতবাসিনী হলেন। হযরত আসিয়া (রা.)-কে পেরেক বিদ্ধ করার কারণেও ফেরাউনকে 'যিল আওতাদ' বলা হতে পারে। –[খাযেন]

مِرْصَادٌ-এর অর্থ : مِرْصَادٌ শব্দটি رَصْد হতে مِفْعَالٌ-এর ওজনে ইসমে আলার সীগাহ, অর্থ ঘাঁটি বা مِيْم অক্ষরটি مَصْدَرْ-এর জন্য হয়েছে। তখন অর্থ হবে– ঘাঁটিতে প্রতীক্ষা করা।

এখানে অত্যাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাকে বুঝাবার জন্য ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে বসার কথা বলা হয়েছে। এটা শব্দ কয়টির ইঙ্গিতমূলক ব্যবহার। ঘাঁটি বলে এমন গোপন স্থানকে বুঝানো হয়েছে যেখানে কোনো লোক কারো অপেক্ষায় আত্মগোপন করে বসে থাকে– এ উদ্দেশ্যে যে, সে লোকটি যখনই সেখানে আসবে তখনই অতর্কিত তার উপর হামলা করবে। এ অবস্থায় যার উপর হামলা করার ইচ্ছা থাকে সে কিছুই জানতে পারে না। সে টেরই পায় না যে, তার উপর আকস্মিক আক্রমণ করা হতে পারে। সে পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত ও অসতর্ক হয়ে সে স্থান অতিক্রম করতে যায় এবং সহজেই শিকার হয়ে বসে। দুনিয়াতে যারা অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের এরূপ অবস্থাই হয়ে থাকে। আল্লাহ যে আছেন এবং তাদের কার্যকলাপ ও গতিবিধির উপর তিনি দৃষ্টি রাখছেন, সে কথা তাদের মোটেই মনে থাকে না। তারা নির্ভীক চিত্তে অন্যায়-অত্যাচার করতে থাকে। আর এমতাবস্থায় অতি আকস্মিকভাবে আল্লাহ তা'আলার আজাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিতে শুরু করে।

وَالْفَجْرِ .... الخ-এর মধ্যস্থিত শপথের জাওয়াব কি? : আল্লাহর বাণী وَالْفَجْرِ এর জাওয়াব কি এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে দ্বিমত পাওয়া যায়।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো "لَتُعَذَّبُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ" হে মক্কাবাসী কাফেররা! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আজাব দেওয়া হবে। খ. আল্লামা যমখশরী (র.)-এর মতে উহ্য جَوَابِ قَسَم টি হলো "لَنُعَذِّبَنَّ الْكَافِرِيْنَ" অর্থাৎ অবশ্যই আমি কাফেরদেরকে আজাব দিব। গ. কারো কারো মতে, উহ্য جَوَابِ قَسَم হলো "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ" অর্থাৎ অবশ্যই আপনার প্রভু ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান আছেন।

لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ-এর মধ্যে مِثْلُهَا-এর مَرْجِعْ কি? : আল্লাহর বাণী لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا-এর মধ্যস্থিত مِثْلُهَا-এর যমীরের مَرْجِعْ কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

ক. هَا যমীরের مَرْجِعْ পূর্ববর্তী عَاد (শব্দটি), এমতাবস্থায় মূলবাক্য হবে لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُ عَادٍ فِي الْبِلَادِ অর্থাৎ 'আদ জাতির ন্যায় শক্তিশালী জাতি [সমকালীন] পৃথিবীতে আর সৃষ্টি করা হয়নি।

খ. অথবা, هَا যমীরটি مَدِيْنَة-এর দিকে ফিরেছে। মূলত বাক্যটি হবে– لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُ مَدِيْنَةِ شَدَّادٍ فِيْ جَمِيْعِ الْبِلَادِ অর্থাৎ সাদ্দাদের শহরের ন্যায় অন্য কোনো শহর পৃথিবীতে তৈরি হয়নি।

গ. অথবা, উক্ত هَا যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْعِمَادُ মূলত বাক্যটি হবে– لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُ تِلْكَ الْعِمَادِ فِي الْبِلَادِ অর্থাৎ বিশ্বে উক্ত ইমারতসমূহের ন্যায় অন্য কোনো ইমারত তৈরি হয়নি।

অনুবাদ :

١٥. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ الْكَافِرُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ اِخْتَبَرَهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ بِالْمَالِ وَغَيْرِهٖ وَنَعَّمَهُ لا فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ـ

১৫. মানুষ তো কাফেরগণ এরূপ যে, যখন তাকে পরীক্ষা করেন যাচাই করেন তার প্রতিপালক সম্মানিত করে ধন-সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা ও অনুগ্রহ করে, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন

١٦. وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ لا فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ ـ

১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তৎপ্রতি পরিমিত করে সংকীর্ণ করে তার উপর জীবিকা। তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপমান করেছেন।

١٧. كَلَّا رَدْعٌ اَىْ لَيْسَ الْاِكْرَامُ بِالْغِنٰى وَالْاِهَانَةُ بِالْفَقْرِ وَاِنَّمَا هُمَا بِالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَكُفَّارُ مَكَّةَ لَا يَتَنَبَّهُوْنَ لِذٰلِكَ بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ لَا يُحْسِنُوْنَ اِلَيْهِ مَعَ غِنَاهُمْ اَوْ لَا يُعْطُوْنَهُ حَقَّهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ ـ

১৭. না, কখনো নয় এটা শাসানো উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সম্মানিত করা ধনাঢ্যতা দ্বারা কিংবা অপদস্থ করা দারিদ্র্য দ্বারা নয়; বরং এগুলো আনুগত্য ও অবাধ্যতা দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। আর মক্কাবাসী কাফেরগণ এ বিষয়ে সচেতন নয়। বস্তুত তোমরা এতিমকে সম্মান করো না তাদের ধনাঢ্যতা সত্ত্বেও তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে না। অথবা মিরাস হতে তার হক প্রদান করে না।

١٨. وَلَا تَحٰضُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَلَا غَيْرَهُمْ عَلٰى طَعَامِ اِطْعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ

১৮. আর তারা পরস্পরে উৎসাহিত করে না নিজেকেও না এবং অন্যকেও না অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দানের ব্যাপারে طَعَام শব্দটি اِطْعَام অর্থে ব্যবহৃত।

١٩. وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ الْمِيْرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا اَىْ شَدِيْدًا لِلَمِّهِمْ نَصِيْبَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنَ الْمِيْرَاثِ مَعَ نَصِيْبِهِمْ مِنْهُ اَوْ مَعَ مَا لَهُمْ ـ

১৯. আর তোমরা ভক্ষণ কর উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। মিরাস সম্পদ সম্পূর্ণরূপে নিজ অংশের সাথে সকল মহিলা ও শিশুর হক সংমিশ্রিত করে আত্মসাৎ কর। অথবা নিজেরা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও এদের সম্পদের প্রতি লোভ কর।

٢٠. وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اَىْ كَثِيْرًا فَلَا يُنْفِقُوْنَهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ فِى الْاَفْعَالِ الْاَرْبَعَةِ ـ

২০. আর তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালোবাস তাই তা ব্যয় কর না। অপর এক কেরাতে فِعْل চতুষ্টয় تَ যোগে পঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

تُرَاثَ -এর মূল : تُرَاثَ শব্দটি মূলে وُرَاثَ ছিল। وَاو-কে تَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন– وُجَاهَ-কে تُجَاهَ করা হয়েছে। وَرِثَ - يَرِثُ - وِرْثًا অর্থ– উত্তরাধিকার হওয়া, পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হওয়া।

"جَمًّا"-এর অর্থ : جَمًّا শব্দটি বাবে نَصَرَ অথবা ضَرَبَ-এর মাসদার। অর্থ– অধিক বেশি, এটা সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য বস্তুর সাথে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দ হতে اَلْجَمَّةُ ব্যবহৃত হয়। অর্থ– যে স্থানে পানি একসাথ হয়। اَلْجُمُوْمُ বলা হয় অধিক পানি সম্বলিত কূপকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (রা.) বর্ণনা করেন, কুদামাহ ইবনে মাযউন নামক এক এতিম বালকের লালনপালনের ভার উমাইয়া ইবনে খালফের উপর অর্পিত হয়েছিল। উমাইয়া উক্ত এতিমকে ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করেছিল। অতঃপর كَلَّا بَلْ الخ আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

অথবা, কোনো কোনো তাফসীরকারের নিকট اِنْسَانُ দ্বারা সাধারণ কাফের বুঝিয়েছেন। কোনো কোনো মুফাসসির فَاَمَّا الْاِنْسَانُ الخ এটা উমাইয়া ইবনে খালফ-এর উদ্দেশ্যে বলেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَاَكْرَمَهُ : ইতঃপূর্বে পাপিষ্ঠ কাফেরদের কিছু কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে তাদের কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং মানুষের সাধারণ চারিত্রিক অবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের বিশেষত কাফেরদের জীবন দর্শন হলো সম্পূর্ণ দুনিয়ামুখি। তারা দুনিয়ার বর্তমান শান্তি ও কষ্টকেই সম্মান এবং অপমানের মাপকাঠি নির্ধারণ করে থাকে। তাদের জানা নেই যে, উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তাকে পরীক্ষা করে থাকেন। ধন-সম্পদ দান করে তার কৃতজ্ঞতার এবং বিপদ ও দারিদ্র্যে ফেলে তার ধৈর্যের পরীক্ষা করা হয়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরাম ও সুখ-সম্পদ আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল নয়। আবার এখানে অভাব-অনটন ও বিপদে থাকাও আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়ার লক্ষণ নয়; বরং আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানিই তার নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার মানদণ্ড। আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাজি আছেন। পক্ষান্তরে, যদি সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর ধন-সম্পদ পাওয়া না পাওয়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করেন মাত্র। সুতরাং যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা–মু'মিন তারা ধন-সম্পদ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে। আর যারা আল্লাহর নাফরমানি ও পাপকার্যে লিপ্ত রয়েছে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : اَلْاِنْسَانُ-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে।

১. اَلْاِنْسَانُ বলে নির্দিষ্ট দু'জন ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যেমন–হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, একজন হলো উতবা ইবনে রাবীয়া অন্যজন আবূ হুযাইফা ইবনে মুগীরা।
২. আয়াতে বর্ণিত বিশেষণে বিশেষিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই اَلْاِنْسَانُ বলে শামিল করা হয়েছে। অর্থাৎ সে হলো পরকালকে অবিশ্বাসকারী, প্রতিদান দিবস অস্বীকারকারী কাফের।

রিজিকের প্রশস্ততা ও সীমাবদ্ধতাকে পরীক্ষা বলার কারণ : মূলত অতিরিক্ত রিজিক প্রাপ্ত হওয়া এবং এতে সংকীর্ণ হওয়া উভয়টি-ই বান্দার জন্য পরীক্ষা। যখন তাকে বেশি রিজিক দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ চাচ্ছেন যে, সে কি এর শুকরিয়া আদায় করে, না কি নাফরমানি করে? আর যখন সংকীর্ণ রিজিক দেওয়া হয়, তখন তার অবস্থার পরীক্ষা এভাবে হয় যে, সে কি ধৈর্য ধারণ করে, না কি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অধৈর্য হয়ে যায়। এমনি ধরনের অন্য আয়াতে আছে– وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

আল্লাহ বান্দাকে মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু পরে তিরস্কারও করেছেন, উভয়টির মধ্যে সামঞ্জস্য কিভাবে হবে? : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে فَاَكْرَمَهُ বলেছেন, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি বান্দাকে মর্যাদাবান করেছেন। পরে যখন বান্দা বলল رَبِّيْ اَكْرَمَنِ অর্থাৎ আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছে, তখন আল্লাহ এ কথার উপর তাকে তিরস্কার করেছেন। এতে বিপরীতমুখি বক্তব্য বা আচরণের আভাস পাওয়া যায়। এ বৈপরীত্যের জবাব নিম্নরূপে দেওয়া যায়–

মূলত كَلَّا শব্দ দ্বারাই বিপরীত বক্তব্য বুঝা যায়। আমরা এ كَلَّا-কে رَبِّيْ اَهَانَنِ-এর সাথে খাস করেও তো দিতে পারি, তাহলে এ বৈপরীত্য কখনো থাকতে পারে না। হ্যাঁ, যদি رَبِّيْ اَكْرَمَنِ এবং رَبِّيْ اَهَانَنِ উভয়টির সাথে মিলানো হয়, তাহলে তার জবাব নিম্নরূপ হবে–

১. সম্ভবত رَبِّىٓ اَكْرَمَنِ বলে উক্ত ব্যক্তি কিছু পাওয়ার আশা করেছিল, তখন আল্লাহ তাকে তিরস্কার করেছেন।

২. মাল-সম্পদ পাওয়ার পূর্বেও তো ব্যক্তির জন্য অনেক নিয়ামত রয়েছে। যেমন–সুস্থ শরীর, সুস্থ মস্তিষ্ক, সাবলীল দেহ এবং ... ও মাল পাওয়ারর পূর্বেও নিয়ামতের শুকরিয়া করা দরকার ছিল। অতএব, যখন শুধু মাল পাওয়ার সময় رَبِّىٓ اَكْرَمَنِ বলে শুকরিয়া আদায় করেছে, এতে বুঝা যায় যে, নিয়ামতের শুকরিয়া করা তার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং দুনিয়াতে অধিক ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি হওয়াই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণেই তার তিরস্কার করা হয়েছে।

৩. দুনিয়ার নিয়ামতের প্রতি তীব্র মোহ এবং পরকালের নিয়ামত হতে বিমুখতা একথা প্রমাণ করে যে, সে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। অতএব, তিরস্কার পাওয়া তো দোষ নয়; বরং পাওনা-ই পেয়েছে। –[কাবীর]

এতিমকে সম্মান না দেওয়ার অর্থ : এতিমকে সম্মান না দেওয়ার অর্থ নিম্নরূপ–

১. তাকে দান না করা, তার প্রতি অনুগ্রহ না করা এবং অন্যাকে তার ব্যাপারে উৎসাহিত না করা। যেমন, আল্লাহ বলেন– وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

২. পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা এবং তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা। যেমন, বলা হয়েছে– وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا

৩. তার সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিলিয়ে আত্মসাৎ করা। –[কাবীর]

لَمًّا-এর অর্থ : لَمًّا শব্দটির অর্থ হলো– অধিক একত্র করা। বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। উক্ত শব্দটির তাফসীরে কয়েকটি মত উল্লেখ করা হয়েছে–

১. ওয়াহেদী এবং কতিপয় মুফাসসির বলেন–"اَكْلًا لَّمًّا" অর্থ– شَدِيْد শক্তভাবে অর্থাৎ বেশি খাওয়া। মূলত এটা বিশ্লেষণী অর্থ, তাফসীর নয়, তাফসীর হলো لَمًّ শব্দটি মাসদার اَكْلً শব্দের نَعْت হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, ইসমে ফায়েল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ "اَكْلًا لَّامًّا" ক্ষুধার্ত, মনে হয় যেন তারা ক্ষুধার্ত হলে সকল কিছু ভক্ষণ করে ফেলবে।

২. ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, তারা এতিমদের মাল মাত্রাধিক্যভাবে আত্মসাৎ করে বা খায়।

৩. মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছু হয় হালাল, কিছু হয় সন্দেহযুক্ত, আর কিছু হয় হারাম, অতঃপর তারা يَلُمُّ الْكُلَّ সকল কিছুকে মিলিয়ে একসাথ করে নেয় এবং খায়। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তারা অন্যের মিরাসী সম্পদ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে থাকে। তদানীন্তন আরব সমাজে নারী ও শিশুদেরকে মিরাস হতে বঞ্চিত করার এক সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে তাদের এক আশ্চর্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাদের ধারণা ছিল মিরাস পাওয়ার অধিকার তো শুধু সে পুরুষদেরই রয়েছে যারা লড়াই করার ও পরিবারবর্গের সংরক্ষণ কাজের যোগ্য হবে। তা ছাড়া মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক শক্তিশালী ও অধিক প্রভাবশালী সে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিত। আর যারা নিজেদের অংশ লাভের ক্ষমতা রাখত না তাদের ভাগের সব সম্পদ হরণ করে নিত। প্রকৃত হক, অধিকার ও কর্তব্যের কোনো মূল্য বা গুরুত্ব ছিল না তাদের দৃষ্টিতে। নিজের কর্তব্য মনে করে হকদারকে তার হক দেওয়া তা অর্জন করার কোনো শক্তি তার আছে কি নেই, সে দিকে কোনো দৃষ্টি না দিয়ে এরূপ করা তাদের মতে চরম বোকামি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ : ধন-সম্পদের মায়ায় তারা অত্যধিক কাতর। জায়েজ-নাজায়েজ ও হালাল-হারামের কোনো চিন্তা তাদের নেই। যেভাবে ও যে কোনো পন্থায়ই তারা সম্পত্তি করায়ত্ত করতে পারে, নির্বিচারে তারা তাই করে বসে। তা করতে তাদের মনে কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচ জাগে না। যতবেশি ধন-সম্পদই তাদের করায়ত্ত হোক না কেন তাদের অধিক পাওয়ার লোভ-লালসার আগুন নির্বাপিত হয় না।

আলোচ্য আয়াতে সম্পদের অত্যধিক মহব্বতের নিন্দা করা হয়েছে। এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, মালের স্বাভাবিক মহব্বত নিন্দনীয় নয়। মালের মহব্বতের কারণ যদি দীন-ঈমান বিনষ্ট না হয়; বরং মাল যদি দীনের কল্যাণের জন্য হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরঞ্চ প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে– نعم مال صالح گفتش رسول ٭ مال را گر بہر دین باشی حمول

অনুবাদ :

٢١. كَلَّا رَدْعٌ لَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا زُلْزِلَتْ حَتّٰى يَنْهَدِمَ كُلُّ بِنَاءٍ عَلَيْهَا وَيَنْعَدِمُ.

২১. না, এটা সঙ্গত নয় এটা তাদের প্রতি [illegible] উপরোল্লিখিত কারণে। যখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে প্রকম্পিত করা হবে, ফলে এর ইমারতরাজি ধ্বসে পড়বে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

٢٢. وَجَاءَ رَبُّكَ أَيْ أَمْرُهُ وَالْمَلَكُ أَيِ الْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا حَالٌ أَيْ مُصْطَفِّيْنَ أَوْ ذَوِيْ صُفُوْفٍ كَثِيْرَةٍ.

২২. আর যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন অর্থাৎ তাঁর আদেশ আগমন করবে আর ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধভাবে এটা حَالٌ রূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সারিবদ্ধ অবস্থায়, অথবা অনেক সারিতে বিভক্ত হয়ে।

٢٣. وَجِايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ لَا تُقَادُ بِسَبْعِيْنَ أَلْفِ زِمَامٍ كُلُّ زِمَامٍ بِأَيْدِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفِ مَلَكٍ لَهَا زَفِيْرٌ وَتَغَيُّظٌ يَوْمَئِذٍ بَدَلٌ مِنْ إِذَا وَجَوَابُهَا يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ أَيِ الْكَافِرُ مَا فَرَّطَ فِيْهِ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ أَيْ لَا يَنْفَعُهُ تَذَكُّرُهُ ذٰلِكَ.

২৩ আর সেদিন জাহান্নাম আনীত হবে সত্তর হাজার লাগামের সাহায্যে প্রত্যেক লাগাম সত্তর হাজার ফেরেশতা টেনে আনবে। তখন এটা আগুনের লেলিহান শিখা ছড়াতে থাকবে এবং শোঁ শোঁ শব্দ করতে থাকবে। সেদিন এটা إِذَا হতে بَدَلٌ আর এর জওয়াব হলো, মানুষ উপলব্ধি করবে অর্থাৎ কাফের, যা সে সীমালঙ্ঘন ও অপরাধ করেছে। কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? এখানে اِسْتِفْهَامٌ টি نَفِيْ অর্থে। অর্থাৎ তার এ উপলব্ধি কোনোই কাজে আসবে না।

٢٤. يَقُوْلُ مَعَ تَذَكُّرِهِ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ الْخَيْرَ وَالْإِيْمَانَ لِحَيَاتِيْ الطَّيِّبَةِ فِي الْأٰخِرَةِ أَوْ وَقْتَ حَيَاتِيْ فِي الدُّنْيَا.

২৪. সে বলবে এ উপলব্ধির সাথে হায়! يَا হরফে নেদাটি تَنْبِيْه-এর জন্য আমি যদি অগ্রিম পাঠাতাম সৎকর্ম ও ঈমান আমার এ জীবনের জন্য আখেরাতের স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের জন্য, অথবা দুনিয়াতে আমার জীবিত থাকা কালীন সময়।

٢٥. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ بِكَسْرِ الذَّالِ عَذَابَهُ أَيِ اللّٰهِ أَحَدٌ أَيْ لَا يَكِلُهُ إِلٰى غَيْرِهِ.

২৫. সেদিন শাস্তি দিতে পারবে না لَا يُعَذِّبُ শব্দটি ذَالٌ বর্ণ যের যোগে তাঁর ন্যায় শাস্তি দান অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অন্য কেউই অর্থাৎ তাকে অন্য কারো প্রতি সমর্পণ করা হবে না।

٢٦. وَكَذَا لَا يُوْثِقُ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الذَّالِ وَالثَّاءِ فَضَمِيْرُ عَذَابَهُ وَوَثَاقَهُ لِلْكَافِرِ وَالْمَعْنٰى لَا يُعَذَّبُ أَحَدٌ مِثْلَ تَعْذِيْبِهِ وَلَا يُوْثَقُ مِثْلَ إِيْثَاقِهِ.

২৬. আর অনুরূপ বন্ধন করতে পারবে না يُوْثِقُ শব্দটি ثَاءٌ বর্ণ যের যোগে তাঁর ন্যায় বন্ধন অন্য কেউই অপর এক কেরাতে ذَالٌ ও ثَاءٌ বর্ণ দু'টি যবর যোগে পঠিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে عَذَابَهُ ও وَثَاقَهُ-এর যমীর কাফেরের প্রতি ফিরবে। অর্থাৎ তার ন্যায় শাস্তি কেউ ভোগ করবে না এবং তার ন্যায় বন্ধনে আবদ্ধ কেউ হবে না।

২৭. يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الْاٰمِنَةُ وَهِيَ الْمُؤْمِنَةُ.

২৭. হে প্রশান্ত চিত্ত নিরাপদ, আর তা হলো মু'মিন চিত্ত

২৮. ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ اَيْ اِرْجِعِيْ اِلٰى اَمْرِهِ وَاِرَادَتِهِ رَاضِيَةً بِالثَّوَابِ مَّرْضِيَّةً عِنْدَ اللّٰهِ بِعَمَلِكِ اَيْ جَامِعَةً بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ وَهُمَا حَالَانِ وَيُقَالُ لَهَا فِي الْقِيَامَةِ.

২৮. তুমি প্রত্যাবর্তন করো, তোমার প্রতিপালকের প্রতি মৃত্যুর সময় তাকে এরূপ বলা হবে। অর্থাৎ তাঁর আদেশের প্রতি বা ইচ্ছার প্রতি প্রত্যাবর্তন করো সন্তুষ্ট হয়ে ছওয়াবের কারণে ও সন্তোষভাজন হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার আমলের কল্যাণ অর্থাৎ উভয় বিশেষণে বিশেষিত অবস্থায়। আর এ শব্দ দু'টি حَالٌ রূপে ব্যবহৃত। আর তাকে উদ্দেশ্য করে কিয়ামতে বলা হবে।

২৯. فَادْخُلِيْ فِيْ جُمْلَةِ عِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ.

২৯. অন্তর্ভুক্ত হও আমার সকল বান্দাগণের মধ্যে যারা পুণ্যবান।

৩০. وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ مَعَهُمْ.

৩০. এবং প্রবেশ করো, আমার জান্নাতে তাদের সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا : আলোচ্য আয়াত হতে কিয়ামতের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। তারা মনে করে বসেছে যে, দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায় তারা যা ইচ্ছা করতে থাকবে। কিন্তু সে বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় কখনই আসবে না, এটা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কর্মফল তথা পুরস্কার ও শাস্তিকে অস্বীকার করে যে পথ তারা অবলম্বন করেছে আসলে তা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়; বরং তা একান্ত বাস্তব এবং অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর তখন সমস্ত পৃথিবী নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

اَلدَّكُّ-এর অর্থ : ইমাম খলীল [নাহুবিদ] বলেন, اَلدَّكُّ অর্থ– প্রাচীর এবং পাহাড় ভেঙ্গে পড়া।

ইমাম মুবাররাদ বলেন, উঁচু নীচু সমান করা, এখান থেকেই ব্যবহার করা হয় دُكَّانٌ কেননা, তাতে বিছানা সমতল হয়ে থাকে অতএব, বুঝা যায় যে, জমিনের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকারের প্রাচীর, পাহাড় এবং গাছ-পালা কিয়ামতের দিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে সমান হয়ে যাবে। –[কাবীর]

وَجَاءَ رَبُّكَ অর্থ : جَاءَ رَبُّكَ-এর শাব্দিক অর্থ আপনার রব 'আসবে'। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর আসা যাওয়া ও একস্থান হতে স্থানান্তরে চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। তাই এ কথাটিকে অবশ্যই রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অতএব, এর অর্থ করা হয়েছে– 'আপনার প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবেন।' এটা হতে একটি বিশেষ পরিবেশের ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। সে সময় আল্লাহর মহাক্ষমতা, নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও প্রবল প্রতাপের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত ও পরিলক্ষিত হবে। দুনিয়ার কোনো বাদশাহের সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও রাজ পরিষদবর্গের আগমন হলে ততটা দাপট ও প্রতাপ অনুভূত হয় না, যতটা হয় দরবারে স্বয়ং বাদশাহর উপস্থিত হওয়ার কারণে, এখানে ঠিক সে পরিবেশই তুলে ধরা হয়েছে।

جَاءَ رَبُّكَ-এর মধ্যে মুযাফ এটাও হতে পারে, যেমন– جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ অর্থাৎ যেদিন আল্লাহর হুকুম হবে। –[রুহুল মা'আনী]

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে– এ রকম আয়াত বা আয়াতাংশকে 'মুতাশাবিহাত' বলা হয়। সেদিন স্বয়ং আল্লাহ অবতরণ এবং ফেরেশতাগণ দলে দলে উপস্থিত হবেন। সুতরাং তাঁর আগমনের অর্থ আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়, আল্লাহই বেশি জানেন। –[বয়ান]

এ ছাড়া ইমাম রাযী (র.) আরো কয়েক ধরনের مُضَافٌ উহ্য রেখে অর্থ দেখিয়েছেন। যেমন–

جَاءَ قَهْرُ رَبِّكَ অর্থাৎ তোমার রবের শাস্তি অথবা ক্রোধ আসবে।

অথবা, وَجَاءَ جَلَائِلُ آيَاتِ رَبِّكَ-তোমার রবের বড় বড় নিদর্শন আসবে।

অথবা, আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করতে হবে যে, زَالَتِ الشُّبْهَةُ অর্থাৎ সকল সন্দেহ দূরীভূত হবে।

অথবা, رَبُّ অর্থ مُرَبِّى ঐ মুরুব্বী হলো একজন বড় ফেরেশ্‌তা তিনি আসবেন। -[কাবীর]

صَفًّا صَفًّا-এর অর্থ এবং ই'রাব : صَفًّا صَفًّا শব্দদ্বয় حَالٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে, অর্থ হলো- সারিবদ্ধভাবে হযরত আতা' বলেন, এখানে ফেরেশতাদের কাতার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক আসমানবাসীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাতার হবে ইমাম যাহহাক বলেন, প্রত্যেক আকাশবাসীগণ যখন অবতরণ করবে তখন তারা সাত কাতারে সারা পৃথিবী জুড়ে অবতরণ করবে।

-[ফাতহুল কাদীর]

উল্লেখ্য যে, হাশরের মাঠের বাম দিকে দোজখ থাকবে। যখন বিশ্ববাসী দোজখকে দেখবে তখন এদিক-সেদিক পলায়ন করতে থাকবে। কিন্তু তাদের চতুর্দিকে সাত কাতার ফেরেশতাদেরকে যখন দণ্ডয়মান দেখবে। তখন বাধ্য হয়ে যে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল সে সে দিকে ফিরে আসবে। -[নূরুল কোরআন]

وَجَاىْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ-এর অর্থ : جَاىْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ-এর মর্মার্থ কোনো কোনো তাফসীরকারের নিকট জাহান্নাম সকল লোকের সম্মুখে প্রকাশ করা হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে নিজের স্থান হতে টেনে মানুষের সামনে আনয়ন করা হবে। একে টানার জন্য সত্তর হাজার রশি হবে, প্রত্যেকটি রশি সত্তর হাজার ফেরেশতা টানবে। আর আরশের বাম দিকে রাখা হবে। এর কঠিন ও ভয়াবহ শব্দ হবে। অতঃপর স্বস্থানে চলে যাবে। -[রূহুল মা'আনী, কাবীর]

يَوْمَئِذٍ .... لَهُ الذِّكْرٰى-এর অর্থ : এর দু'টি অর্থ হতে পারে-

১. সেদিন মানুষ দুনিয়ার কাজকর্ম স্মরণ করবে, যা সেদিন সেখানে করে এসেছে; তা স্মরণ করে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে. কিন্তু তা স্মরণ করে লজ্জিত বা অনুতপ্ত হওয়ায় কি লাভ?

২. সে দিন মানুষের হুঁশ জ্ঞান ফিরে আসবে, শিক্ষা লাভ করবে। সে বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ঠিক কথা ছিল। সত্য ও নির্ভুল ছিল এবং তাদের কথা অমান্য করে সে মহাবোকামি করেছে; কিন্তু তখন হুঁশ হলে, শিক্ষা গ্রহণ করলে এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলেও কোনো লাভ হবে না। উক্ত আয়াতে উমাইয়া ইবনে খালফের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তার কঠিন কুফরির কারণে কঠিন শাস্তি হবে। কিন্তু হুকুম সাধারণ কাফেরদের জন্যও প্রযোজ্য। -[খাযেন]

يَا لَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ আয়াতের অর্থ : উক্ত আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে-

১. হায়! আমি যদি অস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করার সময় কিছু ভালো কাজ করে এ স্থায়ী জীবনের জন্য আগাম পাঠাতাম।

২. দোজখবাসীদের এমন অবস্থা হবে যে, মনে হয় সে জীবন্ত নয়। তখন সে বলবে, হায়! এমন কাজ করে যদি আগাম পাঠাতাম যা আমাকে অগ্নি থেকে নাজাত দিত, যাতে আমি আজকে জীবন্তদের মধ্যে শামিল হতে পারতাম। -[কাবীর]

'তার আজাবের মতো আজাব কেউ দিতে পারবে না' আল্লাহ ছাড়া কেউ কি আজাব দিবে? : আল্লাহ ছাড়া পরকালে অন্য কেউ আজাব দিবে না, দিবার মতো কেউ নেই, তাহলে কিভাবে বলা হলো যে, তার আজাবের মতো কেউ আজাব দিতে পারবে না। বুঝা যায় যে, অন্য কেউ কিছু কম আজাব দিতে পারবে। এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া যায়-

ক. মূলত আয়াতের অর্থ এভাবে হবে যে, لَا يُعَذِّبُ أَحَدٌ فِى الدُّنْيَا عَذَابَ اللّٰهِ الْكَافِرَ يَوْمَئِذٍ আল্লাহ আখেরাতে কাফেরকে শাস্তি দিবেন সে শাস্তির মতো এ দুনিয়াতে কেউ কাউকে শাস্তি দিয়ে দেখাতে পারবে না, কারও শক্তি হবে না। অতএব, আখেরাতে কেউ শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

খ. অথবা, অর্থ এভাবে হবে যে, لَا يَتَوَلّٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ اللّٰهِ أَحَدٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ আল্লাহর দেওয়া আজাবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। কেননা সেদিন তিনিই হবেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। -[কাবীর]

গ. অথবা, عَذَابَهُ-এর সর্বনাম اِنْسَانٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন অর্থ হবে মানুষকে আল্লাহর ন্যায় কেউই শাস্তি দিতে পারবে না।

... يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতের শানে নুযূল : যাহ্হাক ও জুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন– রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি 'রুমা' কূপ ক্রয় করে জনকল্যাণের জন্য মিঠা পানির ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ তার সকল অপরাধ-ত্রুটি মার্জনা করবেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) কূপটি ক্রয় করলেন। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি কি এ কূপটি সর্বসাধারণের ভোগ-ব্যবহারের জন্য দান করবেন? ওসমান (রা.) বললেন– জি-হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ওসমান (রা.) প্রসঙ্গে يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে উক্ত আয়াত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, অথবা হাবীব আদী, অথবা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মা'আলিম ও খাযেন গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াত সকল মু'মিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[লোবাব, খাযেন, মা'আলিম]

প্রশান্ত আত্মা সম্পর্কে আশ্চর্যজনক ঘটনা : হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তায়েফে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর জানাজায় শরিক হয়েছিলম। দেখলাম একটি পাখি উড়ে এসে তাঁর কফিনের মধ্যে ঢুকে পড়ল এরূপ আকৃতির পাখি আমি কখনো দেখিনি। অতঃপর কফিন হতে পাখিটিকে উড়ে যেতে দেখিনি। সমাধিস্থ করার পর তাঁর কবর হতে এক অদৃশ্য আওয়াজ উত্থিত হলো– يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ –[নূরুল কোরআন]

নফসের শ্রেণীবিভাগ : মানুষের নফস বা আত্মাকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. اَلْأَمَّارَةُ এটা কাফের বদকারের আত্মা। তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে দুনিয়াকে ভোগ করে।

২. اَللَّوَّامَةُ এটা পাপী মু'মিনের আত্মা-তারা পাপ করে এবং অনুতপ্ত হয়।

৩. اَلْمُطْمَئِنَّةُ এটা নবী রাসূলগণের আত্মা-যারা আল্লাহকে স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, সৎকর্মশীল মু'মিনগণের আত্মাও এর অন্তর্ভুক্ত।

إِلَىٰ رَبِّكِ -এর মর্মার্থ : মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং (ক) কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো إِلَىٰ أَمْرِ رَبِّكِ অর্থাৎ তোমার প্রভুর নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। (খ) কারো মতে, এর অর্থ হলো "إِلَىٰ إِرَادَةِ رَبِّكِ" তোমার রবের ইচ্ছার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। (গ) কারো মতে এর মর্মার্থ হলো "إِلَىٰ رَحْمَةِ رَبِّكِ" অর্থাৎ তোমার প্রভুর রহমতের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।'

তার প্রশান্তি ও নিশ্চয়তার জন্য এ কথাগুলো বারংবার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বলা হবে– যাতে সে অস্থির না হয়।

قَوْلُهُ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ الخ : ইবনে আবী হাতেম হযরত বোরায়দা (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত হামযা (রা.) সম্পর্কে আর যাহ্হাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওসমান গনী (রা.) সম্পর্কে।

ইবনে মারদুবিয়া আবূ নাঈম হযরত সাইদ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে আমি এ আয়াত তেলাওয়াত করলাম, হযরত আবূ বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন এটি অত্যন্ত বড় সুসংবাদ, তখন হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ কলেন, ফেরেশতাগণ আপনার মৃত্যুর সময় এ আয়াত পাঠ করবেন। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْبَلَدِ : সূরা আল-বালাদ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াত لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ-এর اَلْبَلَدُ শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতে ২০টি আয়াত, ৮২টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে। তা ছাড়া এমন সময় এটা নাজিল হয়েছিল বলে বুঝা যায় যখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল :

১. আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ্ যাহমী কুরইশদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী বীর ছিল। তার গায়ে এত শক্তি ছিল যে, সে একটি আস্ত চামড়া পায়ের নিচে রেখে লোকদেরকে তা টেনে বের করার জন্য আহ্বান জানাত। লোকেরা তা টেনে হেঁচড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, তথাপি এটা তার পায়ের নিচ হতে বের হতো না।
নবী করীম ﷺ যখন তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন সে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করল এবং বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি আমাকে যে জাহান্নামের ভয় দেখাও তার উনিশজন প্রহরীকে শায়েস্তা করার জন্য আমার বাম হাতই যথেষ্ট। আর তুমি যে জান্নাতের লোভ দেখাচ্ছ, আমি বিবাহ করে ও মেহমানদারী করে যে সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি তা তার সমানও তো হবে না। তার অনুরূপ বক্তব্যের ব্যাপারে আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেছেন, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, আবূ জাহলের বর্বরোচিত ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেন, এটা হারিছ ইবনে আমেরের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

৫. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এরামবাসী 'আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ শুনার পর নবী করীম ﷺ-কে মক্কার মুশরিকরা বলল, তুমি তোমার আল্লাহকে বল, তিনি যেন আমাদের উপরও 'আদ ও ছামূদ জাতির ন্যায় আজাব নাজিল করে এ শহরসহ আমাদেরকেও ধ্বংস করে দেন। তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এটা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক প্রত্যাদেশসমূহের অন্যতম এবং অনেকের মতে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়াতের প্রথম বছরই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এ সূরার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। এ সূরায় বহুলাংশে সৎকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথমাংশে ভূমিকা স্বরূপ সৎকর্মের তথা দুঃখ-কষ্টের এবং মানুষের উপর আল্লাহর দানের উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরিশিষ্টে দুষ্কর্ম ও সৎকর্মের প্রতিফলের উল্লেখ রয়েছে।

এ সূরাতে একটি অনেক বড় বক্তব্যকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন এ ক্ষুদ্রকায় সূরাটির মধ্যে অতীব মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ ও মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক মর্যাদা বা হিসাবটা কি তা বুঝানোই হলো এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লাভের দু'টি পথই খুলে দিয়েছেন। আর সে পথে চলার উপায়-উপকরণও দিয়েছেন। মানুষ কল্যাণের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে, না অকল্যাণের পথে চলে অশুভ পরিণতি লাভ করবে, তা তার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। এ দুনিয়া মানুষের জন্য কোনো নিশ্চিত বিশ্রামের স্থান নয়; বরং কঠোর পরিশ্রম করে পরকালের জন্য কিছু উপার্জনের স্থান। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সূরার প্রথমে মক্কা নগরে নবী করীম ﷺ-এর উপর আপতিত বিপদাপদ এবং গোটা আদম সন্তানের সঠিক অবস্থা পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর মানুষের একটা ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মানুষ মনে করে যে, সে যা কিছু নিশ্চিন্তে করছে তার কোনো হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে না। তার উপর কোনো শক্তিমান ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না, কোন পথে অর্থ উপার্জন করল আর কোন পথে ব্যয় করল তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, আমি মানুষকে উপলব্ধি করার পন্থা ও যোগ্যতা দিয়েছি। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয় পথই তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে– সৌভাগ্যের পথ কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম, আর দুর্ভাগ্যের পথ মোহময় ও আকর্ষণীয়। মানুষ স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে দুর্ভাগ্যের পথকে বেছে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত হয়।

উপসংহারে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যমণ্ডিত উচ্চতর পথ নির্দেশ করেছেন। লোক দেখানো কার্যকলাপ ও অহংকারমূলক অর্থ ব্যয় পরিহার করে এতিম-মিসকিনের সাহায্যে অর্থ ব্যয় করা এবং ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ধৈর্য সহকারে সমাজ গঠন করাই সৌভাগ্যের পথ। আর এর বিপরীতটা হলো দুর্ভাগ্য বা জাহান্নামের পথ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لَآ زَائِدَةٌ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ ـ

১. শপথ করতেছি لا অতিরিক্ত এ নগরীর মক্কা নগরীর।

٢. وَاَنْتَ يَا مُحَمَّدُ حِلٌّ حَلَالٌ بِهٰذَا الْبَلَدِ بِاَنْ يَّحِلَّ لَكَ فَتُقَاتِلَ فِيْهِ وَقَدْ اُنْجِزَ لَهُ هٰذَا الْوَعْدُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْمُقْسَمِ بِهٖ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ـ

২. আর তুমি হে মুহাম্মদ যুদ্ধ বৈধতাকারী حِلٌّ শব্দটি حَلَالٌ অর্থে ব্যবহৃত এ নগরীতে এভাবে যে, তোমার জন্য এতে যুদ্ধ করা হালাল হবে এবং তুমি এতে যুদ্ধ করবে। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর সাথে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল। এ বাক্যটি مُقْسَمٌ بِهٖ ও তার مَعْطُوْف-এর মাঝখানে মু'তারেযা বাক্য।

٣. وَوَالِدٍ اَىْ اٰدَمَ وَمَا وَلَدَ اَىْ ذُرِّيَّتَهٗ وَمَا بِمَعْنٰى مَنْ

৩. আর শপথ জন্মদাতার অর্থাৎ আদম (আ.)-এর আর যা সে জন্ম দান করেছে অর্থাৎ তার বংশধর। এখানে مَا অব্যয়টি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত।

٤. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَىِ الْجِنْسَ فِىْ كَبَدٍ نَصَبٌ وَشِدَّةٌ يُكَابِدُ مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَشَدَائِدَ الْاٰخِرَةِ ـ

৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ এর শ্রেণিকে ক্লেশের মধ্যে দুঃখ, কষ্ট যেহেতু সে দুনিয়ার বিপদাপদ ও আখেরাতের দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হবে।

٥. اَيَحْسَبُ اَىْ اَيَظُنُّ الْاِنْسَانُ قَوِىُّ قُرَيْشٍ وَهُوَ اَبُو الْاَشَدِ بْنُ كَلْدَةَ بِقُوَّتِهٖ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهٗ لَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ وَاللّٰهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ ـ

৫. সে কি ধারণা করে অর্থাৎ কুরাইশদের মধ্যে শক্তিমান পুরুষ আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ তার শক্তির অহমিকা বশে মনে করে (যে,) اَنْ অব্যয়টি মুছাক্কলা হতে মুখাফ্‌ফাফা, এর ইসম উহ্য অর্থাৎ اَنَّهٗ কেউ তার উপর ক্ষমতাবান হবে না অথচ আল্লাহ তা'আলা তার উপর ক্ষমতাবান।

٦. يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ عَلٰى عَدَاوَةِ مُحَمَّدٍ مَالًا لُّبَدًا كَثِيْرًا بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ ـ

৬. সে বলে, আমি নিঃশেষ করেছি মুহাম্মদের শত্রুতায় প্রচুর অর্থ অনেক সম্পদ একের পর এক।

٧. اَيَحْسَبُ اَنْ اَىْ اَنَّهُ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ فِيْمَا اَنْفَقَهُ فَيَعْلَمَ قَدْرَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِقَدْرِهِ وَاَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَتَكَثَّرُ بِهِ وَمُجَازِيْهِ عَلٰى فِعْلِهِ السَّيِّئِ.

৭. সে কি মনে করে যে, اَنْ শব্দটি اَنَّ অর্থে তাকে কেউ দেখেনি? তার সে ব্যয় করাকে যে, সে এর পরিমাণ জানাতে চায়। অথচ আল্লাহ তার পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। আর এ সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত আছেন যে, তা অধিক নয়। আর আল্লাহ তার এ মন্দকাজের প্রতিফল অবশ্যই দান করবেন।

٨. اَلَمْ نَجْعَلْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَىْ جَعَلْنَا لَّهُ عَيْنَيْنِ.

৮. আমি কি সৃষ্টি করিনি? এটা اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ তথা সাব্যস্তকরণার্থে প্রশ্নবোধক অর্থাৎ আমি সৃষ্টি করেছি। তার জন্য দু'টি চক্ষু।

٩. وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ.

৯. আর জিহ্বা ও দু'টি ওষ্ঠ?

١٠. وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ بَيَّنَّا لَهُ طَرِيْقَيِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

১০. আর আমি কি তাকে দু'টি পথই প্রদর্শন করিনি? তার জন্য ভালো ও মন্দ উভয় পথ বর্ণনা করেছি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى شَفَتَيْنِ : এ শব্দটি شَفَةٌ-এর দ্বিবচন। شَفَةٌ শব্দটি মূলত شَفَهَةٌ ছিল। هَا-কে হযফ করে شَفَةٌ করা হয়েছে, তবে تَصْغِيْر এবং جَمْع-এর সময় উক্ত هَا প্রকাশ পায়। যেমন– তার تَصْغِيْر হলো شُفَيْهَةٌ এবং جَمْع হলো شَفَهَاتٌ ও شِفَاهٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনে উল্লিখিত সূরা আল-ফাজরে এমন সব কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যেগুলোর পুরস্কার বা শাস্তি পরকালে দেওয়া হবে। বর্তমান সূরাটিতেও সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পিছনের সূরায় অধিকাংশই অসৎকার্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর বর্তমান সূরায় অধিকাংশই সৎকর্ম ও ভালো কর্মের আলোচনা করা হয়েছে। সূরার শুরুতে কতক সৎকর্মের চাহিদার বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষভাগে ভালোমন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। –[কামালাইন]

لَآ اُقْسِمُ-এর لَا এর অর্থ : لَآ اُقْسِمُ-এর মধ্যকার لَا এখানে অতিরিক্ত। যেমন, কতিপয় মুফাস্সিরের অভিমত। অথবা, لَا অতিরিক্ত নয়, বরং এটা আরবদের কথা– لَا وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا অর্থাৎ 'না-আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই এরূপ করবো'-এর মতো। তখন অর্থ হবে لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ اِذَا لَمْ تَكُنْ فِيْهِ অর্থাৎ আপনি যখন এ মক্কা শহরে না থাকবেন, আমি তা দ্বারা কসম করবো না। কারো মতে لا দ্বারা তাদের কথা এবং বক্তব্যের প্রতিবাদ করা উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে– তোমরা তো পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছ, এটা সঠিক নয়, বরং আমি এ শহরের কসম করে বলছি যে, তা ঘটবেই। আবার কারো মতে অর্থ এই হবে যে, সামনে যে বিষয় বর্ণনা করা হবে তা নিশ্চিত সত্য ও বাস্তব হওয়ার কারণে সে সম্পর্কে শপথ করারই প্রয়োজন নেই। শপথ ছাড়াই সামনের কথাগুলো বাস্তব সত্য। –[কুরতুবী]

بلد দ্বারা উদ্দেশ্য এবং তার ফজিলত : সমস্ত মুফাস্‌সির একথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, بَلَدٌ বলে بَلَدٌ حَرَامٌ তথা মক্কা শহরকে বুঝানো হয়েছে। মক্কা শহরের ফজিলত সকল মানুষের কাছে সু-পরিচিত।

১. আল্লাহ তা'আলা মক্কা শহরকে সম্মানিত ও নিরাপদ করেছেন। যেমন তিনি মক্কার মসজিদের ব্যাপারে বলেছেন- وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا

২. তিনি তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মানুষের কিবলা নির্ধারণ করেছেন, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ

৩. তথায় অবস্থিত মাকামে ইবরাহীমের মর্যাদা দিয়ে বলেছেন, وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

৪. মানুষকে তার হজ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

৫. তথায় শিকার নিষিদ্ধ করেছেন।

৬. তার পার্শ্বে বাইতুল মা'মূর-কে রেখেছেন।

৭. তার নিচ হতে দুনিয়া প্রসারিত করেছেন। -[কাবীর]

৮. এখানেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ পবিত্র বাইতুল্লাহ নির্মিত হয়েছে।

৯. সকল নবীর পদচারণা এ স্থানে হয়েছে।

১০. এ স্থানের কা'বা শরীফে এক রাকাত নামাজ একলক্ষ রাকাতের সমান ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ : আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, "আপনি এ শহরে হালাল" মুফাস্‌সিরগণ এটার একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন-

ক. اَنْتَ مُقِيْمٌ بِهٰذَا الْبَلَدِ অর্থাৎ আপনি এ শহরে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আর আপনার এ অবস্থানের কারণে এ শহরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

খ. দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এ শহরটি যদিও 'হেরেম' কিন্তু একটি সময় এমন আসবে যখন কিছু সময়ের জন্য এখানে যুদ্ধ করা ও দীনের শত্রুদের হত্যা করা, রক্তপাত করা আপনার জন্য হালাল করে দেওয়া হবে।

গ. এর তৃতীয় অর্থ হলো- "اَنْتَ غَيْرُ مُرْتَكِبٍ فِيْ هٰذَا الْبَلَدِ مَا يَحْرُمُ" অর্থাৎ আপনার জন্য যা এ শহরে করা হারাম তা আপনি কখনো করবেন না।

ঘ. চতুর্থ অর্থ এই যে, এ শহরটির হেরেম হওয়ার কারণে এখানে বন্য জন্তু হত্যা করা ও গাছ, ঘাস কাটা পর্যন্ত আরববাসীদের নিকট হারাম, সকলের জন্যই এখানে নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হে নবী! এখানে আপনার জন্য কোনো নিরাপত্তা নেই। আপনাকে হত্যা করার জন্য এখানকার লোকেরা সব ব্যবস্থা গ্রহণকে নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ হালাল করে নিয়েছে।

ঙ. অথবা, এর অর্থ এই যে, মক্কা শহরে আপনার জন্য কাউকে হত্যা করা বা শাস্তি প্রদান করা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলে এখানে কাউকে হত্যা করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমা করেও দিতে পারেন। সুতরাং মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার গেলাফ জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে খাত্তালকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আবূ সুফিয়ানের ঘরকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছিলেন। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) -[কবীর]

জনক ও সন্তান দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের দ্বারা শপথের কারণ? : وَلَدٌ ও وَالِدٌ-এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের দ্বারা শপথ করার কারণ কি? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

১. وَالِدٌ-এর দ্বারা হযরত আদম (আ.) এবং مَا وَلَدَ-এর দ্বারা তার সন্তানাদি উদ্দেশ্য। এটাই জমহুরের মত। আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.)ও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার কারণে তাদের শপথ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ" আর আমি আদম জাতিকে সম্মানিত করেছি।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, وَالِدٌ-এর দ্বারা জন্মদানকারী ও مَا وَلَدَ-এর দ্বারা যে জন্ম দেয় না তাকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, তা দ্বারা সকল পিতা ও সন্তান উদ্দেশ্য।

৪. وَالِدٌ-এর দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-কে এবং مَا وَلَدَ-এর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। ইতঃপূর্বে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছিল। আর এখানে এটার নির্মাতা ও অধিবাসীর শপথ করা হয়েছে।

৫. وَالِدٌ-এর দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এবং مَا وَلَدَ-এর দ্বারা তাঁর সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৬. অথবা, وَالِدٌ দ্বারা হযরত নূহ (আ.) -কে এবং مَا وَلَدَ-এর দ্বারা তাঁর সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। -[কাবীর]

৭. ইমাম তাবারী (র.) বলেছেন, এখানে وَالِدٌ দ্বারা নবী করীম ﷺ আর وَلَدٌ দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ -[নূরুল কোরআন]

নবী করীম ﷺ -এর সান্ত্বনা : কাফির কুরাইশগণ যখন বলেছিল- এরাম শহরের 'আ'দ ও ছামূদ জাতির মতো আল্লাহ আমাদেরকেও এ মক্কা নগরীর সাথে ধ্বংস করে ফেলুক, তাহলে আমরা বুঝবো যে, তুমি সত্যবাদী নবী। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র মক্কা নগরীর শপথ করে বলছেন- হে নবী ﷺ! যেহেতু আপনি এ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং প্রিয় নবী ইবরাহীম (আ.) এ নগরীর জন্য দোয়া করেছেন। আর আমি তাকে মুসলিম উম্মার কিবলারূপে মনোনীত করেছি; সেহেতু কাফিরদের কথায় আমি কখনো এ নগরীকে ধ্বংস করবো না; বরং তারা যত অন্যায়-অত্যাচারই করুক না কেন, অদূর ভবিষ্যতে আমি আপনাকে এ নগরীর বৈধ অধিকারী করে দিবো। আপনি সকল বাধা-বিঘ্ন মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নগরে অবস্থান করতে পারবেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মক্কা বিজয়ের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী।

فِىْ كَبَدٍ-এর অর্থ : كَبَدٌ অর্থ- পেটব্যথা, কষ্ট, কঠোরতা। সুতরাং فِىْ كَبَدٍ অর্থ হবে- কষ্ট নির্ভর করে বানিয়েছি। বাক্যটি পূর্ববর্তী শপথ বাক্যগুলোর জবাব। কষ্টনির্ভর কথাটির তাৎপর্য এই যে, মানুষকে পৃথিবীতে শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য তৈরি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ পৃথিবী তার শ্রম, কষ্ট ও কঠোরতা ভোগ করার স্থান। এখানে প্রত্যেক মানুষকেই তা ভোগ করতে হয়। এ মক্কা নগরীরও কোনো এক প্রিয় বান্দার প্রাণপাতের বিনিময়ই আজ তা আরব জাতির এমনকি সারাবিশ্ব মুসলিমের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে, মানুষকে মায়ের গর্ভে স্থান লাভ করা হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি পদে পদে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। যত শক্তিশালী ও বিত্তবান লোকই দেখা যাক না কেন, সেও যখন মায়ের গর্ভে ছিল, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল, প্রসবকালে জীবনের দারুণ ঝুঁকি ছিল। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য পর্যন্ত তাকে বহু প্রকারের দৈহিক পরিবর্তন গ্রহণ করতে হয়েছে। একটা স্তরেও ভুল পরিবর্তন হলে তার প্রাণ অবশ্যই বিপন্ন হয়ে পড়ত। পার্থিব কি পারলৌকিক প্রতিটি সাফল্যের জন্য মানুষকে এমন নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছে যে, সে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার জন্য অবলীলাক্রমে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। রাজা-বাদশা হয়েও সে পরিতৃপ্ত ও আশঙ্কামুক্ত নয়, আরও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, নিরাপত্তার জন্য সে দিবারাত্রি অতৃপ্ত ও শঙ্কিত আত্মা নিয়ে কঠোর দুঃখ ও পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথি (র.) বলেছেন, كَبَدٌ শব্দের অর্থ সে আমানত বহনের কষ্ট যা বহন করতে আসমান, জমিন, পাহাড়-পর্বত অস্বীকৃতি জানিয়েছে- আর মানুষ তা বহন করেছে। যদি মানুষ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তবে তার জীবন সাধনা হবে সার্থক, সে হবে সাফল্যমণ্ডিত। আর যে এ দায়িত্ব পালন করবে না, সে ইহ ও পরকাল উভয় জগতে ধ্বংস হবে।-[নূরুল কোরআন]

لُبَدٌ শব্দের বিশ্লেষণ : لُبَدٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে لُبَدَةٌ কারো মতে لُبَدٌ শব্দটিই একবচন। ইমাম লাইছ (র.) বলেন, لُبَدٌ বলা হয় এমন অধিক সম্পদকে যা আধিক্যের কারণে ধ্বংস হওয়ার ভয় থাকে না। কারো মতে শুধু অধিক সম্পদকে لُبَدٌ বলা হয়।

কাফের -এর اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا বলার কারণ : اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا-এর শাব্দিক অর্থ- 'আমি স্তূপ পরিমাণ ধন-সম্পদ ধ্বংস করেছি, খরচ করেছি বলা হয়নি। এটা হতে বুঝা যায় যে, যে লোক এ কথাটি বলেছে, নিজের ধন-সম্পদের গৌরবে তার বুক স্ফীত। এত খরচ করেছে-তাও তার মোট সম্পদের একটা সামান্য অংশ। তাই সে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে না। আর অপচয় এ জন্য বলা হয়েছে যে, সে সৎ বা কল্যাণকর কোনো কাজে এ সম্পদ ব্যয় করেনি। আরবের কাফেরগণ অর্থ-বৈভবের প্রদর্শনীতে, স্তুতি গায়ক কবি সাহিত্যিকদের পুরস্কার দানে, বিবাহ-শাদি মেজবানীতে, জুয়া খেলায়, আনন্দ-মেলা ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ অপচয়

করত। এক গোত্রপতি অন্য গোত্রপতির সাথে জাঁকজমক, গণভোজ ও দান-দক্ষিণার প্রতিযোগিতা করত। এর ফলে এক দে ... জনের প্রশংসায় কবিতা ও গান রচিত হতো এবং জনসমাবেশে পঠিত হতো, এ জন্য সে নিজেও অন্যের নিকট গৌরব প্রকাশ করত। এটাই অত্র আয়াতের স্তূপ বা রাশি রাশি ধন-সম্পদ উড়ানোর পটভূমি।

কারো মতে সে কাফের বলবে যে, আমি তো মুহাম্মদের বিরোধিতায় অনেক ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗ اَحَدٌ : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, সে যে তার ধন-সম্পদ ব্যয়ের কথা বলে বেড়ায়– সে কি জানে না যে, তার সমস্ত কাজ-কর্ম আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই অবহিত আছেন এবং তিনি তাকে তার মন্দকাজের প্রতিফল (শাস্তি) অবশ্যই প্রদান করবেন।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন– اَيَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرَهٗ يَسْاَلُهٗ عَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيْمَ اَنْفَقَهٗ

অর্থাৎ সে কি মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখেনি? সে কোথা হতে কিভাবে সম্পদ অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

ইমাম কালবী (র.) বলেন–

كَانَ كَاذِبًا لَمْ يُنْفِقْ شَيْئًا فَقَالَ اللّٰهُ اَيَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مَا رَاٰى ذٰلِكَ مِنْهُ فَعَلَ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ اَنْفَقَ اَوْ لَمْ يُنْفِقْ بَلْ رَاٰهُ وَعَلِمَ مِنْهُ خِلَافَ مَا قَالَ

অর্থাৎ [সে দাবি করেছে যে, সে বহু সম্পদ ব্যয় করেছে।] সে মূলত মিথ্যাবাদী সে কিছুই ব্যয় করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে কি ধারণা করেছে যে, সে কি করেছে বা করেনি, ব্যয় করেছে, কি করেনি–তা আল্লাহ তা'আলা জানেন না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তা ভালো করেই জানেন যে, সে যা দাবি করেছে প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ : আমি মানুষের সম্মুখে ভালো ও মন্দের দু'টি পথই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি। সুতরাং এখন যেটি সে গ্রহণ করতে চায় করুক।

অর্থাৎ আমি মানুষকে কেবল চিন্তা ও বিবেকশক্তি দান করেই ক্ষান্ত হইনি এবং এর দ্বারা নিজের জীবনের পথ নিজে তালাশ করে নেওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং আমিই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছি। ভালো-মন্দ, নেকী-বদী, সৎ-অসৎ উভয় পথই তাকে স্পষ্ট করে দিয়েছি। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে-চিন্তে ও বুঝে শুনে নিজের দায়িত্বে যে পথ ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে। সূরা দাহারে এ কথাটিই নিম্নোক্ত ভাষায় বলা হয়েছে– "আমি মানুষকে এক মিশ্রিত শুক্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তার পরীক্ষা নেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ ও দর্শনশক্তি সম্পন্ন বানিয়েছি। আমি তাকে পথ দেখিয়েছি। হয় সে শোকর আদায়কারী হবে, কিংবা হবে কুফরপন্থি।"

ইমাম যাহহাক (র.) -এর মতে, এখানে اَلنَّجْدَيْنِ-এর দ্বারা দু'টি স্তনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মায়ের দু'টি স্তন সন্তানের জীবন রক্ষায় ও তার বিকাশের জন্য দু'টি প্রধান রাস্তার মতো কাজ করে। –[নূরুল কোরআন]

اَلنَّجْدَيْنِ -এর অর্থ : اَلنَّجْدَيْنِ শব্দটি اَلنَّجْدُ -এর দ্বিবচন। اَلنَّجْدُ অর্থ– اَلطَّرِيْقُ فِى ارْتِفَاعٍ অর্থাৎ উঁচু রাস্তা। অতঃপর উঁচু রাস্তা বলতে ভালো-মন্দের দু'দিককে বুঝানো হয়েছে। ইমাম যাহহাকের মতে اَلنَّجْدَيْنِ বলে এখানে দু'টি স্তনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, মায়ের দু'টি স্তন সন্তানের জীবন রক্ষা ও তার বিকাশের জন্য দু'টি প্রধান রাস্তার মতো কাজ করে। বহুবচনে نُجُوْدٌ ব্যবহৃত হয়। نَجْدٌ (নজদ)-কে নজদ এ কারণেই বলা হয় যে, তা মক্কা, হেজাজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে উঁচু। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

অনুবাদ :

١١. فَلَا فَهَلَّا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ جَاوَزَهَا .

১১. তবে সে তো فَلَا শব্দটি فَهَلَّا অর্থে বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করেনি অতিক্রম করেনি।

١٢. وَمَآ أَدْرَاكَ أَعْلَمَكَ مَا الْعَقَبَةُ الَّتِيْ يَقْتَحِمُهَا تَعْظِيْمٌ لِشَانِهَا وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ وَبَيَّنَ سَبَبَ جَوَازِهَا بِقَوْلِهِ .

১২. তুমি কি জান? তোমার কি জ্ঞান আছে বন্ধুর গিরিপথ কি যাকে সে দুরাতিক্রম্য মনে করে। এটা দ্বারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এটা একটি মু'তারেযা বাক্য। আর তা অতিক্রমের উপায় বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে।

١٣. فَكُّ رَقَبَةٍ مِنَ الرِّقِّ بِاَنْ اَعْتَقَهَا .

১৩. দাস মুক্তকরণ দাসত্ব হতে, তাকে আজাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে।

١٤. أَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ مَجَاعَةٍ .

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান করা ক্ষুধা দারিদ্র্যের দিনে।

١٥. يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ قَرَابَةٍ .

১৫. এতিম আত্মীয়-স্বজনকে আত্মীয় قَرَابَةٍ مَقْرَبَةٍ শব্দটি অর্থে।

١٦. أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ أَىْ لُصُوْقٍ بِالتُّرَابِ لِفَقْرِهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بَدَلُ الْفِعْلَيْنِ مَصْدَرَانِ مَرْفُوْعَانِ مُضَافُ الْاَوَّلِ لِرَقَبَةٍ وَيُنَوَّنُ الثَّانِيْ فَيُقَدَّرُ قَبْلَ الْعَقَبَةِ اِقْتِحَامٌ وَالْقِرَاءَةُ الْمَذْكُوْرَةُ بَيَانُهُ .

১৬. কিংবা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত নিঃস্ব ব্যক্তিকে যে অভাব-অনটনের কারণে মাটিতে পড়ে থাকে। অপর এক কেরাতে উভয় فِعْل-এর স্থলে উভয়টি مَصْدَر فَكُّ রূপে পঠিত হয়েছে। প্রথম مَصْدَرٌ অর্থাৎ مَرْفُوْع শব্দটি رَقَبَةٍ এর প্রতি مُضَافٌ আর দ্বিতীয় مَصْدَرٌ অর্থাৎ اِطْعَامٌ তানবীনযুক্ত। সে হিসাবে عَقَبَة শব্দের পূর্বে اِقْتِحَام উহ্য গণ্য করা হবে। আর উল্লিখিত কেরাত তার বিবরণ হবে।

١٧. ثُمَّ كَانَ عَطْفٌ عَلٰى اِقْتَحَمَ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيْبِ الذِّكْرِىْ وَالْمَعْنٰى كَانَ وَقْتَ الْاِقْتِحَامِ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا اَوْصٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ الرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ .

১৭. তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া এটা اِقْتَحَمَ-এর প্রতি عَطْف আর ثُمَّ অব্যয়টি ধারাবাহিকতার জন্য অর্থাৎ كَانَ وَقْتُ الْاِقْتِحَامِ অতিক্রমকালে অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং তারা পরস্পরকে উপদেশ দান করে অর্থাৎ একে অন্যকে উপদেশ দান করে ধৈর্যধারণ করার আনুগত্য ও গুনাহ হতে বাঁচার ক্ষেত্রে। আর তারা পরস্পর উপদেশ দান করে অনুগ্রহ প্রদর্শনের সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করার।

١٨. أُولٰٓئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِهٰذِهِ الصِّفَاتِ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ الْيَمِيْنِ .

১৮. তারাই উল্লিখিত বিশেষণের অধিকারীগণ সৌভাগ্যবান দক্ষিণপন্থি مَيْمَنَة শব্দটি يَمِيْن অর্থে।

١٩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ الشِّمَالِ .

১৯. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগা বামপন্থি।

٢٠. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ بِالْهَمْزَةِ وَبِالْوَاوِ بَدَلَهُ مُطْبَقَةٌ .

২০. তাদের উপর অগ্নি পরিবেষ্টিত থাকবে مُؤْصَدَة শব্দটি هَمْزَه-এর সাথে বা তৎপরিবর্তে وَاوْ-এর সাথে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ স্তরে স্তরে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَقَبَة-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : عَقَبَة অর্থ হলো– দুর্গম ও বন্ধুর গিরিপথ। এটা একবচন, বহুবচনে عِقَابٌ ও عَقَبٌ হয়ে থাকে। عَقَبَة দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

১. হযরত মুজাহিদ এবং যাহ্‌হাকের মতে, এটা জাহান্নামের উপর রাখা একটি কঠিন পথ।

২. হযরত আতা (র.) -এর মতে, عَقَبَةُ جَهَنَّمَ তথা জাহান্নামের গিরিপথ উদ্দেশ্য।

৩. ইমাম কালবী (র.)-এর মতে, عَقَبَةٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানের একটি পথ।

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, عَقَبَة হলো দোজখের একটি উপত্যকার নাম।

৫. কেউ কেউ বলেছেন, عَقَبَة হলো দুর্গম বন্ধুর পথ– যা উপরের দিকে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এ পথটি অতি দুর্গম ও বন্ধুর। এ পথে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে হয়। এ পথের পথিককে নিজের প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা ও শয়তানি লোভ-লালসার সাথে রীতিমতো লড়াই করে চলতে হয়।

৬. হযরত মুজাহিদ ও কালবী (র.) বলেন, এটা হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত অতি ধারালো চিকন সেতু। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَكُّ رَقَبَةٍ : فَكٌّ মাসদার (بَاب نَصَرَ)-এর অর্থ হলো– বিচ্ছিন্ন করা, ছাড়িয়ে নেওয়া, মুক্ত করা ইত্যাদি رَقَبَة-এর অর্থ– ঘাড়। এখানে رَقَبَة-এর দ্বারা দাসকে বুঝানো হয়েছে। তবে فَكُّ رَقَبَة কথাটি আরো ব্যাপক অর্থে হয়ে থাকে যেমন– গোলামী, বন্দীদশা অথবা কেসাস হতে কাউকেও মুক্ত করা। পক্ষান্তরে عِتْقُ رَقَبَة-এর অর্থ হলো– শুধু দাসকে মুক্ত করা। কখনো কখনো মুকাতাবকে মুক্ত করার জন্য যা কিছু দেওয়া হয়, তাকেও فَكُّ رَقَبَة বলে।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–একদা এক বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যা করলে আমি জান্নাত লাভ করতে পারবো। নবী করীম ﷺ বললেন– عِتْقُ النَّسَمَةِ وَفَكُّ الرَّقَبَةِ তখন লোকটি বলল, উভয় কথাটি কি এক হয়ে গেল না? নবী করীম ﷺ বললেন, না عِتْقُ النَّسَمَةِ হলো কোনো দাসকে মুক্ত করা, আর فَكُّ الرَّقَبَةِ হলো কোনো দাসকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য পেশ করা, যাতে সে দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত হতে পারে।

কারো মতে, فَكُّ رَقَبَة হলো– ঈমান, ইবাদত ও কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করা।

উত্তম رَقَبَة : হযরত আছবাগ (র.) বলেন– মূল্যবান কাফেরদাস কম মূল্যের মু'মিনদাস থেকে [মুক্ত করার সময়] উত্তম। তিনি তাঁর এ কথার স্বপক্ষে একটি হাদীস পেশ করেছেন– "........ একদা নবী করীম ﷺ দাস মুক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলেন–কোন رَقَبَة উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন–"যা মূল্যের দিক থেকে অধিক দামী এবং তার মালিকের নিকট ও অধিক মূল্যবান।"

ইবনুল আরাবী (র.) বলেন– উত্তম رَقَبَة হলো মুসলিম رَقَبَة; তিনি দলিল হিসাবে مَنْ اَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا এবং مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً-কে পেশ করে থাকেন।

মূলত আছবাগের মতটি সঠিক নয়। কেননা তিনি হাদীস দ্বারা সঠিক রায় পেশ করতে পারেননি। –[কুরতুবী]

দাস মুক্ত করা উত্তম, না সদকা করা উত্তম ? : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট দাস মুক্ত করা সদকার চেয়ে উত্তম; কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট সদকা উত্তম। কুরআনুল কারীমের আয়াত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত তথা দাস মুক্ত করার ব্যাপারে বেশি প্রমাণ পেশ করে। কেননা আয়াতে সদকার পূর্বে দাসমুক্ত করার হুকুমকে আনা হয়েছে। তা ছাড়া হযরত শা'বী ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন–যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত খরচ রয়েছে, এখন তা সে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দিবে, না দাস কিনে মুক্ত করে দিবে–দাস মুক্ত করাই উত্তম। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন- "যে ব্যক্তি কোনো দাস মুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দোজখের আগুন হতে মুক্ত করবেন।" –[কুরতুবী, কাবির]

ذَا مَتْرَبَةٍ-এর অর্থ : ذَا مَتْرَبَةٍ অর্থ "ধূলি সম্বল" ধূলি ছাড়া যার অন্য কোনো অবলম্বন নেই। এটা একটি আরবি বাগধারা। যা দরিদ্র আর নিষ্পেষিত' অর্থ প্রকাশ করে। বাবে سَمِعَ হতে নির্গত, তা হতে تُرَابٌ শব্দটির অর্থ- মাটি। আর মিসকিনকে ذُوْمَتْرَبَةٍ বলা হয়, যে তার দরিদ্রতার কারণে জমিনের সাথে মিশে গেছে। তার উপরে নেই কোনো ছায়া-দাতা, আর নিচে নেই কোনো বসার স্থান। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একজন মিসকিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে মাটির উপর খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি-ই হলো সে ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ –[কাবীর, কুরতুবী]

ذَا مَتْرَبَةٍ-এর মর্মার্থ : ذَا অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী আর مَتْرَبَةٌ অর্থ- মাটি। শব্দটি বাবে ضَرَبَ হতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা تُرَابٌ-এর অন্য لُغَتْ অর্থাৎ মাটিওয়ালা মিসকিন। মূলত তা একটি আরবি বাগধারা। অর্থাৎ একেবারে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল মিসকিন [দরিদ্র]।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে লিখিয়াছেন–"اَىْ لُصُوْقٌ بِالتُّرَابِ لِفَقْرِهِ" অর্থাৎ দরিদ্রের কারণে যে মাটিতে পড়ে গেছে, মাটির সাথে মিশে গেছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একদা এক মিসকিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে মাটির উপর খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রয়েছে। তখন তিনি মন্তব্য করলেন। এ ব্যক্তিই হলো সে ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ"

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : অর্থাৎ উপরিউক্ত গুণাবলি বিদ্যমান থাকার সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমানদার হওয়া একান্ত জরুরি। কেননা ঈমান ব্যতীত কোনো আমল নেক বলে গণ্য হতে পারে না, আল্লাহর নিকট তা গ্রহণীয় হতে পারেন। কুরআন ও হাদীসের বহুস্থানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেবল সে আমলই গণনার যোগ্য ও মুক্তির উপায় যা ঈমান সহকারে করা হবে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে–"আর যে লোক নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক অথবা স্ত্রীলোক আর হবে সে মু'মিন, তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন-যাপন করাবো এবং এ ধরনের লোকদের অতি উত্তম আমল অনুযায়ী শুভ প্রতিফল দান করবো।"

সূরা মুমিন-এ বলা হয়েছে– "আর যে লোক নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক কি স্ত্রীলোক, আর হবে সে মুমিন, এ ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে এবং তথায় তাদেরকে বেহিসাব রিজিক দেওয়া হবে।" মোটকথা ঈমান ছাড়া কখনও নেক আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

ثُمَّ দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের পূর্বের দান গ্রহণযোগ্য : একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য ঈমান পূর্বশর্ত। اِنْفَاقٌ বা আল্লাহর রাস্তার দান অথবা গরিবকে দান করার ছাওয়াব তখনই হবে যখন দাতা মুমিন হবে। ঈমানের পূর্বে দানের কোনো ছওয়াব পাওয়া যায় না; বরং ঈমানের সাথেই ইবাদত হতে হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন– وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ তাদের দেওয়া ধন-মাল কবুল না হওয়ার কারণ তা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরি করেছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বিশ্বনবী ﷺ-কে বলেন–ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহিলিয়া যুগে ইবনে জুদয়ান আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখত, গরিব-মিসকিনদেরকে খাওয়াত, দাস মুক্ত করত, তা কি তার কোনো উপকারে আসবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর করলেন, না। কেননা সে কোনো দিন এ কথা বলেনি যে, হে আমার রব তুমি আমাকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা করে দিও।

অতএব ثُمَّ এর অর্থ এভাবে হবে যে, فَعَلَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ بَقِيَ عَلٰى إِيْمَانِهِ حَتّٰى الْوَفَاةِ অর্থাৎ এ সমস্ত ভালোকাজ সে মু'মিন অবস্থায় করেছে, তারপর মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অথবা, আয়াতের অর্থ এভাবে হবে যে, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِأَنَّ هٰذَا نَافِعٌ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ অতঃপর তা মুমিনদের জন্য আল্লাহর নিকট লাভজনক হবে। কারো মতে ثُمَّ অর্থ এখানে وَاوْ।

অথবা, উত্তর এভাবে হতে পারে যে, উল্লেখের দিক থেকে পরে কিন্তু অস্তিত্বের দিক থেকে আগেই হবে। –[কাবীর, কুরতুবী]

দয়া ও ধৈর্যের গুরুত্ব : কুরআনে কারীমের উক্ত সংক্ষিপ্ত আয়াতে মুমিন সমাজের দু'টি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হলো, সে সমাজের ব্যক্তিরা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের প্রেরণা দেয়। আর দ্বিতীয় হলো, তারা পরস্পরকে দয়া-অনুগ্রহের প্রেরণা দেয়।

কুরআন মাজীদে صَبْر শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত মুমিনের সমগ্র জীবন-ই ধৈর্যের জীবন। ঈমানের পথে পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথেই তার ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহর ফরজ করে দেওয়া ইবাদতসমূহ সুসম্পন্ন করার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহ পালন করার জন্য ধৈর্য অপরিহার্য। আল্লাহর হারাম করা জিনিস বা কাজ হতে বিরত থাকা ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয়। নৈতিক অপরাধ ও পাপ কাজসমূহ পরিহার করা এবং পবিত্র নৈতিকতা গ্রহণ ধৈর্য থাকলেই সম্ভপর হয়। পদে পদে যে পাপের আকর্ষণ ও হাতছানি, তা হতে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভব এ ধৈর্যের বলেই। জীবনে এমন অনেক সময় ও সুযোগ আসে যখন আল্লাহর আইন মানতে গেলে ক্ষতি, কষ্ট, দুঃখ, বিপদ ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়। আর আল্লাহর নাফরমানির পথ অবলম্বন করলে স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা লাভ হবে বলে স্পষ্ট মনে হয়। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ছাড়া কোনো মু'মিনই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো দয়া ও সহানুভূতি। বস্তুত ঈমানদার সমাজ কখনো নির্মম ও পাষাণ-হৃদয় ও অত্যাচারী সমাজ হয় না; বরং তা মানবতার প্রতি দয়াশীল, করুণাময় এবং পরস্পরের প্রতি সুহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ সমাজ হয়ে থাকে। ঈমানদার লোক একজন ব্যক্তি হিসাবেও আল্লাহর দয়াশীলতার প্রতিমূর্তি হয়ে থাকে। আর সমাজ হিসাবেও একটি মু'মিন জন-সমষ্টি আল্লাহর সে রাসূলের প্রতিনিধির মতো।

দয়া এবং করুণার গুরুত্ব বুঝাবার জন্য অনেক হাদীসের মধ্য হতে দু একটি হাদীসের উল্লেখ-ই যথেষ্ট। যেমন–

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَرْحَمِ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا- (تِرْمِذِيْ)

অর্থাৎ যে লোক আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া-স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না; সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।

ডানপন্থি এবং বামপন্থি : اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ -এর শাব্দিক অর্থ 'ডান পার্শ্বের সহচরবৃন্দ'। এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাতের বিবিধ সুখ-সম্ভোগের অধিকারী যারা, তারাই ডান পার্শ্বের সহচর। এ কারণে অনুবাদে ডানপন্থি বলতে সৌভাগ্যশালী বুঝানো হয়েছে।

اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ-এর শাব্দিক অর্থ 'বাম পার্শ্বের সহচরবৃন্দ, কুরআনে কারীমের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাম পার্শ্বের সহচর বলতে–যারা জাহান্নামের বিবিধ শাস্তি ভোগ করবে, তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এ জন্য অনুবাদে বামপন্থি বলতে হতভাগা বুঝানো হয়েছে।

مُؤْصَدَةٌ **শব্দে দু'টি কেরাত :** জমহুর মীমের পর وَاوْ দিয়ে পড়েছেন অর্থাৎ مُوْصَدَةٌ আর আবূ আমর, হামযা এবং হাফস (র.) মীমের পরে هَمْزَةٌ দিয়ে مُؤْصَدَةٌ পড়েছেন।

سُوْرَةُ الشَّمْسِ : সূরা আশ্-শামস

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম শব্দই হলো اَلشَّمْسُ একে কেন্দ্র করেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৫টি আয়াত, ৫৪টি বাক্য এবং ২৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতা তখন প্রবলভাবে শুরু হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলকথা : নেকী-বদী, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য বুঝানোই এ সূরার বিষয়বস্তু। যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে এবং পাপের পথে চলতেই থাকে, তাদেরকে অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

সূরাটির মূল বক্তব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। সূরার প্রথম হতে ১০ আয়াত পর্যন্ত প্রথম অংশ। আর ১১ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে।

১. চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত আসমান-জমিন পরস্পর হতে ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় পরস্পর হতে ভিন্নতর এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। এ দু'টি এদের বাহ্যিকরূপের দিক দিয়ে যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ফলাফল ও পরিণতিও এক হতে পারে না।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দেহইন্দ্রিয় ও মানসশক্তি দান করে দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর করে ছেড়ে দেননি; বরং এক স্বভাবজাত প্রত্যাদেশের সাহায্যে তার অবচেতনায় পাপ-পুণ্যের পার্থক্য, ভালো-মন্দের তারতম্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা মানুষর মধ্যে পার্থক্য বোধ, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যেসব শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেগুলোকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে সে নিজের মধ্যকার ভালো ও মন্দ প্রবণতাসমূহ হতে কোনোটিকে তেজস্বী করে আর কোনোটিকে দমন করে, তার উপরই তার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সে যদি তালো প্রবণতাসমূহ সমৃদ্ধ ও তেজস্বী করে এবং খারপ প্রবণতা হতে নিজেকে মুক্ত রাখে, তাহলে সে প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার ভালো প্রবণতাসমূহকে দমন করে এবং খারাপ প্রবণতাসমূহকে তেজস্বী করে, তবে তার অকল্যাণ ও ব্যর্থতা অনিবার্য।

সূরাটির দ্বিতীয় অংশে ছামূদ জাতির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করে রেসালাত ও নবুয়তের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ভালো ও মন্দ পর্যায়ে মানব প্রকৃতিতে রক্ষিত ও গচ্ছিত ইলহামী জ্ঞানই নিজ স্বভাবে মানুষের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়, তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে না পারার দরুন মানুষ ভালো ও মন্দ পর্যায়ে ভুল দর্শন ও মানদণ্ড নিরূপণ করে পথভ্রষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ স্বভাবজ্জাত ইলহামের সাহায্যের জন্য নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ওহী নাজিল করেছেন। তাঁরা পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দকে লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। দুনিয়াতে নবী রাসূলগণকে পাঠানোর এটাই মূল উদ্দেশ্য। ছামূদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.)-কে এ ধরনেরই একজন নবী করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি ও জনগণ নিজেদের নফসের দোষযুক্ত ভাবধারায় ডুবে গিয়ে এমনভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যে, তারা এ নবীকে সত্য বলে মানল না। তাদের দাবি অনুযায়ী একটি উষ্ট্রীকে যখন তিনি মু'জিযারূপে তাদের সম্মুখে পেশ করলেন, তখন তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও উক্ত জাতির দুষ্টতম ব্যক্তি জাতির ইচ্ছানুযায়ী তাকে হত্যা করে দিল। তারই ফলে শেষ পর্যন্ত গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

ছামূদ জাতির দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হযরত সালেহ (আ.)-এর জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, মক্কায় তখন ঠিক অনুরূপ অবস্থায়ই উদ্ভব হয়েছিল। এ কারণে সে অবস্থায় এ কাহিনী শুনানো স্বতঃই মক্কাবাসীকে একথা বুঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল যে, ছামূদ জাতির এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তাদের উপর পুরোপুরি খাটিয়ে যাচ্ছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ضَوْءُهَا ـ

১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের আলোর।

٢. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا تَبِعَهَا طَالِعًا عِنْدَ غُرُوْبِهَا ـ

২. আর শপথ চন্দ্রের যখন তা তার অনুগামী হয় তার অস্তগমনের পর পরবর্তী আগমনকারী হিসাবে উদিত হয়

٣. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا بِارْتِفَاعِهِ ـ

৩. আর শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে সমুচ্চ হয়ে।

٤. وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا يُغَطِّيْهَا بِظُلْمَتِهِ وَاِذَا فِى الثَّلٰثَةِ لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا فِعْلُ الْقَسَمِ ـ

৪. আর শপথ রজনীর, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে তাকে স্বীয় অন্ধকারে ঢেকে ফেলে। اِذَا অব্যয়টি তিন স্থানেই ظَرْفِيَّتْ-এর জন্য আর فِعْل قَسَم তন্মধ্যে عَامِلْ।

٥. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا ـ

৫. আর শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন

٦. وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا بَسَطَهَا ـ

৬. আর শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন বিছিয়ে দিয়েছেন।

٧. وَنَفْسٍ بِمَعْنٰى نُفُوْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فِى الْخِلْقَةِ وَمَا فِى الثَّلَاثَةِ مَصْدَرِيَّةٌ اَوْ بِمَعْنٰى مَنْ ـ

৭. আর শপথ আত্মার অর্থাৎ আত্মাসমূহের এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন সৃষ্টিতে। আর مَا অব্যয়টি তিন স্থানেই مَصْدَرِيَّه অথবা مَنْ অর্থে।

٨. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا بَيَّنَ طَرِيْقَيِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَاَخَّرَ التَّقْوٰى رِعَايَةً لِرُؤُوْسِ الْاٰيِ وَجَوَابُ الْقَسَمِ ـ

৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন ভালো ও মন্দ উভয় পথ প্রদর্শন করেছেন আর আয়াতের সামঞ্জস্যতার জন্য تَقْوٰى-কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াত উল্লিখিত শপথের জওয়াব।

٩. قَدْ اَفْلَحَ حُذِفَتْ مِنْهُ اللَّامُ لِطُوْلِ الْكَلَامِ مَنْ زَكّٰهَا طَهَّرَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ ـ

৯. সে-ই সফলকাম হবে এখানে বক্তব্য দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় لَامْ বিলুপ্ত করা হয়েছে। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে গুনাহ হতে পবিত্র করবে

১০. وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنْ دَسّٰهَا اَخْفَاهَا بِالْمَعْصِيَةِ اَصْلُهٗ دَسَّسَهَا اُبْدِلَتِ السِّيْنُ الثَّانِيَةُ اَلِفًا تَخْفِيْفًا ـ

১০. আর সে-ই ব্যর্থ হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে গুনাহের দ্বারা আচ্ছাদিত করবে দَسّٰهَا শব্দটি মূলত دَسَّسَهَا ছিল। দ্বিতীয় س টিকে সহজকরণার্থে আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

র্ব সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় ঈমান ও নেককাজ এবং কুফর ও বদকাজের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছিল। অত্র রায়ও ছামূদ জাতির কুফর ও আল্লাহদ্রোহীতার উল্লেখ করে মক্কার কুরাইশদেরকে তাদের কুফর-শিরক ও আল্লাহদ্রোহীতার অশুভ রিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا আয়াতে ضُحٰى দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আয়াত "وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا" -এর মধ্যে ضُحٰى দ্বারা কি ঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে আলিমগণের বিভিন্ন মতামত দেখা যায়–

. হযরত মুকাতিল (র.)-এর মতে, ضُحٰى অর্থ– সূর্যের তাপ।

. ইমাম কালবী (র.) ও মুজাহিদের মতে, ضُحٰى অর্থ– সূর্যরশ্মি।

. হযরত কাতাদাহ (র.), ইবনে কুতাইবা (র.) ও ফাররা (র.) প্রমুখগণের মতে, ضُحٰى দ্বারা এখানে পূর্ণ দিবসকে বুঝানো হয়েছে।

. ইবনে জারীর (র.) বলেছেন–আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা সূর্য এবং দিনের শপথ করেছেন। –[নূরুল কোরআন]

. কারো কারো মতে, এখানে ضُحٰى দ্বারা সূর্যের রশ্মি ও তাপ উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আরবি ভাষায় ضُحٰى বলতে সে সময়কে বুঝায় যখন সকালবেলা সূর্য অনেকটা উপরে উঠে এবং তার কিরণ প্রখর হয়। কারণ তা তখন শুধু আলোই বিতরণ করে না; বরং উত্তাপও দেয়। –[কাবীর]

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا আয়াতে تَلٰهَا-এর মর্মার্থ : আয়াত وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا -এর মধ্যে تَلٰهَا -এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মতামত নিম্নরূপ–

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন– "تَبِعَهَا طَالِعًا عِنْدَ غُرُوْبِهَا" অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় চন্দ্র উদিত হয়ে তাকে অনুসরণ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এরূপ বর্ণিত আছে।

খ. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, চান্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করার অর্থ হলো এটা সূর্য হতে আলো গ্রহণ করে।

গ. হযরত কাতাদাহ ও কালবী (র.) -এর মতে, এটা দ্বারা চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখের কথা বলা হয়েছে। কেননা প্রথম তারিখে চন্দ্র সূর্যাস্তের পর পরই উদিত হয়।

ঘ. ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, চন্দ্র যখন গোল হয়ে পরিপূর্ণতায় পৌছে তখন সে সূর্যের ন্যায় আলো দিতে থাকে। এখানে সে সময়ের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা আলো প্রদানে তা (এ সময়ে) সূর্যের অনুসরণ করে। উল্লেখ্য যে, تَلَا يَتْلُوْ বাবে نَصَرَ হতে ব্যবহৃত। এটার অর্থ হলো– কারো পিছু গমন করা, কারো অনুসরণ করা।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا : আয়াতের অর্থ– দিনের শপথ যখন তা সমুজ্জ্ব হয়ে তাকে প্রকাশ করে। আলোচ্য আয়াতে جَلّٰهَا-এর هَا -এর مَرْجِعْ কি হবে এবং এর মর্মার্থ কি হবে–এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. কারো কারো মতে, هَا -এর مَرْجِعْ হবে اَلشَّمْسِ অর্থাৎ দিনের শপথ যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, هَا -এর مَرْجِعْ হবে اَلْاَرْضِ অর্থাৎ দিবস জমিনকে প্রকাশ করে।

গ. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, مَا -এর مَرْجِعْ হলো اَلدُّنْيَا অর্থাৎ দিবস (সমগ্র) দুনিয়াকে প্রকাশ করে।

ঘ. অথবা, مَا -এর مَرْجِعْ হলো ظُلْمَة অর্থাৎ দিবস অন্ধকারকে আলোকিত করে।

ঙ. অথবা, আয়াতটির মর্মার্থ এই যে, "مَنْ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَيَوَانِهَا حَتّٰى ظَهَرَ لِاسْتِتَارِهِ لَيْلًا وَانْتِشَارِهِ نَهَارًا" অর্থাৎ পৃথিবীর প্রাণীকুল যেহেতু রাতের বেলায় লুকিয়ে থাকে এবং দিবাভাগে আত্মপ্রকাশ করে সেহেতু যেন দিন তাদেরকে প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য যে, উপরে কতিপয় ক্ষেত্রে مَرْجِعْ উল্লেখের পূর্বেই ضَمِير উল্লেখের কথা বলা হয়েছে- এটা দূষণীয় নয়, কেননা আরবি ভাষায় এরূপ প্রচলন রয়েছে। –[কুরতুবী, কবীর]

مَا -এর অর্থ : কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতে যথাক্রমে مَا بَنٰهَا ، مَا طَحٰهَا এবং مَا سَوّٰهَا -এর مَا শব্দটি مَصْدَرْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন তার অর্থ হবে-আকাশমণ্ডল ও তাকে নির্মাণ করার শপথ, পৃথিবী এবং তার বিস্তৃর্ণ হওয়ার শপথ, মানুষ এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার শপথ; কিন্তু পরবর্তী বাক্য এ অর্থের সাথে সামঞ্জস্য হয় না। অতএব, অন্যান্য তাফসীরকার এ مَا -কে مَنْ বা اَلَّذِيْ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা অর্থ করেন- যিনি আকাশমণ্ডল নির্মাণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিক। প্রশ্ন হতে পারে যে, আরবি ভাষায় 'مَا' শব্দটি তো কেবল নিষ্প্রাণ বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জবাবে বলা যায় যে, এরূপ প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানেই مَا শব্দটি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ -এর স্থলে مَنْ বা اَلَّذِيْ অর্থে مَا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمَنْ بَنٰهَا না বলে وَمَا بَنٰهَا বলার কারণ : পবিত্র কুরআনে কোনো কোনো স্থানে مَنْ-এর স্থলে مَا-এর ব্যবহার দেখা যায় এটা অপ্রতুল হলেও ভাষাগত দিক থেকে ভুল নয়। যেমন, অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِنَ النِّسَاۤءِ এখানে مَنْ نَكَحَ হওয়া দরকার ছিল।

অথবা, এখানে وَالْقَادِرُ الْعَظِيْمُ الشَّأْنِ -এর জন্য تَفْخِيم شَان-وَصْف -কে বুঝানো হয়েছে। যেন এভাবে বলা হয়েছে যে, الَّذِيْ بَنٰهَا –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

نَفْس -এর অর্থ : নফস বলতে কতিপয় তাফসীরকারক আকৃতিগত মানুষ বা মানুষের দেহ বুঝাচ্ছেন। অর্থাৎ শপথ মানুষের, আর যিনি মানুষকে এমন সুঠাম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। আত্মার সুঠামতা বা সুবিন্যস্ততা বলতে ধীশক্তি–কথা বলা, কানে শোনা, চোখে দেখা ও চিন্তাশক্তিকে বুঝাচ্ছেন। নফস অর্থ আত্মা বললে মানুষের সাথে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত হয়। আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ বস্তুরই শপথ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ বস্তু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব, নফস বলতে আত্মা না হয়ে দেহ বিশিষ্ট মানুষই অর্থ করা বেশি যুক্তিযুক্ত।' –[খাযেন, মা'আলিম]

سَوّٰهَا -এর অর্থ : سَوّٰى শব্দটি تَسْوِيَةٌ হতে নির্গত। تَسْوِيَةٌ অর্থ– সুবিন্যস্ত করা। অর্থাৎ তাকে একটি দেহ দান করা হয়েছে। দেহের এ একহারা গঠন, হাত-পা ও মগজের সবকিছুই মানুষের মতো জীবন যাপনের জন্য উপযোগী। তাকে দেখার, শোনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য যে ইন্দ্রিয়শক্তি দেওয়া হয়েছে তা তার আনুপাতিকতা ও বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে মানুষের জন্য জ্ঞানার্জনের সর্বোত্তম উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। তাকে চিন্তা ও বিবেকশক্তি, যুক্তি প্রদান ও মর্মগ্রহণ, কল্পনাশক্তি, স্মরণশক্তি, পার্থক্যবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি এবং অন্যান্য সকল শক্তি স্বাভাবিকভাবে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মানুষকে–জন্মগত পাপী নয়; বরং সঠিক প্রকৃতিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তার দৈহিক গঠন ও অঙ্গ সঙ্কর এমন কোনো সৃষ্টিগত বক্রতা রেখে দেওয়া হয়নি, যার কারণে সে ইচ্ছা করলেও সঠিক, সোজা ও ঋজু পথ গ্রহণ করতে পারে না। কুরআনুল কারীমের ভাষা হলো– فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ –[কাবীর]

অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তানই 'ফিতরাত' তথা ইসলামের অনুসারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তার পিতামাতাই তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকে পরিণত করে।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا আয়াতে اِلْهَامٌ-এর মর্মার্থ : اِلْهَامٌ শব্দটির মূল হলো لَهْمٌ -এর অর্থ– গলাধঃকরণ করা। যেমন বলা হয় لَهَمَ الشَّيْءَ وَالْتَهَمَهُ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি এ জিনিসটি গিলে ফেলেছে, গলাধঃকরণ করেছে। এ মৌল শাব্দিক অর্থের প্রেক্ষিতে শব্দটি আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো ধারণা কল্পনা বা চিন্তাকে অচেতনভাবে বান্দার মন ও মগজে বদ্ধমূল করে দেওয়া

বুঝানোর জন্য একটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মানব প্রকৃতিতে তার পাপ ও পুণ্য এবং সতর্কতা ইলহাম করার অর্থ দুটি- একটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকালেই মানুষের প্রকৃতিতে পাপ-পুণ্য উভয়ের প্রবণতা ও ঝোঁক রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের অবচেতনায় আল্লাহ তা'আলা এ ধারণা ও বিশ্বাস গচ্ছিত রেখেছেন যে, নৈতিক চরিত্রে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বলতে একটি কথা আছে। আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যবোধ জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়েছেন। এ কথাটি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টিকে তার মর্যাদা ও স্বরূপ অনুযায়ী স্বভাবজাত ইলহাম দিয়েছেন। সূরা ত্বা-হায় এ কথাটি বলা হয়েছে এ ভাষায় اَلَّذِیْٓ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی 'তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সৃষ্টিগত দেহ সংগঠন দান করেছেন এবং পরে পথ প্রদর্শন করেছেন, জীব-জন্তুর সকল জাতি ও প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মাছ নিজেই সাঁতার কাটার, পাখি উড়তে পারার, মৌমাছি মৌচাক রচনার, আর বাবুই পাখি বাসোপযোগী বাসা তৈরি করার জ্ঞান পেয়ে থাকে এ স্বভাবজাত ইলহামী জ্ঞান হতে। মানুষকেও তার বিভিন্ন মর্যাদা ও দায়িত্ব হিসাবে আলাদা আলাদা ধরনের ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষ একাধারে একটি জীব সত্তা, এক বিবেক সম্পন্ন সত্তা এবং এক নৈতিক সত্তাও বটে। এ তিনটি সত্তার চাহিদা অনুযায়ী যা দরকার তা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইলহামের মাধ্যমে দান করেছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ যে সকল শপথ করেছেন তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে উক্ত আয়াতদ্বয়। এখানে লক্ষণীয় যে, উপরে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বিপরীতধর্মী বস্তুর শপথ করেছেন। যেমন–চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিবস, আসমান-জমিন ইত্যাদি। এ সব বিশ্ব প্রকৃতির সাহায্যে-প্রমাণ পেশ করার পর মানুষের নিজের সত্তাকে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষকে অত্যন্ত ভারসাম্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তার স্বভাবে পাপ ও পুণ্য দুই ধরনের গুণই ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সে যদি পাপ হতে স্বীয় নফসকে পবিত্র করে পুণ্যকে প্রাধান্য দেয়, তাহলেই সে সফলকাম হবে।

تَزْكِیَةٌ : এর অর্থ হলো পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ, উৎকর্ষ সাধন ও ক্রম বিকাশ বিধান। এর মর্মার্থ এই যে, যে লোক নিজের সত্তাকে পাপ হতে পবিত্র রাখবে, তাকে উৎকর্ষ দান করে তাকওয়ার সুউচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং তাকে ভালো ও কল্যাণের ক্রমবিকাশ দান করতে থাকবে, সে কল্যাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে قَدْ سَبَقَ-এর অর্থ হলো– দমন করা, গোপন করা, লুকিয়ে রাখা, হরণ-অপহরণ করা এবং পথভ্রষ্ট করা, অর্থাৎ যে লোক নিজের নফস বা সত্তায় অবস্থিত ভালো প্রবণতাসমূহকে উৎকর্ষ ও বিকাশ দানের পরিবর্তে তাকে দমন করবে, তাকে বিভ্রান্ত করে খারাপ প্রবণতার দিকে পরিচালিত করবে এবং পাপ, লিপ্সা ও খারাপ প্রবণতাকে অতিশয় শক্তিশালী বানাবে সে লোক অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

কসমের জবাব : সূরার প্রথম থেকে কয়েকটি কসমের উল্লেখ রয়েছে। এ কসমগুলোর জবাব সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়, কারো মতে জবাব হলো, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا তবে এ বক্তব্যের উপর একটি প্রশ্ন জাগে যে, যদি তা কসমের জবাব হয় তাহলে لَقَدْ اَفْلَحَ হওয়া দরকার ছিল। তার উত্তরে ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, لَامْ -কে হযফ করা হয়েছে। কেননা বক্তব্য অনেক দীর্ঘ হয়েছে। এ দীর্ঘ বক্তব্যই لَامْ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

কারো মতে জবাব উহ্য রয়েছে, তা হলো لَیُبْعَثُنَّ

অথবা لَیُدَمْدِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰی اَهْلِ مَكَّةَ لِتَكْذِیْبِهِمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا دَمْدَمَ عَلٰی ثَمُوْدَ لِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا صَالِحًا

কারো মতে এখানে বাক্যকে আগে পরে নিতে হবে। উহ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। তখন বাক্য এভাবে হবে যে, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا –[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

١١. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ رَسُوْلَهَا صَالِحًا بِطَغْوٰهَا بِسَبَبِ طُغْيَانِهَا .

১১. অসত্যারোপ করেছিল ছামূদ সম্প্রদায় তাদের রাসূল সালেহ (আ.)-কে অবাধ্যতা বশত নিজেদের অবাধ্যতার কারণে।

١٢. اِذَا انْبَعَثَ اَسْرَعَ اَشْقٰهَا وَاسْمُهُ قُدَارُ اِلٰى عَقْرِ النَّاقَةِ بِرِضَاهُمْ .

১২. যখন তৎপর হয়েছিল তড়িঘড়ি উদ্যোগ গ্রহণ করল তাদের মধ্য হতে সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তার নাম কুদার. সে তার সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টিকল্পে উক্ত উষ্ট্রীকে হত্যা করতে উদ্যোগী হলো।

١٣. فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَالِحٌ نَاقَةَ اللّٰهِ اَىْ ذَرُوْهَا وَسُقْيٰهَا وَشُرْبَهَا فِىْ يَوْمِهَا وَكَانَ لَهَا يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمٌ .

১৩. তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর রাসূল সালেহ (আ.) বলল, আল্লাহর উষ্ট্রী অর্থাৎ তাকে স্ব-অবস্থায় থাকতে দাও। এবং তার পানি পান করার বিষয়ে সাবধান হও অর্থাৎ তার জন্য নির্ধারিত দিনে তাকে পানি পান করতে দাও। আর তাদের জন্য একদিন ও তার জন্য একদিন নির্দিষ্ট ছিল।

١٤. فَكَذَّبُوْهُ فِىْ قَوْلِهٖ ذٰلِكَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ نُزُوْلُ الْعَذَابِ بِهِمْ اِنْ خَالَفُوْهُ فَعَقَرُوْهَا قَتَلُوْهَا لِيَسْلَمَ لَهُمْ مَاءُ شُرْبِهَا فَدَمْدَمَ اَطْبَقَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ الْعَذَابَ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا اَىِ الدَّمْدَمَةَ عَلَيْهِمْ اَىْ عَمَّهُمْ بِهَا فَلَمْ يَفْلِتْ مِنْهُمْ اَحَدًا .

১৪. তারা রাসূলকে মিথ্যারোপ করল তাঁর এ বক্তব্য যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এবং তারা যদি তাতে অন্যথা করে তবে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে। এবং তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল পানিকে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল। অনন্তর অবতীর্ণ করলেন ঘনীভূত করলেন তাদের উপর তাদের প্রতিপালক শাস্তি তাদের-ই গুনাহের কারণে এবং তাকে সর্বব্যাপী করলেন অর্থাৎ তাদের শাস্তি অবতারণাকে। মোদ্দাকথা, তাদের উপর সর্বব্যাপী আজাব নাজিল হয়, ফলে তাদের মধ্য হতে কেউই বাঁচতে পারেনি।

١٥. وَلَا بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ يَخَافُ تَعَالٰى عُقْبٰهَا تَبِعَتَهَا .

১৫. আর তিনি শব্দটি فَ ও وَاوٌ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত ভয় করেননি আল্লাহ তা'আলা তার পরিণাম ফলাফল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে ছামূদ সম্প্রদায়ের উল্লেখের তাৎপর্য : ইতঃপূর্বে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নফসের প্রতি ফুজূর ও তাকওয়ার ইলহাম করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ফুজূর ও তাকওয়ার এ ইলহামী জ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় বিস্তারিত হেদায়েত লাভ করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণকে বিস্তারিত হেদায়েত দান করেছেন। এ ছাড়া ফুজূর ও তাকওয়া এ দু'টির অনিবার্য ফল ও পরিণতি হলো শাস্তি ও শুভ প্রতিদান। নফসকে ফুজূর হতে পবিত্র করা ও তাকওয়া দ্বারা এর উৎকর্ষ সাধন করার ফল হলো কল্যাণ ও সাফল্য। আর নফসের ভালো প্রবণতাসমূহকে দমন করে একে পাপের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার নিশ্চিত পরিণতি হলো ব্যর্থতা ও বিপর্যয়।

এ কথাটি বুঝানোর জন্য একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। আর সে জন্য ছামূদ জাতিকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে এ ছামূদ জাতির এলাকাই মক্কাবাসীদের অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। উত্তর হেজাজে এ জাতির ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি বর্তমান ছিল। মক্কাবাসীরা সিরিয়ার দিকে বাণিজ্যিক সফর উপলক্ষে এ এলাকার নিকট দিয়ে যাতায়াত করত। ইসলাম পূর্বকালীন আরবি কাব্যে এ জাতির উল্লেখ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই আরববাসীদের মধ্যে এ জাতির কথা সাধারণ পরিচয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হতো।

ছামূদ জাতির সংক্ষিপ্ত কাহিনী : ছামূদ ছিল সাম ইবনে নূহ-এর বংশধর। ছামূদের নামেই এ জাতির নামকরণ। উত্তর-পশ্চিম আরবের 'আল-হাজার' নামক এলাকায় তারা ছিল খুব শক্তিমান জাতি। তারা পাহাড় খোদাই করে বাড়িঘর নির্মাণ করত। তারা নিজেদের ধন-প্রাচুর্যে ও জ্ঞান-গরিমায় মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। লৌহের তৈরি প্রতিমা পূজা করত এবং নানা প্রকার পাপাচার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকত। তাদের হেদায়েতের জন্য তাদেরই বংশোদ্ভূত হযরত সালেহ (আ.) -কে আল্লাহ নবী রূপে পাঠালেন। নবী তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং নবীকে মিথ্যারোপ করে কোনো নিদর্শন দেখাতে বলে। হযরত সালেহ (আ.) -এর নবুয়তের মু'জিযা হিসাবে আল্লাহ পাথরের মধ্য হতে একটি জীবন্ত উষ্ট্রী তৈরি করে দেন। এ ঘটনা দেখে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত সালেহ (আ.) বললেন– এটা আল্লাহর উষ্ট্রী, সে নিজ ইচ্ছামতো যেখানে-সেখানে চরে বেড়াবে। একদিন সব পানি তার জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। আর তোমরা তার কোনো ক্ষতি করলে শক্ত আজাব নাজিল হবে। ছামূদদের মধ্যে কুদার নামক এক সর্দার উষ্ট্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং তার পা কেটে মেরে ফেলল। এ অপরাধের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে তাদের উপর আজাব নাজিল হলো। এক বিকট বজ্রধ্বনিতে তারা নিজ নিজ গৃহে মরে গেল।

بِطَغْوَاهَا-এর মর্মার্থ : بِطَغْوَاهَا-এর মর্মার্থের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

ক. জমহুরের মতে তার অর্থ হলো بِطُغْيَانِهَا অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানিতে সীমালঙ্ঘন করা। হযরত কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র.)ও এ মত পোষণ করেছেন।

খ. মুহাম্মদ কা'আব ও একদল মুফাস্সিরে মতে بِطَغْوَاهَا অর্থ أَيْ بِأَجْمَعِهَا অর্থাৎ তারা সকলেই (মিথ্যারোপ করেছে)।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– بِطَغْوَهَا-এর অর্থ হলো, "بِعَذَابِهَا الَّذِيْ وُعِدَتْ بِهِ" অর্থাৎ যে আজাবের ওয়াদা করা হয়েছিল, সে আজাবকে তারা অস্বীকার করেছে।

ঘ. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন– "بِسَبَبِ طُغْيَانِهَا" অর্থাৎ তারা সীমালঙ্ঘন করার কারণে হযরত সালেহ (আ.) -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

কে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছে? : উষ্ট্রীটিকে কে হত্যা করেছে এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়–

১. জমহূর মুফাস্সিরগণের মতে ছামূদদের সর্দার পাপিষ্ট নরাধম কুদার ইবনে সালিফ উহাকে হত্যা করেছে।

২. কেউ কেউ বলেছেন কুদার সহ এক দল লোক উক্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে কওমের লোকদের সমর্থন ও সাহায্যতায় কুদার উক্ত উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ-এর মধ্যে رَسُوْل দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? : فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ-এর মধ্যে রাসূল দ্বারা সর্বসম্মতভাবে হযরত সালেহ (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।

نَاقَةَ اللّٰهِ-এর মহল্লে ই'রাব কি এবং তার মর্মার্থ কি? : نَاقَةَ اللّٰهِ মহল্লান মানসূব হয়েছে। কেননা এটা تَحْذِيْر হয়েছে। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ হবে–উষ্ট্রীটিকে হত্যা করা হতে বিরত থাক, উহাকে পানি পান করতে বাধা দিও না। যেমন–اَلْاَسَدَ اَلْاَسَدَ এবং اَلصَّبِيَّ اَلصَّبِيَّ বলা হয়ে থাকে।

دَمْدَمَ-এর অর্থ :

১. دَمْدَمَ-এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরীনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। কারো মতে, دَمْدَمَ অর্থ তাদের উপর চতুর্দিক হতে আজাব এসে পড়েছে।

২. কারো মতে, কোনো দাফনকৃত বস্তুকে مَدْمُوْم বলা হয়। অর্থাৎ তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে, জমিন সমান করা হয়েছে। আর তাদের লাশ সে জমিনের নিচে পড়ে গেছে।

৩. অথবা, دَمْدَمَ অর্থ غَضِبَ অর্থাৎ دَمْدَمَةٌ বলা হয় ঐ কথাকে যা দ্বারা অন্যকে শাসানো বা ধমকানো হয়। –[কাবীর]

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا-এর অর্থ : এ বাক্যের দু'টি অর্থ–

১. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো নন। তারা কোনো জাতি বা দলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার পরিণতি ও ফলাফল শতবার চিন্তা করে; কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ও সর্বোচ্চ। ছামূদ জাতির ন্যায় অন্য কোনো শক্তি আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত এ পদক্ষেপের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠতে পারে, অথবা পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে–এমন কোনো ভয় আল্লাহর নেই।

২. অথবা, لَا يَخَافُ-এর فَاعِلْ হযরত 'সালেহ' (আ.)। অর্থাৎ সালেহ (আ.) এ আজাবের শেষ পরিণতি সম্পর্কে কোনো ভয় করেন না। –[কাবীর]

৩. ইমাম কালবী ও সুদ্দী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উষ্ট্রীকে হত্যা করল আর এর পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, তা চিন্তাও করল না। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ اللَّيْلِ : সূরা আল-লাইল

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম শব্দ اَللَّيْلُ -কে কেন্দ্র করে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২১টি আয়াত, ৭১টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরা ও এর পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু প্রায় এক ও অভিন্ন। এটা হতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মানব জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং তার পরিণাম ও ফলাফলের তারতম্য বর্ণনা করাই এ সূরার বিষয়বস্তু।

এর মূলবক্তব্য দু'টি ভাগে বিভক্ত। শুরু হতে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত তার প্রথম ভাগ। এ অংশে বলা হয়েছে, মানবজাতির ব্যক্তি, জাতি ও দলসমূহ দুনিয়াতে যে শ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে, তা স্বীয় নৈতিকতার দিক দিয়ে ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধী। যেমন পরস্পর বিরোধী দিন ও রাত এবং পুরুষ জীব ও স্ত্রী জীব। এরপর দু'প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বসমূহ এই- দান-সদকা করা, আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী অবলম্বন এবং ভালো ও কল্যাণকে, ভালো ও কল্যাণ বলে মেনে নেওয়া। অপর ধরনের বিশেষত্বসমূহ হচ্ছে কার্পণ্য ও বখিলী, আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষ সম্পর্কে নির্ভীক হওয়া, ভালো কথাকে মিথ্যা অভিহিত করে অমান্য করা। পরে বলা হয়েছে যে, এ বিশেষত্বসমূহ নিজস্ব দিক দিয়ে যতটা পরস্পর বিরোধী, এদের ফলাফল অবলম্বনকারীরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করবে। তাদের জন্য ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলোকে সহজ করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কর্মনীতি গ্রহণকারীদের জন্য ভালোকাজ কঠিন ও মন্দকাজ সহজ হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে দুনিয়ার এ সম্পদ যা অর্জনের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত- তার মালিকের সাথে কবরে তো যাবে না। তাহলে মৃত্যুর পর তা মালিকের কোন কাজে আসবে?

দ্বিতীয় অংশেও সংক্ষেপে তিনটি মৌলনীতি পেশ করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনবহিত করে ছেড়ে দেননি। জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে ঠিক কোন পথটি সুষ্ঠু ও সঠিক তা মানুষকে ভালোভাবে জানিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিজের উপর গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত মৌলতত্ত্ব এই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাত-উভয়ের নিরঙ্কুশ মালিক এক আল্লাহই। দুনিয়া পেতে চাইলে তারই নিকট হতে পেতে হবে। আর পরকাল চাইলে তার দাতাও সে আল্লাহ। এখন তুমি বান্দা তার নিকট কি চাইবে, তার ফয়সালার দায়িত্ব তোমার নিজের।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, রাসূল ও কিতাবের সাহায্যে যে কল্যাণ বিধান পেশ করা হয়েছে তা যে হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে, অমান্য ও অস্বীকার করবে তার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলি প্রস্তুত হয়ে আছে। অপরদিকে যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি ঈমান এনে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করবে, আল্লাহ তার উপর রাজি-খুশি হবেন এবং সেও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

সূরাটির শানে নুযূল : সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। তার আয়াতসমূহের অভিব্যক্তি সাধারণ হলেও বহু বিশিষ্ট তাফসীরকারের মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ নামক জনৈক ধর্মদ্রোহী সম্বন্ধে এ সূরা নাজিল হয়েছে। আরবের মধ্যে তারা উভয়েই ধনবান ও নেতৃস্থানীয় ছিল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে চরিত্র, ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপে বিরাট পার্থক্য ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত অর্থ ইসলামের উন্নতি ও কল্যাণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহায্যে এবং মুসলমানের উপকার এবং বিভিন্নরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেছেন, পক্ষান্তরে উমাইয়া তার সঞ্চিত অর্থরাশি এক কপর্দকও কোনোরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেনি। অধিকন্তু উমাইয়া ভয়ানক ইসলাম বিদ্বেষী ছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে সে তার কৃতদাস হযরত বেলালের উপর ভীষণ অত্যাচার করত। হযরত আবূ বকর (রা.) এ সংবাদ শ্রবণে দশ সহস্রাধিক স্বর্ণ মুদ্রা ও নিজ কৃতদাস নাসতাস রুমীর বিনিময়ে হযরত বেলালকে উমাইয়ার নিকট হতে ক্রয় করে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা. আরও কতিপয় নও-মুসলিম দাস-দাসীকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে অত্যাচারী কাফেরদের কবল হতে মুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সঞ্চিত চল্লিশ সহস্র দিরহাম রাসূলুল্লাহ ও সমস্ত মুসলমানদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। চৌত্রিশ হাজার দিরহাম মক্কায় তেরো বছর যাবৎ মুসলমাদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। অবশিষ্ট ছয় হাজার দিরহাম হিজরতের পথে এবং মদীনার মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করেছেন। এভাবে ইসলাম ও ইসলামি উম্মাহর জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েও তিনি কোনো দিন কারো নিকট সাহায্য ও প্রতিদান প্রার্থী হননি। একদা তিনি কম্বল জড়িয়ে বসেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর নবী, এ কম্বল জড়ানো ফকিরকে- যিনি নিজের সমস্ত সম্পদ আপনার জন্য ব্যয় করে নিঃস্ব হয়েছেন- আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সালাম জানিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেছেন, এ দরিদ্রাবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট আছেন কিনা? এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সিদ্দীক (রা.)-কে জানিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, আমি তাতেও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছি, আমি আল্লাহর উপর রাজি আছি- এ সময়ই অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। -[আযীযী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى بِظُلْمَتِهٖ كُلَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

১. শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে তার অন্ধকার দ্বারা, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যলোককে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

٢. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى تَكَشَّفَ وَظَهَرَ وَاِذَا فِى الْمَوْضِعَيْنِ لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا فِعْلُ الْقَسَمِ .

২. শপথ দিবসের, যখন সে আলোকিত হয় প্রকাশিত ও উন্মুক্ত হয়। উভয় ক্ষেত্রে اِذَا অব্যয়টি শুধুমাত্র ظَرْفِيَّه-এর জন্য। আর فِعْل قَسَم তন্মধ্যে عَامِلْ।

٣. وَمَا بِمَعْنٰى مَنْ اَوْ مَصْدَرِيَّةٌ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى اٰدَمَ وَحَوَّاءَ اَوْ كُلَّ ذَكَرٍ وَكُلَّ اُنْثٰى وَالْخُنْثٰى الْمُشْكِلُ عِنْدَنَا ذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَحْنَثُ بِتَكْلِيْمِهٖ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ ذَكَرًا وَلَا اُنْثٰى .

৩. আর শপথ তাঁর যিনি مَا অব্যয়টি مَنْ অর্থে অথবা مصدرية সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী আদম ও হাওয়া কিংবা প্রত্যেক নর ও নারী। আর প্রকৃত উভয় লিঙ্গধারী আমাদের দৃষ্টিতে লিঙ্গ নির্ণয় অসম্ভব বলে গণ্য হলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট সে নর অথবা নারী। সুতরাং কেউ যদি কোনো নর বা নারীর সাথে কথা না বলার শপথ করে এবং উভয় লিঙ্গধারীর সাথে কথা বলে, তবে সে শপথ ভঙ্গকারী রূপে গণ্য হবে।

٤. اِنَّ سَعْيَكُمْ عَمَلَكُمْ لَشَتّٰى مُخْتَلِفٌ فَعَامِلٌ لِلْجَنَّةِ بِالطَّاعَةِ وَعَامِلٌ لِلنَّارِ بِالْمَعْصِيَةِ

৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা তোমাদের আমল বিভিন্ন প্রকৃতির কেউ আনুগত্য দ্বারা বেহেশতের আমল করে, আর কেউ অবাধ্যাচারিতার মাধ্যমে দোজখের কাজ করে।

٥. فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى حَقَّ اللّٰهِ وَاتَّقٰى اللّٰهَ .

৫. সুতরাং যে ব্যক্তি দান করে আল্লাহ তা'আলার হক আর ভয় পোষণ করে আল্লাহকে,

٦. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى اَىْ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِى الْمَوْضِعَيْنِ .

৬. এবং উত্তম বস্তুকে সত্যরূপে গ্রহণ করে উভয় ক্ষেত্রে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উদ্দেশ্য।

٧. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى لِلْجَنَّةِ .

৭. আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ বেহেশতের জন্য।

٨. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بِحَقِّ اللّٰهِ وَاسْتَغْنٰى عَنْ ثَوَابِهٖ .

৮. আর যে কার্পণ্য করল আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে আর অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করল আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার হতে।

٩. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى .

৯. আর উত্তম বস্তুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

١٠. فَسَنُيَسِّرُهٗ نُهَيِّئُهٗ لِلْعُسْرٰى لِلنَّارِ .

১০. আমি তার জন্য সুগম করে দিবো প্রস্তুত করে দিবো কঠোর পরিণামের পথ জাহান্নামের জন্য।

١١. وَمَا نَافِيَةٌ يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰى فِى النَّارِ .

১১. আর না مَا অব্যয়টি نَافِيَة তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে, যখন সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের তাকিদ রয়েছে। আর এ সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে যারা এ দু'টি গুণ অর্জন না করে তাদের পরিণাম অতি ভয়াবহ। –[নূরুল কোরআন]

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى**-এর শানে নুযূল :** আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, হযরত আবূ বকর (রা.) উমাইয়্যা ইবনে খালফের নিকট হতে হযরত বেলাল (রা.)-কে একটি গোলাম এবং কিছু পরিমাণ রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করেন। তাঁর সম্পর্কেই إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى الخ : এখানে আল্লাহ তা'আলা রাত ও দিনের শপথ করেছেন। রাতে সমস্ত জন্তু-জানোয়ার স্ব-স্ব আশ্রয়স্থলে ফিরে যায়, দিনের কর্মব্যস্ততা হতে প্রশান্তি লাভ করে, নিদ্রার ঘোরে ঢলে পড়ে, যে নিদ্রা শরীরের প্রশান্তি এবং অন্তরের খোরাক। অপরদিকে দিনের আগমনে রাতের সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়, মানব জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়, পশু-পাখিরা স্বীয় আস্তানা হতে বের হয়ে আসে। শুধু রাত বা শুধু দিন হলে মানুষের পক্ষে এ পৃথিবীতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

সুতরাং মানুষের জীবন ধারণের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাত-দিনের সৃষ্টি করে দিয়েছেন। –[কাবীর]

আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টি : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আলো ও অন্ধকারকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এতদুভয়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অন্ধকারকে রাত এবং আলোকে দিন হিসাবে রূপ দান করেছেন। –[কুরতুবী]

يَغْشٰى-এর مَفْعُوْل কি? : وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى-এর মধ্যস্থিত يَغْشٰى-এর فَاعِلْ হলো اَللَّيْل কিন্তু এর مَفْعُوْل কি এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, এর مَفْعُوْل হলো اَلنَّهَار অর্থাৎ রাত দিনকে ঢেকে দেয়।

খ. অথবা, এর مَفْعُوْل হলো اَلْاَرْض অর্থাৎ রাত্রি এর অন্ধকার দ্বারা জমিনকে ঢেকে ফেলে।

গ. অথবা, এর مَفْعُوْل হলো اَلْخَلَائِقُ অর্থাৎ সৃষ্টি জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ঘ. অথবা, এর مَفْعُوْل হলো كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে এটা আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অত্র আয়াতে পুরুষ ও স্ত্রীলোক দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى-এর মধ্যে اَلذَّكَر ও اَلْاُنْثٰى তথা নর ও নারী দ্বারা কি বুঝিয়েছেন; এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

ক. এখানে اَلذَّكَرَ-এর দ্বারা হযরত আদম (আ.) ও اَلْاُنْثٰى দ্বারা হযরত হাওয়া (আ.)-কে বুঝিয়েছেন

খ. অথবা, প্রত্যেক নর-নারীকে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শপথের মধ্যে নর ও নারী উভয়ের উল্লেখ করে সৃষ্টি জগতের সকল প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক প্রাণী হয়তো পুরুষ হবে নতুবা নারী।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা-সাধনা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এ কথাটি বলার উদ্দেশ্যেই রাত ও দিন এবং পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টির শপথ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে- রাত ও দিন, পুরুষ ও স্ত্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন এবং এদের প্রত্যেকটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যেমন পরস্পর বিরোধী; অনুরূপভাবে তোমরা যেসব পথে ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা বিনিয়োগ করছ, তাও স্বীয় স্বরূপতার দৃষ্টিপাতে ভিন্ন ভিন্ন ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। এর পরবর্তী আয়াত কয়টিতে বলা হয়েছে যে, এসব চেষ্টা সাধনা দু'ভাগে বিভক্ত।

দ্বন্দ্বের সমাধান : অত্র সূরার ৭ম আয়াতে বলা হয়েছে- ভালো উদ্যোগ গ্রহণকারীদের পথ সহজ করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে সূরা আল-বালাদ এ পথকে عَقَبَةٌ বা দুর্গম-বন্ধুর গিরিপথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'টি কথার মধ্যে সামঞ্জস্যতা কোথায়? তার জবাব হচ্ছে- এ সহজ পথ মূলত অবলম্বন করার পূর্বে এবং প্রথম অবস্থায় তাকে অবশ্যই দুর্গম-বন্ধুর পথ বলে মনে হবে। এ পথে চলতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের নফসের কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা, বিত্ত-বৈভব, সর্বোপরি শয়তানের সাথে প্রবল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়। কেননা তাদের প্রত্যেকটিই এ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ পথ সম্পর্কে তাকে ভীত ও শঙ্কিত করতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে যখন প্রকৃত কল্যাণ পথকে সত্য মেনে তাতে চলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত করে বসবে; নিজের ধন-সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে, তখনই সে দুর্গম পথটিকে সহজ পথ করে দেওয়া হবে- ধ্বংসের গহ্বরে পড়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

اَعْطٰى-এর অর্থ : এখানে اَعْطٰى-এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ-

১. সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কার্যে অর্থ ব্যয় করা। যেমন- দাসমুক্ত করা, বন্দী মুক্ত করা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। তা নফল হোক অথবা ওয়াজিব হোক।

২. অথবা, মাল ও নফসের হক আদায়ের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে মাল ও নফস ব্যয় হয়, তাকে আরবি ভাষায় বলা হয়- اَعْطَى الطَّاعَةَ اَعْطَى السَّعَةَ ইত্যাদি।

৩. অথবা, اَعْطٰى দ্বারা আল্লাহর হক প্রদানকে বুঝানো হয়েছে।

صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى-এর মধ্যে حُسْنٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহর বাণী وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى-এর মধ্যে حُسْنٰى-এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) ও একদল মুফাস্‌সিরের মতে এখানে اَلْحُسْنٰى দ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উদ্দেশ্য।

২. حُسْنٰى দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অথবা, পুণ্যকে বুঝানো হয়েছে।

৪. কিংবা ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে।

৫. অথবা, সকল ভালো কাজকেই তা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৬. হযরত কাতাদাহ, মোকাতিল, কালবী (র.) বলেছেন- এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - আয়াতে اَلْيُسْرٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াত فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى এর মধ্যে اَلْيُسْرٰى দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) ও এক দল মুফাসসিরের মতে اَلْيُسْرٰى দ্বারা এখানে জান্নাত উদ্দেশ্য। ২. কেউ কেউ বলেছেন, اَلْيُسْرٰى হলো কল্যাণ (خَيْر)। ৩. করণীয় কাজ করার এবং বর্জনীয় কাজ পরিত্যাগ করার শক্তি দানই হলো يُسْرٰى ৪. পূর্বকৃত ইবাদতের প্রতি ফিরে আসাকে اَلْيُسْرٰى বলে। ৫. এটা দ্বারা সে সহজ-সরল পথকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, যা মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহর মর্জি অনুরূপ।

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى -এর উপর একটি অভিযোগ ও তার জওয়াব : ইতঃপূর্বে সূরা আল-বালাদে মুত্তাকীর পথকে عَقَبَةٌ তথা দুষ্কর দুর্গম ঘাটি (পথ) বলা হয়েছে। অথচ এখানে আয়াত فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى-এর মধ্যে তাকেই সহজতর পথ বলা হয়েছে, এ দু'টি আয়াতের মধ্যে মিল কোথায়?

এর উত্তর এই যে, এ পথ কার্যত অবলম্বন করার পূর্বে অবশ্যই দুষ্কর, দুর্গম ও বন্ধুর বলে মনে হবে। কিন্তু সে যখন তাকে সত্য মেনে তাতে চলার সিদ্ধান্ত করে নিবে এবং সে জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে, সে সঙ্গে নিজের ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে এ সংকল্পকে কার্যত শক্ত ও পরিপক্ক করে নিবে, তখন সে ঘাটিতে আরোহণ করা তার পক্ষে সহজতর ও নৈতিক পতনের গহবরে পড়ে যাওয়া কঠিনতর হয়ে পড়বে।

اَلْعُسْرٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : عُسْرٰى দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. عُسْرٰى বলে জাহান্নাম উদ্দেশ্য। ২. عُسْرٰى বলে شِرْك অংশীবাদ উদ্দেশ্য। ৩. ভালো কাজ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা কঠিন একথা বুঝানো উদ্দেশ্য ৪. কৃপণতা এবং ধনসম্পদের হক আদায় না করা।

يُسْرٰى এবং عُسْرٰى-কে স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়ার কারণ : এর কয়েকটি কারণ হতে পারে–

১. عُسْرٰى এবং يُسْرٰى বলতে جَمَاعَةُ الْاَعْمَالِ উদ্দেশ্য।

২. অথবা, এখানে اَلطَّرِيْقَةُ শব্দ উহ্য আছে। মূলে ছিল اَلطَّرِيْقَةُ الْيُسْرٰى এবং اَلطَّرِيْقَةُ الْعُسْرٰى –[কাবীর]

فَسَنُيَسِّرُهُ তে س নেওয়ার কারণ : কয়েকটি কারণে এখানে সীন নেওয়া হয়েছে–

১. করুণা এবং দয়া প্রদর্শনের জন্য। যেমন বলা হয়–এ কাজটি করো, একটু পরেই তোমাকে অমুক বস্তু দিবো।

২. প্রতিদান তো বেশির ভাগ পরকালেই দেওয়া হবে। সে সময়টি এখনো আসেনি। সে সময় সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি অবগত নয়। একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন– সে সময়টি মানব জীবনের পরে অবশ্যই আসবে। আর 'পর' বুঝানোর জন্য 'সীন' বসানো স্বাভাবিক নিয়ম। –[কাবীর]

مَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهُ-এর মধ্যে مَا কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? : আয়াত مَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهُ-এর মধ্যে مَا -এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. مَا শব্দটি نَافِيَه [নাবোধক] হবে অর্থাৎ মৃত্যুর পর-পরকালে তার সম্পদ তার কোনো উপকারেই আসবে না।

২. অথবা, তা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর-পরকালে তার ধন-সম্পদ কি তার কোনো উপকারে আসবে? যার মর্মার্থ এটাই হবে যে, প্রকৃতপক্ষে তার ধন-সম্পদ তখন তার কোনো উপকারেই আসবে না।

تَرَدّٰى -এর অর্থ : تَرَدّٰى-এর দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. تَرَدّٰى শব্দটি تَرَدّٰى مِنَ الْجَبَلِ হতে গৃহীত। এ কথাটির অর্থ হলো– পাহাড় হতে পড়ে গিয়ে ধ্বংস হয়েছে। মূল আয়াতের অর্থ হবে– তার ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না যখন সে দোজখের গহীনে পড়ে ধ্বংস হবে।

২. অথবা, تَرَدّٰى শব্দটি اَلرَّدٰى হতে বাবে تَفَعُّلْ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হবে اَلْهَلَاكُ [ধ্বংস] আর উদ্দেশ্য হবে মৃত্যু। মূল আয়াতের অর্থ হবে– যখন মৃত্যু এসে পড়বে তখন তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।
–[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

অনুবাদ :

١٢. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى لِتُبَيِّنَ طَرِيْقَ الْهُدٰى مِنْ طَرِيْقِ الضَّلَالِ لِيَمْتَثِلَ أَمْرَنَا بِسُلُوْكِ الْأَوَّلِ وَنَهْيَنَا عَنِ ارْتِكَابِ الثَّانِيْ.

১২. আমার দায়িত্ব তো শুধুমাত্র পথ নির্দেশ করা যাতে হেদায়েতের পথ গোমরাহীর পথ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং সে প্রথমোক্ত পথ অনুসরণ করে আমার আদেশ পালন করে আর দ্বিতীয় পথ অনুসরণ হতে বিরত থাকে।

١٣. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُوْلٰى أَيِ الدُّنْيَا فَمَنْ طَلَبَهَا مِنْ غَيْرِنَا فَقَدْ أَخْطَأَ.

১৩. আর আমারই অধিকারে পরকাল ও ইহকাল অর্থাৎ দুনিয়া, সুতরাং যে আমি ছাড়া অন্যের কাছে তা কামনা করল, সে ভুল করল।

١٤. فَأَنْذَرْتُكُمْ خَوَّفْتُكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ نَارًا تَلَظّٰى بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْأَصْلِ وَقُرِئَ بِثُبُوْتِهَا أَيْ تَتَوَقَّدُ.

১৪. অনন্তর আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি ভয় প্রদর্শন করেছি, হে মক্কাবাসী! লেলিহান অগ্নিশিখা সম্পর্কে تَلَظّٰى শব্দটি মূল হতে একটি تَ উহ্য করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে তাকে বহাল রেখেও পঠিত হয়েছে অর্থাৎ লেলিহান শিখা বিস্তারকারী।

١٥. لَا يَصْلٰهَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الْأَشْقٰى بِمَعْنَى الشَّقِيِّ.

১৫. তাতে নিক্ষিপ্ত হবে না প্রবেশ করবে না, নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত অন্য কেউ أَشْقٰى শব্দটি شَقِيٌّ অর্থে।

١٦. الَّذِيْ كَذَّبَ النَّبِيَّ وَتَوَلّٰى عَنِ الْإِيْمَانِ وَهٰذَا الْحَصْرُ مُؤَوَّلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ الصَّلِيُّ الْمُؤَبَّدُ.

১৬. যে অসত্যারোপ করেছে নবী করীম ﷺ-কে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঈমান আনয়ন করা হতে। এখানে حَصْر বা সীমাবদ্ধতা আয়াত وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ দ্বারা مُؤَوَّلٌ হবে সুতরাং প্রবেশ দ্বারা স্থায়ীভাবে প্রবেশ উদ্দেশ্য হবে।

তাহকীক ও তারকীব

تَلَظّٰى শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ : تَلَظّٰى মূলে تَتَلَظّٰى ছিল, একটি ت-কে সহজ করার জন্য বিলুপ্ত করা হয়েছে, মূলবর্ণ ل - ظ - ظ মাসদার اَللَّظُّ [আললাযযু] বাবে نَصَرَ অর্থ– আঁকড়িয়ে থাকা, লেগে থাকা, ধারাবাহিকভাবে থাকা, প্রজ্বলিত হওয়া, نَارًا এর মাফউলের সিফাত হওয়ার কারণে মহল্লান মানসূব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى : আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্রষ্টা। এ হিসাবে তিনি স্বীয় কর্মকৌশল, নিজের সুবিচার নীতি ও স্বীয় অনুগ্রহশীলতার ভিত্তিতে তাকে এখানে অজ্ঞ ও অবিহিত না রাখার বরং সঠিক নির্ভুল পথ ও ভুল পথ বুঝিয়ে দেওয়া, পাপ-পুণ্য ও হালাল-হারাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল করার দায়িত্বও তিনি নিজের উপর গ্রহণ করেছেন। সূরা নাহলে এ কথাই নিম্নোক্ত ভাষায় বলা হয়েছে- وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ "সঠিক-সহজ পথ বলে দেওয়া আল্লাহরই দায়িত্ব- অবশ্য বাঁকা পথও আছে।"

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى : আর পরকাল ও ইহকালের প্রকৃত মালিক আমি-ই। এর নিম্নবর্ণিত কয়েকটি অর্থ হতে পারে-

ক. দুনিয়া হতে পরকাল পর্যন্ত সর্বত্রই তুমি আমার মুষ্টির মধ্যে বন্দী। কোনো একটি পর্যায়েও তুমি তা হতে মুক্ত নও; কেননা উভয় জগতের একচ্ছত্র মালিক আমি-ই।

খ. তোমরা আমার দেখানো পথে চল আর না-ই চল তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। কেননা আমার মালিকত্ব দুনিয়া-আখেরাত সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

গ. উভয় জগতের মালিক তো আমিই। তোমরা দুনিয়া পেতে চাইলে তা আমার নিকট হতে পেতে পার, আর পরকালীন কল্যাণ চাইলে তাও আমার নিকট হতে লাভ করতে পার। -[কাবীর]

اَلْاَشْقٰى ও اَلْاَتْقٰى-এর তাৎপর্য : اَشْقٰى ও اَتْقٰى শব্দ দু'টিকে আয়াতে ইসমে তাফযীল-এর صِيْغَة হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ- অতীব হতভাগ্য এবং অতিশয় পরহেজগার। এর অর্থ এই নয় যে, অতীব হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই জাহান্নামে যাবে না। আর অতিশয় পরহেজগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই তা হতে রক্ষা পাবে না; বরং দু'টি চরম পর্যায়ের পরস্পর বিরোধী চরিত্রকে পরস্পরের মুখোমুখি পেশ করে তাদের চরম পরস্পর বিরোধী পরিণতি বর্ণনা করাই এ কথাটির মূল উদ্দেশ্য এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপস্থাপিত যাবতীয় শিক্ষাকে অমান্য করে ও আল্লাহর আনুগত্যকে পরিত্যাগ করে। তারই প্রতিকূলে রয়েছে এমন এক ব্যক্তি যে কেবল ঈমানই আনে না, বরং ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে কোনোরূপ লোক দেখানো ও যশ খ্যাতির লোভ ব্যতীতই নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, শুধু এ কারণেই যে, সে আল্লাহর নিকট পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার বাসনা পোষণ করে।

অনুবাদ :

١٧. وَسَيُجَنَّبُهَا يبعد عنها الْاَتْقَى بِمَعْنَى التَّقِى .

১৭. আর তা হতে দূরবর্তী রাখা হবে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীগণকে اَتْقٰى শব্দটি تَقِىٌّ অর্থে।

١٨. الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى مُتَزَكِّيًا بِه عِنْدَ اللّٰهِ بِاَنْ يُخْرِجَهٗ لِلّٰهِ تَعَالٰى لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً فَيَكُوْنُ زَكِيًّا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذَا نَزَلَ فِى الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَمَّا اشْتَرٰى بِلَالًا الْمُعَذَّبَ عَلٰى اِيْمَانِه وَاَعْتَقَهٗ فَقَالَ الْكُفَّارُ اِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ لِيَدٍ كَانَتْ لَهٗ عِنْدَهٗ فَنَزَلَ .

১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে। তাতে লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের প্রত্যাশা থাকে না। ফলে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মশুদ্ধ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রা.) প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। যখন তিনি ঈমানের কারণে কাফেরদের হাতে অত্যাচারিত হযরত বিলাল (রা.)-কে ক্রয় করে আজাদ করেছেন, তখন কাফেরগণ বলতে থাকে যে, বিলাল আবূ বকরের উপকার করেছিল, সে ঋণ শোধ করার জন্য সে এটা করেছে। তদুত্তরে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

١٩. وَمَا لِاَحَدٍ بِلَالٍ وَغَيْرِه عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى .

১৯. আর নেই কারো বিলাল ও অন্য কারো তার প্রতি কোনো অনুগ্রহ, যে তার প্রতিদান দিবে।

٢٠. اِلَّا لٰكِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى اَىْ طَلَبَ ثَوَابِ اللّٰهِ .

২০. কেবল اِلَّا অব্যয়টি لٰكِنْ অর্থে কিন্তু সে এটা করেছে তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। অর্থাৎ তাঁর পুরস্কার অন্বেষায়।

٢١. وَلَسَوْفَ يَرْضٰى بِمَا يُعْطَاهُ مِنَ الثَّوَابِ فِى الْجَنَّةِ وَالْاٰيَةُ تَشْتَمِلُ مِنْ فِعْلٍ مِثْلَ فِعْلِه فَيُبْعَدُ عَنِ النَّارِ وَيُثَابُ .

২১. আর সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে। বেহেশতে তাকে যে পুরস্কার প্রদত্ত হবে, তার মাধ্যমে। আয়াতটি সে ব্যক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করবে, যে তাঁর ন্যায় নিঃস্বার্থ কাজ করবে এবং তাকেও জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে ও পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَتَزَكّٰى-এর মহল্লে ই'রাব : يَتَزَكّٰى-এর দু'টি অবস্থা হতে পারে–

১. يَتَزَكّٰى ক্রিয়াটি পিছনে উল্লিখিত يُؤْتِىْ ক্রিয়া থেকে بَدَلٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় তার কোনো ই'রাবের মহল নেই, কেননা, তা তখন صِلَةٌ-এর পর্যায়ে, আর صِلَةٌ-এর কোনো এরাবের মহল হয় না।

২. অথবা, يُؤْتِىْ ক্রিয়ার মধ্যকার সর্বনাম হতে يَتَزَكّٰى ক্রিয়াটি حَالٌ হয়েছে, তখন তা মানসূব হবে।

اِبْتِغَاءَ-এর মহল্লে ই'রাব :

১. অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে اِبْتِغَاءَ শব্দটি 'مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ' হিসাবে মানসূব হয়েছে। অথবা, মাফউলে লাহু হিসাবে মানসূব হতে পারে। ইমাম ফাররা বলেন, اِبْتِغَاءَ শব্দটি কিছু উহ্য ইবারতের সাথে মিলিত হয়ে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ مَا اَعْطَيْتُكَ اِبْتِغَاءَ جَزَائِكَ بَلْ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّكَ

২. ইয়াহইয়া اِبْتِغَاءُ শব্দটিকে মারফূ' পাঠ করেন। তা نِعْمَةٍ শব্দের অবস্থানস্থল হতে বদল হয়েছে। কেননা তা ফায়েল অথবা মুবতাদা হিসাবে মারফূ' অবস্থায় রয়েছে। نِعْمَةٍ শব্দের পূর্বের مِنْ অতিরিক্ত। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের একটি বর্ণনা উদ্ধৃতি করেছেন, سَيُجَنَّبُهَا হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি দুর্বল, অচল, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা দাস-দাসীকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এভাবে অনেক দাস-দাসীকে তিনি অত্যাচারী মনিবের হাত হতে রক্ষা করেছেন। একবার তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা (রা.) (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) বলেন–হে পুত্র! আমি দেখছি তুমি শুধু দুর্বল লোকদেরকে মুক্ত করে অর্থ ব্যয় করছ এতে তোমার কি কল্যাণ হবে? যদি সুস্থ-সবল যুবকদেরকে মুক্ত করতে তাহলে তারা তোমার কাজে লাগত; কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে তারা তোমার সাথে থেকে যুদ্ধ করত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন– আব্বাজান! আমি তো এ কাজের জন্য দুনিয়াতে কোনো নাম-কাম চাই না; বরং আল্লাহর নিকট হতেই শুধু প্রতিফল চাই। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে سَيُجَنَّبُهَا ..... আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

অথবা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.) বলেন, হযরত বেলাল (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে তার মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ তার উপর নির্মম অত্যাচার আরম্ভ করল। মহাত্মা বেলালকে মরুভূমির অগ্নি-ঝরা রোদে তপ্ত বালুর উপরে চিত করে শোয়ায়ে বুকে প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়ে রাখত এবং বলত 'মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে আমৃত্যু তোমাকে এভাবে রেখে দিবো।' একদিন এমনি কঠোর শাস্তি চলাকালীন সময়ে হযরত আবূ বকর (রা.) সে পথে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন, মহাত্মা বেলালের উপর এ লোমহর্ষক অত্যাচার দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি বেলালকে ক্রয় করার জন্য তার মনিব উমাইয়ার কাছে প্রস্তাব করলেন। উমাইয়া দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা ও হযরত আবূ বকরের সুস্থ সবল এক কাফের দাস নিসতাসকে বিনিময় মূল্য হিসাবে চাইল। নিসতাস রুমী হযরত আবূ বকরের গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত দাস ছিল। তিনি উমাইয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দাস নিসতাস ও দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে মহাত্মা বেলালকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন। তখন মক্কার কাফেরগণ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে নির্বুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী বলে সমালোচনা করতে লাগল। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে وَمَا لِأَحَدٍ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। –[খাযেন, মা'আলিম, ইবনে কাছীর]

اَلْأَتْقٰى কে? : সমস্ত মুফাসসিরীনের ঐকমত্য এই যে, اَلْأَتْقٰى বলে এখানে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে; কিন্তু শীয়া সম্প্রদায় এ কথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে যে, اَلْأَتْقٰى বলতে এখানে হযরত আলী (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। মূলত তা ঠিক নয়। কেননা হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ আর اَلْأَكْرَمُ ঐ ব্যক্তি, যে অতি উত্তম। নবী করীম ﷺ-এর পরে হযরত আবূ বকরের স্থান হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পাওয়া যায় না; শুধু শীয়া সম্প্রদায় তাদের বদ আকীদার কারণে তার বিরোধিতা করে থাকে। –[কাবীর]

বর্ণিত আছে যে, মোহাম্মদ ইবনে হানফিয়া হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, হযরত আবূ বকর (রা.)। পুণঃজিজ্ঞাসা করেন যে, এরপর কে? তিনি বলেছিলেন হযরত ওমর (রা.)। –[নূরুল কোরআন]

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য :

১. তিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।
২. রাসূলের বংশের সপ্তম পুরুষের সাথে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বংশ একত্রিত হয়ে যায়।
৩. তিনি রাসূলের সাথে প্রত্যেকটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।
৪. তাঁর উপাধি ছিল আতীক। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার ইচ্ছা হয় দোজখ থেকে মুক্ত এমন লোককে দেখতে সে যেন আবূ বকর (রা.)-কে দেখে।
৫. তাঁর বংশের চার প্রজন্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন, যা আর কোনো সাহাবীর ছিল না। তথা- ক. তাঁর পিতামাতা, খ. তিনি নিজে, গ. তাঁর ছেলে ও ঘ. তাঁর পৌত্র।
৬. তাঁর জন্ম মক্কায় আর মৃত্যু মদীনায় উভয়টি পবিত্র নগরী।
৭. নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি সকলের ইহসানের বদলা দিয়ে দিয়েছি; কিন্তু হযরত আবূ বকরের ইহসানের বদলা দিতে পারিনি, তাঁকে আল্লাহ বদলা দিবেন।
৮. পবিত্র কুরআনে তাঁকে اَلْأَتْقٰى ও صَاحِبٌ বলা হয়েছে।
৯. মৃত্যুর সময় তার গৃহে সরকারী সম্পদের মধ্যে একটি কাঠের পাত্র ও একটি যাঁতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। উভয়টি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট পাঠানোর অসিয়ত করে যান।
১০. তিনি অসিয়ত করেছেন যে, জানাজার পর আমার শবদেহ রাসূলের রওজার নিকট নিয়ে যাবে, যদি রওজার দরজা আপনা-আপনি খুলে যায় তবে আমাকে তথায় দাফন করবে, অন্যথায় জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করবে। কিন্তু তাঁর শবদেহ আনা হলে রওজার দরজা আপনা-আপনি খুলে যায়, ফলে তাঁকে তথায় দাফন করা হয় ইত্যাদি। –[নূরুল কোরআন]

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى-এর অর্থ : এ আয়াতটির দু'টি অর্থ হতে পারে। উক্ত দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য ও সঠিক। একটি এই যে, আল্লাহ অবশ্যই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আর দ্বিতীয়টি এই যে, আল্লাহ খুব শীঘ্রই এক ব্যক্তিকে এত কিছু দিবেন যে, সে তা পেয়ে যারপর নাই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। –[কাবীর]

سُوْرَةُ الضُّحٰى : সূরা আদ্ব-দুহা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম শব্দ اَلضُّحٰى-কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ১০২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরার আলোচ্য বিষয় হতে জানা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কিছুদিন পর্যন্ত ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে বারবার আশঙ্কা জাগছিল যে, আমার দ্বারা এমন কোনো অপরাধ তো হয়ে পড়েনি; যার কারণে আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় এ সূরাটি নাজিল হয়। এতে নবী করীম ﷺ -কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে– আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনোরূপ অসন্তোষ নেই এবং ওহী নাজিল হওয়াও এ কারণে বন্ধ হয়ে যায়নি; বরং একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে। দিনের আলোর পর রাতের নিঝুম অন্ধকারের প্রশান্তির মূলে যে লক্ষ্য কার্যকর থাকে তার পশ্চাতেও ঠিক তাই নিহিত রয়েছে। মূলকথা, ওহীর তীব্র রশ্মি যদি আপনার উপর নিরবিচ্ছিন্নভাবে আপতিত হতে থাকে এবং মোটেই অবকাশ দেওয়া না হতো, তাহলে আপনার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত। এ কারণে মাঝখানে বিরতি দেওয়া হয়েছে। এ বিরতিকালে আপনি সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন। বস্তুত ওহী নাজিল হওয়ার প্রাথমিককালে নবী করীম ﷺ -এর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এক দুঃসহ প্রভাব পড়ত। তখন পর্যন্তও ওহীর তীব্র চাপ সহ্য করার অভ্যাস তাঁর হয়নি, এ কারণে এ ব্যাপারে মাঝে মধ্যে অবকাশ ও বিরতি দেওয়া অপরিহার্য ছিল। পরে অবশ্য এ চাপ সহ্য করার মতো শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছিল। সেজন্য প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর ওহী নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিরতি দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজন হয়নি।

সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে বলেছেন– আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ করেছি, তার প্রত্যুত্তরস্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং আমার নিয়ামতসমূহের শোকর কিভাবে আদায় করা উচিত, তা আপনি উত্তমরূপে বুঝে নিন এবং স্মৃতিপটে আঁকিয়ে রাখুন।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করাই এ সূরার মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু। ওহী নাজিল হওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ -এর মনে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, তা দূর করাই ছিল এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরার শুরুতে দিনের দীপ্তি ও রাতের প্রশান্তির শপথ করা হয়েছে এবং নবী করীম ﷺ-কে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে এই বলে যে, আপনার আল্লাহ আপনাকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেননি। তিনি আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টও নন। অল্প দিনের মধ্যেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আপনার পক্ষে প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উত্তম হবে এবং এ পরিবর্তন অব্যাহত ধারায় পরিবর্তন হতে থাকবে। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তা পেয়ে আপনি অত্যন্ত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হবেন। পরবর্তীকালে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অথচ যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন এর কোনো সম্ভাবনাই জাগতিক দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন– আমি আপনাকে পরিত্যাগ করেছি এমন ধারণা আপনার মনে কেমন করে আসল? আমি আপনাকে পরিত্যাগ করেছি– এমন ধারণা বশত আপনি উদ্বিগ্নই বা হলেন কেন? অথচ আপনার জন্ম হতেই আমি আপনার প্রতি ক্রমাগত ও অব্যাহত ধারায় অনুগ্রহ করে আসছি। আপনি তো এতিম ছিলেন, আমিই আপনার লালন-পালন ও হেফাজতের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আপনি পথের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন, আমিই আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। আপনি ছিলেন নিঃসম্বল আমিই আপনাকে সম্পদশালী করেছি। মোটকথা, শুরু হতেই আমার দয়া ও অনুগ্রহ আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছিল।

পরিশেষে বলা হয়েছে, হে নবী! আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ দান করেছি, তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং কিভাবে আমার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা উচিত তা আপনি ভালোভাবে বুঝে নিন এবং তদনুযায়ী আমল করুন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করবেন যাদের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশ গৃহীত হবে। তা ছাড়া যত এতিম ও ভিক্ষুক আছে তাদের সংখ্যায় দশগুণ ছওয়াব তাকে দান করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ সূরা ও তার পরবর্তী সূরাসমূহ পাঠ করার পর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর উক্ত তাকবীর পাঠ করেছেন।

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ : সূরা আদ-দুহা মক্কায় অবতীর্ণ

إِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً : ১১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

وَلَمَّا نَزَلَتْ كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسُنَّ التَّكْبِيْرُ أٰخِرَهَا وَرُوِىَ الْأَمْرُ بِهٖ خَاتِمَتَهَا وَخَاتِمَةَ كُلِّ سُوْرَةٍ بَعْدَهَا وَهُوَ اللّٰهُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

যখন এই সূরা অবতীর্ণ হলো তখন রাসূল ﷺ তাকবীর বলেছেন, কাজেই এর শেষে তাকবীর বলা সুন্নত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সূরার শেষে এবং এর পরের প্রত্যেক সূরার শেষে তাকবীরের বিধান বর্ণিত রয়েছে আর তা হলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ অথবা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

١. وَالضُّحٰى أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ كُلَّهُ .

১. শপথ পূর্বাহ্নের দিনের প্রথমাংশ বা সমস্ত দিন।

٢. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى غَطّٰى بِظَلَامِهٖ أَوْ سَكَنَ .

২. শপথ রজনীর যখন তা নিঝুম হয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় বা স্থির হয়।

٣. مَا وَدَّعَكَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى أَبْغَضَكَ نَزَلَ هٰذَا لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ عِنْدَ تَأَخُّرِ الْوَحْيِ عَنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا إِنَّ رَبَّهٗ وَدَّعَهٗ وَقَلَاهُ .

৩. তোমাকে পরিত্যাগ করেননি হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক এবং বিরূপও হননি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। এ সূরাটি তখন অবতীর্ণ হয় যখন পনেরো দিন যাবৎ ওহী অতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকায় কাফেরগণ বলাবলি করতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার প্রভু ত্যাগ করেছে এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে গেছে।

٤. وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْكَرَامَاتِ لَكَ مِنَ الْأُوْلٰى الدُّنْيَا .

৪. আর অবশ্যই তোমার জন্য আখেরাত অধিক উত্তম হবে তাতে যে সকল মর্যাদাপূর্ণ বিষয় রয়েছে তার প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা পার্থিব জীবন অপেক্ষা।

٥. وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَيْرَاتِ عَطَاءً جَزِيْلًا فَتَرْضٰى بِهٖ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا لَا أَرْضٰى وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِىْ فِى النَّارِ إِلٰى هُنَا تَمَّ جَوَابُ الْقَسَمِ بِمُثْبَتَيْنِ بَعْدَ مَنْفِيَّيْنِ .

৫. আর অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন অর্থাৎ আখেরাতে তুমি প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হবে। তখন তুমি সন্তুষ্ট হবে তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, আমি তখন পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবো না, যখন আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে থাকবে। দু'টি مَنْفِىٌّ-এর পর দু'টি مُثْبَتٌ বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে এখানে এসে শপথের জওয়াব শেষ হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

فَتَرْضٰى-এর মহল্লে ই'রাব : কারো মতে فَتَرْضٰى কসমের জবাব হয়েছে। অর্থাৎ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ কসমের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে فَتَرْضٰى জবাব হয়েছে।

কারো মতে, উহ্য কসমের জবাব হয়েছে। وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ কসমের উপযুক্ত নয়। কেননা মুযারি' ক্রিয়া দ্বারা কসম ব্যবহার করলে লাম এবং নূনে তাকীদ আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল-লাইলের মধ্যভাগে সফলতা ও অসফলতার মূলসূত্র এবং তার শাখা-প্রশাখা বিধানগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এসব কিছুর সত্যতা স্বীকার ও অস্বীকারের প্রতিদান ও প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে। আর তন্মধ্যে রেসালাতের আলোচনা হয়েছে। সমস্ত কুরআনের সার-সংক্ষেপ সূরা আদ্ব-দ্বুহা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত বিভিন্ন সূরাতে বর্ণিত হয়েছে। এদিক থেকে সূরাটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরাসমূহের সাথে এক নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। −[কামালাইন]

সূরাটির শানে নুযূল : অত্র সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

১. হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ওহী নাজিল শুরু হওয়ার পর কিছুকালের জন্য তা বন্ধ ছিল। ইবনে যোবায়ের বলেন−১২ দিন, কালবী বলেন ১৫ দিন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ২৫ দিন এবং মুকাতিল বলেন ৪০ দিন তা বন্ধ ছিল। তাতে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বিরুদ্ধবাদীরা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। কেননা নবী করীম ﷺ-এর প্রতি যখন কোনো সূরা নাজিল হতো, তখনই তিনি তা লোকদের পড়ে শুনাতেন। বেশ কয়েক দিন যখন কোনো নতুন ওহী লোকদের শুনালেন না তখন তারা ধারণা করল যে, ওহীর উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই ওহী আর আসবে না। তারা বলাবলি করতে লাগল− মুহাম্মদকে তাঁর আল্লাহ ত্যাগ করেছে। −[ইবনে জারীর, তাবরানী, সাঈদ ইবনে মারদুবিয়া]

২. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল নবী করীম ﷺ-এর চাচী, তার ঘরের সাথেই উম্মে জামিলের ঘর ছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল− মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে। এরূপ অবস্থায় নবী করীম ﷺ তীব্র মর্মপীড়া ভোগ করছিলেন। প্রিয়জনের পক্ষ হতে উপেক্ষা, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একমাত্র শক্তির উৎস হতে বঞ্চিত হওয়া, তদুপরি মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাঁকে বিচলিত ও চিন্তাকাতর করেছিল। ঠিক এরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে আয়াতসমূহ নাজিল হয়। −[লোবাব, খাযেন, মা'আলিম]

৩. অথবা, কতিপয় তাফসীরকারের মতে− একদা মুশরিক কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ -এর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর নিকট রূহ, যুলকারনাইন ও আসহাবে কাহাফের বৃত্তান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। নবী করীম ﷺ তার উত্তরে তাদেরকে বলেছিলেন যে, আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এর বৃত্তান্ত বলবো; কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, কথাটি বলতে ভুলে গেছেন। এতে নবী করীম ﷺ -এর উপর দশ, পনেরো বা চল্লিশ দিনের মতো ওহী নাজিল বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি কুরাইশদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হন। তখন আবূ জাহল প্রমুখ কুরাইশগণ তাঁকে বলল যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। এতে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে পড়ায় তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য এ সূরা নাজিল হয়। −[খাযেন, মা'আলিম, ইবনে কাছীর]

৪. অথবা, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নবী করীম ﷺ -এর একটি অঙ্গুলি প্রস্তরাঘাতে এরূপ আহত হয়েছিল যে, তার যন্ত্রণায় তিনি একদিন বা দু'দিন যাবৎ নৈশকালীন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পারেননি, এ সময় দীনের প্রচার কার্যও বন্ধ ছিল। এতে দুষ্টমতি আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল এসে নবী করীম ﷺ -কে বলল যে, যে জীন বা শয়তানটি এসে তোমাকে শিক্ষা দেয়, সে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। তার এ অসঙ্গত উক্তির উত্তরেই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। −[লোবাব]

৫. অথবা, হযরত খাওলা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা একটি কুকুরের বাচ্চা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘরে খাটের নিচে প্রবেশ করে মরে গিয়েছিল। অতঃপর চারদিন পর্যন্ত ওহী আগমন বন্ধ থাকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওলাকে বললেন−কেন জানি কয়েকদিন পর্যন্ত আমার নিকট হযরত জিবরাঈল আসেন না, তার কারণ কি? সম্ভবত আমার ঘরে কোনো নতুন ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে, তিনি ঘরে তল্লাশী চালান। আর দেখেন একটি কুকুরের বাচ্চা মরে রয়েছে, তৎক্ষণাৎ তা ঘর হতে বের করে দেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) এ সূরা নিয়ে আগমন করেন। আর বলেন− যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে, আমি সে ঘরে প্রবেশ করি না। −[লোবাব, খাযেন]

اَلضُّحٰى বলতে কি বুঝানো হয়েছে? : اَلضُّحٰى শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. দিনের প্রথম অংশ, সকালবেলা, সকালের সূর্য তাপ ২. পূর্ণ দিবস। আয়াতে দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা اَلضُّحٰى-এর বিপরীত দিকে পূর্ণ রাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ ও মোকাতিল (র.) বলেছেন, এর দ্বারা সূর্য যখন উপরের দিকে উঠে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

سَجٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : سَجٰى শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্থই এখানে গ্রহণযোগ্য-

১. سَجٰى অর্থ- سَكَنَ তথা শান্ত হয়েছে, কোলাহলমুক্ত হয়েছে প্রশান্ত বা নিঝুম হয়েছে।

২. سَجٰى অর্থ- أَظْلَمَ তথা অন্ধকার হয়েছে।

৩. سَجٰى অর্থ- غَطّٰى তথা ঢেকে ফেলেছে, আচ্ছাদিত হয়েছে। -[কুরতুবী, কাবীর]

সূরা লাইলে لَيْل শব্দকে প্রথমে আর সূরা দুহাতে لَيْل শব্দকে পরে আনার মধ্যে হিকমত : এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব হতে পারে-

১. কোনো কোনো দিক থেকে দিন মর্যাদাবান, আবার কোনো দিক থেকে রাত্রি মর্যাদাবান। দু' সূরাতে দু'টিকে প্রথমে উল্লেখ করে উভয়ের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে।
২. প্রথম সূরাতে হযরত আবূ বকরের ঘটনা আর দ্বিতীয় সূরাতে নবী করীম ﷺ-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা.) ঈমান গ্রহণের পূর্বে কুফরির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। তাই সে সূরাতে অন্ধকার বিশিষ্ট রজনীকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ যেহেতু সর্বদা হেদায়েতের পথে ছিলেন, সেহেতু অত্র সূরাতে আলোকিত দিবসের উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে।
৩. দিনের প্রথম প্রহরের সময় অন্তরে খুশি থাকে, আর রাত্রি বেলায় চিন্তা ও নিরানন্দ অনুভূত হয়, যেন এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পার্থিব জীবনের খুশি ও আনন্দ তার দুঃখ-বেদনা থেকে কম হয়ে থাকে।
৪. اَلضُّحٰى এক নির্দিষ্ট সময়ের নাম। যেমন- দিনের প্রথম প্রহর, অত্র সূরাতে দিবসের একাংশ আর পূর্ববর্তী সূরাতে পূর্ণরাত উল্লেখ করার কারণ এভাবে হবে যে, পূর্ণ রাত্রি একত্র হয়ে দিনের একাংশের সমান হয়, যেমন নবী করীম ﷺ সৃষ্টির একাংশ হয়েও সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে মূল্যবান বা সমান। -[কাবীর]

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى আয়াতের মর্মার্থ : নবী করীম ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত ও দয়া দিন দিন যে বৃদ্ধি হতে থাকবে-সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ডিঙিয়ে তিনি যে ইহ ও পরকালীন সাফল্যের উচ্চ মার্গে আরোহণ করবেন, সে দিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রতিটি পরবর্তী অবস্থা আপনার জন্য পূর্ববর্তী অবস্থা হতে উত্তম হবে। আপনার চারদিকে যে বাধার পাহাড়সমূহ দেখছেন, সবই দূরীভূত হয়ে যাবে কেউই কোনো বাধা-বিপত্তিই আপনার বিজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কাজেই আপনি ঘাবড়িয়ে যাওয়ার ও আশাহত হওয়ার কোনোই কারণ নেই।

তা ছাড়া পরকালে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যা দান করবেন; তা এ দুনিয়ার মর্যাদা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি হবে। কাজেই আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ইমাম তবরানী (র.) আওসাত গ্রন্থে এবং বায়হাকী (র.) দালায়েল নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে উদ্ধৃত করেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার পর আমার উম্মত যে বিজয় অর্জন করবে তা আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তখন নাজিল হলো- .... وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ অর্থাৎ অবশ্যই আখেরাত আপনার জন্য এ দুনিয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম হবে।

অথবা, এর অর্থ হলো, প্রথম অবস্থা হতে পরবর্তী অবস্থা উত্তম হবে, অর্থাৎ হে নবী ﷺ আপনার মাক্কী জীবন হতে মাদানী জীবন অধিক উন্নত হবে। -[নূরুল কোরআন]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্য কিভাবে পরকাল-ইহকাল অপেক্ষা উত্তম হবে : নবী করীম ﷺ-এর জন্য দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উত্তম হওয়ার বিভিন্ন দিক হতে পারে

ক. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কারণে তার কল্যাণও ক্ষণস্থায়ী। তা ছাড়া দুনিয়ার কোনো ভালোই নিখাদ নয়। পক্ষান্তরে পরকালের কল্যাণ স্থায়ী ও খাঁটি।

খ. আখেরাতে নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত উম্মতগণকে স্বীয় পাশে পাবেন। তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। কেননা উম্মতগণ তাঁর সন্তানতুল্য। ইরশাদ হচ্ছে- وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মাতাতুল্য।

গ. অথবা, যেন নবী করীম ﷺ -কে আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো আপনি আপনার ইচ্ছা মাফিক সুখ ভোগ করেছেন, আর পরকালে আমি আমার ইচ্ছামতো আপনাকে দান করবো। আর তা অবশ্যই দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।

ঘ. অথবা, দুনিয়াতে যেমন আপনার প্রশংসাকারী আছে তেমন আপনার উপর অপবাদদানকারী একটি দলও রয়েছে। পক্ষান্তরে পরকালে আপনার উপর কেউ অপবাদ দিবে না; বরং সকল নবী রাসূল ও আপনার উম্মতের পক্ষে আপনাকে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে পেশ করা হবে। আর আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। ইরশাদ হচ্ছে- وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট)।

ঙ. অথবা, এজন্য আখেরাত আপনার জন্য উত্তম যে, এটা (তথা জান্নাত) আপনি খরিদ করে নিয়েছেন। অথচ দুনিয়াকে আপনি ক্রয় করেননি। আর কোনো বস্তু পছন্দনীয় না হলে কেউ তা ক্রয় করে না।

মোটকথা, ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া হলো উপার্জনের স্থান, আর আখেরাত হলো ভোগের স্থান। কাজেই দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাত নিঃসন্দেহে ভালো ও উত্তম হবে। নবী করীম ﷺ ফরমান- اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى : অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যাতে আপনি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবেন। অর্থাৎ দিতে তো কিছু বিলম্ব হবে, তবে সে দেওয়ার দিন বেশি দূরেও নয়। তখন তোমার প্রতি তোমার আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের এমন বৃষ্টি বর্ষণ হবে যে, তা পেয়ে তুমি অবশ্যই খুব সন্তুষ্ট হবে। বস্তুত এটা কোনো অমূলক ওয়াদা ছিল না। নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়। দক্ষিণ উপকূল হতে উত্তরে রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর হতে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র আরবদেশ নবী করীম ﷺ -এর শাসনাধীন হয়। আরবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এ ভূখণ্ড এক সুসংবদ্ধ আইন ও শাসনের আওতাভুক্ত হয়। এটা এতদূর শক্তিশালী হয় যে, যে শক্তিই এটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ধ্বনিতে সমগ্র দেশ মুখরিত হয়ে উঠে। অথচ মুশরিকরা এ দেশে তাদের মিথ্যা কালিমার আওয়াজ উচ্চে রাখার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের বিজয়ের সম্মুখে জনগণের কেবল মস্তকই অবনমিত হয়নি, তাদের মন-মগজও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। লোকদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও বাস্তব কাজকর্মে এক বিরাট মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হলো। চরম জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশটি বছরের মধ্যে এতখানি পরিবর্তিত হতে পারে বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। নবী করীম ﷺ -এর অন্তর্ধানের পর তাঁরই গড়া ইসলামি আন্দোলন এক প্রবল শক্তি নিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের এক বিরাট অংশের উপর এটা বিজয়ী হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর রাসূলকে দুনিয়ার জীবনে এত কিছু দান করেছেন। অতঃপর পরকালে তিনি তাঁকে যা কিছু দিবেন, তা তো এ দুনিয়ার মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না।

وَلَسَوْفَ-এর ফায়দা : আয়াতে وَلَسَوْفَ বলা হয়েছে, শুধু সীন দিয়ে سَيُعْطِيْكَ বলা হয়নি। কেননা سَوْفَ দূরবর্তী ভবিষ্যৎকাল বুঝায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর أَجَلْ বা মৃত্যুর সময় এখনো অনেক পরে। তিনি আরো একটি বিরাট সময় বেঁচে থাকবেন। অথবা কাফেরগণ বলেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ -কে তাঁর প্রভু ছেড়ে দিয়েছেন, তখন জবাব দেওয়া হয়েছে যে, না তাঁকে তাঁর প্রতিপালক কখনো ছাড়েননি। তারপর তারা বলেছিল, অনতিবিলম্বে সে মরে যাবে, তখন জবাব দেওয়া হয়েছে যে, وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ الخ -[কাবীর]

অনুবাদ :

٦. اَلَمْ يَجِدْكَ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَىْ وَجَدَكَ يَتِيْمًا بِفَقْدِ اَبِيْكَ قَبْلَ وِلَادَتِكَ اَوْ بَعْدَهَا فَاٰوٰى بِاَنْ ضَمَّكَ اِلٰى عَمِّكَ اَبِىْ طَالِبٍ.

৬. তিনি কি তোমাকে পাননি? এখানে اِسْتِفْهَامٌ টি تَقْرِيْر বা সাব্যস্তকরণার্থে অর্থাৎ তোমাকে পেয়েছেন এতিম অবস্থায় তোমার জন্মের পূর্বে বা পরে পিতৃহারা হওয়ার কারণে অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তোমাকে পিতৃব্য আবূ তালিবের সাথে মিলিত করে।

٧. وَ وَجَدَكَ ضَالًّا عَمَّا اَنْتَ عَلَيْهِ الْاٰنَ مِنَ الشَّرِيْعَةِ فَهَدٰى اَىْ هَدَاكَ اِلَيْهَا.

৭. আর তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন এ শরিয়ত যার উপর তুমি বর্তমানে আছে, এর সম্পর্কে। অতঃপর তিনি পথ নির্দেশ দান করেছেন তোমাকে সত্য পথের সন্ধান দিলেন।

٨. وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَقِيْرًا فَاَغْنٰى اَغْنَاكَ بِمَا قَنَعَكَ بِهٖ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَغَيْرِهَا وَفِى الْحَدِيْثِ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ.

৮. আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অবস্থায় দরিদ্র অবস্থায় অনন্তর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করেছেন গনিমত ইত্যাদি যেসবের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে তুষ্ট করেছেন তা দান করে; হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, অধিক সম্পদের অধিকারী হওয়ার নাম অভাবমুক্তি নয়; বরং আত্মার অভাবমুক্তির অনুভূতিই প্রকৃত ধনাঢ্যতা।

٩. فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ بِاَخْذِ مَالِهٖ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ.

৯. সুতরাং এতিমের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না তার সম্পদ ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে।

١٠. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تَزْجُرْهُ لِفَقْرِهٖ.

১০. আর ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করো না। তার দারিদ্র্যের কারণে তাকে কটুবাক্য বলো না।

١١. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ عَلَيْكَ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا فَحَدِّثْ اَخْبِرْ وَحُذِفَ ضَمِيْرُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ الْاَفْعَالِ رِعَايَةً لِلْفَوَاصِلِ.

১১. আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তোমাকে নবুয়ত দান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে জানিয়ে দাও অবহিত করো। কোনো কোনো فِعْل হতে আয়াতের فَوَاصِلٌ-এর কারণে সে সকল যমীর বিলুপ্ত করা হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি رَاجِعْ বা সম্পর্কিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন– তিনি কি আপনাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তদুত্তরে বলেছেন–নিশ্চয়। তখন তিনি বলেছেন–আপনি যখন ছোট ছিলেন, দুর্বল ছিলেন, তখন আমি আপনাকে ছেড়ে দেইনি; বরং আপনাকে লালন-পালন করে যতটুকু গড়া দরকার গড়ে তুলেছি– সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসাবে পরিগণিত করেছি। এতটুকু করার পর আপনার কি ধারণা হয় যে, আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি? –[কাবীর]

এতিমের অর্থ ও তার গুরুত্ব : এতিম শব্দের অর্থ এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে তাফসীরকারদের দু'টি অভিমত রয়েছে

১. মাতৃ-পিতৃহীন। যখন তাঁর পিতা পরলোক গমন করে তখন তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের উদরে। দুনিয়াতে পদার্পণ করে তিনি মা ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের লালন-পালনে বড় হচ্ছিলেন; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় মা'কে হারানোর দু'বৎসর পরেই তিনি দাদাকেও হারালেন। আট বছর বয়সের এ অনাথ বালকের দায়িত্বভার চাচা আবূ তালিবের হাতে ন্যস্ত হয়। তিনি তাঁর সকল প্রকারের সহযোগিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়েছেন। এটাই এতিম ও আশ্রয়দানের অর্থ। -[কাবীর]

২. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- এতিম শব্দের অর্থ- একক, অদ্বিতীয়, অর্থাৎ আপনি বিশ্বের তুলনাহীন ব্যক্তি অথবা আরবের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং আপনাকে নবুয়ত এবং রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করা হলো। -[খাযেন, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى : ضَآلًّا শব্দ ضَلَالَةٌ হতে নির্গত, এর অর্থ- গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা, পথের সন্ধান না জানা, নিখোঁজ ও বিলুপ্ত হওয়া। কোনো কোনো সময় ضَلَالٌ শব্দ দ্বারা অসতর্কতা ও ভ্রূক্ষেপহীনতাও বুঝানো হয়ে থাকে। এ বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রথমোক্ত পথভ্রষ্টতা অর্থটি এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ বাল্যকাল হতে নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বৎসর নবী করীম ﷺ কখনো গোমরাহীর কারণে শিরক বা নাস্তিকতায় নিমজ্জিত ছিলেন না এবং জাহেলিয়াত যুগের কাজকর্ম ও রসম-রেওয়াজে তিনি মগ্ন ছিলেন না। এ জন্য وَجَدَكَ ضَآلًّا দ্বারা পথহারা বা অনভিজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। নবুয়ত লাভের পূর্বেও তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর জীবন গুনাহ হতে পবিত্র ছিল এবং তিনি উত্তম চরিত্রে বিভূষিত ছিলেন কিন্তু সত্য দীনের বিস্তারিত কোনো তত্ত্বাদি বা বিধি-বিধান তাঁর জানা ছিল না। সূরা শূ'রার ৫২নং আয়াতে বলা হয়েছে-'কিতাব কি, ঈমান কি, তা তুমি জানতে না।'

আলোচ্য আয়াতে ضَآلًّا-এর আরেকটি অর্থ হতে পারে- নবী করীম ﷺ এক জাহিলিয়া সমাজ-পরিবেশে নিখোঁজ প্রায় হয়েছিলেন এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে নবুয়তের পূর্বে তাঁর ব্যক্তিত্ব তেমন স্পষ্ট ও ভাস্বর ছিল না। অথবা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে অসাধারণ প্রতিভা দান করেছিলেন, তা জাহেলিয়াতের প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে বিনষ্ট হচ্ছিল। ضَلَالٌ বলতে অনবহিত বা অনভিজ্ঞ বুঝায়। অর্থাৎ নবুয়ত লাভের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেসব সত্য, নিগূঢ় তত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করেছিলেন নবুয়তের পূর্বে তিনি সে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত বা অনভিজ্ঞ ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- ضَآلًّا অর্থ- পথহারা। একদা শৈশবে নবী করীম ﷺ মক্কা নগরীর গলিতে হারিয়ে যান। আবূ জাহল তাঁকে মেশ শাবকের পিছনে ছুটতে দেখে আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পৌছিয়ে দেয়।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) বলেন- একবার নবী করীম ﷺ চাচা আবূ তালেবের সাথে সওদাগরি কাফেলায় সিরিয়া যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে রাতের অন্ধকারে শয়তান তার উটের লাগাম টেনে তাঁকে পথের বাইরে নিক্ষেপ করে। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে এক ফুৎকারে শয়তানকে আবিসিনিয়ায় নিক্ষেপ করেন এবং নবী করীম ﷺ-কে কাফেলার পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন। তাই পথহারা ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন। -[ইবনে কাছীর, খাযেন, মা'আলিম]

ইমাম কালবী, সুদ্দী ও ফাররা বলেন, وَجَدَكَ ضَآلًّا অর্থ وَجَدَكَ فِىْ قَوْمٍ ضَلَالٍ فَهَدَاهُمُ اللّٰهُ لَكَ অর্থাৎ আপনাকে ভ্রষ্ট-গোমরাহ সমাজের বুকে পেয়েছেন, তারপর তিনি তাদেরকে আপনার কারণে হেদায়েত দিয়েছেন।

ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন, তিনি চল্লিশ বৎসর তাঁর গোত্রের দীনে ছিলেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, তিনি আল্লাহর দীনের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ 'কিতাব এবং ঈমান কি- তা আপনি জানতেন না।'

জমহুর মুফাসসিরীন, ওলামায়ে কেরাম ও মুহাককিকীন এ কথায় একমত যে, তিনি কখনো কুফরি করেননি। ضَآلًّا-এর অর্থ তাই হবে যা হযরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) এবং অন্যান্য সালফে সালেহীন করেছেন। -[কাবীর]

عَآئِلًا فَاَغْنٰى-এর অর্থ : আয়াতে করীমায় عَآئِلٌ শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে-

১. দরিদ্র বা ফকির। আর এটাই প্রসিদ্ধ অর্থ। এ অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে اَغْنٰى অর্থ হবে-আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আবূ তালিবের লালনের মাধ্যমে মুখাপেক্ষীহীন করেছেন। যখন আবূ তালিবের সম্পদ অসুবিধা হচ্ছিল, তখন খাদীজার সম্পদ দ্বারা সম্পদশালী করেছেন। যখন খাদীজা (রা.)-এর সম্পদে অসুবিধা হয়েছিল। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) -এর সম্পদ দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। এটাতেও যখন অসুবিধা মনে করেছেন, তখন হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আনসারদের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন। তারপর জিহাদের নির্দেশ দিয়ে গনিমতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

২. عَائِلٌ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো, সন্তানসন্ততি বেশি হওয়া, আর তারা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সমস্ত উম্মত : উম্মতের আধিক্য দ্বারাই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। কারো মতে উম্মতকে রাসূলের দ্বারা সম্পদশালী করেছেন। কেননা, তারা ছিল জাহিল-মূর্খ। রাসূলের মাধ্যমে তারা দীনি ইলমের সম্পদ অর্জন করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এতিমরূপে গ্রহণের হিকমত : এটার কয়েকটি জবাব হতে পারে–

১. তিনি যেন এতিমের কদর বুঝতে পারেন। তাহলে তাদের প্রাপ্য আদায় করবেন, তাদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন, এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.) পেট পুরে খেতেন না। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিয়েছেন–পেট ভর্তি করে খেলে ক্ষুধার্তদের ক্ষুধার কথা ভুলে যাওয়ার ভয় করছি।

২. গুণ ও নামের দিক থেকে তিনি আর এতিমগণ এক হবেন। অতঃপর এ কারণে তাঁকে সম্মান দিবেন। এ কারণেই তিনি বলেছেন– إِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّدًا فَأَكْرِمُوهُ وَوَسِّعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ 'যখন তোমরা সন্তানের নাম মুহাম্মদ রাখবে, তখন তার সম্মান করবে এবং মজলিসে তার স্থান প্রশস্ত করে দিবে।'

৩. যাদের মাতা-পিতা জীবিত থাকে তারা সকল কাজে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাতা-পিতাকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যেন ছোটবেলা থেকেই তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো উপর ভরসা না করেন।

৪. সমাজের বাস্তব চিত্র হলো এই যে, এতিম সন্তানদের দোষত্রুটি গোপন থাকে না। এমনকি অতিরিক্ত দোষও বের হয়ে যায়। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে এতিম করে জন-সম্মুখে ছেড়ে দিয়েছেন। যেন তারা তাঁর সম্পর্কে ভালো করে বুঝে নিতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাঁর পবিত্রতা এবং নিষ্কলুষতার উপর ঐকমত্য পোষণ করতে পারে–এটাই হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে। রিসালাতের দায়িত্বের পর কোনো ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর কোনো প্রকার প্রকার দোষ আরোপ করতে পারেনি।

৫. মাতা-পিতা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। রাসূলের শিক্ষা স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। কেননা তাঁর কেউ ছিল না।

৬. গরিব এবং এতিম হলে মানুষ সমাজে সম্মান পায় না; কিন্তু এ ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেলে এক নজির স্থাপন করেছেন যে, গরিব এবং এতিম হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিকুলের মধ্যে সম্মানিত হয়েছেন। এক বাক্যে দুনিয়ার সকল মানুষ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রকার লোক তাঁকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এটাই তাঁর এক প্রকার মু'জিযা। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ : 'আর আপনি سَائِلٌ-কে ধমক দিবেন না।' এখানে سَائِلٌ শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. আর্থিক সাহায্যপ্রার্থী, অভাবগ্রস্ত ও ভিক্ষুক। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ হবে, তাকে সাহায্য করতে পারলে কর। আর না পারলে, নম্রতা সহকারে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ কর। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তাকে ধমক দেওয়া যাবে না। আপনি দরিদ্র ছিলেন আল্লাহই আপনাকে ধনী করেছেন। অতএব, আপনি অপর কোনো গরিব, ভিক্ষুক, সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিবেন না।

২. প্রশ্নকারী, জিজ্ঞাসাকারী, অর্থাৎ দীন ইসলামের ব্যাপারে কেউ যদি কিছু জানতে চায়, তাহলে এরূপ প্রশ্নকারী ব্যক্তি যতই অজ্ঞ বা মূর্খ হোক না কেন আর যত অশোভন ভঙ্গিতেই জিজ্ঞাসা করুক না কেন– অতীব স্নেহ ও দরদ সহকারে তার জবাব দিবে জ্ঞানের অহংকারী রূঢ় স্বভাবের অধিকারীদের ন্যায় ধমক দিয়ে বা তিরস্কার করে তাকে তাড়িয়ে দিও না। হযরত আবুদ দারদা, হাসান বসরী ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখগণ এ দ্বিতীয় অর্থটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ : শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে হয়েছে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে এবং পরে যত নিয়ামত মহানবী ﷺ -কে দান করা হয়েছে সবই এখানে উদ্দেশ্য। সূরার শেষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– হে নবী! আপনি আল্লাহর দেওয়া প্রত্যেকটি নিয়ামতের উল্লেখ করুন– প্রকাশ করুন। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামতের প্রকাশ যেভাবে হতে পারে, তা এই যে, মুখে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহেই এ সব কিছু আমাকে দান করেছেন, আমি যোগ্যতার বলে এগুলো লাভ করিনি। নবুয়তের নিয়ামত প্রকাশের নিয়ম হলো, লোকদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচার চালানো, তার শিক্ষা লোকদের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া, হিদায়েত পাওয়া, এতিম হয়েও সুষ্ঠুভাবে লালিত-পালিত হওয়া এবং দরিদ্র হতে ধনী হওয়া– এ সবই আল্লাহর পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ -এর জন্য একেকটি বিরাট নিয়ামত। এসব নিয়ামতের প্রকাশ পদ্ধতি হলো, পথভ্রষ্ট লোকদেরকে হেদায়েত করা, এতিম ও অনাথ লোকদেরকে আশ্রয় দান করা এবং গরিব, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সাহায্যপ্রার্থীকে সহায্য করা। সুতরাং বুখারী শরীফে হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে

যে, নবী করীম ﷺ এর নিকট– সাহায্যপ্রার্থী হয়ে কোনো দিন কেউ বিমুখ হয়নি। কাউকেও কোনো দিন তিনি لَا (না) বলে ফিরিয়ে দেননি। এ মর্মে কবি ফারাযদাক (র.) খুব সুন্দর বলেছেন مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِيْ تَشَهُّدِهِ * لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءَهُ نَعَمْ অর্থাৎ তাশাহহুদ ব্যতীত অন্য কোথাও নবী করীম ﷺ لَا (শব্দ) উচ্চারণ করেননি। যদি تَشَهُّدْ না হতো, তাহলে তার এই لا ও نَعَمْ-এ পরিণত হতো। অর্থাৎ এখানেও তিনি لَا না বলে نَعَمْ-ই বলতেন।

হযরত মোকাতিল (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে স্মরণ করাই হলো তাঁর শোকর গুজারী। আর শোকর গুজারী হলো এই সত্য উপলব্ধি করা যে, এ নিয়ামত আল্লাহ তা'আলারই দান। দ্বিতীয় নিয়ামতকে নিয়ামতদাতার মর্জি মোতাবেক ব্যয় করা। আর্থিক নিয়ামতের শোকর গুজারী হলো তা আল্লাহর রাহে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। শারীরিক নিয়ামতের শোকর গুজারী হলো, যেসব ফরজ মানুষের প্রতি অর্পিত হয়েছে, তা আদায় করা এবং পাপাচর হতে আত্মরক্ষা করা; আর ইলমের শোকর গুজারী হলো, অন্যের নিকট ইলম পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষকে হেদায়েত করা। –[নূরুল কোরআন]

এখানে نِعْمَةٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আলোচ্য আয়াতে নিয়ামত দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন–

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন– اَلنِّعْمَةُ দ্বারা এখানে নবুয়তকে বুঝানো হয়েছে।

২. এতিম, মিসকিন ও দরিদ্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসার তৌফিককে নিয়ামত বলা হয়েছে।

৩. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এখানে নিয়ামত দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে।

৪. বস্তুত এর দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে প্রদত্ত সকল নিয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ : আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি অনেক অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি করুণার কথা আল্লাহ এ সূরাতে উল্লেখ করেছেন।

নবীর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ হলো আল্লাহ নবীকে পিতৃহীন অবস্থায় পেয়েছেন। অতঃপর আশ্রয় দান করেছেন। অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ তাঁকে পরিত্যাগ করেছন অথবা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এরূপ কোনো ধারণাই মনে আসতে পারে না। বস্তুত নবী করীম ﷺ যখন মাতৃগর্ভে ছয় মাসের ছিলেন, সে সময়ই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। এ জন্য তিনি জন্মাবস্থায়ই পিতৃহীন ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও অসহায় করে রাখেননি। ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর জননীই তাঁর লালন-পালন করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর জননী-স্নেহ বঞ্চিত হয়ে আট বছর বয়স পর্যন্ত দাদার স্নেহে লালিত হন। দাদা তাঁকে পরম স্নেহে ও আদরে লালন-পালন করেন। তিনি তাঁকে শুধু ভালোই বাসতেন না; বরং তাঁকে নিয়ে তিনি রীতিমতো গর্ববোধ করতেন। তিনি লোকদের বলতেন–আমার এ নাতিটি একদিন দুনিয়াতে বড় খ্যাতি ও সম্মান লাভ করবে। দাদার ইন্তেকালের পর তাঁর চাচা আবূ তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সাথে এমন স্নেহ-ভালোবাসার ব্যবহার করতেন যে, কোনো জন্মদাতা পিতাও বোধ হয় তা করতে পারে না। এমনকি নবুয়ত লাভের পর সমগ্র আরববাসী যখন তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল, তখন দশ বছর পর্যন্ত তিনিই তাঁর সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বুক পেতে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় অনুগ্রহ হলো 'পথহারাকে পথ দেখিয়েছেন।' বাল্যকাল হতে নবুয়ত লাভ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর অবস্থার বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে তিনি কখনো গোমরাহ হয়ে মূর্তিপূজা, শিরক কিংবা নাস্তিকতায় নিমজ্জিত হয়েছেন বলে ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। তিনি সত্যদীন, তার আইন-কানুন ও বিধি-বিধান কিছুই জানতেন না। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তা তাঁকে শিখিয়েছেন।

তৃতীয় অনুগ্রহ হলো নিঃস্বকে সম্পদশালীতে পরিণত করা। নবী করীম ﷺ -এর জন্য তাঁর পিতা কেবলমাত্র উষ্ট্রী এবং একজন কৃতদাসী উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছেন। ফলে তাঁর জীবন আরম্ভ হয়েছিল দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে, পরে এক সময় কুরাইশদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা হযরত খাদীজা (রা.) প্রথমত ব্যবসায়ে তাঁকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য নিজেই পরিচালনা করতে থাকেন। হযরত খাদীজার ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎকর্ষ দানের ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতার বিশেষ অবদান ছিল। নবী করীম ﷺ স্ত্রীর ধন-সম্পদের উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল ছিলেন না। যদিও বিবি খাদীজা (রা.) তার সমস্ত ধনসম্পদ নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উৎসর্গ করেছেন। এভাবে নবীকে আল্লাহ সম্পদশালী করলেন।

سُوْرَةُ أَلَمْ نَشْرَحْ : সূরা আলাম নাশরাহ্

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের প্রথমাংশকে এর নাম হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ১০৩ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে অনুমিত হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা আদ্ব-দ্বুহা ও এ সূরাটি প্রায় একই সময় নাজিল হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি মক্কা শরীফে সূরা আদ্ব-দ্বুহার পরে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মূলত এ সূরাতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। নবুয়তের পূর্ববর্তী সময় নবী করীম ﷺ মক্কাবাসীদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করতেই সমগ্র সমাজ ও জাতি যেন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। তখন মক্কা নগরীতে তাঁর কথা শুনতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রতি পদে তাঁর সম্মুখে নানাবিধ সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করতে লাগল। তাঁর জন্য এ সব খুবই মর্মন্তুদ ও নিরুৎসাহ ব্যাঞ্জক ছিল। এ কারণে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রথমে সূরা আদ্ব-দ্বুহা ও পরে এ সূরাটি নাজিল হয়।

সূরাটিতে সর্বপ্রথম নবী করীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আমি আপনাকে তিনটি বড় বড় নিয়ামত দান করেছি। এ নিয়ামতসমূহ বর্তমান থাকতে আপনার নিরুৎসাহ ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। একটি হলো 'শরহে সদর'-এর নিয়ামত। দ্বিতীয় নবুয়তের পূর্বে যে দুর্বহ বোঝা আপনার মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছিল, আমি তা আপনার উপর হতে নামিয়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় হলো তার উচ্চ ও ব্যাপক উল্লেখের নিয়ামত। একমাত্র আপনি ছাড়া সৃষ্টিলোকের অন্য কাউকে এরূপ নিয়ামত দান করা হয়নি।

অতঃপর সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে বর্তমানের কঠিনতাপূর্ণ ও দুষ্কর সময় খুব বেশি দীর্ঘ হবে না। এ সংকীর্ণতাপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালতা ও প্রশস্ততার ফল্গুধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে।

পরিশেষে নবী করীম ﷺ -কে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এ কঠিনতা ও কঠোরতা, সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করার শক্তি আপনার মধ্যে একটি জিনিস হতেই আসবে। আর তা হলো, আপনি যখনই আপনার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যস্ততা হতে অবসর পাবেন, তখন আপনি ইবাদত-বন্দেগির শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন হবেন। সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে নিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلَمْ نَشْرَحْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَيْ شَرَحْنَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ صَدْرَكَ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا .

১. আমি কি প্রশস্ত করিনি? এখানে اِسْتِفْهَامٌ বা প্রশ্নবোধকটি تَقْرِيْر বা সাব্যস্তকরণার্থে অর্থাৎ আমি প্রশস্ত করেছি। তোমার জন্য হে মুহাম্মদ তোমার বক্ষকে নবুয়ত ইত্যাদি অনুগ্রহের মাধ্যমে।

٢. وَوَضَعْنَا حَطَطْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ .

২. আর আমি অপসারণ করেছি বিদূরিত করেছি তোমার উপর হতে তোমার বোঝা।

٣. الَّذِيْ اَنْقَضَ اَثْقَلَ ظَهْرَكَ وَهٰذَا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ .

৩. যা দুর্বহ করেছিল ভারি করেছিল তোমার পৃষ্ঠকে এ আয়াতটি অনুরূপ–যেমন, অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে–

لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

٤. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بِاَنْ تُذْكَرَ مَعَ ذِكْرِيْ فِي الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَالْخُطْبَةِ وَغَيْرِهَا .

৪. আর আমি তোমার খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি যেমন– আযান, ইকামাত, তাশাহহুদ ও খুতবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমার স্মরণের সাথে তোমর নামও উল্লিখিত হয়।

٥. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الشِّدَّةِ يُسْرًا سُهُوْلَةً .

৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই বিপদাপদের সাথেই স্বস্তি আছে শান্তি আছে।

٦. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاسٰى مِنَ الْكُفَّارِ شِدَّةً ثُمَّ حَصَلَ لَهُ الْيُسْرُ بِنَصْرِهٖ عَلَيْهِمْ .

৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে নবী করীম ﷺ প্রথমে কাফেরদের পক্ষ হতে অনেক দুঃখ-যাতনা সহ্য করেছেন। অতঃপর তাদের উপর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করেছেন।

٧. فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَانْصَبْ اِتْعَبْ فِي الدُّعَاءِ .

৭. অতএব যখনই তুমি অবসর হবে সালাত হতে সাধনা করো খুব প্রার্থনা করো।

٨. وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ تَضَرَّعْ .

৮. আর তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো কান্নাকাটি করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে নবী করীম ﷺ-এর রেসালাতের কার্যকে সঠিকরূপে পরিচালনার নিমিত্তে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে তাঁর উপর আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন নবুয়তের ভার বহনের জন্য যোগ্য করে তুলতে তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করার বিষয় আলোচিত হচ্ছে। নবুয়তের দায়িত্বকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কাফেরদের

ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাশার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে মানবিক মাকসুদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, উভয় সূরার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। -[কামালাইন]

সূরাটির শানে নুযূল : এ সূরা সর্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছিল। একদা নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা, হযরত দাউদ ও হযরত সোলাইমান (আ.) প্রমুখ নবীগণকে এক একটি গৌরবজনক উপাধি ও বিশিষ্ট শক্তি দান করেছ। আমার জন্য তুমি সেরূপ কোন সম্পদ দান করেছ? উক্ত প্রার্থনার উত্তরে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে নবী করীম ﷺ -এর অসাধারণ দৈহিক ও আত্মিক উন্নতির বিষয় বর্ণিত হয়েছে -[খাযেন, মা'আলিম, ইবনে কাছীর]

অথবা, কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় গরিব, অসহায়, দাসদাসী ও মহিলাগণই তাওহীদে বিশ্বাস করেছিল। তখনো আরবের কোনো উল্লেখযোগ্য ধনী বা প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ সময় মক্কার মুশরিকগণ মুসলমানদের দরিদ্র ও দৈন্য দশা নিয়ে উপহাস করত। এতে নবী করীম ﷺ ও তাঁর অনুসারীগণ কিছুটা সংকোচবোধ করতেন। তাদের মানসিক দুর্বলতা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ সূরা নাজিল করেন। -[লোবাব]

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ আয়াতে شَرْحُ الصَّدْرِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? : মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে شَرْحِ صَدْر 'বক্ষ উন্মোচনের' দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. সকল প্রকার মানসিক দ্বন্দ্ব, কুণ্ঠা ও ইতস্তত ভাব হতে মুক্ত হয়ে এ কথায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও প্রশান্ত হওয়া যে, ইসলামের পথই একমাত্র সত্য পথ এবং ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসনীতি, আদর্শ নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, আইন ও বিধান একান্তভাবে সত্য, নির্ভুল ও কল্যাণকর।

এ অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে সত্য-সঠিক পথের বিস্তারিত পথ নির্দেশ, নবী করীম ﷺ -এর জানা ছিল না। এ কারণে তার মনে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব সদা জাগ্রত থাকত। নবুয়ত দান করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনের এ উদ্বেগের চির অবসান করে দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে-

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ .

২. কোনো ব্যক্তির মাঝে প্রবল সাহস ও বলিষ্ঠ মানসিকতার উদ্ভব হওয়া, বড় বড় অভিযানে গমন এবং কঠিন-কঠোর, দুঃসাধ্য কাজে একবিন্দু কুণ্ঠা ও দুর্বলতা দেখা না দেওয়া মানে নবুয়তের মহান দায়িত্ব পালনের সাহসিকতার সঞ্চার হওয়া।

এ অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, নবুয়ত দান করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অপূর্ব সাহসিকতা, দৃঢ় মানসিকতা, উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের উদারতা প্রশস্ততাও দান করেছেন। কেননা নবুয়তের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য এ গুণসমূহ ছিল অপরিহার্য।

شَقُّ الصَّدْرِ-এর বর্ণনা : শরহে সাদরের পাশা-পাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষ বিদারণও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে। অন্তরকে পরিষ্কার করে ঈমান ও তাওহীদের বীজ রাখার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণই শাক্কে সাদার।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্ষ চারবার বিদারণ করা হয়েছিল-

১. হযরত আনাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যখন তাঁর বয়স চার বছর হয়, তিনি তখন হযরত হালীমা (রা.) -এর প্রতিপালনে ছিলেন। একদিন ছেলেদের সাথে খেলার মাঠে গেলেন। সে সময় ফেরেশতা এসে তাঁর বক্ষ বিদারণ করে। সোনার তস্তরীতে জমজমের পানি দ্বারা তাঁর 'কলব' [হৃদপিণ্ড] ধৌত করে, আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর বক্ষে সেলাইর দাগ দেখেছি। এ বক্ষ বিদারণ দ্বারা খেলাধুলা এবং বাল্যকালের অন্যান্য দুর্বলতা দূর করা উদ্দেশ্য ছিল।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, দ্বিতীয়বার যখন তাঁর বয়স বিশ বছর হয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনা মতে- যখন তাঁর বয়স দশ বছর হয়েছিল, তখন এক ময়দানে হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ.) তাঁকে শোয়ায়ে বক্ষ বিদারণ করে, এতে কোনো রক্তও বের হয়নি, কোনো কষ্টও অনুভব করেননি। তখন একজন পানি আনয়ন করেন, দ্বিতীয়জন কলব ধৌত করেন। এটা দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষকে একটি রক্তপিণ্ডের মতো বের করে ফেলে দেন। আর স্নেহ-মমতাকে রৌপ্যের টুকরোর মতো একটি পিণ্ড আকারে অন্তরে প্রবিষ্ট করে দেন। অতঃপর বক্ষ বন্ধ করে তাতে একটি জিনিস ঔষধের মতো লাগিয়ে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে স্নেহ-মমতা, দয়া, অনুগ্রহ প্রবল হয়ে উঠে। আর যৌবনের সর্বপ্রকার কু-বাসনা দূর হয়ে যায়

১. যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন, তখন বক্ষ বিদারণ করা হয়। আর ওহী বরদাশত করার ক্ষমতা তাঁর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়।

২. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবুয়তের পর হিজরতের পূর্বে মেরাজ গমন কালে কা'বা ঘরের নিকট তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর হযরত জিবরাঈল (আ.) সোনার তশতরীতে জমজমের পানি দ্বারা তাঁর বক্ষ ধৌত করে তাতে ঈমান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ভর্তি করে আকাশমণ্ডলী সফরের শক্তি তাঁর বক্ষে ঢেলে দেন। –[খাযেন, রূহুল মা'আনী]

সারকথা, আল্লাহ তা'আলা দৌহিক ও আত্মিকভাবে নবী করীম ﷺ-এর বক্ষ উন্মুক্ত ও সম্প্রসারিত করেছেন, এ বক্ষ উন্মোচনের পর তাঁর দেহ এরূপ বিশুদ্ধ ও নির্মল এবং হৃদয় এরূপ সমুজ্জ্বল ও জ্যোতিপূর্ণ হয়েছিল যে, প্রখর সূর্য কিরণের মধ্যেও তাঁর পবিত্র দেহের ছায়া প্রতিবিম্বিত হতো না। –[আযীযী, কাযেন]

قَلْب-কে উল্লেখ না করে صَدْر-কে উল্লেখ করার কারণ : অত্র আয়াতে قَلْب -এর পরিবর্তে صَدْر উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ এর একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন।

১. জমহুর মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে قَلْب -এর পরিবর্তে صَدْر-এর উল্লেখ করার কারণ এই যে, কুমন্ত্রণা, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও কু-ধারণার স্থান হলো صَدْر বা বক্ষ, অন্তর বা قَلْب নয়। ইরশাদ হচ্ছে– اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ। কাজেই شَرْحِ صَدْر-এর মাধ্যমে বক্ষকে সমস্ত কুমন্ত্রণা ও কু-কামনা হতে পবিত্র করা হয়েছে।

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী (র.) বলেন, মূলত قَلْب-ই হলো শয়তানের লক্ষ্যস্থল। আর قَلْب (অন্তর) صَدْر (বক্ষ) রূপ দুর্গে অবস্থিত। কাজেই শয়তান কিছুমাত্র সুযোগ করতে পারলেই তার সৈন্য-সামন্ত সহ বক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে কলব সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কুচিন্তা, সন্দেহ-সংশয় ও দুশ্চিন্তার জাল এমনভাবে বিস্তারিত হয় যে, قَلْب ইবাদত ও অন্যান্য ভালো কাজ করতে মজা পায় না। একমাত্র شَرْحِ صَدْر-এর মাধ্যমেই এ অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। –[কাবীর]

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ-আয়াতে لَكَ -কে অতিরিক্ত নেওয়ার হিকমত : এখানে اَلَمْ نَشْرَحْ صَدْرَكَ বললেই বাক্য পূর্ণ হয়ে যেত তথাপি "لَكَ" শব্দটিকে অতিরিক্ত নেওয়া হয়েছে কেন? মুফাসসিরগণ তার একাধিক হিকমত বর্ণনা করেছেন।

১. এটা দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, شَرْحِ صَدْر [ও নবুয়তের অন্যান্য কল্যাণ] একমাত্র নবী করীম ﷺ-এর জন্যই নিবেদিত। এতে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কোনো ফায়দা নেই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে– اِنَّمَا شَرَحْنَا صَدْرَكَ لِاَجْلِكَ لَا لِاَجْلِىْ" অর্থাৎ আমি আপনার বক্ষকে উন্মোচন করেছি আপনারই কল্যাণের জন্য, আমার কোনো কল্যাণের জন্য নয়।

২. অথবা, এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেহেতু নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত কাজ-কর্ম আল্লাহর জন্যই করে সেহেতু আল্লাহ তা'আলা شَرْحِ صَدْر ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজ নবী করীম ﷺ -এর জন্যই করেছেন। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَمْ نَشْرَحْ بِصِيْغَةِ الْجَمْعِ؟ : اَلَمْ نَشْرَحْ – বাক্যাংশটুকু বহুবচনের সীগায় উল্লেখ করা হয়েছে কেন? : আল্লাহ তা'আলা এখানে اَلَمْ اَشْرَحْ না বলে اَلَمْ نَشْرَحْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ একবচনের صِيْغَه ব্যবহার না করে বহুবচনের صِيْغَه উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. এখানে বহুবচনের صِيْغَه সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় অনেক সময় সম্মানার্থে একবচনের স্থলে বহুবচনের صِيْغَه ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিয়ামতদাতা যেমন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তেমনটি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতও অতিশয় মর্যাদা সম্পন্ন।

২. অথবা, বহুবচনের صِيْغَه দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, شَرْحِ صَدْر-এর কাজটি আল্লাহ তা'আলা একা করেননি; বরং এ কাজে তিনি তাঁর ফেরেশতাগণের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। যেন বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনি আপনার উপর অর্পিত রেসালাতের দায়িত্ব পালন করে যান। আমার ফেরেশতাগণ সার্বক্ষণিকভাবে আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। –[কাবীর]

وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ -এর অর্থ : وِزْر -এর শাব্দিক অর্থ– পাপ, দুশ্চিন্তা, কাপড়ের গিরা, বোঝা, ভার ইত্যাদি। সুতরাং وِزْر -এর অর্থ হবে– আমি আপনার উপর হতে দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে– এ বোঝা অর্থ গুনাহ। জাহেলিয়াতের যুগে নবী করীম ﷺ এমন কোনো ভুল করেছেন, যা এ আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিশ্চিন্ত করে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তার ভুল মাফ করে দিয়েছেন। –[খাযেন]

অথবা, এ وِزْر (দুর্বহবোঝা) দ্বারা চাচা আবূ তালেব ও খাদীজার মৃত্যুতে যে দুঃখ-চিন্তা এসেছিল, তা অপসারণের কথা বুঝিয়েছেন। -[রূহুল মা'আনী]

অথবা, وِزْرَكَ-এর মধ্যে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মূলবাক্য ছিল وِزْرَ اُمَّتِكَ অর্থাৎ অধিক চিন্তা করে হতাশ হবেন না, আপনার উম্মতের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেওয়া হয়েছে। অথবা, আপনার উপস্থিতিতে তাদের উপর শাস্তি হবে না। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে- مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ -[রূহুল মা'আনী]

অথবা, কিছু দিন ওহীর অবতরণ বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আর তা ছিল মনের উপর বিরাট বোঝার ন্যায়। মহান আল্লাহ সূরা দুহা এবং সূরা ইনশিরাহ নাজিল করে তাঁর দুশ্চিন্তার বোঝা দূর করে দিয়েছেন এবং তাঁর মনেও সান্ত্বনা দান করেছেন।

কারো মতে, ইসলামের প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় নবী করীম ﷺ-এর অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকত এবং দিবারাত তিনি সত্য সাধনায় মশগুল থাকতেন। কিন্তু বিরোধীদের বিরোধিতার কারণে তাঁর আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক কাজ হতো না। তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। মহান আল্লাহ তাঁর মনকে প্রশস্ত করেছেন এবং অনেক দুঃসাধ্য কাজও সহজ করেছেন, ফলে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। -[নূরুল কোরআন]

رَفْعُ الذِّكْرِ-এর ধরন : নাম সমুন্নত করার এটা একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় [যখন সূরাটি নাজিল হয়] কেউ চিন্তাও করতে পারেনি যে, একক ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তি, যার সাথে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক রয়েছে, তাও কেবল মক্কা শহরে সীমাবদ্ধ, তার সুনাম ও সুখ্যাতি সারা বিশ্বে কেমন করে ছড়িয়ে পড়বে। এ সুসংবাদ আল্লাহ বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

এ رَفْعُ الذِّكْرِ-কে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়-

প্রথম স্তর, নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায় যখন মক্কার মুশরিকগণ সমাগত হাজীদের কাছে নবী করীম ﷺ-এর নানাবিধ কুৎসা করে বেড়াত, যাতে কেউ তাঁর অনুসারী না হয়, মূলত ফল হয়েছিল বিপরীত। বিরুদ্ধবাদীদের মুখে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নাম যত্রতত্র প্রচারিত হতে লাগল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বত্র আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। তাঁর সম্বন্ধে জানার জন্য এবং তাঁকে বুঝার জন্য অনেকে কৌতূহলবোধ করল। নবী করীম ﷺ-এর সংস্পর্শে এসে অনেকেই দীনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয় স্তর, নবী করীম ﷺ-এর মদীনার জীবনে যখন ইসলামি হুকুমত কায়েম হয়েছিল। তখনও মুশরিকগণ তাঁর দুর্নাম রটনা করেছিল। মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রের আল্লাহনুগত্য, সামাজিক ন্যায়-নীতি, সাম্য, সততা ও উত্তম সামাজিকতা সাধারণ মানুষের মন-মগজকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে তাঁর নাম আরও ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়েছিল।

তৃতীয় স্তর, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগ। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে গোটা পৃথিবীতে তাঁর নামের যশ ছড়িয়ে পড়েছিল।

চতুর্থ স্তর হলো, তৎপরবর্তী, বর্তমান ও অনন্তকালের স্তর, সারা পৃথিবীর মুসলমান প্রত্যহ ভক্তিভরে তাঁর নাম উচ্চারণ করে যেখানেই আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় সেখানেই নবী করীম ﷺ-এর নামও উচ্চারিত হয়। পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত- এমনকি কিয়ামতের পরেও সর্বত্র তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হবে। এটাই رَفْعُ الذِّكْرِ-এর তাৎপর্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, رَفْعُ الذِّكْرِ দ্বারা আজান, ইকামত, তাশাহ্হুদ, খুতবা এবং কালিমায়ে তাওহীদে নবীর কথা জুড়ে দেওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর নামের সাথে রাসূলের নাম কুরআনের বহুস্থানে একত্রে যিকির বা উল্লেখের কথা বুঝিয়েছে। যেমন- اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ - مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ইত্যাদি -[খাযেন]

কতিপয় তাফসীরকার এটা দ্বারা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের নবীর উপর দরূদ পাঠের কথা এবং সকল উম্মতের উপর দরূদ পাঠের আদেশের কথা বুঝানো হয়েছে। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন- আপনার নিকট আল্লাহ رَفْعِ ذِكْرِ-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন তিনি বলেন, আল্লাহই এর অর্থ ভালো জানেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আল্লাহ বলেন, اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ অর্থাৎ আমার নামের সাথে আপনার নাম নেওয়া হয়। -[রূহুল মা'আনী]

কারো মতে, নবী করীম ﷺ-এর সুখ্যাতি ও সুনাম বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে সারা বিশ্বে এমন কি ঊর্ধ্ব জগতেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا : 'নিশ্চয়ই সংকীর্ণতা ও কঠোরতার সাথে রয়েছে প্রশস্ততা ও সহজতা।' এ কথাটি এখানে একই সঙ্গে দু'বার বলা হয়েছে- কথাটির উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করার জন্য। নবী করীম ﷺ -কে পূর্ণমাত্রায় সান্ত্বনা দান ও আশ্বস্ত করার জন্যই এরূপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বর্তমানে যে সংকটপূর্ণ সংকীর্ণ অবস্থায় রয়েছেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অচিরেই সংকট কেটে যাবে এবং শুভ দিনের সূচনা হবে।

লক্ষণীয় যে, এখানে দু'টি বাক্যেই اَلْعُسْرُ শব্দটিকে মা'রেফা (مَعْرِفَة) উল্লেখ করা হয়েছে। আর আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি শব্দকে একবার মা'রেফা উল্লেখ করে পুনরায় তাকে মা'রেফা নেওয়া হলে একই বস্তুকে বুঝায়। অর্থাৎ দু'টি দ্বারা একটি বস্তুই উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং এখানে উভয় عُسْر দ্বারা একটি عُسْر -ই উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে يُسْرًا শব্দটিকে উভয় বাক্যে نَكِرَة নেওয়া হয়েছে। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী যা দ্বারা দু'টি পৃথক يُسْر উদ্দেশ্য।

এটা হতে মুফাস্সিরগণ এ সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন যে, একটি عُسْر (মুশকিল-কঠোরতা)-এর সাথে দু'টি يُسْر [আসানী-সহজতা] রয়েছে। জনৈক কবি বলেছেন-

إِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوٰى * فَفَكِّرْ فِيْ أَلَمْ نَشْرَحْ * فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ * إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ .

ইমাম বাগাবী (র.) লিখেছেন, যদি কষ্ট কোনো গর্তের মধ্যে থাকে, স্বস্তিও সে গর্তে হাজির হবে। এ আয়াতে মহান আল্লাহ প্রিয় নবী ﷺ -কে বিশেষ সান্ত্বনা প্রদান করেন। -[নূরুল কোরআন]

إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا না বলে إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا বলেছেন কেন? : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا (কঠোরতার পর সহজতা) না বলে إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [কঠোরতার সাথে সহজতা] বলেছেন। এর কারণ কি?

এর জাওয়াবে বলা হয়েছে যে, 'সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা' না বলার কারণ এই যে, প্রশস্ততার কাল সংকীর্ণতার পর এতই সন্নিকটে ও কাছাকাছি যে, তাকে পৃথক একটি সময় হিসাবে গণ্য করা যায় না। মোটকথা, এটা দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সংকীর্ণতা ক্ষণস্থায়ী অচিরেই তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ জন্যই এখানে সংকীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততা বলা হয়েছে, সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা বলা হয়নি।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلٰى رَبِّكَ الخ : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- আপনি সালাত হতে অবসর হওয়ার পর অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে দোয়া ও মুনাজাতে মশগুল হয়ে যান। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করুন- তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণও প্রায় একই ব্যাখ্যা প্রদান করে লিখেছেন- এখানে 'অবসর পাওয়া'-এর অর্থ হলো, নিজের নিত্যনৈমিত্তিক ও প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততা হতে অবসর পাওয়া। এ নির্দেশের মূল লক্ষ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, যখন অন্য কোনো ব্যস্ততা ও লিপ্ততা থাকবে না, তখন এ অবসর মুহূর্তগুলোকে ইবাদত-বন্দেগির কষ্ট স্বীকার ও আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রমে অতিবাহিত করবেন। অন্য সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য সব কাফেলা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল স্বীয় আল্লাহর দিকে মন একান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখবেন। এটা আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নির্দেশ।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন আপনি ফরজ সালাত হতে অবসর হবেন, রাত্রি জাগরণের জন্য দণ্ডায়মান হবেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার নিজের জন্য ও উম্মতের জন্য দোয়া করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ তাফসীরকারকদের মতে, এর অর্থ হলো যখন ফরজ নামাজ শেষ হয় বা অন্য কোনো নামাজ শেষ হয় তখন বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করুন।

অথবা, এর অর্থ হলো, এক ইবাদত শেষ হলে আরেক ইবাদতে সাধনা করুন, যাতে করে এক মুহূর্তও ইবাদত ব্যতীত অতিবাহিত না হয়। -[নূরুল কোরআন]

আর হযরত হাসান এবং যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেছেন, যখন জিহাদ থেকে অবসর পান তখন ইবাদতে মশগুল হোন।

আর মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- যখন দুনিয়ার কাজ শেষ হয়; তখন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হোন।
-[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ التِّيْنِ : সূরা আত্-ত্বীন

সূরাটির নামকরণের কারণ : اَلتِّيْنُ অর্থ- আনজীর, ডুমুর বা ঐরূপ ফল বিশেষ। কেউ কেউ একে পর্বত-প্রান্তর অথবা মসজিদ বিশেষের নাম বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দ 'ত্বীন' হতে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি বাক্য এবং ১৫৯টি অক্ষর রয়েছে।

وَقْتُ نُزُوْلِ السُّوْرَةِ :

সূরাটির অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে, একটিতে মক্কায় অপরটিতে মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটা মাক্কী সূরা হওয়ার সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ হলো, এতে মক্কা শরীফ সম্পর্কে هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এ শান্তির শহর) শব্দ কয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যদি মদীনায় অবতীর্ণ হতো, নিশ্চয় মক্কা শহরকে 'এ শহর' বলা হতো না। এ ছাড়া সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটু চিন্তা করলেও মনে হয়, তা মক্কা শরীফে নবুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে বাচনভঙ্গি, সংক্ষিপ্ত আয়াত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা ধারা, তা এতে পুরাপুরি বর্তমান। পরকালে শুভ কর্মফল ও শাস্তি অপরিহার্য এবং অতীব যুক্তিসঙ্গত, এ কথাই এতে বুঝানো হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম- এ তিনটি প্রধান ধর্ম এবং এর জগদ্বিখ্যাত প্রবর্তকত্রয়ের ধর্ম ও কর্মের বিকাশ স্থাপনের শপথ করে মানবের উৎপত্তি ও পরিণতির বিষয় বিবৃত করা হয়েছে।

ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের শাস্তি প্রমাণই এর বিষয়বস্তু। এ কথা প্রমাণের জন্যই নবী-রাসূলগণের অভ্যুদয়ের স্থানসমূহের নামে শপথ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতি বিশিষ্ট ও সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন। নবুয়তের ন্যায় উচ্চতম মর্যাদার ধারক লোক এই মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে- মানুষ দু' প্রকার-

১. যারা অতি উত্তম মান ও কাঠামোতে সৃষ্টি হওয়ার পর খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে পৌঁছে, যে পর্যন্ত অন্য কোনো সৃষ্টি যেতে পারে না।

২. যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে এ পতন হতে রক্ষা পেয়ে যায় এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব সমাজের সর্বত্র ও সর্বদাই এ দু' প্রকারের বাস্তবতার কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সূরার শেষভাগে উপরিউক্ত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে-মানুষের মাঝে যখন এ দু' ধরনের পরস্পর বিরোধী স্বভাবের মানুষ বর্তমান দেখা যায়, তখন কর্মফলকে অস্বীকার করা যেতে পারে না। অধঃপতনে পতিত লোকদেরকে কোনো শাস্তি এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লোকদেরকে কোনো পুরস্কার যদি না-ই দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে বে-ইনসাফী ও অবিচার প্রমাণিত হয়। অথচ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। অতএব, এ ব্যাপার নিঃসন্দেহ যে, মহাবিচারক আল্লাহ অধঃপতিতদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন এবং ঈমান ও কর্ম দ্বারা উন্নত মর্যাদার অধিকারীদেরকে যারপরনাই পুরস্কার দান করবেন।

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আত্ব-ত্বীনমক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

ثَمَانُ اٰيَةٍ : ৮ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ اَيِ الْمَاكُوْلَيْنِ اَوْ جَبَلَيْنِ بِالشَّامِ يُنْبِتَانِ الْمَاكُوْلَيْنِ .

১. শপথ ত্বীন [আনজীর] ও যায়তুনের! অর্থাৎ দু'টি খাদ্যদ্রব্য অথবা সিরিয়া অবস্থিত দুটি পাহাড় যাতে এ দু'টি খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়।

٢. وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ الْجَبَلِ الَّذِىْ كَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَمَعْنٰى سِيْنِيْنَ الْمُبَارَكَ اَوِ الْحَسَنَ بِالْاَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ .

২. শপথ তূর-এ সাইনার! এটা সে পাহাড় যাতে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেছেন। আর سِيْنِيْنَ এর অর্থ হলো, বরকতময় অথবা ফলদার বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত ও সুদর্শনীয়।

٣. وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ مَكَّةَ لِاَمْنِ النَّاسِ فِيْهَا جَاهِلِيَّةً وَاِسْلَامًا .

৩. আর শপথ এ শান্তিপূর্ণ-নিরাপদ নগরীর! এটা দ্বারা এখানে মক্কাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের যুগে এবং ইসলামের যুগে সর্বদা এটা মানুষের জন্য নিরাপদ নগরী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

٤. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ تَعْدِيْلٍ لِصُوْرَتِهٖ .

৪. অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মানবজাতিকে অতীব সুন্দর কাঠামোয়-তার আকৃতিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছি।

٥. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ فِىْ بَعْضِ اَفْرَادِهٖ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ لا كِنَايَةٌ عَنِ الْهَرَمِ وَالضُّعْفِ فَيَنْقُصُ عَمَلُ الْمُؤْمِنِ عَنْ زَمَنِ الشَّبَابِ وَيَكُوْنُ لَهٗ اَجْرُهٗ .

৫. অতঃপর আমি তাকে উল্টা ফিরিয়ে দিয়েছি কোনো কোনো মানুষকে [মানুষের কোনো কোনো একককে] সর্বনিম্ন পর্যায়ে-এটা দ্বারা বার্ধক্য ও দুর্বলতার দিকে كِنَايَة [ইঙ্গিত] করা হয়েছে। কাজেই মু'মিন ব্যক্তি যৌবনকাল অপেক্ষা বার্ধক্যে আমল কম করে। কিন্তু তথাপি এর [পূর্ণ আমলের] ছওয়াব পায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরাতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর উপর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ ছিল, আর অত্র সূরায় সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দানের ঘোষণা রয়েছে যে, তিনি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দরতম গঠনের পাশাপাশি চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনেরও তাকিদ রয়েছে এ সূরায়। -[নূরুল কোরআন]

ত্বীন ও যায়তুন-এর অর্থ : আলোচ্য সূরায় প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা ত্বীন ও যায়তুনের শপথ করেছেন। এরা দু'টি ফল। অবশ্য উক্ত ফলদ্বয়ের গাছকেও তীন ও যায়তুন বলা হয়।

ত্বীন অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। তা সাধারণত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উৎপন্ন হয়। মুফাস্সিরগণ লিখেছেন, ত্বীন খাদ্য, ফল ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন, তীন ফল লঘু পাক। তা ফুসফুস ও পেটের অভ্যন্তরের অন্যান্য যন্ত্রাংশকে পরিষ্কার ও সুস্থ-সবল রাখে। এ ভক্ষণে অর্শ রোগ নির্মূল হয়। সর্ব দিক দিয়ে এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। আর যায়তুন বলে এমন ফল যা হতে সে নামের তৈল উৎপাদিত হয়।

ত্বীন ও যায়তুন দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে তীন ও যায়তুন দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ইবনে আবী রিবাহ, জাবির ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখয়ী (র.) প্রমুখগণের মতে, ত্বীন বলতে সে ফল বুঝায়, যা লোকেরা ভক্ষণ করে। আর যায়তুন সে ফল যা হতে এ নামের তৈল বের করা হয়। ইবনে আবি হাতেম ও হাকেম (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ মতের সমর্থনে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।
২. হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, ত্বীন এবং যায়তুন দু'টি পাহাড়।
৩. কাতাদা (র.) বলেন, ত্বীন সে পাহাড় যার উপর দামেশক নগরীটি হয়েছে আর যায়তুন হলো বায়তুল মুকাদ্দাস।
৪. আবূ মুহাম্মদ ইবনে ক্বাব বলেছেন, আসহাবে কাহাফের মসজিদ হলো ত্বীন। আর যাতুন হলো ইলইয়ার মসজিদ। -[নূরুল কোরআন]
৫. ইবনে জারীর সহ অনেকের মতে, ত্বীন হলো জুদী পাহাড়ে নির্মিত হযরত নূহ (আ.)-এর মসজিদ; আর যায়তুন দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্দেশ্য।
৬. কারো মতে, ত্বীন হলো কূফা শহর আর যায়তুন হলো সিরিয়া শহর।
৭. আল্লামা যামাখশারী ও আলূসী (র.) সহ প্রমুখ তাফসীরকারদের মতে, ত্বীন ও যায়তুন দ্বারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তদানীন্তন আরব সমাজে এ দু'টি স্থান ত্বীন ও যায়তুন ফল উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

তূরে সীনীন দ্বারা উদ্দেশ্য : 'তূর' দ্বারা সে পাহাড় উদ্দেশ্য, যার উপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন। 'সীনীন'-এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে-

১. নাহ্বিদদের নিকট সীনীন এবং সীনা দু'টি পাহাড়ের নাম।
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, 'তূর' হলো পাহাড়, আর সীনীন (হাবশী ভাষায়) সুন্দর।
৩. ইমাম কালবী (র.) বলেন, তা বৃক্ষযুক্ত পাহাড়। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]
৪. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, এর অর্থ সুন্দর পর্বত।
৫. কারো মতে, এটি এক প্রকার পাথর যা তূর পর্বতের কাছাকাছি পাওয়া যায়।
৬. হযরত ইকরামা (র.) বলেন, এটি সে স্থান যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত।
৭. হযরত মোকাতিল (র.) বলেন, যে পাহাড়ের উপর ফলবান বৃক্ষ থাকে তাকে সীনীন বলে।
৮. কারো মতে, এটি হিব্রু শব্দ, যার অর্থ- বরকতময়। -[নূরুল কোরআন]

শহর 'আমীন' হওয়ার কারণ : أَمِيْن অর্থ- آمِن অর্থাৎ শান্তিদাতা, আশ্রয়দাতা, শান্তিধাম ও নিরাপদ মক্কা শহরকে শান্তিদাতা ও আশ্রয়দাতা বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে–

১. আবরাহা বাদশাহর আক্রমণ থেকে হস্তীর দলকে নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহ তা'আলা মক্কা শহরকে হেফাজত করেছেন–শান্তিতে রেখেছেন বিধায় একে أَمِيْن বলা হয়েছে।

২. এ শহর সকলকে আশ্রয় দেয়। হিংস্র জন্তু শিকারযোগ্য প্রাণীও এখানে আশ্রয় পায়। যেমন– আল্লাহ বলেন, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا –[কাবীর]

৩. যুদ্ধ-বিগ্রহসহ সমস্ত খুন-খারাবি এ শহরে নিষিদ্ধ।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ আয়াতে أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'অবশ্যই আমি মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।' মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে, এর অর্থ হলো– 'আমি মানবজাতিকে ভারসাম্যপূর্ণ (সুষমামণ্ডিত) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তা'আলা ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন।

২. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীকে মাথা উপুড় করে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু মানবজাতিকে সোজা দেহে মাথা উঁচু করে সৃষ্টি করেছেন। তারা হাত দ্বারা আহার করে।

৩. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম (রা.) বলেন, أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ হলো সুন্দর গঠন ও সুন্দর অবয়ব।

৪. হযরত আসাম (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানবকে পরিপূর্ণ আকল, বোধশক্তি, সাহিত্য-জ্ঞান ও বর্ণশক্তি দিয়ে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

৫. কেউ কেউ বলেছেন, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার তাৎপর্য এই যে, তাকে এক উন্নতমানের দেহ দেওয়া হয়েছে, অপর কোনো প্রাণীকে এরূপ দেহ দেওয়া হয়নি। সে সঙ্গে তাকে চিন্তা, অনুধাবন, জ্ঞান অর্জন ও বিবেক পরিচালনার অধিক উন্নতমানের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى "ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ" : তাফসীরকারকগণ বাক্যটির দু'টি অর্থ করেছেন।

এক. আমি তাকে অতি বার্ধক্যের দিকে নিয়ে গিয়েছি। এটা খুবই মর্মান্তিক অবস্থা। এ অবস্থায় পৌছলে মানুষ চিন্তা ও কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে, শারীরিক কামনীয়তা ও মানবিকশক্তি হারিয়ে কুৎসিত হয়ে পড়ে।

দুই. আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করেছি।

সূরার মূল উদ্দেশ্যের সাথে এ দুই অর্থের কোনোটিই সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ ভালো বা মন্দ উভয় প্রকার লোকই বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে থাকে। কেউ এ অবস্থায় পৌছলেই মনে করা যেতে পারে না ; তাকে কোনো খারাপ আমলের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে কিছু লোকের জাহান্নামে যাওয়ার ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণরূপে পরকালে ঘটিতব্য ব্যাপার। সূরার মূল উদ্দেশ্য লোকদেরকে পরকালে বিশ্বাসী বানানো।

হযরত মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষ যখন তাকে প্রদত্ত অনন্ত-অসীম নিয়ামত লাভের পরও অকৃতজ্ঞ হয় এবং মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহের অপব্যবহার করে যেমন খুশি তেমন জীবন যাপন করে এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে তথা দোজখের নিম্নস্তরে পৌছে দেন। মানুষ যখন মানবতার অমর্যাদা করে তখন সে অবনতি অধঃপতনের সর্বনিম্নস্তরে পৌছে যায়। এ জন্য কুরআনে হাকীমে বলা হয়েছে– وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا

–[নূরুল কোরআন]

٦. لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِلَّا اَىْ لٰكِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ مَقْطُوْعٍ وَفِى الْحَدِيْثِ اِذَا بَلَغَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكِبَرِ مَا يُعْجِزُهٗ عَنِ الْعَمَلِ كُتِبَ لَهٗ مَا كَانَ يَعْمَلُ .

٧. فَمَا يُكَذِّبُكَ اَيُّهَا الْكَافِرُ بَعْدُ اَىْ بَعْدَ مَا ذُكِرَ مِنْ خَلْقِ الْاِنْسَانِ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ ثُمَّ رَدَّهٗ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ الدَّالِّ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ بِالدِّيْنِ بِالْجَزَاءِ الْمَسْبُوْقِ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ اَىْ مَا يَجْعَلُكَ مُكَذِّبًا بِذٰلِكَ وَلَا جَاعِلَ لَهٗ .

٨. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ اَىْ هُوَ اَقْضَى الْقَاضِيْنَ وَحُكْمُهٗ بِالْجَزَاءِ مِنْ ذٰلِكَ وَفِى الْحَدِيْثِ مَنْ قَرَاَ بِالتِّيْنِ اِلٰى اٰخِرِهَا فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ .

অনুবাদ :

৬. যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইরশাদ করেছেন : কিন্তু اِلَّا এখানে لٰكِنَّ অর্থে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য তো রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার অবিচ্ছিন্ন, হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, যখন মু'মিন বার্ধক্যে উপনীত হয়, যদ্দরুন সে আমলে অক্ষম হয়ে পড়ে। তার আমলনামায় সে সকল আমল লিখিত হতে থাকে, যা সে যৌবনে আমল করত।

৭. সুতরাং কিসে তোমাকে অবিশ্বাসী করে? হে কাফের তারপরও অর্থাৎ মানুষকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি কর, তৎপর হীনতাগ্রস্ত বয়সে উপনীত করা ইত্যাদি, যা পুনরুত্থানে সামর্থ্যবান হওয়ার প্রতি প্রমাণ পেশ করে: এগুলো উল্লেখ করার পরও কর্মফল সম্বন্ধে প্রতিফল সম্পর্কে, যা পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের পর সংঘটিত হবে। অর্থাৎ কোন বস্তু তোমাকে প্রতিফল অস্বীকারকরণে উৎসাহিত করেছে? অথচ এমন কোনো কারণই নেই।

৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? অর্থাৎ তিনিই শ্রেষ্ঠতম বিচারক। আর প্রতিফল সংক্রান্ত তাঁর এ বিধান তারই অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা ত্বীন শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, সে তা পাঠান্তে বলবে بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ - হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আর আমি তার প্রতি সাক্ষ্য দানকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ الخ : التِّيْنِ-এর মধ্যস্থ وَ কসমের জন্য। وَالزَّيْتُوْنِ...الْاَمِيْنِ পর্যন্ত আতফ হয়েছে التِّيْنِ-এর উপর। لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ الخ বাক্যটি জওয়াবে কসম। কসম ও তার জওয়াব একত্র হয়ে জুমলা ফে'লিয়া হবে।

اَمِيْن শব্দটি بَلَد-এর সিফাত। اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ হালের স্থলে اِنْسَان হতে।

اَسْفَلَ শব্দটি سَافِلِيْنَ-এর দিকে মুযাফ হয়ে নসব বিশিষ্ট হয়েছে। এটা মাফউল হতে হাল হয়েছে। আর তা উহ্য كَوْن হতে না'তও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি ছিল- رَدَدْنٰهُ حَالَ كَوْنِهٖ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ

قَوْلُهُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ الخ : مَا এস্তেফহামিয়া, অর্থাৎ أَيُّ شَيْءٍ কেউ কেউ বলেন, مَنْ-এর يُكَذِّبُكَ মাফউল كَذِبَ এর, এটার ফায়েল যমীর مَا-এর দিকে ধাবিত। بِالدِّيْنِ-এর ب সবাবের জন্য এসেছে হরফ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। اَللّٰهُ ফায়েল, মুবতাদা। بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ তার খবর : নফীর উপর যদি এস্তেফহাম আসে, তখন বাক্য হ্যাঁ-বাচক হয়ে যায় এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

غَيْرُ مَمْنُوْنٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন–

১. কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো غَيْر مَقْطُوْعٍ অর্থাৎ এমন প্রতিদান যা কোনো দিন বিচ্ছিন্ন-নিঃশেষ হবে না। অশেষ ও অফুরন্ত কর্মফল।

২. কারো কারো মতে, এর অর্থ হলো بِغَيْرِ عَمَلٍ অর্থাৎ মু'মিন কোনো আমল ছাড়াই তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। মূলত এটা আল্লাহর নিছক অনুগ্রহ বৈ আর কি?

৩. কেউ কেউ বলেছেন– غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থ "لَا يُمَنُّ بِهٖ عَلَيْهِمْ" অর্থাৎ এ প্রতিদানের কারণে তাদেরকে খোঁটা দেওয়া হবে না।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো, যৌবনে মু'মিন ব্যক্তি যে আমল করত বৃদ্ধ হয়ে দুর্বলতার কারণে সে আমল করতে না পারলেও তাকে সে আমলের ছওয়াব দেওয়া হবে–যার ছওয়াবের ধারা অব্যহত ও অবিচ্ছিন্ন হবে।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মুসলমান শারীরিকভাবে বিপদগ্রস্ত হয় তথা কোনো প্রকার রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেন তার জন্য এখনও সে নেক আমলের ছওয়াব লিপিবদ্ধ কর, যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো। –[নূরুল কোরআন]

فَمَا يُكَذِّبُكَ-এর মধ্যে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে : فَمَا يُكَذِّبُكَ-এর মধ্যে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়।

১. জমহুর মুফাস্‌সিরগণের মতে, এখানে কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে কাফের! আল্লাহর এত কুদরত দেখার পরও কিভাবে তুমি পুনরুত্থান ও কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতে পার? এরপরও প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করার কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

২. হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন যে, এখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতটির অর্থ হবে, হে হাবীব! মহাবিচারক আল্লাহর পক্ষ হতে যা নাজিল হয় তাকে আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। কেননা এত জ্বলন্ত প্রমাণ ও অকাট্য দলিল প্রত্যক্ষ করার পরও কে আছে যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করবে?

৩. কারো কারো মতে, এখানে গোটা-মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ" : দুনিয়ার ছোট বড় বিচারকদের নিকট যখন তোমরা সুবিচার পাওয়ার আশা কর, তোমরা চাও যে, তারা প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিবে এবং যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে ভালো ফল ও পুরস্কার দিবে, তখন আল্লাহর নিকট হতে তোমরা এর বিপরীত কি করে আশা করতে পার? তিনি কি সকল বিচারকের তুলনায় অনেক বড় বিচারক নন? তোমরা তাঁকেই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক মান, তাহলে তিনি কোনোরূপ সুবিচার করবেন না বলে তোমরা কিভাবে কল্পনা করতে পার? হাদীসে বর্ণিত আছে– নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা কেউ যখন সূরা 'আত্-ত্বীন' পাঠ করবে ও اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পর্যন্ত পৌছবে, তখন সে যেন বলে بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ 'হ্যাঁ, আমি-ই এর সাক্ষী।'

سُوْرَةُ الْعَلَقِ : সূরা আল-আলাক্

সূরাটির নামকরণের কারণ : عَلَقٌ অর্থ– রক্ত অথবা তার ঘনীভূত প্রগাঢ় অবস্থা। এর অন্য অর্থ জলৌকাকৃতি ক্ষুদ্রতর কীটাণু বা শুক্রকীট। এর মর্মার্থে প্রেম-প্রীতি, আসক্তি, আকর্ষণ ও আলিঙ্গন প্রভৃতিও পরিগ্রহণ করা যেতে পারে। এ 'আলাক্' ই হচ্ছে মানব সৃষ্টির একটি মূল উপাদান। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের আলাক্ শব্দ হতেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

এ সূরার অন্য নাম 'ইক্রা'। অত্র সূরাতেই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পাঠ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। পাঠ করার নির্দেশকে আরবি 'ইক্রা' দিয়ে বুঝানো হয়। তাই সূরার নাম 'ইক্রা' রাখা হয়েছে।

অত্র সূরার অন্য আরেক নাম 'ক্বালাম'। কেননা ৪র্থ আয়াতে عَلَّمَ بِالْقَلَمِ বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় ১৯টি আয়াত, ৭২টি বাক্য এবং ১২২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : আলোচ্য সূরাটির দু'টি অংশ। এক অংশ শুরু হতে পঞ্চম আয়াত مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى হতে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত চলেছে। অধিকাংশ আলেমগণের মতে, নবী করীম ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ এটাই সর্বপ্রথম ওহী। হযরত আয়েশা (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এ পাঁচটি আয়াতই সর্ব প্রথম নাজিল হয়েছে।

সূরাটির দ্বিতীয় অংশ পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হারাম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করলেন এবং আবূ জাহল তাকে ধমক দিয়ে এ কাজ্ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল ঠিক সে সময় এ দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়।

সূরার বিষয়বস্তু : সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথমাংশ প্রথম হতে পঞ্চম আয়াতের مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ এবং এটা অবতীর্ণ হয়েছিল পবিত্র মক্কার অনতিদূরে হেরা গিরিগুহায়।

সূরার দ্বিতীয় অংশটি পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হেরেম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন এবং আবূ জাহল ধমক দিয়ে এই কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল, ঠিক সেই সময়ই এই দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়। পরে নাজিল হওয়া এ অংশ প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতের পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক সংযোজন। কেননা প্রথম ওহী বা প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পর ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এ নামাজেরই মাধ্যমে। কাফেরদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও এ নামাজের কারণেই শুরু হয়েছিল। অত্র সূরার কয়টি আয়াতে সংক্ষেপে মানুষ সৃষ্টির রহস্য, অজানাকে জানানো ও জ্ঞান দানের রহস্য এবং মহীয়ান আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করা হয়েছে। তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকে রিসালাতের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি দিবালোকের মতো দিকনির্দেশ পেয়েছেন। শেষ দিকে ভ্রান্ত কাফেরদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত প্রদান করে নবী করীম ﷺ -কে ভালো কাজগুলো করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-আলাক্ব মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعَ عَشَرَةَ اٰيَةً : আয়াত সংখ্যা- ১৯

صَدْرُهَا إِلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ذٰلِكَ بِغَارِ حِرَاءٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত এটার প্রথম কয়টি আয়াত প্রথম নাজিলকৃত ওহী, যা হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়েছে। -[বুখারী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِقْرَأْ أَوْجِدِ الْقِرَاءَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ الْخَلَائِقَ .

১. পাঠ কর পাঠ আরম্ভ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি জগতকে।

٢. خَلَقَ الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ مِنْ عَلَقٍ جَمْعُ عَلَقَةٍ وَهِىَ الْقِطْعَةُ الْيَسِيْرَةُ مِنَ الدَّمِ الْغَلِيْظِ .

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে মানব শ্রেণিকে জমাট রক্ত হতে عَلَقٌ শব্দটি عَلَقَةٌ -এর বহুবচন, আর তা হলো জমাট রক্তের একটি পিণ্ড।

٣. اِقْرَأْ تَاكِيْدٌ لِلْاَوَّلِ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ لَا يُوَازِنُهُ كَرِيْمٌ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ اِقْرَأْ .

৩. পাঠ করএটা প্রথমোক্ত اِقْرَأْ -এর জন্য تَاكِيْد আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত কোনো মহিমান্বিত তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এটা اِقْرَأْ-এর যমীর হতে حَالٌ।

٤. اَلَّذِىْ عَلَّمَ الْخَطَّ بِالْقَلَمِ وَاَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِهِ اِدْرِيْسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেনলিখন কলমের সাহায্যে হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম লিখার সূচনা করেন।

٥. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ مَا لَمْ يَعْلَمْ قَبْلَ تَعْلِيْمِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْكِتَابَةِ وَالصِّنَاعَةِ وَغَيْرِهَا .

৫. মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেনমানব শ্রেণিকে যা সে জানত না তাকে হেদায়েত, লিখন ও শিল্পকর্ম ইত্যাদি শিক্ষাদানের পূর্বে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ : এখানে بِ হরফটি عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلَّذِىْ خَلَقَ বাক্যটি رَبِّكَ -এর সিফাত। خَلَقَ الْاِنْسَانَ الخ বাক্যটি প্রথম বাক্যের তাফসীর।

قَوْلُهُ اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ : رَبُّكَ মাওসূফ, اَلْاَكْرَمُ সিফাত। اَلَّذِىْ মাওসূল। عَلَّمَ بِالْقَلَمِ সেলা বাক্য হয়ে দ্বিতীয় সিফাত। মাওসূফ ও সিফাতসমূহ মিলিত হয়ে মুবতাদা عَلَّمَ الْاِنْسَانَ الخ বাক্য তার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলিত হয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া। এটা হাল হয়েছে اِقْرَأْ -এর যমীর হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ সূরা পবিত্র মক্কার অদূরে হেরা গিরি গুহায় মহানবী ﷺ -এর প্রতি সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ হিসাবে অবতীর্ণ হয়। হযরত আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী করীম ﷺ প্রথমত স্বপ্নযোগে ওহী বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হতে লাগলেন। প্রত্যেক স্বপ্নই প্রভাতের উজ্জ্বল রশ্মির ন্যায় সত্যভাবে প্রত্যক্ষীভূত হতো। তিনি রাতে যা স্বপ্নে দেখতেন দিনে অবিকল তা-ই সংঘটিত হতো। অতঃপর নির্জনবাস তাঁর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হয়ে উঠল। এ সময় তিনি হেরা পর্বতের গুহায় গমন করে একাকী নির্জনে বসে দিবানিশি গভীর ধ্যান ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি এ জন্য যে খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন, তা শেষ হয়ে গেলে তিনি প্রিয় পত্নী বিবি খাদীজার নিকট আগমন করতেন এবং বিবি খাদীজা আবার কয়েক দিনের উপযোগী খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করে দিলে তিনি সেগুলো নিয়ে পুনরায় হেরা গুহায় চলে যেতেন। এরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদা তিনি ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় অকস্মাৎ সত্য তাঁর নিকট আগমন করল- তাঁর প্রতি ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। -[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

প্রথম ওহী অবতীর্ণকালীন প্রাসঙ্গিক ঘটনা : হেরা গিরি-গুহায় ধ্যানমগ্ন মুহাম্মদ ﷺ অকস্মাৎ প্রত্যাদেশ লাভ করলেন। হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা তাঁর নিকট সর্বপ্রথম বললেন-'ইকরা' বা পড়ুন। হযরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এর নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বললেন-'আমি তো লেখাপড়া জানি না।' তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে নিজ বক্ষে আকর্ষণপূর্বক দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে বললেন-'পাঠ করুন'। নবী করীম ﷺ পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আমি তো লেখাপড়া জানি না।' তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয়বার তাঁকে বক্ষে আকর্ষণ করে এরূপ দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তৎপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন। নবী করীম ﷺ ঐরূপভাবেই উত্তর করলেন- "আমি তো লেখাপড়া জানি না, কিরূপে পাঠ করবো? অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে তৃতীয়বার আলিঙ্গন করলেন এবং এরূপ কঠিনভাবে তা করলেন যে, তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হলো। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে পড়ল এবং আতঙ্কে হৃদয় প্রকম্পিত হতে লাগল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে ছেড়ে দিয়ে 'ইকরা' হতে পঞ্চম আয়াতে 'مَا لَمْ يَعْلَمْ' পর্যন্ত পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তা নবী করীম ﷺ -এর কণ্ঠস্থ হয়ে গেল।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- অতঃপর নবী করীম ﷺ ভীত-কম্পিত অবস্থায় সে স্থান হতে ফিরে আসলেন। হযরত খাদীজা (রা.) -এর নিকট পৌঁছে বললেন- 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও।' তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হলো। পরে যখন তাঁর ভীতি কেটে গেল, তখন তিনি বললেন, 'হে খাদীজা! এ আমার কি হয়ে গেল।' অতঃপর সমস্ত ঘটনার বিবরণ তাঁকে শুনালেন এবং বললেন- আমার নিজের জীবনে ভয় লেগে গেছে। হযরত খাদীজা (রা.) বললেন- ভয়ের কিছুই নেই, আপনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর শপথ, আপনাকে আল্লাহ কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন। আমানতসমূহ যথাযথ ফিরিয়ে দেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, দরিদ্র লোকদেরকে নিজে উপার্জন করে দান করেন। আতিথ্য রক্ষা করেন ও ভালো কাজে সাহায্য করেন। পরে তিনি নবী করীম ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন, আরবি ও হিব্রু ভাষায় ইনজীল লিখতেন। এ সময় খুব বেশি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা তাঁকে নবী করীম ﷺ-এর ঘটনার বিবরণ শুনতে বললেন। ওয়ারাকা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখতে পেয়েছ? নবী করীম ﷺ যা কিছু দেখতে পেয়েছেন তা বললেন। ওয়ারাকা বললেন- এ তো সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! যদি আমি আপনার নবুয়তকালে যুবক হতাম। হায়! আপনার জাতির লোকেরা আপনাকে যখন বহিষ্কৃত করবে তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম! রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকেরা কি আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন - হ্যাঁ, আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা যে কেউ নিয়ে আসবে, অথচ তাঁর সাথে শত্রুতা করা হবে না। এমন তো কখনো হয় নি। আপনার সেকালে আমি যদি জীবিত থাকি, তাহলে আমি বলিষ্ঠভাবে আপনার সাহায্য করবো। কিন্তু এর অল্প কাল পরেই ওয়ারাকার ইন্তেকাল হয়ে যায়। -[দুররে মানছূর, বয়ান, মা'আলিম]

قَوْلُهُ تَعَالَى اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ : ইরশাদ হয়েছে, পড়ো, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার সংশ্লিষ্ট ঘটনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফেরেশতা যখন নবী করীম ﷺ-কে বললেন, 'পড়ো', তখন তিনি জবাবে বললেন- 'আমি পড়তে পারি না।' কিন্তু কেন তিনি তা বলেছেন-এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. একদল আলিমের মতে, ফেরেশতা ওহীর এ শব্দসমূহ লিখিত আকারে তাঁর সম্মুখে পেশ করেছিল এবং সে লিখিত জিনিসই পড়তে বলেছিল। কেননা ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো যে, আমি যেভাবে বলতে থাকি আপনি সেভাবে পড়তে থাকুন, তাহলে তার উত্তরে নবী করীম ﷺ-কে 'আমি পড়তে পারি না', বলতে হতো না। কারণ লিখিত জিনিস পড়তে না পারলেও কারো উচ্চারণকে অনুসরণ করে অনুরূপ উচ্চারণ করা যে কোনো নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

খ. অপর একদল আলিমের মতে এর অর্থ হলো, "إِقْرَأْ مَا أَقْرَأُ" অর্থাৎ আমি যা পড়ি তা আপনি আমার সাথে পড়ুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবিক দুর্বলতার কারণে বলেছেন, আমি পড়তে পারি না। জমহুর আলিমগণ শেষোক্ত মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, ওহী [নবী করীম ﷺ-এর নিকট] লিখিত নাজিল হয়নি।

কুরআনের যে অংশ প্রথম অবতীর্ণ : অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে– সূরা আল-আলাক্ব-ই সর্বপ্রথম সূরা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে অত্র সূরার প্রথম ৫টি আয়াত তাঁকে শিখিয়ে যান।

কারো মতে, সূরা 'আল-মুদ্দাছ্ছির' সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এটা হযরত জাবির (রা.)-এর অভিমত।

কারো মতে, সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এটা হযরত আবূ মাইসারার অভিমত।

হযরত আলী (রা.)-এর মতে, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে।

তবে প্রথম মতই সহীহ। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য ও যোগ্য স্বপ্ন দেখানো হতো। তারপর ফেরেশতা إِقْرَأْ بِاسْمِ الخ নিয়ে আসেন। –[কুরতুবী]

بِاسْمِ-এর মধ্যকার بَاء-এর অর্থ :

১. আবূ উবায়দা বলেন, এখানে بَاء অতিরিক্ত। অর্থ দাঁড়াবে إِقْرَأْ إِسْمَ رَبِّكَ অর্থাৎ 'তুমি তোমার রবের নাম পাঠ করো।' অথবা أُذْكُرْ إِسْمَهُ অর্থাৎ 'তুমি তাঁর নাম স্মরণ করো।' এ মতটি কয়েকটি কারণে দুর্বল।

ক. যদি নাম স্মরণ করা বা নাম পড়ার জন্যই বলা হতো, তাহলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, আমি তো পড়তে জানি না।

খ. এ নির্দেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য প্রযোজ্য হয় না। কেননা তিনি তো পূর্ব হতেই আল্লাহর জিকিরে মগ্ন ছিলেন এবং এ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো কাজও তখন ছিল না।

গ. এ অর্থ করলে بَاء-এর অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ কুরআনের কোনো হরফও অর্থ ছাড়া নেই।

২. بَاء অতিরিক্ত নয়, বরং অর্থ হবে حَالٌ-এর অর্থাৎ إِقْرَأِ الْقُرْآنَ مُفْتَتِحًا بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ হে রাসূল, আল্লাহর নাম উল্লেখপূর্বক কুরআন পাঠ করুন। অর্থাৎ প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবেন, তারপর পাঠ করবেন। এ অর্থের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাসমিয়া পড়া ওয়াজিব।

অথবা, بَاء সহযোগিতার অর্থ দিবে, তখন ইবারত হবে إِقْرَأِ الْقُرْآنَ مُسْتَعِينًا بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহর নামের সহযোগিতা নিয়ে কুরআন পাঠ করো।' এখানে নামকে একটি যন্ত্রের মতো ব্যবহার করা বুঝায়। যেমন বলা হয়– كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ অর্থাৎ 'আমি কলমের দ্বারা লিখেছি।

অথবা, بَاء-এর অর্থ لَامٌ [লাম] হবে। অর্থাৎ إِجْعَلِ الْقِرَاءَةَ لِلّٰهِ তথা 'তোমার পড়াকে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করো।' যেমন, বলা হয় بَنَيْتُ هٰذِهِ الدَّارَ بِاسْمِ الْأَمِيْرِ অর্থাৎ এ বাড়ি আমীরের নামে [অর্থাৎ তাঁর জন্য] বানিয়েছি। –[কাবীর, কুরতুবী]

اَللّٰهُ না বলে رَبِّكَ বলার কারণ : رَبّ হলো আল্লাহর 'ইসমে সিফাত' আর 'আল্লাহ' হলো ইসমে যাত। 'ইসমে যাত' 'ইসমে সিফাত -এর উপর প্রাধান্য পায়। অথচ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর প্রথম ওহী এবং প্রথম পরিচিতির সময় ইসমে যাত ব্যবহার না করে ইসমে সিফাত ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আমরা বর্তমানে ইসমে যাত ব্যবহার করে তাসমিয়া পাঠ করি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কেননা, তা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর প্রথম ওহী, ফেরেশতাকে দেখার সাথে সাথে তাঁর মধ্যে মারাত্মক কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর আশঙ্কা করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজের এমন একটি সিফাত উল্লেখ করেছেন যদ্দারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মন থেকে ভীতি দূর করা। তাই তিনি বললেন, ঐ সত্তার নামে পড়ুন, যিনি আপনাকে লালন-পালন করেছেন, করছেন এবং করবেন। তুমি যখন রক্তকণিকা অবস্থায় ছিলে তখন থেকেই তোমার লালন-পালন আমি করছি, সে সময় তোমাকে ধ্বংস করিনি। যখন তোমাকে একজন মূল্যবান ব্যক্তিত্ব, একত্ববাদী এবং আমার পরিচয়প্রাপ্ত হিসাবে গড়ে তুলেছি, তখন কিভাবে তুমি চিন্তা করতে পার যে, আমি তোমাকে ধ্বংস করবো? –[কাবীর]

رَبِّكَ-এর পরই اَلَّذِىْ خَلَقَ বলার কারণ : আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলি উল্লেখ না করে শুধুমাত্র اَلَّذِىْ خَلَقَ বলা হয়েছে। কেননা মনে হয় যেন বান্দা প্রশ্ন করেছে যে, হে রব! তুমি যে রব– এ কথার প্রমাণ কি? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে রব, এর প্রমাণের জন্য দূরে যাওয়া লাগবে না; বরং তোমাদের অস্তিত্বের উপর চিন্তা করো; তাহলে আমাকে পাবে ..... তুমিতো তোমার সত্তা এবং সমস্ত গুণাবলিসহ অনুপস্থিত এবং অস্তিত্বহীন ছিলে। তারপর তুমি অস্তিত্বে আসলে : তোমার অস্তিত্বের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন। অস্তিত্বে আসলেই তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিপালক (রব) -এর প্রয়োজন হয়। সে রব-ই হলাম 'আমি'। –[কাবীর]

اَلَّذِىْ خَلَقَ-এর مَفْعُوْل কি? : আল্লাহর বাণী اَلَّذِىْ خَلَقَ-এর مَفْعُوْل কি এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

ক. এখানে مَفْعُوْل-এর উল্লেখ করা হয়নি। আর এর উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এটা হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি সমস্ত সৃষ্টিলোক এবং সৃষ্টিলোকের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। আর বলা বাহুল্য যে, তিনিই আল্লাহ তা'আলা।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে اَلَّذِىْ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ অর্থাৎ যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্ট হওয়ার কারণে كُلَّ شَىْءٍ-কে উহ্য করা হয়েছে। যেমন– বলা হয় اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ আল্লাহ সবকিছু হতে বড়।

গ. অথবা, এখানে مَفْعُوْل হলো اَلْاِنْسَانَ পরবর্তী আয়াত خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ দ্বারা তার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

عَلَقٍ-এর অর্থ : عَلَقٍ অর্থ– জমাট-বাঁধা রক্ত, রক্তপিণ্ড, বহুবচন। একবচনে عَلَقَةٌ মাতৃগর্ভে সন্তানের উন্মেষ হওয়ার পর প্রাথমিক কয়েক দিনের মধ্যে এরূপ অবস্থা হয়। পরে তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর ক্রমশ তাতে মানুষের আকার-আকৃতি দানা বেঁধে উঠতে থাকে। উদ্ধৃত আয়াতে মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ এক অতি নগণ্য ও হীনতম অবস্থা হতে মানুষের সৃষ্টির সূচনা করে তাকে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় اِقْرَأْ-এর মধ্যে পার্থক্য :

১. কারো মতে, প্রথম اِقْرَأْ দ্বারা রাসূলকে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় اِقْرَأْ দ্বারা অন্যের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. অথবা, প্রথম اِقْرَأْ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ, আর দ্বিতীয়টির দ্বারা অন্যকে শিক্ষাদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. অথবা প্রথমটি দ্বারা নামাজ পড়ার নির্দেশ আর দ্বিতীয়টি দ্বারা নামাজের বাইরে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –[কাবীর]

৪. অথবা প্রথম اِقْرَأْ বলার পর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَا اَنَا بِقَارِئٍ তখন দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে– اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ. –[নূরুল কোরআন]

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতের মর্মার্থ : এটা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অবদান, এক অতি বড় অনুগ্রহ, অনুগ্রহের ফলশ্রুতি তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্নই বানাননি, কলম ব্যবহারের সাহায্যে লেখার কৌশলও শিখিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও উন্নয়ন এবং বংশানুক্রমে জ্ঞানের উত্তরাধিকার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন, স্থায়িত্ব সংরক্ষণের মাধ্যমে বানিয়েছেন এ কলমকে। তিনি যদি ইলহামী চেতনার সাহায্যে মানুষকে কলম ব্যবহার ও লেখার কৌশল শিক্ষা না দিতেন, তাহলে মানুষের জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারের যাবতীয় স্বভাবসিদ্ধ যোগ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যেত। তার বিকাশ ও উন্নয়ন এবং এক বংশ হতে বংশান্তরে ও এক যুগ হতে যুগান্তরে তার পৌঁছে যাওয়া, টিকে থাকা ও অধিকতর উন্নতি লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যিনি কলম দ্বারা লিখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইদরীস (আ.)। আর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা প্রথম কলমকে সৃষ্টি করেছেন আর ইলম শিক্ষা দিয়ে মানবজাতিকে শিক্ষিত করে তোলা হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। –[নূরুল কোরআন]

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ-এর মধ্যকার اَلْاِنْسَانَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاِنْسَانَ দ্বারা এখানে হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে– وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ কারো মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্দেশ্য। –[ফাতহুল কাদীর]

তবে উত্তম মত হলো, সাধারণভাবে সকল মানুষ উদ্দেশ্য হওয়া

অনুবাদ :

٦. كَلَّا حَقًّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ـ

৬. বস্তুত অবশ্যই মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে।

٧. اَنْ رَّاٰهُ اَیْ نَفْسَهٗ اسْتَغْنٰى بِالْمَالِ نَزَلَ فِیْ اَبِیْ جَهْلٍ وَرَاٰی عِلْمِيَّةٌ وَاسْتَغْنٰی مَفْعُوْلٌ ثَانٍ وَاَنْ رَاٰهُ مَفْعُوْلٌ لَهٗ ـ

৭. কারণ, সে মনে করে অর্থাৎ নিজেকে অমুখাপেক্ষী সম্পদের কারণে। এ আয়াত আবূ জাহল প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। আর رَاٰی দ্বারা আন্তরিক দেখা উদ্দেশ্য। اِسْتَغْنٰی তার مَفْعُوْلٌ ثَانِیْ আর اَنْ رَّاٰهُ পূর্বোক্ত یَطْغٰی -এর مَفْعُوْلٌ ثَانِیْ -

٨. اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ یَا اِنْسَانُ الرُّجْعٰی اَلرُّجُوْعُ تَخْوِیْفٌ لَهٗ فَیُجَازِی الطَّاغِیَ بِمَا یَسْتَحِقُّهٗ ـ

৮. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকটহে মানুষ! সুনিশ্চিত প্রত্যাবর্তন اَلرُّجْعٰی শব্দটি اَلرُّجُوْعُ অর্থে। এটা দ্বারা তাকে ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য। অবাধ্য ব্যক্তিকে সে প্রতিফল দেওয়া হবে, সে যার উপযোগী হবে।

٩. اَرَاَیْتَ فِیْ مَوَاضِعِهَا الثَّلَاثَةِ لِلتَّعَجُّبِ الَّذِیْ یَنْهٰی هُوَ اَبُوْ جَهْلٍ ـ

৯. তুমি কি দেখেছ?এ শব্দটি তিন স্থানেই বিস্ময় প্রকাশার্থে তাকে যে বাধাদান করে সে হলো আবূ জাহল।

١٠. عَبْدًا هُوَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰی ـ

১০. এক বান্দাকে তিনি নবী করীম ﷺ যখন সে নামাজ পড়ে।

١١. اَرَاَیْتَ اِنْ كَانَ اَیِ الْمَنْهِیُّ عَلَی الْهُدٰی ـ

১১. তুমি কি লক্ষ্য করেছ? যদি সে বাধা প্রদত্ত ব্যক্তি সৎ পথে থাকে।

١٢. اَوْ لِلتَّقْسِیْمِ اَمَرَ بِالتَّقْوٰی ـ

১২. অথবা اَوْ অব্যয়টি تَقْسِیْم -এর জন্য তাকওয়ার নির্দেশ দান করে।

١٣. اَرَاَیْتَ اِنْ كَذَّبَ اَیِ النَّاهِی النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَلّٰی عَنِ الْاِیْمَانِ ـ

১৩. তুমি কি লক্ষ্য করেছ? যদি সে মিথ্যা আরোপ করে উক্ত বাধাদানকারী ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -কে। আর মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান আনয়ন করা হতে।

١٤. اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی مَا صَدَرَ مِنْهُ اَیْ یَعْلَمُهٗ فَیُجَازِیْهِ عَلَیْهِ اَیْ اَعْجَبْ مِنْهُ یَا مُخَاطَبُ مِنْ حَیْثُ نَهْیِهٖ عَنِ الصَّلٰوةِ وَمِنْ حَیْثُ اَنَّ الْمَنْهِیَّ عَلَی الْهُدٰی اٰمِرٌ بِالتَّقْوٰی وَمِنْ حَیْثُ اَنَّ النَّاهِیَ مُكَذِّبٌ مُتَوَلٍّ عَنِ الْاِیْمَانِ ـ

১৪. তবে কি সে জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা দেখছেন? যা তার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং তিনি তাকে এর প্রতিফল দিবেন। অর্থাৎ হে শ্রোতা! এ লোকের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করো। এ জন্য যে, সে নামাজ হতে বাধা দিচ্ছে, অথচ বাধা প্রদত্ত ব্যক্তি সৎপথে প্রতিষ্ঠিত এবং তাকওয়ার প্রতি আহ্বানকারী। আর সে নবীর প্রতি মিথ্যারোপকারী ও ঈমান আনয়ন হতে বিমুখ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতগুলোর শানে নুযূল : নবুয়ত লাভের পরপরই এবং প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারে কাজ শুরু করার পূর্বে নবী করীম ﷺ হারাম শরীফের মধ্যে আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন। আর এটা দেখে কুরাইশগণ সর্বপ্রথম অনুভব করতে পারল যে, নবী করীম ﷺ কোনো নতুন ধর্মমতের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা রাসূলের এ কাজকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখছিলেন। আবূ জাহল নবী করীম ﷺ-কে এই বলে ধমকাতে লাগল যে, হেরেমের মধ্যে এ পদ্ধতিতে ইবাদত করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে– আবূ জাহল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদ তাদের সামনে মাটির উপর কপাল রাখে কিনা? লোকেরা 'হ্যাঁ' বললে– আবূ জাহল রাগতঃস্বরে বলল– লাত ও উয্যার শপথ! আমি যদি তাকে এভাবে নামাজ পড়তে দেখতে পাই, তাহলে তার গর্দানের উপর পা রাখবো এবং তার মুখ মাটির সাথে ঘষে দিবো। একবার আবূ জাহল তাঁকে নামাজ পড়তে দেখতে পেয়ে তাঁর গর্দানের উপর পা রাখার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো; কিন্তু সহসাই লোকেরা দেখতে পেল যে, সে পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে এবং কোনো জিনিস হতে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। তার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলে–সে বলল, আমি তার নিকটবর্তী হতেই আমার ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থানে একটি ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড দেখতে পেলাম। তাতে পাখাযুক্ত জীবসমূহ বিচরণ করছিল। নবী করীম ﷺ আবূ জাহলের এ বাক্য শুনে বললেন–পাখাযুক্ত জীবগুলো ছিল ফেরেশতা, আর খানিকটা অগ্রসর হলেই তারা তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলত। এ ঘটনা প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। –[দুররুল মুখতার, বায়ান]

قَوْلُهُ تَعَالَى كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ ..... اِسْتَغْنٰى : সে পরম অনুগ্রহশীল আল্লাহ মানুষের প্রতি এত বড় অনুগ্রহ করেছেন, তার সাথে মূর্খতা বশতঃ সেরূপ আচরণ করা মোটেই সঙ্গত হতে পারে না, যার উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

ধন-সম্পদ, মান-সম্মান যাই মানুষ দুনিয়াতে পেতে চাচ্ছে সব কিছুই সে পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তার সাথে বিদ্রোহমূলক আচরণ করে থাকে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে বাধা দেন না অথবা তার উপর আজাব নাজিল করেন না। এটা দেখে মানুষ আরো বেশি বেশি সীমালঙ্ঘন করে।

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى আয়াতে عَبْدًا দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : অত্র আয়াতে عَبْدًا দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। "سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ" অর্থাৎ মহান সে আল্লাহ যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের একাংশে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন।

সূরা জিন-এ বলা হয়েছে "وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا" [আর আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল তখন তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হলো।]

বস্তুত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে এভাবে 'আবদ' বান্দা বলে অভিহিত করা একটি বিশেষ ভালোবাসার ভঙ্গি, অত্যন্ত স্নেহের ডাক।

اِذَا صَلّٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : উদ্ধৃত আয়াতে اِذَا صَلّٰى বলে নবী করীম ﷺ-এর নামাজ পাঠের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত আয়াতগুলো সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশসমূহের অন্যতম। এর পূর্বে এমন কোনো আয়াত নাজিল হয়নি; যাতে নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখানো হয়েছিল। তাহলে নবী করীম ﷺ কিভাবে নামাজ পড়লেন? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে নবুয়তের পদে অভিষিক্ত করার পর তাঁকে নামাজ পড়ার একটি বিশেষ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে সে পদ্ধতির উল্লেখ কোথাও পাওয়া যাবে না। কোথাও লিখা নেই যে, হে নবী! আপনি এভাবে নামাজ পড়ুন। এটা দ্বারা এ কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র কুরআনে সন্নিবেশিত কালামই যে ওহীর মাধ্যমে নাজিল হতো না, এ ছাড়াও আল্লাহ ওহী বা ইলহামের সাহায্যে তাঁকে কুরআন বহির্ভূত আরো অনেক কিছু বলতেন ও শিক্ষা দিতেন। আল্লাহর দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী ঐ নামাজ পড়া হয়েছিল।

اَرَاَيْتَ-এর মধ্যকার হামযার অর্থ : اَرَاَيْتَ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে تَعَجُّبْ সহকারে সম্বোধন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, হামযা এখানে تَعَجُّبْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ تَعَجُّبْ-এর কয়েকটি কারণ রয়েছে–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ, আপনি আবূ জাহল ইবনে হেশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারা ইসলামের শক্তি বাড়িয়ে দিন। সেই দোয়ার উত্তরে আল্লাহ যেন বলছেন– 'আপনার তো ধারণা ছিল যে, আবূ জাহলের দ্বারা ইসলাম শক্তিশালী হবে। তার মতো ব্যক্তি দিয়ে কি ইসলামের শক্তি বাড়ে? অথচ সে নামাজি বান্দার নামাজে বাধা দেয়! এ কল্পনায় আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

২. তার উপাধি ছিল 'আবুল হাকাম'। যেন বলা হচ্ছে যে, তার উপাধি কিভাবে তা হতে পারে, অথচ সে আল্লাহর খিদমত হতে বান্দাকে ফিরিয়ে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত! এটা কি হিকমতের পরিচয় যে, সে করুণাময়ের ইবাদত ছেড়ে পাথরের ইবাদত করে!

৩. এ আহ্মক-নির্বোধ নির্দেশ দেয় আর নিষেধ করে। এ বিশ্বাসে প্রকট যে, অন্য লোক তার কথায় উঠবে-বসবে। অথচ সে না সৃষ্টিকর্তা, না প্রতিপালক। তারপরেও সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালকের ইবাদত থেকে নিষেধ করে। এটা কি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়? –[কাবীর]

يَنْهَاكَ না বলে يَنْهٰى عَبْدًا বলার কারণ : যেহেতু عَبْد বলতে এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে সেহেতু সরাসরি كَ সর্বনাম ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু মূল্যবান কয়েকটি উপকারিতার জন্য عَبْد বলা হয়েছে।

১. عَبْد নাকেরা শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ দাসত্বের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে যে, তিনি এমন عَبْد দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি তাঁর বর্ণনা দিয়ে শেষ করতে পারবে না। তাঁর দাসত্বের ও আন্তরিকতার বর্ণনা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। বর্ণিত আছে যে, ইহুদিদের এক সাহিত্যিক এসে হযরত ওমর (রা.)-কে বলল, তোমাদের রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দাও। তিনি বললেন– আমার চেয়ে হযরত বিলাল (রা.) বেশি জানেন। হযরত বিলাল (রা.) বললেন– হযরত ফাতিমা (রা.) -এর কাছে যাও। হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেখিয়ে দিলেন– তখন সে হযরত আলী (রা.) -কে উক্ত প্রশ্ন করলে তিনি বললেন– তুমি আমাকে দুনিয়ার পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে আগে বর্ণনা দাও, তারপর আমি তোমাকে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিবো। সে বলল, এটাতো আমার জন্য সহজসাধ্য নয়। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন– দুনিয়ার ঐ পণ্যদ্রব্যের বর্ণনা থেকে তুমি অক্ষম হয়ে গেছ যাকে আমার আল্লাহ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ বলেছেন। আর আমার দ্বারা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমি ঐ ব্যক্তিত্বের চরিত্রাবলি তোমার সামনে উত্থাপন করি, যার ব্যাপারে আমার আল্লাহ বলেছেন وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ সামান্য বস্তুর বর্ণনা দান যদি অসম্ভব হয়, অসীম বস্তুর বর্ণনা তালাশ করা অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

২. এটা দ্বারা চরম তিরস্কার বুঝায়। যেন বলা হচ্ছে যে, আবূ জাহল এমন নিকৃষ্ট ব্যক্তি, যে যেমন তেমন আবদকেও বাধা দেয়। এটা তার অভ্যাস। অতএব, হে রাসূল! তার আপনাকে বাধা দেওয়া কোনো নতুন অভিনব কিছু নয়।

৩. এটা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য সে সকল ব্যক্তিদেরকে যারা নামাজে বাধা দেয়।

৪. আবূ জাহল কি মনে করছে যে, মুহাম্মদ ﷺ যদি আমার ইবাদত না করে আমি আর কোনো ইবাদতকারী পাবো না? মুহাম্মদ ﷺ তো একজন আবদ মাত্র। আমার নিকট অনেক ফেরেশতা রয়েছে যাদের সংখ্যা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তারা সর্বদা নামাজে এবং আমার গুণকীর্তনে লিপ্ত। –[কাবীর]

اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى আয়াতে সম্বোধিত কে? : "اَرَاَيْتَ" শব্দে আল্লাহ তা'আলা কাকে সম্বোধন করেছেন, এ ব্যাপারে দু'টি মত দেখা যায়–

১. এখানে নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে; এ মতের স্বপক্ষে দলিল হলো– প্রথম ও তৃতীয় اَرَاَيْتَ শব্দদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এখন যদি মধ্যের اَرَاَيْتَ -এর সম্বোধন তাঁকে ছাড়া অন্যকে ধরা হয়, তাহলে বাক্যের সৌন্দর্য এবং বিন্যাস নষ্ট হয়ে যায়।

২. কারো মতে এখানে কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জালিম এবং মজলুমকে দেখছেন, একবার জালিমকে আবার মজলুমকে সম্বোধন করছেন। যেমন, কোনো হাকিমের সামনে বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষ দণ্ডায়মান, কোনো সময় বাদীকে আবার কোনো সময় বিবাদীকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলেন। –[কাবীর]

قَوْلُهُ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى : আল্লামা বাগাবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা যখন নামাজ আদায় করে তখন অবাধ্য কাফের আবূ জাহল তাঁকে তাতে বাধা প্রধান করে; অথচ সে বান্দা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হেদায়েতের উপর রয়েছেন। আর তিনি তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বনের আদেশ দিচ্ছেন। –[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

১৫. كَلَّا رَدْعٌ لَهُ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ لَمْ يَنْتَهِ لا عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ لَنَجُرَّنَّ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى النَّارِ.

১৫. সাবধান তার প্রতি ভর্ৎসনা, যদি সে لَئِنْ মধ্যকার لَا অক্ষরটি শপথের জন্য বিরত না হয় যে কুফরির উপর সে প্রতিষ্ঠিত আছে, তা হতে। তবে আমি তাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবো, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে তার মস্তকের অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবো।

১৬. نَاصِيَةٍ بَدَلٌ نَكِرَةٌ مِنْ مَعْرِفَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ وَصَفَهَا بِذٰلِكَ مَجَازًا وَالْمُرَادُ صَاحِبُهَا.

১৬. সে কেশগুচ্ছ এ نَكِرَه টি مَعْرِفَه হতে بَدَلٌ যা মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছকে এ বিশেষণ দ্বারা مَجَازًا বিশেষিত করা হয়েছে। এটা দ্বারা صَاحِبُ نَاصِيَةٍ উদ্দেশ্য।

১৭. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ أَيْ أَهْلَ نَادِيهِ وَهُوَ الْمَجْلِسُ يَنْتَدِي يَتَحَدَّثُ فِيهِ الْقَوْمُ وَكَانَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَرَهُ حَيْثُ نَهَاهُ عَنِ الصَّلٰوةِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْثَرُ نَادِيًا مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ عَلَيْكَ هٰذَا الْوَادِيَ إِنْ شِئْتُ خَيْلًا جُرْدًا وَرِجَالًا مُرْدًا.

১৭. অতএব, সে আহ্বান করুক, তার সভাসদদেরকে অর্থাৎ তার সভা তথা মজলিসের সদস্যদের আহ্বান করুক। মজলিসকে نَادِي এ জন্য বলা হয়, যেহেতু সেখানে জাতীয় বিষয় আলোচনার সময় ডাকাডাকি করা হয়। আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজের ব্যাপারে ধমক দিয়ে বলেছিল, তুমি জান যে, তোমার নিকট আমার সভাসদগণ অপেক্ষা অধিক লোক নেই। আমি যদি ইচ্ছা করি তবে উত্তম অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল দ্বারা এ উপত্যকাকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারি।

১৮. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ الْمَلٰئِكَةَ الْغِلَاظَ الشِّدَادَ لِإِهْلَاكِهِ فِي الْحَدِيثِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتْهُ الزَّبَانِيَةُ عَيَانًا.

১৮. আমিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করবো তাকে ধ্বংস করার জন্য কঠোর, কঠিন ফেরেশতাদেরকে। হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের প্রহরীকে আহ্বান করতেন, তবে তাৎক্ষণিক তাকে পাকড়াও করত।

১৯. كَلَّا ط رَدْعٌ لَهُ لَا تُطِعْهُ يَا مُحَمَّدُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَاسْجُدْ صَلِّ لِلّٰهِ وَاقْتَرِبْ مِنْهُ بِطَاعَتِهِ.

১৯. সাবধান তার প্রতি ভর্ৎসনা। তুমি তার অনুসরণ করো না হে মুহাম্মদ! নামাজ বর্জনে তার কথা মান্য করো না আর সিজদা করো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো আর নৈকট্য লাভ করো তাঁর প্রতি, তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ : نَاصِيَة মাওসূফ, كَاذِبَة প্রথম সিফাত, خَاطِئَة দ্বিতীয় সিফাত। মাওসূফ নিজের দুই সিফাত মিলিত হয়ে বদল, اَلنَّاصِيَة মুবদাল মিনহু। আর আরবি ব্যাকরণের নিয়ম রয়েছে, নাকিরা মাওসূফ মা'রেফা হতে বদল হতে পারে।

قَوْلُهُ اَلزَّبَانِيَةَ : اَلزَّبْنُ মাসদার। অর্থ– দূর করা, টক্কর লাগানো, ধাক্কা দেওয়া। আবূ ওবায়দা বলেছেন– এটা বহুবচন, একবচনে زِبْنِيَةٌ (যিবনিয়াহ), নাহুশাস্ত্রবিদ ইমাম কিসায়ী বলেন– তার একবচন زِبْنِيٌّ (যিবনিউয়ুন), মূলে তার বহুবচন زَبَانِيٌّ (যবানিউন), দু'টি ইয়া সহ, একটি ى বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে ة নেওয়া হয়েছে, زَبَانِيَة হয়ে গেল। আখফাশ নাহবী বলেন– এর একবচন زَابِنٌ কোনো কোনো ব্যাকরণবিদের মতে زَبَانِيَة বহুবচন, কিন্তু তার কোনো একবচন নেই। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : আবূ জাহল নবী করীম ﷺ -কে নামাজ পড়তে নিষেধ করত এবং নামাজ পড়ার সময় তাঁকে নানা প্রকার কষ্ট দিত। একদা হযরত ﷺ মাকামে ইবরাহীমে নামাজ পড়ার সময় আবূ জাহল এসে বলল যে, আমি কি তোমাকে এখানে নামাজ পড়তে নিষেধ করিনি? নবী করীম ﷺ তাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। এতেও সে নিবৃত্ত না হয়ে বলে উঠল যে, তোমার কি জানা নেই যে, আমার কত সভাসদ আছে? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে এ উপত্যকাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা পূর্ণ করে দিতে পারি। তাদের সাহায্যে নিশ্চয় আমি তোমাকে পর্যুদস্ত করে দিতে পারি। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী]

আল্লাহ তা'আলা আবূ জাহলের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন।

এখানে كَلَّا -এর অর্থ : كَلَّا শব্দটি ধমকের জন্য। এখানে আবূ জাহলকে ধমক দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন আল্লাহর ইবাদত থেকে কাউকেও নিষেধ না করে এবং তাদেরকে 'লাত'সহ অন্যান্য মূর্তির উপাসনা করতে যেন নির্দেশ না দেয়।

অথবা, বলা হচ্ছে যে, কখনো আবূ জাহল নবী করীম ﷺ -কে হত্যা এবং ঘাড়ে পা রাখতে পারবে না; বরং নবী করীম ﷺ -এর অনুসারীরাই তাকে হত্যা করে দিবে এবং তার বক্ষের উপর পা রাখবে।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, আল্লাহ যে সকল কিছু অবলোকন করছেন, তা কখনো তারা জানে না। যদিও কিছু জানে, কিন্তু সে জানা তাদেরকে কোনো ফায়দা না দেওয়ায় মনে হয় যেন তারা কিছুই জানে না। –[কাবীর]

لَنَسْفَعًا -এর অর্থ : لَنَسْفَعًا -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. اَلسَّفْعُ অর্থ কোনো বস্তুকে শক্তভাবে ধরা এবং ধরে টানা। অতএব অর্থ হবে– অবশ্যই আমি তার কপালের কেশগুচ্ছ ধরে টানবো এবং দোজখের দিকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবো।

২. অথবা, اَلسَّفْعُ অর্থ– اَلضَّرْبُ (মারা)। অর্থাৎ অবশ্যই আমি তার চেহারায় চড় মারবো।

৩. অথবা, اَلسَّفْعُ অর্থ– اَلْاِسْوِدَادُ (কালো করা)। অর্থাৎ অবশ্যই তার চেহারাকে কালা-মলিন করে দিবো।

৪. অথবা, اَلسَّفْعُ অর্থ হবে– আমি অবশ্যই তাকে অপদস্থ এবং অপমান করে ছাড়বো।–(কাবীর, ফাতহুল কাদীর)

لَنَسْفَعًا -এ বর্ণিত কয়েকটি কেরাত : "لَنَسْفَعًا" শব্দটিতে কয়েকটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে।

১. لَنَسْفَعَنَّ-এর শেষের নূনটি তাশদীদযুক্ত। এটা নূনে ছাকীলা।

২. ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, لَأَسْفَعَنَّ

৩. لَنَسْفَعَنْ -এর শেষের নূনটি সাকিন। একে নূনে খাফীফা বলা হয়। পড়তে তানবীনের মতো পড়া যায় এ কারণে আলিফ লেখা হয়েছে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

আবূ জাহলের মৃত্যুর অবস্থা : বদরের প্রান্তরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) নিহতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন ; হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, আবূ জাহল মাটিতে পড়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ইবনে মাসউদ (রা.) মনে করলেন যে, তার শরীরে শক্তি থাকতে পারে– তাই তিনি দূর থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে মারাত্মক আহত করে দিলেন। তারপর যখন বুঝতে পারলেন যে, সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে আছে। তখন তিনি গিয়ে বক্ষের উপর বসলেন। এটা দেখে আবূ জাহল বলে উঠল যে, হে বকরির রাখাল, বক্ষে উঠে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, ইসলাম উপরে থাকে, তার উপরে কেউ উঠতে পারে না তখন আবূ জাহল বলল, তোমাদের নেতাকে বলবে– আমার জীবদ্দশায় আমার কাছে তার চেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং ক্রোধের পাত্র হিসেবে কেউ ছিল না; এখন মৃত্যুর সময়ও আমার ক্রোধের পাত্র সে ছাড়া আর কেউই নেই। [বর্ণিত আছে যে, এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ বলেছেন– হযরত 'মূসা (আ.)-এর ফেরআউনের চেয়ে আমার ফেরআউন মারাত্মক'।] তারপর ইবনে মাসউদ (র.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল– আমার মাথা আমার তলোয়ার দিয়ে কাটো। কেননা তা খুবই ধারাল। যখন তার মাথা কাটা হলো, তখন তিনি তার মাথা বহন করতে পরছিলেন না। কেননা, সেতো ছিল কুকুর। কুকুরকে বহন করা ঠিক নয় টেনে-হেঁচড়ে নেওয়াই শ্রেয়। অথবা, আল্লাহর বাণী– لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ -এর যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য এরূপ হয়েছে তারপর তিনি তার লাশ টেনে নবী করীম ﷺ-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর ফেরশতা জিবরাঈল (আ.)ও সামনে হাসতে হাসতে যাচ্ছেন। –[কাবীর]

نَاصِيَةٌ**-এর অর্থ :** نَاصِيَةٌ অর্থ– কপালের চুল। কখনো চুলের স্থানকেও نَاصِيَةٌ বলা হয়। তবে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা نَاصِيَةٌ বলে চেহারা এবং মাথাকে বুঝিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, আবূ জাহল কপালের উপরে চুলকে সুন্দর করে আঁচড়িয়ে যত্নের সাথে রাখত। চুল কালো রাখারও তার প্রচেষ্টা ছিল, সম্ভবত আল্লাহ তার চুলের সাথে চেহারাকেও কালো করার ইচ্ছা করেছেন। –[কাবীর]

اَلزَّبَانِيَةُ**-এর অর্থ :** হযরত কাতাদাহ (র.)-এর ব্যাখ্যানুযায়ী আরবি ভাষায় পুলিশদের ব্যাপারে زَبَانِيَةٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। زَبْنٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– ধাক্কা দেওয়া। রাজা-বাদশাহর দরবারে এ বিশেষ উদ্দেশ্যে সুবেদার নিযুক্ত করা হয়। বাদশাহ কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দরবার হতে বহিষ্কার করাই তাদের কাজ। এখানে আল্লাহর এ কথাটির তাৎপর্য এই যে, সে তার সমর্থকদের ডেকে আনুক, আমি আমার পুলিশ বাহিনী তথা আজাবের ফেরেশতাদের ডেকে আনবো। তারা এসে সে লোকটির ও তার সমর্থকদের সাথে বুঝাপড়া করবে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, زَبَانِيَةٌ দ্বারা জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র তাদের সংখ্যা ১৯ বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, সে ফেরেশতাগণ এত বিরাটকায় যে, তাঁদের মাথা আসমানে, পা জমিনে এবং মাথার চুলও মাটিতে পড়বে। চক্ষুর জ্যোতি বিদ্যুতের মতো হবে, এক কাঁধ হতে অপর কাঁধের দূরত্ব এক বছরের রাস্তা হবে। তাঁদের বাহুতে সত্তর হাজার মানুষ সংকুলান হবে। –[কাবীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি আবূ জাহল তখন নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে তার দলবলকে ডাকত, তবে দোজখের ফেরেশতাগণ তাদেরকে সকলের সম্মুখে পাকড়াও করত। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تُطِعْهُ **:** তথা আবূ জাহল নামাজ পরিত্যাগের যে কথা বলেছে– তা কোনো অবস্থাতেই মানবেন না; বরং আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সেজদা করতে থাকুন এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করতে থাকুন। –[নূরুল কোরআন]

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ**-এর মর্মার্থ :** এখানে সেজদা অর্থ– নামাজ অর্থাৎ হে নবী! আপনি এ পর্যন্ত যেভাবে নামাজ পড়ছিলেন নির্ভয়ে সেভাবে নামাজ পড়তে থাকুন। তার সাহায্যে আপনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাকুন। মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, বান্দা সে সময় তার আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হয় যখন সে সেজদায় অবনমিত হয়। মুসলিম শরীফে অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ যখনই এ আয়াতটি পড়তেন, তখনই সেজদা করতেন। এ সেজদাকে সেজদায়ে তেলাওয়াত বলে। এটা ওয়াজিব।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা সিজদায়ে শোকর। কারো কারো মতে, তা দ্বারা নামাজের মধ্যকার সেজদাকে বুঝানো হয়েছে।

اِقْتَرِبْ**-এর অর্থ :** এর অর্থ 'সেজদার মাধ্যমে তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকটতম মর্যাদা অর্জনে সচেষ্ট হও।' কারো মতে–"হে মুহাম্মদ সেজদা করো, হে আবূ জাহল! তার নিকটে যাও। দেখতে পাবে তোমার পরিণতি। –[কাবীর]

سُوْرَةُ الْقَدْرِ : সূরা আল-ক্বাদর

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَدْر শব্দের ধাতুগত অর্থ– পরিমাণ নির্ধারণ ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ। এ মূলধাতু হতেই তাকদীর বা ভাগ্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ সম্মান, গৌরব ও মহিমা। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের 'কদর' শব্দ হতেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ৩০টি বাক্য এবং ১২১টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ক. আবুল হাইয়্যান তাঁর اَلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ সূরাটি মাদানী।

খ. পক্ষান্তরে আল্লামা আল-মাওয়ারদী (র.) বলেন, অধিকাংশ কুরআন বিশারদের মতে তা মাক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী (র.) আল-ইতকান গ্রন্থে এটাই লিখেছেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু : কুরআন মাজীদের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই সূরাটির মূল বিষয়বস্তু। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন– আমিই এ কিতাব নাজিল করেছি। অর্থাৎ তা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিজস্ব কোনো রচনা নয়; বরং তা আমারই নাজিল করা কিতাব। আমি এ কিতাব কদরের রাত্রে নাজিল করেছি। তা বড়োই সম্মান ও মর্যাদার রাত। পরে এ কথার ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– এটা হাজার মাসের তুলনায়ও অধিক উত্তম রাত।

সূরার শেষভাগে বলা হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতা ও রূহ জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব রকমের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত তা এক পরিপূর্ণ শান্তির রাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ রাতে কোনোরূপ অশুভ বিষয়ের স্থান হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালাই যে মানবতার কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি, কোনো জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ফয়সালা হলেও তা অবশ্যই গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। এ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মুত্তাকী মুসলমানদের গৃহে গমন করে প্রত্যেক নর-নারীকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাম ও শান্তির বাণী জ্ঞাপন করেন।

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-ক্বাদর মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

خَمْسُ اَوْ سِتُّ اٰيَاتٍ : ৫/৬ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ اَيِ الْقُرْاٰنَ جُمْلَةً وَّاحِدَةً مِّنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَيِ الشَّرَفِ وَالْعِظَمِ .

১. আমি এটা অবতীর্ণ করেছি কুরআনকে একবার লাওহে মাহফূয হতে পৃথিবীর আকাশে, মহিমান্বিত রজনীতে অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা।

٢. وَمَآ اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَعْظِيْمٌ لِشَانِهَا وَتَعَجُّبٌ مِنْهُ .

২. আর তুমি কি জান? তোমার কি জানা আছে? হে মুহাম্মদ! মহিমান্বিত রজনী কি? এটা তার মাহাত্ম্য বর্ণনা ও তৎপ্রতি বিস্ময় প্রকাশ উদ্দেশ্য।

٣. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيْهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنْهُ فِىْ اَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَتْ فِيْهَا .

৩. মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম যে মাসে মহিমান্বিত রজনী নেই। সুতরাং সে রজনীর পুণ্য কাজ এ রজনীহীন সহস্র মাসের পুণ্য কাজ অপেক্ষা উত্তম।

٤. تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ وَالرُّوْحُ اَىْ جِبْرِيْلُ فِيْهَا فِى اللَّيْلَةِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ بِاَمْرِهٖ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ قَضَاهُ اللّٰهُ فِيْهَا لِتِلْكَ السَّنَةِ اِلٰى قَابِلٍ وَمِنْ سَبَبِيَّةٌ بِمَعْنَى الْبَاءِ .

৪. অবতীর্ণ হয় ফেরেশতাকুল تَنَزَّلُ শব্দটি মূলত تَتَنَزَّلُ ছিল, একটি تَ মূল হতে বিলুপ্ত হয়েছে। এবং রূহ অর্থাৎ জিবরীল (আ.) তাতে সে রজনীতে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে আদেশে প্রত্যেক কাজে যা আগামী বছরের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন। আর مِنْ অব্যয়টি سَبَبِيَّة এবং بَ অর্থে ব্যবহৃত।

٥. سَلٰمٌ قف هِىَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَمُبْتَدَأٌ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا اِلٰى وَقْتِ طُلُوْعِهٖ جُعِلَتْ سَلٰمًا لِكَثْرَةِ السَّلَامِ فِيْهَا مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ لَا تَمُرُّ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِلَّا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ .

৫. শান্তিময় সে রজনী এটা অগ্রবর্তী خَبَر আর তার مُبْتَدَأ হলো, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত مَطْلَعُ শব্দটি لَام -এর মধ্যে যবর ও যের উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তার উদয়ক্ষণ পর্যন্ত। এ রজনীকে سَلَامٌ শান্তিময় বলার কারণ এই যে, এ রজনীতে ফেরেশতাগণ অধিক পরিমাণে সালাম পাঠ করে তারা কোনো মু'মিন পুরুষ বা নারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম না দিয়ে অতিক্রম করে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ : اِنَّا মুবতাদা, اَنْزَلْنٰهُ-এর "ہ" যমীর কুরআনের দিকে ধাবিত– মাফউল। اَنْزَلْنَا-এর উহ্য যমীর ফায়েল; ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলিত হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ মুবতাদা, خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ الخ খবর। আর পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি مَا اَدْرٰكَ-এর মধ্যস্থ ইস্তিফহামের জওয়াব।

قَوْلُهُ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ الخ : تَنَزَّلُ ফেলে, اَلْمَلٰٓئِكَةُ ফায়েল, اَلرُّوْحُ শব্দটি مَلٰئِكَة-এর উপর আতফ হয়ে فِيْهَا জার-মাজরূর মুতা'আল্লিক تَنَزَّلُ-এর সাথে। بِاِذْنِ رَبِّهِمْ বাক্য تَنَزَّلُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক অথবা উহ্য مُتَلَبِّس-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে তার ফায়েল হতে হাল হয়েছে। مِنْ كُلِّ اَمْرٍ এটা পূর্ববর্তী ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। ফে'ল ও তার মুতা'আল্লিকসমূহ সহ জুমলায়ে মুস্তানাফা। এখানে বাক্য শেষ হয়েছে।

سَلَامٌ খবরে মুকাদ্দাম, هِىَ মুবতাদা মুয়াখখার। حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ মুতা'আল্লিক سَلَامٌ-এর সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামত দিবসের উপস্থিতির কথা উল্লিখিত হয়েছে, আর অত্র সূরায় পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার রাতের তথা লাইলাতুল কদরের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

–[নূরুল কোরআন]

সূরাটির শানে নুযূল : বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এমন একজন ইবাদতকারী ছিল, যে সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকত আর প্রত্যুষে জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়ত এবং সারা দিন জিহাদে মশগুল থাকত। এভাবে সে এক হাজার বছর কাটিয়ে দিল, এ ঘটনা প্রসঙ্গে অত্র সূরা অবতীর্ণ করে সমস্ত উম্মতের উপর নবী করীমের উম্মতের মর্যাদা প্রমাণ করা হলো। –[মাযহারী]

অথবা, পূর্ববর্তী যুগের দীর্ঘায়ু ধার্মিকগণ বহু বছর পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগি করে এবং তাদের দীর্ঘ জীবনে বহু সৎকার্য করে অবশেষে পুণ্যের অধিকারী হয়ে গেছেন। সুতরাং হযরতের সমসাময়িক অথবা পরবর্তী যুগের অল্পায়ু মু'মিনদের পক্ষে প্রার্থনা বা ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকার্যে তাদের সমকক্ষ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হবে? এক সময় নবী করীম ﷺ-এর মনে এ চিন্তা উদিত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরা অবতীর্ণ করে তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলেন– হে রাসূল! আমি আপনার এবং আপনার অনুগামীদের জন্য এমন এক মহা মহিমান্বিত রজনী নির্ধারিত করে দিয়েছি, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে এক রজনীর উপাসনা হাজার মাসের উপাসনার চেয়েও উত্তম। –[ইবনে জারীর]

অথবা, একদা নবী করীম ﷺ সাহাবীদের কাছে বনী ইসরাঈলের এক দরবেশের কাহিনী বর্ণনা করলেন। সে দরবেশ একটানা চুরাশি বছর অথবা হাজার মাস আল্লাহর রাহে জিহাদ করেন। এ হাজার মাস যাবৎ উলঙ্গ তরবারি তাঁর কোমরে বাঁধা ছিল। এ কাহিনী শুনে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বিস্ময় বোধ করলেন এবং অনুশোচনা করলেন। তাঁরা বললেন– আদিকালের লোকেরা দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করত; আমরা তো অল্প দিন আয়ু লাভ করি। সত্যিই আমরা হতভাগ্য। তাঁদের এ অনুশোচনার জবাবে আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– তোমরা অল্পায়ু হলেও ভাবনার কিছুই নেই। তোমাদেরকে কদরের রাত্রি দান করেছি। যা সাধারণ রাত্রি হতে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ হাজার রাত্রি ইবাদত করে যে পুণ্য অর্জন করা হয়েছে তোমাদের যুগে শুধু কদরের রাত্রির পুণ্য তার চেয়েও অনেক বেশি। –[দুররে মানছুর, লোবাব, ইবনে কাছীর]

অথবা, হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল বনী উমাইয়ার জালিম বাদশাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বারে একের পর এক বানরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বসছে, আর প্রজাদের উপর অত্যাচার করছে। এ স্বপ্ন দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয়।

হাজার মাসের দ্বারা বনী উমাইয়াদের রাজত্বকালের হাজার মাস (আশি সাল)-কে বুঝিয়েছে। যেমন- তা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উমাইয়াদের পার্থিব রাজত্বকালের আশি সাল হতে পরকালীন মর্যাদার এ রাত্রিই উত্তম।

-[রুহুল মা'আনী, আযীযী]

قَدْر -এর অর্থ কি, একে কদরের রাত বলা হয় কেন? : মুফাসসিরগণ এখানে قَدْر -এর দু'টি অর্থ করেছেন।

১. একদল মুফাসসিরের মতে, ক্বদর -এর অর্থ হলো- তাকদীর। কেননা এ রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা তাকদীরের ফয়সালা জারি ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের কাছে সোপর্দ করে দেন। সূরা-দোখান -এর নিম্নোক্ত আয়াতটিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ এ রাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারের অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সুদৃঢ় ফয়সালা জারি করা হয়।

২. ইমাম যুহরীসহ একদল মুফাস্‌সিরের মতে, ক্বাদর -এর অর্থ- মাহাত্ম্য, মর্যাদা, সম্মান ও সম্ভ্রম। অর্থাৎ এটা অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ মর্যাদাশালী ও সম্মানিত রাত। এ সূরায় 'ক্বাদরের রাত হাজার মাসেরও তুলনায় অধিক কল্যাণকর' কথা হতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

৩. শেখ আবূ বকর ওয়াররাফ বর্ণনা করেন, এ রাতে ইবাদতের কারণে এমন লোকেরও মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পায় ইতঃপূর্বে যাদের কোনো মর্যাদা বা কদর ছিল না। এ জন্য এ রাতকে শবে কদর বলা হয়। -[নূরুল কোরআন]

লাইলাতুল কদর নিরূপণ : এ রাতকে সাধারণত 'শবে কদর' বলা হয়ে থাকে। এ শবে কদর কবে, কখন তার সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। কেউ কেউ বলেছেন- যে কোনো মাসের যে কোনো রাতে শবে কদর হতে পারে এবং সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির উপরেই তার শবে কদর প্রাপ্তির শুভ মুহূর্ত নির্ভর করে। তবে অধিকাংশের মতে রমজান মাসের মধ্যেই শবে কদর অবস্থিত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের ইঙ্গিতেও বুঝা যায়, রমজান মাসের শেষ দশ তারিখের মধ্যেই এবং তার বেজোড় রাত্রিতে শবে কদর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অনেক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মতে, রমজান মাসের সাতাশ তারিখের রাত্রেই শবে কদর হয়ে থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, ধর্মপ্রাণ মুসলিম নর-নারীগণ যাতে শবে কদর প্রাপ্তির আশায় রমজান মাসের সমস্ত রাত আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে অতিবাহিত করে পুণ্য ও অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হতে পারে, তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলা এ মহিমান্বিত রাতকে রমজান মাসের মধ্যে গোপন রেখে দিয়েছেন। তবে হাদীসসমূহের বর্ণনা ও সাহাবীদের ধারণা মতে, রমজান মাসের শেষে তথা ২৭ শে রমজান তারিখে অমানিশার গভীর অন্ধকারেই মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ আধ্যাত্মিক জগতে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্র অপেক্ষা অন্ধকার রাত্রেই অধিকতর ঐশী অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়ে থাকে। অতএব, সবদিক বিবেচনা করলে রমজানের সাতাশ তারিখের রাত্রকেই শবে কদর হিসাবে নিরূপণ করা যেতে পারে। কারণ যুগ যুগ ও শতাব্দী ধরে লক্ষ্য করা হয়েছে-আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র রাতকে ঝড়-ঝটিকা, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে মুক্ত রাখেন। ঐ রাত্রে পৃথিবীর উপর কোনোই অশান্তির ঘটনা সংঘটিত হয় না।

হযরত ওসমান ইবনে আব্দুল আসের এক দাস বহু দিন ধরে নৌকা ও জাহাজ চালাত, সে একটি ঘটনা তার নিকট বলল- আমার সফরে একটি বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, বছরের মধ্যে একদিন সমস্ত নদীর লবণাক্ত পানি মিঠা হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন- যখন এরূপ আবার হবে, তখন তুমি আমাকে জানাবে। অতএব, এক বছর রমজানে তাকে জানানো হলো। তখন জানা গেল তা রমজানের ২৭ তারিখ রাত্র ছিল। -[আযীযী]

আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন যে, আমি তা কদরের রাতে নাজিল করেছি। অথচ কুরআন এক দীর্ঘ সময়ে নাজিল হয়েছে :

আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা কদরের রাতে নাজিল করেছি।' তা হতে বাহ্যত মনে হয় সমস্ত কুরআন কদরের রাতে এক সঙ্গে নাজিল হয়েছে। অথচ নবী করীম ﷺ -এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ কুরআন নাজিল হয়েছিল। মুফাস্‌সিরগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ক. একদল মুফাস্‌সিরের মতে, কদরের রাতে পূর্ণ কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফূয হতে প্রথম আকাশে নাজিল হয়েছে। আর তখন হতে দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ অল্প অল্প করে নবী করীম ﷺ -এর উপর নাজিল হয়েছে।

খ. এ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন ওহী বাহক ফেরেশতার হাতে সমর্পণ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময় সময় ২৩ বছরের দীর্ঘ মেয়াদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সে আয়াত ও সূরাসমূহকে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি নাজিল করেছেন। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মনোনীত মত।

গ. ইমাম শা'বী (র.) সহ একদলের মতে, এর ব্যাখ্যা হলো এ রাতে কুরআন নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে।

ঘ. সমস্ত কুরআন শরীফের ন্যায় এর অংশ বিশেষও কুরআন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কাজেই এখানে কুরআন দ্বারা আংশিক কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে।

লাইলাতুল কদরকে গোপন রাখার কারণ : আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি কারণে উক্ত লাইলাতুল কদরকে গোপন রেখেছেন :

১. উক্ত রাত্রকে তিনি গোপন রেখেছেন, যেমন গোপন রেখেছেন অনেক বস্তুকে। যেমন তিনি সমস্ত ইবাদতে তাঁর সন্তুষ্টি গোপন রেখেছেন, যেন সকল গুনাহ হতে বিরত থাকা যায়।

একান্ত ওলীদেরকে গোপন করে রেখেছেন, যেন পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করে। দোয়ার মধ্যে জবাব দানকে গোপন করে রেখেছেন, যেন বেশি বেশি দোয়া করা হয়। اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى কে গোপন রেখে সকল সালাত (নামাজ) আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তওবা কবুলকে গোপন রেখেছেন, যেন সকল প্রকার তওবা সংঘটিত হয়। মৃত্যুকে গোপন রেখে মনে ভয়ের সঞ্চার করে রেখেছেন। এমনিভাবে লাইলাতুল কদরকে গোপন রেখেছেন, যেন বান্দা রমজানের সকল রাতকে সম্মান করে ইবাদত করে।

২. মনে হয় যেন আল্লাহ বলতে চান যে, যদি আমি লাইলাতুল কদরকে নির্ধারণ করে দিতাম, তাহলে সে রাতকে তোমাদেরকে নাফরমানির দিকে নিয়ে যেত। কেননা, আমি তোমাদের হঠকারিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। অতএব, তোমরা গুনাহগার হয়ে যেতে। এমতাবস্থায় তোমাদের গুনাহ বড় হয়ে দাঁড়াত। কেননা, জেনেশুনে গুনাহ করলে তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই না জানিয়ে গোপন করে রেখেছি।

৩. এ রাতকে তালাশ করে চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে বের করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে চেষ্টা-সাধনার ফল দান করবেন, যা অন্যান্য ইবাদতে পাওয়া যায় না।

৪. অথবা, বান্দা যখন লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য সকল রাতে চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বলবেন যে, দেখ তোমরা বলেছিলে- মানুষ জমিনের খুন-খারাবি এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ করবে- দেখ অনির্ধারিত ধারণামূলক রাতে তারা এত চেষ্টা করে আমার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করছে, যদি উক্ত রাতকে প্রকাশ করে দিতাম, তাহলে দেখতে কত চেষ্টা তারা করত। -[কাবীর]

দিন কি রাতের সাথে যুক্ত হবে? : রাত এবং দিন মিলে 'লাইলাতুল কদর' হয়ে থাকে। যেমন, হযরত শাবী বলেন, يَوْمُهَا كَلَيْلَتِهَا 'লাইলাতুল কদরের দিনটি রাতের মতোই মর্যাদাবান'। আরবিতে لَيْل বললে نَهَار বা দিনও শামিল থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তি দুই لَيْلَة -এর ই'তিকাফের নিয়ত করলে মধ্যকার দিনেও ই'তিকাফে থাকতে হবে। যদিও কারো মতে দিন শামিল নয়। -[কাবীর]

رُوْح অর্থ কি? : 'রূহ' এর মর্মার্থের ব্যাপারে কয়েকটি মত দেখা যায়-

১. 'রূহ' -এর অর্থ বড় ফেরেশতা। যদি তিনি আসমান ও জমিনসমূহকে গিলতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এক লোকমার বেশি হবে না।

২. ফেরেশতাদের একটি বিশেষ দল, যাদেরকে অন্যান্য ফেরেশতাগণ 'লাইলাতুল কদর' ব্যতীত কোনো সময়ে দেখেন না।

৩. অথবা, আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি, যারা খায় ও পরে, তারা ফেরেশতাও নয়, মানুষও নয়। সম্ভবত তারা বেহেশতবাসীদের সেবক।

৪. অথবা, সম্ভবত ঈসা (আ.)। কেননা তাঁর এক নাম 'রূহ'। তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

৫. অথবা, কুরআন। যেমন, আল্লাহ বলেন- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا

৬. অথবা, রহমত। মনে হয় যেন আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলছেন যে, ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছেন, তাঁদের পিছনে রহমতও অবতরণ করেছে। অতএব, তারা দুনিয়ার সফলতার সাথে সাথে আখেরাতের সাফল্যতার ভাগী হচ্ছে।

৭. অথবা, ফেরেশতাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

৮. ইমাম নুজাইহ্ বলেন, 'রূহ' বলতে ডান ও বাম কাঁধের ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে।

তবে সবচেয়ে সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য কথা হলো– 'রূহ' বলতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। সমস্ত ফেরেশতাদের উল্লেখের পর হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উল্লেখ দ্বারা তাঁর ফজিলত বুঝানো হয়েছে। মনে হয় যেন এ কথা বলা হয়েছে, اَلْمَلٰٓئِكَةُ فِىْ كَفْوٍ وَالرُّوْحُ فِىْ كَفْوٍ অর্থাৎ 'সকল ফেরেশতা এক পাল্লায় আর হযরত জিবরাঈল (আ.) এক পাল্লায়'। –[কাবীর]

سَلٰمٌ -এর অর্থ : سَلٰمٌ অর্থ– শুভেচ্ছা বা কল্যাণ কামনা। আল্লাহর আদেশে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রত্যেক ইবাদতে রত মুসলমান নর-নারীকে কদরের রজনীতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাম বা শুভেচ্ছাবাণী জ্ঞাপন করেন। অথবা, সকাল হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ রজনীকে শান্তি ও কল্যাণের রজনী বানিয়েছেন। সে রজনীতে পৃথিবীকে ঝড়, ঝটিকা, বজ্রপাত, ভূমিকম্প বা অনুরূপ কোনো প্রাকৃতিক বিপদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখেন; বরং এর পরিবর্তে সে রাতের সকাল পর্যন্ত সমগ্র জগৎ ব্যাপি এক অনাবিল শান্তি ও স্নিগ্ধতা বিরাজ করে।

হযরত নাফে' (র.)-এর তাফসীর করেছেন এভাবে যে, কদরের রাত সবটুকুই নিরাপদ এবং মঙ্গলময়। এ রাতে অমঙ্গলের কিছুই নেই।

ইমাম শা'বী (র.) বর্ণনা করেন যে, سَلٰمٌ -এর অর্থ হলো, এ রাতে সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ফেরেশতাগণ মু'মিনদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন– আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। –[নূরুল কোরআন]

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -এর মধ্যে اَمْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন যে, এখানে 'اَمْرٍ' দ্বারা সে সকল বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যা পরবর্তী এক বছরের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক হুকুম বলে বুঝানো হয়েছে, প্রত্যেক বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি সঙ্গত কাজ। সূরা দুখানে তাকে اَمْرٍ حَكِيْمٍ বলা হয়েছে।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ -এর মধ্যস্থিত "ه" যমীরটির مَرْجِعْ কি? : মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ -এর মধ্যস্থিত "ه" যমীরের مَرْجِعْ হলো কুরআন মাজীদ। যদিও পূর্বে তার উল্লেখ নেই, তথাপি 'নাজিল করা' কথাটি হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তা কুরআন সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ : সূরা আল-বাইয়্যিনাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটি দ্বারা সূরাটির নামকরণ হয়েছে আল-বাইয়্যিনাহ। "বাইয়্যেনাহ" অর্থ স্পষ্ট দলিল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ। এটা দ্বারা মূলত রাসূলে কারীম ﷺ উত্থাপিত দীন ও জীবনাদর্শের কথা বুঝানো হয়েছে। উক্ত সূরাটির আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– কিয়ামাহ, বালাদ, মুনফাক্কীন, বারিইয়্যা এবং লাম-ইয়াকুন। এতে ৮টি আয়াত, ২৫টি বাক্য এবং ১৪৯টি অক্ষর রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কতিপয় তাফসীরকার বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ সূরাটি মাক্কী। আর অপর কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে তা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে জুবাইর এবং আতা ইবনে ইয়াসার (র.) -এর মতে এটা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা (রা.) এ পর্যায়ে দু'টি কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটি কথানুযায়ী তা মাদানী। হযরত আয়েশা (রা.) তাকে মাক্কী বলেছেন। আল-বাহরুল মুহীত গ্রন্থকার আবূ হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন প্রণেতা আবুল মুনয়িম (র.) এ সূরাটির মাক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ সূরাতে বর্ণিত কথা ও বিষয়বস্তুতে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, যার ভিত্তিতে একটি কথাকে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : সূরাটিতে সর্বপ্রথম রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সে কথাটি হলো– দুনিয়ার মানুষ আহলে কিতাব বা মুশরিক যা-ই হোক না কেন, যে কুফরির অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল, তা হতে মুক্তি লাভের জন্য এমন এক জন রাসূল প্রেরণ অপরিহার্য ছিল যার নিজ সত্তাই হবে তাঁর রাসূল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। তাকে প্রদত্ত কিতাব হবে সম্পূর্ণরূপে যথাযথ, সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

এরপর আহলে কিতাব জাতিসমূহের গোমরাহীর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পথ দেখাননি বলেই যে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তা নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ হতে সঠিক পথের নির্দেশ পাওয়ার পরই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। কাজেই তাদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আর এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে নবী ও রাসূল-ই এসেছেন আর যে কিতাব-ই নাজিল হয়েছে, তা একটি মাত্র নির্দেশই দিয়েছে। সে নির্দেশ হলো, সকল পথ-পন্থা ও নির্দেশ পরিত্যাগ করে আল্লাহর খালেস বন্দেগি করার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা হতেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাব এ আসল ও প্রকৃত দীন হতে বিচ্যুত হয়ে নিজের ধর্মে যেসব নতুন নতুন মত-পথ ও কথার উদ্ভাবন বা বৃদ্ধি করে নিয়েছে, তা সবই সম্পূর্ণ বাতিল।

কাজেই আল্লাহর এ শেষ নবী যিনি এখন এসেছেন, তিনিও সে আসল দীনের দিকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে অকুল আহ্বান জানিয়েছেন। সূরার শেষ ভাগে স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে, যে আহলে কিতাব ও মুশরিক এ নবীকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে। তারা নিকৃষ্টতম জীব। চিরকালীন জাহান্নামই তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনে নেক আমলের পথ অবলম্বন করবে তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ لِلْبَيَانِ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ اَىْ عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ عَطْفٌ عَلٰى اَهْلِ مُنْفَكِّيْنَ خَبَرُ يَكُنْ اَىْ زَائِلِيْنَ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ اَىْ اَتَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ اَيِ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ ـ

১. আহলে কিতাবগণ হতে যারা কাফের مِنْ অব্যয়টি بَيَانِيَه আর মুশরিকগণ অর্থাৎ প্রতিমা পূজারী এটা اَهْلِ-এর প্রতি عَطْف বিরত হওয়ার ছিল না এটা يَكُنْ-এর خَبَرْ অর্থাৎ স্বীয় অবস্থা পরিত্যাগকারী ছিল না তাদের নিকট না আসা পর্যন্ত تَاْتِيَهُمْ শব্দটি اَتَتْهُمْ অর্থে সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশ্য দলিল।

٢. رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ بَدَلٌ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً مِنَ الْبَاطِلِ ـ

২. আল্লাহর পক্ষ হতে একজন রাসূল এটা بَيِّنَةٌ হতে بَدَلْ আর তিনি নবী মুহাম্মদ ﷺ যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ বাতিল হতে।

٣. فِيْهَا كُتُبٌ اَحْكَامٌ مَكْتُوْبَةٌ قَيِّمَةٌ مُسْتَقِيْمَةٌ اَىْ يَتْلُوْ مَضْمُوْنَ ذٰلِكَ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ـ

৩. যাতে আছে বিধানসমূহ লিখিত আহকামসমূহ সঠিক নির্ভুল। অর্থাৎ তিনি কুরআনের বিষয়বস্তু পাঠ করে শুনান। পরিণামে কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর কেউ অবাধ্যাচারিতা প্রদর্শন করে।

٤. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ فِى الْاِيْمَانِ بِهٖ ﷺ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ اَىْ هُوَ ﷺ اَوِ الْقُرْاٰنُ الْجَائِىْ بِهٖ مُعْجِزَةٌ لَهٗ وَقَبْلَ مَجِيْئِهٖ ﷺ كَانُوْا مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى الْاِيْمَانِ بِهٖ اِذَا جَاۤءَ فَحَسَدَهٗ مَنْ كَفَرَ بِهٖ مِنْهُمْ ـ

৪. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন প্রশ্নে তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আগমন করার পর অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা কুরআন যা তিনি স্বীয় মু'জিযারূপে আনয়ন করেছেন। আর তারা তাঁর আগমনের পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনার প্রশ্নে ঐকমত ছিল; কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পর কতিপয় লোক ঈর্ষাবশে কুফরি অবলম্বন করেছে।

٥. وَمَآ اُمِرُوْا فِىْ كِتَابَيْهِمُ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ اَىْ اَنْ يَعْبُدُوْهُ فَحُذِفَتْ اَنْ وَ زِيْدَتِ اللَّامُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا مِنَ الشِّرْكِ حُنَفَآءَ مُسْتَقِيْمِيْنَ عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ اِذَا جَاءَ فَكَيْفَ كَفَرُوْا بِهٖ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ الْمُسْتَقِيْمَةِ.

৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল তাদের কিতাবদ্বয় তাওরাত ও ইনজীলে। আল্লাহর ইবাদত করতে শব্দটি اَنْ يَعْبُدُوْهُ অর্থে ব্যবহৃত اَنْ -কে বিলুপ্ত করে তদস্থলে لَامْ ব্যবহৃত হয়েছে দীনকে তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে শিরক হতে একনিষ্ঠভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ ﷺ -এর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। এক্ষণে যখন তিনি আগমন করেছেন, তখন তারা কিরূপে তাঁর অবাধ্যাচারণ করছে। আর নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে ও জাকাত আদায় করতে, এটাই দীন মিল্লাত যা সঠিক قَيِّمَة শব্দটি مُسْتَقِيْمَة অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় শবে কদরের ফজিলত ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় ইবাদত কবুল হওয়ার মৌলিক ভিত্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর তা হলো, বান্দার ইখলাস বা মনের একনিষ্ঠতা ও পবিত্রতা।

এ ছাড়া পূর্ববর্তী সূরায় যখন শবে কদরের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় বান্দার নেক ও বদ হওয়ার মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা ঈমানদার হয় এবং নেক আমল করে তারা সৌভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যারা কুফরি ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে তারা হতভাগ্য। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটির শানে নুযূল : মহানবী ﷺ -এর পূর্বে মক্কা-মদীনার ইহুদি-নাসারাগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট এই বলে প্রার্থনা জানাত- যদি আমাদের জীবদ্দশায়ই আখেরী নবীর আগমন ঘটে, তবে আমরা সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনবো। কিন্তু তাঁর নবুয়ত লাভ করার পর মাত্র কয়েকজন লোক ব্যতীত কেউই ঈমান আনল না। তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন। -[মা'আলিম]

আহলে কিতাব-এর পরিচয় : আল-কুরআনের পরিভাষায় হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর অনুসারীগণকেই আহলে কিতাব বলা হয়। কেননা, তারাই আসমানি কিতাব তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারী ছিল। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। কেননা, নবী করীম ﷺ-এর যুগে ইহুদি ও খ্রিস্টান নামে দু'টি ধর্মীয় দল ছিল, যারা নিজেদের কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা অবহিত হয়েছিল যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমন অত্যাসন্ন, তাঁর গুণাবলি হবে এই ...... কিন্তু এটা অবগত থেকে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেও তাঁর আনীত দীন ও আদর্শকে গ্রহণ না করার কারণে তাদেরকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আহলে কিতাবের মধ্যে ইহুদিগণ নিজেদের কিতাব ও ধর্মবিশ্বাসে অনেক মনগড়া কল্পিত কথা ও আকীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি করে নিয়েছিল। যেমন- তারা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। এটা ছিল আল্লাহর সত্তায় প্রকাশ্য শিরক। অপর দিকে খ্রিস্টানগণও নিজেদের কিতাব ও আকীদায় অনেক মনগড়া কথা ও আকীদা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। যেমন- তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র এবং মরিয়ম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলে ত্রিত্ববাদের আকীদা পোষণ করত। এটাও ছিল আল্লাহর সত্তায় প্রকাশ্য শিরক।

মুশরিকদের পরিচয় : উপরিউক্ত আয়াতে যেসব লোকদেরকে মুশরিক নামে অভিহিত করা হয়েছে, তারা মূলতই কোনো নবী, কিতাব ও ধর্মের অনুসারী ছিল না। শিরক করাকেই তারা ধর্ম মনে করত। সুতরাং উপরিউক্ত আয়াতে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার সারকথা হলো আহলে কিতাবগণ নির্দিষ্ট নবী ও কিতাবের অনুসারী হওয়ার এবং

তাওহীদবাদী ধর্মের দাবি করেও আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় শিরক করে। আর মুশরিকগণ কোনো কিতাব ও তাওহীদী ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় শিরক করাকে ধর্ম ভেবে থাকে।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল এর অর্থ এই নয় যে, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে কিছু কিছু লোক কুফরি করত আর কতক কুফরি করত না; বরং এর মর্ম হলো কুফরিতে নিমজ্জিত লোক দু'ভাগে বিভক্ত, একদল আহলে কিতাব ও অপর দল মুশরিক। কেননা তারা কুফরি না করলে তখন আহলে কিতাব বা মুশরিকরূপে তাদের পরিচয় থাকে না। তখন তারা হয়ে যায় মুসলিম ও মু'মিন।

অগ্নি উপাসক কি আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত? : এ ব্যাপারে দু'টি মত দেখা যায়।

১. কতিপয় আলিমের মতে, তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

২. অন্যান্যদের মতে তারা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। -[কাবীর]

মুশরিকদের পূর্বে আহলে কিতাবকে উল্লেখের হিকমত : আল্লাহর বাণী لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الخ এর মধ্যে আহলে কিতাবকে মুশরিকদের পূর্বে উল্লেখ করার বিভিন্ন রহস্য ও কারণ মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন।

ক. আহলে কিতাব ছিল আলিম, সমাজে তারা প্রভাবশালী ছিল এ জন্য তাদরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. সূরাটি মাদানী। আর মদীনায় তখন আহলে কিতাবের বসবাস ছিল। তাই মুখ্যত তাদের কথা বলা হয়েছে।

গ. আহলে কিতাব হওয়ার কারণে অন্যান্যরা তাদের অনুসরণ করত। কাজেই তারা কুফরি করার কারণে অন্যরাও কুফরি করেছেন। এ জন্য তাদেরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. আহলে কিতাবের কুফরি ও বিরোধিতা ছিল মারাত্মক। কেননা তারা নবী করীম ﷺ -কে শেষ নবী জেনেও তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে।

ঙ. অথবা, আহলে কিতাব মুশরিকদের অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কারণে তাদেরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। -[কাবীর]

حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ আয়াতে اَلْبَيِّنَةُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : পরবর্তী আয়াত رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ الخ হতে বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াতে اَلْبَيِّنَةُ দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁর নবুয়ত পূর্ব ও নবুয়ত পরবর্তী জীবন উম্মী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের মতো একখানি জ্ঞানের বিশ্বকোষ পেশ করা, তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা ও সংস্পর্শে ঈমান গ্রহণকারীদের জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি হওয়া, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিভিত্তিক আকীদা-বিশ্বাস স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ইবাদত, উন্নত মানের পবিত্র নৈতিকতা ও মানব জীবনের জন্য উত্তম নীতি-আদর্শ ও আইন-বিধানের শিক্ষাদান, তার কথা ও কাজ পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া এবং সকল প্রকার বিরোধিতা অতিক্রম করে অত্যন্ত সাহসিকতা সহকারে তার নিজ দাওয়াত ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, তার উপর সুদৃঢ় হয়ে থাকা-এ সব কিছুই অকাট্যভাবে প্রমাণ করছিল যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল। আর এ হিসাবে তিনি কাফিরদের জন্য এক অকাট্য দলিলও ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাইয়্যেনাহ বলার কারণ : এর কয়েকটি কারণ হতে পারে।

১. কেননা, তিনি নিজেই নবুয়তের এক উজ্জ্বল প্রমাণ ছিলেন। নবুয়তের সকল যোগ্যতা তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

২. তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ আকলের একমাত্র ধারক। সত্যবাদিতা ছিল তাঁর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য দিক। তাইতো তিনি হয়েছিলেন সত্যবাদিতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

৩. তাঁর জীবনে মু'জিযা ছিল স্পষ্ট এবং অধিক। স্পষ্টতা এবং আধিক্যতার দিক থেকে মনে হয় যেন তিনিই بَيِّنَة বা حُجَّة এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম দিয়েছেন سِرَاجًا مُّنِيْرًا -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

مُطَهَّرَةً-এর অর্থ : مُطَهَّرَةً অর্থ–পবিত্র কিন্তু কোনো বস্তু হতে পবিত্র, তা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব, কারো মতে مُطَهَّرَةً عَنِ الْبَاطِلِ অর্থাৎ বাতিল হতে পবিত্র। যেমন বলা হয়েছে– لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

অথবা, مُطَهَّرَةً عَنِ الذِّكْرِ الْقَبِيْحِ অর্থাৎ অশোভনীয় উক্তি উল্লেখ হতে মুক্ত-পবিত্র। কেননা কুরআনে উত্তম উক্তিই স্থান পেয়েছে। অথবা, مُطَهَّرَةً বলতে পবিত্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত তা স্পর্শ করতে পারবে না, বুঝানো হয়েছে। যেমন– অন্যত্র বলা হয়েছে لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

كُتُبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : كُتُبٌ দ্বারা আয়াতে কারীমায় সমস্ত সহীফাগুলোতে লিপিবদ্ধ আয়াত এবং বিধানসমূহকে বুঝানো উদ্দেশ্য।

অথবা, كُتُبٌ বলতে আল্লাহর আদেশসমূহকে বুঝানো হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের উল্লেখ আর চতুর্থ আয়াতে শুধু আহলে কিতাবকে উল্লেখ করার কারণ : মুশরিকগণ তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাদের মধ্যে একদল নিহত হয়েছে। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবগণ জিজিয়া দিয়ে নিজস্ব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা বিভক্ত হয়নি বলে উক্ত চতুর্থ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রথম আয়াতে একই সাথে উভয় দলের কথা এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবগণ তাদের কিতাবে নবী করীম ﷺ -এর সকল পরিচয় পেয়েও যখন ঈমান আনেনি, তখন তারা মুশরিকদের মতো হয়ে গেছে। –[কাবীর]

دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-এর অর্থ : دِيْن শব্দটির অনেকগুলো আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন– মহাবিচার দিন, রাজত্ব, ক্ষমতা, হুকুম, ধর্ম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, চরিত্র, অভ্যাস, কৌশল। আয়াতে ধর্ম ও জীবন-বিধান অর্থে ব্যবহার হয়েছে। বহুবচনে أَدْيَانٌ আর قَيِّمَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত, সরল, সুশৃঙ্খল। আয়াতে সবগুলো অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মহানবী ﷺ আল্লাহর নিকট হতে যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন, তা সরল ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-বিধান। এতে বক্রতা ও জড়তার লেশমাত্র নেই। নেই কোনো বাতিল, মিথ্যা ও মনগড়া কথা এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত সরল–সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ জীবন-বিধান।

হযরত খলীল ইবনে আহমাদ (র.) বলেছেন قَائِمٌ، قَيِّمٌ، قَيِّمَةٌ তিনটি শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ এটি দীন তাদের, যারা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে।

অথবা, এর অর্থ হলো كُتُبٌ قَيِّمَةٌ তথা এটি সে দীন, যা বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। যাতে কোনো প্রকার ভুলত্রুটি নেই।

আর কারো মতে এর অর্থ হলো, এটিই সত্য মিল্লাত, আর এটিই শরিয়তের সঠিক পথ। –[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

٦. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَالٌ مُقَدَّرَةٌ أَيْ مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى أُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে আহলে কিতাবদের মধ্য হতে এবং মুশরিকগণ, জাহান্নামী হবে তথায় তারা চিরকাল থাকবে خَالِدِيْنَ শব্দটি এখানে حَالٌ مُقَدَّرَةٌ হয়েছে। অর্থাৎ তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামী হওয়া আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এরাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

٧. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ الْخَلِيْقَةُ.

৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে, তারাই হলো উৎকৃষ্ট সৃষ্টি [শ্রেষ্ঠ] সৃষ্টি।

٨. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ إِقَامَةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرَضُوْا عَنْهُ ط بِثَوَابِهِ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ خَافَ عِقَابَهُ فَانْتَهٰى عَنْ مَعْصِيَتِهِ تَعَالٰى.

৮. তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট জান্নাত-যা চিরস্থায়ী চিরকালীন আবাসস্থল প্রবহমান হবে যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ তথায় তারা চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট তাঁর আনুগত্য করার কারণে। আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট তাঁর প্রতিদান প্রদানের কারণে। এটা তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে আল্লাহর আজাবকে ভয় করত তাঁর নাফরমানি হতে বিরত থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الخ : الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল, كَفَرُوْا তার সেলা, مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ বায়ান كَفَرُوْا-এর জন্য। এ পর্যন্ত ইসমে إِنَّ - فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ খবরে إِنَّ আর خَالِدِيْنَ فِيْهَا উভয় যুলহাল হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى - أُولٰئِكَ মুবতাদা, هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ বাক্য হয়ে খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .... الْبَرِيَّةِ : আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে যারা কুফরি করেছে এবং যারা মুশরিক তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে। তারা নিকৃষ্টতম জীব।

এখানে কুফর অর্থ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর শেষ নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। আল্লাহর সৃষ্টিতে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কোনো সৃষ্টি নেই। এমনকি জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষাও তারা নিকৃষ্ট। কেননা বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হয়ে এ সত্য দীনকে অমান্য করেছে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে যে কাফেরদের কথা বলা হয়েছে, তারা দু' প্রকার–

১. আহলে কিতাব, তথা ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে যারা কাফের রয়েছে, কেননা তারা হযরত ওযায়ের (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে ধারণা করে।

২. মুশরিক, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করে মূর্তিপূজা করে। কাফেরদের উভয় দলের জন্যই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। –[নূরুল কোরআন]

شَرُّ الْبَرِيَّةِ وَخَيْرُ الْبَرِيَّةِ-এর অর্থ : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরগণকে সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি নামে আখ্যায়িত করেছেন। এর তাৎপর্য হলো যে, মানুষ সৃষ্টিকুলের মধ্যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের দিক দিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত। কারণ অন্যান্য সৃষ্টিকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দান করা হয়নি। আর তাদেরকে কর্মেও কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি; কিন্তু মানুষ এ সব অমূল্য রত্ন ও কর্মের স্বাধীনতা লাভ করেও তার সঠিক ব্যবহার করে না। আল্লাহর প্রদর্শিত পথে তার প্রয়োগ দেখায় না; বরং তার প্রদর্শিত পথের বিপরীত পথেই নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি পরিচালনা করেছে। সুতরাং এ মূল্যবান সম্পদের যথার্থ ব্যবহার না করার কারণেই তারা সৃষ্টিকুলের মধ্যে নিকৃষ্টতর সৃষ্টি প্রমাণিত হয়েছে। এটাই হলো شَرُّ الْبَرِيَّةِ-এর মর্ম।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকগণকে خَيْرُ الْبَرِيَّةِ বা সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি নামে অভিহিত করেছেন। তারা আল্লাহর সৃষ্টিকুল এমনকি ফেরেশতাদের তুলনায়ও উত্তম মর্যাদার অধিকারী। কারণ অন্যান্য সৃষ্টিকে যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়নি, তেমনি ফেরেশতাগণকেও জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়নি। অথচ মানবকুলকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে। আর এর সদ্ব্যবহার করে যারা আল্লাহর প্রদর্শিত জীবনাদর্শে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে তারা অন্যান্য সৃষ্টি ছাড়া স্বয়ং ফেরেশতাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান ও উত্তম না হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। তাই মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যারা কুফরি ও শিরক করে, তারা আশরাফুল মাখলুকাত হয়েও সৃষ্টির নিকৃষ্টতর জীব। আর যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করে, তারা আশরাফুল মাখলুকাতের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং সৃষ্টির সেরা প্রাণীরূপে পরিগণিত হয়েছে।

মুশরিকদের পূর্বে আহলে কিতাবকে উল্লেখের কারণ : এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের পূর্বে আহলে কিতাবের উল্লেখ করেছেন। এর কারণ এই যে, আহলে কিতাবের অপরাধ মুশরিকদের হতেও জঘন্য ছিল। কেননা মুশরিকদের নিকট তো কোনো আসমানি কিতাব ছিল না। তারা নবী করীম ﷺ -কে চিনত না। দীন কি তা বুঝত না। এজন্য তথায় নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতা করেছে। পক্ষান্তরে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা জেনেশুনে নিছক বিদ্বেষবশত নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতা করেছে। –[কাবীর]

كَفَرُوْا-কে ক্রিয়াপদে এবং اَلْمُشْرِكِيْنَ-কে ইসমে ফায়েল-এর শব্দে কেন উল্লেখ করা হয়েছে? : كَفَرُوْا শব্দটি এখানে اَهْلِ كِتَابٌ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেহেতু তাদের কুফরি সাময়িক ছিল, স্থায়ী ছিল না, সেহেতু كَفَرُوْا -কে ক্রিয়াপদ নেওয়া হয়েছে, যা অস্থায়ীত্বকে প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, মুশরিকরা শিরকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার উপর স্থায়ী রয়েছে, সেহেতু তাদের ব্যাপারে إِسْم فَاعِلْ-এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা স্থায়ীত্বকে বুঝিয়ে থাকে।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হতে বুঝা যায় যে, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের আজাব সমান হবে। অথচ মুশরিকরা অতি পাপী : আয়াত إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الخ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের আজাব সমান হবে। অথচ আহলে কিতাব অপেক্ষা মুশরিকদের পাপ জঘন্য। মুফাসসিরগণ এর জবাবে বলেছেন যে, অত্র আয়াত হতে এটা বুঝা যায় যে, আহলে কিতাবের কাফের ও মুশরিকদের জন্য পরকালে চিরকালীন জাহান্নাম হবে। কিন্তু জাহান্নামে যে তাদের উভয়ের আজাব সমান হবে তা তো বলা হয়নি।

জাহান্নামে বিভিন্ন প্রকারের আজাব রয়েছে। সুতরাং হয়তো আহলে কিতাবকে লঘু আজাব দেওয়া হবে।

অথবা, এর জবাব এই যে, কাফের হওয়ার কারণে তাদের নেক আমলের কোনো মূল্যই আল্লাহর কাছে নেই। কাজেই মুশরিক ও কাফের সকলেই আল্লাহ তা'আলার নিকট সমান দোষী।

উভয় দলকে সমান শাস্তি প্রদানের কারণ : মুশরিকগণ একত্ববাদ, নবুয়াত এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করে। আর আহলে কিতাব এ সব কিছুকে স্বীকার করে। নবুয়তের ব্যাপারে শুধু মুহাম্মদ ﷺ -কে মানে না। এ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মুশরিকদের চেয়ে আহলে কিতাবদের অবাধ্যতা কম। এতদসত্ত্বেও উভয়ের শাস্তি সমান হবে বলে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এর জবাবে বলা যায় যে, উভয় দলের শাস্তি হবে– তা উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, কিন্তু উভয়ের শাস্তি সমান হবে– বুঝা যায় না। শাস্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন, বিভিন্ন দোষের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি রয়েছে। জেনার শাস্তি 'রজম', চুরির শাস্তি 'হাত কাটা', হত্যার শাস্তি কেসাস ইত্যাদি। অতএব, কাফির-মুশরিকদের অবাধ্যতা যেমন প্রকট, শাস্তিও হবে প্রকট। –[কাবীর]

ধমক এবং পুরস্কার প্রদানের মধ্যে সৌন্দর্য : প্রথমে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে ধমক প্রদান করেছেন। তারপর إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا হতে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। এতে সুন্দর এক ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য রয়েছে। যেমন, ধমক হলো ঔষধ সমতুল্য আর অঙ্গীকার হলো খাদ্য সমতুল্য। প্রথমে ঔষধ প্রয়োগ করে শরীরকে সুস্থ করতে হয়, তারপর খাদ্য দিলে শরীরের লাভ হয়; ঔষধ ছাড়া খাদ্য দিলে ক্ষতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ধমক দিয়ে ঔষধের কাজ করেছেন।

অথবা, চর্ম সংস্কারের পর-ই তা দ্বারা বিভিন্ন বস্তু তৈরি করা সম্ভবপর হয়। সংস্কার ছাড়া কোনো বস্তু তৈরি করতে চাইলে সে চর্ম ক্ষতি ছাড়া কোনো কিছু বহন করে আনবে না। তেমনিভাবে আল্লাহ মানুষকে ধমকের মাধ্যমে সংস্কার করে পুরস্কার ঘোষণা করতে চাচ্ছেন। –[কাবীর]

'জান্নাতে আদন'-এর অর্থ : عَدْن শব্দটি স্থায়িত্ব বুঝায়। যেমন বলা হয়েছে– لَا يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا এবং وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ -বর্ণিত আছে যে, جَنَّاتُ عَدْنٍ দ্বারা وَسَطُ الْجَنَّةِ তথা বেহেশতের মধ্যভাগকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে عدن শব্দটি مَعْدِنٌ তথা খনি হতে গৃহীত اَلْجَنَّةُ مَعْدِنُ النَّعِيْمِ وَالْاَمْنِ وَالسَّلَامَةِ অর্থাৎ বেহেশত নিয়ামত, নিরাপত্তা এবং শান্তির খনি। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

'জান্নাত' নামকরণ : جَنَّةٌ শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি মত দেখা যায়। সেগুলো আলোচনা করলে জান্নাতের নামকরণ সুস্পষ্ট হয়ে যায়–

১. اَلْجِنُّ হতে উৎপত্তি। জিন জাতি যেমনিভাবে এক মুহূর্তে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে থাকে, বেহেশতবাসীরাও তাদের প্রাপ্য জান্নাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

২. অথবা, جُنُوْنٌ থেকে উদ্ভূত, কেননা জান্নাতবাসীরা জান্নাতকে দেখার সাথে সাথে পাগলের মতো হয়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা পাগল হবে না।

৩. অথবা جَنَّةٌ [বাগান] থেকে উদ্ভূত, কেননা জান্নাত এমন গাছপালাযুক্ত আবাসস্থল হবে যেখানে কোনো রকম গরম এবং রৌদ্র পড়বে না।

৪. অথবা, جَنِيْنٌ থেকে উদ্ভূত, কেননা ব্যক্তি জান্নাতে চূড়ান্ত নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। তাকে না কোনো গরম স্পর্শ করবে, না কোনো ঠাণ্ডা। لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا সে جَنِيْنٌ তথা মায়ের পেটের সন্তানের মতো নিরাপদে থাকে। –[কাবীর]

رَضِيَ الرَّبُّ না বলে رَضِيَ اللّٰهُ বলার কারণ : আল্লাহ তা'আলার সকল গুণবাচক বিশেষ্য রেখে তাঁর মূল নাম اَللّٰهُ -কে উল্লেখ করার মধ্যে হিকমত হলো– اَللّٰهُ নামটি মানুষের মনে যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি করে তেমন তাঁর প্রতি সম্মানও সৃষ্টি করে কেননা এ নামটিই আল্লাহর 'যাত' তথা সত্তা এবং সকল গুণবাচক বিশেষ্যকে শামিল করে। যদি رَضِيَ الرَّبُّ বলা হতো, তাহলে বান্দার মধ্যে এতটুকু ভীতি এবং সম্মান সৃষ্টি হয় না, যা সৃষ্টি হয় رَضِيَ اللّٰهُ বললে। কেননা مُرَبِّيْ এমন একজন ব্যক্তি যে কম পেয়েও যথেষ্ট মনে করে; কিন্তু আল্লাহর সামান্য সম্মান যথেষ্ট নয়। সম্মান বলতে যা বুঝায় পূর্ণটাই তাঁর জন্য। –[কাবীর]

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ : সূরা আয-যিলযাল

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতের زُلْزِلَتْ শব্দ হতে এর নামকরণ করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ– **প্রকম্পিত**। এ সূরাতে কিয়ামত হওয়ার সময় সমস্ত পৃথিবী প্রকম্পিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৫টি বাক্য এবং ১০০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা নাজিলের স্থান ও সময়কাল নিয়ে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। ইবনে মাসউদ, আতা, জারীর ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখের মতে এটা মাক্কী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও এরূপ একটি শক্তিশালী অভিমত পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হযরত কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.)-এর মতে এটা মাদানী সূরা; কিন্তু এর বাচন-ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে কিয়ামত ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম তিনটি বাক্যে বলা হয়েছে– মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বারের জীবন কিভাবে হবে এবং কিভাবে মানুষের জন্য বিস্ময়ের উদ্রেককারী হবে? পরে দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে এই যে, জমিনের উপর থেকে নিশ্চিন্তভাবে সকল প্রকার কাজ করেছে এবং এ নিষ্প্রাণ-নির্জীব জিনিস কোনো এক সময় তার কাজকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, তা তার চিন্তায়ও কখনো আসেনি। অথচ তা-ই এক দিন আল্লাহর নির্দেশে কথা বলে উঠবে এবং কোন সময় কোথায় কি কাজ করে তাও বলে দিবে। সেদিন সকল মানুষ উত্থিত হবে এবং তাদের আমলের চুলচেরা হিসাব-নিকাশ হবে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। –[মা'আরেফুল কোরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ حُرِّكَتْ لِقِيَامِ السَّاعَةِ زِلْزَالَهَا تَحْرِيْكَهَا الشَّدِيْدَ الْمُنَاسِبَ لِعِظَمِهَا .

১. যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে কেঁপে উঠবে কিয়ামত সংঘটনের জন্য স্বীয় প্রকম্পনে প্রবলভাবে তার বিশালত্বের উপযোগী প্রকম্পন।

٢. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا كُنُوْزَهَا وَمَوْتَاهَا فَاَلْقَتْهَا عَلٰى ظَهْرِهَا .

২. আর পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে তন্মধ্যস্থিত খনিজ পদার্থ ও মৃতদেহসমূহকে বের করে উপরিভাগে ছুঁড়ে দিবে।

٣. وَقَالَ الْاِنْسَانُ الْكَافِرُ بِالْبَعْثِ مَا لَهَا اِنْكَارًا لِتِلْكَ الْحَالَةِ .

৩. আর মানুষ বলবে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী কাফের এর কি হলো? সে অবস্থার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে।

٤. يَوْمَئِذٍ بَدَلٌ مِنْ اِذَا وَجَوَابُهَا تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا تُخْبِرُ بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ .

৪. সেদিন এটা اِذَا হতে بَدَلٌ আর তার জওয়াব হলো, পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে তার পৃষ্ঠে কৃত যাবতীয় ভালো-মন্দ কাজের বিবরণ দিবে।

٥. بِاَنَّ بِسَبَبِ اَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا اَيْ اَمَرَهَا بِذٰلِكَ وَفِي الْحَدِيْثِ تَشْهَدُ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ بِكُلِّ مَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا .

৫. কারণ এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। তাকে এ প্রশ্নে আদেশ দান করবেন। হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সেদিন পৃথিবীর প্রত্যেক নর-নারী তার পৃষ্ঠে যা কিছু করেছে, সব কিছুরই সাক্ষ্য দান করবে।

٦. يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ مِنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ اَشْتَاتًا لا مُتَفَرِّقِيْنَ فَاَخَذَ ذَاتُ الْيَمِيْنِ اِلَى الْجَنَّةِ وَاَخَذَ ذَاتُ الشِّمَالِ اِلَى النَّارِ لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ اَيْ جَزَائَهَا مِنَ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ .

৬. সেদিন মানুষ বের হবে হিসাবের স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন দলে বিভক্তভাবে, সুতরাং ডানপন্থিগণ বেহেশতের দিকে অগ্রসর হবে, আর বামপন্থিগণ জাহান্নামের পথ ধরবে। কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে অর্থাৎ তার প্রতিফল বেহেশত বা জাহান্নাম।

٧. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ زِنَةَ نَمْلَةٍ صَغِيْرَةٍ خَيْرًا يَّرَهُ يَرَ ثَوَابَهُ.

৭. কেউ অণু পরিমাণ পুণ্য কর্ম করলে ক্ষুদ্র পিঁপড়ার সমান সে তা প্রত্যক্ষ করবে তার অধিকারী হবে।

٨. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ جَزَاءَهُ.

৮. আর কেউ অণু পরিমাণ পাপ করলে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে তার প্রতিফল ভোগ করবে।

তাহকীক ও তারকীব

إِذَا ও يَوْمَئِذٍ-এর মহল্লে ই'রাব : সূরার প্রথমে إِذَا এবং চতুর্থ আয়াতে يَوْمَئِذٍ-এর মহল্লে ই'রাব হলো মানসূব। কেননা, يَوْمَئِذٍ শব্দটি إِذَا হতে بَدَلٌ হয়েছে এবং إِذَا শব্দটি تُحَدِّثُ ক্রিয়ার মাফউলে ফীহ অর্থাৎ যরফ হয়েছে। অথবা زُلْزِلَتْ-এর মাফউলে ফীহ। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا : إِذَا শর্তিয়া, زُلْزِلَتْ ফে'য়েলে মাজহুল, اَلْأَرْضُ মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়িলুহু, زِلْزَالَ মাফউলে মুতলাক, هَا যমীর أَرْضُ-এর দিকে ধাবিত। وَأَخْرَجَتِ الخ জুমলায়ে মা'তূফা زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ-এর উপর। وَقَالَ الخ মা'তূফ হয়েছে زُلْزِلَتْ-এর উপর।

قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا : قَالَ ফে'ল, اَلْإِنْسَانُ ফা'য়েল, مَا ইস্তিফহামিয়া মুবতাদা, لَهَا খবর, আর জুমলায়ে ইস্তিফহামিয়া قَالَ-এর মাফউল। উল্লিখিত সকল বাক্যগুলো শর্তের অন্তর্ভুক্ত। এর জওয়াব يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ الخ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় নেক্কার ও বদকার লোকদের কর্মের বিবরণ স্থান পেয়েছে, আর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, সৌভাগ্য তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে জীবন যাপন করে। আর এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কবে হবে? অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে কে ভাগ্যবান আর কে হতভাগ্য। সেদিন সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে। সেদিন প্রত্যেকে তার আমল দেখতে পাবে। –[নূরুল কোরআন]

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الخ-এর শানে নুযূল : হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতদ্বয় দুই দল মুসলমানকে উপলক্ষ্য করে নাজিল হয়েছে। আয়াত يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ নাজিল হওয়ার পর একদল মুসলমানের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে, অল্প-স্বল্প দান করা হলে তার পুরস্কার পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে অপর একদল মুসলমান মনে করতে লাগল যে, ছোট ছোট গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করবেন না। কেবল কবীরা গুনাহকারীদেরকেই শাস্তি দেওয়া হবে। তখন তাদের ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য এ আয়াত দু'টি নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا : زَلْزَلَةٌ-এর অর্থ হলো– পর পর প্রবলভাবে নাড়া দেওয়া, প্রকম্পিত করা। সুতরাং زُلْزِلَتْ-এর অর্থ হবে– 'পৃথিবীকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে দেওয়া হইবে।' এখানে গোটা পৃথিবীকে আন্দোলিত করার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর উক্ত কম্পনের তীব্রতা প্রকাশ করার জন্য زِلْزَالَهَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, পৃথিবীর ন্যায় এক বিরাট গোলককে যেমনভাবে কাঁপাতে হয় ঠিক সেভাবে তাকে প্রকম্পিত করা হবে। কতিপয় তাফসীরকারের মতে কিয়ামতের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হলে যে 'কম্পন' হবে এটা সে 'কম্পন'। তবে মুফাসসিরদের একটি বড় দলের মতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলে যে কম্পন হবে, এটা সে কম্পন। অর্থাৎ এটা পুনরুত্থানের পরের ঘটনা। এ দ্বিতীয় মতটি অধিকতর সহীহ। কেননা, পরবর্তী সব কথাই এ পর্যায়কে বুঝায়।

এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমার বংশধরদের মধ্য হতে

দোজখের অংশ প্রেরণ কর। তখন হযরত আদম (আ.) আরজ করবেন, দোজখের অংশ কি? তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন, শুধু একজন অবশিষ্ট থাকবে, এ কথা শ্রবণ করে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাত হয়ে যাবে। মানুষকে দেখা যাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাঁপছে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং আল্লাহর আজাবই হবে অত্যন্ত কঠিন। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا : আয়াত وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا [আর জমিন তার বোঝাসমূহ বের করে দিবে।] এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. মৃত মানুষ মাটির মধ্যে যেরূপে ও যে অবস্থায় পড়ে থাকুক না কেন, পৃথিবী তা সবই বের করে দিবে।

২. কেবল মৃত মানুষকে বাইরে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হবে না; তাদের পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত কাজকর্ম, কথাবার্তা ও গতিবিধির সাক্ষ্যের যে স্তূপ মাটির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে সে সবকেও তা বাইরে নিক্ষেপ করবে।

৩. স্বর্ণ, রৌপ্য, হিরা, জহরত ও মাটির বুকে গচ্ছিত অন্যান্য সমস্ত সম্পদ স্তূপে স্তূপে বাইরে বের করে দিবে। সেদিন মানুষ আফসোস করে বলবে যে, এ সব বস্তুর জন্য আমরা দুনিয়ার জীবনে কত-না কিছু করেছি। অথচ আজ তা আমাদের কোনো কাজেই আসছে না।

تُحَدِّثُ-এর দু'মাফউল : تُحَدِّثُ ক্রিয়ার প্রথম মাফউল উহ্য রয়েছে। তা হলো اَلْخَلْقَ আর দ্বিতীয় মাফউল হলো اَخْبَارَهَا মূলবাক্য এভাবে হবে– تُحَدِّثُ الْخَلْقَ اَخْبَارَهَا

জমিনের সংবাদ বর্ণনার অর্থ : জমিনের সংবাদ বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, মানুষ এ ভূ-পৃষ্ঠের উপর যা কিছু বলেছে ও করেছে, তা ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের ইথার আবিষ্কারের পূর্বে মানুষের নিকট এ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অজানাই ছিল। মানুষ এ দুনিয়াতে যা কিছু করে ও বলে, তা সবই অণু-পরমাণু ও বাতাসের ইথারের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমান যুগের রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডের দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ কর্তৃক মানুষের কথা ও কার্যাবলি ভূমির মুখে বর্ণনা দেওয়া কোনো কষ্টকর ব্যাপার নয়। আল্লাহর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই টেপরেকর্ডের ন্যায় ব্যক্তির আমলের বিবরণ মানুষ ভূমির মুখে শুনতে পাবে। এমনকি, মানুষ যদি অতিশয় গোপন স্থানে গিয়ে কোনো কাজ করে, সে স্থানেরও ছবি তুলে রাখা আল্লাহর পক্ষে কষ্টকর নয়। বর্তমান যুগের শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মির তুলনায় অনেক শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মি আল্লাহর নিকট বর্তমান স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিটি কাজের ছবি আল্লাহ তা'আলা তুলে রাখছেন, যেন আদালতের বিচারের সময় ছবি ও ভূমির টেপরেকর্ড দ্বারা আসামীর সম্মুখে তার আমল তুলে ধরা যায়। শুধু এটাই নয়, কিয়ামতের দিন স্বয়ং মানুষের হাত-পা যে তার আমলের সাক্ষ্য দিবে, তার বর্ণনাও সূরা ইয়াসীনসহ অনেক স্থানেই বিদ্যমান। অতএব, ভূমির মুখে মানুষের আমলের সংবাদ বর্ণনা হওয়া যে অদ্ভুত কোনো কথা নয়, তা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম ﷺ এ আয়াত يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا পাঠ করে বললেন– তোমরা কি জান, তার সংবাদ কি? সাহাবীগণ বললেন– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– সেদিন প্রত্যেক বান্দা ভূ-পৃষ্ঠের উপর থেকে যা কিছু বলেছে ও করেছে তা ভূমি নিজ মুখে বর্ণনা করবে যে, সে অমুক অমুক কাজ করেছে।

–[তিরমিযী, নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ]

اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে মানুষ বলে প্রত্যেকটি মানুষকেই বুঝানো হতে পারে। কেননা পুনরুজ্জীবিত হয়ে চেতনা লাভ করতেই প্রত্যেকটি মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে, এ সব কি হচ্ছে? তবে পরে জানতে পারবে যে, এটা হাশরের মাঠ, যাকে অসম্ভব মনে করত, তা-ই তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কারণে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে। অবশ্য মু'মিনদের এমন অবস্থা হবে না। কেননা যা-ই ঘটতে যাবে, তা-ই তাদের বিশ্বাসের অনুকূলে হবে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এখানে اَلْاِنْسَانُ দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা বিশ্বাস করত না যে, তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে। এ জন্য তারা কবর থেকে উঠে এ কথা বলবে। আর মু'মিনগণ বলবে, এটি সে অবস্থা যার অঙ্গীকার করেছিলেন আল্লাহ, আর নবী-রাসূলগণ এর সত্যতার সংবাদ দিয়েছিলেন। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا : সেদিন জমিন মানুষের কার্যকলাপের বিবরণ পেশ করবে। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর আদেশ প্রদান করবেন।

অথবা, এর ব্যাখ্যা হলো, মানুষ যখন প্রশ্ন করবে জমিনের কি হলো সে সব গোপন কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে? তারই জবাবে জমিন বলবে– আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন, তাই আমি এ কাজ করছি। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ "يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا" : -এর অর্থ : এ উক্তির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী উপস্থিত হবে। যেমন, সূরা আনআমে বলা হয়েছে– 'এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সম্পূর্ণ একাকী আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ, যেমন আমি তোমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছি।'

২. যারা হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুবরণ করেছে, পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকা হতে তারা দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন, সূরায়ে নাবা-এ বলা হয়েছে– যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তোমরা দলে দলে উপস্থিত হবে।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি অর্থ দেখা যায়। যেমন–

৩. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ হাশরের ময়দানে সুন্দর কাপড় পরে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে উঠবে। তখন আওয়াজ আসতে থাকবে যে, এরা আল্লাহর ওলী। আরেকদল কালো-মলিন চেহারায় উলঙ্গ শরীর নিয়ে গলদেশে শিকল পরে উঠবে। তখন আওয়াজদাতা আওয়াজ দিবে যে, এরা আল্লাহর শত্রুদল।

৪. প্রত্যেক দল স্বজাতীয়দের সাথে উঠবে। যেমন - ইহুদি ইহুদিদের সাথে, খ্রিস্টান খ্রিস্টানদের সাথে। –[কাবীর]

لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ -এর অর্থ : উল্লিখিত ৬ নং আয়াতে হাশরের দিন মানুষকে তাদের কৃতকর্ম অবলোকনের কথা বলা হয়েছে। এর দু'টি তাৎপর্য হতে পারে। একটি এই যে, প্রত্যেক মানুষকে তাদের আমল দেখানো হবে এবং বলে দেওয়া হবে। এর দ্বারা আমলনামা প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন, সূরা হাক্কাহ-এর ১৯ নং ও ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কাফের-মু'মিন সকলের হাতেই তাদের আমলনামা দেওয়া হবে। সূরা ইনশিক্বাক্বে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণকে ডান হস্তে আমলনামা দেওয়া হবে এবং কাফেরগণকে পিছন দিক হতে আমলনামা দেওয়া হবে। –[আয়াত ৭ – ২০]

দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, হাশরের দিন তাদেরকে নিজ নিজ আমলের প্রতিদান অবলোকন করানো হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فَمَنْ يَّعْمَلْ .... شَرًّا يَّرَهٗ -এর মর্মার্থ : এ আয়াতের মর্মার্থ হিসাবে মুফাসসিরগণ নিম্নরূপ মত পেশ করেন–

১. আহমদ ইবনে কা'ব বলেন–فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَهُوَ كَافِرٌ فَاِنَّهٗ يَرٰى ثَوَابَ ذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَلْقَى الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ কোনো কাফের ব্যক্তি সামান্য ভালো কাজ করলে তার ছওয়াব মৃত্যু পর্যন্ত পেতে থাকবে। আখেরাতে কিছুই পাবে না। এ অর্থটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মু'মিন হোক আর কাফের হোক খারাপ করুক আর ভালো করুক, সবকিছু আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন। অতঃপর আল্লাহ মু'মিনের গুনাহ মাফ করে দিবেন, আর ভালো কাজের ছওয়াব দিবেন। আর কাফেরদের ছওয়াব ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং পাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।

৩. যদিও কাফেরদের ভালো কাজ কুফর কর্তৃক মিটিয়ে দেওয়া হবে; কিন্তু তুলনা করার জন্য পেশ করা হবে। এমনিভাবে মু'মিনদের পাপও পেশ করা হবে। যেন বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহ কতটুকু গুনাহের কারণে কাফেরকে পাকড়াও করেছেন এবং কতটুকু পাপ কাজ মু'মিনদের থেকে মিটিয়ে দিয়েছেন। –[কাবীর]

বস্তুত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো, মহান আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ছোট পাপেরও শাস্তি প্রদান করতে পারেন। আর তাঁর মর্জি হলে বড় বড় পাপও ক্ষমা করে দিতে পারেন। এটা সম্পূর্ণই তাঁর ব্যাপার। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْعَادِيَاتِ : সূরা আল-'আদিয়াত

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম اَلْعٰدِيٰتُ [আল-'আদিয়াত] শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ৩৩টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা মক্কী কি মাদানী, এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. হযরত ইবনে মাসউদ, জারীর, হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এক মত অনুযায়ী এটা মাক্কী সূরা।

খ. হযরত আনাস (রা.), কাতাদাহ (র.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্য মত অনুযায়ী এটা মাদানী সূরা। তবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে এটা মাক্কী সূরা হওয়াই প্রতীয়মান হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে পরকাল অবিশ্বাসের পরিণাম যে কত ভয়াবহ ও মারাত্মক হতে পারে এবং মহা-বিচারের দিন মানুষের আমল সহ মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ হবে, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে।

এ আলোচনায় তদানীন্তন মরু আরবের মানুষের জুলুম, অত্যাচার ও অবিচার এবং মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেকালে মানুষ সামাজিক জীবনে যে চরম দুর্ভোগ পোহাত, এক গোত্র অপর গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে চড়াও হয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ এবং তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে দাসী বানাত– এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তখন মানব জীবনের কোনোই নিরাপত্তা ছিল না। পারস্পরিক হানাহানি, লাঠালাঠি, লড়াই, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কার্যাবলি, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও অবিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি– তাই প্রকারান্তরে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত একটি দৃশ্যের পটভূমিকায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতার অপচয় ঘটিয়ে তাঁর না-শোকরী করছে। ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তির লোভে অন্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের জেনে রাখা উচিত ছিল যে, কবর হতে তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে। আর তাদের যাবতীয় কাজ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হবে। শুধু কার্যগুলোর রেকর্ডই উপস্থিত করা হবে না; বরং কার্যের কারণ ও মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়ামতসমূহের বাস্তব রেকর্ড উপস্থিত করে তার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের পরই তাদের জন্য রায় ঘোষণা করা হবে। কারো প্রতি বিচারের বেলায় পক্ষপাতিত্ব ও জুলুমের আশ্রয় নেওয়া হবে না। সকলের প্রতিই ন্যায় ও ইনসাফের নীতি কার্যকর থাকবে। সুতরাং মানুষের উচিত পরকালের মহাবিচার দিনের ভয়াবহতার কথাটি নিজেদের হৃদয়ে জাগ্রত রাখা এবং সে বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। অন্যথায় তাদের জীবনে কালো অমানিশা আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالْعٰدِيٰتِ اَلْخَيْلُ تَعْدُوْ فِى الْغَزْوِ وَتَضْبَحُ ضَبْحًا هُوَ صَوْتُ اَجْوَافِهَا اِذَا عَدَتْ ـ

১. শপথ ধাবমান অশ্বরাজির ঘোড়াসমূহ, যারা রণাঙ্গনে ছুটে চলে যখন সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে দৌড়ানোর সময় অশ্ব হতে যে হাঁপানোর শব্দ শুনা যায়, তাকে ضَبْح বলা হয়।

٢. فَالْمُوْرِيٰتِ اَلْخَيْلِ تُوْرِى النَّارَ قَدْحًا بِحَوَافِرِهَا اِذَا سَارَتْ فِى الْاَرْضِ ذَاتِ الْحِجَارَةِ بِاللَّيْلِ ـ

২. অনন্তর যারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। ঘোড়া যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে ক্ষুরাঘাত দ্বারা রাত্রিকালে প্রস্তরযুক্ত জমিনের উপর চলার সময় তার পায়ের খুরের আঘাতে আগুন ছুটে।

٣. فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا اَلْخَيْلُ تُغِيْرُ عَلَى الْعَدُوِّ وَقْتَ الصُّبْحِ بِاِغَارَةِ اَصْحَابِهَا ـ

৩. অতঃপর যারা অভিযানে বের হয়, প্রভাত কালে অশ্বারোহীগণসহ প্রত্যূষে ঘোড়া শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

٤. فَاَثَرْنَ هَيَّجْنَ بِهٖ بِمَكَانِ عَدْوِهِنَّ اَوْ بِذٰلِكَ الْوَقْتِ نَقْعًا غُبَارًا بِشِدَّةِ حَرَكَتِهِنَّ ـ

৪. তখন উৎক্ষিপ্ত হয় উড়ায় তা দ্বারা তাদের দৌড়ানোর স্থানে বা দৌড়ানোর সময় ধূলিকণা ঘোড়ার ক্ষীপ্রগতিতে ছুটার কারণে ধূলিকণা উড়ে।

٥. فَوَسَطْنَ بِهٖ بِالنَّقْعِ جَمْعًا مِنَ الْعَدُوِّ اَىْ صِرْنَ وَسَطَهٗ وَعَطَفَ الْفِعْلَ عَلَى الْاِسْمِ لِاَنَّهٗ فِىْ تَاوِيْلِ الْفِعْلِ اَىْ وَاللَّاتِىْ عَدَوْنَ فَاَوْرَيْنَ فَاَغَرْنَ ـ

৫. অতঃপর তা সহ অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে ধূলিকণা উড়িয়ে শত্রুদলের শত্রুবাহিনীর অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এখানে فِعْل-কে اِسْم-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। কেননা, সে اِسْم টি فِعْل-এর تَاوِيْل হয়েছে। অর্থাৎ وَاللَّاتِىْ عَدَوْنَ فَاَوْرَيْنَ فَاَغَرْنَ শপথ সে সকল অশ্বের যারা ক্ষীপ্রবেগে ছুটে চলে, অতঃপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে এবং অনন্তর শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করে।

٦. اِنَّ الْاِنْسَانَ اَيِ الْكَافِرَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ لَكَفُوْرٌ يَجْحَدُ نِعْمَتَهٗ تَعَالٰى ـ

৬. অবশ্যই মানুষ অর্থাৎ কাফের তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ অবাধ্যাচারী, সে আল্লাহর অনুগ্রহরাজিকে অস্বীকার করে।

٧. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ اَىْ كَنُوْدِهٖ لَشَهِيْدٌ يَشْهَدُ عَلٰى نَفْسِهٖ بِصُنْعِهٖ ـ

৭. এবং সে অবশ্যই তদুপর অর্থাৎ তার অকৃতজ্ঞতার উপর অবহিত স্বীয় কাজের দ্বারা সে নিজের উপর নিজেই সাক্ষী।

٨. وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ اَىِ الْمَالِ لَشَدِيْدٌ اَىْ لَشَدِيْدُ الْحُبِّ لَهٗ فَيَبْخَلُ بِهٖ ـ

৮. এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে সম্পদের অতিশয় প্রবল অর্থাৎ সম্পদের প্রতি তার অত্যাসক্তির কারণে সে কার্পণ্য করে।

٩. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ اُثِيْرَ وَاُخْرِجَ مَا فِى الْقُبُوْرِ مِنَ الْمَوْتٰى اَىْ بُعِثُوْا ـ

৯. তবে কি সে জানে না যে, যখন উত্থিত হবে উপড়িয়ে বের করা হবে যা কিছু কবরসমূহে রয়েছে অর্থাৎ মৃতগণ, তাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থান করা হবে।

١٠. وَحُصِّلَ بُيِّنَ وَاُفْرِزَ مَا فِى الصُّدُوْرِ الْقُلُوْبِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ ـ

১০. আর প্রকাশ করা হবে ব্যক্ত ও প্রকাশিত করা হবে যা কিছু অন্তরে রয়েছে অর্থাৎ অন্তরে কুফর ও ঈমান যা আছে।

١١. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ لَعَالِمٌ فَيُجَازِيْهِمْ عَلٰى كُفْرِهِمْ اُعِيْدَ الضَّمِيْرُ جَمْعًا نَظْرًا لِمَعْنَى الْاِنْسَانِ وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ دَلَّتْ عَلٰى مَفْعُوْلِ يَعْلَمُ اَىْ اِنَّا نُجَازِيْهِ وَقْتَ مَا ذُكِرَ وَتَعَلَّقَ خَبِيْرٌ بِيَوْمَئِذٍ وَهُوَ تَعَالٰى خَبِيْرٌ دَائِمًا لِاَنَّهٗ يَوْمُ الْمُجَازَاةِ ـ

১১. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে সেদিন সবিশেষ অবহিত অবশ্যই জ্ঞাত এবং তাদের কুফরির জন্য তাদেরকে শাস্তি দান করবেন। اِنْسَانَ-এর প্রতি ضَمِيْر جَمْع বা বহুবচনীয় সর্বনাম অর্থের দিক বিচারে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর এ বাক্যটি يَعْلَمُ-এর مَفْعُوْل নির্দেশ করছে অর্থাৎ اِنَّا نُجَازِيْهِ وَقْتَ مَا ذُكِرَ উল্লিখিত সময়ে আমি তাদেরকে প্রতিফল দান করবো। আর خَبِيْرٌ-এর সম্পর্ক يَوْمَئِذٍ-এর সাথে, কেননা সেদিন প্রতিফল দানের দিন। যদিও আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই অবহিত।

তাহকীক ও তারকীব

ضَبْحًا-এর মহল্লে ই'রাব : বসরীদের নিকট ضَبْحًا শব্দটি 'হাল' হিসাবে মানসূব হয়েছে। কারো মতে, এটা মাসদার তবে 'হাল' হিসেবে মানসূব হয়েছে। আবূ উবায়দা বলেন, মূলবাক্য ছিল- ضَبَحَتِ الْخَيْلُ ضَبْحًا -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ "فَاَثَرْنَ" : فَاَثَرْنَ এটা جَمْع مُؤَنَّث غَائِبْ মাযীর সীগাহ اِثَارَةٌ মাসদার। অর্থ- ধূলি উড়ানো, জোশ মারা, উত্তেজিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। اَثَرْنَ মূলে اَثْوَرْنَ (আছওয়ারনা) ছিল। وَاوْ-এর হরকত উচ্চারণ কষ্ট বিধায় পূর্ববর্তী সাকিন হরফে দেওয়া হয়েছে। আর و-কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর দু'টি সাকিন একত্র হওয়ায় আলিফটি বিলুপ্ত করা হয়েছে اَثَرْنَ হয়েছে। জিনসে اَجْوَف وَاوِىْ এ বাক্য اَلْعٰدِيٰتِ-এর উপর আতফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ এ জীবনে ভালো-মন্দ যে কাজই করুক না কেন আর তা যত সামান্যই হোক, তার পরিণতি পরকালে অবশ্যই দেখতে পাবে। আর অত্র সূরায় ইরশাদ হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। কেননা সে অর্থ-সম্পদের মোহে মত্ত। এ কারণেই সে তার প্রতিপালককে ভুলে তাঁকে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অমনোযোগী থাকে। অথচ তাকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে তার এ জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটি নাজিলের কারণ : নবী করীম ﷺ বনূ কেনানা গোত্রের বিরুদ্ধে কতিপয় সাহাবীকে পাঠালেন। তাঁদের আমীর ছিলেন মুনযির ইবনে আমর আনসারী। তাঁরা প্রত্যাবর্তন করতে বিলম্ব করেছিলেন। এ সুযোগে মুনাফিকগণ বলতে লাগল- তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তখন সাহাবীদের নিরাপদ থাকার খবর দিয়ে আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ "وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا" : اَلْعَادِيَاتِ শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে- ধাবমান, দ্রুত গমনকারী। আর ضَبْحًا শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁপানো ও হ্রেষাধ্বনি। সুতরাং শব্দ দু'টির সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে- ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁপিয়ে ধাবমানকারী জন্তু। তাফসীরকারদের মধ্যে এ জন্তু দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এবং তার নামে শপথ করার কারণ কি এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। একদল তাফসীরকার মনে করেন, তা দ্বারা হজের সময় মিনা ও মুযদালিফার ধাবমানকারী উষ্ট্রের কথা বুঝানো হয়েছে। অপর অভিমতে পাওয়া যায় যে, তা দ্বারা ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা জীব-জন্তুর মধ্যে হাঁপিয়ে ও হ্রেষাশ্বাসে দ্রুত চলার অভ্যাস রয়েছে ঘোড়া, কুকুর ও গাধার। আর অন্য কোনো জন্তু এরূপ করে না। এ ছাড়া পরবর্তী আয়াতসমূহের বিবরণ ও আলোচনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, তা দ্বারা ঘোড়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে দু'টি কঙ্করের সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে এবং ঘোড়ায় চড়েই শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়।

২ ও ৩নং আয়াতের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে ঘোড়ার কথাই বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ অভিমতই পোষণ করেন। -[কুরতুবী]

* হযরত আলী (রা.) বলেছেন- اَلْعٰدِيٰتِ শব্দ দ্বারা হাজীদের সে উটগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আরাফাহ থেকে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত দৌড়ে থাকে, তবে ঘোড়ার মতোই অধিক গ্রহণীয়। -[নূরুল কোরআন]

اَلْعٰدِيٰتِ দ্বারা কসম করার কারণ : উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়ার চলমান দৃশ্য এবং তা ব্যবহারের উদ্দেশ্যটির কথা প্রকাশ করে তার নামেই শপথ করেছেন। সুতরাং এ অবস্থাটি কি ছিল এ বিষয়েও তাফসীরকারগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেন- আল্লাহ তা'আলা এটা দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঘোড়ার সহায়তায় অভিযান পরিচালনের কথা বলেছেন, কিন্তু এ ব্যাখ্যা- শপথের জবাবে ৬ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার সাথে খাপ খায় না; বরং আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মানুষ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ। তারা ধন-সম্পদে বড়োই কৃপণ। এখানে জিহাদের জন্য আত্মত্যাগ করতে গিয়ে এবং ধন-সম্পদ ব্যয় করে মু'মিন লোক কিভাবে অকৃতজ্ঞ ও কৃপণ হতে পারে, এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়; কিন্তু আরেকদল তাফসীরকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা দ্বারা শপথের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় এবং কোনো প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় না। জাহিলিয়া যুগের মারামারি, কাটাকাটি, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের রমণীকে দাসী বানিয়ে রাখার এবং প্রতিশোধ গ্রহণের, পারস্পরিক ঝগড়া-কলহের কথার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল প্রভাত হওয়ার পূর্বে শত্রুর উপর আঘাত হানা, যাতে শত্রু প্রতিরক্ষার কোনো সুযোগ না পায়। এটা মানুষের জন্য শক্তির অপচয় ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার, অকৃতজ্ঞতারই শামিল। অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে লুণ্ঠন করা, তাদের রমণীগণকে দাসী বানিয়ে রাখা নিতান্তই ন্যক্কারজনক কাজ। শপথের জবাবে এ কথাগুলো বলা হয়েছে।

اَلْمُوْرِيٰتِ-এর অর্থ : اَلْمُوْرِيٰتِ শব্দটি اَلْاِيْرَاءُ মাসদার হতে নির্গত। অর্থ- অগ্নি নির্গত হওয়া। যেমন, দিয়াশলাই হতে অগ্নি বের করা হয়। শব্দ দ্বারা ঘোড়াগুলোর রাত্রিকালীন দৌড়ের কথা-ই বুঝানো হয়েছে। কেননা পাথরের সাথে ক্ষুরের তীব্র ঘর্ষণে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কেবল রাত্রি বেলাই পরিদৃশ্যমান হয়ে থাকে- দিনের বেলায় তা দেখা যায় না।

اَلْقَدْحُ-এর অর্থ : قَدْحٌ শব্দের মূল অর্থ- বের করা। যেমন বলা হয়- قَدَحْتُ الْعَيْنَ অর্থাৎ আমি চক্ষু বের করেছি। অর্থাৎ চক্ষু থেকে যখন দূষিত পানি বের করা হয় তখন উক্ত বাক্য বলা হয়। আর قَدَّاحٌ বলা হয় সে পাথরকে, যে পাথর আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে। -[কুরতুবী]

فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا-এর অর্থ : اَلْمُغِيْرَاتِ শব্দটি اَلْاِغَارَةُ হতে নির্গত। اَلْاِغَارَةُ অর্থ- আক্রমণ করা। আর صُبْحٌ অর্থ- সকালবেলা, ভোরবেলা। আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোনো জনবসতির উপর আক্রমণ চালাতে হলে তারা রাতের অন্ধকারে লক্ষ্য স্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে যেত। যেন শত্রুপক্ষ কিছুমাত্র টের পেতে না পারে এবং সাত সকালে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। যেন সকাল বেলার আলোর মধ্যে সকল কিছু দেখা যায়। আর দিনও যেন এতটা উদ্ভাসিত হয়ে না উঠে যে, শত্রুপক্ষ দূর হতেই তাদেরকে আসতে দেখতে পারে এবং প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। -[কুরতুবী, কাবীর]

নবী করীম ﷺ যে অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন, তিনি লক্ষ্য করতেন যে, এ জনবসতিতে ফজরের আজান হয় কিনা? যদি আজানের শব্দ হতো তবে অভিযান পরিচালিত হতো না। যদি আজানের শব্দ না হতো, তবে ভোর হওয়ার পর অভিযান পরিচালনা করা হতো। -[নূরুল কোরআন]

بِهٖ-এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল : فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا আয়াতের মধ্যে بِهٖ-এর সর্বনাম ইমাম ফাররা -এর নিকট مَوْضِعُ الْاِغَارَةِ তথা আক্রমণের স্থানের দিকে ফিরেছে। কারো মতে وَقْتُ الْاِغَارَةِ তথা আক্রমণের সময়ের দিকে ফিরেছে। ইমাম কিসাঈ-র মতে عَدُوٌّ বা শত্রুর দিকে ফিরেছে। -[কাবীর]

نَقْعًا-এর অর্থ : আবূ উবায়দার মতে نَقْعٌ শব্দের অর্থ رَفْعُ الصَّوْتِ বা উচ্চৈঃস্বর। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে نَقْع অর্থ- ধূলি-বালি। তবে আয়াতের এ অর্থটিই বেশি নিকটতম।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন, نَقْع হলো মুযদালিফা এবং মিনা-র মধ্যবর্তী স্থান। কারো মতে গিরিপথ, কারো মতে نَقْع হলো জলাশয়। -[ফাতহুল কাদীর]

فَوَسَطْنَ بِهٖ-এর মধ্যকার ه-এর মারজি' : ইমাম মুকাতিল (র.) বলেন, ه-এর মারজি' হলো اَلْعَدُوُّ কেননা পূর্বের وَالْعَادِيَاتِ-এর মধ্যে عَدْو শব্দটি রয়েছে। কারো মতে, এর মারজি' হলো اَلنَّقْعُ -[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ : অর্থাৎ মানুষ তার প্রভুর বড়ো অকৃতজ্ঞ। আর এ কথা বলার জন্যই ঘোড়ার শপথ করা হয়েছে। বস্তুত সূরায় প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতে যে শপথ করা হয়েছে তা দ্বারা তদানীন্তন আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত মারামারি ও লুটতরাজের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রাক-ইসলাম-জাহেলিয়াতের কালে রাত একটা ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হতো। এ সময় প্রত্যেক গোষ্ঠী ও জনবসতির লোকেরাই শত্রুর আক্রমণের ভয়ে সদা কম্পমান হয়ে থাকত। তখনকার আরব সমাজে গোত্রে গোত্রে কেবল প্রতিশোধমূলক যুদ্ধই হতো না, ধন-সম্পদ লুট, চতুষ্পদ জন্তু তাড়িয়ে নেওয়া, ধৃত নারী ও শিশুদের দাস বানাবার উদ্দেশ্যও এক গোত্র অপর গোত্রের উপর অতর্কিত হামলা করে বসত। এ জুলুম-পীড়ন ও লুটতরাজ সাধারণত ঘোড়ায় চড়েই করা হতো।

উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মানুষ তার প্রভুর বড়ো অকৃতজ্ঞ। মানুষ পারস্পরিক মারামারি ও যুদ্ধ-লুণ্ঠনের কাজে যে শক্তি ব্যয় করছে, তা এ কাজে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দান করেননি। কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত এ সব উপায়-উপকরণ, শক্তি-সামর্থ্য ও সাহস-কৌশল আল্লাহর প্রিয় এ দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির কাজে ব্যয় করা বাস্তবিকই অতি বড় অকৃতজ্ঞতার কাজ। এটা অপেক্ষা বড় অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে?

كَنُوْد-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : كَنُوْد-এর আভিধানিক অর্থ হলো- অকৃতজ্ঞ, কৃপণ ইত্যাদি। এখানে كَنُوْد দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, كَنُوْد-দ্বারা কাফের ও আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকারকারীকে বুঝানো হয়েছে।

খ. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাপী।

গ. অথবা, বিপদে পড়ে নিরাশাজনিত কারণে যারা আল্লাহর নিয়ামত বিস্মৃত হয়ে যায়-তাদের কথা বলা হয়েছে।

ঘ. অথবা, এর দ্বারা স্বল্প কল্যাণের কথা বুঝানো হয়েছে।

ঙ. অথবা, এর দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি সম্পর্কে যথাযথ পাত্রে ব্যবহার না করে এর অপব্যয় করে থাকে-যা চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল।

اَلْاِنْسَانَ দ্বারা এখানে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : আয়াত اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ-এর মধ্যে اَلْاِنْسَانَ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটা দ্বারা কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এটাই জমহুরের মত।

খ. অন্য একদল মুফাসসিরের মতে, এটা দ্বারা সকল পাপীকেই বুঝানো হয়েছে। -[কুরতুবী]

اِنَّهٗ-এর যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থল : اِنَّهٗ-এর মধ্যকার সর্বনামটি পিছনে উল্লিখিত اَلْاِنْسَانَ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন মূলবাক্য হবে وَاِنَّ الْاِنْسَانَ عَلٰى كَنُوْدِهٖ لَشَهِيْدٌ অর্থাৎ মানুষ তার সে কৃপণতার উপর অথবা অকৃতজ্ঞতার উপর নিজেই সাক্ষী।

অথবা, সর্বনামটি পিছনে উল্লিখিত لِرَبِّهٖ-এর رَبّ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা رَبّ শব্দটি নিকটবর্তী, আর নিকটবর্তী বস্তুর প্রতি সর্বনামের প্রত্যাবর্তন বেশি যুক্তিযুক্ত। এমতাবস্থায় এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে وَعِيْد ধমক উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ "তিনি রব-ই তাদের অকৃতজ্ঞতার উপর সাক্ষী।" -[কাবীর]

অথবা, এর অর্থ হলো, মানুষ যে অকৃতজ্ঞ অবাধ্য সে নিজেই নিজের সাক্ষী। -[নূরুল কোরআন]

اَلْخَيْر-এর অর্থ : আরবি ভাষায় اَلْخَيْر শব্দটির অর্থ খুব ব্যাপক। বিভিন্ন স্থানে তার বিভিন্ন মর্ম গ্রহণ করা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো– কল্যাণ ও মঙ্গল; কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে তা দ্বারা ধন-সম্পদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষ কল্যাণ ও মঙ্গলের মহব্বতে খুব কঠিন।' কঠিন ও কৃপণ হওয়া কেবল ধন-সম্পদের ক্ষেত্রেই হয়– কল্যাণ ও মঙ্গলের বেলায় কঠিন ও কৃপণ কথাটি খাটে না। যেমন, সূরা বাক্বারার ১৮০ নম্বর আয়াতে خَيْر শব্দটি ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ" : মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াতের কয়েকটি অর্থ করেছেন।

১. إِنَّهُ لِأَجْلِ حُبِّ الْمَالِ لَبَخِيْلٌ مُمْسِكٌ অর্থাৎ সে মানুষ ধন-সম্পদকে বেশি পছন্দ করার কারণে অত্যন্ত কৃপণ সঞ্চয়কারী।

২. অথবা, "সে মাল-ধন তালাশে খুব-ই শক্ত এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও ইবাদতে অত্যন্ত দুর্বল।"

৩. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, "সে ধন-মালকে পছন্দ করে। এটাও পছন্দ করে যে, সব সময় যেন সে মালকে পছন্দনীয় বস্তুর মধ্যে শামিল রেখেতে পারে।" –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

সম্পদকে خَيْر বলার কারণ : ইবনে যায়েদ বলেন– আল্লাহ সম্পদকে خَيْر বা কল্যাণ বলেছেন। সে যুগ বেশি দূরে নয় যে, এ সম্পদ অকল্যাণ হয়ে দাঁড়াবে; কিন্তু মানবসমাজ তাকে সকল কল্যাণের আধার মনে করে, এ কারণে তিনিও তাকে কল্যাণ বলে নাম রেখেছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

مَنْ فِى الْقُبُوْرِ-এর মধ্যে مَنْ না বলে مَا বলার কারণ : আল্লাহ তা'আলা إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ বলেছেন, "مَنْ فِى الْقُبُوْرِ" বলেননি– মুফাস্‌সিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. সংখ্যাধিক্যের দিক বিচার করে "مَنْ" -এর পরিবর্তে "مَا" ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা সেদিন ভূগর্ভস্থ হতে যারা বের হবে তাদের মধ্যে মানুষ অপেক্ষা অন্যান্য জীব-জন্তু ও বস্তুর সংখ্যা অধিক হবে।

২. অথবা, পুনরুত্থানের সময় মানুষও জ্ঞানহীন ও মৃত অবস্থায় উথিত হবে। এ জন্য "مَنْ" -এর পরিবর্তে "مَا" ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ" : লোকদের অন্তরে যে ইচ্ছা ও মনোভাব, উদ্দেশ্য ও প্রবণতা, যেসব চিন্তাধারা ও কল্পনা এবং বাহ্যিক কাজের পিছনে যেসব গোপন কার্যকারণ ও অভিপ্রায় লুক্কায়িত আছে তা সবই বের করে ও প্রকাশ করে দেওয়া হবে। এর যাচাই ও পরখ করে ভালোগুলো ও মন্দগুলোকে ছেটে পৃথক করা হবে। মানুষের প্রতিটি বাহ্যিক কাজের পিছনে কোনো উদ্দেশ্য ও মনোভাবটি লুকিয়ে আছে তা কেবল আল্লাহই জানতে পারেন, আল্লাহই তার যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। তা ছাড়া এ কাজের দরুন কি ধরনের শাস্তি বা শুভ প্রতিফলের যোগ্য হতে পারে তা নির্ধারণ করার ক্ষমতাও কেবল তাঁরই রয়েছে।

حُصِّلَ শব্দটি تَحْصِيْل হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো– কোনো জিনিসকে বের করে আনা। যেমন– উপরের ছাল খুলে ফেলে তার ভিতরের জিনিস বের করা। বিভিন্ন জিনিস যাচাই-বাছাই করে পরস্পরকে আলাদা-আলাদা করে বুঝাবার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কাজেই মনের গোপন অবস্থা, তত্ত্ব ও তথ্য বের করা এবং তার যাচাই করে আলাদা আলাদা করা এ উভয় অর্থই তাতে শামিল রয়েছে। সূরা আত্ব-ত্বারিক্বে এ কথাটি বলা হয়েছে, এভাবে يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ যেদিন গোপন তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই করা হবে।

قُلُوْب না বলে صُدُوْر উল্লেখ করার কারণ : কেননা قَلْب হলো রূহ ধারণকারী। আর তা মজ্জাগতভাবেই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। সৃষ্টিগতভাবে তার খেদমত করতে প্রস্তুত; কিন্তু বিপদ হলো নফস নিয়ে। যার স্থান হলো صَدْر বা বক্ষ। এ নফস-ই কয়েক ভাগে বিভক্ত। আম্মারাহ, লাউয়ামাহ এবং মুত্‌মাইন্নাহ। এ কারণেই বলা হয়েছে– يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ
–[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ" : সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কোনো কিছুই গোপন রাখার সাধ্য কারো নেই এবং কোনো কর্মকে গোপন করার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফাঁকি দেওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে خَبِيْر শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষকে তার কর্মের বদলা দিবেন। এটা যুজাজ (র.)-এরও অভিমত।
–[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ : সূরা আল-ক্বারি'আহ্

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَارِعَةٌ অর্থ– আঘাতকারী, বিধ্বস্তকারী, বিচূর্ণকারী, কিন্তু এখানে অর্থ হলো– কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। অত্র সূরার প্রথম আয়াতেই সে মহা-প্রলয়ের আরবি শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। সে শব্দকে কেন্দ্র করে সূরার নাম اَلْقَارِعَةُ রাখা হয়েছে। মূলত এটা কেবল নাম-ই নয়; বরং এর বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্যের শিরোনামও তা। কেননা এতে মহাপ্রলয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৩৩টি বাক্য এবং ১৫২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী। এর মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। তার বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, এটা মক্কায় প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও পরকালে পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে পার্থিব জীবনের কৃতকর্মসমূহের হিসাব দেওয়া এবং প্রতিদান গ্রহণের জন্য মানুষের উপস্থিত হওয়া। সূরার প্রথমেই মানুষের মন যাতে আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং থরথর করে কেঁপে উঠে, এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশীয় কথায় বাঘ! বাঘ! বলা হলে যেমন স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং প্রাণভয়ে মানুষ কাঁপতে থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলাও সূরার প্রথমে এমনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে সমস্ত মানুষ কেঁপে উঠে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়। অতঃপর মহাপ্রলয় কি? তার প্রশ্ন রেখে গুণগত দিকটি তুলে ধরে মূল ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ মহাপ্রলয় এমন ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হবে যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। সেদিন মানুষ পতঙ্গকুলের ন্যায় দিক-বিদিক ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তাদের অবস্থা হবে তখন দিশাহারা ও পাগলপারা মানুষের ন্যায়। পাহাড়গুলো পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। এর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সে মহাপ্রলয়ের আকার ও রূপটি হবে কত ভয়ঙ্কর ও ভয়াল! পরিশেষে মানবকুলের বিচার অনুষ্ঠানের জন্য হাশর প্রান্তরে আল্লাহর আদালত বসবে। সে আদালতে মানুষের কার্যাবলির বিচার-বিশ্লেষণ হয়ে তা পরিমাপ করা হবে। যাদের সৎকাজের পরিমাণ বেশি এবং ওজনে পাল্লা ভারি হবে, তাদের পরিণাম হবে শুভ। তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী সন্তোষজনক জীবন। মহা সুখ-শান্তি ও আনন্দে তারা জীবন কাটাবে। আর যাদের অসৎ কাজের পরিমাণ বেশি ও পাল্লা ভারি হবে তাদের পরিণাম হবে খুব দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। প্রজ্বলিত উত্তপ্ত অনল-গর্ত হবে তাদের স্থায়ী নিবাস। সেখানেই তারা অনাদি-অনন্ত চিরদুঃখ ও কষ্টজনক জীবন কালাতিপাত করতে থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلْقَارِعَةُ اَيِ الْقِيَامَةُ الَّتِيْ تَقْرَعُ الْقُلُوْبَ بِاَهْوَالِهَا ـ

১. করাঘাতকারী অর্থাৎ কিয়ামত যা তার বিভীষিকা দ্বারা অন্তরসমূহকে আঘাত করবে।

٢. مَا الْقَارِعَةُ تَهْوِيْلٌ لِشَانِهَا وَهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ خَبَرُ الْقَارِعَةِ ـ

২. কি সে করাঘাতকারী? এর দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহতা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে مَا মুবতাদা এবং اَلْقَارِعَةُ খবর। উভয় মিলে (جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়ে) اَلْقَارِعَةُ -এর খবর হয়েছে।

٣. وَمَا اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ مَا الْقَارِعَةُ زِيَادَةُ تَهْوِيْلٍ لَهَا وَمَا الْاُوْلٰى مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهَا خَبَرُهُ وَمَا الثَّانِيَةُ وَخَبَرُهَا فِيْ مَحَلِّ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ لِاَدْرٰى ـ

৩. আপনি কি জানেন? আপনার কি জানা আছে? করাঘাতকারী কি? এটা দ্বারা এর বিভীষিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। প্রথমোক্ত "مَا" মুবতাদা। এর পরবর্তী অংশ مَا -এর খবর হয়েছে। আর দ্বিতীয় مَا ও তার খবর মিলে اَدْرٰى -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

٤. يَوْمَ نَاصِبُهُ دَلَّ عَلَيْهِ الْقَارِعَةُ اَيْ تَقْرَعُ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ الْمُنْتَشِرِ يَمُوْجُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ لِلْحَيْرَةِ اِلٰى اَنْ يُدْعَوْا لِلْحِسَابِ ـ

৪. সেদিন يَوْمَ -এর নসবদাতা উহ্য রয়েছে। তার প্রতি اَلْقَارِعَةُ শব্দটি নির্দেশ করছে অর্থাৎ تَقْرَعُ মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার ন্যায় ভয়-বিহ্বলতার কারণে তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় একজনের উপর অন্যজন গড়াগড়ি করবে এবং হিসাব-নিকাশের প্রতি আহূত হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে।

٥. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ كَالصُّوْفِ الْمَنْدُوْفِ فِيْ خِفَّةِ سَيْرِهَا حَتّٰى تَسْتَوِيَ مَعَ الْاَرْضِ ـ

৫. আর পর্বতসমূহ হবে রকমারি ধুনা পশমের ন্যায় ধুনিত পশমের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি/ সম্পন্ন, এমনকি জমিনের সাথে মিশে যাবে।

٦. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ بِاَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلٰى سَيِّاٰتِهِ ـ

৬. সুতরাং পাল্লা ভারি হবে অর্থাৎ যার নেক আমল তার পাপের উপর প্রাধান্য পাবে।

٧. فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي الْجَنَّةِ اَيْ ذَاتَ رِضًا بِاَنْ يَرْضَاهَا اَيْ مَرْضِيَّةٌ لَهُ .

৭. সে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন লাভ করবে জান্নাতে অর্থাৎ যার সন্তোষপূর্ণ জীবন যাতে সে সন্তুষ্ট হবে তথা যা তার পছন্দ মতো হবে।

٨. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ بِاَنْ رَجَحَتْ سَيِّاٰتُهُ عَلٰى حَسَنَاتِهٖ .

৮. পক্ষান্তরে যার আমলনামা হালকা হবে অর্থাৎ যার নেক আমলের উপর বদ আমল প্রাধান্য পাবে।

٩. فَاُمُّهُ فَمَسْكَنُهُ هَاوِيَةٌ .

৯. তার স্থান আবাস হবে হাবিয়া।

١٠. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ اَيْ مَا هَاوِيَةٌ هِيَ .

১০. আপনার কি জানা আছে এটা কি? অর্থাৎ হাবিয়া কি?

١١. نَارٌ حَامِيَةٌ شَدِيْدَةُ الْحَرَارَةِ وَهَاءُ هِيَهْ لِلسَّكْتِ تَثْبُتُ وَصْلًا وَ وَقْفًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ تُحْذَفُ وَصْلًا .

১১. তা হলো উত্তপ্ত অগ্নি-অত্যন্ত উত্তপ্ত। আর "هِيَهْ" -এর "هَا" অক্ষরটি সাকতাহ এর জন্য হয়েছে। এটা মিলিয়ে পড়া ও পৃথক করে পড়া উভয় অবস্থায়ই বহাল থাকে। তবে এক কেরাত অনুযায়ী মিলে পড়ার সময় এটা হযফ হয়ে যায়।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ-এর মহল্লে ই'রাব : اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ বাক্যটির কয়েকটি মহল্লে ই'রাব হতে পারে-

১. تَحْذِيْر হিসাবে مَرْفُوْع অথবা مَنْصُوْب উভয়টি হতে পারে। যেমন বলা হয়- اَلْاَسَدُ اَلْاَسَدُ [মারফূ' বা মানসূব]।

২. অথবা, উহ্য ক্রিয়ার ফায়েল হিসাবে মারফূ' হবে। মূলবাক্য এভাবে হবে যে, سَتَاْتِيْكُمُ الْقَارِعَةُ অর্থাৎ অতি শীঘ্র তোমাদের নিকট মহাপ্রলয় এসে পড়বে। যার খবর ইতঃপূর্বে اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ -এ দেওয়া হয়েছে।

৩. اَلْقَارِعَةُ মুবতাদা হিসাবে মারফূ' আর مَا الْقَارِعَةُ খবর হিসাবে মারফূ' হবে। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

يَوْمَ-এর মহল্লে ই'রাব কি? : আয়াত يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ الخ -এর মধ্যস্থিত يَوْمَ -এর মহল্লে ই'রাব -এর ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে, এমতাবস্থায় তা উহ্য ক্রিয়া تَقْرَعُ অথবা اُذْكُرْ -এর مَفْعُوْل হবে। ২. অথবা, مَحَلًّا مَرْفُوْع হবে। তখন তা উহ্য মুবতাদার খবর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরায় মানুষের স্বভাবগত তিনটি নৈতিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে- ১. অকৃতজ্ঞতা, ২. অর্থ-সম্পদের লোভ ও ৩. পরকালের সম্পর্কে অমনোযোগিতা।

আর অত্র সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। যাতে করে মানুষের অমনোযোগিতা দূরীভূত হয় এবং সে আল্লাহর শোকরগুজার হয় এবং অন্তরের নিভৃত কোণে যে অর্থলোভ থাকে তা দূরীভূত হয়। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَلْقَارِعَةُ" : اَلْقَارِعَةُ-এর শাব্দিক অর্থ হলো- ঠোকরকারী, আঘাতকারী। এটা قَرْعٌ ধাতু হতে নির্গত। قَرْعٌ -এর অর্থ হলো- একটি জিনিস দ্বারা অন্য একটি জিনিসের উপর শক্তভাবে আঘাত করা, যাতে প্রচণ্ড শব্দ হয়। এই শাব্দিক অর্থের মিলের কারণে قَارِعَةٌ শব্দটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও ভীষণতম বিপদ বুঝাবার জন্য বলা হয়। আরবি ভাষায় বলা হয়- قَرَعَتْهُمْ অমুক গোত্র বা জাতির উপর কঠিন ও ভীষণ বিপদ এসেছে। সূরা রাআদ-এ বলা হয়েছে-[وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْقَارِعَةُ تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ] যেসব লোক কুফরি করেছে তাদের কীর্তি-কলাপের কারণে কোনো না কোনো বিপদ আসতেই থাকে। তবে এখানে "قَارِعَةٌ" শব্দটি কিয়ামত বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল-হাক্কাতেও কিয়ামতকে এ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে اَلْقَارِعَةُ -এর দ্বারা হযরত ইসরাফীল (আ.) -এর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

বস্তুত قَارِعَةٌ দ্বারা কিয়ামতই উদ্দেশ্য। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই প্রকাশ করেন। যেমন- কিয়ামতের অপর নাম হচ্ছে اَلطَّامَّةُ ও اَلْحَاقَّةُ।

তাফসীরকার হযরত কাতাদাহ (র.)ও বলেছেন, قَارِعَةٌ হলো কিয়ামত। -[তাবারী]

قَوْلُهُ "وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ" : অর্থাৎ 'ক্বারিআহ'র হাকিকত এবং মৌলত্ব সম্পর্কে আপনার কোনো ইলম নেই। কেননা তার কঠিনতা এত বেশি যে, তথায় কারো না ধারণা পৌঁছতে পারে, না কোনো চিন্তা পৌঁছতে পারে। এমনকি তা বুঝাও মুশকিল। যতটুকু-ই আপনি ধারণা করবে না কেন– তা আপনার ধারণার চেয়েও কঠিনতর। এ আয়াত দ্বারা যেন আল্লাহ তা'আলা বলতে চাচ্ছেন যে, সে ক্বারিআহ'র তুলনায় দুনিয়ার ক্বারিআহ কিছুই নয়। পরকালের আগুনের তুলনায় ইহকালের আগুন কিছুই নয়। –[কাবীর]

قَوْلُهُ "كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ" : اَلْفَرَاشُ এর বলা হয় সে ক্ষুদ্রকায় পাখিকুলকে, যেগুলো অগ্নির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। আমাদের দেশে সেগুলোকে পঙ্গপাল বলা হয়। আর مَبْثُوثٌ অর্থ– বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। অর্থাৎ পঙ্গপাল কোনো একটি দিকে থাকে না, চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থাটিকে পতঙ্গকুলের অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন। কিয়ামতের দিনও মানুষ কঠিন বিপদ ও আত্মচিন্তায় দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তাদের এ অবস্থাটিকেই পতঙ্গকুলের অবস্থা দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ "كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ" : عِهْنٌ অর্থ– পশম এবং مَنْفُوشٌ অর্থ– ধুনিত। পশম ধুনা হলে যেরূপ তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে চতুর্দিকে উড়তে থাকে, তদ্রূপ পর্বতগুলো খণ্ড বিখণ্ড হয়ে উড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ধুনিত পশমের অবস্থা দ্বারা কিয়ামতের দিন পাহাড়গুলোর অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতএব, সেদিন পাহাড়ের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে মানুষের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। চরম ধ্বংস সে ব্যক্তিদের জন্য যারা এত সুন্দর করে বুঝানোর পরও সঠিক পথে আসছে না। –[কাবীর]

মহাপ্রলয়ের দিন পাহাড়ের বিভিন্ন অবস্থা : কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয়ের দিনে পাহাড়ের বিভিন্ন অবস্থা এবং রূপ হবে।

ক. টুকরা টুকরা হবে। যেমন বলা হয়েছে– وَدُكَّتِ الْجِبَالُ دَكًّا

খ. বিক্ষিপ্ত বালুকাস্তূপের ন্যায়। যেমন বলা হয়েছে– كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا -

গ. ধুনা পশমের ন্যায় হবে। যেমন كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ -

ঘ. মরীচিকায় পরিণত হবে। যেমন– وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا –[কাবীর]

مَوَازِينُ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَوَازِينُ শব্দ مَوْزُونٌ বা مِيزَانٌ-এর বহুবচন। مَوْزُونٌ-এর বহুবচন ধরা হলে এর অর্থ হবে, আল্লাহর দৃষ্টিতে ওজনযোগ্য আমলসমূহ। আর مِيزَانٌ-এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ হবে, সে পাল্লা যা দ্বারা আমল পরিমাপ করা হবে। সুতরাং প্রথম অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের মর্ম হবে– তাদের নেক আমলসমূহ বা বদ আমলসমূহ যা ওজনযোগ্য– তার পরিমাণ বেশি হোক বা কম হোক। আর দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে মর্ম হবে– নেক আমল বা বদ আমলসমূহের পাল্লাটি যদি ভারি ও হালকা হয়। যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারি এবং বদ আমলের পাল্লা হালকা হবে, তারা লাভ করবে সন্তোষজনক সুখী জীবন। আর যাদের নেক আমলের পাল্লা হালকা এবং বদ আমলের পাল্লা ভারি হবে তারা হবে, অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত। এ বিষয় সূরা আ'রাফের ৮৯ আয়াতে, সূরা কাহাফের ১০৪ – ১০৫ আয়াতে এবং সূরা আম্বিয়ার ৪৭ আয়াতেও বর্ণনা বিদ্যমান। আসল পরিণামের ব্যাপারটি কিরূপ হবে, তার সঠিক কোনো রূপরেখা সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান না থাকলেও আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই পোষণ করা যায় না। কেননা আলো-বায়ু এর মতো আকার-আয়তনহীন বস্তুর পরিমাপ কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন আমল পরিমাপের ব্যাপারটি আল্লাহর মহা কুদরতের সম্মুখে কোনো অসুবিধারই বস্তু নয়।

ইমাম গাযালী (র.) লিখেছেন যে, সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাদের আমল পরিমাপের জন্য দাঁড়ি পাল্লার ব্যবস্থা থাকবে না। তাদের হাতে আমলনামা দেওয়া হবে না; বরং একটি নাজাতনামা দেওয়া হবে। যাতে এ কথা লিখা থাকবে যে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের নাজাতনামা। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যেভাবে মায়ের কোল শিশুর আবাসস্থল, ঠিক তেমনিভাবে কাফেরদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। এ কারণে أُمٌّ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

আর هَاوِيَةٌ একটি জাহান্নামের নাম। এটা মা'রেফা ও গায়রে মুনসারেফ, কোনো কোনো সময় এর উপর আলিফ-লাম সিফাতের দিক বিবেচনায় প্রবেশ করে يَهْوِىْ – هَوٰى উপর হতে নিচে পতিত হওয়া। এর ইসমে ফায়েল স্ত্রীলিঙ্গে هَاوِيَةٌ আর জাহান্নামের নাম এজন্য هَاوِيَةٌ রাখা হয়েছে, কিয়ামতের পর পাপিষ্ঠগণ এতে পতিত হবে।

قَوْلُهُ نَارٌ حَامِيَةٌ : বস্তুত যারা ঈমানের সম্পদ এবং নেক আমলের সম্বল নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে না; তাদের ঠিক নিবাস হবে জাহান্নাম। আর তা হবে অতি উত্তপ্ত অগ্নি। –[মাযহারী]

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে যে, দোজখের আগুনকে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত রাখা হয়, তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে। এরপর আরো এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়; তখন তা সাদা বর্ণ ধারণ করে। এরপর আরো এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলে তা কালো বর্ণ ধারণ করে।

তাই এখন দোজখের আগুন সম্পূর্ণ কালো বর্ণের। সে কারণে তা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে আছে। –[ইবনে কাছীর]

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ : সূরা আত-তাকাছুর

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের اَلتَّكَاثُرُ শব্দটিকে নামকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ২৮টি বাক্য এবং ১২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : আবূ হাইয়ান ও শাওকানী বলেন, সব তাফসীরকারকদের মতেই এ সূরাটি মাক্কী। ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, সবচাইতে বেশি পরিচিত কথা হলো– এটা মাক্কী সূরা; কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে এটা মাদানী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে দুনিয়া পূজা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা এবং মানুষকে আখেরাতপন্থি ও পরকালমুখি করা। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের জাগতিক জীবনে অধিক মাত্রায় উপায়-উপকরণ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। তোমরা বেশি বেশি লাভ করা এবং অপরের তুলনায় নিজে বেশি সম্পদের অধিকারী হওয়াকেই জীবনের আসল উন্নতি ও যথাযর্থ সাফল্য ভেবে নিয়েছ। যার ফলশ্রুতিতে তোমরা জীবনের আসল মূল্যবোধ, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি হতে অনেক দূরে সরে পড়েছ। সেদিকে দৃষ্টিপাত করা ও মনোযোগ দেওয়ার কোনোই সুযোগ পাচ্ছে না এবং মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনও অনুভব কর না। অথচ জাগতিক উপায়-উপকরণের তুলনায় এদিকে মনোযোগ দেওয়াই ছিল তোমাদের আসল কর্তব্য। পরকালের হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার চিন্তা ভুলেও তোমাদের মনের কোণে জাগরিত হয় না। এরূপ অবস্থায় নিমজ্জিত হয়ে থাকলে পরিণতিতে জাহান্নাম যে তোমাদের অবলোকন করতে হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। যেদিন চাক্ষুষ জাহান্নামকে অবলোকন করবে, সেদিনই তার আসল সত্যাসত্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।

সূরার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ও অবদান বর্তমান। এ নিয়ামতসমূহ কোন পথে, কি নিয়মে ব্যবহার করলে, সে বিষয় তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, সময় থাকতে তোমরা সাবধান হও, সতর্ক হও। পরকালমুখি গতি-চরিত্র গ্রহণ করো। এটাই তোমাদের জীবনে মহাসাফল্য এনে দিবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে প্রতিদিন কুরআনের এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তাঁরা বললেন– কার সাধ্য আছে যে, প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তখন তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কি أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করতে পারে না? [অর্থাৎ এ সূরা এক হাজার আয়াতের সমতুল্য]।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাতে এক হাজার আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে। সাহাবীগণ অপারগতা প্রকাশ করলে নবী করীম ﷺ أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে ইরশাদ করলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ সূরাটি এক হাজার আয়াতের সমান। –[রূহুল মা'আনী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلْهٰكُمُ شَغَلَكُمْ عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ التَّكَاثُرُ اَلتَّفَاخُرُ بِالْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَالرِّجَالِ.
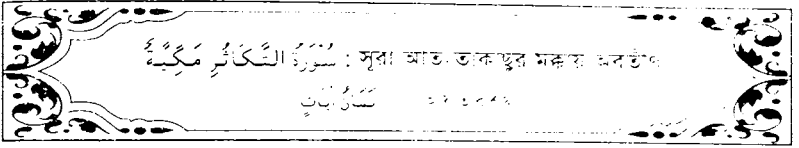
১. তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিরত রেখেছে আধিক্য-সম্পদ, সন্তানসন্ততি ও জনবলের অহংকার।

٢. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ بِاَنْ مُتُّمْ فَدُفِنْتُمْ فِيْهَا اَوْ عَدَدْتُمُ الْمَوْتٰى تَكَاثُرًا.

২. যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরে গিয়ে উপনীত হও। অর্থাৎ মৃত্যুর পর জমিনে সমাধিস্ত হও। অথবা সংখ্যাধিক্য প্রমাণের জন্য মৃতব্যক্তিদের (কবর)-কে গণনা কর।

٣. كَلَّا رَدْعٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

৩. কখনো নয় এটা ধমকের জন্য হয়েছে। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

٤. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ سُوْءَ عَاقِبَةِ تَفَاخُرِكُمْ عِنْدَ النَّزْعِ ثُمَّ فِى الْقَبْرِ.

৪. পুনরায় বলবো অচিরেই তোমরা জ্ঞাত হবে তোমাদের অহংকারের পরিণতি জানতে পারবে মৃত্যু যন্ত্রণার সময় অতঃপর কবরে অবস্থানের সময়।

٥. كَلَّا حَقًّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ اَىْ عِلْمًا يَقِيْنًا عَاقِبَةَ التَّفَاخُرِ مَا اشْتَغَلْتُمْ بِهٖ.

৫. কখনো নয় অবশ্যই তোমরা যদি নিশ্চিতরূপে জানতে অর্থাৎ তোমাদের অহংকারের পরিণতি যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে পারতে, তাহলে তোমরা তাতে লিপ্ত হতে না।

٦. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ النَّارَ جَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ وَحُذِفَ مِنْهُ لَامُ الْفِعْلِ وَعَيْنُهُ وَاُلْقِىَ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ.

৬. অবশ্যই তোমরা প্রত্যক্ষ করবে জাহান্নাম-অগ্নি এটা উহ্য শপথের জওয়াব। আর لَتَرَوُنَّ-এর لَام كَلِمَه ও عَيْن كَلِمَه হযফ করা হয়েছে এবং এর হরকত رَا-এর উপর দেওয়া হয়েছে।

٧. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا تَاكِيْدٌ عَيْنَ الْيَقِيْنِ مَصْدَرٌ لِاَنَّ رَاٰى وَعَايَنَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

৭. পুনরায় বলি অবশ্যই তোমরা প্রত্যক্ষ করবে দোজখ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ প্রথমোক্ত لَتَرَوُنَّ-এর তাকিদ হয়েছে। নিশ্চিতরূপে عَيْنٌ শব্দটি لَتَرَوُنَّ-এর مَصْدَرٌ (مَفْعُول مُطْلَق) হয়েছে। কেননা عَايَنَ ও رَاٰى একই অর্থবোধক।

٨. ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي النُّوْنَاتِ وَ وَاوُ الضَّمِيْرِ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ رُؤْيَتِهَا عَنِ النَّعِيْمِ مَا يَلْتَذُّ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الصِّحَّةِ وَالْفَرَاغِ وَالْأَمْنِ وَالْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

৮. তারপরও বলি অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে কয়েকটি نُوْنٌ পর পর আসার কারণে রফার نُوْنٌ -কে এটা হতে হযফ করা হয়েছে। যেদিন তারা জাহান্নামকে দেখবে নিয়ামত সম্পর্কে নিয়ামত হলো দুনিয়ার মানুষ যার স্বাদ গ্রহণ করে উপভোগ করে। যেমন সুস্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি।

তাহকীক ও তারকীব

عَيْنَ الْيَقِيْنِ-এর মধ্যস্থিত عَيْنَ শব্দটি তারকীবে কি হয়েছে? : আয়াত ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ-এর মধ্যস্থিত عَيْنَ শব্দটি لَتَرَوُنَّ-এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসাবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। কেননা عَيْنَ শব্দটি এখানে رُؤْيَةٌ-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন তারা জাহান্নামকে নিজেদের চোখে দেখতে পাবে।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ তারকীবে কি হয়েছে? : আয়াতে لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ তারকীবে উহ্য শপথের জবাব হয়েছে। মূলত বাক্যটি ছিল- وَاللّٰهِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখতে পাবে।

سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْلٌ কি? : আল্লাহ তা'আলার বাণী– سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْلٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো سُوْءُ عَاقِبَةِ تَفَاخُرِكُمْ অর্থাৎ শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পারস্পরিক অহংকারের অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। [মৃত্যুর সময় এবং কবরে অবস্থানের সময়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার উল্লেখ করে পরকালে হিসাব-নিকাশ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর অত্র সূরায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অথচ এগুলোর এক দিন হিসাব দিতে হবে। এগুলোর ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

শানে নুযূল : আলোচ্য সূরার শানে নুযূল প্রসঙ্গে একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

১. হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা আবদে মানাফ গোত্র ও বনূ সাহম গোত্র পরস্পরের জন সংখ্যায় আধিক্যের গর্ব করেছিল। আবদে মানাফ গোত্র এ গর্বে বিজয়ী হলো। তখন বনূ সাহম গোত্র বলল, আমাদের বংশের বহু লোক জাহিলিয়া যুগে মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর জীবিত এবং মৃত সকলকে গণনা করে তারা বিজয়ী হলো। এ প্রসঙ্গে সূরাটি নাজিল হয়।

২. হযরত ইবনে বোরায়দাহ (রা.) হতে বর্ণিত, মদীনায় আনসারদের দু'টি গোত্র ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব নিয়ে পরস্পর খুব গর্ব প্রকাশ করত। এমনকি তারা স্বীয় জনবল প্রমাণের জন্য মৃতব্যক্তিদের গণনা করতে কবরস্থানে গমন করল এবং সমাধি গণনার মাধ্যমে নিজেদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণের প্রয়াস পেল। তাদের উপরিউক্ত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়।

قَوْلُهُ "اَلْهٰكُمْ" : এ শব্দটির মূলরূপ হলো اَلْهٰى - كُمْ হচ্ছে বহুবচনীয় সর্বনাম। এর অর্থ হচ্ছে– বেখেয়ালীপনা, আত্মভোলা, কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকা। আরবি ভাষায় এ শব্দটিকে সে আত্মভোলা ও বেখেয়ালীপনাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়, যা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে বেখেয়ালী ও গাফেলতীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

اَلتَّكَاثُرُ-এর অর্থ : এ শব্দটি كَثْرَتٌ ধাতু হতে নির্গত। বাবে تَفَاعُلٌ-এর মাসদার। এর অর্থ তিনটি– প্রথমত অতিমাত্রায় কোনো বস্তু পাওয়ার প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকা। দ্বিতীয়ত কোনো বস্তু বেশি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করা। তৃতীয়ত কোনো বস্তু অপরের তুলনায় বেশি লাভ করে অহঙ্কার ও গৌরব প্রকাশ করা।

সুতরাং এখানে উভয় শব্দের সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে– তোমাদের অধিক লাভের চিন্তা ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে গাফেল ও বেখেয়াল করে রেখেছে। অথবা, এটাও হয় যে, তোমাদের নিজেদের আধিক্য ও আত্মগর্ব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়াদি হতে গাফেল ও মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। কি কি বিষয়বস্তুর আধিক্য গাফেল ও মোহাচ্ছন্ন করেছে: । কুরআন মাজীদ সে বস্তুটির নাম বলেনি। এ জন্য তার মর্ম অনেক ব্যাপক। এটা দ্বারা ধন-সম্পদের প্রাচুর্য বুঝা যায়, এটা দ্বারা মান-মর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-হেকমত, বুদ্ধি-কৌশল, জাগতিক জীবনের বিলাস-সামগ্রী ও উপায়-উপাদান সবই হতে পারে। সারকথা এই যে, যে বস্তুর অধিক পরিমাণে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতায় পড়ে মানুষ নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মতৎপর থেকে আল্লাহর ইবাদত, পরকাল ও হাশর-নশরের চিন্তা হতে সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে পড়ে; তাই বলা হয়েছে। চাই তা ধন-সম্পদ হোক বা মান-মর্যাদা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হোক। অথবা, জীবনের বিলাস-সামগ্রী হোক বা অন্য কিছু হোক।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-কে দ্বিরুক্ত করার কারণ :

১. এখানে উক্ত বাক্যকে দু'বার নেওয়া হয়েছে তাকিদের জন্য। তা দ্বারা وَعِيْد ধমকের পর ধমক দেওয়া হয়েছে। যেমন, বলা হয়– اَقُوْلُ لَكَ ثُمَّ اَقُوْلُ لَكَ لَا تَفْعَلْ অর্থাৎ আমি তোমাকে বলছি, তারপরও বলছি– তুমি করো না।

২. অথবা, প্রথমটি মৃত্যুর সময়, আর দ্বিতীয়টি কবরে প্রশ্ন করার সময়।

৩. ইমাম যাহহাক (র.) বলেন, প্রথম বাক্য দ্বারা কাফেরদেরকে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ اَيُّهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ

৪. প্রথমটি وَعِيْد বা ধমক, দ্বিতীয়টি وَعْد বা পুরস্কারের ওয়াদা।

৫. অথবা, একটি হলো কবরের আজাব সম্পর্কে, আর অন্যটি কিয়ামতের আজাব সম্পর্কে। –[কাবীর]

৬. কারো মতে, প্রথমটি পরকাল সম্পর্কে সতর্কবাণী আর দ্বিতীয়টি এ সম্পর্কে পুনঃ তাকিদ।

৭. কারো মতে, প্রথমবার সতর্কবাণী মৃত্যুর সময়ের বা কবরের অভ্যন্তরের আজাবের ব্যাপারে আর দ্বিতীয়টি কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পরের আজাব সম্পর্কে। –[নূরুল কোরআন]

لَوْ-এর জবাব : لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ বাক্যে لَوْ হরফে শর্ত। শর্ত আসলে তার জাযা থাকা আবশ্যক; কিন্তু এখানে এর উল্লেখ নেই। এ কারণে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, জাযা এখানে উহ্য রয়েছে। কেননা যদি لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ-কে لَوْ-এর জবাব ধরা হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়ায়, যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করতে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে না। অথচ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে তারা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। অতএব, لَوْ-এর জবাব হবে لَمَا اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ অর্থাৎ অবশ্যই আধিক্যের বাসনা তোমাদেরকে অমনোযোগী করতে পরত না। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ عِلْمَ الْيَقِيْنِ : বিদ্যার্জন ও জ্ঞান লাভের দ্বারা অন্তরে যে বিশ্বাস ও প্রত্যয় সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় ইলমুল ইয়াকীন বা জ্ঞানলব্ধ প্রত্যয়। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সম্পর্কে আফসোস করে বলেছেন, তোমরা জাগতিক জীবনে অধিক মাত্রায় ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য, মান-মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের নেশায় মোহান্ধ হয়ে পড়েছ এবং একেও জীবনের উন্নতি ও সাফল্য ভাবছ; কিন্তু তা কখনই মানুষের জীবনের আসল উন্নতি ও সাফল্য হতে পারে না; বরং আল্লাহকে ভুলে এ সব ধান্দায় থাকার পরিণতি যে কত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক, এ বিষয় যদি তোমরা জ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করতে, তবে তা তোমাদের পক্ষেই ফলপ্রসূ হতো। আয়াতে ওহীলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও নেক আমল করার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেছেন, আমরা এ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতাম যে, আলোচ্য আয়াতের عِلْمَ الْيَقِيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহ পুনর্জীবন দান করবেন এবং পুনরুত্থান করবেন।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথি (র.) লিখেছেন, ইলমুল ইয়াকীন হলো– অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। –[নূরুল কোরআন]

لَتَرَوُنَّ-কে দ্বিরুক্ত করার কারণ : لَتَرَوُنَّ শব্দটি اَلرُّؤْيَةُ থেকে নির্গত। এ اَلرُّؤْيَةُ বা প্রত্যক্ষ করাকে দ্বিরুক্ত করা হয়েছে। কেননা, এখানে وَعِيْد বা ধমকের তাকিদ করা হয়েছে। সম্ভবত জাতি ধমক শুনতে অপছন্দ করত। তাই وَعِيْد-কে বারবার উল্লেখ করে সতর্ক করা হয়েছে।

অথবা, প্রথম 'দেখা' হবে দূর থেকে, আর দ্বিতীয় 'দেখা' হবে একেবারে জাহান্নামের তীরে গিয়ে।

অথবা, প্রথম 'দেখা' হবে তীরে গিয়ে, আর দ্বিতীয় 'দেখা' হবে জাহান্নামে প্রবেশ করার সময়। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

অথবা, এর কারণ হলো, প্রথমবার দেখার তাৎপর্য হলো মৃত্যুর পর আলমে বরযখ বা মধ্যালোকে দেখা। আর দ্বিতীয়বার দেখার তাৎপর্য হলো হাশরের দিন দেখা। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ "عَيْنَ الْيَقِيْنِ" : عَيْن অর্থ- চক্ষু এবং يَقِيْن অর্থ- বিশ্বাস। সুতরাং উভয় শব্দের সম্মিলিত অর্থ হলো, কোনো বস্তু চক্ষু দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে অন্তরে সে বিষয়ে যে বিশ্বাস জন্মলাভ করে, তাকেই বলা হয় عَيْنَ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যয়। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে- তোমরা জাহান্নামকে পরকালে চাক্ষুষ দর্শন করে, চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করতে পারবে; কিন্তু ওহীলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পার্থিব জীবনে তার বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।

عِلْمُ الْيَقِيْنِ ও عَيْنُ الْيَقِيْنِ ও حَقُّ الْيَقِيْنِ-এর পার্থক্য : কোনো জিনিস জানার তিনটি স্তর রয়েছে-

১. عِلْمُ الْيَقِيْنِ ২. عَيْنُ الْيَقِيْنِ এবং ৩. حَقُّ الْيَقِيْنِ যেমন- কেউ বিশ্বস্ত মাধ্যমে জানতে পারল যে, আঙ্গুর ফল মিষ্টি : একে বলে عِلْمُ الْيَقِيْنِ এরপর সে এটা চোখে দেখে বুঝতে পারল যে, এটা মিষ্টি হবে, তাকে বলে عَيْنُ الْيَقِيْنِ ; অতঃপর সে তা ভক্ষণ করে তার স্বাদ গ্রহণ করল, তাকে বলে حَقُّ الْيَقِيْنِ।

নিয়ামত সম্পর্কে যারা জিজ্ঞাসিত হবে : কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- এতে সম্বোধিত ব্যক্তিরা হবে কাফের : অর্থাৎ কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হবে- তোমাদেরকে আল্লাহ এরূপ নিয়ামত দিয়েছেন, তোমরা তার কি শোকর আদায় করেছ? কোনো কোনো তাফসীরকারের নিকট আয়াতের সম্বোধন সাধারণ কাফের ও মুসলমান। অর্থাৎ সকলকে নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। -[কাবীর]

কিয়ামতের দিন কোন কোন বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ" সে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে النَّعِيْم। (নিয়ামত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এখানে প্রশ্ন হলো, এ নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে? হাদীসের বর্ণনায় তার একাধিক জবাব পাওয়া যায়।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে "نَعِيْم" দ্বারা স্বাস্থ্য, সুস্থতা, চক্ষু ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হবে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, সহজ বিধান ও কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

গ. কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তা দ্বারা খেজুর, মিষ্টি পানি ও শীতল ছায়াকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ. কোনো কোনো হাদীসে নিম্নোক্ত ৫টি বস্তুকে বুঝানো হয়েছে- ১. তৃপ্তি করে খাওয়া; ২. ঠাণ্ডা পানীয়; ৩. মজার ঘুম; ৪. ঘরের ছায়া ও ৫. ভারসাম্যপূর্ণ দেহ।

ঙ. বুখারী শরীফের একটি হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ব্যতীত হাশরের দিন কোনো মানুষ স্বীয় স্থান হতে নড়তে পারবে না। ১. সে নিজের জীবন কোন পথে ব্যয় করেছে? ২. যৌবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে? ৩. সম্পদ কিভাবে আর্জন করেছে? ৪. অর্জিত সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছে? ৫. ইলম অনুযায়ী আমল করেছে কিনা?

চ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বান্দা যখন কোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলে?

ছ. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, বান্দার ভাষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কি উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিল?

জ. হযরত মা'আয (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তিকে তার জীবনের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এমনকি চোখে সুরমা লাগানো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তাদেরকে এ সব প্রশ্ন করা হবে না। -[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْعَصْرِ : সূরা আল-‘আসর

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম اَلْعَصْرُ শব্দকেই এর নামরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১৪টি বাক্য এবং ৬৮ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটি কখন নাজিল হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়।

১. হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.) প্রমুখের মতে, এ সূরাটি মদীনায় নাজিল হয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। কেননা এতে ঈমান ও আমলের মৌলিক কথার উল্লেখ করা হয়েছে

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটি অতিশয় ক্ষুদ্র, অথচ এতে বক্তব্য ও ভাবের মহাসমুদ্র লুক্কায়িত রয়েছে। আল্লাহ এ ক্ষুদ্রকায় বাক্য কয়টিতে মানব জীবনের আসল নীতি-আদর্শ ও কর্মময় ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। এ সূরাটি ভাব ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে এত ব্যাপক যে, গোটা ইসলামি জীবন চরিত্রটি একটি সংক্ষেপ অথচ বিরাট-বিশালকায় রূপ অংকন করা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন−কোনো লোক এ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে তা-ই তার হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। মোটকথা, আল্লাহ এতে মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার চার দফা মূলনীতি উপস্থাপন করেছেন। ১. ঈমান ২. নেক আমল, ৩. সত্যের পারস্পরিক উপদেশ, ৪. ধৈর্যের পারস্পরিক নসিহত। এ চার দফা মূলনীতি হতে যারা সরে পড়বে তাদের ধ্বংস ইহকালে ও পরকালে অনিবার্য। সে ধ্বংস ও ক্ষতি হতে কেউই উদ্ধার পাবে না। আর তার ধারণা ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত উভয়কালের মুক্তি ও সাফল্য।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন দুই ব্যক্তি ছিলেন, যখন তারা কোনো স্থানে একত্রিত হতেন, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের সামনে সূরা আল-'আসর না পড়তেন ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথক হতেন না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন− যে ব্যক্তি অত্র সূরা সম্পর্কে চিন্তা করে, তার জন্য অত্র সূরাটিই যথেষ্ট। −[ইবনে কাছীর]
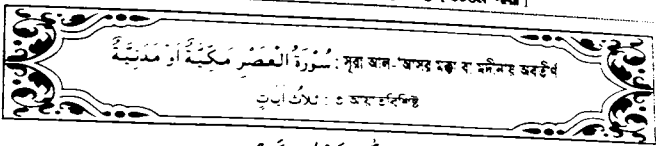
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. وَالْعَصْرِ الدَّهْرِ أَوْ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوْبِ أَوْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ـ

১. শপথ কালের যুগ অথবা মধ্যাহ্ন হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় কিংবা সালাতুল আসর।

২. إِنَّ الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ لَفِيْ خُسْرٍ فِيْ تِجَارَتِهِ ـ

২. অবশ্যই মানুষ মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত তার ব্যবসায়।

৩. إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَيْسُوْا فِيْ خُسْرَانٍ وَتَوَاصَوْا أَوْصٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْحَقِّ أَيِ الْاِيْمَانِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ ـ

৩. তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। আর তারা পরস্পর উপদেশ দান করে একে অন্যকে উপদেশ প্রদান করে সত্যের প্রতি ঈমানের প্রতি আর পরস্পর উপদেশ দান করে ধৈর্যের প্রতি আনুগত্য এবং পাপ হতে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে বংশ গৌরবের দম্ভে অহঙ্কারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছিল, আর অত্র সূরাতে সকল প্রকার পাপীদের পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে। সাথে সাথে নেককার লোকদের সুফলের কথাও ঘোষণা করা হচ্ছে।

সূরার শানে নুযূল : জাহিলিয়া যুগে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর সাথে কালাদাহ ইবনে উসায়েদ -এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কালাদাহ প্রায়ই তাঁর নিকট যাতায়াত করত। হযরত আবূ বকর (রা.) ঈমান গ্রহণের পর একদিন সে তাঁর নিকট এসে বলল– হে আবূ বকর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ব্যবসা-বাণিজ্য তো ভাটা লেগেছে। আয়-রোজগারের পথ তো প্রায় বন্ধ। তুমি কোন্ ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছ। নিজেদের ধর্মকর্মও হারিয়েছ এবং দুনিয়াও হারিয়েছ। তুমি এখন উভয় দিক দিয়ে পূর্ণরূপে লোকসানে নিপতিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন– হে নির্বোধ! যে লোক আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের গোলাম হয়ে যায়, সে কখনো লোকসানে নিপতিত হয় না। যারা পরকাল সম্পর্কে কোনোই চিন্তা-ভাবনা করে না, মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, তারাই লোকসানে নিপতিত। যারা কেবল জাগতিক উন্নতি লাভের জন্যই সদা চিন্তামগ্ন ও ব্যস্ত থাকে, তারাই একূল-ওকূল উভয় কূলই হারায়। হযরত আবূ বকর (রা.) -এর কথার সত্যতা প্রমাণ এবং এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। -[আযীযী]

اَلْعَصْرُ -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এখানে 'اَلْعَصْرُ' শব্দটির তিনটি অর্থ হতে পারে। ১. কাল। ২. মধ্যাহ্ন হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় এবং ৩. আসরের নামাজ।

* ইবনে কাইসান (র.) বলেছেন, আসর শব্দ দ্বারা রাত ও দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
* হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে আছর বলা হয়।
* হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, দিনের শেষ ঘণ্টাকে আসর বলা হয়। -[নূরুল কোরআন]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে "اَلْعَصْر" দ্বারা কালকেই বুঝানো হয়েছে। কালের শপথ করার অর্থ হলো, সূরায় উক্ত চারটি গুণসম্পন্ন লোক ছাড়া অন্যান্য সকল মানুষই যে মহা ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন, কাল-সময়-স্রোত তার জ্বলন্ত সাক্ষী। মানুষের ইতিহাস দৃঢ়তা ও সন্দেহাতীতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, উক্ত চারটি গুণ যে সকল লোকের নেই তারা শেষ পর্যন্ত সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সময় বা কাল আসলে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য এক এক ব্যক্তি ও এক এক জাতিকে আল্লাহর দেওয়া সময় বা অবকাশ মাত্র। পরীক্ষাগারে যেমন পরীক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, ঠিক মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তেমনিভাবে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

যা হোক এ তীক্ষ্ণ গতিশীল কালস্রোত সাক্ষ্য দেয় যে, উক্ত চারটি গুণ হারিয়ে যে সব কাজে নিজের আয়ুষ্কাল ক্ষয় করছে, তা সবই ক্ষতিকর। এ ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে শুধু সেসব লোক যারা উল্লিখিত চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে দুনিয়ায় কাজ করবে।

ইমাম রাযী (র.) এ পর্যায়ে একজন মনীষীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি হলো– একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতেই আমি সূরা আল-'আসর-এর অর্থ বুঝতে পেরেছি। বরফ বিক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছিল, দয়া কর সে ব্যক্তির প্রতি যার মূলধন গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অনুগ্রহ কর সে ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি হারিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যক্তির এ চিৎকার শুনে আমি বললাম– "وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ" -এর তো এটাই অর্থ। মানুষকে যতটা আয়ুষ্কাল দেওয়া হয়েছে তা বরফ গলার মতো দ্রুত গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাকে যদি অপচয় করা হয় কিংবা ভুল ও অন্যায় কাজে ব্যয় করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটাই হলো মানুষের ক্ষতি। এটা অপেক্ষা বড় ক্ষতি মানুষের আর কিছুই হতে পারে না।

اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য : ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে اَلْاِنْسَانُ – মানুষ বলতে মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে, অন্যথায় পরবর্তী اِسْتِثْنَاءْ সহীহ হতো না। সমগ্র মানবজাতি সমানভাবে সকলেই এতে শামিল। কাজেই উক্ত চারটি গুণের যারা অধিকারী নয়, তারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কথাটি সর্বদিক দিয়েই সর্বাবস্থায় সত্য ও প্রমাণিত। উক্ত গুণাবলি হতে বঞ্চিত এক ব্যক্তি হোক, কোনো জাতি হোক অথবা হোক দুনিয়ার সকল মানুষ সকলের জন্যই তা প্রয়োজন। এটা আল্লাহ তা'আলার একটি অপরিবর্তনীয় মৌলনীতি। সারা দুনিয়ার মানুষও যদি কুফর, পাপকাজ ও পরস্পরকে বাতিল কাজে উৎসাহিত করেন এবং আত্মপূজায় নিমগ্ন হওয়ার শিক্ষা দানের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাহলেও ভিন্নতর কোনো পরিণাম দেখা দিবে না। কেননা মৌলনীতির প্রয়োগ সাধারণ, নিরপেক্ষ ও নির্বিশেষে হয়ে থাকে।

اَلْاِنْسَانُ-এর اَلْ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاِنْسَانُ-এর اَلْ দ্বারা 'ইনসান' -এর جِنْس বা জাতিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আলিফ ও লাম জিন্সী হবে, এ কারণেই 'ইনসান' হতে اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে ইস্তিছনা করা হয়েছে।

অথবা اَلْ এখানে عَهْدِيْ হবে। তখন مَعْهُوْد হবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে মুশরিকদের একটি বিশেষ দল উদ্দেশ্য। যথা–ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল ও আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, এটা দ্বারা আবূ লাহাবকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, আবূ জাহ্‌ল উদ্দেশ্য। –[কাবীর]

خُسْر-এর অর্থ : خُسْر শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ধ্বংস, ক্ষতি, লোকসান ও কারবারে অকৃতকার্য হওয়া। উপরিউক্ত আয়াতেও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যখন ক্ষতি হয় তখনই আরবিতে বলা হয় তোমার লোকসান হয়েছে। গোটা ব্যবসাটি দেউলিয়ায় পরিণত হলেও দেউলিয়াত্ব বুঝাবার জন্য এ শব্দটির প্রয়োগ হয়। এ শব্দটি লাভ ও মুনাফার বিপরীত শব্দ। কুরআন মাজীদে যত স্থানে এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তা ফালাহ শব্দেরই বিপরীত অর্থে। ফালাহ শব্দের অর্থ হলো কল্যাণ বা সাফল্য। বস্তুত কুরআন মাজীদে ফালাহা ও খুসরুন শব্দদ্বয় উভয় জগতের কল্যাণ এবং ক্ষতি, লোকসান ও লাভের অর্থে ব্যবহার করেছে। কুরআন যখনই তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, মানুষ বড়োই ক্ষতিগ্রস্ত তখন তা দ্বারা উভয় জগতের ক্ষতিই বুঝায়। –[কাবীর]

خُسْر-কে অনির্দিষ্ট নেওয়ার কারণ : আয়াতে কারীমায় لَفِيْ خُسْرٍ বলা হয়েছে, لَفِي الْخُسْرِ বলা হয়নি। কেননা অনির্দিষ্ট শব্দ কোনো সময় ভয়ানক বুঝায়, আবার কোনো সময় তাচ্ছিল্য বুঝায়। ভয়ানক বুঝালে আয়াতের অর্থ হবে–اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ عَظِيْمٍ لَايَعْلَمُ كُنْهَهُ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ নিশ্চয় মানুষ ভয়ানক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। আর যদি তাচ্ছিল্য বুঝায় তাহলে অর্থ হবে– নিশ্চয় শয়তানের ধ্বংস ছাড়া মানুষেরও ধ্বংস আছে। কেননা হে শয়তান! আমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার চেয়েও বেশি নাফরমান বর্তমান রয়েছে। প্রথম অর্থটি-ই সঠিক। –[কাবীর]

আয়াতে কতিপয় তাকিদ : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ আয়াতে কয়েকটি তাকিদ রয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা خُسْرَانٌ কে চূড়ান্ত করে বুঝিয়েছেন-

১. فِيْ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা ধ্বংসের মধ্যে ডুবে রয়েছে, চতুর্দিক থেকে ধ্বংস তাদেরকে বেষ্টন করে আছে।

২. إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ব্যবহার করা হয়েছে, যা তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. لَفِيْ خُسْرٍ -এর মধ্যে لَامٌ ব্যবহৃত হয়েছে। -[কাবীর]

গুণ চতুষ্টয় : উপরিউক্ত সূরায় ক্ষতির ভাগ হতে নিষ্কৃতি লাভ করে সাফল্য লাভের যে চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই-

১. **ঈমান :** ঈমান হলো ইহকাল ও পরকালের মুক্তি লাভের প্রধান শর্ত। ঈমান ব্যতিরেকে যতই উত্তম ও কল্যাণজনক কাজ করা হোক না কেন, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না এবং পরকালেও তাতে মুক্তি ও সাফল্য আসবে না। এখানে ঈমান দ্বারা সংক্ষেপে আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, তাকদীর, পরকাল ও হিসাব-নিকাশ প্রভৃতির প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে।

২. **নেক আমল ও সৎকাজ :** এটাকেও আল্লাহ তা'আলা মুক্তির দ্বিতীয় শর্ত নিরূপণ করেছেন। কেননা ঈমানের পরিচয় দেয় আমল। বীজ ও চারার সাথে বৃক্ষের যে সম্পর্ক, ঈমান ও নেক আমলের মধ্যে সে সম্পর্ক। বীজ দ্বারা যদি চারা না গজায়, তবে বুঝতে হবে, বীজ মাটিতলায় চাপা পড়ে গেছে। অতএব, কারো ঈমানের ফলশ্রুতিরূপে নেক আমল জীবনে প্রতিফলিত না হলে বুঝতে হবে, তার গোড়ায় যে কোনো কারণ রয়েছে। সুতরাং মূল কারণ উদ্ঘাটন করে তা নিরসনের জন্য তৎপর হওয়া উচিত।

৩. **সত্যের পারস্পরিক উপদেশ :** এখানে হক শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর আভিধানিক অর্থ হলো- সত্য, স্বত্ব, অধিকার ইত্যাদি। আয়াতে সম্ভবতঃ মানুষের অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণে এবং তা আদায়করণেই পারস্পরিক উপদেশের কথা বলা হয়েছে।

৪. **ধৈর্যের পারস্পরিক নসিহত :** ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা যে মানব জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি, তা বলাই বাহুল্য। ধৈর্য অবলম্বনের কথা কুরআন মাজীদের বহু আয়াতেই বর্তমান।

اَلصّٰلِحٰتِ বলতে যা বুঝায় : ঈমানের পর মানুষকে ক্ষতি হতে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য তা হলো নেক কাজ করা। আয়াতে صَالِحَاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সকল প্রকার নেক ও ভালো কাজ এর মধ্যে শামিল; কিন্তু কুরআনের ঘোষণানুযায়ী কোনো আমল-ই عَمَلٌ صَالِحٌ নয়, যদি তার মূলে ঈমান বর্তমান না থাকে এবং তা শরিয়ত অনুযায়ী সম্পাদিত না হয়।

এ কারণেই কুরআনে কারীমে عَمَلٌ صَالِحٌ -এর পূর্বে ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানহীন আমলের কোনো শুভ ফল হওয়ার কথা কোথাও বলা হয়নি; অন্যদিকে ঐ ঈমান-ই গ্রহণযোগ্য যার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আমল পেশ হয়ে থাকে। নতুবা 'আমলে সালেহ' ছাড়া ঈমান একটি মৌখিক দাবি মাত্র। আর ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য শুধু ঈমানকে উল্লেখ না করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরায় আমলকে শর্ত করে দিয়েছেন।

اَلْحَقُّ বলতে যা বুঝায় : وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ -এর মধ্যকার 'হক' শব্দটি বাতিলের বিপরীত সাধারণত এর দু'টি অর্থ হয়ে থাকে:

১. সহীহ, ঠিক, নির্ভুল, পূর্ণ সত্য, ইনসাফ ও সুবিচার মোতাবেক ও প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ কথা। তা ঈমান ও আকীদার কথা হোক, কিংবা বৈষয়িক কাজ সম্পর্কিত হোক।

২. হক অর্থ- অধিকার। এটা এমন অধিকার, যা যথাযথভাবে আদায় করা মানুষের উপর কর্তব্য। সে হক আল্লাহর হোক কি বান্দার, অথবা নিজের-ই অধিকার হোক না কেন, সব-ই এর মধ্যে শামিল।

৩. কারো মতে 'হক' বলতে তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) 'হক' -এর অর্থ আয়াতে 'কুরআন' হবে বলে উল্লেখ করেছেন, তবে সাধারণ অর্থ নেওয়াই উত্তম। -[ফাতহুল কাদীর]

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন- এখানে حَقٌّ দ্বারা কুরআনে কারীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর সবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। -[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ : সূরা আল-হুমাযাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের "هُمَزَةٌ" শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। هُمَزَةٌ অর্থ– নিন্দুক। অত্র সূরায় নিন্দুকের ভয়াবহ পরিণতির উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় নামকরণ স্বার্থক হয়েছে। এতে ৯টি আয়াত ও ১৬১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য সূরাটি মাক্কী। বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : ইসলাম-পূর্ব যুগে জাহেলিয়াতের আরব সমাজের অর্থ পূজারী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ত্রুটি ও দোষ বিদ্যমান ছিল। এ সূরায় তার-ই বীভৎসতা ব্যক্ত করে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এর কারণে মানুষ মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ-আস্বাদ, আরাম-আয়েশ ও মান-মর্যাদা অত্যধিক অর্জন করার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় বেশি দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ও চেষ্টায় দিন-রাত তন্ময় হয়ে থাকে। সুতরাং তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে তোমাদেরকে যে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সম্পদ অসৎ পথে উপার্জন এবং তার যথেচ্ছা ব্যয়ের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, জাহান্নামই হবে এ সব লোকদের চির আবাস। তাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেদিন জাহান্নামের আগুন হতে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। দাহনকারী আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে। কাজেই যারা ধন-সম্পদের অহমিকায় পড়ে পরনিন্দায় ও মানুষকে কটাক্ষ করার পেছনে পড়ে রয়েছে, তাদের এখন হতেই সাবধান হওয়া উচিত। এ সব অহঙ্কারী নিন্দুক ধনীদের আবাসস্থল হবে হুতামাহ নামক দোজখ।

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-হুমাযাহ্ মক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

تِسْعُ اٰيَاتٍ : ৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ اَوْ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ اَىْ كَثِيْرِ الْهَمْزِ وَاللَّمْزِ اَىِ الْغِيْبَةِ نَزَلَتْ فِيْمَنْ كَانَ يَغْتَابُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ كَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَغَيْرِهِمَا ـ

১. দুর্ভোগ অভিশাপমূলক শব্দ অথবা জাহান্নামের একটি উপত্যকা সে সকল লোকের জন্য, যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে অর্থাৎ অধিক ছিদ্রান্বেষণ ও সমালোচনাকারী অর্থাৎ পরচর্চাকারী। এ আয়াতটি সে সমস্ত লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের দুর্নাম করে বেড়াত। যেমন– উমাইয়া ইবনে খালফ, অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ প্রমুখ।

٢. اَلَّذِىْ جَمَعَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ اَحْصَاهُ وَجَعَلَهٗ عُدَّةً لِحَوَادِثِ الدَّهْرِ ـ

২. যে সঞ্চয় করে শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, সম্পদ এবং একে বারংবার গণনা করে গণনা করে এবং বিপদকালীন সময় কাজে আসবে এ ধারণায় সংরক্ষণ করে।

٣. يَحْسَبُ لِجَهْلِهٖ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ جَعَلَهٗ خَالِدًا لَا يَمُوْتُ ـ

৩. সে ধারণা করে তার অজ্ঞতার কারণে যে, তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে তাকে চিরস্থায়ী করে দিবে এবং সে মৃত্যুবরণ করবে না।

٤. كَلَّا رَدْعٌ لَيُنْبَذَنَّ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ لَيُطْرَحَنَّ فِى الْحُطَمَةِ الَّتِىْ تَحْطِمُ كُلَّ مَا اُلْقِىَ فِيْهَا ـ

৪. কখনো নয় এটা ভর্ৎসনা উদ্দেশ্যে সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে এটা উহ্য শপথের জবাব। অর্থাৎ সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে ভস্মকারী দোজখে যা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত সকল বস্তুকে ভস্ম করে ফেলবে।

٥. وَمَآ اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ مَا الْحُطَمَةُ ـ

৫. তুমি কি জান? তোমার কি জানা আছে? ভস্মকারী কি?

٦. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الْمُسَعَّرَةُ ـ

৬ এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি লেলিহান শিখাযুক্ত।

٧. الَّتِىْ تَطَّلِعُ تَشْرُفُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ الْقُلُوْبِ فَتُحْرِقُهَا وَاَلَمُهَا اَشَدُّ مِنْ اَلَمِ غَيْرِهَا لِلُطْفِهَا ـ

৭. যা গ্রাস করবে ভেদ করবে অন্তরসমূহ অন্তরসমূহে পর্যন্ত, তখন একে দাহন করবে। আর এর সূক্ষ্মতার কারণে তার পোড়ানোর কষ্ট অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অধিক কষ্টকর হবে।

٨. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ جَمَعَ الضَّمِيْرَ رِعَايَةً لِمَعْنَى كُلِّ مُؤْصَدَةٌ بِالْهَمْزَةِ وَبِالْوَاوِ بَدْلَهُ مُطْبَقَةٌ.

৮. নিশ্চয় এটা তাদেরকে كُلّ শব্দের অর্থগত দিক বিচারে বহুবচনীয় সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে. পরিবেষ্টিত করে রাখবে শব্দটি هَمْزَة অথবা তদস্থলে وَاوْ দ্বারা অর্থাৎ مُطْبَقَة

٩. فِيْ عَمَدٍ بِضَمِّ الْحَرْفَيْنِ وَبِفَتْحِهِمَا مُمَدَّدَةٍ صِفَةٌ لِمَا قَبْلَهُ فَتَكُوْنُ النَّارُ دَاخِلَةَ الْعَمَدِ.

৯. স্তম্ভসমূহে উভয় অক্ষরে পেশযোগে বা যবরযোগে শব্দটি উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। যা দীর্ঘায়িত এটা প্রথমোক্ত শব্দের صِفَتْ সুতরাং সে আগুন স্তম্ভসমূহের মধ্যে হবে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْ جَمَعَ-এর মহল্লে ই'রাব : اَلَّذِيْ শব্দটি كُلّ হতে بَدَلٌ হয়েছে। তখন جَرْ اِعْرَابْ হবে। অথবা ذَمّ হিসাবে মানসূব হবে। এ বাক্যটি এমন একটি গুণ যা 'কারণ'-এর স্থলাভিষিক্ত বা কাজ দেয়। -[কাবীর]

يَحْسَبُ اَنَّ الخ -এর মহল্লে ই'রাব : يَحْسَبُ اَنَّ الخ -এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় এর কোনো মহল্লে ই'রাব নেই।

২. অথবা, جَمَعَ -এর যমীর হতে حَالٌ হয়ে এটা مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

"لَيُنْبَذَنَّ" তারকীবে কি হয়েছে : আল্লাহর বাণী "لَيُنْبَذَنَّ" তারকীবে উহ্য শপথের জবাব হয়েছে।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ -এর মহল্লে ই'রাব : "نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ" আয়াত উহ্য মুবতাদা "هِيَ" -এর খবর হিসাবে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ : وَيْلٌ মুবতাদা, لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ খবর। اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالًا الخ বদল كُلّ হতে। অথবা, তিরস্কারের স্থলে নসবের স্থানে, অথবা এর পূর্ববর্তীর তা'লীল বা কারণ।

يَحْسَبُ اَنَّ الخ জুমলায়ে মুস্তানাফা, পূর্ববর্তী বাক্যকে স্থিরকরণের জন্য। কেউ কেউ বলেন, جَمَعَ -এর ফায়েল হতে হাল হিসাবে নসবের স্থানে অবস্থিত।

لَيُنْبَذَنَّ الخ লাম উহ্য কসমের জবাব। অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَايَطْرَحُنَّ

حُطَمَةٌ পূর্বোক্ত لَيُنْبَذَنَّ -এর যরফ। এটা حَطْم মূলবর্ণ হতে ইসমে ফায়েলে মুবালাগার সীগাহ। فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ এটা عَلَيْهِمْ -এর যমীর হতে হাল হিসাবে নসবের স্থলে রয়েছে। অর্থাৎ كَائِنِيْنَ فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ مُوْثَقِيْنَ فِيْهَا কেউ কেউ বলেন- এটা উহ্য মুবতাদার খবর। মুবতাদা হলো هُمْ অথবা مُؤْصَدَةٌ -এর সিফাত। نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ এটা উহ্য هِيَ মুবতাদার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে ইহকালীন ও পরকালীন কৃতকার্যতার জন্য চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা এ গুণ চতুষ্টয়ের বাহক নয়, তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অকৃতকার্য। অত্র সূরাতেও ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অকৃতকার্যতার শ্রেণি থেকে এক বিশেষ শ্রেণির উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলো, পরনিন্দুক ও অপবাদ প্রদানকারী।

শানে নুযূল : হযরত ওসমান ও ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমরা সর্বদা শুনে আসছি যে, সূরা আল-হুমাযাহ উবাই ইবনে খলফকে উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা সুদ্দী বলেন, এ সূরা আখনাস ইবনে শোরায়েককে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, উমাইয়া ইবনে খালফকে নবী করীম ﷺ এবং সাহাবীগণের নামে যখন সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে দুর্নাম ও নিন্দা করতে দেখতে পেলেন, তখন তাকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সূরাটিই অবতীর্ণ করেন। কতিপয় তাফসীরকারের মতে, এটা মুগীরা ইবনে অলীদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আস ইবনে ওয়ায়েলকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে বলেও কোনো কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়। -[লোবাব, খাযেন, জালালাইন]

وَيْلٌ-এর অর্থ : মুফাসসিরগণ এখানে وَيْلٌ -এর দু'টি অর্থ উল্লেখ করেছেন।

১. وَيْلٌ এটা অভিসম্পাত দেওয়ার জন্য ও ধ্বংস কামনার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. অথবা, এর দ্বারা জাহান্নামের একটি উপত্যকাকে বুঝানো হয়েছে।

প্রথমোক্ত মত অনুযায়ী শব্দটি মূলত ছিল وَيْ لِفُلَانٍ (অর্থাৎ অমুকের জন্য ধ্বংস বা আফসোস), و - ى ও لَامْ -কে যুক্ত করে পরবর্তী অংশকে হযফ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى 'هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ' : هُمَزَةٌ ও لُمَزَةٌ শব্দদ্বয় অর্থের দিক দিয়ে প্রায় সমার্থবোধক।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা পশ্চাতে দুর্নাম রটায়, অগোচরে কথা বলে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়- তাদেরকে هُمَزَةٌ ও لُمَزَةٌ দুই-ই বলে। অবশ্য কোনো কোনো মুফাসসির এদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন :

২. যারা পিছনে অপবাদ রটায় তাদেরকে هُمَزَةٌ বলে এবং যারা সামনে অপবাদ রটায় তাদেরকে لُمَزَةٌ বলে।

৩. মোকাতেল বলেন, যারা সামনে অপবাদ রটায় তাদেরকে هُمَزَةٌ বলে, আর যারা পেছনে অপবাদ রটায় তাদেরকে لُمَزَةٌ বলে।

৪. যারা হস্ত দ্বারা আক্রমণ করে তাদেরকে هُمَزَةٌ বলে এবং যারা পিছনে অপবাদ রটায় তাদেরকে لُمَزَةٌ বলে।

৫. হাসান বসরী (র.) বলেন, যে কারো সম্মুখে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে; তাকে লুমাযাহ বলা হয়; আর যে কারো পশ্চাতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে তাকে হুমাযাহ বলে।

৬. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কাতাদাহ (র.) বলেন, পরনিন্দাকারীকে 'হুমাযাহ' আর বিদ্রুপকারীকে 'লুমাযাহ' বল।

৭. হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, হাতের ইশারায় দোষ বর্ণনা ও দুঃখ দেওয়াকে হুমাযা আর জিহ্বা দ্বারা দোষ-ত্রুটি বর্ণনাকারীকে লুমাযাহ বলে।

৮. হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, 'হুমাযাহ' সে যে মানুষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে আর চোখের ইঙ্গিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনাকারীকে লুমাযাহ বলে।

৯. হযরত ইবনে কায়সান (র.) বলেন, 'হুমাযাহ' সে ব্যক্তি, যে নিজের সাথীকে কথা দ্বারা দুঃখ দেয়। আর 'লুমাযা' সে ব্যক্তি, যে চোখের বা মাথার ইশারা বা ভ্রুর ইঙ্গিতে মানুষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى 'الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ' : প্রথম কথাটির পর এ দ্বিতীয় কথাটি বলায় স্বতই এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে লোক অন্যদের অপমান-লাঞ্ছনার যে কাজ করে, তা তার ধনশীলতার অহমিকার কারণেই করে। جَمَعَ مَالًا -এর অর্থ হলো, সে বিপুল পরিমাণ মাল সঞ্চয় করে, আর গণনা করে রাখে- বলায় সে ব্যক্তির কার্পণ্য ও হীন মানসিকতা চোখের সামনে ভেসে উঠে

مَالًا শব্দকে নাকেরা নেওয়ার কারণ : সম্ভাব্য দু'টি কারণে مَالٌ -কে نَكِرَةٌ 'অনির্দিষ্ট' ব্যবহার করা হয়েছে।

১. 'মাল' এমন একটি বিশেষ্য বা নাম যা সারা দুনিয়ার সকল কিছুকে শামিল করে। অতএব, একজন মানুষের মাল দুনিয়ার সকল মালের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এ নগণ্য মাল নিয়ে মানুষ কিভাবে গৌরব এবং অহঙ্কার করে? এ কথা বুঝানোর জন্যই 'নাকেরাহ' ব্যবহার করা হয়েছে।

২. মালের অপকারিতা এবং ক্ষতিকে বিরাট করে দেখানোর জন্য 'নাকেরাহ' নেওয়া হয়েছে। মাল মানুষকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার। অতএব, একজন জ্ঞানী এবং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে মাল নিয়ে বড়াই ও অহঙ্কার করতে পারে? -[কাবীর]

وَعَدَّدَهُ শব্দের বিভিন্ন দিক : عَدَّدَ -এর অর্থ নিরূপণে কয়েকটি দিক দেখা যায়। যেমন- ক. عَدَّدَ শব্দটি اَلْعُدَّةُ হতে নির্গত। অর্থ-সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, গুদামজাত করা। খ. عَدَّدَ অর্থ- اَحْصٰى গণনা করা। তাশদীদযুক্ত ব্যবহার করা হয়েছে আধিক্য বুঝানোর জন্য গ. عَدَّدَ অর্থ كَثَّرَ অর্থাৎ অধিক করে এবং বাড়ায়। সবগুলো অর্থকে একসাথে আনলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, "যে মাল জমায় এবং পুঞ্জীভূত ও গুদামজাত করে, বারবার গণনা করে এবং অধিক মাল বাড়ানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।" -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

اَخْلَدَهُ -এর অর্থ : اَخْلَدَهُ -এর অর্থ হচ্ছে তাকে চিরস্থায়ী করবে এবং চিরন্তন জীবন দান করবে অর্থাৎ তাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবে ও রক্ষা করবে। অপর অর্থ এ হতে পারে যে, তার এ সম্পদ কোনো দিন হাত ছাড়া হবে না; বরং চিরদিন তার কাছে থাকবে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় ও গুনে গুনে রাখার কাজে এতই নিমগ্ন ও তন্ময় হয়ে পড়েছে যে, সে লোক মৃত্যুর কথাই ভুলে গেছে। এ সব বিপুল অর্থ-সম্পদ ছেড়ে রিক্ত হস্তে একদিন যে মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হবে এবং আল্লাহর নিকট পৌছতে হবে, তা তার স্মৃতি হতে মুছে গেছে। ভুলেও তার মনে এর কথা জাগরিত হয় না। ভেবে নিয়েছে আমার সম্পদ নেয় কে? চিরদিনই তা আমার কাছে থাকবে। −[কাবীর]

لَيُنْبَذَنَّ -তে হিকমত : আল্লাহ তা'আলা نَبْذ হতে উদ্ভূত ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। কেননা, نَبْذ শব্দের মধ্যে নিক্ষেপণের অর্থের সাথে সাথে اِهَانَة বা অপমান ও ঘৃণা রয়েছে। যেহেতু কাফের দল শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে সেহেতু তাদের জন্য এমন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে অপমান এবং তিরস্কার রয়েছে। −[কাবীর]

حُطَمَة -এর অর্থ : حُطَمَة শব্দটির আভিধানিক অর্থ− ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা। জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার অগ্নির একটি প্রকার। যেমন− سَقَرٌ ও لَظٰى দুই শ্রেণির আগুনের নাম। কেউ কেউ বলেন, হুতামা হচ্ছে জাহান্নামের দ্বিতীয় স্তরের নাম। এই আগুনকে হুতামা নামকরণের কারণ হলো, তা দেহের হাড় ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে− হে নিন্দুকগণ! তোমরা মানুষের মাংস আহার করছ এবং তাদের মান-সম্মানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছ। তোমাদের পিছনেও বিরাট হুতামা নামে এক অনলকুণ্ড রয়েছে, যা তোমাদের মাংসকে পুড়িয়ে হাড়গুলো গুড়াগুড়া করবে। −[কাবীর, খাযেন]

আগুনকে 'আল্লাহর আগুন' বলার কারণ : উপরিউক্ত ছয় নম্বর আয়াতে হুতামাকে 'আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে জাহান্নামকে আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন আর কোথাও বলা হয়নি। এখন তাকে আল্লাহর আগুন বলায় যেমন তার ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে, অপরদিকে এটাও প্রকাশ পায় যে, জাগতিক জীবনে ধন-সম্পদের নাগাল পেয়ে যারা গর্ব করে এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানে ও দুর্নাম করে বেড়ায়, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা খুব ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি তাদেরকে হুতামা নামক অগ্নি দ্বারা শাস্তি দিবেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـئِدَةِ" : সাত নম্বর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, হুতামা নামক আগুন তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। মূলে تَطَّلِعُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ উদয় হওয়া ও পৌছে যাওয়া, আর দ্বিতীয় অর্থ খবর পাওয়া, অবহিত হওয়া। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম হয়; হুতামা নামক অগ্নির দহন-ক্রিয়া তাদের হৃদয়কেও দহন করতে ছাড়বে না। এখানে দেহের অন্যান্য অঙ্গসমূহকে বাদ দিয়ে শুধু হৃদয় বা অন্তরের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো− হৃদয়ই হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূল। কুফরি-বেঈমানী, বাতিল আকীদা ও চিন্তাধারা সর্বপ্রথম এ স্থানেই উদয় হয়। সুতরাং এ কারণেই আল্লাহ সে নির্দিষ্ট স্থানটির কথা উল্লেখ করে বুঝাচ্ছেন যে, যে স্থানটি কুফরি ও দুষ্ট চিন্তা-ধারার উৎসমূল, সে স্থানটিতে হুতামা নামক আগুন হানা দিবে। −[কাবীর]

قَوْلُهُ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ : কাফেরদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পর চিরদিনের জন্য তার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে তারা তা হতে বের হতে পারবে না এবং দোজখের উত্তাপও বের হতে পারবে না।

হযরত শাহ আব্দুল আযীজ (র.) লিখেছেন, দোজখীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ আগুন পৌছে দেওয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যাদের জন্য দোজখের চিরস্থায়ী শাস্তির সিদ্ধান্ত হবে এবং যখন শুধু তারাই দোজখে থাকবে তখন দোজখীদেরকে লৌহ নির্মিত সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হবে। তারপর সে সিন্ধকগুলোকে বন্ধ করে দোজখের নিম্নদেশে নিক্ষেপ করা হবে। কেউ অন্যের আজাবকে দেখতে পাবে না। −[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ" : এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে হুতামার অনল গর্তে নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর তাতে স্থাপিত স্তম্ভের সাথে তাদেরকে বেঁধে রাখবেন। তখন তারা গলদেশে লোহার জিঞ্জির পরিহিত থাকবে এবং অনলকুণ্ডের দরওয়াজাগুলো আবদ্ধ করে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন− عَمَد দ্বারা প্রকাণ্ড কীলকের কথা বলা হয়েছে, যা জাহান্নামীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়ে তার উপর লোহার কীলক বসানো হবে, যার ফলে তারা জাহান্নামের উত্তাপে বের হওয়ার চেষ্টা করে বের হতে পারবে না। এরূপ অভিমতও পাওয়া যায় যে, জাহান্নামের মধ্যে কতগুলো লম্বা স্তম্ভ হবে, যার সাথে জাহান্নামীগণকে বেঁধে রাখা হবে। −[খাযেন]

* তাফসীরকার হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, এ খুঁটিগুলো দ্বারা দোজখের মধ্যে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।
* হযরত মোকাতেল (রা.) বলেছেন, দোজখীদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর কেউ তাদের নিকট যেতে পারবে না। −[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْفِيْلِ : সূরা আল-ফীল

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার প্রথম আয়াতের اَلْفِيْلِ শব্দ অবলম্বনে। اَصْحٰبُ الْفِيْلِ অর্থ– হস্তির অধিপতি। এটা দ্বারা একটি হস্তিসজ্জিত সেনাবাহিনীর কথা বুঝানো হয়েছে এবং তার পরাজয় কিভাবে হয়েছিল গোটা সূরায় তা-ই স্থান পেয়েছে। এ কারণেই সূরাটির নাম যথাযথ হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : তাফসীরকারকদের সর্বসম্মত মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করলেই অনুমিত হয় যে, এটা মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম।

ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ : ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইয়েমেনের ইহুদি শাসক যুনাওয়াস তথাকার খ্রিস্টানদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে–ধ্বংসপ্রায় করে ফেলে। এতে পার্শ্ববর্তী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসকগণ খুব ক্ষুব্ধ হয়। এরই প্রতিশোধে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনের উপর অভিযান চালিয়ে আবিসিনিয়ার শাসকগণ ইয়েমেনের হিময়ারী সরকারের পতন ঘটায় এবং দেশটি দখল করে নেয়। এ অভিযানের প্রধান নায়ক ছিল এরিয়াত এবং তার সহকারী ছিল আবরাহা। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে যুদ্ধ বেঁধে যায়। আবরাহা এরিয়াতকে হত্যা করে ইয়েমেনের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। আবিসিনিয়া শাসকদের ইয়েমেন দখল করার পিছনে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি কার্যকর থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও তারা দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ধর্মীয় প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল একটি বাহানা মাত্র। আর সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হলো আরবের সাথে পূর্ব আফ্রিকা, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক জলপথ ও স্থলপথের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কেননা শত শত বছর ধরে আরবগণ এ পথে যাতায়াত করে প্রভূত মুনাফা লাভ করে আসছিল। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। ইয়েমেন দখল করার পূর্বে লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক পথটি তারা রোমানদের সহায়তায় দখল করে নিয়েছিল।

এখন লক্ষ্য হলো, শাতিল আরব হতে মিসর ও সিরিয়া গমনের স্থলপথ। পথটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল ইয়েমেনের আবরাহা সরকারের মূল উদ্দেশ্য– কিন্তু এ উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে আবরাহা নতুন এক ফন্দি করল। সে আরবদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান-মর্যাদা বিলীন করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের জন্য ইয়েমেনের সানয়ায় একটি আন্তর্জাতিক মানের গীর্জা নির্মাণ করল এবং সেখানে হজের মৌসুমে দুনিয়ার সমস্ত লোককে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাল। কিন্তু ইয়ামেনের খ্রিস্টান লোক ব্যতীত হজের মৌসুমে অন্য কোনো এলাকার লোকের সমাগম না দেখতে পেয়ে সে ভাবল, মক্কার ঘরই হচ্ছে এর অন্তরায়। মক্কার কা'বা ঘরকে ধ্বংস করা ব্যতীত সানয়ায় এ আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তাই সে সদর্পে ঘোষণা করল, আমি মক্কার হজ অনুষ্ঠান আগামী বৎসর হতে এ সানয়ায়ই করতে চাই। সুতরাং এ জন্য, আমার প্রথম কর্তব্য হবে–মক্কার কা'বা ঘরকে ধূলিসাৎ করে ফেলা। এ ঘোষণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। এ উদ্দেশ্যে সে ষাট হাজার দুর্ধর্ষ সেনার একটি বিরাট বাহিনী সাজাল। ঐ বাহিনীতে ১৩টি যুদ্ধ-হস্তিও ছিল। অতঃপর সে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল।

আবরাহার বাহিনী কা'বা ধ্বংসের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলল। পথে দু'টি গোত্র তাদেরকে বাধা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারা এ বিশাল বাহিনীর শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতে না পেরে পরাজয় বরণ করল। আবরাহা বাহিনী তায়েফে উপনীত হলে তথাকার লোকেরা নিজেদের 'লাৎ মন্দির' ভেঙ্গে ফেলার আশঙ্কা করল। কিন্তু তারা এত বড় বিরাট শক্তির মোকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকতে পারবে না, এ ধারণায় তাদের একটি প্রতিনিধি আবরাহার নিকট গিয়ে বলল– আপনার মূল লক্ষ্য হলো কা'বা-গৃহ। আপনি আমাদের লাত-মন্দির ধ্বংস করবেন না, আমরা আপনার মক্কায় পৌছার পথ প্রদর্শনের ভূমিকা পালন করবো, আবরাহা এতে সম্মত হলো। আবূ রিগাল নামে এক ব্যক্তিকে তার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করল; কিন্তু আল-মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌছলে– আবূ রিগাল মারা গেল।

সেখান হতে আবরাহা একটি অগ্রবর্তী দল পাঠাল। তারা তেহামা হতে কুরাইশদের অনেক পালিত পশু লুণ্ঠন করে নিয়ে আসল। তারা মহানবী ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবেরও দুইশত উষ্ট্র লুট করে নিয়ে আসে।

আবরাহা বাহিনী আস-সিফাহ (আরাফাহ পর্বতমালার নিকটবর্তী স্থান) নামক স্থানে পৌঁছে কুরাইশদের নিকট দূত পাঠায়। দূত বলল, আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আসিনি, কা'বা ঘর ধ্বংস করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তোমরা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে না আসলে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো না। জবাবে কুরাইশ সরদার আব্দুল মুত্তালিব বললেন– তোমাদের সাথেও আমাদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা নেই। কা'বা ঘরের যে মালিক, তিনি তার ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলল, তবে আপনি আমার সাথে আমাদের সেনাপতি আবরাহার নিকট চলুন। আব্দুল মুত্তালিব তাঁর কথায় আবরাহার নিকট গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন খুব সুশ্রী বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো। সে নিজের আসন হতে উঠে এসে তার পাশে বসল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার যেসব উট লুট করে আনা হয়েছে তা ফেরত দিন। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এ কথায় আমার দৃষ্টিতে আপনার কোনো মর্যাদা থাকল না। কেননা পিতৃ ধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার জন্য আপনি কোনো কথাই বললেন না। তিনি বললেন, আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক, আর সেগুলো সম্পর্কেই আপনার নিকট আবেদন করতে এসেছি। এ ঘরের ব্যাপার আলাদা। এর একজন রব আছেন, তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা বলল, সে আমার আঘাত হতে তা রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, ঐ ব্যাপারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তা আপনি জানেন, আর তিনি [এ ঘরের মালিক] জানেন। এ কথা বলে তিনি আবরাহার নিকট হতে ফিরে আসলেন। পরে সে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায়, আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বলেছেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের নিকট হতে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। কিন্তু আবরাহা তাতে রাজি হলো না।

আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার সেনানিবাস হতে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে সাধারণ হত্যাকাণ্ড হতে বাঁচার জন্য বংশ-পরিবার নিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। পরে তিনি কুরাইশদের কতিপয় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে হারাম শরীফে উপস্থিত হন এবং কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর সেবকদের হেফাজত করেন। সেদিন কোনো দেব-দেবীর নিকট নয়; বরং একমাত্র আল্লাহর নিকটই তারা দোয়া করেছিলেন। ইবনে হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে আব্দুল মুত্তালিবের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা উল্লেখ করেছেন।

لَاهُمَّ اِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ * رِحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكَ
لَايَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ * وَمِحَالُهُمْ غَدًا وَمِحَالُكَ
اِنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ * وَقِبْلَتَنَا فَاَمْرٌ مَا بَدَا لَكَ

হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘরের সংরক্ষণ করে,
আপনিও রক্ষা করুন আপনার নিজের ঘর।
কাল যেন তাদের ক্রুশ এবং চেষ্টা-যত্ন আপনার ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় জয়ী হতে না পারে।
আপনি যদি তাদেরকে এবং আমাদের কেবলা ঘরকে এমনিই ছেড়ে দিতে চান, তাহলে আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করুন। সুহাইলী 'রওজুল উনুফ' নামক গ্রন্থে এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত কবিতাংশও উদ্ধৃত করেছেন–

وَانْصُرْنَا عَلٰى اٰلِ الصَّلِيْبِ * وَعَابِدِيْهِ الْيَوْمَ لَكَ

ক্রুশধারী ও তার পূজারীদের মোকাবিলায় আমি আপনাকে ছাড়া আর কারো নিকট কোনো আশা রাখি না।
ইবনে জারীর আব্দুল মুত্তালিবের দোয়া প্রসঙ্গে পড়া নিম্নোক্ত ছত্র দু'টিরও উল্লেখ করেছেন।

يَا رَبِّ لَا اَرْجُوْ لَهُمْ سِوَاكَا * يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا
اِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَا * اِمْنَعْهُمْ اَنْ يُّخَرِّبُوْا قِرَاكَا

"হে আমার প্রভু! তাদের মোকাবিলায় আমি তোমাকে ব্যতীত আর কারো নিকট কোনো কিছু আশা করি না। হে প্রভু! তুমি তোমার ঘরকে রক্ষা করো। এ ঘরের শত্রুগণ, তোমার শত্রু। তোমার জনবসতি তাদের আক্রমণ হতে মুক্ত রাখো।"

আব্দুল মুত্তালিব এ প্রার্থনা করার পর স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে পর্বতমালায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। পরদিন আবরাহার বাহিনী মুহাসসির (মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী মুহাস্সাব উপত্যকার নিকবর্তী স্থান) নামক স্থান হতে কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বাহিনীর অগ্রে আবরাহার হস্তিটিকে পরিচালনা করল। কিঞ্চিৎ দূরে যাওয়ার পরই হস্তিটি বসে পড়ল, কোনো ক্রমেই অগ্রসর হতে চাইল

না। মারপিট দেওয়া হলো, তবুও হাতিটি নড়ল না। মুখ ফিরিয়ে চালনার চেষ্টা করা হলে সে দিকে চলল; কিন্তু যখনই কা'বা অভিমুখী হয়, তখনই হাতিটি বসে পড়ে। তারপর শুরু হলো আবরাহা বাহিনীর উপর আল্লাহর গজব নাজিলের পালা। লোহিত সাগরের দিক হতে ঝাঁকে ঝাঁকে অপরিচিত নতুন পক্ষীকুল এসে তাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর বর্ষণ করতে লাগল। কঙ্করগুলো আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার তেজস্ক্রিয়া ছিল খুব বেশি। যার দেহে পড়ত, তার দেহেই জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হতো। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত গোটা দেখা দিত। যেখানে পড়ত সেখান সরাসরি বিপরীত দিক দিয়ে বের হয়ে যেত। দৈহিক জ্বালা-পোড়া, বসন্ত গোটা উদ্গমন ও কঙ্কর বর্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল এবং সে স্থানেই অনেকে মৃত্যুবরণ করল। আর পথে পথেও অনেকে পড়ে রইল। আবরাহাও কঙ্কর আঘাতে জখম হয়ে কোনো মতে খাসয়াম অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে ছিল। অতঃপর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এটাই আসহাবুল ফীলের ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এ ঘটনা সমগ্র আরবদেশে ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ দুনিয়ার বুকে স্বীয় অসীম কুদরতের যৎকিঞ্চিৎ নজির স্থাপন করলেন। মক্কার লোকগণ এ ঘটনায় আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করল। আরবগণ এ ঘটনার পর হতে দশ বছর পর্যন্ত প্রতিমা পূজা ছেড়ে নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করত। এ বছরটি আরবদের নিকট 'হস্তি বছর' নামে সুপরিচিত হয়ে গেল। আবরাহার হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার ঘটনাটি যে মাসে সংঘটিত হয়, তা ছিল মহররম মাস। মহানবী ﷺ-এর জন্মের দুই মাস পূর্বে। দুই মাস পরই ১২ই রবিউল আউয়াল কাবার প্রহরী ও বিশ্বমানবের মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ মুজতবা আহমদ মুস্তফা ﷺ ধরার বুকে তাশরীফ আনেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনাটিকে নিয়ে সেকালের বহু বিখ্যাত কবিও অনেক কবিতা-চরণ লিখে ঘটনাটিকে অমর করে রেখেছেন। পক্ষীকুলের নিক্ষিপ্ত কঙ্করগুলোও নিজেদের নিকট স্মৃতি স্বরূপ রেখে ছিল। তাদের বিপুল রণসম্ভার ও খাদ্য সামগ্রী কুরাইশদের হস্তগত হলো। এ সূরা নাজিল হওয়া পর্যন্ত এ ঘটনার অনেক দর্শকই তখন বর্তমান ছিল। মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান। ঘটনাটি আরবের লোকদের মুখেমুখেই লেগে ছিল। এ কারণেই সূরায় বিস্তারিত ঘটনা আলোচিত না হয়ে যেটুকু মক্কাবাসীদের সম্মুখে আলোচনার প্রয়োজন ছিল, তা-ই আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শাস্তিদানের বিবরণটি। এ সূরা অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশসহ সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে ইসলামি দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বিরোধিতা হতে বিরত থাকবারই প্রকারান্তরে আহবান জানিয়েছেন। -[খাযেন, কাছীর, মু'আলিম, হোসাইনী]

সূরাটির সারকথা : সূরা আল-ফীলে সংক্ষিপ্তভাবে আবরাহার আক্রমণ এবং ধ্বংস আলোচিত হয়েছে। কেননা মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বর্নিতা সকলের নিকটই এ ঘটনা জানা ছিল। আরবের কোনো ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। সমগ্র আরববাসীদের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার আক্রমণ হতে কা'বা ঘরের হেফাজতের কার্যটি কোনো দেব-দেবী কর্তৃক হয়নি। এটা নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহরই অবদান। এ কারণেই একাধারে কয়েকটি বছর পর্যন্ত কুরাইশের লোকেরা এ ঘটনার দ্বারা এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা এ সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেনি। এ ঘটনার উল্লেখ দ্বারা কুরাইশদের এবং সাধারণভাবে আরববাসীদের মনে চিন্তার খোরাক দেওয়া হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা অন্যান্য সব মা'বূদ পরিত্যাগ করার এবং একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগি করার দাওয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। সাথে সাথে এ কথাও যেন বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর এ সত্য দীনের দাওয়াতকে যদি তারা জোরপূর্বক দমন করতে চেষ্টা করে, তাহলে যে আল্লাহ হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তারা সে আল্লাহর ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে পড়ে চিরতরে ভস্ম হয়ে যেতে পারে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلَمْ تَرَ اِسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبٍ اَىْ اِعْجَبْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ هُوَ مَحْمُوْدٌ وَاَصْحَابُهُ اَبْرَهَةُ مَلِكُ الْيَمَنِ وَجَيْشُهُ بَنٰى بِصَنْعَاءَ كَنِيْسَةً لِيَصْرِفَ اِلَيْهَا الْحَاجَّ مِنْ مَكَّةَ فَاَحْدَثَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ فِيْهَا وَلَطَخَ قِبْلَتَهَا بِالْعَذِرَةِ اِحْتِقَارًا بِهَا فَحَلَفَ اَبْرَهَةُ لَيَهْدِمَنَّ الْكَعْبَةَ فَجَاءَ مَكَّةَ بِجَيْشِهِ عَلٰى اَفْيَالٍ مُقَدَّمُهَا مَحْمُوْدٌ فَحِيْنَ تَوَجَّهُوْا لِهَدْمِ الْكَعْبَةِ اَرْسَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا قَصَّهُ فِىْ قَوْلِهِ .

১. আপনি কি দেখেননি? اِسْتِفْهَامْ টি এখানে বিস্ময় বুঝানোর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ আপনি বিস্মিত হবেন কিরূপ আচরণ করেছেন আপনার প্রভু হস্তিওয়ালাদের সাথে। হস্তির নাম ছিল মাহমূদ। এর মালিক ছিল ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা এবং তার সৈন্যবাহিনী। আবরাহা সানয়ায় একটি গীর্জা নির্মাণ করেছিল। যাতে মক্কা হতে হাজীদেরকে সেদিকে ফিরাতে পারে [অর্থাৎ যাতে লোকজন মক্কায় হজ না করে তথায় গিয়ে হজ পালন করে]। তখন বনূ কেনানার এক ব্যক্তি একে অবমাননা করার জন্য তার ভিতরে ঢুকে পায়খানা করে এবং তাকে মলমূত্র দ্বারা কদর্য করে দেয়। এতে আবরাহা ক্ষুব্ধ হয়ে কা'বাকে ধ্বংস করার শপথ করে। সে তার সেনাবাহিনী ও কতিপয় হস্তিসহ মক্কায় আক্রমণ করে। সে বাহিনীর সম্মুখ ভাগে ছিল মাহমূদ [নামক হাতি]। সুতরাং যখন তারা কা'বা ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হলো তখন তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা [সে বাহিনী] প্রেরণ করেন যার উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

٢. اَلَمْ يَجْعَلْ اَىْ جَعَلَ كَيْدَهُمْ فِىْ هَدْمِ الْكَعْبَةِ فِىْ تَضْلِيْلٍ خَسَارٍ وَهَلَاكٍ .

২. তিনি কি করে দেননি? অর্থাৎ অবশ্যই করে দিয়েছেন। তাদের প্রচেষ্টাকে কা'বা ধ্বংসের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ব্যর্থ ও ধ্বংস।

٣. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ جَمَاعَاتٍ قِيْلَ لَا وَاحِدَ لَهُ وَقِيْلَ وَاحِدُهُ اِبُّوْلٌ اَوْ اِبَّالٌ اَوْ اِبِيْلٌ كَعَجُّوْلٍ وَمِفْتَاحٍ وَسِكِّيْنٍ .

৩. আর তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাদের উপর পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে কেউ কেউ বলেছেন, اَبَابِيْل শব্দের একবচন নেই। কারো কারো মতে, এর একবচন اِبُّوْلٌ বা اِبَّالٌ অথবা اِبِيْلٌ যেমন عَجُّوْل ، مِفْتَاح ও سِكِّيْنٌ -

٤. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ طِيْنٍ مَطْبُوْخٍ .

৪. যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল কঙ্কর পাকা মাটি।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ كَوَرَقِ زَرْعٍ اَكَلَتْهُ الدَّوَابُّ وَدَاسَتْهُ وَاَفْنَتْهُ اَىْ اَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ وَاحِدٍ بِحَجَرَةِ الْمَكْتُوْبِ عَلَيْهِ اِسْمُهُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنَ الْعَدَسَةِ وَاَصْغَرُ مِنَ الْحِمَّصَةِ يَخْرِقُ الْبَيْضَةَ وَالرَّجُلَ وَالْفِيْلَ وَيَصِلُ اِلَى الْاَرْضِ وَكَانَ هٰذَا عَامَ مَوْلِدِ النَّبِىِّ ﷺ.

৫. ফলে তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দিলেন, অর্থাৎ এমন শস্য পত্রে করে দিয়েছেন যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করেছে, একে মেড়েছে ও ধ্বংস করে ফেলেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে সে কঙ্কর দ্বারা ধ্বংস করেছেন, যার মধ্যে তার নাম লিখিত ছিল। আর সে পাথরটির আকার ছিল ডাল অপেক্ষা বড় এবং চনা অপেক্ষা ছোট। এটা লোহার টুপী, ব্যক্তি ও হাতির শরীর ভেদ করে ভূমিতে পতিত হতো। আর এ ঘটনাটি নবী করীম ﷺ -এর জন্মের বছর সংঘটিত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মানুষের নৈতিক দুর্বলতার উল্লেখ রয়েছে। এই মর্মে যে, যারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করবে, মানুষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করবে, তাদের জন্য পরকালে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আর অত্র সূরায় এ কথা যোগ করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি করবে এবং দীন ইসলামের সাথে শত্রুতা করবে তাদের শাস্তি যে পরকালেই হবে তা নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর তাদের অন্যায় আচরণই হবে তাদের ধ্বংসের কারণ। যেমন ইয়েমেনের রাজা আবরাহাকে আল্লাহ তা'আলা তার বিরাট সৈন্য ও হস্তিবাহিনীসহ ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস করেছিলেন। -[নূরুল কোরআন]

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ الخ আয়াতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? : اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ الخ-এর মধ্যে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। মূলত শুধু নবী করীম ﷺ বা কুরাইশই নয়; বরং সমস্ত আরববাসীকে লক্ষ্য করেই, তুমি কি দেখনি? বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে ও পরবর্তী কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা তদানীন্তন আরবের সব লোকই এ ঘটনাটি জানত। কুরআন মাজীদের বহু স্থানে "اَلَمْ تَرَ" 'তুমি কি দেখনি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা মূলত সাধারণ লোকদেরকে কিছু বলাই উদ্দেশ্য।

এ স্থলে 'দেখনি' কথাটির তাৎপর্য এই যে, সে সময় মক্কা, মক্কার আশপাশ ও আরবের বিশাল অঞ্চলে, মক্কা হতে ইয়েমেন পর্যন্ত এমন বহু সংখ্যক লোক জীবিত ছিল, যারা নিজেদের চোখে হস্তিবাহিনীর ঘটনাটি দেখেছিল। কেননা এ ঘটনাটি ঘটেছিল সে সময়ের মাত্র ৪০/৪৫ বছর পূর্বে। সারা আরব প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হতে এ ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে পেরেছিল। ফলে এটা সকলের নিকট নিজ চোখে দেখা ঘটনার মতোই সন্দেহাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

اَلَمْ تَعْلَمْ 'আপনি কি জানেননি' না বলে اَلَمْ تَرَ বলার কারণ : এখানে সম্বোধিত ব্যক্তি যদি বিশেষ করে নবী করীম ﷺ হন, আর দেখা দ্বারা অন্তরের সাথে দেখা উদ্দেশ্য হয় অথবা যদি সম্বোধিত ব্যক্তি ব্যাপক হয় আর দেখা দ্বারা অন্তরের সাথে দেখা বা বাহ্যিকভাবে দেখা- যা-ই উদ্দেশ্য হোক, তাহলে কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না; কিন্তু দেখা দ্বারা যদি বাহ্যিকভাবে দেখা উদ্দেশ্য হয়, আর সম্বোধিত ব্যক্তিও বিশেষ করে নবী করীম ﷺ হন, তাহলে অবশ্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নবী করীম ﷺ তো তখন বিদ্যমান ছিলেন না, কিভাবে তিনি দেখবেন? 'দেখা' না বলে 'জানা' শব্দ ব্যবহার করা দরকার ছিল। এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়-

ঘটনাটি অতীব নিকবর্তী হওয়ার কারণে তার অনেক নিদর্শন তখনও অবশিষ্ট রয়েছিল। যেসব ঘটনার নিদর্শন বর্তমান থাকে সে সকল ঘটনাকে উপস্থিত ঘটনার পর্যায়ে ফেলানো হয়ে থাকে।

অথবা, ব্যাপারটি খবরে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর খবরে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে যে ইল্ম অর্জিত হয়, তা দেখার সমতুল্য হওয়ার কারণে 'দেখা' বলা হয়েছে। -[কাবীর]

خَلَقَ - فَعَلَ এবং عَمِلَ-এর মধ্যে পার্থক্য : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ আয়াতে فَعَلَ ব্যবহার করা হয়েছে। عَمِلَ অথবা خَلَقَ বলা হয়নি। কেননা خَلَقَ কোনো কাজ শুরুতে সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। আর عَمِلَ শব্দটি তলবের পরে ব্যবহৃত হয়। فَعَلَ শব্দটি আম –সাধারণত উক্ত সব অর্থকে শামিল করে। অতএব, فَعَلَ-এর মধ্যে خَلَقَ-এর বৈশিষ্ট্য এভাবে পাওয়া গেছে যে, আল্লাহ নতুন করে আবাবীল পাখি সৃষ্টি করেছেন। আর عَمِلَ-এর অর্থও পাওয়া যায়। কেননা হস্তিদলকে তাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করিয়েছেন–কুরাইশদের দোয়ার মাধ্যমে।

এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহার না করে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা উক্ত তিনটি শব্দের অর্থকে শামিল করে। –[কাবীর]

আসহাবুল ফীলের পরিচয় : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগমনকারী ইয়েমেনের বিরাটকায় হস্তিবাহিনীকেই আসহাবুল ফীল নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো এই– ইয়েমেনের খ্রিস্টান শাসক আবরাহা কা'বা ঘরের অনুরূপ সানয়ায় একটি গীর্জা তৈরি করে তথায় লোকদেরকে প্রতিবছর জিলহজ মাসে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাল। আসল ইচ্ছা ছিল কা'বা-ঘরের বিকল্পরূপে খ্রিস্টানদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু তার আহ্বানে আরবের লোকেরা সাড়া দিল না। ফলে সে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় ঘোষণা করল। অতঃপর ষাট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী এবং তেরোটি যুদ্ধ-হস্তিসহ কা'বা ঘর আক্রমণের জন্য রওয়ানা হলো। পথে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে পরাজিত করে কা'বার অনতিদূরে এসে শিবির স্থাপন করল। মক্কার লোকগণ এ বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করার সাহস করল না। তাদের সর্দার আবদুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের দরজার কড়া ধরে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর ঘর এবং এর খাদেমগণকে আক্রমণকারীদের হাত হতে রক্ষার জন্য দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহর গায়েবী সাহায্য এসে গেল এবং ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে তাদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করল। আর তারা এর আঘাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হলো। এটাই হচ্ছে সূরাটির সারকথা।

أَصْحَابِ الْفِيْلِ বলার কারণ : এখানে مِلَاكُ الْفِيْلِ বা أَرْبَابُ الْفِيْلِ বলা হয়নি। কেননা أَصْحَابُ الْفِيْلِ বলা হয়েছে أَصْحَابٌ শব্দটি صَاحِبٌ-এর বহুবচন, صَاحِبٌ শব্দটি একই জাতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা উক্ত শব্দটি এ জাতির ব্যাপারে ব্যবহার করে বুঝাচ্ছেন যে, তারা হাতির জাতি বৈ কিছু নয়। কেননা তাদের মধ্যে পশুত্ব, নির্বুদ্ধিতা এমন পর্যায়ে বর্তমান ছিল যে, তারা হাতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, যখন مُصَاحَبَةٌ বা সাথীত্ব দু' ব্যক্তির মধ্যে হয়ে থাকে, তখন তুলনামূলক মর্যাদায় যে কম হয় তাকে صَاحِبٌ বলা হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথীদেরকে صَحَابَةٌ বলা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে صَاحِبٌ বলা হয় না। এমনিভাবে ঐ জাতিকে হাতির সাথী বলা হয়েছে, যারা মানুষ হয়ে হাতির أَصْحَابٌ হয়েছে এবং তারা মর্যাদার দিক থেকে হাতির চেয়ে কম। –[কাবীর]

كَيْدَهُمْ-এর তাৎপর্য : كَيْدٌ শব্দের অর্থ হলো– কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে গোপনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একেই বলা হয় ষড়যন্ত্র বা কৌশল গ্রহণ; কিন্তু ইয়েমেনের শাসক আবরাহা তো গোপন কোনো কিছু করেনি। তার কা'বা ঘর ধ্বংস করার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ছিল ঘোষিত বিষয়। আর এ উদ্দেশ্যেই সে ষাট হাজার সেনার একটি বিরাট বাহিনীসহ রওয়ানা হয়েছিল; কিন্তু কা'বা ঘর ধ্বংস করার পাশাপাশি তার আর যে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ছিল, তা সে প্রকাশ করেনি বটে– তা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সে চেয়েছিল কা'বা বিধ্বস্ত করে মক্কা ও এর আশেপাশের লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার পর দক্ষিণ আরবের সিরিয়া ও মিসরগামী স্থল পথটিকে আবিসিনিয়ার করতলগত করা। এ পথটি তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলেই সমগ্র আরবের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে। আর কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলে এ গোপন উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণে যে কোনোই বাধা থাকত না, তা সন্দেহাতীত। উপরিউক্ত كَيْدٌ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের এ গোপন উদ্দেশ্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ "تَضْلِيْل" : تَضْلِيْل শব্দটি ضَلَّ ধাতু হতে নির্গত। বাবে تَفْعِيْل-এর সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে– বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যচ্যুত করা। আরবগণ তীর নিক্ষেপ স্থলে বলে তার তীরটি ভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ তার তীরটি লক্ষ্যস্থানে আঘাত হানতে সক্ষম হয়নি–ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়েছে। এখানেও ইয়েমেন শাসকের অভিযান ও ষড়যন্ত্রকে নিষ্ফল ও ব্যর্থকরণের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন, সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে– وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ অর্থাৎ কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى طَيْرًا اَبَابِيْلَ : "طَيْرًا" শব্দের অর্থ হলো– পাখি। আর اَبَابِيْل-এর অর্থ– جَمَاعَتْ অর্থাৎ বহু সংখ্যক, বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দল। যা বিভিন্ন দিক হতে একই লক্ষ্য পানে ছুটে আসে, তা মানুষের দল হোক, অথবা জন্তু-জানোয়ারের। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, اَبَابِيْل এক ধরনের পাখির নাম। মুফাসসিরগণ হতে طَيْرًا اَبَابِيْلَ-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

ক. ইকরামা ও কাতাদাহ (র.) বলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি লোহিত সাগরের দিক হতে এসেছিল। ইকরামাহ (র.) এটাও বলেছেন যে, শিকারি পাখির মাথার মতোই ছিল এ পাখিগুলোর মাথা।

খ. হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেন, এ ধরনের পাখি না পূর্বে কখনো দেখা গেছে, না পরে কখনো দেখা গেছে। এটা না নজদের পাখি ছিল, না হেজাজের, না তেহামার, তা কেউই বলতে পারে না।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাদের চক্ষু পাখির মতোই ছিল, আর পাঞ্জা ছিল কুকুরের মতো। মোটকথা, তাদের আকার ও রং যাই হোক না কেন, তারা যেদিক হতেই আসুক না কেন, তারা ছিল আল্লাহর সাহায্যেরই বহিঃপ্রকাশ। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ : حِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ সিজ্জীল ধরনের পাথর। حِجَارَةٌ-এর অর্থ হলো- পাথর। তবে سِجِّيْلٍ-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, سِجِّيْلٌ শব্দটি سَنْگ ও گِيل এ দু'টি ফারসি শব্দ মিলিয়ে আরবি বানানো হয়েছে। এটা দ্বারা সে পাথরকে বুঝানো হয়েছে- যা মাটির গাড়া হতে বানানো হয়েছে ও আগুনে জ্বালিয়ে শক্ত করা হয়েছে। খোদ কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত হতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সূরা اَلذَّارِيَاتُ-এর ৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ [অর্থাৎ তা] মাটির গাড়া হতে বানানো পাথর ছিল।

খ. জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীর করেছেন طِيْنٍ مَطْبُوْخٍ অর্থাৎ পাকা মাটি।

গ. কারো কারো মতে سِجِّيْلٌ শব্দটি اَسْجَالٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর দ্বারা সে ফলকের কথা বুঝানো হয়েছে, যাতে কাফেরদের শাস্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে- তাদের প্রতি সে পাথর নিক্ষিপ্ত হলো, যা সিজ্জীল ফলকে লিখিত ছিল।

ঘ. কেউ কেউ বলেছেন, মাটি ও পাথরের গুঁড়া মিশ্রিত করে পুড়িয়ে যে ঢিল বানানো হয়, তাকে سِجِّيْلٌ বলে।

প্রায় সব বর্ণনাকারীই একমত হয়ে বলেছেন যে, প্রত্যকটি পাখির মুখে একটি ও পঞ্জায় দু'টি করে পাথর ছিল। মক্কার কোনো কোনো লোকের নিকট দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ পাথর কুচি নমুনাস্বরূপ রক্ষিত ছিল। আবূ নায়ীম নাওফল ইবনে আবূ মুয়াবিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হস্তি ওয়ালাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত পাথর কুচি আমি নিজ চক্ষে দেখেছি। এ পাথর কালচে লালবর্ণের মটরের ছোট দানার আকারের ছিল। আবূ নাঈম হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তা 'চিলগুজা' নামাক ফলের সমান ছিল। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে তা ছাগলের লাদের সমান ছিল।

মূলত সব পাথরকুচি এ আকারের ছিল না। তা বিভিন্ন আকারের ছিল বলেই বর্ণনায় এরূপ পার্থক্য পাওয়া যায়। -[খাযেন, মা'আলিম]

طَيْرًا-কে নাকেরাহ নেওয়ার কারণ : নিকৃষ্ট বুঝানোর জন্য طَيْرًا-কে নাকেরাহ নেওয়া হয়েছে। একদল নিকৃষ্ট পাখির দ্বারাই তাদেরকে বাধা ও ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহর কি হিকমত-তিনি এ ক্ষুদ্র এবং নিকৃষ্ট পাখি দ্বারা এত বড় কাজ করিয়েছেন।

অথবা, ছোট বস্তুকে বড় এবং গুরুত্ববহ বুঝানোর জন্য নাকেরাহ নেওয়া হয়েছে।-এমন কোন পাখি আছে যে, পাথর মারবে আর তার পাথর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না? -[কাবীর]

عَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ-এর অর্থ : فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ আয়াতের عَصْفٍ শব্দটির অর্থ হলো- ফসলের ঐ অবশিষ্ট অংশ যা শস্য কর্তন করার পর জমিনে পড়ে থাকে এবং জন্তুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অথবা, শস্য-দানার খোসা, যাকে আমাদের ভাষায় ভূষি বলা হয়। যেমন, ডালের ভূষি যা জীবজন্তুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। مَاْكُوْلٍ শব্দের অর্থ হলো যা ভক্ষণ করা হয়। সুতরাং আয়াতের মর্ম হলো, শস্যদানাকে মথিত করে যেভাবে ভূষি বের করা হয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা কা'বা ঘর আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রস্তর আঘাতে নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

* হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, عَصْفٍ শব্দের অর্থ হলো- গম গাছের পাতা।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গমের উপর গিলাফের ন্যায় যে আবরণ হয়, তাকে عَصْفٍ বলা হয়। আর مَاْكُوْلٍ অর্থ- জীব-জন্তুর চিবানো ঘাষ-পাতা।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলার গজব আবরাহা ও তার বাহিনীকে চিবানো ঘাস-পাতার ন্যায় করে দিয়েছিল। -[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ : সূরা আল-কুরাইশ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের قُرَيْشٌ শব্দটি দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৪টি আয়াত, ১৭টি বাক্য এবং ৭৩টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। খুব কম সংখ্যক তাফসীরকার একে মাদানী সূরা বলে অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সূরাটি মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়। কারণ সূরার দু' নম্বর আয়াতে فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ দ্বারা মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কথাই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাওয়াত দেওয়া।

মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির বহুকাল পূর্ব হতেই মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও অনৈসলামী আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং কা'বা ঘরকেই এ শিরকের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল। মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব হতেই কা'বা ঘরে ৩৬০টি প্রতিমা রাখা হয়েছিল; কিন্তু কুরাইশগণ এদেরকে আল্লাহ মানত না। এদের অসিলায় তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে, এ আশায় তারা এদের পূজা করত। এদের নিকট অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন পুরা করার প্রার্থনা করত। অথচ কুরাইশগণের সমগ্র আরবের উপর বংশীয় কৌলিন্য-আভিজাত্য, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম যশ-লাভের একমাত্র কারণ ছিল কা'বা ঘর। কা'বা ঘরের কারণেই তারা আবরাহার আক্রমণ হতে রক্ষা পেয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁর বহুবিধ বদান্যতা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন–হে কুরাইশগণ! তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরে। তোমরা দেশ হতে দেশান্তরে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে যাতায়াত করতে পারছ; এটা আল্লাহর ঘরের খেদমত ও সেবা করারই ফলশ্রুতি। সুতরাং তোমাদের উচিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে, এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগি করা; অভাব-অভিযোগ ও হাজত পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা– তিনিই তো তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করে সুখী-সমৃদ্ধিশালী করেছেন এবং তোমাদের জন্য ভিতর-বাইর সর্বত্র এবং বাণিজ্যিক পথগুলোকে নিরাপদ করেছেন। তোমরা যেখানেই যাও, সেখানেই আল্লাহর ঘরের খাদেম বলে সম্মান পাচ্ছ। এমনকি আরবের দুর্বৃত্ত ও ডাকাত দলও তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে না। তোমাদের প্রতি হামলা করে না, তোমরা আল্লাহর এ সব নিয়ামত কিরূপে বিস্মৃত হতে পার? তোমাদের উচিত, যে ঘরের দ্বারা লাভবান হচ্ছ সে ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা। অন্যথায় তোমাদের নিকট হতে এ নিয়ামত কেড়ে নেওয়া হবে। তখন তোমরা পদে পদে অপমান ও অপদস্থ হবে।
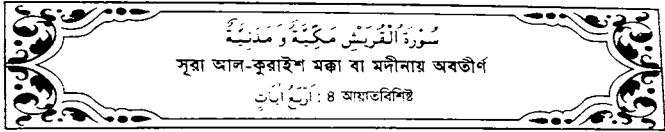
سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ وَ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আল-কুরাইশ মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

اَرْبَعُ اٰيَاتٍ : ৪ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ ـ

১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে।

٢. اِلٰفِهِمْ تَاكِيْدٌ وَهُوَ مَصْدَرُ اَلِفَ بِالْمَدِّ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ اِلَى الْيَمَنِ وَ رِحْلَةَ الصَّيْفِ اِلَى الشَّامِ فِىْ كُلِّ عَامٍ يَسْتَعِيْنُوْنَ بِالرِّحْلَتَيْنِ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الْاِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ الَّذِىْ هُوَ فَخْرُهُمْ وَهُمْ وُلْدُ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ـ

২. তাদের আসক্তি এটা (اِلٰفِهِمْ) তাকিদ হয়েছে। এটা اَلِفَ -এর মাসদার– যা মদ-এর সাথে পঠিত হয়েছে। শীতকালীন সফর ইয়েমেনের দিকে এবং সফর গ্রীষ্মকালীন সিরিয়ার দিকে প্রতি বছর তারা দু'টি বাণিজ্য সফর করত, মক্কায় নির্বিঘ্নে অবস্থান করার জন্য, যাতে [বাকি সময়] তারা সে ঘরের [অর্থাৎ কা'বার] খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে-যা তাদের গৌরবের বস্তু। আর তারা ছিল নযর ইবনে কেনানার বংশধর।

٣. فَلْيَعْبُدُوْا تَعَلَّقَ بِهٖ لِاِيْلَافِ وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ـ

৩. সেহেতু তাদের কর্তব্য হলো ইবাদত করা। এটা لِاِيْلَافِ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। এর فَا، অতিরিক্ত। এ ঘরের প্রভুর।

٤. اَلَّذِىْۤ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ لا اَىْ مِنْ اَجْلِهٖ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ اَىْ مِنْ اَجْلِهٖ وَكَانَ يُصِيْبُهُمُ الْجُوْعُ لِعَدَمِ الزَّرْعِ بِمَكَّةَ وَخَافُوْا جَيْشَ الْفِيْلِ ـ

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন অর্থাৎ ক্ষুধার কারণে আর তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন, ভয়-ভীতি হতে অর্থাৎ ভয়ের কারণে। মক্কায় শস্য উৎপাদন না হওয়ার কারণে তারা ক্ষুধার শিকার হতো। আর তারা হস্তিবাহিনীর আক্রমণে ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

তাহকীক ও তারকীব

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ-এর মহল্লে ই'রাব : رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ-এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান :

১. এটা মহল্লান مَرْفُوْعٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা هُمَا সর্বনামের خَبَرٌ হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে- هُمَا رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

২. অথবা, তা মহল্লান مَنْصُوْبٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা হয়তো-

ক. উহ্য فِعْلٌ-এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসাবে হয়েছে। বাক্যটি হবে- يَرْتَحِلُوْنَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

খ. অথবা, اِيْلَافٌ মাসদারের مَفْعُوْلٌ হয়েছে।

গ. অথবা, যরফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে যোগসূত্র : এ সূরার মূলকথা ও বক্তব্যের সাথে সূরা ফীল -এর বিষয়-বস্তুর গভীর মিল রয়েছে। যার ফলে কেউ কেউ উভয় সূরাকে একটি সূরা হিসাবে গণ্য করেছেন। কেননা পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরায়ও (কা'বার আশে-পাশে অবস্থিত) কুরইশদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা স্বতন্ত্র সূরা না পূর্ববর্তী সূরা আল-ফীল -এর অংশ এ ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়।

ক. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, এটা পূর্ববর্তী সূরা আল-ফীল-এর অংশ বিশেষ। কতিপয় হাদীসের বর্ণনা হতেও এ ধারণা বলিষ্ঠতা পেয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-এর নিকটে রক্ষিত মাসহাফে এ দু'টি সূরা এক সঙ্গে লিখিত রয়েছে। দু'টির মাঝে বিসমিল্লাহ লিখে পার্থক্য করা হয়নি। হযরত ওমর (রা.)ও একবার এ সূরা দু'টিকে মিলিয়ে পড়েছিলেন, এদের মধ্যে পার্থক্য করেননি।

খ. হযরত ওসমান (র.) যখন তার খেলাফতকালে কুরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূরাদ্বয় দু'টি স্বতন্ত্র সূরা হিসাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

قَوْلُهُ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ : اِيْلَافٌ শব্দটি اَلِفٌ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো- আসক্ত হওয়া, অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া।

আখফাশ, কিসায়ী, ফাররা ও ইবনে জারীর প্রমুখ ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, لِاِيْلَافِ-এর মধ্যস্থিত لَامٌ টি এখানে বিস্ময় প্রকাশের জন্য হয়েছে। এ দৃষ্টিতে اِيْلَافِ قُرَيْشٍ -এর অর্থ হবে- কুরাইশদের আচরণ বড়োই আশ্চর্যজনক। কেবল আল্লাহর অনুগ্রহেই তারা বিক্ষিপ্ত থাকার পর সংঘবদ্ধ হলো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তারা বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত হলো ও এর সাহায্যে আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করল, তা সত্ত্বেও তারা সে এক আল্লাহর ইবাদত হতে দূরে থাকছে।

খলীল ইবনে আহমদ, সীবওয়াইহ ও যামাখশারী প্রমুখ ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ বলেছেন- এ লাম (لَامٌ) টি কারণসূচক। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে- এমনি তো কুরাইশদের উপর আল্লাহর অসীম রহমতের-নিয়ামতের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই; কিন্তু অন্য কোনো নিয়ামতের জন্য না হলেও এ একটি নিয়ামতের কারণে তাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। আর সে নিয়ামতটি হলো, তারা এ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে। কেননা এ অবাধ ও শঙ্কাহীন বিদেশ যাত্রার সুযোগটাই আল্লাহ তা'আলার অতি বড় নিয়ামত।

لِاِيْلَافِ -এর লাম-এর সম্পর্ক : لِاِيْلَافِ -এর লাম-এর ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে-

১. পিছনের সূরার সাথে [সংশ্লিষ্ট] مُتَعَلِّقٌ মূলবাক্য এভাবে হবে যে, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُوْلٍ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ফীলকে ধ্বংস করেছেন, যেন কুরাইশ অবশিষ্ট থাকতে পারে।

২. অথবা, পূর্বোক্ত সূরার প্রথম অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট। মূলবাক্য হবে- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন- আমি যত কিছু তাদের সাথে করেছি- সব কিছু কুরাইশদের আসক্তির জন্য করেছি।

৩. অথবা, لِإِيلَافِ-এর লাম অর্থ إِلَى তখন আয়াতের অর্থ হবে-

فَعَلْنَا كُلَّ مَا فَعَلْنَا فِى السُّوْرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ إِلَى نِعْمَةٍ أُخْرَى عَلَيْهِمْ وَهِيَ إِيلَافُهُمْ .

অর্থাৎ পিছনের সূরায় বর্ণিত যা কিছু আমি করেছি তা অন্য একটি নিয়ামত প্রদানের উদ্দেশ্যে করেছি, তা হলো-তাদের মহব্বত, আসক্তি অথবা অভ্যস্ততা। -[কাবীর]

কুরাইশ কারা? : কুরাইশরা মূলত হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর অধঃস্তন বংশধরে فِهْر নামে এক লোক ছিল। তার উপাধি ছিল قُرَيْش [কুরাইশ]। তার বংশধররাই কুরাইশ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। ফিহির ব্যবসা-বাণিজ্য করে বহু ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিল বিধায় তার উপাধি হয়েছিল কুরাইশ।

কুরাইশরা মক্কার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। নবী করীম ﷺ-এর প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কেলাব সর্বপ্রথম তাদের মক্কায় একত্র করেন। এ জন্য তার উপাধি হয়েছে 'একত্রকারী'।

জনৈক কুরাইশী বলেছেন- أَبُونَا قُصَيٌّ كَانَ يُدْعَى مُجَمِّعًا * بِهِ جَمَّعَ اللّٰهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرٍ অর্থাৎ আমাদের পিতৃপুরুষ কুসাইকে একত্রকারী বলা হতো। তার অসিলায় ফিহিরের গোত্রসমূহকে আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় একত্র করেছেন। কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লীর পদ তাদের হাতে আসে। কা'বার খেদমতের কারণে সারা আরবে তাদের মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া কুরাইশরা অনুকূল পরিবেশের সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেও মনোনিবেশ করে। ক্রমে মক্কা একটি ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইতঃমধ্যে আবরাহার নেতৃত্বে মক্কার কা'বা ঘর আক্রমণ এবং তার ধ্বংসে গোটা আরবে- এমনকি আরবের বাইরেও কুরাইশদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ সব কারণে নবী করীম ﷺ বলেছেন- "قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ" কুরাইশ বংশের লোক অন্যসব লোকের নেতা। বায়হাকীতে হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "كَانَ هٰذَا الْأَمْرُ فِى حِمْيَرٍ فَنَزَعَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِى قُرَيْشٍ" আরবের সর্দারী ও নেতৃত্ব প্রথমে হেমইয়ার লোকদের মধ্যে ছিল। পরে আল্লাহ তাদের নিকট হতে তা কেড়ে নেন এবং কুরাইশকে দান করেন।

নিম্নে হযরত ইসমাঈল (আ.) পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর [ও কুরাইশদের] বংশধারা উল্লেখ করা হলো : মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কেলাব ইবনে মুররা ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহির (কুরাইশ) ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান ইবনে ইসমাঈল (আ.)।

কুরাইশকে কুরাইশ নামকরণ করা হয়েছে কেন? : মুফাস্‌সিরগণ قُرَيْش-কে কুরাইশ নামকরণের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. قُرَيْش শব্দটি قَرْش হতে নির্গত। এর অর্থ হলো- সঞ্চয় করা, উপার্জন করা। তাদের পিতৃপুরুষ বহু সম্পদ সঞ্চয় ও উপার্জন করেছেন বিধায় তার উপাধি হয়েছে কুরাইশ।
২. অথবা, এটি اَلتَّقَرُّشُ হতে নির্গত। যার অর্থ- একত্র হওয়া। কেননা কুরাইশরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার একত্র হয়েছিল।
৩. অথবা, اَلْقَرْشُ অর্থ- তালাশ করা, যেহেতু তারা নিঃস্ব হাজীদেরকে তালাশ করে তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করত, তাই তাদেরকে قُرَيْش বলে।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরাইশ হলো এক বিরাট সামুদ্রিক প্রাণী; যেদিকে সে যায় সেদিকে ছোট বড়, যা কিছু পায় সবই গিলে ফেলে। কিন্তু তাকে কেউ ভক্ষণ করতে পারে না। সবার উপর সে প্রাধান্য বিস্তার করে, এ কারণেই তাদেরকে قُرَيْش বলা হয়।
৫. অথবা, নযর ইবনে কিনানা যখন তার পোশাক পরিধান করে বসেছিল তখন লোকেরা বলল 'তাকাররাশা' তাই এ নামকরণ করা হয়।
৬. অথবা, নযর ইবনে কিনানা যখন তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল তখন লোকেরা বলল, এই তো কুরাইশ উষ্ট্র, অর্থাৎ শক্তিশালী উষ্ট্র।
৭. অথবা, قَرَشَهُ অর্থ- তাকে কেটেছে, যা কামূস গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তথা এদিক সেদিক থেকে একত্র করেছে। যেহেতু কুরাইশ বংশীয় লোকেরা ব্যবসায়িক মালপত্র চারদিক থেকে একত্র করত, তাই এ নামকরণ করা হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

"إِيْلَافٌ"-কে **দ্বিরুক্ত করার কারণ :** إِيْلَافٌ শব্দটিকে দ্বিরুক্ত করা হয়েছে, কেননা إِيْلَافٌ বা সম্প্রীতি এবং অভ্যাস তাদের মাঝে প্রকট ছিল, দ্বিরুক্তির মাধ্যমে তাকে তাকিদ করা হয়েছে। প্রথম إِيْلَافٌ থেকে দ্বিতীয় إِيْلَافٌ 'বদল' হয়েছে। এবং প্রথম إِيْلَافٌ দ্বারা عَامٌ বা সাধারণ إِيْلَافٌ উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় إِيْلَافٌ দ্বারা خَاصٌ বা বিশেষ করে দু'সফর উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের কারণ : উপরিউক্ত দুই নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, কুরাইশগণ শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনসহ উত্তর আরবের বিভিন্ন শহরে বাণিজ্যে যেত। কেননা এ সময়ে সেসব দেশে ঠাণ্ডা থাকত। আর শীতের মৌসুমে দক্ষিণ আরবের বিভিন্ন শহরে বাণিজ্যে যেত। কেননা এ সময় সেসব দেশে গরম আবহাওয়া থাকত। এ দু'মৌসুমে নিরাপদে কুরাইশদের সফর ছিল আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে নিয়ামতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। -[কুরতুবী]

رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ-এর অর্থ : উপরিউক্ত তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কার কুরাইশগণকে বলেছেন যে, হে কুরাইশগণ! এ ঘরের প্রতিপালকেরই তোমাদের ইবাদত করা উচিত। এ ঘর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কা'বা ঘরকে বুঝিয়েছেন। কেননা তারা এ জগতে মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কৌলিন্য-মর্যাদা ইত্যাদি যা কিছু লাভ করেছে, তা এ ঘরেরই অবদান। এ ঘরের কারণেই তাদের এত কিছু লাভ। এ ঘরের মালিকই জালিম আবরাহার ষাট হাজার সৈন্যকে নাস্তনাবুদ করে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। তারা যখন চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন ছিল তখন বংশগত সুনাম-সুখ্যাতি কিছুই ছিল না। এ ঘরের আশ্রয়ে আসার কারণেই দিক-দিগন্তে নিরাপত্তা ও সুনাম-সুখ্যাতি নিয়ে ভ্রমণ করতে পেরেছে। এ সব জাগতিক নিয়ামত এ ঘরের মালিকেরই অবদান- তাদের অবদান নয়। অতএব, তাদের ইবাদত সে মহা প্রতিপালক এ ঘরের মালিকই পেতে পারেন। -[কুরতুবী]

"فَلْيَعْبُدُوْا" -এর অর্থ :

১. কারো মতে, فَلْيَعْبُدُوْا অর্থ فَلْيُوَحِّدُوْا অর্থাৎ তারা যেন একত্ববাদী হয়। কেননা আল্লাহ এ ঘরের সংরক্ষণ করেছেন, প্রতিমাগুলো এটাকে সংরক্ষণ করেনি। আর একত্ববাদ হলো ইবাদতের চাবি।

২. কারো মতে, فَلْيَعْبُدُوْا অর্থ فَلْيَعْبُدُوا الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِاَعْمَالِ الْجَوَارِحِ অর্থাৎ তারা যেন সে ইবাদতগুলো করে যেগুলো সরাসরি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে জড়িত।

৩. তবে উত্তম হলো- উভয় অর্থকে একত্র করে আয়াতের অর্থ করা। কেননা আয়াতের শব্দ প্রয়োগের দ্বারা উভয় অর্থই বুঝা যায়। হ্যাঁ, যদি নির্দিষ্টকরণের কোনো দলিল এসে পড়ে, তাহলে অন্য কথা; কিন্তু এখানে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, একটি অর্থ করতে হবে।

এ আয়াতের তৃতীয় আরেকটি অর্থ পাওয়া যায়- فَلْيَتْرُكُوْا رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَلْيَشْتَغِلُوْا بِعِبَادَةِ رَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ অর্থাৎ তাদের উচিত হলো শীত এবং গ্রীষ্মকালীন সফর ছেড়ে দেওয়া এবং এ ঘরের ইবাদতে মনোনিবেশ করা।' -[কাবীর]

মূল নিয়ামত ছাড়া 'খাদ্যদান'-এর উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জগতে কত যে নিয়ামত দান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তবে এমন কতগুলো আছে যা মূল নিয়ামত; কিন্তু মূল নিয়ামতগুলো ছেড়ে খাদ্যদান বা اِطْعَامٌ-কে উল্লেখ করার কারণ হলো-

১. আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের উপর 'হস্তী প্রতিরোধ', 'পাখি প্রেরণ' এবং আবরাহা সরকারের ধ্বংসকে উল্লেখ করেছেন, আর তা তিনি তাদের إِيْلَافٌ-এর জন্য করেছেন, তারপর তিনি ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানেই কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা তো এখন রোজগারের মুখাপেক্ষী, ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়লে কে আমাদের রোজগারের ব্যবস্থা করবে? কে আমাদেরকে খাওয়াবে? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, ইবাদত না করার কারণে যিনি ক্ষুধার সময় তোমাদেরকে খাইয়েছেন, ইবাদতের পর তিনি কি তোমাদের খাওয়াবেন না?

২. এত বড় বড় নিয়ামত দেওয়ার পরও বান্দার পক্ষ থেকে ভালো ব্যবহার হচ্ছে না। তথাপি আল্লাহ তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন। যেন আল্লাহ তাদেরকে লজ্জা দিচ্ছেন যে, - বড় বড় নিয়ামত খাওয়ার পর লজ্জা করা দরকার ছিল; কিন্তু যখন খারাপ ব্যবহার করেছ, তখনো আমি খাওয়াচ্ছি। তাতে তোমাদের বেশি বেশি লজ্জা করা দরকার। -[কাবীর]

مِنْ جُوْعٍ উল্লেখ করার ফায়দা : এতে নিম্নলিখিত ফায়দা পরিলক্ষিত হচ্ছে-

১. এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ক্ষুধার জ্বালা-মহাজ্বালা, ক্ষুধার তাড়নায় তথা পেটের জ্বালায় মানুষ অনেক কিছু করে থাকে।

২. ক্ষুধা অবস্থায় যে মহাকষ্ট হয়, সাথে সাথে ক্ষুধা নিবারণের পর যে মহা শান্তি অনুভূত হয়, তা যে, আল্লাহর বিরাট নিয়ামত- তা বুঝানোর জন্য مِنْ جُوْعٍ বলা হয়েছে।

৩. এ কথার গুরুত্ব বুঝা যায় যে, উত্তম খাদ্য হলো তা, যা ক্ষুধা নিবারণ করে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ : আয়াতটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যা তাফসীরকারকগণ উল্লেখ করেছেন–

১. তারা নির্ভয়ে, অত্যন্ত নিরাপদে ভ্রমণ করত। কেউ তাদের বাধা দিত না, না তাদের উপর কেউ আক্রমণ করত, সফরে থাকুক আর বাড়িতে। অথচ অন্যরা আক্রমণ থেকে রেহাই পেত না, সফরে বের হোক আর বাড়িতে থাকুক, উভয় অবস্থায় তাদের উপর আক্রমণ চলত।

২. إِنَّ اللّٰهَ اٰمَنَهُمْ مِنْ زَحْمَةِ اَصْحَابِ الْفِيْلِ অর্থাৎ হস্তিবাহিনীর কষ্টদায়ক আঘাত থেকে আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন।

৩. দাহহাক বলেন, اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ الْجُذَامِ অর্থাৎ তিনি তাদেরকে কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপদে রেখেছেন।

৪. اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اَنْ تَكُوْنَ الْخِلَافَةُ فِيْ غَيْرِهِمْ অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এ ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন যে, খিলাফত অন্যের কাছে চলে যাবে।

৫. اٰمَنَهُمْ بِالْاِسْلَامِ অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের দ্বারা নিরাপত্তা দান করেছেন।

৬. اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ الضَّلَالِ بِبَيَانِ الْهُدٰى অর্থাৎ হেদায়েতের পথ-নির্দেশের মাধ্যমে ভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। ইতঃপূর্বে তারা ছিল جُهَّالُ الْعَرَبِ বা আরব মূর্খ। এখন তারা হচ্ছে আহলে কিতাব, আহলে কুরআন ও আহলে ইলম। আর আহলে কিতাব হয়ে গেছে– جُهَّالُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى তথা মূর্খ ইহুদি আর খ্রিস্টান। –[কাবীর]

সারকথা হলো :

১. তোমরা মক্কায় স্থায়ী বসতি করার পূর্বে খুবই দুঃখ-দুর্দশা ও অনাহারক্লিষ্ট অবস্থায় জীবন-যাপন করতে। মক্কায় অবস্থান করার পর হতে আমি তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটন দূর করেছি। এটা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সে দোয়ারই ফলশ্রুতি, যা তিনি পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে করেছিলেন– [সূরা ইবরাহীম–৩৭ আয়াত]। আর এ ঘরের সেবা করার ফলে আরব জগতের সর্বত্র তোমরা সম্মানিত হয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথগুলো তোমাদের জন্য নির্ভয় ও নিরাপদ হয়েছে, তা এ ঘরেরই অবদান।

২. আল্লাহ তা'আলা হয়তো একথা দ্বারা নবী করীম ﷺ -এর দোয়ার কারণে ক্রমাগতভাবে ছয় বছর দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করেছিল। আবার নবী করীম ﷺ-এর দোয়ার ফলেই দুর্ভিক্ষের অবসান হয়ে সমগ্র মক্কায় শস্য, ফলমূলের সমাহার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেমে এসেছিল। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমাদেরকে আহার দিচ্ছি। আর হেরেমে অবস্থানের কারণে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, লুটতরাজ, যুদ্ধ-হাঙ্গামা ও ভয়-ভীতি হতে তোমাদেরকে নিরাপদ ও নির্ভয় করেছি।

মোটকথা, তোমাদের জীবনে এ সব অবদান আল্লাহ তা'আলারই নিয়ামত। সে আল্লাহকে ভুলে দেব-দেবীর কাছে পড়ে থাকা তোমাদের পক্ষে কোনোক্রমেই শোভা পায় না। তোমরা এ ঘরের প্রভুর ইবাদতে মশগুল হও, দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা ছেড়ে দাও।

খাদ্য দানের ধরন : কুরাইশদের বসবাসের স্থান মক্কা এরূপ ছিল যে, সেখানকার জমি খামার উপযোগী ছিল না। শস্য-শ্যামল ছিল না, গুল্ম-লতা উৎপাদন হতো না। অর্থাৎ তা এমন এটি স্থান ছিল, যাতে বসবাসকারীদের খাদ্যের অভাবে মৃত্যু ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে এরূপ করে দিলেন যে, বছরের বারো মাসই সেখানে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত। এরূপ ব্যবস্থা না হলে তারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করত। –[আযীযী]

কুরাইশদের বৈশিষ্ট্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশকে সাতটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মর্যাদা প্রদান করেছেন, যা ইতঃপূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি এবং পরেও কাউকে দান করা হবে না।

১. আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি।
২. নবুয়ত ও রিসালত তাদের মধ্যে দান করা হয়েছে।
৩. কা'বা শরীফের খেদমতের দায়িত্ব তাদেরকেই দান করা হয়েছে।
৪. হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্বও তাদের প্রতি অর্পিত হয়েছে।
৫. হস্তিবাহিনীর উপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেছেন।
৬. দশ বছর যাবৎ কুরাইশ বংশ ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর ইবাদত করেনি, তথা নবুয়তের প্রথম দশ বছর।
৭. কুরাইশদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা একটি সূরা নাজিল করেছেন। এ সূরায় কুরাইশ ব্যতীত আর কারো উল্লেখ করা হয়নি।
–[হাকেম, তাবারানী, বুখারী]

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ : সূরা আল-মাউন

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির শেষ আয়াতের শেষ শব্দ "اَلْمَاعُوْنَ" (আল-মাউন)-কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৭টি আয়াত, ২টি বাক্য এবং ১১১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়-কাল : আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইবনে জুবাইর, আতা ও জাবিরসহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের একটি দলের মতে, আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে।

২. হযরত কাতাদাহ ও যাহহাক সহ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অপর দলের মতে, এ সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য সূরায় নামাজে গাফিলতি করা ও লৌক দেখানো (আমল ও নামাজ)-এর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টতই তা দ্বারা মুনাফিকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের আবির্ভাব হয়েছে মদীনায়। কাজেই এ হতে বুঝা যায় যে, সূরাটি মদীনায় নাজিল হওয়ার মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র কতদূর নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়, তার একটি চিত্র অংকন করেছেন। সর্ব প্রথমেই বলা হয়েছে– পরকাল বা দীন ইসলামে যারা বিশ্বাসী হয় না; বরং অস্বীকার করে, তাদের সম্পর্কে তোমরা কিছু জান কি? তাদের সামাজিক চরিত্র লেনদেন কতখানি নিম্নস্তরের হীন ও নীচ হতে পারে, তা শোন। তাদের প্রথম চরিত্র হলো এতিমদের হক ও অধিকারকে তারা নস্যাৎ করে। তাদের ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করে তা হতে তাদেরকে বেদখল করে। তারা তা চাইতে আসলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো– নিজেরা তাদের খাদ্য দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও খাদ্য দিতে এবং সাহায্য-সহানুভূতি করতে বলে না। তারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ আদায়ের জন্য কুফরিকে গোপন রেখে নামাজি সেজে জামাতে শামিল হয় এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, আমরা মুসলমান। রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধায় আমাদের অধিকার রয়েছে। এ সব কাফের নামাজিদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা নামাজের ক্ষেত্রে খুবই উদাসীন। নামাজের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে নামাজ পড়ে না। নামাজের প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞা দেখায়। কেবল নামাজই নয় – সমস্ত কাজকর্মই লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি সামাজিক জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও অন্যকে ধার দিতে চায় না। তারা কত স্বার্থপর ও আত্মপূজারী হয় যে, অপরের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট করা এবং সাধারণ একটু স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াকেও পছন্দ করতে পারে না। এটাই হলো পরকাল ও দীন ইসলাম অস্বীকারকারীদের জীবন চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ রূপ।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ اَوْ نِصْفُهَا وَنِصْفُهَا

সূরা আল-মাউন মক্কা বা মদীনায় অথবা অর্ধেক মক্কায় অর্ধেক মদীনায় অবতীর্ণ

سِتٌّ اَوْ سَبْعُ اٰيَاتٍ : ৬/৭ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ بِالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ اَىْ هَلْ عَرَفْتَهُ اَوْ لَمْ تَعْرِفْهُ ـ

১. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফল দিবস অস্বীকার করে? হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দিবস, অর্থাৎ তুমি তাকে চিন, না চিন না?

٢. فَذٰلِكَ بِتَقْدِيْرِ هُوَ بَعْدَ الْفَاءِ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ اَىْ يَدْفَعُهُ بِعُنْفٍ عَنْ حَقِّهٖ ـ

২. সে তো فَاء-এর পরে هُوَ সর্বনাম উহ্য আছে যে এতিমকে রূঢ়ভাবে বিতাড়িত করে অর্থাৎ তার হক দেওয়ার পরিবর্তে তাকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

٣. وَلَا يَحُضُّ نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ اَىْ اِطْعَامِهٖ نَزَلَتْ فِى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ اَوِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ ـ

৩. আর সে উৎসাহিত করে না নিজেকে এবং অন্যকে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে অর্থাৎ তাকে খাদ্য সরবরাহ করতে, এ আয়াতটি আস ইবনে ওয়ায়েল অথবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে।

٤. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ

৪. দুর্ভোগ সে নামাজির জন্য

٥. اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ غَافِلُوْنَ يُؤَخِّرُوْنَهَا عَنْ وَقْتِهَا ـ

৫. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন অমনোযোগী, তাকে যথাসময় হতে বিলম্বিত করে।

٦. اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا ـ

৬. যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে নামাজ ইত্যাদি।

٧. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ كَالْاِبْرَةِ وَالْفَاسِ وَالْقِدْرِ وَالْقَصْعَةِ ـ

৭. আর গৃহস্থালীর ছোট-খাটো প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে বিরত থাকে যেমন সুঁই, কুড়াল, হাঁড়ি-পাতিল, পেয়ালা।

তাহকীক ও তারকীব

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ .... -এর هَمْزَة ইস্তিফহামের জন্য, অর্থাৎ বিস্ময় প্রকাশক। رَاَيْتَ ফে'ল এটা একটি মাফউলের দিকে মুতায়াদ্দী হয়েছে, তা হলো اَلَّذِىْ الخ কেউ কেউ বলেন, اَلرُّؤْيَةَ অর্থ- اَخْبِرْنِىْ তখন দুই মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হবে। দ্বিতীয় মাফউলটি উহ্য, مَنْ هُوَ حَذَلًا الخ।

فَذٰلِكَ الخ -এর শর্তের জওয়াব। আর ف আতেফাও হতে পারে; তাই আতফ 'জাতের উপর জাতের' অথবা 'গুণের উপর গুণের' হতে পারে। প্রথম অবস্থায় ذٰلِكَ মুবতাদা, الَّذِىْ يَدُعُّ الخ এর খবর।

وَلَا يَحُضُّ الخ আতফ হয়েছে يَدُعُّ-এর উপর, দ্বিতীয় অবস্থায় নসবের স্থানে আতফ হবে মাওসূলের উপর, যা নসবের স্থানে অবস্থিত।

فَوَيْلٌ মুবতাদা, الْمُصَلِّيْنَ খবর। ف ক্রমধারা বর্ণনার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় কুরাইশদের উত্তম চরিত্রের কারণে তাদের উপর অনুগ্রহ অবতারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর বর্তমান সূরাতে মুনাফিকদের অসৎ ব্যবহার ও তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুনাফিকগণ অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণ এবং নিজেরা মুসলমান এ কথা প্রমাণের জন্য মুসলমানদের নিকট থাকাকালে তাদের সাথে জামায়াতে শামিল হতো। আর তাদের নিকট হতে চলে যাওয়ার পর নামাজ পরিত্যাগ করত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় জিনিস অপরকে দেওয়া হতে বিরত থাকত। তাদের এ আচরণকে উপলক্ষ করেই এ সূরা অবতীর্ণ হয়। –[লোবাব]

অথবা, কতিপয় তাফসীরকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন–এ সূরার প্রথম তিন আয়াত মক্কায় আসিম ইবনে ওয়ায়েল কাফের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বাকি আয়াতসমূহ মদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী, খাযেন]

অথবা, কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, প্রথম তিন আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তার অভ্যাস ছিল, যখন কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি মুমূর্ষ হতো, তখন তার নিকট এসে বসত, আর বলত– আপনি আপনার এতিম সন্তানদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করুন, আর তাদের অংশের মালও আমার নিকট আমানত রাখুন, আমি তাদের দেখাশুনা করবো; কিন্তু যখন সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত, আর এতিম শিশুগণ তার নিকট গমন করত, তখন সে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দরজা হতে বের করে দিত।

একদা এক এতিম শিশু রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করে বলল– আবূ জাহলের নিকট আমার মাল-সম্পদ রয়েছে– অথচ সে তা আমাকে দেয় না। রাসূল ﷺ সে এতিমের কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় দেখে আবূ জাহলের নিকট গিয়ে কিয়ামতের দিনের ভয় দেখান; কিন্তু সে পাপিষ্ঠ কাফের তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল না। আর কিয়ামতের অস্তিত্ব অস্বীকার করল। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন, আর ঘরে ফিরে আসেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[আযীযী]

অথবা, হযরত মুকাতিল, সুদ্দী এবং ইবনে কাইসা (র.) -এর মতে, এ সূরা নাজিল হয়েছে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ সম্পর্কে।

অথবা, ইমাম যাহহাক (র.) -এর মতে, এ সূরা নাজিল হয়েছে আমর ইবনে আমের মাখযূমী সম্পর্কে। –[নূরুল কোরআন]

أَرَأَيْتَ-এর অর্থ কি? এর مُخَاطَبْ কে? : أَرَأَيْتَ –এর বাহ্যিক অর্থ– আপনি কি দেখেছেন? আর 'দেখা'-এর দ্বারা এখানে শুধু চোখে দেখাকেই বুঝানো হয়নি; বরং চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কথার তাৎপর্য অনুধাবন, জানা, বুঝা ও চিন্তা করাও এ দেখার মধ্যে শামিল আছে। প্রকৃত দেখা বলতে এ শেষোক্ত অর্থই বুঝতে হবে, নিছক চোখে দেখা নয়।

মোটকথা, আয়াতের মর্মার্থ হলো, আপনি কি জানেন, পরকালের বিচার ও প্রতিফলের কথা যে লোক অস্বীকার করে, সে কি রকমের লোক? অথবা, পরকালের কর্মফল দানের ব্যবস্থাকে যে লোক অসত্য মনে করে তার অবস্থাটা কি? তা কি আপনি চিন্তা ও বিবেচনা করেছেন?

এখানে أَرَأَيْتَ দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদে সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেকসম্পন্ন লোককেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

مَعْنَى الدِّيْنِ-এর অর্থ : কুরআন মাজীদে الدِّيْنِ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মুফাসসিরগণ এর দুটি অর্থ গ্রহণ করেছেন। ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ একদল মুফাসসিরের মতে এখানে الدِّيْنِ দ্বারা দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সূরাটির বক্তব্য হবে, দীন ইসলামের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা। অর্থাৎ দীন-ইসলাম অমান্যকারীদের যা কিছু

স্বভাব-চরিত্র হয়ে থাকে, দীন ইসলামের প্রতি ঈমান এর বিপরীত স্বভাব-চরিত্র সৃষ্টি করে। ২. অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে, এখানে اَلدِّيْن-এর অর্থ হবে–কর্মফল দান, বিচার। এ অবস্থায় সূরাটির বক্তব্য দাঁড়ায়–পরকাল অস্বীকারের আকীদা মানুষের মধ্যে এরূপ স্বভাব-চরিত্র সৃষ্টি করে।

اَلَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : اَلَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ দ্বারা এখানে কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. একদল মুফাসসিরের মতে, এখানে নির্দিষ্টভাবে কাউকে বুঝানো হয়নি; বরং সাধারণভাবে দীন অস্বীকারকারী সকলকেই বুঝানো হয়েছে। ২. অপর একদল মুফাসসিরের মতে, এখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে আবার এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে?

ক. কেউ কেউ বলেছেন, এটা দ্বারা আবূ জাহল উদ্দেশ্য। খ. কারো মতে, আবূ সুফিয়ানকে বুঝানো হয়েছে। গ. অথবা, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা উদ্দেশ্য। ঘ. অথবা, আস ইবনে ওয়ায়েল উদ্দেশ্য।

দীন অস্বীকারকারীদের চরিত্র : উল্লিখিত দুই ও তিন নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন অস্বীকারকারী অর্থাৎ দীন ইসলামকে অস্বীকারকারী লোকদের চরিত্রের কিছুটা রূপ তুলে ধরেছেন। এখানে তাদের জীবনের দু'টি কাজ উল্লেখ করে তাদের গোটা চরিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা দীন ইসলাম ও কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে তাদের চরিত্র এত হীন-নীচু ও কুৎসিত হয় যে, পিতৃহীন বালকগণ যখন তাদের দরজায় এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকে, তখন তাদেরকে চোখ রাঙ্গিয়ে রূঢ় ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর দাঁড়িয়ে থাকলে তখন গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তখন আশ্রয়হীন ও পিতৃহীন শিশুগণ অশ্রু ফেলে চলে যায়। এখানে يدع শব্দটির আরও কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তা হলো এতিমদের হক নষ্ট করা। তাদের ভূ-সম্পত্তি হতে বে-দখল করে তাড়িয়ে দেওয়া। সেকালে আরব সমাজে যারা পিতৃহীন বালকদের অভিভাবক হতো, তারা এতিমদের হক নষ্ট করত এবং তাদের বিষয়-সম্পত্তি হতে তাদেরকে উৎখাত করে তড়িয়ে দিত। এতিমগণ এসে নিজেদের অর্থ-সম্পদ চাইলে তখন গলা ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিত। তাদের হক ও অধিকার হতে বঞ্চিত করা হতো।

তাদের দ্বিতীয় যে চরিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, পিতৃহীন বালকগণের প্রতি অনুগ্রহশীল ও দয়াবান না হওয়া। নিজেরা তো অন্ন দেয়ই না, উপরন্তু অন্য লোককেও অন্ন-বস্ত্র দানের জন্য উৎসাহিত করে না। এ দু'টি চরিত্র উল্লেখ করে মূলত তাদের প্রকৃত রূপটি কি তা-ই বলা হয়েছে। বিচার দিনের আকীদা-বিশ্বাস ধারণের যে নৈতিক ফল মানুষের জীবনে ফলে থাকে এবং তা দ্বারা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি কিভাবে গড়ে উঠতে পারে, এখানে একটি নেতিবাচক উদাহরণ উল্লেখ করে প্রকারান্তরে তা বুঝানো হয়েছে। পরকালে কৃতকর্মের হিসাব দানের আকীদা যারা অন্তরে পোষণ না করে তারা নিজেদেরকে যতই সমাজ-দরদি বলে প্রকাশ করুক না কেন, মূলত তারা হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন আত্মপূজারী স্বার্থপর। যে কোনো অন্যায়-অবিচার করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। দুনিয়ার সমস্ত পাপাচার-জুলুম ও অত্যাচার-অবিচার তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। এ কথাটি বুঝাবার জন্যই আল্লাহ তা'আলা দু'টি চরিত্র তুলে ধরেছেন। –[কাবীর]

এতিমকে তাড়ানোর অবস্থা : এতিমকে তাড়ানোর কয়েকটি দিক হতে পারে–১. তার পাওনা এবং সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে তাকে উচ্ছেদ করা। ২. তার দুঃখ-কষ্টে সমবেদনা প্রকাশ না করা, এগিয়ে না আসা। ৩. তাকে ধমক দেওয়া, পিটুনী দেওয়া এবং উপহাস করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–ঐ খাওয়ার টেবিল হতে উত্তম আর কোনো খাওয়ার টেবিল হতে পারে না, যেখানে এতিম রয়েছে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত চার নম্বর আয়াতে مُصَلِّيْن বলে প্রকৃত নামাজিদের কথা বলা হয়নি; বরং যারা মুসলিম সমাজে পরিগণিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে এবং জামাতে উপস্থিত হয়, তাদের কথা বলা হয়েছে। মূলত এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। কেননা মুনাফিকরা মূলত দীন ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখে না; কিন্তু মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্যের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান হতে পারে না। বিরোধিতা করলেও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং তারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম হওয়ার চরিত্রটি গ্রহণ করে। নবী করীম ﷺ ও সাহাবীদের যুগে নামাজি হওয়াটাই ছিল মুসলমান হওয়ার লক্ষণ। কোনো লোক নামাজি না হয়ে শতবার ঈমানদার হওয়ার দাবি করলেও তার ঈমানের সত্যতা

গ্রহণযোগ্য হতো না। তাই মুনাফিকগণ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় নামাজির সাজে সাজত। এ কারণেই আল্লাহ মুনাফিক সম্বোধন না করে 'নামাজ ওয়ালা' বলে সম্বোধন করেছেন এবং গুণগত দিকটি তুলে ধরে তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

নামাজে অবজ্ঞা প্রদর্শন : উপরিউক্ত পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নামাজে উদাসীন হওয়া দ্বারা সঠিক সময় নামাজ না পড়া; নামাজে দণ্ডায়মান হলে অনাগ্রহতা প্রকাশ করা, বারবার আলস্য ভরে হাই তোলা, পড়িপড়ি করে শেষ ওয়াক্তে কয়েকটা কপাল ঠুকুনি দিয়ে দায় সারা, আল্লাহর দিকে ইচ্ছাপূর্বক মোতাওয়াজ্জো না হওয়া ইত্যাদি আচরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মুনাফিকগণ নামাজের ক্ষেত্রে এরূপই করত। এখানে নামাজের মধ্যে কেরাত ও রাকাতে ভুল হওয়া অথবা অলক্ষ্যে চিন্তাও খেয়াল অন্যদিকে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা নামাজে ভুল হওয়া ও খেয়াল অন্যদিকে চলে যাওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এরও নামাজে ভুল হয়েছে এবং তিনি সাহু সিজদা দিয়ে তার প্রতিবিধানের পথ দেখিয়েছেন। মু'মিনদের অলক্ষ্যে নামাজে নিজেদের চিন্তা-খেয়াল অন্যদিকে গেলেও মনে হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা নিজেদের চিন্তা ও খেয়ালকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যান। নামাজের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি ও খেয়াল অন্যদিকে চলে যাওয়ার কথা বুঝালে আল্লাহ عَنْ صَلَاتِهِمْ না বলে বরং فِىْ صَلَاتِهِمْ বলতেন। এ কারণেই আশআস ইবনে মালিক ও আতা ইবনে দীনার (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার শোকর যে, তিনি فِىْ صَلَاتِهِمْ না বলে عَنْ صَلَاتِهِمْ বলেছেন। কেননা আমরা নামাজের মধ্যে ভুল করে থাকি বটে; কিন্তু নামাজের প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহা প্রদর্শন করি না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ : মহান আল্লাহর বাণী– عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ -এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (র.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হলো– নামাজের সময় নষ্ট করা, তথা সঠিক সময়ে নামাজ আদায় না করা।
২. হযরত ইবনে জারীর ও আবূ আওয়া'লার মতে, سَاهُوْنَ শব্দ দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সঠিক সময়ের পর নামাজ আদায় করে।
৩. হযরত আবুল আলিয়া (র.) বলেছেন, তারা নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করে না এবং রুকু-সিজদাও ঠিক মতো আদায় করে না।
৪. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এর অর্থ হলো– তারা নামাজ পড়ল কি পড়ল না, এ বিষয়ে কোনো পরোয়াই করে না।
৫. কারো মতে, এর অর্থ হলো, তারা নামাজ পড়ে কিন্তু ছওয়াবের আশা করে না। আর না পড়লেও আল্লাহর আজাবকে ভয় করে না।
৬. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, তারা নামাজে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে।
৭. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন– এর অর্থ হলো, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে। আর যখন নামাজ পড়ে না তখন তাদের কোনো আক্ষেপ থাকে না। –[নূরুল কোরআন]

اَلْمِسْكِيْن-এর দিকে طَعَامٌ-এর নিসবতের উপকারিতা : طَعَامٌ শব্দকে اَلْمِسْكِيْن-এর দিকে اِضَافَةٌ করার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ খাদ্য মিসকিনের হক। তাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা দ্বারা তার চরম কৃপণতা, কঠিন অন্তর এবং বদ মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। –[কাবীর]

লোক দেখানো কাজ : উপরিউক্ত ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের দ্বিতীয় যে চরিত্রটি তুলে ধরেছেন, তা হলো কপটতা এবং লোক দেখানো কাজ। অর্থাৎ নিজের আসল উদ্দেশ্যটি গোপন করে কল্পিত মহৎ ও ভালো উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করা যা মূলতই তার উদ্দেশ্য নয়। কপটতা বা লোক দেখানো চরিত্রটি যেমন মুনাফিকদের মধ্যে থাকে, তেমনি মু'মিনদের মধ্যেও হতে পারে। মুনাফিকগণ বেঈমানী ও কুফরিকে অন্তরে গোপন রেখে মানুষের নিকট প্রকাশ করে বেড়ায় যে, আমি মুসলিম, আমি নামাজ পড়ি। আর মু'মিনগণের জীবনে এ চরিত্রটি খুব কমই প্রতিফলিত হয়। হলেও তা বেঈমানী ও কুফরি অন্তরে চাপা দিয়ে নয়; বরং নাম-কাম, সুখ্যাতি ও সুফল লাভের উদ্দেশ্যে অনেক সময় হয়তো হয়ে থাকে। মোটকথা, ভিতর ও বাহির একরূপ না হয়ে বিপরীত হওয়াকেই রিয়া ও কপটতা বলে। এটা মুনাফিকদের বেলায় মারাত্মক অপরাধ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেছেন– اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ মুনাফিক ও অধার্মিকগণের স্থান জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে হবে। আর মু'মিনদের ক্ষেত্রেও রিয়াকারী ও কপটতা একটি বিরাট অপরাধ। রিয়া মানুষের নেককে নষ্ট করে ফেলে। আয়াতের বক্তব্যটি যেহেতু পূর্বের সাথে সম্পৃক্ত, এ জন্য এখানে মুনাফিকদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরা হয়েছে।

مَاعُوْنَ বলতে যা বুঝায় : مَاعُوْنَ শব্দটির আসল অর্থ হলো, নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রকায় জিনিস। যেমন– দা, খন্তা, কুড়াল, ডেগ, পাতিল, কুলা, চালনি, দিয়াশলাই, চুলা ইত্যাদি। এটা মানুষের জীবনে অহরহ প্রয়োজন হয়। হযরত ওমর, হাসান, কাতাদাহ, যাহহাক (র.) প্রমুখ মনীষীগণের মতে, এখানে مَاعُوْنَ দ্বারা জাকাতের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে নামাজের পরপরই জাকাতের কথা বলেছেন। যেহেতু মুনাফিকগণ নামাজের বেলায় উদাসীন থাকে। অতএব তাদের মতে, এখানে مَاعُوْنَ দ্বারা জাকাত আদায় না করার কথাই বুঝানো হয়েছে। অপর দিকে হযরত ইবনে মাসউদ, আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরামা (র.) সহ অনেক তাফসীরকারের মতে এখানে মাউন দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব ও দ্রব্য-সামগ্রীর কথা বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর যুগে মাউন অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র মানুষকে ধার দিতাম (আবূ দাউদ)। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মাউন-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন– কুড়াল, ডুলি ও এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা (আবূ নাঈম)। মোটকথা, এ হাদীস বিশুদ্ধ হলে বলতে হবে যে, উপরিউক্ত সাহাবী ও তাবেঈগণ নবী করীম ﷺ-এর এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। নতুবা নবী করীমের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তার বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদানের সাহস কোনো সাহাবী ও তাবেঈর থাকতে পারে না। মাউনের অর্থ যখন ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় বস্তু, তখন জাকাতকেও মাউন নামে এ দিক দিয়ে অভিহিত করা যায় যে, তা বিরাট কোনো সম্পদেরই ক্ষুদ্র একটি অংশ, যার প্রয়োজনীয়তা অভাবীদের জন্য অনস্বীকার্য। সারকথা, আল্লাহ তা'আলা মাউন শব্দের ব্যবহার করে এ কথাই বলতে চাচ্ছেন যে, পরকাল অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি যে কত নীচু হয় এবং তারা কতখানি স্বার্থপর হয়, অপরের জন্য সাধারণ একটু কষ্ট স্বীকার এবং সাধারণ একটু স্বার্থ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয় না– তা কত হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক। –[ফাতহুল কাদীর]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ .... الْمَاعُوْنَ আয়াতের ধমকের কারণ : তাফসীর বিশারদগণ এর কয়েকটি জবাব দিয়েছেন–

১. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ অর্থ– فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ بِهٰذِهِ الْاَفْعَالِ অর্থাৎ 'মুনাফিকদের মধ্য হতে সে সমস্ত মুসল্লি বা নামাজিদের জন্য ধ্বংস যারা উক্ত তিনটি কাজ করে।' এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের জন্য আরও বেশি আজাব নির্ধারিত রয়েছে। কারণ সে নিষিদ্ধ কাজগুলো করে আর কর্তব্য কাজকে ছেড়ে দেয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– যদি আল্লাহ তা'আলা فِيْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ অর্থাৎ তারা নামাজের ভিতরে অবহেলা করে– বলতেন, তাহলে মু'মিনদের জন্য এ ধমক হত; কিন্তু عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ 'নামাজ হতে বিরত থাকে'– বলেছেন। অতএব, যে ধমক দেওয়া হয়েছে, তা নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে– নামাজ পড়ার কারণে নয়।

৩. অথবা, سَاهُوْنَ অর্থ এখানে لَا يَتَعَهَّدُوْنَ اَوْقَاتَ صَلَاتِهِمْ وَلَا شَرَائِطَهَا অর্থাৎ সে নামাজ আদায় করেছে কি করেনি, তার তোয়াক্কা বা পরোয়া করে না। এ কারণে এ ধমক দেওয়া হয়েছে। –[কাবীর]

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ : সূরা আল-কাওছার

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার শুরুতে اَلْكَوْثَرَ শব্দ হতে তার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ। আর অত্র সূরায় حَوْض كَوْثَرْ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ সূরার নাম سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ রাখা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১০টি বাক্য এবং ৪২ টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আয়েশা (রা.) হতে সূরাটি মাক্কী বলে বর্ণিত হয়েছে। বেশির ভাগ মুফাসসিরদের মত এটাই।

হযরত ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.) একে মাদানী বলেছেন। ইমাম সুয়ূতি (র.) একে সঠিক মত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেন, 'এই মাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাজিল হয়েছে। পরে তিনি বিসমিল্লাহ বলে সূরা কাওসার পাঠ করলেন।' এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন মদীনায়। তিনি বলেন– এ সূরাটি আমাদের উপস্থিতিতে নাজিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরাটি নাজিলের ঐতিহাসিক পটভূমি কি ছিল, তা সম্মুখে শানে নুযূলের আলোচনায় আমরা সামান্য উল্লেখ করেছি। অতি সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতে তিনটি বক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রথম আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ইহকাল-পরকাল ব্যাপী আল্লাহ তা'আলার অজস্র নিয়ামত, প্রাচুর্য, যশ-খ্যাতি, সুনাম ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– আমি আপনাকে ব্যাপক প্রাচুর্য ও নিয়ামত দান করেছি, যার কোনো সীমারেখা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে জীবনের সব কাজকর্ম বিশ্বপালনকর্তার উদ্দেশ্যে করার জন্য হেদায়েত করে বলেছেন– আপনি নামাজ ও কুরআনকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুন। তৃতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুগণ চিরতরে নির্মূল হওয়ার এবং উত্তরোত্তর ইসলাম ও মহানবীর শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আপনি শিকড় কাটা ও নির্বংশ নন; বরং আপনার শত্রুরাই এ জগতের পাতা হতে চিরতরে মুছে যাবে। কোথাও তাদের নাম-ধাম ও বংশের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে আপনার পুত্র-সন্তান না থাকলেও আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম, বংশ পৃথিবীর বুকে চিরগৌরবময় হয়ে থাকবে। মানুষ আপনাকে মাথার তাজতুল্য স্মরণ করবে। এমনকি আপনার সঙ্গীগণের সাথে সম্পর্ক থাকাকেও গৌরব ও পরকালের নাজাতের বিষয় মনে করবে।
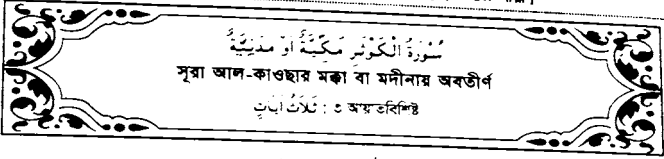
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ الْكَوْثَرَ هُوَ نَهْرٌ فِى الْجَنَّةِ اَوْ هُوَ حَوْضُهُ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتُهُ اَوِ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْقُرْاٰنِ وَالشَّفَاعَةِ وَنَحْوِهَا

২. فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ عِيْدِ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ ـ

৩. اِنَّ شَانِئَكَ اَىْ مُبْغِضَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ الْمُنْقَطِعُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ اَوِ الْمُنْقَطِعُ الْعَقْبِ نَزَلَتْ فِى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَمَّى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْتَرَ عِنْدَ مَوْتِ اِبْنِهِ الْقَاسِمِ ـ

অনুবাদ :

১. আমি অবশ্যই তোমাকে দান করেছি হে মুহাম্মদ কাওছার তা একটি বেহেশতী নহর অথবা কূপ, যেখানে উম্মতে মুহাম্মদীকে সমবেত করা হবে। অথবা কাওছার দ্বারা নবুয়ত, কুরআন, শাফায়াত ইত্যাদি প্রভূত কল্যাণ উদ্দেশ্য।

২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো কুরবানির ঈদের নামাজ এবং কুরবানি করো তোমার কুরবানির জন্তু।

৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী তোমার প্রতি শত্রুতাকারী। সে-ই নির্বংশ। সকল মঙ্গল হতে বিচ্ছিন্ন বা নির্বংশ। এ আয়াতটি আস ইবনে ওয়ায়েল প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুত্র কাসেম (রা.)-এর ইন্তেকালের পর সে তাঁকে اَبْتَرْ বা নির্বংশ রূপে আখ্যায়িত করেছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَلْكَوْثَرْ টি مَفْعُوْل হিসাবে مَنْصُوْب হয়েছে। وَانْحَرْ অংশটি فَصَلِّ -এর مَعْطُوْف হয়েছে। شَانِئَكَ অংশটুকু مُفْرَدْ হয়ে مُبْتَدَاْ হবে আর هُوَ الْاَبْتَرُ জুমলা হয়ে خَبَرْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরায় কাফির মুশরিকদের কয়েকটি মন্দ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আর অত্র সূরায় আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, হে রাসূল ﷺ! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দান করেছি! প্রভূত কল্যাণ কাজেই আপনি অধিক পরিমাণে দান করুন এবং কার্পণ্য করবেন না।

এমনিভাবে পূর্ববর্তী সূরায় বলা হয়েছে, মুনাফিকরা নামাজের ব্যাপারে গাফেলতি করে। আর আলোচ্য সূরায় আদেশ করা হয়েছে যে, হে রাসূল ﷺ! আপনি শুধু আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করতে থাকুন। কেনন নামাজ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। -[নূরুল কোরআন]

শানে নুযূল : এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ও কারণ সম্পর্কে, তাফসীরকারকদের মধ্য হতে অনেকগুলো কারণ ও উপলক্ষ বর্ণিত পাওয়া যায়-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মদীনার সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় পদার্পণ করলে কুরাইশগণ তাকে বলল, আপনি মদীনার সর্দার। আপনি কি আমাদের সম্প্রদায়ের সেই শিকড়কাটা ও নির্বংশ লোকটিকে দেখেছেন, যে নিজেকে আমাদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মনে করে? অথচ আমরাই হাজীগণের পুরনো খাদেম, তাদেরকে পানি পান করিয়ে থাকি এবং আমরাই নেতৃস্থানীয় লোক। তখন আল্লাহ তা'আলা إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[খাযেন]

হযরত ইবনে মুনযারের বর্ণনা, ইকরামা (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা, নবী করীম ﷺ-এর নিকট ওহী প্রেরণ করে যখন তাওহীদের দাওয়াত দিতে আদেশ করলেন, তখন কুরাইশগণ বলল- بُتِرَ مِنَّا অর্থাৎ মুহাম্মদ আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, কোনো লোকের পুত্র সন্তান মরে গেলে কুরাইশগণ বলত, بُتِرَ فُلَانٌ অর্থাৎ অমুক পুত্রহীন বা নির্বংশ হয়েছে। সুতরাং নবী করীম ﷺ-এর কোনো এক পুত্রের (কাসেমের) যখন ইন্তেকাল হয়, তখন আস ইবনে ওয়ায়েল বলল- মুহাম্মদ নির্বংশ হয়েছে। তখন আল্লাহ উপরিউক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন। -[রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর পুত্র ইবরাহীমের যখন ইন্তেকাল হয়, তখন মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, আমাদের এ ধর্মত্যাগী লোকটি রাতে নির্বংশ হয়েছে। তখন-ই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-কাওসার অবতীর্ণ করেন। -[লোবাব, রূহুল মা'আনী]

اَلْكَوْثَرُ-এর অর্থ : কাওছার শব্দটির অর্থ ও ভাবধারা খুবই ব্যাপক। দু'এক কথায় তা প্রকাশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। كَوْثَرٌ শব্দটি فَوْعَلٌ-এর ওযনে মুবালাগার সীগাহ। শব্দটি كَثْرَةٌ বা كَثُرَ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো- বিপুল, অধিক। এখানে শব্দটি সীমাহীন মঙ্গল ও অধিক কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ হবে- হে নবী! আমি আপনাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে বিপুল ও সীমাহীন মঙ্গল দান করেছি, যার কোনো হিসাব নেই। অর্থাৎ আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি- কিতাব দিয়েছি। দুনিয়ার মানুষের নেতা, নবীদের সর্দার করেছি। আপনার প্রচারিত ধর্মকে সর্বশেষ ধর্ম ও মানুষের জন্য শাশ্বত জীবন-বিধান বানিয়েছি। আপনার অনুসারী কর্মীগণ ও আপনার উম্মতগণ আপনার গুণকীর্তন করতে থাকবে, তারা এবং ফেরেশতাকুল আপনার প্রতি কল্যাণ কামনায় সোচ্চার থাকবে, দরুদ পাঠ করবে। আপনার উম্মত দ্বারা আপনার প্রচারিত দীন জগতের প্রত্যেক প্রান্তে পৌঁছবে। আপনাকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিকের ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করা হবে। সমস্ত বাতিল দীনের উপর আপনার দীন বিজয়ী হবে। পরকালে হাশরের ময়দানে আপনার কর্তৃত্বে হাউজে কাওছার দান করা হবে। আপনার পিপাসাকাতর উম্মতগণকে এর পানি পান করিয়ে তাদের তৃষ্ণা চিরতরে নিবারণ করা হবে। আপনাকে শাফায়াতের অধিকারী করা হবে। এমনকি জান্নাতে থাকবে আপনার জন্য নহরে কাওছার নামে একটি উন্নতমানের প্রস্রবণ। অতএব, কাফিরগণ যে বলে, আপনি শিকড়কাটা নির্বংশ, আপনার দীনি আন্দোলন ও আদর্শ বেশিদিন টিকবে না; তা তাদের ভুল ধারণা। তারাই নির্মূল-নির্বংশ হবে। দুনিয়ার ইতিহাসে তাদের নাম-নিশানও থাকবে না।

অনেক তাফসীরকার কাওছার দ্বারা 'হাউযে কাওছার' অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। পরকালে নবী করীম ﷺ-কে হাউযে কাওছারের কর্তৃত্ব দান সম্পর্কে বহু সাহাবী হতে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যার সত্যতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একে সত্য বলে গ্রহণ করা এবং এর প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। একে অস্বীকার করলে কাফির হতে হয়। -[রূহুল মা'আনী]

এ ছাড়াও এ সম্পর্কে আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন-

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, পরকালে পবিত্র কুরআনের শারীরিক রূপই হবে হাওযে কাওছার, যারা পৃথিবীর এ জীবনে কুরআনে কারীমের অমৃত সুধা পান করেছে এবং যে ব্যক্তি যে পরিমাণ পান করেছে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি ঐ অনুপাতেই হাওযে কাউছারের পানি পান করার সুযোগ লাভ করবে।
   ইবনে আবী হাতেম হযরত হাসান (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, কাওছার হলো কুরআনে কারীম।
২. ইবনুল মুনজির যাহহাক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হাউযে কাওছার হলো জান্নাতের একটি নহর।
৩. ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- কাওছার হলো আখেরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ।

তবে আল্লামা সুয়ূতী (র.) হাউজে কাওছার যে একটি জান্নাতের নহর যা রাসূল ﷺ -কে দান করা হয়েছে– এ প্রসঙ্গে সত্তর খানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। –[নূরুল কোরআন]

كَوْثَر -এর আকৃতি-প্রকৃতি ও অবস্থা : তাফসীরকারগণ বলেন, হাউযে কাওছারের প্রশস্ততা এক মাসের ভ্রমণের পথ হবে এবং তার পার্শ্ব দেশে এমনভাবে তাঁবু খাটানো রয়েছে যেন মণি-মুক্তার ভিতরের অংশকে সম্পূর্ণ খালি করে রাখা হয়েছে এবং স্বর্ণ রুপা ইত্যাদি দ্বারা তৈরিকৃত তারকারাশির মতো কারুকার্য রয়েছে। আর তার আশে-পাশে এমন কতগুলো বৃক্ষ রয়েছে, যেগুলোর শিকড় স্বর্ণের মতো, শাখাগুলো زَمَرُّد পাথরের রং এবং পাথর ও কঙ্করগুলো মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের রূপ রেখার মতো এবং সে স্বর্গের মাটিগুলো মিশক আম্বর হতেও সুগন্ধযুক্ত। তার পানি মধু হতেও মিষ্টি, দুগ্ধ হতে ও সাদা, বরফ হতেও অধিক ঠাণ্ডা। যে কেউ একবার তা হতে এক ঢোক পানি পান করবে, সে কখনো আর পিপাসিত হবে না, কখনো তার কথা ভুলবে না। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : উক্ত আয়াতে فَصَلِّ বলে কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে।

১. কেউ কেউ এখানে صَلٰوة-এর অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের সালাতকে বুঝাচ্ছেন।

২. কেউ কেউ عِيْدُ الْاَضْحٰى-এর সালাতকে বুঝিয়েছেন। কেননা তার সাথে সাথেই কুরবানি করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে– নামাজ ও কুরবানি করো।

৩. কারো কারো মতে, তা দ্বারা عَامٌ সাধারণভাবে যে কোনো নামাজ উদ্দেশ্য হতে পারে। 'আর নহর করো' এ কথাটি দ্বারা নামাজের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা এবং তাকে সিনার উপর ধারণ করা।

৪. কারো কারো মতে, তার অর্থ– নামাজ শুরু করার পূর্বে দু' হাত উপরে তুলে তাকবীর বলা।

৫. কেউ কেউ বলেন, রুকুর পর সোজা হয়ে رَفْعِ يَدَيْنِ করা।

আর وَانْحَرْ শব্দ বলে উটের নহর করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গরুর বেলায় জবাই এবং উটের বেলায় নহর করা উত্তম। অর্থাৎ উটের চার পা বেঁধে তার حُلْقُوْم-এর মধ্যে ছুরি অথবা ধারালো অন্য কোনো অস্ত্র বসিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া, তা উটের বেলায় সুন্নত। আর গরু-ছাগল, মহিষ, বকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে জবাই করা সুন্নত। অর্থাৎ উটের কুরবানিকে নহর এবং গরু ছাগলের কুরবানিকে জাবাই বলা হয়।

فَاشْكُرْ-এর স্থলে فَصَلِّ বলার কারণ : নিয়ামত প্রাপ্তির পর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। অতএব, নিয়ামত দান করার পর নামাজের নির্দেশ না দিয়ে শুকরিয়া করার নির্দেশ দেওয়া দরকার ছিল। তার উত্তর হচ্ছে–

১. মূলত শুকর সম্মানের বাস্তব ব্যাখ্যা। আর তার তিনটি মৌলিক দিক রয়েছে–

ক. অন্তর দ্বারা এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে, সে নিয়ামত একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে, অন্যের কাছ থেকে নয়,

খ. মুখে তাঁর স্বীকৃতি দেওয়া ও গ. বাস্তব কাজে কার্যত তাঁর খেদমত করা, তার সম্মুখে অবনত হওয়া। আর নামাজ উক্ত তিনটি বিষয়কে একই সাথে শামিল করে। অতএব, বুঝা যায় যে, শুধু শুকরিয়ার নির্দেশ নয়; বরং নামাজের নির্দেশ দ্বারা শুকরিয়ার সকল দিক ও বিভাগকে শামিল করা হয়েছে।

২. সম্ভবত ইতঃপূর্বে তিনি ওহীর মাধ্যমে নামাজের বিধানাবলি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, কিন্তু শুকরিয়া সম্পর্কে জানেননি।

৩. হযরত মুজাহিদ ও ইকরামা (র.)-এর মতে فَصَلِّ অর্থ এখানে فَاشْكُرْ।

৪. প্রথমে যখন নবী করীম ﷺ-কে নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি বলেছেন– আমার তো অজু নেই, আমি কিভাবে নামাজ আদায় করবো? তখন আল্লাহ বলেন, اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর পাখা দ্বারা জমিনে আঘাত করলে কাওছারের পানি নির্গত হয়, তখন তিনি সে পানি দ্বারা অজু করেন। এ সময়ই তাঁকে বলা হয়েছে فَصَلِّ لِرَبِّكَ অর্থাৎ আপনি আপনার রবের শুকরিয়া আদায় করুন। –[কাবীর]

اِنْحَرْ শব্দের অর্থ : اِنْحَرْ শব্দের অর্থ নিরূপণে মুফাসসিরদের পক্ষ থেকে দু'টি মত দেখা যায়–

১. উট কুরবানি করা। এটা অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

২. اِنْحَرْ শব্দটি নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। এতে কয়েকটি দিক দেখা যায়, যেমন–

ক. ইমাম ফাররা বলেন, اِنْحَرْ অর্থ– اِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ অর্থাৎ নামাজে কেবলামুখি হও

খ. হযরত আলী (রা.) বলেন, যখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, এ কোন نَحْر, যার নির্দেশ আমাকে করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তা কোনো কুরবানি (نَحْر) নয়; বরং আপনাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, যখন আপনি তাকবীরে তাহরীমা করবেন তখন হাত তুলে তাকবীর দিবেন

গ. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ نَحْر-এর ব্যাখ্যা– 'দু হাতকে নামাজে বক্ষের উপর রাখা' বলেছেন। তিনি বলতেন– নামাজের পূর্বে হাত উঠানো মহান সত্তার কাছে নিবেদিত প্রাণের কাজ, আর বক্ষের উপর হাত রাখা বিনয়ী ব্যক্তির কাজ।

ঘ. হযরত আতা (র.) বলেন– اُقْعُدْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى يَبْدُوَ نَحْرُكَ। দুই সিজদার মধ্যে বসবে, যেন তোমার বক্ষ প্রকাশিত হয় (দেখা যায়)।

ঙ. হযরত যাহহাক (র.) বলেন– اِرْفَعْ يَدَيْكَ عَقِيْبَ الدُّعَاءِ اِلٰى نَحْرِكَ। অর্থাৎ দোয়া শেষে তোমরা হাত বক্ষ পর্যন্ত উঠাও। –[কাবীর]

صَلَاة-এর পর نَحْر উল্লেখ করার কারণ : কুরআনে কারীমের বৈশিষ্ট্য হলো صَلَاة-এর পর পর জাকাতের উল্লেখ করা; কিন্তু এখানে তার বিপরীত نَحْر-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে। কেননা যদি এখানে صَلَاة দ্বারা ঈদের নামাজ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ব্যাপারটি তো একেবারেই স্পষ্ট। কেননা ঈদের নামাজের পরই কুরবানি করার হুকুম। আর যদি সাধারণ নামাজ হয়, তাহলে কয়েকটি উত্তর হতে পারে–

ক. মুশরিকদের নামাজ আর কুরবানি ছিল মূর্তির জন্য, তাদের বিরোধিতার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো যে, উক্ত দু'টি কাজ আপনি আপনার রবের জন্য করুন।

খ. কারো মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমন সম্পদ ছিল না যে, সম্পদের উপর জাকাত ওয়াজিব হতে পারে। আর তাঁর উপর কুরবানি ফরজ ছিল। যেমন, তিনি বলেছেন– ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلٰى اُمَّتِيْ الضُّحٰى وَالْاَضْحٰى وَالْوِتْرُ –[কাবীর]

قَوْلُهُ "اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ" : নিঃসন্দেহে,আপনার শত্রুগণ নির্বংশ, শিকড়কাটা। এখানে شَانِئَكَ শব্দটি شَنِئَ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো, এমন ঘোরতর শত্রু, যারা বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হিংসার কারণে বঞ্চিত ব্যক্তির সাথে নির্মম ব্যবহার করে। আর اَبْتَرُ শব্দটি بَتَر শব্দ হতে নির্গত। আরবি ভাষায় অনেক অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ– কেটে ফেলা। প্রচলিত অর্থে মাত্র এক রাকাত নামাজ পড়াকে بُتَيْرٌ (বুতার) বলা হয়। একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে– যে কাজের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয় না তা আবতার বা ব্যর্থ হয়। সুতরাং ব্যর্থকর্ম ব্যক্তিকে আবতার বলা হয়। আত্মীয়-স্বজন ও গোত্র হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে আবতার বলা হয়। পুত্রহীন ব্যক্তিকে আবতার বলা হয়। পুত্র মরে গেলে আবতার বলা হয়। সাহায্যকারী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে নিঃসম্পর্ক হয়ে পড়লেও আবতার বলা হয়। আয়াতে মক্কার কাফেরগণের নাম-নিশানা, যশ-খ্যাতি, ধর্ম-আদর্শ ইত্যাদি মুছে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মূলত এ কথাটি কাফেরদের উক্তির প্রতিবাদে বলা হয়নি; বরং তা ছিল নবী করীম ﷺ এবং তাঁর দলীয় কর্মীবাহিনীর জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ। আর বাস্তবেও এ ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই। নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর হতে মক্কার কাফেরদের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ- দুর্গতির কালো অমানিশা। তারা নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে যা কিছু করার তা করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। বদর যুদ্ধে তারা ধর্ম ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে মার খাওয়ার পর চতুর্দিকে ইসলামের জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছিল। একে পাপিষ্ঠরা সহ্য করতে না পেরে ওহুদ যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধ; রচনা করেছিল; কিন্তু তাতেও সফল হতে পারল না। কয়েক বছর পরই মক্কা নগরী মহানবীর পদানত হলো এবং তারপরই ছড়িয়ে পড়তে লাগল ইসলামের জয়জয়কার। মানুষ দলে দলে, গোত্রে গোত্রে এসে নবী করীম ﷺ-এর হাতে বাইয়াত হয়ে ইসলামে দীক্ষা নিতে লাগল। মহানবী ﷺ-এর পর খেলাফতে রাশেদার যুগে ইসলামের উন্নতির বিষয়টি সর্বজনবিদিত। মোটকথা, নবী করীম ﷺ অপুত্রক হয়েও তাঁর বংশাবলির প্রতি মানুষ আজ পর্যন্ত দরুদ পাঠ করে আসছে। তাঁর বংশের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে গৌরব ভাবছে। এমনকি তাঁর সাহাবীদের বংশের সাথে সম্পর্ককে এ জীবনের আভিজাত্য ও কৌলিন্য মনে করছে। সাইয়্যেদ, আলবী, হাশেমী, সিদ্দিকী, ফারুকী, ওসমানী, আনসারী প্রমুখ বংশধারা ও উপাধি দুনিয়ায় আজ মহত্ত্ব, গৌরব ও কৌলিন্যের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। পক্ষান্তরে সে যুগের সময় আরবের বিখ্যাত সর্দারগণের নাম-নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায় না, বংশাবলির কোনো পাত্তা নেই। উপরন্তু আবূ জাহেল, আবূ লাহাব, উতবা ও শায়বার বংশ পরিচয় তো দূরের কথা তাদের নাম মুখে উচ্চারণ করতে মানুষ ঘৃণা বোধ করে। এ সব হলো هُوَ الْاَبْتَرُ-এর মূল রহস্য। যারা জীবনকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে, তাদেরকে আল্লাহ ইহকালে এভাবে পুরস্কৃত করেন এবং পরকালেও করবেন।

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ : সূরা আল-কাফিরূন

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম বাক্যের শব্দ اَلْكَافِرُوْنَ হতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে- سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ [সূরাতুল কাফিরূন]।

অত্র সূরায় বিশেষভাবে কাফিরদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মুসলমানদের সকল আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ অবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এ কারণেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল কাফিরূন। এতে ৬টি আয়াত, ২৬টি বাক্য এবং ৭৪টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইকরামাহ (রা.) এবং হাসান বসরী (র.) বলেন, এ সূরাটি মাক্কী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে দু'টি মত উদ্ধৃত হয়েছে। একটি মতানুযায়ী তা মাক্কী এবং অপর একটি মতে তা মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরদের মতে, তা মাক্কী সূরা। আর এর বিষয়বস্তু হতেও তা মাক্কী বলে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মূলবক্তব্য : এক কথায় এর মূল বক্তব্য হলো, তাওহীদের শিক্ষা এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ ঘোষণা। অর্থাৎ কাফেরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী হতে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে যে নিঃসম্পর্ক এ কথাটি অত্র সূরাহ দ্বারা জানিয়ে দেওয়া-ই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর এ সূরা দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, কাফের অথবা মুশরিকদের সাথে মুসলমানরা যেন সর্বদা অনমনীয়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কুফরি ও দীন পূর্ণমাত্রায় পরস্পর বিরোধী, আর এ দু'টির মধ্যে কোনো একটি দিকও যে পরস্পরের সাথে হওয়ার মতো নেই, এ কথাটিও তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। বর্তমান সূরাটি এ বিষয়ের জন্য পরিপূরক।

কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মূলা পেশকারী সূরা মনে করার কোনো প্রশ্নই হবে না। আর কুফর যেখানে যেরূপ অবস্থায়ই থাকুক না কেন মুসলমানদেরকে তা হতে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জনের ঘোষণা করতে হবে।

দীনের ব্যাপারে মুসলমানরা যে কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার সন্ধি-সমঝোতার আচরণ গ্রহণ করতে পারে না। তা কোনো রূপ খাতির-উদারতা ও সংকোচ-কুণ্ঠা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে। আর আগুন ও পানির ন্যায় ইসলাম ও কুফরি দু'টি বিপরীতমুখি আদর্শ। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ প্রদত্ত একত্ববাদের ধর্ম, আর কুফরি মানব রচিত মানব মন গড়ানীতি, ইসলামের পরিপন্থি। মুসলমানদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। আর কাফেরদের উপাস্য তারা ধার্য করেছিল ৩৬০টি মূর্তিকে অতএব, মুসলমান ও অমুসলমানদের নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। -[আশরাফী]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বহু ফজিলত রয়েছে-

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান মর্যাদাশীল সূরা। -[তিরমিযী]

২. শিরক হতে পরিত্রাণ দানকারী হিসাবে এ সূরাটি প্রসিদ্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হযরত নওফাল (রা.) আরজ করেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন- যা আমি শয্যাগমনকালে রাত্রিতে পড়তে পারি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা কাফিরূন পড়ো, কেননা তা শিরক হতে পবিত্রতা ঘোষণা করে।
-[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

نَزَلَتْ لَمَّا قَالَ رَهْطٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ النَّبِيَّ ﷺ تَعْبُدُ اٰلِهَتَنَا سَنَةً وَنَعْبُدُ اِلٰهَكَ سَنَةً

এটা তখন অবতীর্ণ হয় যখন মুশরিকদের একটি দল নবী করীম ﷺ -কে প্রস্তাব দেয় যে, এক বছর আপনি আমাদের ইলাহদের উপাসনা করবেন। আর এক বছর আমরা আপনার ইলাহের উপাসনা করব।

١. قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ـ

১. বলো, হে কাফেরগণ !

٢. لَآ اَعْبُدُ فِى الْحَالِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنَ الْاَصْنَامِ ـ

২. আমি উপাসনা করবো না বর্তমানে যা তোমরা উপাসনা কর। মূর্তিসমূহের।

٣. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ فِى الْحَالِ مَآ اَعْبُدُ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَحْدَهٗ ـ

৩. আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও বর্তমানে যাঁর ইবাদত আমি করি তিনি হলেন এক আল্লাহ।

٤. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ فِى الْاِسْتِقْبَالِ مَا عَبَدْتُّمْ ـ

৪. আর আমিও ইবাদতকারী নই ভবিষ্যতে তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছ।

٥. وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ فِى الْاِسْتِقْبَالِ مَآ اَعْبُدُ عَلِمَ اللّٰهُ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَاِطْلَاقُ مَا عَلَى اللّٰهِ عَلٰى جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ ـ

৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও ভবিষ্যতে যাঁর ইবাদত আমি করি আল্লাহ তা'আলা অবগত ছিলেন যে, এ কাফেরগণ ঈমান আনয়ন করবে না। আর আল্লাহ তা'আলার জন্য مَا অব্যয়টির ব্যবহার تَقَابُلْ -এর কারণে হয়েছে।

٦. لَكُمْ دِيْنُكُمْ اَلشِّرْكُ وَلِىَ دِيْنِ اَلْاِسْلَامُ وَهٰذَا قَبْلَ اَنْ يُّؤْمَرَ بِالْحَرْبِ وَحَذَفَ يَاءَ الْاِضَافَةِ السَّبْعَةُ وَقْفًا وَ وَصْلًا وَ اَثْبَتَهَا يَعْقُوْبُ فِى الْحَالَيْنِ ـ

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম শিরক আর আমার জন্য আমার ধর্ম ইসলাম। আর তা যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তনের পূর্বেকার বিধান। কেরাতে সাবয়ায় وَقْف ও وَصْل উভয় অবস্থায়াই دِيْنِىْ শব্দের ى বিলুপ্ত। কিন্তু ইয়াকূব উভয় ক্ষেত্রেই ى-কে বহাল রাখার পক্ষপাতি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ الخ : قُلْ ফে'ল يَا হরফে নেদা, اَلْكٰفِرُوْنَ মুনাদা, لَا اَعْبُدُ الخ জওয়াবে নেদা, বাক্যটি قُلْ-এর মাফঊল। لَا اَعْبُدُ الخ এবং وَلَا اَنَا عَابِدٌ الخ তাতে দু'টি মত রয়েছে। ১. প্রথমটি দ্বিতীয়টির তাকিদ। ২. প্রথমটি মুস্তাকবেলের জন্য, দ্বিতীয়টি হালের জন্য। কেননা, لَا মুযারে'-এর উপর মোস্তাকবেল অর্থে ব্যবহৃত হয়। لَا اَعْبُدُ الخ-এর অর্থ- لَا اَعْبُدُ فِى الْمُسْتَقْبِلِ وَلَا اَنْتُمْ فَاعِلُوْنَ فِى الْمُسْتَقْبِلِ مَا اُرِيْدُ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّىْ مَا تَطْلُبُوْنَ কেউ কেউ এর বিপরীতও বলেছেন।

دِيْنُكُمْ মুবতাদা মুয়াখখার আর لَكُمْ খবরে মুকাদ্দাম। دِيْنِ মূলে دِيْنِىْ ছিল। আয়াতসমূহের শেষ প্রান্তের সাথে সমতা বিধানের জন্য ى বিলোপ করা হয়েছে। আর তার চিহ্ন হিসাবে যের অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা আল-কাওছারের শেষ আয়াতে কাফিরদের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কাফিররাই নিঃসন্তান। বর্তমান সূরা পূর্ণটিই কাফিরদের ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে। এদিক দিয়ে উভয় সূরার মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান।

শানে নুযূল : ১. যখন একদল মুশরিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, আপনি এক বছর আমাদের উপাস্য [মূর্তিগুলোকে] দেবতাসমূহকে অর্চনা করুন, তবে আমরাও আপনার মা'বূদকে এক বৎসরকাল ইবাদত করবো। তখন উক্ত সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

আবূ জাহল ও আস ইবনে ওয়ায়েল, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ, আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুছ নামক কাফেরগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে একদা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে এই মর্মে সংবাদ পৌছাল যে, হে মুহাম্মদ ﷺ! আসুন, আমরা পরস্পর সন্ধি করে নিবো। এক বছর আমরা আপনার আল্লাহর পূজা করবো এবং এক বছর আপনি আমাদের মাবূদগণের উপাসনা করবেন। এ অনুপাতে উভয় পক্ষই উভয়ই পক্ষের ধর্ম হতে কিছু কিছু হিসসা লাভ করতে সক্ষম হবে। তদুত্তরে হুযূর ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করা হতে পানাহ্ চাই।

অতঃপর তারা বলল, ঠিক আছে, আপনি আমাদের কিছু সংখ্যক উপাস্যকে সত্য বলে গ্রহণ করুন, তবে আমরাও আপনার প্রভুকে বিশ্বাস করবো এবং তাঁর পূজা করবো। এমতাবস্থায়ই উক্ত সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

১. ইবনে ইসহাক নামক প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা এবং ইবনে জারীর ও তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করে বলেন, কুরাইশগণ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি যদি চান যে, আপনার সম্পদের প্রয়োজন আছে, তবে আমরা আপনাকে মক্কার সর্ববৃহৎ ধনী বানিয়ে দিবো। আর বিবাহ করতে চাইলেও আমাদের আরবের সর্বোচ্চ সুন্দরী রূপসী ও গুণবতী মহিলাটি আপনাকে বিবাহ করিয়ে দিব। তথাপিও আপনি আমাদের মা'বূদসমূহকে আর গালি দিবেন না। আর যদি এ কথায় একমত না হন, তবে আপনি আমাদের খোদাগুলোকে এক বছর পূজা করবেন, পরে আমরাও আপনার প্রভুকে এক বছর পূজা করবো। অতঃপর হুযূর ﷺ বললেন, একটু অপেক্ষা কর, দেখি আমার প্রভু তাতে কি বলেন। অতঃপরই অত্র সূরাটি নাজিল হয়।

قُلْ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তি : قُلْ 'বলে দিন'-এ নির্দেশ যদিও নবী করীম ﷺ -এর প্রতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী কথা হতে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, তা দ্বারা প্রত্যেক মু'মিনকে সম্বোধন করা হয়েছে। কাফেরদেরকে সামনের কথাগুলো বলে দেওয়া প্রত্যেক মু'মিনেরই কর্তব্য। এমনকি, যে ব্যক্তি তওবা করে ঈমান গ্রহণ করেছে, তার উপরো কর্তব্য যে, সে এ কথাগুলো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিবে। -[কাবীর]

قُلْ শব্দের উপকারিতাসমূহ : قُلْ ব্যবহারের মাধ্যমে ৪৩টি ফায়দা পরিলক্ষিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো-

১. নবী করীম ﷺ মানুষের জন্য নম্র, ভদ্র এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় যদি সরাসরি তাঁর পক্ষ হতে 'হে কাফেররা' বলা হয়, তাহলে ধারণা করা হবে বা তারা বলে বেড়াবে যে, এমন শক্ত শব্দ কোনো প্রকারেই নবীর পক্ষ থেকে হতে পারে না। তা আমার তথা কোমল চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমতাবস্থায় قُلْ শব্দ এ কথার ইঙ্গিত বহন করেছে যে, তা আমার পক্ষ থেকে নয়; স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে, তিনি-ই আমাকে 'বলো' বলেছেন।

২. যখন তাঁকে বলা হয়েছিল وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ তখন কিছু কড়া কথা বলতে তিনি দ্বিধা করছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ বলেন- [আপনার কোনো ভয় নেই] আপনি বলুন।

৩. قُلْ ছাড়া বললে কাফেররা ধারণা করতে বা বলতে পারে যে, তা মুহাম্মদের উক্তি, তাকে পাকড়াও করো। এমন মন্তব্য করতে তার আদৌ ভয় করেনি? এ সমস্ত কথা থেকে বাঁচার জন্য قُلْ বলা হয়েছে। কেননা এতে আল্লাহর কথা বুঝা যায়। -[কাবীর]

يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ-এর মুখাতাব কারা? : বিশেষ করে কাফেরগণ। আর এ শব্দটি মূলত কোনো গালি নয়। তাই তাদেরকে يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ বলে গালি দেওয়া হয়নি। তা আরবি ভাষায় নাস্তিকদের সম্বোধনসূচক শব্দ মাত্র। তার অর্থ হলো- অমান্যকারী বা অবিশ্বাসী। অতএব, يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ-এর অর্থ হবে, হে সে সকল লোকেরা! যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল ﷺ-এর রিসালাতকে অবিশ্বাস ও অমান্য করেছ। -[কাবীর, মাদারিক]

يَاَيُّهَا الْمُشْرِكُوْنَ বলে সম্বোধন না করার কারণ : উক্ত আয়াতে يَاَيُّهَا الْمُشْرِكُوْنَ বলা হয়নি; বরং يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ বলা হয়েছে। কেননা আয়াতে কেবল মুশরিকদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং সকল অবিশ্বাসীর দল উদ্দেশ্য। এতে কাফের, মুশরিক, ইহুদি, নাসারা, অগ্নিপূজক, হিন্দু, বৌদ্ধ, অর্থাৎ সকল অমুসলমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যদি مُشْرِكُوْنَ বলা হতো, তবে এক জাতিকেই خَاصّ করা হতো বাকিরা বাদ পড়ে যেত।

এখানে আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার কুফরকে একই অবস্থায় মেপেছেন। কারণ, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ প্রত্যেক প্রকারের অমুসলমান একই স্তরে রয়েছে।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ -এর তাৎপর্য : বায়যাবী গ্রন্থকার বলেন, لَا শব্দটি اِسْتِقْبَالٌ অর্থে مُضَارِعٌ-এর উপর প্রবিষ্ট হয় রূহুল বয়ান গ্রন্থকারও এ কথা বলেন। لَا টি مُضَارِعٌ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে তেমন ব্যবহার হয় না। তদ্রূপ مَا অক্ষরটিও مُضَارِعٌ بِمَعْنٰى حَالٌ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

কেউ কেউ বলেন, لَا এবং مَا প্রত্যেকটি حَالٌ এবং اِسْتِقْبَالٌ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে আমরা যে কোনো একটিকেই حَالٌ-এর জন্য এবং অপরটিকে اِسْتِقْبَالٌ-এর জন্য ব্যবহার করে থাকি।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ-এর তাফসীরে ইমাম বুখারী (র.)ও এ কথাই বলেন যে, مَا ও لَا কালিমা দু'টি কখনো زَمَانَهٗ حَالٌ আবার কখনো زَمَانَهٗ مُسْتَقْبِلٌ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে এ অক্ষরগুলো تَكْرَارٌ নেওয়া হয়েছে, এ কথা বলার প্রয়োজন থাকবে না। বড় বড় তাফসীরকারগণের অভিমতও তাই।

অতএব, আয়াতের তাফসীর হবে-কার্যত এমন হচ্ছে না যে, আমি তোমাদের মা'বূদগণের ইবাদত করবো, আর তোমরাও আমার মা'বূদের ইবাদত করবে। আর ভবিষ্যতেও কখনো এরূপ হতে পারে না। অর্থাৎ আমি আমার একত্ববাদের উপর বহাল থাকা অবস্থায় এবং তোমরা তোমাদের শিরকের উপর বহাল থেকে একে অপরের প্রভুর ইবাদত করবে, তা কখনো হতে পারে না।

মূলকথা হলো, তোমাদের এবং আমাদের মা'বূদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, ইবাদতের পদ্ধতিতেও মিল নেই।

এভাবেই مَا এবং لَا -এর تَكْرَارٌ-এর বিষয়টি নিরসন করা হয়েছে। আর মুসলমানদের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদতের নীতিমালাও একই। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহী-এর মাধ্যমে তা শিখিয়ে দিয়েছেন এবং মুশরিকদের নিয়মগুলো সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও স্বেচ্ছায় তৈরিকৃত, আল্লাহর কোনো বিধান মতে নয়। -[মা'রিফ]

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ আয়াতকে দ্বিরুক্ত করার কারণ : আয়াতটি দ্বিরুক্তির ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

১. تَكْرَارْ নেই, এটা কয়েকটি কারণে :

ক. প্রথম আয়াতটি ভবিষ্যৎকালের আর দ্বিতীয় আয়াতটি বর্তমানের জন্য।

খ. প্রথমটি বর্তমানের আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যৎ কালের জন্য।

গ. উভয়টির ক্ষেত্র ভিন্ন– এভাবে যে, তোমরা যা কিছু পূজা করছ আমি তার পূজা করি না, এ আশায় যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করছ না– এ আশায় যে, আমি তোমাদের মূর্তির পূজা করবো।

২. تَكْرَارْ আছে। তখন বলা হবে যে, ক. তাকিদের জন্য تَكْرَارْ নেওয়া হয়েছে। খ. কাফেরগণ তাদের প্রস্তাবকে দু'বার দিয়েছিল, এ কারণে জবাবও দু'বার দেওয়া হয়েছে। [তাদের প্রস্তাব ছিল যে, হে মুহাম্মদ, তুমি এক মাস বা এক বছর আমাদের মূর্তিকে পূজা কর আমরাও অনুরূপ তোমার আল্লাহকে পূজা করবো।] –[কাবীর]

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ বলার কারণ : অর্থাৎ তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার। এ আয়াতটির অর্থ অবলোকন করে অনেক লোক বিভ্রান্ত হয়। তারা বলে– তা দ্বারা ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছে। যদি তাদের ধর্ম সত্যই না হবে তবে কুরআনে কেন এ কথা বলা হলো যে, তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার। এটা দ্বারা দুই ধর্মকেই পাশাপাশি অবস্থান করার এবং একে অপরের উপর হস্তক্ষেপ না করার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু দীন শব্দ দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে; তা চিন্তা না করার ফলেই তাদের মনে এ উদ্ভট চিন্তা গজিয়েছে। এখানে দীন শব্দটি কর্মফল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, সূরা আল-ফাতিহায় আল্লাহকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ কর্মফল দিনের কর্তা বলা হয়েছে। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম হবে– তোমাদের কর্মফল তোমরা ভোগ করবে, আমাদের কর্মফল আমরা ভোগ করবো। যেহেতু এ আয়াত ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই কতিপয় তাফসীরকার বলেন– এ আয়াতের বিধান দ্বারা কাফেরদেরকে ইসলামের প্রথম যুগে ধর্ম পালনের যেটুকু অবকাশের কথা ভাবা যায়, তা জিহাদের বিধান দ্বারা রহিত করা হয়েছে। মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য লড়াইগুলোই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। বস্তুত দীনকে ধর্ম অর্থ গ্রহণ করলে আমরা এ কথাও বলতে পারি, এটা ঠিক অনুরূপ কথার ন্যায়, যেমন আমরা ধিক্কার ও ভর্ৎসনাভাবে বলে থাকি– তোমার পথে তুমি, আমার পথে আমি। এ কথা দ্বারা আমরা যেমন তার পথের স্বীকৃতি দেই না এবং সহাবস্থানেরও অবকাশ বুঝাই না; বরং তা দ্বারা পথের ভয়াবহ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়। আয়াতেও অনুরূপভাবে 'তোমার দীন তোমার আমার দীন আমার' বলে তাদের জীবনাদর্শ ও শিরকি কর্মপন্থার ভয়াবহ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের শিরকি জীবনাদর্শ ও মতবাদের স্বীকৃতি বা পাশাপাশি অবস্থানের কথা বলা হয়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো তোমাদের জন্য তোমাদের কুফরি ও শিরক, আর আমার জন্য রয়েছে তাওহীদ ও ইখলাস। এতে কাফেরদের জন্য বিশেষ সতর্ক বাণী রয়েছে। এ কথার তাৎপর্য হলে, নবী করীম ﷺ কাফেরদেরকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন তোমাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করার জন্য। কিন্তু যদি তোমরা আমার আহবানে সাড়া না দাও, তবে তোমরা আমাকে শিরকের দিকে আহ্বান করো না। তোমরা তোমাদের কুফরি নিয়েই থাক। আর আমাকে আমার দীন নিয়ে থাকতে দাও। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ النَّصْرِ : সূরা আন-নাসর

সূরাটির নামকরণের কারণ : উক্ত সূরার প্রথম আয়াত হতেই তার নামকরণ করা হয়েছে। আর দলে দলে যখন মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল তখন তাতে ইসলামের শক্তি ও সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হচ্ছিল। এ সূরায় সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে سُوْرَةُ النَّصْرِ। আর অত্র সূরাকে (سُوْرَةُ التَّوْدِيْعِ) বিদায় সূরাও বলা হয়। কেননা তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিদায় সম্পর্কীয় ইঙ্গিতও রয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এরপর আর কোনো সূরা নাজিল হয়নি; অর্থাৎ এটাই সর্বশেষ সূরা। -[মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী]

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি বিদায় হজকালে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে 'মিনা' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুযূর ﷺ তাঁর উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বিদায় হজের ভাষণ দেন। -[তিরমিযী, বায়হাকী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। -[আহমদ]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন হুযূর ﷺ বলেন, এ বছর আমার ইন্তেকাল হবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে উঠেন। হুযরত মুহাম্মদ ﷺ তখন বলেন, আমার বংশধরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) হেসে উঠলেন। -[ইবনে আবূ হাতেম ইবনে মারদুবিয়াহ]

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, সূরা আন-নাসর কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। অর্থাৎ এরপর কুরআনের পরিপূর্ণ কোনো সূরা নাজিল হয়নি।

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

অতঃপর হুযূর ﷺ ৮০ দিন জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে আয়াতে كَلَالَةٌ নাজিল হয়। তখন হুযূর ﷺ-এর বয়স মাত্র ৫০ দিন বাকি ছিল।

অতঃপর لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ নাজিল হয়, তখন হুযূর ﷺ-এর বয়স ৩৫ দিন মাত্র বাকি ছিল। অতঃপর وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الخ নাজিল হয়, তারপর হুযূর ﷺ-এর হায়াত ২১/৭ দিন বাকি ছিল। তবে اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الخ সূরাটি فَتْحُ مَكَّةَ-এর পূর্বে কি পরে নাজিল হয় এ মর্মে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীত হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়। তাতে বর্ণিত রয়েছে, এটা খায়বার হতে ফেরার পথে নাজিল হয়। আর খায়বারের যুদ্ধ فَتْحُ مَكَّةَ-এর পূর্বে হয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূলবক্তব্য হচ্ছে, আরবের বুকে ইসলাম একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আরব হতে পৌত্তলিকতা নির্বাসিত হওয়ার শুভ সংকেত দান এবং নবী করীম ﷺ-এর বিদায়কাল ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাষ। সুতরাং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মদদ ও বিজয় যখন সমাগত হবে, তখন দিকে দিকে তোমরা লক্ষ্য করবে ইসলামের জয়জয়কার অবস্থা, দেখতে পাবে যে, দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণের দিন শেষ হয়েছে। এখন ইসলাম আল্লাহর মদদে পুষ্ট হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের বিদায় হবে। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ভবিষ্যত বাণী। সর্বশেষে নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহর হামদ ও গুণগানসহ তাসবীহ পাঠের এবং ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে এ কথা বলা হয়েছে- ইসলাম আরবের বুকে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতাদর্শের উপর একটি বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের এ বিজয় ডংকা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং নবীর দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন তাঁর বিদায়ের দিন সমাগত। অতএব হে নবী! আপনার দ্বারা আল্লাহ যে এ মহৎ কাজ করালেন আপনি এ জন্য আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করুন এবং বিনীত মস্তকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দৃষ্টিতে নবী করীম ﷺ -এর ভুল-ত্রুটি বা দায়িত্ব পালনে গাফেলতি হয়নি; বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে বান্দা সর্বদাই অপরাধী। বান্দা কোনো সময়ই নিজেকে আল্লাহর নিকট নির্দোষ বলতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অতিশয় বিনয় প্রকাশের জন্যই ইস্তেগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আন-নাসর মদীনায় অবতীর্ণ

ثَلَاثُ اٰيَاتٍ : ৩ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ نَبِيَّهُ ﷺ عَلٰى اَعْدَائِهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ .

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য শত্রুর মোকাবিলায় স্বীয় নবীর প্রতি এবং বিজয় মক্কা বিজয়।

٢. وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَيِ الْاِسْلَامِ اَفْوَاجًا جَمَاعَاتٍ بَعْدَ مَا كَانَ يَدْخُلُ فِيْهِ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَ ذٰلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ جَاۤءَ الْعَرَبُ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ طَائِعِيْنَ .

২. আর তুমি লোকদেরকে দেখতে পাবে তারা আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে অর্থাৎ ইসলামে দলে দলে অথচ পূর্বে একজন একজন করে ইসলামে দীক্ষিত হতো। মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন এলাকার লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে।

٣. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اَيْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُوْلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ وَعَلِمَ بِهَا اَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُ وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتُوُفِّيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ .

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা, মহিমা ঘোষণা করো প্রশংসার সাথে। আর তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক পরিমাণে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পাঠ করতে থাকেন। এ সূরার মাধ্যমে এটা অনুমিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইহজগত ত্যাগের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। অষ্টম হিজরির রমজান মাসে মক্কা বিজয় সূচিত হয়, আর দশম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী ﷺ ইন্তেকাল করেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ الخ : اِذَا মানসূব হয়েছে جَاۤءَ দ্বারা। কেউ কেউ বলেন- يُسَبِّحُ দ্বারা মানসূব হয়েছে। نَصْرُ মাসদার اللّٰهُ ফায়েল -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। আর মাফউল উহ্য। অর্থাৎ نَصْرُهُ اِيَّاكَ اَوِ الْمُؤْمِنِيْنَ তা মিলিত হয়ে جَاۤءَ-এর ফায়েল হয়েছে। وَالْفَتْحُ আতফ হয়েছে نَصْرُ اللّٰهِ-এর উপর। وَ رَاَيْتَ আতফ হয়েছে جَاۤءَ-এর উপর। আর رَاَيْتَ-এর অর্থ যদি عِلْمٌ হয়, তাহলে প্রথম মাফউল হবে نَاسٌ আর দ্বিতীয় মাফউল হবে يَدْخُلُوْنَ আর যদি رَاَيْتَ -এর অর্থ عَبْرَةٌ হয়,

তখন يَدْخُلُوْنَ হাল হবে। উভয় অবস্থায় اَفْوَاجًا শব্দ يَدْخُلُوْنَ-এর ফায়েল হতে হাল হবে। فَسَبِّحْ الخ জওয়াবে শর্ত। بِحَمْدِ رَبِّكَ হাল হিসেবে নসবের স্থলে অবস্থিত। وَاسْتَغْفِرْهُ আতফ হয়েছে سَبِّحْ-এর উপর اِنَّهُ كَانَ الخ তা'লীল হলো اِسْتَغْفِرْهُ-এর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে কাফিরদের অপ-সন্ধির প্রস্তাবকে নাকচ করে ইসলামর স্বতন্ত্রতা ও স্বশক্তিতে নির্ভরতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বর্তমান সূরাতে কাফেরদের পরাজয় ও ইসলামের মহাবিজয় সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

শানে নুযূল : হযরত মুয়াম্মার ও যুহরী (র.)-এর উদ্ধৃতিসহ মুহাদ্দিস আবদুর রায্যাকের বর্ণনা। ইমাম যুহরী (র.) বলেন– মহানবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন খালেদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী মক্কার নিম্নভূমিতে প্রেরণ করলেন। তিনি কুরাইশগণের দল অতিক্রম করে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করলেন। অতঃপর অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দিলে তিনি অস্ত্র সংবরণ করলেন। তখন মক্কার লোকগণ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব]

এ বর্ণনাকে অধিকাংশ তাফসীরকার দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অধিকাংশের মতে এ সূরা বিদায় হজের সফরে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় অবতীর্ণ হয়। এটাই হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ সূরারূপে সর্বশেষ সূরা। এ সূরা নাজিলের পর নবী করীম ﷺ সত্তর দিন অথবা তিনমাস ইহজগতে জীবিত ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কারণে একে 'সূরাতুল বিদা'ও বলা হয়। সুতরাং এ দৃষ্টিতে বলা যায় যে, এ সূরাটি মূলত কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়নি। এটা হচ্ছে বিশ্বের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আরবের মাটি হতে শিরক ও পৌত্তলিকতা চিরতরে বিদায় হওয়ার পূর্বাভাষ এবং নবী করীম ﷺ এ জগৎ হতে চিরতরে বিদায় হওয়ার বিদায়ী সংকেত।

نَصْرٌ এবং فَتْحٌ-এর মাঝে পার্থক্য : نَصْرٌ এবং فَتْحٌ-এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন–

১. نَصْرٌ হলো, লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য-সহযোগিতা। আর فَتْحٌ হলো, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া।

২. نَصْرٌ হলো, فَتْحٌ-এর জন্য কারণের মতো।

৩. نَصْرٌ হলো, দুনিয়ায় স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া, আর فَتْحٌ হলো জান্নাত লাভ হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া।–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

ইযাফাতের সাথে نَصْرُ اللّٰهِ বলার কারণ : نَصْرٌ তো আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। যেমন, বলা হয়েছে وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ অতএব, نَصْرُ اللّٰهِ বা 'আল্লাহর সাহায্য' বলে সাহায্যকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ কি? এটার জবাব হলো, نَصْرُ اللّٰهِ-এর অর্থ হবে, এমন সাহায্য যা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। এ সাহায্য দুনিয়ার কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। অথবা, এমন সাহায্য যা আল্লাহর বিশেষ হিকমতের মাধ্যমে হয়ে থাকে অথবা সাহায্যকে বিরাট করে দেখানোর জন্য نَصْرُ اللّٰهِ বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহর সাহায্য আর অন্যের সাহায্যের মধ্যে তুলনাই চলে না। –[কাবীর]

আল্লাহর সাহায্য আগমনের পদ্ধতি : উক্ত আয়াতে আল্লাহর সাহায্য আগমনের যে কথা বলা হয়েছে তা স্বয়ং পায়ে হেঁটে অথবা পাখির মতো উড়ে আসার মতো কোনো কিছু নয়; বরং মুসলমানগণ যখন কাফেরদের সাথে জান বাজি রেখে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে থাকে। অথবা কাফেরদের সাথে ইসলামের সত্যতার দলিল পেশ করে থাকে। আর যখন মুনাফিক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং আল্লাহভীতি অর্জন করার জন্য শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় আত্মাসমূহের সাথে জিহাদ করে থাকে, তখনই তাদের জিহাদ এবং অসত্যের মোকাবিলা ও কাফেরদের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের নিকট আল্লাহর শক্তি বা সাহায্য আগমন করে থাকে এবং এ সাহায্যই আল্লাহর [পক্ষে] জয় বলা হয়।

আয়াতে نَصْرٌ এবং فَتْحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত فَتْحٌ দ্বারা তাফসীরকারগণ বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য উদ্দেশ্য করেছেন।

১. এখানে فَتْحٌ দ্বারা মক্কা বিজয়কে লক্ষ্য করা হয়েছে। কেননা, মক্কা বিজয় হওয়ার পর আরবের কাফেরদের শক্তি শেষ হয়ে গেল এবং অধিকাংশ আরববাসীগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল।

২. অথবা, এটা দ্বারা সাধারণ বিজয় উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা তখন ইসলামের বিশেষত্ব সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ল, সারা বিশ্বেই মুসলমানদের বিজয় লাভ হতে লাগল। –[খোলাসাতুত্ তাফসীর]

৩. অথবা, فَتْحٌ দ্বারা আল্লাহর اَسْرَارْ وَمَعْرِفَتْ-এর বিজয় উদ্দেশ্য, আর نَصْر দ্বারা আল্লাহর 'তাওফীক' উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ আল্লাহর তাওফীক যখন আমাদেরকে সাহায্য করবে তখন نَفْسِ اَمَّارَهْ ও শয়তান আমাদের সম্মুখে পরাজিত হবে এবং আল্লাহর مَعَارِفْ وَحَقَائِقْ-এর দরজা খুলে যাবে, সকল দিকেই ইসলামের উন্নতি হতে থাকবে।

نَصْر দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য, আর فَتْح দ্বারা সাধারণ বিজয়। যে বিজয়ের পর আর বিজয় হতে পারে না, যা আল্লাহর ذَات এবং صِفَات-এর সম্বন্ধে كَشْف লাভ করা।

৪. অথবা, فَتْح দ্বারা فَتْح جَبَرُوْت উদ্দেশ্য অর্থাৎ রূহ জগৎ সম্পর্কে كَشْف হওয়া।

نُصْرَتْ হলো– কোনো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, যাকে 'উপকরণ' বলা হয়। আর فَتْح হলো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া, যা সাহায্যের প্রতিফল স্বরূপ। আর فَتْح-এর জন্য نُصْرَتْ আবশ্যক, কিন্তু نُصْرَتْ-এর জন্য فَتْح হওয়া আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا : মক্কা বিজয়ের পূর্ব থেকেই বহুসংখ্যক লোক এমন হয়েছিল যে, যারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর রিসালত এবং ইসলামের সত্যকে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করেছিল। ইসলাম গ্রহণ করলে কুরাইশগণ আক্রমণ করবে– এ ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না।

অথবা, আরও বিভিন্ন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন তাদের সে সকল বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত হয়ে গেল এবং তখন থেকেই তারা দলে দলে ইসলামে দাখিল হতে শুরু করল এবং ইয়েমেন থেকে ৭০০ লোক একযোগে মুসলমান হয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট আসছিল। তারা পথে আজান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে আসছিল। এতদ্ভিন্ন আরও বহু আরবীগণও এরূপ দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। এ বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا

অর্থাৎ তুমি দেখতে পাবে যে, লোকজন দলে দলে শান্তির ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে।

وَرَأَيْتَ النَّاسَ-এর اَلنَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্য : বাহ্যিকভাবে اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা সকল মানুষ বুঝায়। আর এতে সকল মানুষ দীনে প্রবিষ্ট হওয়ার কথা। অথচ বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর জবাব দু'ভাবে দেওয়া যায়।

১. اَلنَّاسُ দ্বারা এখানে (اِنْسَانِيَّةٌ) মনুষ্যত্ববোধ উদ্দেশ্য। আর মনুষ্যত্ব বলতে দীন এবং ইবাদতকে বুঝায়। যার মধ্যে উক্ত মনুষ্যত্ব নেই, তাকে نَاسٌ বলাও ঠিক নয়। এ কারণেই বলা হয়েছে أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) একদা اَلنَّاسُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলেন, তখন তিনি বললেন– نَحْنُ النَّاسُ، أَشْيَاعُنَا أَشْبَاهُ النَّاسِ، وَأَعْدَاؤُنَا النَّسْنَاسُ অর্থাৎ আমরা হলাম اَلنَّاسُ এবং আমাদের অনুগামীরা হলো মানুষের মতো আর আমাদের শত্রুরা হলো ছোট বানর।" তা শুনে হযরত আলী (রা.) তাঁকে চুম্বন দিলেন এবং বললেন– اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

২. اَلنَّاسُ দ্বারা ইয়েমেনবাসীগণ উদ্দেশ্য। যখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন–

اَللّٰهُ أَكْبَرُ جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ اَلْإِيْمَانُ يَمَانٍ .....

অর্থাৎ আল্লাহু আকবার, আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এসেছে, আর ইয়েমেনবাসীরা এসেছেন। ঈমান তো ইয়েমেনীদের ঈমান .....। –[কাবীর]

দলে দলে দীন গ্রহণ : উপরিউক্ত দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মদদ ও বিজয় আগমনের পর আপনি দেখবেন যে, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। এখানে 'আপনি' দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হলেও ভাষণের মূল লক্ষ্য হলো সমগ্র মুসলিম উম্মত। কুরআন মাজীদে এ ধরনের সম্বোধনের অনেক উদাহরণই পাওয়া যাবে যে, নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করে সমগ্র মুসলিম উম্মতকে কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটির মর্ম এই হবে যে, এখন আর দুই একজন করে ইসলামে দীক্ষা নেওয়ার সময় নেই। এখন মানুষ গোত্র, অঞ্চল ও দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই এরূপ অবস্থার প্রকাশ ঘটেছে। মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ﷺ তায়েফ ও হোনায়েন বিজয় করলেন। এটার পরই শুরু হয়েছিল গোত্রে-গোত্রে ও দলে দলে ইসলাম গ্রহণের পালা। নবম হিজরির শুরুতেই আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে বিভিন্ন গোত্র এসে নবী করীম ﷺ-এর মুবারক হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। নানাদিক হতে প্রতিনিধির পর প্রতিনিধি এসে মহানবীর আস্তানায় ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। পরিশেষে এমন অবস্থা হলো যে, নিকট আরবে কোথাও একজন মুশরিক খুঁজে পাওয়া যেত না। সারকথা এই যে, আল্লাহর মদদ যখন বিজয়রূপে মুসলমানদের কাছে সমাগত হবে তখনই মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। এটাই হলো আয়াতের তাৎপর্য। সুতরাং এটা কোনো একটি দেশ, অঞ্চল ও যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আবহমানকাল ধরে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো দেশে, যে কোনো অঞ্চলে, যে কোনো যুগেই এটার রূপায়ন পরিলক্ষিত হতে পারে।

اَلنَّاسُ-কে مَعْرِفَة নেওয়ার কারণ : এর কারণ আনুষঙ্গিকভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ أَهْلُ يَمَن এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কতগুলো গোত্র, যারা দল বেঁধে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে ভিন্নভাবে বুঝানোর জন্য اَلنَّاسُ-কে مَعْرِفَة নেওয়া হয়েছে।

অথবা, এটাও বলা যায় যে, اَلتَّعْرِيْفُ لِلتَّعْظِيْمِ অর্থাৎ সেই ইসলাম গ্রহণকারী দলকে অন্যান্যদের উপর বিশেষত্ব দানের লক্ষ্যে اَلِفْ لَامْ নিয়ে مَعْرِفَةْ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ...... تَوَّابًا : আয়াতের অর্থ হলো, অতঃপর আপনার প্রভুর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করুন, আর তাঁর দরবারে গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা তিনি গুনাহগারদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে থাকেন। এ আয়াত দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عَارِفْ بِاللّٰهِ গণ সাধারণভাবে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ করার পর একাগ্রতার সাথে كَمَالِيَتْ-এর সর্বোচ্চ পন্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে থাকেন। যাতে সাধারণ মুসলমানগণ পৌঁছতে সক্ষম নয়। যেমন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ كَمَالِيَتْ -এর সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছেন। এ কারণেই হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, وَاسْتَغْفِرْهُ আপনি তাঁর ইস্তিগফার করুন।

ইস্তিগফার করার নির্দেশ দেওয়ার দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যখন عَارِفْ بِاللّٰهِ-এর দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন এবং সর্বস্তরের মানুষ আপনার অনুসারী হয়েছে এবং তাদের اِسْتِعْدَادْ সমূহ আপনার অপেক্ষা কোনোভাবেই তুলনীয় নয়; বরং তারা বহু নিম্নে রয়ে গেছে।

তাই নাকেস উম্মতগণের كَمَالِيَتْ -এর জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। যাতে আপনার অসিলায় তারা কিয়ামতের দিনের জন্য পূর্ণমাত্রায় ঈমানের নূর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যু সংবাদ : সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এ কথায় একমত যে, এ সূরাটি নবী করীম ﷺ -এর মৃত্যু সংবাদ বহন করে। বর্ণিত আছে যে, এটা হযরত আব্বাস (রা.) বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'কেন কাঁদছেন?' তিনি বললেন– আমার মনে হয় আপনার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আসলেই তা।

কারো মতে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরূপ বলেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ বালককে অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে।'

হযরত ওমর (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে সব সময় কাছে রাখতেন। বিশেষ বৈঠকে বদরী সাহাবীদের সাথে তাঁকে আসার অনুমতি দিতেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বললেন, এ বালককে আপনি কি অনুমতি দিচ্ছেন, অথচ আমাদেরও তো তার মতো ছেলে-সন্তান আছে? তিনি বললেন, তার ব্যাপারে আপনারা সবাই জেনেছেন যে, সে কেমন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ সম্পর্কে তাদের সাথে আমাকেও মন্তব্য করতে অনুমতি দিলেন। সম্ভবত এ প্রশ্ন তিনি আমার কারণেই সবার কাছে রেখেছেন।
তাদের মধ্য হতে কেউ বললেন, আল্লাহ তাঁর নবীকে বিজয়ের পর ক্ষমা প্রার্থনা এবং তওবার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, ব্যাপারটি মূলত এরূপ নয়; বরং তার দ্বারা রাসূল ﷺ -এর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে। ওমর (রা.) বললেন, তুমি যা বললে তা-ই আমি জানি। তারপর বললেন– এমন বুদ্ধিমত্তার জবাবের পর কিভাবে আমাকে তোমরা ভৎর্সনা করতে পার?
–[কাবীর, কুরতুবী]

এ সূরা দ্বারা মৃত্যু সংবাদ বুঝার কারণ : কয়েকটি কারণে উক্ত সূরায় মৃত্যুর সংবাদ বুঝা যায়–

১. এ সূরা নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়া এবং তাঁর সাক্ষতের মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন, আর সে বান্দা তাঁর সাক্ষাৎকে গ্রহণ করেছে।' এ সাক্ষাৎ বলতে মৃত্যুর পর আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে বুঝানো হয়েছে।
২. সাহায্য, বিজয় এবং দলে দলে দীনে প্রবেশের শুভ সংবাদ একথার প্রমাণ দেয় যে, পূর্ণতা অর্জন হয়ে গেছে। যার জন্য রাসূল ﷺ দুনিয়াতে এসেছিলেন। কার্য সম্পাদন হয়ে গেলে থাকার প্রয়োজন থাকে না।
৩. তাসবীহ, তাহমীদ এবং ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রচার এবং জনগণের সাথে সম্পর্কশীল সকল কাজ থেকে বিমুখ হতে হবে। কেননা এ কাজের দায়িত্বশীল তৈরি হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ জীবিত থাকলে রেসালাত থেকে অব্যাহতি নিয়ে বসে থাকতে হবে। আর এটা জায়েজ নয়।
৪. وَاسْتَغْفِرْهُ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিদায়ের সময় ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। তওবা হয় শেষ জীবনে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا : বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে অবহিত করেছেন যে, অচিরেই আপনি একটি নিদর্শন দেখবেন, যখন তা দেখবেন তখন سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ অধিক পরিমাণে পাঠ করবেন। আর সে নিদর্শন হলো সূরা নসর। –[মাযহারী]

سُوْرَةُ اَبِىْ لَهَبٍ : সূরা আল-লাহাব

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আবী-লাহাব। সূরার প্রথম আয়াতের শব্দ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ হতে নামকরণ করা হয়েছে।

আর আবূ লাহাব-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্র সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এটাকে সূরা আবী-লাহাব নামকরণ করা স্বার্থক হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : উক্ত সূরাটি যে মাক্কী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং মতভেদও নেই। তবে মাক্কী জীবনের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তা ঠিক কোন অধ্যায়ে নাজিল হয়েছে– এ কথাটি সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে নবী করীম ﷺ এবং তার ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপারে আবূ লাহাবের যে ভূমিকা ছিল, সে দৃষ্টিতে অনুমান করা যায় যে, যে সময়ে নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় সে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তার আচরণ ইসলামের অগ্রগতির পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়েছিল, ঠিক সে সময়েই এ সূরা নাজিল হয়েছে।

আর এটাও সম্ভব যে, কুরাইশের লোকেরা যখন নবী করীম ﷺ এবং তাঁর গোটা বংশ পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে শি'আবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ করেছিল এবং আবূ লাহাবই কেবল এমন ব্যক্তি ছিল, যে নিজের বংশ পরিবারের লোকদের সংস্পর্শ পরিহার করে দুশমনদের পক্ষ সমর্থন করেছিল, এ সূরাটি সে সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ইসলামের কোনো শত্রুর নাম উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কেবল এ সূরাটিকেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ সূরাটি আবূ লাহাব এবং তার স্ত্রীকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। এর কারণ হলো যে, আবূ লাহাব ইসলামের শত্রুতায় আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ নবী করীম ﷺ তার শত্রুতার জবাবে কোনো দিনই কিছু বলেননি; বরং তার অত্যাচার-নিপীড়ন নীরবেই সহ্য করে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তার হীনতা-নীচতা, বিদ্বেষপরায়ণতা ও শত্রুতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার এবং তার স্ত্রীর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। বলা হয়েছে– আবূ লাহাব সর্বাঙ্গীনভাবে তার স্ত্রীসহ ধ্বংস হোক, চরমভাবে তার বিনাশ ঘটুক। তার বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, ইহকাল ও পরকাল কোথাও উপকারে আসবে না। সে তার কর্মের বিনিময়ে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তার সেই স্ত্রীও, যে মহানবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাঁটাযুক্ত ডাল বহন করে তাঁর দুয়ারে ফেলে রাখে। পরকালে তার গলায় শৃঙ্খলের হাসুলী পড়িয়ে দেওয়া হবে। এ সূরা অবতীর্ণের পরও তারা ঈমান আনল না; বরং মহানবীর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে গেল এবং বকাবকি ও আবোল-তাবোল বলতে লাগল। তার কথার কোনো মূল্য নেই। তাই আস্তে আস্তে মহানবীর দিকেই মানুষের মন আকৃষ্ট হতে লাগল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لَمَّا دَعَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وَقَالَ اِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ عَمُّهُ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا دَعَوْتَنَا نَزَلَ تَبَّتْ خَسِرَتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ اَىْ جُمْلَتُهُ وَعُبِّرَ عَنْهَا بِالْيَدَيْنِ مَجَازًا لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهِمَا وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ دُعَاءٌ وَتَبَّ خَسِرَ هُوَ وَهٰذِهِ خَبَرٌ كَقَوْلِهِمْ اَهْلَكَهُ اللّٰهُ وَقَدْ هَلَكَ وَلَمَّا خَوَّفَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَذَابِ فَقَالَ اِنْ كَانَ مَا يَقُوْلُ ابْنُ اَخِىْ حَقًّا فَاِنِّىْ اَفْتَدِىْ مِنْهُ بِمَالِىْ وَ وَلَدِىْ نَزَلَ

১. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সম্প্রদায়কে আহ্বান করে বলেন, আমি তেমাদেরকে কঠোর শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী তখন তাঁর চাচা আবূ লাহাব বলে উঠল, تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا دَعَوْتَنَا অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও! এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করেছ? তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। ধ্বংস হোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক আবূ লাহাবের হস্তযুগল অর্থাৎ সর্বাঙ্গ রূপকার্থে হস্তযুগল দ্বারা সর্বাঙ্গ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা অধিকাংশ কাজ হাতের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এ বাক্য বদদোয়ার জন্য আর সে নিজেও ধ্বংস হোক এটা তার ধ্বংসের ব্যাপারে সংবাদ দান। যেমন, বলা হয় اَهْلَكَهُ اللّٰهُ وَقَدْ هَلَكَ আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন, এ জন্য আবূ লাহাব বলেছিল, আমার ভাতিজার কথা যদি সত্যে পরিণত হয়, তবে আমি আমার সম্পদ ও সন্তান ফিদিয়া দিয়ে তা হতে অব্যাহতি লাভ করবো। তখন পরবর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

٢. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ وَكَسْبُهُ اَىْ وَلَدُهُ وَاَغْنٰى بِمَعْنٰى يُغْنِىْ

২. তার কোনো কাজে আসেনি– তার সম্পদ ও উপার্জন আর তার উপার্জন অর্থাৎ তার সন্তানরা اَغْنٰى শব্দটি يُغْنِىْ অর্থে ব্যবহৃত।

٣. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ اَىْ تَلَهُّبٍ وَتَوَقُّدٍ فَهِىَ مَالُ تَكْنِيَتِهِ لِتَلَهُّبِ وَجْهِهِ اِشْرَاقًا وَحُمْرَةً .

৩. অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে অর্থাৎ লেলিহান শিখা বিস্তারকারী ও প্রজ্বলিত। আর এটা তার উপনামের পরিণাম, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল চেহারার কারণে তার উপনাম اَبُوْ لَهَبٍ রাখা হয়েছিল।

অনুবাদ :

٤. وَامْرَأَتُهُ ط عَطْفٌ عَلٰى ضَمِيْرِ يَصْلٰى سَوَّغَهُ الْفَصْلُ بِالْمَفْعُوْلِ وَصِفَتِهٖ وَهِيَ أُمُّ جَمِيْلٍ حَمَّالَةَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ الْحَطَبِ الشَّوْكِ وَالسَّعْدَانِ تُلْقِيْهِ فِيْ طَرِيْقِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪. আর তার স্ত্রীও যা يَصْلٰى-এর যমীরের প্রতি عطف ও صفت-এর মধ্যবর্তী مَفْعُوْل দ্বারা ব্যবধানের কারণে এ عَطْف-এর অবকাশ রয়েছে। আর সে হলো, উম্মে জামীল। যে বহনকারিণী শব্দটি পেশ ও যবরযোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে ইন্ধন কণ্টক ও কাষ্ঠ, যা সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চলার পথে ছড়িয়ে দিত।

٥. فِيْ جِيْدِهَا عُنُقِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ اَيْ لِيْفٍ وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ الَّذِيْ هُوَ نَعْتٌ لِامْرَأَتِهٖ اَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ .

৫. তার গলদেশে ঘাড়ে পাকানো রজ্জু অর্থাৎ শক্ত পাকানো। এ বাক্যটি حَمَّالَةَ الْحَطَبِ হতে حَالٌ যার صِفَتْ -এর اِمْرَأَتُهُ অথবা তা উহ্য مُبْتَدَأ-এর خَبَرْ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ الخ : اَبِيْ لَهَبٍ ফে'ল মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলিত হয়ে تَبَّتْ-এর ফায়েল। وَتَبَّ ফে'ল, যমীর ফায়েল, যা আবূ লাহাবের দিকে ধাবিত। একটি বাক্য অপর বাক্যের উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ : حَبْل মাওসূফ, مِنْ مَّسَدٍ সিফাত, مَوْصُوْف ও صِفَتْ মিলিত হয়ে মুবতাদা মুয়াখখার فِيْ جِيْدِهَا খবরে মুকাদ্দাম। আর বাক্যটি নসবের স্থানে حَمَّالَةَ -এর যমীর হতে হাল হিসাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, সূরা আল-কাফিরূনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন দরবারে এলাহীতে আরজি পেশ করলেন, হে আল্লাহ! তবে আমার পুরস্কার কি? তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন যে, لَكَ النَّصْرُ وَالْفَتْحُ এরপর নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার সে চাচার কি পরিণতি হবে, যে সারা জীবন আমাকে কষ্ট দিয়েছে। মূর্তিপূজার দিকে আমাকে আহ্বান করেছে। আমি তাওহীদের দিকে আহ্বান করলে সে পাথর ছুড়ে মেরেছে, তখন আল্লাহ এ সূরায় ঘোষণা করেছেন যে, تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ -[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল : ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- যখন اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (الاية) অবতীর্ণ হয়। নবী করীম ﷺ একদিন সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হায়! প্রাতঃকালীন বিপদ-বিপদ!! বলে ডাক দিলেন। তাঁর ডাক শুনে কুরাইশরা পাহাড়ের পাদদেশে জমায়েত হলো। যে আসতে পারল না, সে লোক পাঠিয়ে বৃত্তান্ত জানতে চাইল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ওগো! আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের পিছনে একদল শত্রু তোমাদের উপর হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে বলল- হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করছি। তোমরা প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করো। নতুবা তোমাদের উপর শাস্তি অনিবার্য। এটা শুনে নবী করীম ﷺ-এর চাচা আবূ লাহাব বলল, تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟ অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও আমাদেরকে এ জন্য এখানে জমায়েত করেছ? কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আবূ লাহাব নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ওই সময় একটি প্রস্তরখণ্ডও নিক্ষেপ করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন।-[খাযেন, লোবাব, কাবীর]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ডেকে শাস্তির ভয় দেখান তখন আবূ লাহাব বলে, যখন শাস্তি আসবে তখন মাল এবং সন্তানসন্ততি ফেদিয়া হিসাবে দিয়ে মুক্তি পাবো। তখন مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ অবতীর্ণ হয়। -[খাযেন]

تَبَّتْ-এর অর্থ : تَبَّتْ ক্রিয়াটি تَبَابٌ মাসদার হতে গৃহীত। تَبَابٌ-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন–

১. اَلتَّبَابُ অর্থ اَلْهَلَاكُ ধ্বংস। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ

২. تَبَابٌ অর্থ خَسَارَةٌ - خُسْرَانٌ ক্ষতি, অনিষ্ট। অর্থাৎ এমন ক্ষতি যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ বলেন–وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ এ تَتْبِيْبٍ-এর ব্যাখ্যা অন্যত্র এসেছে غَيْرَ تَخْسِيْرٍ।

৩. تَبَابٌ অর্থ خَيْبَةٌ -প্রার্থিত বস্তু অর্জন না হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– আবূ লাহাব মানুষকে এই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিরত রাখত যে মুহাম্মদক জাদুকর। যেহেতু সে গোত্রের সর্দার ছিল, সেহেতু তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ না করেই চলে যেত। সমাজে সে না ছিল দোষী না ছিল অভিযুক্ত। পিতার মতো সবাই তাকে সম্মান করত। যখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন সে শুনে রাগে, ক্ষোভে বিরোধিতা শুরু করল। তখন থেকে সে দোষী এবং অভিযুক্ত বলে সমাজে পরিচিত হলো। তারপর থেকে সে যে কোনো কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে বলত কেউই কান দিত না। অতএব, তার সকল আশা দুরাশায় পরিণত হলো। কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পারল না।

৪. হযরত আতা (রা.) বলেন, تَبَّتْ অর্থ غُلِبَتْ পরাজিত হলো। কেননা তার ধারণা ছিল যে, তার হাত বিজয়ী, সে মুহাম্মদ ﷺ -কে মক্কা হতে বের করে দিবে; কিন্তু তা হয়নি; সে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, تَبَّتْ অর্থ صَفِرَتْ يَدَاهُ অর্থাৎ তার দুই হাত কল্যাণ থেকে খালি হয়ে গেছে।

–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

আবূ লাহাবের পরিচয় : আবূ লাহাবের প্রকৃত নাম ছিল عَبْدُ الْعُزّٰى এ ব্যক্তি হুযূর ﷺ -এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব-এর বংশধরভুক্ত লোক ছিল। তার চেহারা ও শরীরের রং দুধে আলতা মিশানো রঙের মতো ছিল বলে তার كُنْيَتْ রাখা হয় আবূ লাহাব।

আবূ লাহাব একজন ইসলামের বিরাট শত্রু ছিল। স্বজাতির ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ইসলামকে অস্বীকার করেছিল। আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ মনোরথ হলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লা'নত করলেন।

কারো কারো মতে, এ লোকটি তার নাম অনুসারে ওজ্জার সেবাদাস হিসাবেই পরিণত হয়েছিল। এ হিসাবে তার নামকরণ স্বার্থক হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনে তার প্রকৃত নাম উল্লেখ করা হয়নি। কারণ সে নামটিও মুশরিকের নাম ছিল। মুশরিকের নাম কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করার যোগ্যতা রাখে না। এ কারণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। "لَهَبٌ" জাহান্নামের একটি সম্পর্কিত নাম।

يَدَا উল্লেখের ফায়দা : يَدَ উল্লেখ করার মধ্যে কয়েকটি কারণ ও ফায়দা বর্ণিত আছে–

১. কেননা, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে পাথর নিক্ষেপের জন্য উদ্যত হয়েছিল। তারিকুল মুহারিবী বলেন, আমি বাজারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ, হে মানুষ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, সফলতা অর্জন করবে। একজন লোক তাঁর পিছনে পাথর নিক্ষেপ করছিল, এমতাবস্থায় তার পিছন দিক রক্তাক্ত হয়ে গেছে। সে বলছে– হে, তোমরা তাকে অনুসরণ করবে না– সে মিথ্যাবাদী। আমি বললাম– এ লোক কে? মানুষ বলল, মুহাম্মদ এবং তাঁর চাচা আবূ লাহাব।

২. দু' হাত বলে তার দীন এবং দুনিয়াকে বুঝানো হয়েছে। তার প্রথম এবং শেষকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অথবা, দু' হাত দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, ডান হাত হলো অস্ত্র আর বাম হাত হলো ঢাল। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

৪. কারো মতে, দু হাত দ্বারা অর্থ-সম্পদ ও সমতাকে বুঝানো হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

تَبَّ-কে দ্বিরুক্ত করার কারণ : تَبَّ-কে কয়েকটি কারণে দ্বিরুক্তি করা হয়েছে।

১. প্রথম تَبَّتْ বদ-দোয়ার জন্য আর পরের تَبَّ তার ধ্বংসের খবর পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

২. উভয়টিই তার ধ্বংসের খবর বহন করে, এভাবে যে, প্রথমটি দ্বারা তার সকল কাজকর্ম এবং ভূমিকা আর পরের تَبَّ তার নাফস ধ্বংস হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে।

৩. প্রথম تَبَّ দ্বারা তার নাফস আর দ্বিতীয় تَبَّ দ্বারা তার ছেলে উতবা উদ্দেশ্য।

৪. প্রথম تَبَّ অর্থ হলো তার দুই হাত ধ্বংস হোক, কেননা সে আল্লাহর হক চিনেনি। আর পরের تَبَّ অর্থ ধ্বংস হোক, কেননা সে রাসূলের হক চিনেনি। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

مَا أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ -এর অর্থ : সূরার দুই নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, আবূ লাহাবের ধন-সম্পদ ও উপার্জন কোনো উপকারে আসল না। আবূ লাহাব ছিল কৃপণ লোক। সে কৃপণতার দ্বারা বহু ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিল। তৎকালীন মক্কায় চারজন লোক বিরাট ধনী ও সম্পদশালী বলে পরিচিত ছিল, আবূ লাহাব ছিল তাদের একজন। তার মওজুদ স্বর্ণের পরিমাণই ছিল আট সের দশ তোলা। সে বহু পশু সম্পদের মালিক ছিল। আর উপার্জন দ্বারা সম্ভবত তার ছেলেদের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা হাদীসে সন্তানকে উপার্জিত সম্পদ বলা হয়েছে। অতএব, আয়াতের মর্ম হবে– তার ধনসম্পদ এবং সন্তানগণ যেমন এ দুনিয়াতে তার কোনো কল্যাণে আসেনি; তেমনি পরকালেও আসবে না। একটি ঘটনা দ্বারাই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও কাফেরদের চরম পরাজয়ের কথা শুনে আবূ লাহাব যার পর নাই শোকাভিভূত, মর্মাহত ও ব্যথিত হয়ে পড়েছিল। যে কারণে সে এমন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল যে, সে রোগ হতে আর নিষ্কৃতি লাভ করেনি। তার দেহে একপ্রকার ফুসকুড়ি যা বসন্ত গোটার ন্যায় ছিল, তা সাংঘাতিকভাবে দেখা দিল। আরবে এ ব্যধিকে সংক্রামক ব্যধি ভাবা হতো। এ ব্যাধি দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই তার আপনজন ও সন্তানগণ দূরে সরে পড়ে। কেউ তার ধারে কাছে আসল না। ফলে রোগযন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে নিজের ঘরেই মরে রইল। কয়েকদিন পর্যন্ত লাশ পড়ে থাকার দরুন যখন তা পচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলো, তখন প্রতিবেশী লোকগণ দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে তার এক ছেলের নিকট অভিযোগ করল। এ সময় এক ছেলে কয়েকজন হাবশী লোক ভাড়া করল। তারা নাকমুখ বন্ধ করে লাঠি দ্বারা লাশটি গড়িয়ে গড়িয়ে একটি কূয়া খনন করত তাতে ফেলে দিয়ে মাটি ও পাথর কুচা দ্বারা কূয়াটির মুখ বন্ধ করে দিল।

তাফসীরকারগণ হতে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ লাহাবের তিন পুত্র ছিল– ওতবা, ওতায়বা ও মাতয়াব। যখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়, আবূ লাহাব রাগান্বিত হয়ে আপন পুত্র ওতবা ও ওতায়বাকে বলে–তোমাদের বিবাহ বন্ধনে মুহাম্মদের যে দুই কন্যা রোকাইয়া ও উম্মে কুলছুম রয়েছে, তাদেরকে এক্ষণই তালাক দিয়ে দাও, অন্যথায় আমি তোমাদের মুখ দেখবো না। [তখনও কাফেরের সাথে বিবাহ সিদ্ধ ছিল।] তারা পিতার নির্দেশ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে গিয়ে তালাক প্রদান করে। ওতায়বা উম্মে কুলছুমকে তালাক প্রদান করে রাসূল ﷺ-কে অনেক গালাগালি করে; আর রাসূলের মুখের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। কিন্তু রাসূলের মুখমণ্ডলে তা পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বদদোয়া করেন–اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য হতে একটি কুকুরকে তার উপর বিজয়ী করে দাও।

ওতায়বা তালাক প্রদান করে ঘরে যায়, আর পিতার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সফরে গমন করে। পথিমধ্যে রাত্রে একস্থানে যাত্রা বিরতি করে। সেখানে একজন পাদ্রী এসে তাদেরকে বলে– এখানে বন্য হিংস্র পশু থাকে, সাবধান! আবূ লাহাব সকলকে একত্র করে বলে–আমার এই সন্তানের হেফাজত করবে, কেননা আমার মুহাম্মদের বদ-দোয়ার ভয় হচ্ছে। কাজেই সকলে তার পুত্রকে মাঝে নিয়ে শুয়ে পড়ে। রাত্রে জঙ্গল হতে একটি বাঘ আসে। আর শুঁকে শুঁকে ওতায়বাকে পেয়ে নিয়ে যায়, আর ফেড়ে ভক্ষণ করে। –[রূহুল মা'আনী]

ভবিষ্যদ্বাণী : এ সূরাতে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেগুলো বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল–

১. আবূ লাহাবের ধ্বংস।

২. তার ধন-সম্পদ দ্বারা সে কোনো প্রকার উপকৃত হবে না।

৩. সে জাহান্নামী হবে। –[কাবীর]

আবূ লাহাবের স্ত্রী : এ সূরায় আবূ লাহাবের মারাত্মক পরিণতির সাথে তার স্ত্রীকেও জড়িত করা হয়েছে। তার স্ত্রীও ইসলাম এবং নবী করীম ﷺ-এর বিরোধিতায় কম পরিশ্রম করে নি। এ স্ত্রীলোকটির নাম ছিল আরওয়া। তার উপনাম ছিল উম্মে জামিল। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের ভগ্নি। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন উম্মে জামিল তা শুনতে পেয়ে ক্রোধে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং সে নবী করীম ﷺ-এর কুৎসা গাঁথা গেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলো। এ সময় তার হস্তে ছিল এক মুষ্টি কঙ্কর শিলা। সে অগ্রসর হয়ে হারামে উপস্থিত হলো। এ সময় নবী করীম ﷺ ও আমার পিতা আবূ (রা.) বকর হারামেই বসা ছিলেন। আবূ বকর তা দেখে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! যে মহিলাটি আসছে, সে আপনার ক্ষতি করতে পারে বলে আমার মনে হয়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– সে আমাকে দেখতেই পাবে না। উম্মে জামীল হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকটে এসে তাঁকে বলল, তোমার সাথী নাকি আমার নামে কুৎসা রটনা করছে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, এ ঘরের মালিকের নামে কসম! তিনি তোমার নামে কোনোই কুৎসা রচনা করেননি। তা শুনে সে চলে গেল।

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -এর অর্থ : এ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– কাঠ বহনকারিণী। তাফসীরকারগণ এর কয়েকটি তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

১. আবূ লাহাবের স্ত্রী রাত্রি কালে কাঁটাযুক্ত গাছের ঢাল এনে হুযূর ﷺ -এর ঘরের দরজায় ফেলে রাখত, এ কারণে তাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। যাহ্হাক হযরত ইকরামা ও ইবনে মুনযির (র.) এ মত প্রকাশ করেন।

২. উম্মে জামীল পরস্পর মানুষের মাঝে কুটনাগিরী করে বেড়াত, আর একজনের বিরুদ্ধে অপরজনকে ক্ষেপিয়ে তুলত, এটাকে চোগোলখুরি বলা হয়। এটা পরস্পরের মধ্যে যেন আগুন লাগানোর মতো কাজ ছিল। তাই তাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া, তেমনি বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে বিবাদ লাগানো। তাই তাকে এ নাম দেওয়া হয়। এ মতের প্রবক্তা হলেন ইমাম সুদ্দী ও কাতাদাহ (র.)।

৩. আর হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, اَلْحَطَبُ অর্থ– গুনাহ। অর্থাৎ আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল গুনাহের বোঝা বহনকারিণী। –[নূরুল কোরআন]

جِيْدٌ ও مَسَدٌ -এর অর্থ : আরবি ভাষায় অলংকার পরিহিত গলাকে বুঝাবার জন্য جِيْد বলা হয়। তাফসীরকারকগণ বলেছেন– আবূ লাহাবের স্ত্রীর গলায় একটি বহু মূল্যের কণ্ঠহার ছিল। সে বলত, আমি এটা বিক্রয় করে মুহাম্মদের শত্রুতায় ব্যয় করবো। এ কারণে এখানে جِيْدٌ শব্দটি বিদ্রূপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আর مَسَدٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়–

১. খুব শক্ত পাকানো রশি। ২. খেজুর আঁশের পাকানো রশি। ৩. চামড়া বা পশম দ্বারা পাকানো রশি। ৪. লোহার তার জড়ানো রশি। সুতরাং সর্বশেষ আয়াতটির মর্ম হবে– তার গলায় খুব শক্ত পাকানো রশি হাসুলীর ন্যায় ঝুলতে থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত– তার গলায় লোহার সত্তর হাত জিঞ্জির লাগানো হবে। কতিপয় তাফসীরকারক বলেছেন– শেষ দুই আয়াতে তার পার্থিব অবস্থা এবং পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে। সে সময় সে পাহাড় হতে রাসূল ﷺ -এর শত্রুতায় কাষ্ঠ বহন করে আনত। তার গলায় সোনা ও মুক্তার হারের পরিবর্তে খেজুর ছিলকার রশি থাকত যা দ্বারা কাষ্ঠ বহন করে আনত। সে রশি গলায় নিয়ে তার মৃত্যুও হবে।

যেমন তাফসীরকারগণ হতে বর্ণিত হয়েছে– সে একদিন একটি কাষ্ঠের বোঝা বহন করে আনার পথে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং বিশ্রামের উদ্দেশ্যে একটি পাথরের উপর বসে। সে সময় একজন ফেরেশতা পিছন হতে রশি লাগিয়ে টানে, আর সে পড়ে যায়। সে সময়ই তার মৃত্যু হয়। তাই সে যেন কবরে যাওয়ার সময় গলায় রশি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। –[খাযেন, মা'আলিম]

* আর হযরত আ'মাশ-মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, مَسَدٌ শব্দটির অর্থ হলো নির্মিত শৃঙ্খল। হযরত শা'বী এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো– খেজুরের ছালের তৈরি মজবুত রশি। সে কাঠের বোঝা বহনের জন্যে এ রশি ব্যবহার করত। আর তা দিয়ে বেঁধেই তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

* হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.) বলেছেন, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের গলায় সর্বদা একটি মূল্যবান হার থাকত, সে দম্ভ প্রকাশ করে বলত, মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতা এবং শত্রুতা সাধনে আমি এ মূল্যবান হার ব্যয় করবো, হয়তো এ কারণেই দোজখে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে।

* আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, যদি مَسَدٌ শব্দটির অর্থ লৌহ নির্মিত জিঞ্জির হয়, তবে পরকালে এ শাস্তি হবে। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ : সূরা আল-ইখলাস

সূরাটির নামকরণের কারণ : কুরআন মাজীদে সমস্ত সূরাসমূহের নামই সূরা হতে চয়নকৃত একটি শব্দ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু এ সূরাটি এর ব্যতিক্রম। সূরার কোনো শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়নি; বরং সূরার মূলবক্তব্য ও ভাবধারা হতে এটার নামকরণ করা হয়েছে 'আল-ইখলাস'। এর অর্থ হলো– নির্ভেজাল, নিরঙ্কুশ, একনিষ্ঠতা। কেননা এ সূরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও অন্যান্য তাওহীদের কথা বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় অন্য কোনো বস্তুর সংমিশ্রণ ও ভেজাল নেই। তাঁর ক্ষেত্রে কোনো কিছু মিশ্রিত হয়নি। তিনি নিরেট নির্ভেজাল খালেস একক সত্তা। কেউ কেউ তার নাম রেখেছেন– সূরাতুল আসাস বা মৌল সূরা। অর্থাৎ ইসলামি জীবন– বিধানটি আল্লাহ কেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। সে আল্লাহর মূল ও আসল পরিচয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে তাকে সূরাতুল আসাস বলা হয়। আবার কেউ কেউ সূরাটির প্রথম আয়াত দ্বারা তার নামকরণ করেছেন– سُوْرَةُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। এতে ৪টি আয়াত, ১৫টি বাক্য এবং ৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী কিংবা মাদানী এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

১. অনেকের মতে, তা মাক্কী। যেমন, হযরত ইবনে মাসউদ (র.) বলেন– কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ -কে বলল–আপনার রব-এর বংশতালিকা বলুন, তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ মতের সাথে উবাই ইবনে কা'বও একমত।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ইহুদিদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো, তাদের মধে কা'ব ইবনে আশরাফ, হুয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তারা বলল– হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার সে রব কি রকম যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি নাজিল করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মাদানী। তবে উভয় ধরনের হাদীসকে একত্র করলে বুঝা যায় যে, প্রথমে তা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তারপর একই প্রশ্ন ইহুদিরা মদীনাতে করলে একই সূরা শুনিয়ে দেওয়া হয়।

মূলবক্তব্য : সূরাটির মূলবক্তব্য হলো, এক কথায় একত্ববাদ। রাসূলে কারীম ﷺ যখন একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন দেব-দেবী ও মূর্তিপূজকে জগৎ পরিপূর্ণ ছিল। মূর্তি পূজকরা কাষ্ঠ, পাথর, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি দ্বারা দেব-দেবীর আকার আকৃতি বানাত এবং সেগুলো পূজা করত। এগুলোই ছিল তাদের খোদা। তাদের খোদাগণের দেহ ছিল এবং সেগুলোর যথারীতি বংশ মর্যাদার ধারা ছিল। কোনো দেবতা স্ত্রীহারা ছিল না, আর কোনো দেবী স্বামীহারা ছিল না, তাদের পানাহারের প্রয়োজন ছিল। তাদের পূজারীগণ তাদের জন্য এগুলো ব্যবস্থা করে দিত। তখন মুশরিকদের অনেকেই বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ তা'আলারও মানবাকৃতি আছে, তিনিও সে আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন।

তখনকার খ্রিস্টানরা এক খোদাকে বিশ্বাস করত, কিন্তু সে খোদার একজন পুত্র তো অবশ্যই থাকতে হতো, আর সে পুত্রের মাতাও থাকতে হতো এবং শ্বশুর শাশুড়িও ছিল।

অনুরূপভাবে ইহুদিগণেরও এক খোদা এবং তার পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি থাকতে হতো। মোটকথা, সে খোদা মানবীয় গুণাবলির উর্ধ্বে ছিল না এবং তাদের সে খোদা ভ্রমণ করত, মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করত। কখনো বা যে কোনো সৃষ্টির সাথে লড়াই কুস্তি করত। এ সব অবস্থার বাইরে ছিল অগ্নিপূজক, তারকাপূজক অর্থাৎ মাজূসী, সাবী।

আর ইহুদিগণ হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলত এবং নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র ও মরিয়ম (আ.) -কে আল্লাহর স্ত্রী বলত।

তাদের এ সকল অশ্লীল ধারণা উৎখাত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একত্ববাদের পরিচয় দান করেন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে একথা ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য বলেন যে, আল্লাহ এক, তিনি কোনো মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের সাথে অতুলনীয় অসাম স্যশীল এবং নিরাকার। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোনো সন্তান নেই, আর এরূপ ধারণা করা অশোভনীয়। তিনি স্বনির্ভর [illegible] নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন। তিনিই সকলের চেয়ে অতুলনীয়তাবে মহান। অশেষ ক্ষমতাবান। তাঁর সমতুলা কেউ [illegible] নেই। তাই সকলেই তাঁর একত্ববাদের উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।

সূরাটির ফজিলত : এ সূরাটির ফজিলত অনেক–

১. এ সূরাটি যদি কেউ একবার শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করে, তবে ১০ পারা কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যাবে : যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাতে (অর্থাৎ শোবার সময়) এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে পারবে? সাহাবীগণ আরজ করলেন, এটা কেমন করে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ কুলহুওয়াল্লাহ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম আহমদ (র.) হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরাহ শুনাচ্ছি, যা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন সব কিতাবেই নাজিল হয়েছে এবং বলেন, রাতে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ . قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ না পড়ে শুবে না। হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন, আমি তখন থেকে আর এ সূরাগুলো পড়া ব্যতীত শুই না। –[ইবনে কাছীর]

২. কোনো একজন সাহাবী আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সূরা কুলহুওয়াল্লাহটি পড়তে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার এ ভালোবাসাই তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। –(তিরমিযী) ইবনে কাছীর ইমাম আহমদ ও হযরত আনাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরাহ প্রতিদিন একশতবার পাঠ করবে, তবে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অবশ্য ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবে না। –[তিরমিযী ও দারেমী]

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিদ্রাগমনের শয্যায় ডান হয়ে ১০০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তাকে তার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিবেন। –[তিরমিযী]

৫. হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পড়তে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়েছে! তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওয়াজিব হয়েছে? হুযূর ﷺ বলেন, জান্নাত।
–[ইবনে কাছীর, তিরমিযী, নাসায়ী]

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, যে ব্যক্তি দশবার এ সূরা তেলাওয়াত করবে তার জন্য বেহেশতে একটি মহল এবং যে ব্যক্তি বিশবার পড়বে তার জন্য দু'টি, আর ত্রিশবার পড়লে তিনটি মহল তৈরি হবে। –[দারেমী]

৭. প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় খাঁটি মনে অন্তত একবার করে তেলাওয়াত করলে ঈমানের দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাবে এবং শিরক থেকে রক্ষা পাবে।

৮. খাঁটি মনে দুই শতবার করে তেলাওয়াত করলে একশত বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৯. তিনবার পাঠ করলে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যায়।

১০. এক হাজার বার পড়ে দোয়া করলে যে কোনো সৎ মনোবাসনা পূর্ণ হবে এবং বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

১১. কবরস্থানে গিয়ে পড়লে মুর্দাদের কবর আজাব মাফ হয়। যে কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পড়ে দম করলে সে আরোগ্য হয়।

১২. হযরত আনাস (রা.) বলেন, জনৈক আনসার ব্যক্তি কোবা মসজিদে নামাজ পড়ালেন। প্রত্যেক রাকাতে প্রথমে [ফাতিহার পর] সূরা ইখলাস পড়া তার নিয়ম ছিল। পরে অপর কোনো সূরা পাঠ করতেন। লোকেরা তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল– তুমি এটা কি করছ, قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পাঠের পর তাকে যথেষ্ট মনে না করে তার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করছ, এটা ঠিক নয়। হয় এ সূরাটি পড়ো অথবা তাকে বাদ দিয়ে অন্য সূরা পড়ো। তখন সে বলল, আমি তা ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা চাইলে নামাজ পড়াবো, না হয় ইমামতি ছেড়ে দিবো; কিন্তু লোকগণ তার পরবর্তী অন্য কাউকে ইমাম বানাতে পছন্দ করল না। শেষ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর সমীপে ব্যাপারটি পেশ হলো। তিনি সে লোককে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমার সাথীগণ যা চায়, তা মানতে তুমি অপারগ কেন? তখন সে বলল– আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– এ সূরার প্রতি তোমার অগাধ ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতী বানাবে। –[বুখারী]

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ফজিলতের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে।

তা'বীর : বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওহীদের প্রতি ঈমান নসীব করবেন। তার পরিবারবর্গের সংখ্যা কম হবে। সে অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করবে এবং তার দোয়া কবুল করা হবে।
–[নূরুল কোরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ فَنَزَلَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَاللّٰهُ خَبَرُ هُوَ وَ أَحَدٌ بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ خَبَرٌ ثَانٍ.

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। বলো, তিনিই একক আল্লাহ এখানে اَللّٰهُ শব্দটি هُوَ-এর خَبَرٌ আর اَحَدٌ শব্দটি اَللّٰهُ হতে بَدَلٌ কিংবা هُوَ-এর خَبَرٌ ثَانِيْ।

٢. اَللّٰهُ الصَّمَدُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيِ الْمَقْصُوْدُ فِي الْحَوَائِجِ عَلَى الدَّوَامِ.

২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী তা مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ অর্থাৎ সকল প্রয়োজনে সর্বদা তিনিই লক্ষ্য।

٣. لَمْ يَلِدْ لِانْتِفَاءِ مُجَانَسَةٍ وَلَمْ يُوْلَدْ لِانْتِفَاءِ الْحُدُوْثِ عَنْهُ.

৩. তিনি কাউকেও জন্ম দেননি যেহেতু কেউই তাঁর সমশ্রেণির নয়। এবং তিনি কারো দ্বারা জাত নন আল্লাহ নশ্বর না হওয়ার কারণে।

٤. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَيْ مُكَافِيًا وَمُمَاثِلًا فَلَهُ مُتَعَلِّقٌ بِكُفُوًا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَحَطُّ الْقَصْدِ بِالنَّفْيِ وَأُخِّرَ أَحَدٌ وَهُوَ اِسْمُ يَكُنْ عَنْ خَبَرِهَا رِعَايَةً لِلْفَاصِلَةِ.

৪. আর কেউই তাঁর সমতুল্য নেই অর্থাৎ কেউ তাঁর সমকক্ষ ও সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়। لَهُ-এর সম্পর্ক كُفُوًا-এর সাথে আর نَفِيْ দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে তাকে مُقَدَّمٌ করা হয়েছে। আর يَكُنْ-এর اِسْمٌ অর্থাৎ اَحَدٌ-কে তার خَبَرٌ-এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে– আয়াতের ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ : এখানে هُوَ মুবতাদা اَللّٰهُ শব্দটি প্রথম খবর, আর اَحَدٌ শব্দটি দ্বিতীয় খবর বা বদল, আর اَللّٰهُ الصَّمَدُ টি مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ।

لَمْ يَلِدْ টি فِعْلٌ ও فَاعِلٌ আর এর مَفْعُوْلٌ হলো উহ্য।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এখানে اَحَدٌ টি لَمْ يَكُنْ-এর فَاعِلٌ এবং كُفُوًا হলো مَفْعُوْلٌ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পিছনে সূরা আদ্ব-দুহাসহ বিভিন্ন সূরায় মু'মিনদের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো তাওহীদ। বর্তমান সূরাতে সে তাওহীদের আলোচনা রয়েছে।

শানে নুযূল : এ সূরা নাজিলের উপলক্ষ সম্পর্কে হাদীসে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে মাত্র চারটি ঘটনা উল্লেখ করছি–

১. উবাই ইবনে কা'ব বলেন, মক্কার মুশরিকগণ নবী করীম ﷺ-এর নিকট বলল, তুমি আমাদেরকে যে প্রতিপালকের ইবাদত করতে বল, তার পরিচয় দানে বংশ তালিকাটি কি তা আমাদেরকে শুনাও। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজ পরিচয় দানে সূরাটি অবতীর্ণ করেন। –[তিরমিযী, হাকেম, লোবাব, কাছীর]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদল ইহুদি নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল, যাদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ ও হুয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তারা বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার যে প্রতিপালক তোমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছে, তাঁর গুণাবলি ও পরিচয় কি তা আমাদেরকে শুনাও। হয়তো আমরা তোমার প্রতি ঈমানও আনতে পারি। তখন আল্লাহ নিজ পরিচয় বর্ণনায় এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন– (লোবাব, খাযেন, ইবনে কাছীর) তাঁর মতে এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা ইহুদিরা মদীনায় ছিল। –[লোবাব]

৩. হযরত আনাস (রা.) বলেন, খায়বরের ইহুদিগণ মহানবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা, আদমকে মথিত মাটি দ্বারা, ইবলীসকে আগুন দ্বারা, আকাশকে ধূম্র দ্বারা, ভূমিকে পানির ফেনা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু তোমার প্রতিপালক কিসের সৃষ্টি তা আমাদেরকে জানাও। নবী করীম ﷺ নিশ্চুপ থাকলেন। ইতোমধ্যে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এ সূরা নিয়ে অবতীর্ণ হন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে এ সূরা পাঠ করে শুনান।
–[লোবাব, ইবনে কাছীর]

৪. হযরত আতা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, নাজরান থেকে একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে বলল যে, আপনি আপনার প্রতিপালকের বর্ণনা দিন। তিনি কি মূল্যবান জাফরান বা ইয়াকুত পাথরের নাকি স্বর্ণ বা রৌপ্যের? তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আমার প্রতিপালক কোনো বস্তুর সৃষ্টি নন; বরং তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। তখন উক্ত সূরাটি নাজিল হয়। –[নূরুল কোরআন]

মোটকথা,অনেকগুলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু যখন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় জানতে চাচ্ছে, তখনই আল্লাহর পক্ষ হতে এ সূরা পাঠ করে শুনানোর নির্দেশ হয়েছে। তাই নবী করীম ﷺ ও তাদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছেন। এ জন্যই সাহাবীগণ সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে তা নাজিলের উপলক্ষ বলে থাকেন।

اَللّٰهُ اَحَدٌ -এর অর্থ : কাফেরদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি বলো, আমার প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি একক, আল্লাহ সম্পর্কে সেকালের আরব সমাজের লোক পরিচিত ছিল। তারা সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করত। সূরা আল-ফীলে আমরা আলাচনা করেছি। যে, আবরাহার আক্রমণ হতে আল্লাহর ঘরকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র তাঁরই নিকট প্রার্থনা করেছিল। ইহুদি-খ্রিস্টানগণও আল্লাহ সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখত। সেকালে আরব সামাজে আল্লাহ সম্পর্কে কি ধরনের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তা বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায় যে, তাঁদের আল্লাহ ও কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আল্লাহর মধ্যে তফাৎ কি? খ্রিস্টানগণ আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা রাখত যে, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পুত্র এবং মরিয়ম তার স্ত্রী। এ বিশ্বাস রাখার ফলে আল্লাহ সম্পর্কে অনিবার্যরূপে যে ধারণাগুলো জন্ম নেয়, তা হলো আল্লাহর আকার ও দেহ রয়েছে। তার সত্তায় মানুষ অংশীদার, মানুষের ন্যায় তারও যৌন ক্ষুধা আছে। মানুষের ন্যায় তিনি বস্তু, বস্তুর মুখাপেক্ষী এবং তিনি পানাহার করে থাকেন (না'উযু বিল্লাহ)। অপরদিকে ইহুদিদের আকীদাও এরূপ ছিল। তারা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলত। আল্লাহর সাথে মানুষের সাথে কুস্তি-লড়াইর আকীদায়ও তারা বিশ্বাসী ছিল। তা ছাড়া আরবের পৌত্তলিকগণ আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় অংশী সাব্যস্ত করত। কা'বা ঘরের ৩৬০টি প্রতিমাই তার সাক্ষী। অন্যদিকে একদল লোক গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। একদল ছিল অগ্নি উপাসক। যদিও অগ্নি উপাসকদের কোনো অস্তিত্ব আরবে ছিল না। তাই আল্লাহ তাদের প্রশ্নের জবাবে তাদের নিকট পরিচিত নামটিই উল্লেখ করে এমন একটি গুণ সংযোজন করে দিলেন, যাতে তাদের সমস্ত ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের

মূলে কুঠারাঘাত হানে এবং সেগুলো মূলোৎপাটিত হয়– তা হলো 'আহাদ'। এটার অর্থ এক নয়। কেননা, এক হলে দুই তিন ইত্যাদি সংখ্যা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আরবি এক وَاحِدٌ-কে বলা হয়। এখানে اَحَدٌ-এর অর্থ হলো– একক, অনন্য। অর্থাৎ তিনি স্বীয় সত্তায়, গুণে, ক্ষমতা এবং কর্মকুশলতায়, বুদ্ধি-জ্ঞানে একক ও অনন্য। এতে কেউ তাঁর শরিক নেই। তাঁর স্ত্রী-পুত্র নেই, পানাহার করেন না, কারো সাথে কুস্তি লড়েন না।

وَاحِدٌ ও اَحَدٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : اَحَدٌ এবং وَاحِدٌ-এর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য বিদ্যমান–

১. وَاحِدٌ-কে আহাদের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু اَحَدٌ-কে وَاحِدٌ-এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

২. যদি কেউ বলে فُلَانٌ لَايُقَاوِمُهٗ وَاحِدٌ অর্থাৎ একজন অমুকের প্রতিযোগিতা করতে পারে না। তার জন্য এ কথা বলা বৈধ হবে যে, لٰكِنَّهٗ يُقَاوِمُهٗ اِثْنَانِ অর্থাৎ কিন্তু দু'জনে পারে। কিন্তু اَحَدٌ-এর ব্যাপারে এরূপ বলা জায়েজ হবে না। যদি বলা হয় فُلَانٌ لَايُقَاوِمُهٗ اَحَدٌ لٰكِنَّهٗ يُقَاوِمُهٗ اِثْنَانِ তাহলে বলা বৈধ নয়।

৩. وَاحِدٌ শব্দটি হ্যাঁ-বোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়, আর اَحَدٌ শব্দটি না-বোধক نَفِىْ বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলবে– رَأَيْتُ رَجُلًا وَاحِدًا . مَا رَأَيْتُ اَحَدًا . اَحَدٌ শব্দটি عُمُوْم-এর ফায়দা দেয়। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

اَلصَّمَدُ-এর অর্থ : اَلصَّمَدُ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ অনেক মতামত উল্লেখ করেছেন। আমরা তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো নির্ভীক, যার কোনো ভয় নেই।
২. ইমাম শা'বী (র.) বলেন, সামাদ হলেন যিনি পানাহার করেন না।
৩. আবুল ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামা (রা.) বলেছেন, সামাদ হলেন তিনি, যার কর্তৃত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।
৪. ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, যিনি তার সকল গুণাবলি এবং কর্মে পরিপূর্ণ নিখুঁত– তিনি সামাদ।
৫. কারো মতে, সকল প্রয়োজনের সময় যার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়, তিনিই সামাদ।
৬. কারো মতে, সর্বাবস্থায় যাঁর নিকট চাওয়া হয় তিনিই হলেন সামাদ।
৭. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হওয়ার পর যিনি থাকবেন তিনি হলেন সামাদ।
৮. ইকরামা (র.) বলেছেন, যার উপর কারো কোনো মর্যাদা নেই তিনিই হলেন সামাদ।
৯. ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, সামাদ হলেন তিনি, যাঁর উপর কখনো কোনো বিপদাপদ আসে না।
১০. হযরত ইবনে হান্নান ও মোকাতেল (র.) বলেছেন, সামাদ হলেন তিনি, যিনি সম্পূর্ণ দোষত্রুটি মুক্ত।
১১. আল্লামা আলূসী (র.) صَمَدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন–

هُوَ الْمُسْتَغْنِىْ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ اَلْمُحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلُّ اَحَدٍ .

অর্থাৎ সামাদ সেই পবিত্র সত্তা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ প্রত্যেকেই তাঁর মুখাপেক্ষী। –[নূরুল কোরআন].

اَحَدٌ-কে নাকেরা এবং اَلصَّمَدُ-কে মা'রেফা নেওয়ার কারণ : اَحَدٌ এবং اَلصَّمَدُ উভয়টি এখানে আল্লাহর সিফাত, একটিকে نَكِرَةٌ বা (অনির্দিষ্ট), অন্যটিকে مَعْرِفَةٌ [নির্দিষ্ট] ব্যবহার করার কারণ হলো– আল্লাহর اَحَدِيَّةٌ বা এককত্ব অধিকাংশ আরবদের কাছে অপরিচিত এবং অজানা ছিল, এ কারণে অনির্দিষ্ট নেওয়া হয়েছে। আর صَمَدٌ বা অমুখাপেক্ষীতা সম্পর্কে সমস্ত মানুষেরই অবগতি রয়েছে, এ কারণেই নির্দিষ্ট শব্দ নেওয়া হয়েছে। –[কাবীর]

اَللّٰهُ শব্দকে দ্বিরুক্তিকরণের উপকারিতা : اَللّٰهُ اَحَدٌ এবং اَللّٰهُ الصَّمَدُ বাক্যদ্বয়ে اَللّٰهُ শব্দকে বারবার নেওয়া হয়েছে। কেননা যদি পরের اَللّٰهُ শব্দকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বাক্য এরূপ দাঁড়ায়– اَللّٰهُ اَحَدٌ اَلصَّمَدُ এরূপ বলা আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা একই শব্দের (اَللّٰهُ) দু'টি وَصْفٌ-এর একটি নাকেরা অন্যটি মারেফা হওয়া বৈধ নয়। বৈধ করার জন্যই পরে اَللّٰهُ যুক্ত করা হয়েছে। নচেৎ উভয় وَصْفٌ-কে نَكِرَةٌ (নাকেরা) অথবা مَعْرِفَةٌ (মা'রেফা) নেওয়া জরুরি হয়ে পড়বে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ" : অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন– হে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়! তোমরা আমার সম্পর্কে একটি মনগড়া মৌলিক বিশ্বাস রচনা করে রেখেছ যে, হযরত ঈসা (আ.) ও ওযায়ের (আ.) আমার পুত্র। তোমরা পরিষ্কার জেনে রেখো, আমি কাউকেও জন্মদান করিনি। তারা আমার পুত্র নয়। জন্ম দেওয়া আমার বৈশিষ্ট্য নয়। আমার কোনো দেহ ও আকার নেই– দেহ ও আকৃতির অনিবার্য দাবিগুলো হতে আমি মুক্ত ও পবিত্র। আমি কাউকেও পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করিনি। তার লয় নেই, ক্ষয় নেই। আমি চিরন্তন নিরাকার সত্তা। সুতরাং আমার বংশ রক্ষারও কোনো প্রয়োজন করে না। তোমরা বল ফেরেশতা আমার কন্যা, তাও তোমাদের ভুল ধারণা। মানুষ, ফেরেশতা, জিন এক কথায় সৃষ্টিলোকের সমস্ত সৃষ্টিই আমার বান্দা। আর তোমাদের মধ্যে যারা মনে করে যে, আমার পিতা-মাতা রয়েছে, তারাও আমার প্রতি এ ধারণা পোষণ করে জুলুম করে। আমি কোনো সত্তার দ্বারা জন্মগ্রহণ করিনি। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। আমার কোনো বংশ তালিকা নেই। যেমন, আরবের মুশরিকগণ দেবতার বংশাবলি নির্ণয় করে থাকে। আর যারা মনে করে যে, আমি যুগে যুগে মানুষের কাছে পূজা-অর্চনা পাওয়ার জন্য দেবতার আকারে আবির্ভূত হই, তাও আমার সম্পর্কে তাদের মারাত্মক ভুল ধারণা। আমার কোনোরূপ আবির্ভাব প্রতিভাব হয় না। আমার সত্তা এভাবে একই অবস্থায় সর্বত্র বিরাজমান।

لَمْ يَلِدْ-কে আগে আনার কারণ : দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে মানুষ নিজে জন্মগ্রহণ করে, তারপর বড় হয়ে জন্ম দেয়; কিন্তু আয়াতে প্রথমে জন্ম দেওয়ার ক্রিয়া তারপর জন্মগ্রহণ করার ক্রিয়াটি উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, আরবের পৌত্তলিকেরা আল্লাহর ব্যাপারে বলত যে, তিনি জন্ম দিয়েছেন, তাঁর ছেলে-মেয়ে আছে। এ আকীদাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রথমেই বলা হয়েছে– তিনি জন্ম দেননি। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ : অর্থাৎ তাঁর مُمَاثِلٌ বা সমকক্ষ কেউই নেই এবং কেউই তাঁর অনুরূপ নয়। আকৃতি প্রকৃতিতেও অন্য যে কোনো অবস্থাতেই কেউই তাঁর সমান নয়। যেহেতু তিনি এমন। সুতরাং তিনি সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা আর তিনি عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–কেননা, خَالِقٌ হতে মাখলুকদের সকল বিষয়েই শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক। এতে এ কথাও ইশারা পাওয়া যায় যে, তিনি سَمِيْعٌ - بَصِيْرٌ - مُرِيْدٌ ও مُتَكَلِّمٌ শ্রবণকারী, দৃষ্টিকারী, ইচ্ছা পোষণকারী ও বক্তব্য পেশকারী। কারণ, যদি এ সকল গুণাবলিতে গুণান্বিত না হতেন তবে এর বিপরীত গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক হতো, তখন তিনি حَادِثٌ হওয়া বাঞ্ছনীয় হতো। তাই তা বাতিল ধারণা। অতএব, আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরায় তার শেষ পরিচিতিতে এ কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তার ক্ষেত্রে জগৎবাসী যে সকল বিবেচনা করেছিল যে, তিনি মানব মর্যাদায় গুণান্বিত, তার ঊর্ধ্বে নয়, এ সকল ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। আর মানবীয় নয়; বরং সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে ক্ষমতাবান, সকল গুণে কুদরতীভাবে গুণান্বিত। কোনো গুণেই তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। তিনি কেমন, এ বিষয়ে মানবীয় জ্ঞান স্থির করতে সক্ষম হবে না যে, তিনি এমন। বরং সর্বশেষ তিনি যেমন আছেন তেমন, আমরাও তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করি।

সূরাটির ইখলাসের অন্যান্য নামসমূহ : সূরাটির গুরুত্ব সমধিক, আর এ কারণে এর নামও একাধিক, যা নিম্নরূপ–

১. সূরাতুত তাফরীদ, ২. সূরাতুত তাজরীদ, ৩. সূরাতুত তাওহীদ, ৪. সূরাতুল ইখলাস, ৫. সূরাতুন নাজাত ৬. সূরাতুল বেলায়েত, ৭. সূরাতুন নিসবত, ৮. সূরাতুল মা'রিফাত, ৯. সূরাতুল জামাল, ১০. সূরাতুল মোকাশকাশা, ১১. সূরাতুল মোয়াওওয়াজা, ১২. সূরাতুস সামাদ, ১৩. সূরাতুল আছাছ, ১৪. সূরাতুল মানেআ, ১৫. সূরাতুল মাহদর, ১৬. সূরাতুল মুনাফ্যিরাহ, ১৭. সূরাতুল বারাআত, ১৮. সূরাতুল মুযাক্কিরা, ১৯. সূরাতুন নূর, ২০. সূরাতুল আমান।

প্রত্যেকটি নামই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। ইমাম রাযী (র.) এ নামসমূহের তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা এ সূরার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সহজেই আঁচ করা যায়। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ : সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরা আল-ফালাক্বের নামটি গ্রহণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের اَلْفَلَقُ শব্দ হতে। اَلْفَلَقُ শব্দের অর্থ হচ্ছে– বিদীর্ণ হওয়া। তা দ্বারা রাতের আঁধার ভেদ করে উষার উদয় হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। আর সূরা আন-নাস -এর নামকরণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের 'আন-নাস' শব্দ দ্বারা। এর অর্থ হলো মানবকুল। কতিপয় তাফসীরকার এ সূরা দু'টিকে سُوْرَةُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ নাম রেখেছেন। এ সূরা দু'টি পাঠ করে আল্লাহর নিকট সর্বপ্রকার অনিষ্টতা হতে পানাহ চাওয়া হয়।

সূরা আল-ফালাক্বে রয়েছে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৬৯টি অক্ষর।

আর সূরা আন-নাসে রয়েছে ৬টি আয়াত, ২০টি বাক্য এবং ৭৯টি অক্ষর।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়কাল নির্ধারণে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এক দলের অভিমত হলো, এটা মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়। হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবির ইবনে যায়েদ (রা.) এ মতের সমর্থক। তাঁদের মতে, যখন মহানবী ﷺ চতুর্দিক দিয়ে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হন এবং বৈরীদল তাঁর জীবন, প্রদীপ নিভিয়ে ফেলার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন তা অবতীর্ণ হয়। সূরা আল-ফালাক্বের 'রাতের অন্ধকারে অনিষ্টতা' কথাটি এ দিকেরই ইঙ্গিত বহন করে বলে অনুমিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর ও কাতাদাহ (রা.)-এর মতে, সূরা দু'টি মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত। মদীনাবাসী ইহুদি লাবীদ ইবনে আসেম জাদুমন্ত্র দ্বারা মহানবী ﷺ -এর জীবন নাশের হীন ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয় এবং জাদুর প্রভাব মহানবী ﷺ -এর পবিত্র বদনমণ্ডলের উপর নিপতিত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে মদীনাতে অবস্থানকালে উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হয়। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর সূত্রে বলেছেন– মহানবী ﷺ -এর জাদুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ৭ম হিজরি সনের। এ সূত্র ধরে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) সূরা দু'টিকে মাদানী বলে মনে করেন। তবে সূরা দু'টি স্পষ্টত মক্কায় অবতীর্ণ বলে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা জোরালো বলে মনে হয়। পরে মদীনাতে মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র যখন প্রবল হয়ে উঠে, তখন তা পাঠ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হন নবী করীম ﷺ। সুতরাং শুধুমাত্র জাদু সংক্রান্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া সমীচীন নয়।

সূরা দু'টির বিষয়বস্তু : নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সমগ্র পৃথিবী, বিশেষ করে আরবের সমাজ ব্যবস্থা বাতিল শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। মানবিকতার সম্মানজনক অবস্থান থেকে মানবজাতি পাশবিকতার নিম্নস্তরে উপনীত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে তারা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহর আসনে সমাসীন করেছিল নানা প্রকৃতির মূর্তি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি কল্পিত দেবতাদের। পুরোহিত শ্রেণি নানা ভেলকীবাজির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি লাভ করত। এক কথায় সমাজে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। এমনি নৈরাজ্যকর পরিবেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থি আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অশান্তি ও পরিবারিক উৎপীড়ন দ্বারাও যখন তাঁর বৈপ্লবিক প্রচারণাকে স্তব্ধ করা গেল না, তখন দুনিয়ার কোল থেকে চিরতরে অপসারিত করে দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হতে আল্লাহদ্রোহী শক্তি কার্পণ্য করেনি। এ সংকটজনক পরিস্থিতিতে মহানবী ﷺ আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক ও ভয়-ভীতিতে তথা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ও তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে– হে নবী! আপনি বলুন, উষা উদয়ের পরিচালক সর্বশক্তিমান সত্তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, সৃষ্টিকুলের সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে; গাঢ় তমসার রজনীর অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে– যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়.......।

সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মহানবী ﷺ প্রত্যহ এ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। মুসলিম জননী আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– 'রাসূলে কারীম ﷺ রাত্রিকালে বিছানায় শয়নকালে দু'হাত একত্রিত করে সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে সর্বাঙ্গে ফুঁক দিতেন। হাতদ্বয় দ্বারা মোছার কাজটি মাথা হতে আরম্ভ করতেন এবং দেহের সম্মুখভাগ তিনবার মুছে ফেলতেন।'

এ সূরাদ্বয়ের আলোকে ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান রয়েছে বলে অনুমিত হয়। অবশ্য ঝাড়-ফুঁকের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও তা সঠিকভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে অলাভজনক। কেননা বিভিন্ন সূত্রের অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে, 'যে লোক দাগানোর চিকিৎসা করাল এবং ঝাড়-ফুঁক করাল সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।' –[তিরমিযী]

পরিশেষে বলা যায় যে, সৃষ্টিকুলের অনিষ্টকারিতা থেকে অব্যাহতি লাভ, আত্মরক্ষা ও একমাত্র আল্লাহকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান বলে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ঝাড়-ফুঁককেই কেবল আরোগ্য লাভের মাধ্যম কল্পনা করা ইত্যাদি হচ্ছে আলোচ্য সূরাদ্বয়ের বিষয়বস্তু ও মূলকথা।

এ সূরা দুটি কুরআনের অংশ : শুধু হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উক্ত সূরাদ্বয়কে কুরআনের সূরা হিসাবে মানতেন না। তাঁর নিকট রক্ষিত 'মাসহাফ' হতে তিনি নাকি এ সূরাদ্বয়কে মুছে ফেলেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন– 'কুরআনের অংশ নয় এমন সব জিনিস কুরআনের সাথে মিশাইও না। এ সূরাদ্বয় কুরআনে শামিল নয়। এটা তো নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি হুকুম মাত্র। তা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাত্র।'

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্ত অভিমতের জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন–

১. তিনি তাঁর মাসহাফে সূরাদ্বয় শুধু উল্লেখ করেননি।

২. নবী করীম ﷺ যে, এ সূরাদ্বয়কে কুরআনে শামিল করার অনুমতি দিয়েছেন, সে কথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) জানতে পারেননি।

৩. এটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত অভিমত। এ মত অন্য কারো নয়। অন্য কোনো সাহাবীও তাঁর এ মতকে সমর্থন করেননি।

৪. হযরত ওসমান (রা.) সমস্ত সাহাবীর সম্পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের যে অনুলিপি তৈরি করিয়েছেন, তাতে উক্ত সূরাদ্বয় শামিল ছিল।

৫. নবী করীম ﷺ উক্ত সূরাদ্বয় নামাজে পড়েছিলেন বলে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম কর্তৃক একদা জাদু করা হয়েছিল। এর প্রভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ বিষয়টি হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হুযূর ﷺ -কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর জাদু যে বস্তুর মাধ্যমে করা হয়েছিল তা ছিল হুযূর ﷺ-এর চিরুনির একটি টুকরা এবং মাথা মুবারকের এক গাছি চুল সংযোজনে বনূ জুরাইজের যী আরওয়ান নামক একটি কূপের তলায় পাথর চাপা দিয়ে পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে রাখা হয়েছিল।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ ﷺ লোক পাঠিয়ে ঐ সকল জাদুর বস্তুগুলো নিয়ে আসলেন এবং সূরা আন-নাস ও আল-ফালাকের এক একটি আয়াত পড়লেন এবং একটি গিরাহ খুলে ফেললেন, অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, হুযূর ﷺ -এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম জাদু করল, তাতে হুযূর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর নিকট বললেন যে, হে আয়েশা! আমার অসুস্থতা কি তা আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করিয়ে দিয়েছেন? অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি, আমার নিকট দু'জন লোক মানুষের আকৃতিতে (ফেরেশতা) এসেছেন। একজন আমার শিহরে বসল, অপরজন পায়ের দিকে বসল। মাথার দিকের ব্যক্তি পায়ের দিকস্থ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল যে, এ মহামানবের অসুস্থতা কি? অপরজন বললেন, তাঁকে জাদু করা হয়েছে। আবার প্রশ্ন করলেন, কে তাঁকে জাদু করেছে? বললেন, লবীদ ইবনে আসম যে ইহুদিদের সাহায্যকারী মুনাফিক ছিল। প্রশ্ন করলেন কিসের মধ্যে করা হয়েছে? বললেন, একটি চিরুনি ও দাঁতের মধ্যে। অতঃপর প্রশ্ন করলেন তা কোথায় রাখা হয়েছে? বললেন, তা খেজুরের ঐ গেলাপে রাখা হয়েছে যাতে খেজুর হয়। আর তা بئر ذوران -এর তলায় একটি পাথরের নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। হুযূর ﷺ স্বয়ং সে কূপে গমন করে তা বের করে আনলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তা প্রকাশ করেননি যে, অমুক ইহুদি এ বেয়াদবি করেছে? হুযূর ﷺ বললেন, আমাকে আল্লাহ শেফা দান করেছেন, আর কারো কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ নয়।

ইমাম ছা'লাবী (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, হুযূর ﷺ -এর খিদমতে একটি ছেলে ছিল, এক ইহুদি তাকে ফুসলিয়ে তার মাধ্যমে হুযূর ﷺ -এর দাঁত মোবারক ও চিরুনি মুবারক অর্জন করে এবং একটি দাঁতের সুতায় ১১টি গিরা সংযোগ করে জাদু করল। প্রত্যেকটি গিরায় একটি সুঁই লাগাল এবং চিরুনির সাথে এগুলো সংযোগ করে একত্রে খেজুর ফলের গেলাপে পাথরের চাপা দিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা سُوْرَةُ مُعَوِّذَتَيْن নাজিল করেছেন এবং এতে ১১টি আয়াত রয়েছে। এক এক আয়াত পড়ে হুযূর ﷺ এক একটি গিরা খুললেন এবং সুস্থতা অর্জন করেন।

জাদুর বাস্তবতা : জাদুর বাস্তবতার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়– কারো মতে, এর কোনো ভিত্তি নেই। এটা নিছক কুসংস্কার মাত্র। আবার কারো মতে, এর বাস্তবতা রয়েছে।

প্রথম দলের মতে– জাদুর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কাজেই তাকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ার এমন বহু জিনিস আছে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যাবেক্ষণেই শুধু আসে; কিন্তু তা কিভাবে সংঘটিত হয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোনো কথা নেই। জাদু মূলত একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। তা মন হতে সংক্রমিত হয়ে দেহকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন দৈহিক প্রভাব সংক্রমিত হয়ে মনকে প্রভাবিত করে। ভয় একটা মনস্তাত্ত্বিক জিনিস; কিন্তু তা দেহে সংক্রমিত হয়ে দেহে লোমহর্ষণ ঘটে। সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করে। জাদুর দ্বারা আসল ব্যাপারে পরিবির্তন ঘটে না বটে, কিন্তু তার কারণে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হয়। তখন আসল ব্যাপারই পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে অনুভূত হয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বন্দুকের গুলী ও বিমান হতে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো জাদুর কার্যকারিতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অসম্ভব; কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে যা মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিছক হঠকারিতা বৈ কিছুই নয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট প্রমাণ আছে। যেমন– ফিরআউনের যুগে যখন হযরত মূসা (আ.)-কে পাঠানো হয়েছিল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তারা জাদুকরদেরকে জমায়েত করেছে বলে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিয়েছেন–

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ـ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ ـ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ ..... الخ (اَيْضًا) سَحَرُوْآ اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاؤُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ـ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ـ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

উভয় সূরার ফজিলত : হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাকে নবী করীম ﷺ আদেশ দিয়েছেন আমি যেন প্রত্যেক নামাজের পর সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস পাঠ করি। –[তিরমিযী]

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক্ব এবং সূরা আন-নাস তিনবার করে পাঠ করবে, তাহলে সব বিষয়ে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। –[তিরমিযী]

* হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ জিন ও ইনসানের দৃষ্টির ক্ষতি হতে পানাহ চেয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। যখন সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস নাজিল হয়। তখন তিনি এই দু'টি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন, আর অন্যান্য দোয়া পাঠ হতে বিরত থাকলেন।

* হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানায় বিশ্রাম করার সময় সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর হাত দ্বারা চেহারা মোবারক এবং শরীরে যেখানে হাত যায় সেখানে মাসাহ করতেন। আমি যদি কষ্ট অনুভব করতাম, তবে আমাকে এ আমল করার আদেশ প্রদান করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

* হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কষ্ট অনুভব করতেন তখন তিনি সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে দম করতেন। যখন তাঁর ব্যথা বেড়ে যেত তখন আমি নিজেই এই সূরাদ্বয় পাঠ করতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে মাসেহ করিয়ে নিতাম।

হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, যে রোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়, সে সময় ও তিনি সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন অসুস্থতা বেড়ে গেল তখন আমি ফুঁক দিতাম এবং তাঁর চেহারা মোবারক মুছে দিতাম। –[নূরুল কোরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

نَزَلَتْ هٰذِهٖ وَالَّتِىْ بَعْدَهَا لَمَّا سَحَرَ لَبِيْدُ الْيَهُوْدِىُّ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ وِتْرٍ بِهٖ اِحْدٰى عَشَرَةَ عُقْدَةً فَاَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ وَبِمَحَلِّهٖ فَاُحْضِرَ بَيْنَ يَدَيْهِ ﷺ وَاُمِرَ بِالتَّعَوُّذِ بِالسُّوْرَتَيْنِ فَكَانَ كُلَّمَا قَرَأَ اٰيَةً مِنْهُمَا انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَوَجَدَ خِفَّةً حَتّٰى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا وَقَامَ كَاَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ـ

অনুবাদ :

যখন লবীদ নামক ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করে, তখন এ সূরা ও পরবর্তী সূরা অবতীর্ণ হয়। উক্ত ইহুদি একটি সুতায় এগারোটি গিরা লাগিয়ে জাদু মন্ত্র ফুঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উক্ত জাদু সম্পর্কে এবং জাদুর স্থানটি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন জাদুর জিনিসগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে হাজির করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অত্র সূরা দু'টির মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনার আদেশ করেন। তিনি যখন সূরা দু'টি হতে একটি করে আয়াত পাঠ করতেন, তৎক্ষণাৎ একটি গিরা খুলে যেতে লাগল এবং তাঁর মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসতে লাগল। সম্পূর্ণ সূরা দু'টি পাঠ করার পর সমস্ত গিরাগুলো খুলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যেন তাঁর বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে।

١. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ الصُّبْحِ ـ

১. বলো, আমি আশ্রয় নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার প্রভাতের।

٢. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ حَيَوَانٍ مُكَلَّفٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَجَمَادٍ كَالسَّمِّ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অপকারিতা হতে চাই শরিয়তের মুকাল্লাফ প্রাণী বা গায়রে মুকাল্লাফ কিংবা জড় পদার্থের অথবা বিষ ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

٣. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اَىِ اللَّيْلِ اِذَا اَظْلَمَ اَوِ الْقَمَرِ اِذَا غَابَ

৩. আর অনিষ্ট হতে রাত্রির, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় অর্থাৎ রাত্রি যখন অন্ধকার হয় কিংবা চন্দ্র যখন অস্তগমন করে।

٤. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ السَّوَاحِرِ تَنْفُثُ فِى الْعُقَدِ الَّتِىْ تَعْقِدُهَا فِى الْخَيْطِ تَنْفُخُ فِيْهَا بِشَىْءٍ تَقُوْلُهٗ مِنْ غَيْرِ رِيْقٍ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِىُّ مَعَهٗ كَبَنَاتِ لَبِيْدِ الْمَذْكُوْرِ ـ

৪. আর সে সকল নারীদের অনিষ্ট হতে যারা ফুঁক দেয় জাদুকারিণীদের ঝাড়-ফুঁক গ্রন্থিসমূহে যা সুতায় গিরা দিয়ে কিছু পড়ে থুথু ছাড়া ফুঁক দেয়। আল্লামা যামাখশারী এতদসঙ্গে এটাও বলেছেন, যেমন- উল্লিখিত লবীদ ইহুদির কন্যাগণ।

৫. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ أَظْهَرَ حَسَدَهُ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ كَلَبِيْدِ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْيَهُوْدِ الْحَاسِدِيْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذِكْرُ الثَّلَاثَةِ الشَّامِلِ لَهَا مَاخَلَقَ بَعْدَهُ لِشِدَّةِ شَرِّهَا .

৫. এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে। স্বীয় হিংসা প্রকাশ করে এবং সে মতে কাজ করতে শুরু করে। যেমন হিংসুক ইহুদিগণের মধ্য হতে উক্ত লবীদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে করেছিল। এ শেষোক্ত তিনটি বস্তু যদিও مَا خَلَقَ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি এগুলো অধিকতর অনিষ্টকর হেতু পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ : بِرَبِّ الْفَلَقِ মুতা'আল্লিক হচ্ছে اَعُوْذُ-এর সাথে। مَا অর্থ الَّذِيْ ইসমে মাওসূল, তার প্রত্যাবর্তনকারী উহ্য। مَا মাসদারিয়াও হতে পারে, তখন خَلَقَ অর্থ– মাখলূক হবে। কেউ কেউ বলেন, مَا নাকেরা, তবে এ মতটি ভ্রান্ত।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ অংশটি اِذَا وَقَبَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে, অতঃপর اَعُوْذُ-এর مَفْعُوْلْ হবে। আর পরবর্তী বাক্যদ্বয়ও একই অবস্থায় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে একত্ববাদের ঘোষণা এবং আল্লাহকেই একমাত্র সবকিছুর অধিপতি ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি মানুষ সর্ব ব্যাপারে আল্লাহরই মুখাপেক্ষী, এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। অত্র সূরায় আল্লাহর আশ্রয়ে যাওয়ার এবং তাঁরই প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার এক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

শানে নুযূল : ইমাম বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– মহানবী ﷺ কোনো এক সময় খুব কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে একজন পায়ের নিকট এবং অপরজন শিয়রের নিকট বসল। যিনি পায়ের নিকট বসা ছিলেন তিনি শিয়রের নিকট বসা ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলেন– তার কি হয়েছে? তুমি কি দেখেছ। সে বলল– তার চিকিৎসার প্রয়োজন। সে আবার বলল– কি চিকিৎসার প্রয়োজন? জবাব দিল, জাদু চিকিৎসার প্রয়োজন। আবার জিজ্ঞাসা করল– কে জাদু করেছে? তখন বলল– লবীদ ইবনে আসেম ইহুদি। জিজ্ঞাসা করা হলো– সে কোথায় জাদু করেছে? তখন বলল– অবদান গোত্রের কূপের তলদেশে একখানা প্রস্তর খণ্ডের নিম্নে গিরা দেওয়া চুল রয়েছে– তা-ই জাদু। সুতরাং কূপের পানি সেচন করে সে পাথর ও গিরা দেওয়া চুল বের করে আনতে হবে। তাই রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে পানি সেচনের লোক সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি লোকের দ্বারা তার পানি সেচন করে প্রস্তর খণ্ড ও চুল বের করে আনলেন। ঐ চুলে এগারোটি গিরা ছিল। সুতরাং এ সময় আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস-এর এগারোটি আয়াত অবতীর্ণ করে তার এক একটি আয়াত পড়ে যখন গিরায় ফুঁক দেওয়া হলো, তখন এক একটি গিরা আপনা হতে খুলে গেল। অতঃপর চুলগুলো পুড়ে ফেলা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম ﷺ আরোগ্য লাভ করেন।

মানুষ জাহিলিয়া যুগে নানা প্রকার ক্ষতি ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেব-দেবী, জিন-ভূত ইত্যাদির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত। তাদেরকে বড় শক্তিমান ভেবে তাদের নিকট বিপদ হতে মুক্তি ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করত। যেমন বর্তমান যুগেও মুশরিকগণ নানা দেব-দেবীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। যেমন, হিন্দুগণ কলেরা মহামারী হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহাকালির পূজা করে ও আবেদন জানায়। এমনভাবে বহু দেব-দেবীর কাছে তারা আত্মরক্ষার জন্য শরণাপন্ন হতো। সূরা জিনে বলা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক মানুষ জিনদের শরণাপন্ন হয় [৬ নং আয়াত]।

আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় এসব বাতিল মা'বূদ ও কল্পিত সত্তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা পরিহার করে একমাত্র তাঁরই শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

اَلْفَلَقُ -এর অর্থ : فَلَقٌ শব্দের আসল অর্থ– দীর্ণ করা, তাফসীরকারকদের অধিকাংশের মতে তার তাৎপর্য হলো– 'রাতের অন্ধকার দীর্ণ করে প্রভাত আলো ফুটে বের হওয়া'। আরবি ভাষায় فَلَقُ الصُّبْحِ অর্থাৎ প্রভাত-সূর্যের উদয় বাক্য খুব বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআনে فَالِقُ الْاِصْبَاحِ অর্থাৎ রাতের অন্ধকার দীর্ণ করে প্রভাত উদয়কারী বাক্যাংশ আল্লাহর পরিচয় স্বরূপই বলা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাখ্যাকারগণ এর অনেক ব্যাখ্যা করেছেন।

* ইবনে জারীর (র.) বলেছেন, এর অর্থ– প্রভাত। ইমাম বুখারী (র.) একে সঠিক মত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
* শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে পূর্বাকাশে যে আলো প্রত্যক্ষ করা যায় তাকেই فَلَقٌ বলে। হযরত জাবের ইবনুল হাসান, সাঈদ ইবনে জোবায়ের, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.)ও এ মত প্রকাশ করেছেন।
* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি অভিমত হলো, ফালাক্ব হলো দোজখের একটি কয়েদখানা। যখন সে কয়েদখানার দরজা খোলা হবে, তখন দোজখের অধিবাসীরাও ভীত হবে।
* হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন فَلَقٌ হলো দোজখের অভ্যন্তরে ঢাকনি দেওয়া একটি কূপ।

  অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যখন তা খোলা হবে এবং তার অভ্যন্তর থেকে যে অগ্নি বের হবে, তার তীব্রতা দেখে দোজখ নিজেই চিৎকার শুরু করবে।
* ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে জারীর (র.) হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, 'ফালাক্ব' হলো দোজখের একটি গৃহ যখন তা খোলা হবে। তখন দোজখের অধিবাসীরা তার উত্তাপের তীব্রতায় চিৎকার শুরু করবে। –[নূরুল কোরআন]

আশ্রয় প্রার্থনা : মানুষ কোথায় কার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কার রক্ষাব্যূহে স্থান নিবে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত সূরায় তা শিক্ষা দিয়েছেন। বলা হয়েছে– ঊষা উদয়ের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো– তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট হতে। এখানে فَلَقٌ শব্দটির অর্থ হলো– বিদীর্ণ হওয়া, ভেদ করে উত্থিত হওয়া। সূর্য রাতের অন্ধকার ভেদ করে উদয় হয়। সুতরাং যার দ্বারা এ উদয় ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং যে তাকে প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ করে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এখানে 'ঊষা উদয়ের প্রতিপালক' বলার তাৎপর্য হলো যে, ঊষা জগতের বুকে সর্বত্র একই সময় উদয় হয় না, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময় উদয় হয়। এমনকি এক গোলার্ধে যখন উদয় হয় অন্য গোলার্ধে তখন তার অস্তগমন হয়। তাই আল্লাহ বলেছেন– পৃথিবীর সব অঞ্চল, দেশ, স্থান ও গোলার্ধে যার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে, সে মহাশক্তিধর-যার উপর আর দ্বিতীয় কোনো শক্তি নেই, তোমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। তবেই তোমরা সর্বপ্রকার অনিষ্টের হাত হতে রক্ষা পেতে পারবে।

যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হবে : এ সূরাটিতে চার প্রকার ক্ষতি-অনিষ্টতার জন্য আশ্রয় প্রার্থনার কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অনিষ্টতা ও ক্ষতি হতে, মানুষ, জিন-পরী, ভূত-প্রেত, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী, আলো-বায়ু-পানি, মোটকথা, আল্লাহর সৃষ্টিলোকে যা কিছু আছে তার সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হও। আর কোনো মানবীয় বা অমানবীয় সত্তার শরণাপন্ন হয়ো না। কেননা সেগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি।

৩ নং আয়াতে রাতের অন্ধকারে যেসব ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন– চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, আক্রমণ, সম্ভাব্য যা কিছুই হতে পারে তা হতে রক্ষার জন্য বলা হয়েছে। আর ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কুফরি কালাম দ্বারা ছিন্ন চুলে ফুঁক দিয়ে গিরা দান করত তোমার যে অনিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা হতে রক্ষার জন্য বলা হয়েছে। عُقَدٌ শব্দটি عُقْدَةٌ-এর বহুবচন। এটা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক ও হিংসুকের হিংসা হতে আত্মরক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

হিংসা বলা হয়– এমন স্বভাব, চরিত্রকে, যে অন্যের মঙ্গলামঙ্গল, ভালাই ও ধনাঢ্যতা দেখে মনে জ্বালা অনুভব করে এবং নিজে অনুরূপ না পেলে তা ধ্বংস হওয়ার কামনা করে, কিন্তু ধ্বংস ও বিলীন হওয়ার কামনা না করে অনুরূপভাবে নিজে পাওয়ার আশা পোষণ করাকে হিংসা বলা হয় না। এহেন চরিত্র হতে মানুষের রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন; কিন্তু আল্লাহর প্রতি যাদের অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা বিদ্যমান তাদের পক্ষে কোনোই কষ্টকর ব্যাপার নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি সকল কিছুর ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধন হতে পানাহ চাওয়ার কথা। এটা বলা হয়নি যে, আল্লাহর সৃষ্টিকৃত অনিষ্টের ক্ষতি হতে পানা চাই। [যদিও আল্লাহ ভালোমন্দ সকল কিছুরই সৃষ্টিকর্তা] ক্ষতির সৃষ্টি মূলত ক্ষতি নয়। ক্ষতির অর্জন সাধনই ক্ষতির কারণ। অতএব, ক্ষতির সৃষ্টি করা আল্লাহর দোষ নয়।

তাই আয়াতের মর্মার্থে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর প্রত্যেকটি কাজেই সামগ্রিক কল্যাণ ও নির্ভেজাল মঙ্গলের জন্য হয়েছে। অবশ্য সৃষ্টির মধ্যে যে সকল গুণ আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোর সৃষ্টির লক্ষ্য পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তা হতে কোনো কোনো সময় ক্ষতির নমুনা যদিও বুঝা যায় তবে তা ক্ষতি নয়; বরং তাতেও মঙ্গলের কারণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং তাঁর সকল ব্যবস্থাই কল্যাণময়ী। অতএব, مَا অক্ষরটি مَوْصُولَةٌ বা مَصْدَرِيَّةٌ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ : উক্ত আয়াত হতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ততা হতে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। غَاسِقٌ অর্থ হলো– অন্ধকার প্রসার হয়ে যাওয়া, অন্ধকারে সব কিছু আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়া। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত হাসান বসরী (র.) এবং মুজাহিদ (র.) এখানে غَاسِقٌ-এর তাফসীর করেছেন রাতের অন্ধকার। আর وَقَبَ অর্থ– অন্ধকার পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ আমি রাত্রি হতে আল্লাহর সন্নিকটে আশ্রয় চাই, যখন রাতের অন্ধকার পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে চন্দ্রের দিকে ইশারা করে বলেন, তুমি এ চন্দ্রের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। এটা অবশ্যই غَاسِقٌ আচ্ছাদনকারী, যখন তা আচ্ছাদিত হয়। আর তার আচ্ছাদন হওয়ার অর্থ হলো তা সূর্যের কবলে পড়া।

রাত্রিকে غَاسِقٌ-এর জন্য খাস করার কারণ : এর কারণ হচ্ছে– রাতের বেলায় জিন ও শয়তানসমূহ এবং ক্ষতি সাধনকারী প্রাণীসমূহ চোর, ডাকাত ও জমিনের বহু কীটপতঙ্গ বেশির ভাগ চলাচল করে থাকে। এগুলো সুযোগ মতো মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। সকাল হলে এগুলো পালিয়ে যায়। হাদীস শরীফে এগুলোর বহু প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে غَاسِقٌ-এর সাথে রাতকে خُصُوصٌ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ : এখান থেকে ৩য় পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ততা হতে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আর গিরায় ফুঁকদানকারী মহিলাদের ক্ষতিগ্রস্ততা হতে আমি পানাহ চাই। আর গিরায় ফুঁক দান করার অর্থ– জাদু করা। কেননা যে কারো উপর জাদু করে সে মন্ত্র পড়ে কোনো রশির গিরায় ফুঁক দেয় এবং গিরা লাগায়।

اَلنَّفّٰثٰتِ শব্দের ব্যাখ্যা : اَلنَّفّٰثٰتِ শব্দের মওসূফ نُفُوسٌ ও হতে পারে, যাতে পুরুষ ও মহিলা সকলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ অবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে, গিরায় ফুঁকদানকারী পুরুষ ও মহিলাগণের অনিষ্ট হতে আমি পানাহ চাই। আর আয়াতে কারীমায় نَفّٰثٰتٌ বলে মহিলাগণের কথা বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণত আরব দেশের প্রচলন ছিল, মহিলাগণই জাদুর কাজ করত। হ্যাঁ, পুরুষগণও এ কাজ করে থাকে। তবে পুরুষগণ অপেক্ষা মহিলাগণ সৃষ্টিগতভাবেই এ কার্যের অধিনায়ক বেশি হয়ে থাকে। এ কারণেই نَفّٰثٰتٌ শব্দটি مُؤَنَّثٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

অথবা, نَفّٰثٰتٌ এ জন্য বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর যে জাদুর ঘটনা হয়েছিল এবং যে কারণে এ সূরা দু'টি নাজিল হয়েছে, সেই ঘটনায় জাদুকারিণী ছিল ওয়ালীদ ইবনুল আসিমের মেয়েগণ। তারা তাদের পিতার নির্দেশ পালন স্বরূপ এ কাজ করেছিল। এ কারণেই نَفّٰثٰتٌ বলে স্ত্রীলোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা, نَفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ-কে خُصُوصِيَّتٌ-এর সাথে এ জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, উক্ত সূরা দু'টি নাজিল হওয়ার কারণ ছিল এ খাস প্রক্রিয়ার ঘটনা। এ কারণেই مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ-কে خَاصٌ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঝাড়-ফুঁক ও দোয়া কালাম : এ সূরা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের মূল আকীদার ভিত্তিতে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন কালাম দ্বারা আরোগ্য, নিরাময় এবং বালা-মসিবত হতে রক্ষাকল্পে ঝাড়-ফুঁক করা জায়েজ। স্বয়ং নবী করীম ﷺ এবং সাহবীদের জীবন হতে এরূপ ঝাড়-ফুঁকের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ নিম্নোক্ত কালাম পাঠ করে হাসান ও হোসাইনকে ফুঁক দিতেন।

اُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ .

অর্থাৎ আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালামের আশ্রয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেক কষ্টদায়ক শয়তান হতে এবং খারাপ নফস হতে। কিন্তু ইসলামি আকীদার পরিপন্থি কোনো কুফরি কালাম দ্বারা তা করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়; বরং কুফরি। এরূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। –[লোবাব, তিরমিযী, নাসায়ী]

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আন-নাস মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

سِتُّ اٰيَاتٍ : ৬ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَالِقِهِمْ وَمَالِكِهِمْ خَصُّوْا بِالذِّكْرِ تَشْرِيْفًا لَهُمْ وَمُنَاسَبَةً لِلْاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْمُوَسْوِسِ فِيْ صُدُوْرِهِمْ

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব-এর। তাদের সৃষ্টিকর্তা ও তাদের মালিকের। মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট হতে পানাহ চাওয়ার উপযুক্ত এবং মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে মানুষদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢. مَلِكِ النَّاسِ ـ

২. মানুষের বাদশাহ।

٣. اِلٰهِ النَّاسِ بَدَلَانِ اَوْ صِفَتَانِ اَوْ عَطْفَا بَيَانٍ وَاَظْهَرَ الْمُضَافَ اِلَيْهِ فِيْهِمَا زِيَادَةً لِلْبَيَانِ ـ

৩. মানুষের ইলাহ-এর পানাহ চাচ্ছি। এরা উভয়ই দু'টি বদল অথবা সিফাত অথবা عَطْفُ بَيَانٍ এবং এ দু'টির মধ্যে مُضَافُ اِلَيْهِ-কে প্রকাশ করা হয়েছে অধিকভাবে وَضَاحَتْ -এর জন্য।

٤. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ اَلشَّيْطَانِ سُمِّيَ بِالْحَدَثِ لِكَثْرَةِ مُلَابَسَتِهٖ لَهٗ اَلْخَنَّاسِ لِاَنَّهٗ يَخْنُسُ وَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْقَلْبِ كُلَّمَا ذَكَرَ اللّٰهَ ـ

৪. অনিষ্ট হতে কুমন্ত্রণাদানকারীর শয়তান, যার নাম حَدَثْ অধিক পরিমাণে কুমন্ত্রণা দানের কারণে। যে আত্ম গোপনকারী যেহেতু সে বারবার ঘুরে আসে এবং আল্লাহর স্মরণ করা হলে অন্তর হতে সরে পড়ে।

٥. اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ لَا قُلُوْبِهِمْ اِذَا غَفَلُوْا عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে যখন তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল থাকে।

অনুবাদ :

٦. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بَيَانٌ لِلشَّيْطَانِ الْمُوَسْوِسِ اَنَّهُ جِنِّيٌّ وَاِنْسِيٌّ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اَوْ مِنَ الْجِنَّةِ بَيَانٌ لَهُ وَالنَّاسِ عَطْفٌ عَلَى الْوَسْوَاسِ وَعَلٰى كُلٍّ يَشْمُلُ شَرَّ لَبِيْدٍ وَبَنَاتِهِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَاعْتُرِضَ الْاَوَّلُ بِاَنَّ النَّاسَ لَا يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِهِمُ النَّاسُ اِنَّمَا يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِهِمُ الْجِنُّ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ النَّاسَ يُوَسْوِسُوْنَ اَيْضًا بِمَعْنًى يَلِيْقُ بِهِمْ فِي الظَّاهِرِ ثُمَّ تَصِلُ وَسْوَسَتُهُمْ اِلَى الْقَلْبِ وَتَثْبُتُ فِيْهِ بِالطَّرِيْقِ الْمُؤَدِّيْ اِلٰى ذٰلِكَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

৬. জিনদের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে এটা কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তানের বিবরণ যে, চাই সে জিন হোক বা মানুষ হোক। যেমন, অন্য আয়াতে আছে مِنَ شَيَاطِيْنُ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ কিংবা শুধু اَلْوَسْوَاسُ বয়ান হবে, আর النَّاسِ শব্দটি الْجِنَّةِ -এর প্রতি عَطْف হবে। সারকথা এটা উক্ত লবীদ ইহুদি ও তার কন্যাদেরকেও অন্তর্ভুক্তকারী। প্রথম تَرْكِيْب-এর প্রেক্ষিতে এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মানুষ তো মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় না; বরং জিনই মানুষর অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। তার উত্তর এই যে, মানুষও কুমন্ত্রণা দেয় তার জন্য উপযোগী পন্থায় এবং শেষাবধি সে কুমন্ত্রণা অন্তরে গিয়ে পৌছায়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ : بِرَبِّ النَّاسِ শব্দদ্বয় اَعُوْذُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। مَلِكِ النَّاسِ আতফে বায়ান اِلٰهِ النَّاسِ ও আতফে বয়ান। مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ বাক্যটিও اَعُوْذُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, اَلَّذِيْ الخ বাক্যটি خَنَّاسْ-এর সিফাত হিসাবে জর-এর স্থলে, অথবা রফার স্থলে উহ্য هُوَ হতে। অথবা جِنَّةٌ (জিন্নাতুন) হতে ذَمٌّ (তিরস্কার)-এর স্থানে হওয়ার কারণে নসবের স্থলে অবস্থিত।

قَوْلُهُ اَلْخَنَّاسْ : এটা خَنَّاسْ-এর বয়ান অথবা وَسْوَاسْ-এর বয়ান। কেউ কেউ বলেন, তা يُوَسْوِسُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, شَرٌّ হতে বদল হয়েছে– হরফে জার পুনঃ আগমনের কারণে। কেউ কেউ বলেন, তা يُوَسْوِسُ-এর যমীর হতে হাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা فَلَقْ-এর মধ্যে ইহকালীন ও পরকালীন বালা-মসিবত হতে আশ্রয় প্রার্থনার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর অত্র সূরায় পরকালীন সমস্যাসমূহ হতে হেফাজত কামনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল-ফালাক্বের মধ্যে شَرٌّ-এর মাফহুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা দুঃখ-দুর্দশা এবং তার কারণসমূহকে শামিল করেছে। আর অত্র সূরায় ঐ সকল شَرٌّ হতে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা সকল পাপের কারণ। অর্থাৎ শয়তানি কুমন্ত্রণা এবং এর প্রভাব যেহেতু পরকালের জন্য খুবই ক্ষতিকারক, এ জন্য শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার তাকিদ করে কুরআন খতম করা হয়েছে।

اَلرَّبِّ-কে اَلنَّاسِ-এর প্রতি اِضَافَتْ করার কারণ : رَبٌّ-এর অর্থ প্রতিপালক এবং সর্ববস্তুর সংশোধনকারী। এখানে رَبٌّ-এর اِضَافَتْ টি اَلنَّاسُ-এর প্রতি করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী সূরা فَلَق-এর প্রতি করা হয়েছে। এটার কারণ হচ্ছে– সূরা فَلَق-এর মধ্যে প্রকাশ্য ও শারীরিক বিপদসমূহ থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলা উদ্দেশ্য এবং آفَاتِ جِسْمَانِي কেবল মানুষের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং অন্যান্য জীবজন্তুর সাথেও শারীরিক বালা-মসিবত সংযোজিত হতে পারে। তবে وَسْوَسَه شَيْطَانِي-এর বিপরীত। অর্থাৎ وَسْوَسَةٌ شَيْطَانِيٌّ-এর ক্ষতিগ্রস্ততা মানুষের সাথে مَخْصُوص রয়েছে। আর জিন জাতিও তাতে আনুষঙ্গিকভাবে শামিল রয়েছে।

এ কারণেই এখানে رَبٌّ-এর اِضَافَتْ টি نَاسٌ-এর প্রতি করা হয়েছে।

আল্লাহর তিনটি গুণ : সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ শব্দটির সাথে স্বীয় তিনটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে– মানুষের প্রতিপালক, দ্বিতীয়টি মানুষের মালিক, তৃতীয়টি মানুষের উপাস্য বা মা'বূদ। এ তিনটি গুণ উল্লেখের তাৎপর্য হচ্ছে– মানুষের মূল প্রতিপালক আল্লাহ ব্যতীত কেউই হতে পারে না। সে-ই তাদের আলো, বায়ু, আহার্য, পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু ও উপায়-উপকরণের সংস্থান করে দেন। মানুষের মালিক এ দিক দিয়ে যে, তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা। অতএব, যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষের প্রতি যার অজস্র ও অফুরন্ত অনুগ্রহ বিদ্যমান, সে মানুষের উপাস্য বা মা'বূদ হওয়ার যোগ্য। বস্তুত হে দুনিয়ার মানুষ! যিনি তোমাদের রব, মালিক ও মা'বূদ তাঁর তুলনায় আর কোনো সত্তাই বড় শক্তিধর হতে পারে না। সুতরাং জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হও। এমনকি মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান যারা অলক্ষ্যে মানুষের অন্তরে গিয়ে কুপ্ররোচনা দেয়; যা হতে উদ্ধার পাওয়া আল্লাহর মেহেরবানি ছাড়া খুবই কঠিন, তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও মহাশক্তিধর আল্লাহর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা কর, তাঁর শরণাপন্ন হও। তবেই তোমরা এদের অনিষ্টতা ও ক্ষতি হতে রক্ষা পেতে পারবে।

وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ-এর অর্থ : وَسْوَاسٌ বলা হয়, কোনো খারাপ কথা, কাজ ও ভাবের বিষয় মনে এমনভাবে উদয় করে দেওয়া যে, যার অন্তরে উদয় করা হয়, সে আদৌ বুঝতেই পারে না। এ শব্দটির মধ্যে পৌনঃপুনিকতার ভাব বিদ্যমান। যেমন– ভূকম্পনের মধ্যে বারবার কম্পনটি বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি 'ওয়াসওয়াসার' মধ্যে বারবার কুমন্ত্রণা দেওয়া, বারবার খারাপ ভাব জাগরিত করার বিষয়টি বর্তমান। আর خَنَّاسٌ শব্দটির অর্থ হলো, প্রকাশ পাওয়ার পর গোপন হওয়া; সম্মুখে আসার পর পিছনে হটে যাওয়া। কেউ কেউ বলেন, খান্নাস শব্দটির অর্থ হলো প্রকাশ পাওয়ার পর গোপন হওয়া; সম্মুখে আসার পর পিছনে হটে যাওয়া। কেউ কেউ বলেন, খান্নাস শব্দটি দ্বারা নফসে আম্মারার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা বিশেষ একটি শয়তানের কথা বুঝানো হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কতিপয় তাফসীরকারের মতে, খান্নাস শব্দটি দ্বারা নফসে আম্মারাও মানুষের মনে খারাপ চিন্তা, ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা জাগিয়ে তোলে। সূরা ইউসুফে উল্লিখিত হয়েছে– اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ অর্থাৎ অন্তর খারাপের দিকে প্ররোচিত করে। নবী করীম ﷺ তার প্রখ্যাত মাসনুন ভাষণে نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا বলেছেন। তা দ্বারা নফসেরর প্ররোচনাও বুঝা যায়; কিন্তু সূরাটির পরবর্তী ভাষ্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে, খান্নাসের কুমন্ত্রণা দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণাকেই বুঝানো হয়েছে। আর শব্দটির অর্থ দ্বারা যে গুণটি প্রকাশ হয় তা জিন শ্রেণির পক্ষেই সম্ভবপর। সুতরাং এ বাক্যের মর্ম হবে যে, খান্নাস জিন শয়তান বারবার মানুষের মনে কুমন্ত্রণা জাগিয়ে তোলে। এখানে আর একটি দিক আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় যে, মানুষের মনে কোনো খারাপ ভাব জাগরিত হলেই তা গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? এ বিষয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ পাওয়া যায়। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, মানুষের মনে কোনো খারাপভাব ও ইচ্ছার উদয় হলেই তা গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাঞ্ছিত কাজটি করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ না হয়। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেই বাঞ্ছিত কাজটি করতে পারুক বা না পারুক তা গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা তা করার জন্য সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-এর অর্থ : সূরাটির শেষে উল্লেখ হয়েছে যে, যে খান্নাস মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়, তা দুই শ্রেণির দুই জাতির মধ্য থেকে হতে পারে। জিন জাতির মধ্য হতে হওয়ার বিষয়টির আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন। কেননা স্বয়ং ইবলীসই জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে জাতির মধ্যে তার শাগরেদ, মুরিদ-মু'তাকেদ ও অনুসারী থাকাটা স্বাভাবিক; কিন্তু মানুষের

মধ্যে হওয়ার কথাটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। মানুষের মধ্যে শয়তান হওয়ার তাৎপর্য হলো, যেসব মানুষ শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে চিরস্থায়ীভাবে কুফরি ও শিরকির পন্থা গ্রহণ করেছে তারাই শয়তানের শ্রেণিভুক্ত। তারা মানুষের মনে বিভিন্ন পন্থায় ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা ঢেলে থাকে। লেখা ও সাহিত্যের মাধ্যমে, বক্তৃতা ও কথা দ্বারা; অশালীন ও অশ্লীল ছায়াছবি, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মনটিকে কুফরি শিরকি ও খারাপ কাজের দিকে এমনভাবে ধাবিত করে যে, একজন পাকা ঈমানদার লোকও অনেক সময় তা অনুভব করতে পারে না। এ পর্যায়ে আমরা হযরত আবূ যর (রা.)-এর বর্ণিত একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন।

তিনি বললেন, আবূ যর নামাজ পড়েছ কি? আমি বললাম, না পড়িনি। তিনি বললেন, উঠ, নামাজ পড়। নির্দেশ মতো আমি নামাজ পড়ে তাঁর খেদমতে এসে বসলাম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে আবূ যর! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যেও শয়তান হয় নাকি? নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, মানুষের মধ্যেও শয়তান হয়। -[মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী]

اَلنَّاسُ শব্দকে تَكْرَارٌ নেওয়ার কারণ : "اَلنَّاسُ" শব্দকে এখানে বারবার নেওয়া হয়েছে এ জন্য যে, তা দোয়া এবং حَمْد ও ثَنَاءٌ-এর স্থান। সুতরাং দোয়ার ক্ষেত্রে ثَنَاءٌ-ও حَمْد-এর সাথে "اَلنَّاسُ" কে تَكْرَارٌ নেওয়া উত্তম। এ জন্য বারবার নেওয়া হয়েছে।

আর কারো কারো মতে, এ সূরায় اَلنَّاسُ শব্দটি পাঁচবার আনয়ন করা হয়েছে। তার হিকমত হচ্ছে–

১. প্রথম اَلنَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্য ছোট বাচ্চাগণ কেননা لَفْظ رَبّ এবং رُبُوْبِيَّتْ তার জন্য قَرِيْنَةٌ স্বরূপ, কারণ লালনপালনের আবশ্যকতা সর্বাধিক বাচ্চাদের জন্যই হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে رب الناس ।

২. দ্বিতীয় "اَلنَّاسُ" দ্বারা উদ্দেশ্য যুবকগণ لَفْظ مَلِكٌ তার قَرِيْنَةٌ স্বরূপ রয়েছে এবং مَلِكٌ প্রশাসনিক অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রশাসনিক বিষয় যুবকদের জন্যই শোভনীয় হয়ে থাকে। এ কারণেই দ্বিতীয়বার مَلِكِ النَّاسِ বলা হয়েছে।

৩. তৃতীয় "اَلنَّاسُ" দ্বারা বৃদ্ধগণ উদ্দেশ্য, যারা দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মাশগুল হয়ে থাকেন, لَفْظ اِلٰهٌ তার জন্য قَرِيْنَةٌ স্বরূপ, যা ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিতবাহক। তাই বলা হয়েছে اِلٰهِ النَّاسِ ।

৪. চতুর্থ اَلنَّاسُ দ্বারা আল্লাহর নেক বান্দাগণ উদ্দেশ্য এবং لَفْظ وَسْوَسَةٌ তার জন্য قَرِيْنَةٌ স্বরূপ। কেননা শয়তান আল্লাহর নেক বান্দাগণের শত্রু স্বরূপ। নেক বান্দাগণের অন্তরে وَسْوَسَةٌ সৃষ্টি করাই শয়তানের কার্য। তাই বলা হয়েছে اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ।

৫. পঞ্চম বারের اَلنَّاسُ দ্বারা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী লোকগণ উদ্দেশ্য। কেননা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের ক্ষতি সাধন হতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। -[কাবীর, নূরুল কোরআন]

বস্তুত শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পরহেজগার, সকলকে মহান আল্লাহর রহমতের দিকে আকৃষ্ট করা এবং তাদের ইবলীস শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য।

দীন ও ঈমানের হেফাজতের গুরুত্ব : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, পূর্ববর্তী সূরা ফালাক্বে যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে তথা আল্লাহ তা'আলার শুধু একটি গুণের উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো رَبِّ الْفَلَقِ আর যে জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে তা একাধিক যেমন- ১. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ২. غَاسِقٍ ও ৩. نَفَّاثَاتٍ আর আলোচ্য সূরায় মহান আল্লাহর তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।

১. رَبِّ النَّاسِ ২. مَلِكِ النَّاسِ ও ৩. اِلٰهِ النَّاسِ অথচ এ সূরায় শুধু একটি জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। প্রথমোক্ত সূরায় মানুষের দেহ এবং প্রাণের হেফাজত উদ্দেশ্য ছিল। আর অত্র সূরায় দীনের হেফাজত উদ্দেশ্য। এতে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দীন ও ঈমানের হেফাজতের গুরুত্ব দেহ ও প্রাণের হেফাজতের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ববহ।

-[কাবীর, নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ : সূরাহ আল-ফাতিহা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার নাম আল-ফাতিহা। অর্থ- প্রারম্ভিকা, অবতারণিকা, উদ্বোধনী। বাংলা ভাষায় তাকে ভূমিকা ও মুখবন্ধ বলে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহিমান্বিত সূরাকে 'ফাতিহাতুল কিতাব' (গ্রন্থের সূচনা) বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ পবিত্রতম সূরা দিয়ে কুরআন শরীফ আরম্ভ করা হয়েছে।

এ সূরার অন্যান্য নামসমূহ : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) আল-ইতকান নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, আমি সূরা ফাতিহার (৫০০) পাঁচশত নাম অবগত হয়েছি, যা সূরা ফাতিহার শীর্ষ মর্যাদার পরিচায়ক। নিম্নে তার কতিপয় উল্লিখিত হচ্ছে-

১. فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ২. فَاتِحَةُ الْقُرْاٰنِ ৩. اُمُّ الْكِتَابِ ৪. اُمُّ الْقُرْاٰنِ ৫. اَلْقُرْاٰنُ عَظِيْمٌ ৬. اَلْكَافِيَةُ ৭. اَلْوَافِيَةُ ৮. اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ ৯. سُوْرَةُ الْحَمْدِ ১০. سُوْرَةُ الْحَمْدِ الْاُوْلٰى ১১. سُوْرَةُ الْحَمْدِ الْقُصْوٰى ১২. سُوْرَةُ الْكَنْزِ ১৩. اَسَاسُ الْقُرْاٰنِ ১৪. سُوْرَةُ الشُّكْرِ ১৫. سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ ১৬. سُوْرَةُ الدُّعَاءِ ১৭. سُوْرَةُ الصَّلٰوةِ ১৮. سُوْرَةُ الشِّفَاءِ ১৯. سُوْرَةُ الشَّافِيَةِ ২০. سُوْرَةُ النُّوْرِ ২১. سُوْرَةُ الرَّاقِيَةِ ২২. سُوْرَةُ التَّفْوِيْضِ ইত্যাদি। -[ইতকান]

সূরাটি অবতরণের সময়কাল : অবতরণের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সূরা রূপে এটিই প্রথম অবতীর্ণ হয়। তবে সূরা ইকরা, মুদ্দাছছির ও মুযযাম্মিল -এর কয়টি আয়াত অবশ্য সূরা ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রা.) সূরা ফাতিহা সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের সে বক্তব্যের অর্থ এই যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর পূর্বে আর কোনো সূরা নাজিল হয়নি। এ কারণেই এ সূরার নাম فَاتِحَةُ الْكِتَابِ বা কুরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে। -[মা'আরেফুল কোরআন]

এটি মাক্কী না মাদানী এ বিষয়েও কিছুটা দ্বন্দ্ব রয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, সূরা اَلْحَجَر-এর পূর্বে এটি মক্কা অবতীর্ণ হয়। তবে صَاحِبُ الْمَدَارِكْ বলেন, বিশুদ্ধ কথা হলো এটা মাক্কী মাদানী উভয়ই। অর্থাৎ নামাজ ফরজ হওয়ার পর এটি মক্কায় নাজিল হয়; এরপর কা'বার দিকে কেবলা পরিবর্তন যখন হয় তখন পুনরায় মদীনায় নাজিল হয়। অপর এক মতে এর অর্ধেক অবতীর্ণ হয় মক্কায় আর অবশিষ্ট অর্ধেক নাজিল হয় মদীনায়। -[হাশিয়াতুল ওয়াস্সাফ]

সূরটির বিষয়বস্তু : মূলত এ সূরা একটি প্রার্থনার পদ্ধতি মাত্র। এ সূরার প্রথমার্ধে আল্লাহর প্রশংসা এবং দ্বিতীয়ার্ধে বান্দার দোয়া বা প্রার্থনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর এ মহান কালাম অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলা এ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। এটাকে কুরআনের অগ্রভাগে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে- এ মহান গ্রন্থ হতে উপকৃত হতে হলে এবং সত্য পথের সন্ধান পেতে হলে সর্বপ্রথম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হয়। বস্তুত মানুষের মনে যে জিনিস লাভ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, মানুষ স্বভাবত তাঁরই প্রার্থনা করে এবং সে প্রার্থনা ঠিক তখনই করে, যখন যে নিঃসন্দেহে জানতে বুঝতে পারে যে, যাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে উক্ত জিনিসটি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ, তাঁর মঞ্জুরি ছাড়া তা লাভ করা যেতে পারে না। অতএব, কুরআন মাজীদের প্রথমেই এ প্রার্থনার স্থান নির্দেশ করত লোকদের এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সত্যপথ লাভের উদ্দেশ্যে সত্যানুসন্ধানের মনোভাব নিয়ে এ কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তাঁরই নিকট পথ নির্দেশের প্রার্থনা করে।

এ সূরায় প্রার্থনা করা হয়- হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনার ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ দেখান। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআন মানুষের সম্মুখে পেশ করে পরবর্তী সূরায় বলেন- এ কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, এটা সত্য অনুসন্ধানকারীদের জন্য একমাত্র জীবন বিধান। তা তোমাদের দান করা হলো।

সূরাটির মাহাত্ম্য : এ সূরার ফজিলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে, তার মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– এ সূরার তুল্য তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে অন্য কোনো সূরা নেই। কুরআন শরীফ সমস্ত স্বর্গীয় গ্রন্থের মূল, আর সূরা ফাতিহা কুরআন শরীফের মূল। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল সে যেন সমগ্র তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন শরীফ পাঠ করল এবং যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর জানল, সে যেন সমগ্র কুরআন শরীফের তাফসীর অবগত হলো। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন– সূরা ফাতিহার কল্যাণে সর্ব প্রকার বিষ বিনষ্ট হয়ে যায়। উক্ত সূরা কুরআন শরীফের মূল এবং প্রত্যেক পীড়ার আরোগ্যকারী মহৌষধ। হযরত জা'ফর সাদিক (র.) বলেন– আল-হামদু শরীফ চল্লিশবার পড়ে পানিতে দম দিয়ে রোগীর মুখে ছিটিয়ে দাও, ইনশাআল্লাহ রোগ মুক্ত হবে।

২. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল-ফাতিহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম আয়াত তিনটি আল্লাহর জন্য, শেষ তিনটি বান্দার জন্য। আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয়াতটি আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের মধ্যে বণ্টনকৃত। অর্থাৎ إِيَّاكَ نَعْبُدُ আল্লাহর জন্য। আর إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বান্দার জন্য। কারণ সাহায্য প্রার্থনা করাটা হলো বান্দার জন্যই নির্ধারিত। এ সূরাটি দোয়া কবুল হওয়া এবং বিভিন্ন আজাব-মসিবত দূরীভূত হওয়ার জন্য অধিক কার্যকরী।

৩. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে হযরত আলী (রা.) সূরা আল-ফাতিহা পড়ে তাকে দম করে দেন, তার বরকতে লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

৪. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, যে কেউ সূরা আল-ফাতিহা সর্বদা তেলাওয়াত করবে সে দোজখ হতে রক্ষা পাবে।

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরের দিকে দরওয়াজা খোলার আওয়াজ শুনে মাথা উঠালেন। তখন হযরত জিবরাঈল ﷺ বললেন, আসমানের একটা দরওয়াজা আজই খোলা হলো, আজ ব্যতীত পূর্বে কখনো খোলা হয়নি। অতঃপর তা হতে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন ইনি একজন ফেরেশতা তিনি আজ ব্যতীত আর কখনো জমিনে অবতরণ করেননি। তারপর উক্ত ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনাকে দু'টি নূরের শুভ সংবাদ দিচ্ছে, যা আপনাকে দান করা হয়েছে পূর্ববর্তী কোনো নবীকেও তা দান করা হয়নি। তা হলো ফাতিহাতুল কিতাব ও সূরা আল-বাক্বারার শেষ অংশ। এ দু'টির প্রতিটি হরফ পাঠে ছওয়াব দান করা হবে। –[মুসলিম শরীফ]

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– সূরা আল-ফাতিহা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের মহৌষধ।

৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। –[বুখারী]

৮. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি বিছানায় শুয়ে সূরা আল-ফাতিহা ও إِخْلَاصْ পাঠ করবে তখন তুমি মৃত্যু ব্যতীত সব কিছু হতে নিরাপদ থাকবে। –[বাযযার]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ سَبْعُ اٰيَاتٍ بِالْبَسْمَلَةِ اِنْ كَانَتْ مِنْهَا وَالسَّابِعَةُ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اِلٰى اٰخِرِهَا وَاِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهَا فَالسَّابِعَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ اِلٰى اٰخِرِهَا وَيُقَدَّرُ فِىْ اَوَّلِهَا قُوْلُوْا لِيَكُوْنَ مَا قَبْلَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهٗ بِكَوْنِهٖ مِنْ مَقُوْلِ الْعِبَادِ .

অনুবাদ :

সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে বিসমিল্লাহসহ। যদি তাসমিয়া ফাতিহার অংশ হয়, তখন صِرَاطَ الَّذِيْنَ হতে শেষ পর্যন্ত হবে সপ্তম আয়াত। আর যদি তাসমিয়া ফাতিহার অংশ না হয়ে থাকে, তবে সপ্তম আয়াত হবে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ হতে শেষ পর্যন্ত। তাসমিয়ার শুরুতে قُوْلُوْا ক্রিয়া উহ্য মানতে হবে, তাহলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর পূর্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধান হবে। কেননা, তা বান্দার বক্তব্য।

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ قُصِدَ بِهَا الثَّنَاءُ عَلَى اللّٰهِ بِمَضْمُوْنِهَا مِنْ اَنَّهٗ تَعَالٰى مَالِكٌ لِجَمِيْعِ الْحَمْدِ مِنَ الْخَلْقِ اَوْ مُسْتَحِقٌّ لِاَنْ يَحْمَدُوْهُ وَاللّٰهُ عَلَمٌ عَلَى الْمَعْبُوْدِ بِحَقٍّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَىْ مَالِكِ جَمِيْعِ الْخَلْقِ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهِمْ وَكُلٌّ مِنْهُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ يُقَالُ عَالَمُ الْاِنْسِ وَعَالَمُ الْجِنِّ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَغُلِّبَ فِىْ جَمْعِهٖ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ اُولُوا الْعِلْمِ عَلٰى غَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ لِاَنَّهٗ عَلَامَةٌ عَلٰى مُوْجِدِهٖ .

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই এটা খবরিয়া বাক্য। এ বাক্যের সার-সংক্ষেপ দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করা উদ্দেশ্য। এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত প্রশংসার অধিকারী অথবা তিনিই তার যোগ্য যে, কেবল বান্দা তাঁরই প্রশংসা করবে। اَللّٰهُ শব্দটি প্রকৃত উপাস্যের নাম। যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক অর্থাৎ তিনি সমস্ত মাখলূকাতের তথা মানব, জিন, ফেরেশতা ও জীব-জন্তুর অধিপতি। উল্লিখিত প্রত্যেক প্রকারের উপর عَالَمٌ শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন- عَالَمُ الْاِنْسِ মানবজগৎ, عَالَمُ الْجِنِّ দানবজগৎ ইত্যাদি। عَالَمٌ শব্দটিকে 'ওয়াও' এবং নূন দ্বারা বহুবচন নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞানীদেরকে অন্যান্য মাখলুকাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। عَالَمٌ শব্দটি عَلَامَةٌ থেকে গৃহীত। কেননা 'জগৎ' আল্লাহর অস্তিত্বের উপর আলামত বা নিদর্শন।

অনুবাদ :

٢. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَىْ ذِى الرَّحْمَةِ وَهِىَ اِرَادَةُ الْخَيْرِ لِاَهْلِهٖ .

২. যিনি পরম করুণাময় দয়ালু অর্থাৎ করুণাওয়ালা। কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তির প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা হলো রহমত।

٣. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اَىْ الْجَزَاءِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَخُصَّ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهٗ لَا مِلْكَ ظَاهِرًا فِيْهِ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلّٰهِ تَعَالٰى بِدَلِيْلِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ وَمَنْ قَرَأَ مَالِكَ فَمَعْنَاهُ مَالِكُ الْاَمْرِ كُلِّهٖ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَىْ هُوَ مَوْصُوْفٌ بِذٰلِكَ دَائِمًا كَغَافِرِ الذَّنْبِ فَصَحَّ وُقُوْعُهٗ صِفَةً لِلْمَعْرِفَةِ .

৩. যিনি প্রতিফল বিদসের মালিক يَوْمِ الدِّيْنِ হলো الْجَزَاءِ বা প্রতিফল দিবস। আর তা দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সেদিন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো কোনো আধিপত্য থাকবে না। এ কথার উপর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলবেন- لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ অর্থাৎ আজকের আধিপত্য কার? لِلّٰهِ একমাত্র আল্লাহর জন্য। কেউ مَالِكَ পড়েন। তখন অর্থ হবে তিনি কিয়ামতের দিবসে সমস্ত বিষয়ের অধিপতি। অর্থাৎ তিনি সর্বদা এ গুণে গুণান্বিত, যেমন- غَافِرِ الذَّنْبِ অতএব, তা মা'রেফার সিফাত হওয়া সঠিক হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : এ সূরা মক্কায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের প্রথম অধ্যায়েই অবতীর্ণ হয়। নির্ভরযোগ্য হাদীস হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এটাই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে নাজিল হয়। তার পূর্বে শুধু কয়েকটি খণ্ড আয়াতই নাজিল হয়েছিল- যা সূরা আলাক্ব, মুযযাম্মিল ও মুদ্দাছিরের অন্তর্ভুক্ত।

শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বলেন- একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন- হে মুহাম্মদ! তিনি উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন আকাশ ও জমিনের মধ্যখানে একটি ঝুলানো চেয়ার, তার উপর উপবিষ্ট একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ। তা দেখে মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তখন তিনি ঘরে ফিরে যান। উপর্যুপরি কয়েকবার এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তিনি তা হযরত খাদীজা (রা.)-এর নিকট প্রকাশ করেন। তখন হযরত খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পরামর্শ দিলেন, আপনি আব্দুল্লাহ (আবূ বকর) (রা.)-কে নিয়ে বহু-শাস্ত্রবিদ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ওরাকা ইবনে নাওফালের নিকট গমন পূর্বক তাঁকে এ ব্যাপারে অবগত করুন। আমার বিশ্বাস, তিনি আপনাকে এর রহস্য বলে দিতে পারবেন। পরামর্শ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ারাকার নিকট গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলেন। তা শুনে ওয়ারাকা বলে উঠলেন- 'কুদ্দূসুন কুদ্দূসুন' [শুভ শুভ] তিনি যে নামূসুল 'আখবার' [স্বর্গীয় বাণীবাহক জিবরাঈল।]

অতঃপর তিনি বললেন, আবার সেরূপ অদৃশ্য বাণী কর্ণগোচর হলে আপনি ভীত না হয়ে সে আলোকোজ্জ্বল-জ্যোতির্ময় পুরুষ যা বলেন, তা স্থিরভাবে শুনবেন।

তদনুসারে হযরত পুনরায় প্রান্তর দিয়ে গমনকালে যখন 'ইয়া মোহাম্মদ'! ধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন তিনিও 'লাব্বায়েক' (উপস্থিত) বলে উত্তর দিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট প্রকাশ হয়ে বললেন- হে মুহাম্মদ, আপনি মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত নবী এবং আমি তাঁর প্রেরিত জিবরাঈল ফেরেশতা। তখন তিনি বললেন, বলুন- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সূরা আল-ফাতিহার শেষ পর্যন্ত। -[দালায়েলে বায়হাকী, ওয়াহেদী, এতকান, ফতেহ]

اَللّٰهُ -এর পরিচিতি : আল্লাহ সে মহান সত্তাকে বলা হয়, যিনি অতি পবিত্র- সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র ও পাক। আর যিনি সকল আকৃতি-প্রকৃতি এবং শরীর হতে মুক্ত। সকল মাখলুকাতের যাবতীয় অবস্থা হতে ব্যতিক্রম। আর তিনি কেমন? তাঁর কোনো রূপরেখা আছে কিনা? কোথায় বাস করেন? কোথা হতে এসেছেন? এ ধরনের সকল প্রশ্ন হতে পবিত্র।

অর্থাৎ আল্লাহ এমন জাত-পাক, যিনি স্থায়ী, থাকা আবশ্যক এবং সকল দিক থেকে কামালিয়াত সমন্বয়ে বহাল রয়েছেন এবং সকলের সৃষ্টিকর্তা। আর لَفْظ (اَللّٰه) এবং اِلٰه একই অর্থ জ্ঞাপক। যেমন, বলা হয়েছে اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ এবং وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ আবার কখনো হয়তো اِلٰه দ্বারা غَيْرُ اللّٰهِ-কে বুঝায়। কিন্তু اَللّٰه বলতে একমাত্র اَللّٰه-কে বুঝায়, তাই اَللّٰه শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহর পরিচিতি এভাবে দেয়া যায় যে,

هُوَ اسْمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ بِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنَزَّهِ عَنْ شَرِيْكٍ .

رَبٌّ-এর অর্থ : رَبٌّ শব্দের বাংলা অর্থ করা হয়– প্রভু, লালনপালনকারী; কিন্তু কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত رب -এর অর্থ ও ভাব অত্যন্ত ব্যাপক। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রব শব্দের যেরূপ ব্যবহার এবং অর্থ বুঝানো হয়েছে, তা হতেই প্রমাণিত হয় যে, এ শব্দটির বহু ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে। কুরআনে কারীমের প্রয়োগ দৃষ্টে মনে হয় যে, এ শব্দের অর্থ– সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন-বিধান দেওয়া, কোনো জিনিসের মালিক হওয়া, লালনপালন করা, রিজিক দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। একসঙ্গে এ সব অর্থই তাতে নিহিত আছে এবং যে শক্তির মধ্যে একসঙ্গে এ সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে তিনি হচ্ছেন রব।

اَلشُّكْرُ لِلّٰهِ না বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কেন বলা হয়েছে? : حَمْد প্রকৃতপক্ষে شُكْر -এর একটি প্রকার মাত্র। এ অনুসারে বুঝা যায় شُكْر -এর উর্ধ্বে حَمْد এর স্থান। আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّٰهَ عَبْدٌ لَمْ يَحْمَدْهُ অর্থাৎ সকল শোকর -এর মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান হলো حَمْد এবং বান্দা যখন আল্লাহর শোকর করে, তখন حَمْد আদায় হয় না। অতএব, আল্লাহর প্রশংসা যেন অতি উত্তমভাবে আদায় হয় এ কারণে এখানে حَمْد বলা হয়েছে– شُكْر বলা হয়নি এবং আল্লাহর উপযুক্ত মতে যেন حَمْد আদায় হয়।

আর حَمْد -কে رَأْسُ الشُّكْرِ বলার কারণ হলো আল্লাহর নিয়ামতের কথা মুখে স্বীকার করা, অন্তরে স্বীকার করা হতে অতি উত্তম। আর কার্যত নিয়ামত স্বীকার করা হতেও উত্তম। কেননা অন্তরের স্বীকৃতি বা কার্যের স্বীকৃতি হতে মুখের স্বীকৃতি অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। –[মাদারেক]

حَمْد এর বিপরীত হলো ذَمٌّ [নিন্দা] আর شُكْر -এর বিপরীত হলো كُفْرَانٌ নাফরমানি করা। আবার কারো কারো মতে مَدْح বা প্রশংসা হলো এমন কার্যের উপর গুণ বর্ণনা করা যা صِفَتْ كَمَالْ -এর অন্তর্ভুক্ত যেমন اَزَلْ হতে থাকা, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব হওয়া ইত্যাদি।

اَلشُّكْرُ বলা হয়– এমন প্রশংসা যা তার উত্তম গুণাবলির কারণে সে পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেই প্রশংসার কারণ সে নিজেই। কারো কারো মতে, حَمْد ও مَدْح এর মধ্যে عَامٌ وَخَاصٌ এর পার্থক্য। অর্থাৎ حَمْد (হামদ) হলো খাস এবং مَدْحٌ (মদাহ) হলো عَامٌ (আম)। কারো কারো মতে, কোনো অনুগ্রহের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, বা সম্মান প্রদর্শন করার নাম شُكْرٌ চাই তা বক্তব্যের মাধ্যমে হোক অথবা কর্ম এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক। আর বিনা অনুগ্রহে সম্মান করা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলো- حَمْد আর ذَمٌّ বলা হয়, যে কোনো প্রকার নিন্দাজ্ঞাপক করা। চাই কথার দ্বারা বা কার্যের দ্বারা, অথবা যে কোনোভাবেই হোক। আল্লামা যামাখশরী (র.) বলেন, حَمْد ও مَدْح সমর্থক শব্দ। উভয়ের মধ্যে কোনো فَرْق নেই।

اَلْعَالَمِيْنَ-কে جَمْع ব্যবহার করার কারণ :

১. اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ-এর বহুবচন। যেহেতু عَالَمٌ-এর সমস্ত অংশসমূহের মধ্যে ইনসান জাতি বিশেষত তন্মধ্যে পুরুষ জাতিই উত্তম, এ কারণে اَلْعَالَمِيْنَ-কে جَمْعُ مُذَكَّرٌ-এর صِيْغَهْ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে।

আর যেহেতু এতে কেবল ইনসান জাতি উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর সৃষ্টিকুলের যত জাতি রয়েছে। যেমন– عَالَمِ لَاهُوْت - عَالَمِ اِنْسَانْ - عَالَمِ مَلَكُوْت - عَالَمِ جَنَّاتْ - عَالَمِ بَرْزَخْ - عَالَمِ اٰخِرَةْ ইত্যাদি সকল প্রকার সৃষ্টিকুল উদ্দেশ্য, এ হেতু اَلْعَالَمِيْنَ শব্দকে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে আল্লাহ তা'আলা জিন-ইনসান, পশুপক্ষী, জল ও স্থল ভাগের সকল প্রাণীজগৎ এবং গাছ-পালা, তরু-লতা, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি আঠারো হাজার মাখলুকাতের সকলেরই তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টিসকল এক একটি عَالَم বা জগৎ। এ কারণে رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলা হয়েছে এবং اَلْعَالَمِيْنَ-কে جَمْع নেওয়া হয়েছে।

২. অথবা, عَالَمٌ অর্থ– নিশান, চিহ্ন বা নিদর্শন এবং اَلْعَالَمِيْنَ অর্থ– চিহ্নসমূহ। আল্লাহ তা'আলা যত জগৎ বা জাতি সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকটি জাতিই তাঁর কুদরতের এক একটি নিশান বা চিহ্ন। এগুলোর সংখ্যা অপরিসীম বিধায় اَلْعَالَمِيْنَ-কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। –[কাশ্শাফ, মাদারিক]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

১. لَفْظ رَحْمٰنْ আল্লাহ তা'আলার সিফাতি নাম হওয়া সত্ত্বেও لَفْظُ اَللّٰهُ-এর ন্যায় কেবল ذَاتْ بَارِىْ تَعَالٰى-এর জন্য সুনির্দিষ্ট। অতএব, এর অর্থ করা হয়েছে কোনো মেহনত বা পরিশ্রমের বিনিময় ব্যতীত দয়া বর্ষণকারী, আর رَحِيْم শব্দের অর্থ করা হয়েছে, اَعْمَالْ صَالِحَةْ সমূহের উত্তম প্রতিদানকারী ও বিশেষ দয়াবান এবং প্রকৃত পরিশ্রমের প্রতিদান বিশেষভাবে দানকারী।

২. কেউ কেউ বলেন, رَحْمٰنْ দুনিয়াতে সাধারণভাবে সকলের জন্য মেহেরবান, অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
আর رَحِيْم আখেরাতে বিশেষভাবে সকল নেক বান্দাদের জন্য দয়া বর্ষণকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ رَحْمٰنْ শব্দটি সাধারণ অর্থে এবং رَحِيْم শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। কেউ কেউ বলেন– এ শব্দদ্বয় مُبَالَغَةْ-এর অর্থের জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ অধিক রহমতের অধিকারী।

৩. (كَثْرَتْ رَحْمَتْ) কেননা رَحْمَتْ অর্থ হলো– رِقَّتُ الْقَلْبِ নরম অন্তঃকরণ হওয়া। আল্লাহ তা'আলা অন্তর হতে পাক। অতএব, এর অর্থ হবে অধিক দয়াবর্ষণকারী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্য অতি উত্তমভাবে দয়া বর্ষণকারী এবং নাফরমান বান্দাদের জন্যও খুব দয়া বর্ষণকারী।

৪. কেউ কেউ বলেন, رَحْمٰن رَحِيْم উভয় শব্দ رِحْم শব্দ থেকে নির্গত– তা আল্লাহর জন্য خَاصْ শব্দ, এটার লিঙ্গান্তরও হয় না। বাংলা ভাষায় এদের অর্থ– দয়াময় ও অধিক দয়াময় এবং رَحْمٰنْ শব্দটি ঈমানদার ও বেঈমান কাফের সকলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। আর رَحِيْم কেবল ঈমানদার ও আল্লাহর অনুগত লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, যারা ঈমান গ্রহণ করে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তবে, বেঈমানগণের প্রতি (رَحْمٰنْ) দয়াবান অস্থায়ী এবং ঈমানদারদের প্রতি (رَحِيْم) স্থায়ী দয়াবান হবেন ইহকালে ও পরকাল।

৫. কারো মতে, اَلرَّحْمٰنُ হলো চিন্তা-দুঃখ পেরেশানী দূরকারী আর اَلرَّحِيْمُ হলেন পাপসমূহ মার্জনাকারী।

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেন, প্রার্থনার পর যিনি দেন তিনি হলেন رَحْمٰنْ আর যিনি প্রার্থনা ব্যতীতই দান করেন এবং প্রার্থনা না করলে রাগন্বিত হন, তিনি হলেন رَحِيْم যেমন কবি বলেন–

وَاللّٰهُ يَغْضِبُ اِذَا تَرَكْتَ سُوَالَهُ * وَبَنُوْ اٰدَمَ يَغْضِبُ حِيْنَ يُسْئَلُ

৭. কারো মতে, اَلرَّحْمٰنْ হলেন পথ প্রদর্শনকারী আর اَلرَّحِيْم হলেন তৌফিকদানকারী– (مَارَبُ الطَّلَبَةِ)

قَوْلُهُ "مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ মালিক, স্বত্বাধিকারী, একচ্ছত্র অধিপতি। সাধারণত 'يَوْمْ' সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বলে। শরিয়তের পরিভাষায়– সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বলে। আবার আরবি ভাষায় 'يَوْمْ' শব্দটি সময় বা কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার পঞ্চাশ হাজার বছরকেও 'يَوْمْ' বলা হয়। এখানে 'সময়' অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ কর্মফলের সময়টা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় হতে আরম্ভ করে সমস্ত লোকের হিসাব হয়ে বেহেশত বা দোজখে প্রবেশ করার হুকুম পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

বস্তুত তিনিই সবকিছুর মালিক। প্রকাশ্য, গোপন, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার শুরু নেই শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানার কোনো তুলনা নেই। মানুষের মালিকানা তো ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাহ তা'আলার মালিকানা এমন যে, পরকালেও একমাত্র তার মালিকানাই সাব্যস্ত হবে।

আর مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-এর অর্থ– কোনো বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাতে ব্যবহার রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধনসহ সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। আর دِيْن অর্থ– প্রতিদান। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ দ্বারা অর্থের ব্যাপকতার দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে, সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার অধিকারে থাকবে। –[মা'আরেফুল কোরআন]

مَالِكْ এবং مَلِكْ-এর মধ্যে পার্থক্য : শব্দটি মীমের পর আলিফ এবং আলিফ ছাড়া উভয়ভাবেই পড়া যায়। মক্কা ও মদীনার ক্বারীগণ আলিফ ছাড়া পড়েন। আবার অনেকের মতে আলিফ দিয়ে পড়া উত্তম। اَلْمَلِكْ বলতে বুঝায় اَلَّذِىْ يُدَبِّرُ اَعْمَالَ رَعِيَّةِ الْعَامَّةْ অর্থাৎ যে তারা প্রজা-সাধারণের সাধারণ কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে; কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত বিশেষ কাজ ও ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু মালিক (مَالِكْ) সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারীকে বলা হয়। তাতে একটি অক্ষর বেশি হওয়াতে তার অর্থ অধিকতর ব্যাপক ও সর্বাত্মক।

অনুবাদ :

٤. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اَىْ نَخُصُّكَ بِالْعِبَادَةِ مِنْ تَوْحِيْدٍ وَغَيْرِهِ وَنَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُوْنَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا .

৪. আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি অর্থাৎ তাওহীদ ইত্যাদিতে শুধু ইবাদতের জন্য আপনাকেই খাস করেছি এবং ইবাদত ইত্যাদির উপর আপনার থেকেই সাহায্য চাচ্ছি।

٥. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اَىْ اَرْشِدْنَا اِلَيْهِ وَيُبْدَلُ مِنْهُ .

৫. আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন অর্থাৎ তার প্রতি চালিত করুন। সামনের আয়াত এটা থেকে বদল হয়েছে।

٦. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالْهِدَايَةِ وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِيْنَ بِصِلَتِهِ .

৬. তাদের পথে যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ সুপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে। সামনের বাক্যটি الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ থেকে 'বদল' হয়েছে।

٧. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَلَا وَغَيْرِ الضَّالِّيْنَ وَهُمُ النَّصَارٰى وَنُكْتَةُ الْبَدَلِ اِفَادَةُ اَنَّ الْمُهْتَدِيْنَ لَيْسُوْا يَهُوْدًا وَلَا نَصَارٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَاِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَاٰبُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ صَلٰوةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ وَمُتَلَازِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৭. তাদের পথে নয় যাদের উপর অভিশাপ নাজিল করেছেন অভিশপ্ত গোষ্ঠি হচ্ছে ইহুদিরা। এবং যারা পথভ্রষ্ট নষ্ট, যারা পথভ্রষ্ট তারা হচ্ছে খ্রিস্টানগণ। 'বদল' বলার কারণ হলো এ কথা বুঝানো যে, ইহুদি এবং খ্রিস্টানগণ সুপথপ্রাপ্ত নয়। আল্লাহ সঠিক সম্পর্কে ভালো জানেন। তাঁর দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন এবং আশ্রয়স্থল। আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং পূত-পবিত্র সহচরবৃন্দের উপর আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিক অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِيَّاكَ -এর মধ্যে اِيَّاكَ نَعْبُدُ তে مَفْعُوْل কে-فِعْل-এর পূর্বে নেওয়ার কারণ : اِيَّاكَ نَعْبُدُ এবং اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ মাফউলকে فِعْل -এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো ফে'ল পূর্বে নেওয়া, মাফউল পরে নেওয়া। এরূপ করা হয় ইখতেসাস-এর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ ক্রিয়াটিকে ঐ মাফউলের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়। অতএব, অর্থ দাঁড়ায়–আমরা (হে আল্লাহ) তোমারই জন্য ইবাদত করি (ইবাদত একমাত্র তোমারই জন্য খাস) আর তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

اَلْعِبَادَةُ -এর অর্থ : ইবাদত শব্দটি 'عَبْدٌ' হতে নির্গত। 'عَبْدٌ' বলা হয় দাস ও বান্দাকে। এটা হতেই গঠিত হয়েছে ইবাদত অর্থাৎ বন্দেগি এবং দাসত্ব করা। কথাটি শ্রবণের সাথে সাথে কয়েকটি কথা জাগ্রত হয়।

ক. যে বন্দেগি স্বীকার করেছে সে বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। বান্দা হওয়া ও বান্দা হয়ে থাকাই তার সঠিক মর্যাদা।

খ. এমন একজন আছেন যার বন্দেগি করা হয়েছে।

গ. যাঁর বন্দেগি করা হচ্ছে, তাঁর পক্ষ হতে নিয়ম ও আইন-বিধান নাজিল হচ্ছে এবং যে বন্দেগি করছে সে তাঁকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিধানকেও পুরোপুরি মেনে নিচ্ছে।

ঘ. কাউকেও মা'বূদ বলে স্বীকার করা এবং তার দেওয়া আইন-কানূন পালন করে চলার একটি অনিবার্য পরিণতি রয়েছে, যে পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বন্দেগির কাজ করা হচ্ছে।

ইবাদাতকে عُبُوْدِيَّةٌ থেকে বলা যায়। এর অর্থ اَلذُّلُّ বা অবনতি স্বীকার করা, দলিত-মথিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। এর আরো অর্থ مَا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوْعِ وَالْخَوْفِ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভালোবাসা, বিনয় ও ভীতি এ সব কয়টি ভাবধারা যাতে সমন্বিত তা-ই ইবাদত।

মানবের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত, মূলত আল্লাহ এ জন্য মানবকুলকে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু দুর্বল মানবের পক্ষে এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে চলা সবসময় সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই ইবাদত স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে বান্দার মুখ হতে বলানো হয়েছে- "হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এ কর্তব্য পালনের জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি।" তাতে আল্লাহর পক্ষ হতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দা ইবাদতের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোক, নিজের সাধ্যমতো এ কর্তব্য পালন করে যাক, আর আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুক, আমি তাকে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করবো।

ইমাম গাযালী (র.) স্বীয় গ্রন্থ আরবাঈনে দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা- নামাজ, জাকাত, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা, প্রতিবেশী ও সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা। মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া এবং রাসূলের সুন্নত পালন করা। -[মা'আরেফুল কোরআন]

اَلْاِسْتِعَانَةُ -এর অর্থ : اَلْاِسْتِعَانَةُ-এর অর্থ طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ তথা সাহায্য প্রার্থনা করা। مَعُوْنَةٌ দু' প্রকার ضَرُوْرِيَّةٌ এবং غَيْرُ ضَرُوْرِيَّةٍ যা ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব হয় না; তাকে ضَرُوْرِيَّةٌ বলা হয়। আর যা ছাড়া কাজ করা যায়; কিন্তু কষ্ট হয়, সহজভাবে করা যায় না, তাকে غَيْرُ ضَرُوْرِيَّةٍ বলে। এখানে اِسْتِعَانَةٌ বলে উভয় প্রকার مَعُوْنَةٌ-কে বুঝানো হয়েছে।

সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি আম, তথা কোনো কাজের সাহায্য চাই সে বিষয়টির উল্লেখ নেই। এ কারণে জমহুর মুফাসসিরীনের অভিমত হচ্ছে এখানে সাধারণ সাহায্যে প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্য কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। -[মা'আরেফুল কোরআন]

اَلْهِدَايَةُ -এর অর্থ : হিদায়াতের অর্থ- দু'টি।

১. اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ বা পথ দেখিয়ে দেওয়া।

২. اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ বা উদ্দেশ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

هِدَايَةٌ শব্দটি اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে সকলেই অবগত, আর اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ অর্থে ব্যবহৃত হওয়া مَجَازٌ হিসাবে।

আল্লামা তাফতাযানী (র.) কাশশাফের হাশিয়াতে বলেন, যদি هِدَايَةٌ শব্দটি مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِه হয়, তখন اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ -এর অর্থ হবে।

আর যখন مُتَعَدِّىْ بِوَاسِطَةِ الْحَرْفِ হয়, তখন اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ -এর অর্থ হবে।

মূলত মানুষকে এ হেদায়েত চারটি দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম- স্বভাবজাত জ্ঞান হতে কাজের পথ জেনে নেওয়ার সুব্যবস্থা। দ্বিতীয়-মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা ও ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে জীবন পথের জ্ঞান অর্জন। তৃতীয়- স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির পথ নির্দেশ। চতুর্থ- দীন হতে পথ প্রদর্শন লাভ।

প্রথমোক্ত তিন ধরনের হেদায়েত সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে; কিন্তু এ স্বভাবজাত হেদায়েত দ্বারা মানুষের জীবনের ব্যাপক, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহ কিছুতেই পূরণ হতে পারে না। জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে হলে দীনভিত্তিক হেদায়েত একান্তই আবশ্যক, যা মানুষের কাছে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে। যা বাস্তবায়ন করেন রাসূলগণ।

اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ-এর অর্থ : اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ-এর বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। ১. সিরাতুল মুস্তাকীম হলো– কিতাবুল্লাহ, ২. ইসলাম, ৩. আবুল আলিয়ার মতে, মুহাম্মদ ﷺ আবূ বকর ও ওমর (রা.) উদ্দেশ্য, ৪. ইমাম সাহল বলেন, সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা উদ্দেশ্য, ৫. ইমাম মুযানী (র.) বলেন, রাসূলের তরীকাকে বুঝানো হয়েছে এবং ৬. আল্লামা যামাখশারী বলেন, সত্যপথ ও সত্যধর্ম ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْاِسْتِقَامَةُ-এর অর্থ : اِسْتِقَامَةٌ শব্দের অর্থ– সোজা হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া, اِعْتِدَالٌ বা সরল-সোজা হওয়া। সূরা আল-ফাতিহায় اِسْتِقَامَةٌ বলতে সরল-সোজা পথকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ইসলাম সরল-সোজা পথ বা জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু তাকে সিরাতুল মুস্তাকীম বলা হয়েছে।

আল-ওয়াস্‌সাফের হাশিয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, اَلْمُسْتَقِيْمُ-এর অর্থ হলো– اَلْمُسْتَوِىْ مِنَ الْاِسْتِقَامَةِ তথা اَلْاِعْتِدَالُ বা সরল সহজ, অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– هُوَ طَرِيْقُ الْحَقِّ وَالدِّيْنِ لِاَنَّهُ مُعْتَدِلٌ بَيْنَ الْاِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ

যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - وَهٰذِهٖ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

আর এ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ দ্বারা আমাদের শরিয়তে মোহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা অতি কঠোরতা ও অতি নম্রতার মাঝামাঝি।

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَغْضُوْب ও ضَالُّوْنَ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. اَلضَّالُّوْنَ বলতে নাসারা বা খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ তারা নিজেরা পূর্বেই ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেক লোককে ভ্রষ্ট করেছে।

   اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলে ইহুদিদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন– وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের উপর গজব এবং অভিশাপ অবতারণ করেছেন। –[ইবনে কাছীর]

২. অথবা, مَغْضُوْب এবং ضَالٌّ বলে মুনাফিক উদ্দেশ্য। অথবা, مَغْضُوْب দ্বারা ফাসিক বা যাদের আমল মন্দ, আর ضَالٌّ দ্বারা যারা মন্দ আকীদাসম্পন্ন তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৩. কারো মতে, مَغْضُوْب عَلَيْهِمْ দ্বারা সকল বদ আমলকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, আর ضَالِّيْنَ দ্বারা সকল جَاهِلْ-কে বুঝানো হয়েছে।

নিয়ামতপ্রাপ্ত কারা? : যারা আল্লাহর পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের বর্ণনা সূরা আন-নিসার ৯ম রুকূতে এসেছে–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

অর্থাৎ যারা পুরস্কারপ্রাপ্ত তারা হলেন– নবীগণ, সিদ্দীকগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। বর্ণনাকারী হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) বলেন– পুরস্কারপ্রাপ্ত দ্বারা নবীগণকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন– মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত অকী'(র.) বলেন– মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– ফেরেশতাগণ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণকে বুঝানো হয়েছে। [এ সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।]

قَوْلُهُ اٰمِيْن : اٰمِيْن শব্দটি اِسْم فِعْل -এর অর্থ হলো اِسْتَجِبْ । যেমন– رُوَيْد ـ حَيَّهَلْ ও هَلُمَّ একে দু'ভাবে পড়া যায়। মদবিহীন। যথা– اَمِيْن যেমন কবি বলেন–

تَبَاعَدَ عَنِّيْ فَطَحَلَ اِذْ دَعَوْتُهُ * اَمِيْنَ فَزَادَ اللّٰهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا

আর মদসহ। যেমন– اٰمِيْنَا যেমন– مَجْنُوْن-এর কবিতায় আছে–

يَا رَبِّ لَا تَسْلُبَنِّيْ حُبَّهَا اَبَدًا * وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنَا

তবে اٰمِيْن অংশটি سُوْرَةُ فَاتِحَة-এর কোনো অংশ নয়। কিন্তু সূরা আল-ফাতিহা সমাপ্ত করে আমীন বলা মোস্তাহাব। হাদীসে এসেছে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে 'আমীন' বলতে শুনেছি এবং তিনি তাতে শব্দ লম্বা করেছেন। আবূ দাউদে এসেছে তিনি শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি বলেন– 'আয় আল্লাহ! তুমি করো।' জাওহারী বলেন– এরা অর্থ 'অনুরূপ' হোক। তিরমিযী বলেন– 'আমাদের নিরাশ করো না। অধিকাংশ ওলামা বলেন এর অর্থ– 'আয় আল্লাহ। তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো।'

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হযরত জিব্রাঈল (আ.) সূরা আল-ফাতিহা সমাপ্তের পর আমাকে 'اٰمِيْن' পড়া শিখিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, চিঠিপত্রে যেরূপ সীলমোহর লাগানো হয়, তদ্রূপ সূরা আল-ফাতিহার জন্য 'আমীন' সীলমোহর। যখন বান্দা সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করে 'আমীন' বলে, ফেরেশতাগণও আমীন বলে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব-পরের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। –[বায়যাবী]

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এটা চিঠির মোহরের মতো। এটা কুরআনের কোনো অংশ নয়। কেননা পূর্বোক্ত مَصَاحِف সমূহে এ শব্দটির উল্লেখ নেই।

আর হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে, নামাজে ইমাম اٰمِيْن বলবে না। কেননা এটা দোয়া প্রার্থনাকারীর শব্দ। –[কাশশাফ]

তবে আমাদের মাযহাব মতে, নামাজের মধ্যে ইমাম মুক্তাদি সবার জন্য اٰمِيْن গোপনে পড়া সুন্নত। জামাত ছাড়া নামাজেও সুন্নত। –[হাশিয়ায়ে ওয়াস্‌সাফ]